অর্থবিজ্ঞানের ভূমিকা

সুব্রত গুপ্ত

অর্থশাস্ত্র বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, যোগমায়া দেবী কলেজ, কলিকাতা,
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

এস. গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্স

৫৮, বিধান সরণী

কলিকাতা - ৬

ভূমিকা

বর্তমানে বইটি বি-কম্ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লিখিত হইয়াছে। বি-এ. ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অর্থবিজ্ঞানের উপর লিখিত আমার বই পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। বি-কম্ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদাভাবে লিখিত এই বইয়ে অর্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব যতটা সম্ভব প্রাঞ্জল ভাষায় সহজবোধ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে। আমার এই প্রচেষ্টা সার্থক হইয়াছে কিনা সুধীবৃন্দই বিচার করিবেন। এই বইটি কোন মৌলিক চিন্তাধারার সাক্ষ্য বহন করে না। কিন্তু স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন বিদেশী বইতে অর্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব যেভাবে আলোচনা করা হইয়াছে, সেইগুলিকে মাতৃভাষায় নূতন আঙ্গিকে প্রকাশ করার চেষ্টা আমি করিয়াছি। বিদগ্ধ পাঠক এই বইয়ের উপর Samuelson, Lipsey, Stigler, Stonier and Hague, Watson প্রমুখ লেখকদের বইয়ের প্রভাব নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন। এই বইয়ের কোন কোন ক্ষেত্রে আমার লিখিত অন্য কয়েকটি বইয়েরও বিভিন্ন অংশ সংযোজিত হইয়াছে। বইটির মান যতদূর সম্ভব উঁচু রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে প্রশ্নপত্র উত্তরসংকেত সহ দেওয়া হইয়াছে। বইটি ছাপার কাজে আমি শ্রীগোপালচন্দ্র মল্লিক ও শ্রীরবীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের নিকট হইতে প্রুফ সংশোধনের কাজে সাহায্য পাইয়াছি। এই বইটি কিভাবে আরও উন্নত করা যায় সে সম্পর্কে যে কোন পরামর্শ সানন্দে গৃহীত হইবে।

বিনীত

সুব্রত গুপ্ত

Three-Year Degree Syllabus For Economic Theory In Different Universities.

Economics—Subject-matter and scope,—Consumer's behaviour—Production, Factors of production—Costs of Production—Organisation of Production—Monopoly & Competition.

The Firm and the market—Perfect and Imperfect Competition. Factor pricing—Wages, Interest, Profits and Rent, Monetary Systems—Banking and Central Banking—Monetary theory—Income, Employment and Output—Value of Money—Inflation and Deflation—Monetary Policy—International Economic Institutions—International Trade and Foreign Exchange—International value—Balance of Payments—Exchange Rate determination—Exchange control--Devaluation.

Government Finance—Taxation—Public Expenditure—Public Debts.

Economic Fluctuations—Causes and Remedies of Unemployment—Fiscal Policy vs. Monetary Policy—Economic Systems—Capitalism and Socialism—The State and economic activities—Economic Planning.

সূচীপত্র

Stat●—রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (State Trading)—শিল্প জাতীয়করণের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি—মার্ক্সের উন্নয়ন তত্ত্ব—আধুনিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য—অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপাদান—সুষম বা ভারসাম্য সূচক উন্নয়ন এবং অসম উন্নয়ন (Balanced growth vs. Unbalanced growth)—অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপায় (Requirements for economic development of an underdeveloped country) অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থসংস্থান (Financing of Economic Development).

অর্থবিজ্ঞানের ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

অর্থবিজ্ঞানের সংজ্ঞা এবং অন্যান্য
(Definition of Economics and allied topics)

অর্থবিজ্ঞানের বিষয়-বস্তু (Subject-matter of Economics
একটি সমাজবিজ্ঞান। সমাজ-জীবনে মানুষের বিভিন্ন কাজের ম
গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইতেছে জীবিকা উপার্জন করা। মানুষের অ
এই অভাবের কোন সীমা নাই। একটি অভাব মি
আমাদের অন্য একটি অভাব মিটাইবার চিন্তা
প্রয়োজনের তুলনায় সামগ্রীর অপ্রাচুর্য আমরা
আবার, এই অভাব মিটাইবার প্রধান উপকরণ হইতেছে অর্থ; অর্থোপা
সব মানুষেরই থাকে। উপার্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া বিভিন্ন
প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাইবার চেষ্টা করে। রবিন্সের মতে অল্প আয়
সামগ্রীর সাহায্যে অনেক অভাব দূর করার প্রচেষ্টা
বলি অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা। সুতরাং অল্প আয় এবং
ব্যবহারের সাহায্যে অভাব মিটাইবার কাজে আ
থাকি তখন আমাদের সেই কাজকেই অর্থ
(economic activities) বলা হয়। অর্থবিজ্ঞান এই অর্থনৈতিক কা
করে। অর্থনৈতিক কাজের মূল কথা হইল, অর্থ-উপার্জন করা এবং
সেই উপার্জিত অর্থের ব্যবহার করিয়া যতদূর সম্ভব অভাব মিটাইবার
অর্থবিজ্ঞান মানুষের বিভিন্ন কাজের মধ্যে এই একটি
অনুশীলন করে। যদি কোন একটি বিশেষ
অর্থোপার্জনের কোন যোগাযোগ না থাকে অথবা
যোগাযোগ না থাকে, তবে সেই কাজ অর্থবিজ্ঞা
বিষয় নয়; যদি অসুস্থ ছেলের শুশ্রূষা করেন, তবে সেই কাজ
আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না; কারণ এই কাজের মধ্যে
চেষ্টা নাই। কিন্তু যদি হাসপাতালের কোন নার্সকে কোন রোগীর শু
হয় তবে সেই কাজ অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বস্তু হয়। কারণ নার্সকে এইজন্য
দিতে হয়।

অভাব : অভাবের কোন সীমা নাই

...সিত আয়ের সাহায্যে অভাব দূর করার প্রচেষ্টাই অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা

অর্থবিজ্ঞান মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের অনু... করে

মানুষের বিভিন্ন অভাব দূর করিবার জন্য টাকা খরচ করিতে হয়; সু

মাত্রেরই টাকার প্রয়োজন থাকে। অর্থোপার্জনের জন্য মানুষ
চেষ্টার ফলস্বরূপ সে তাহার বিভিন্ন অভাব পূরণ করিতে পারে।
মানুষের বিভিন্ন কাজের মধ্যে শুধু এই বিশেষ দিকটি অনুশীলন ক
পণ্য বিনিময় করে এবং এইজন্য বিনিময়ের মাধ্যমেই মানুষের বিভি
অভাব পূরণ করার সময়ে আমাদের একটি জিনিস চিন্তা করিতে হ
কোন্ অভাবটি আগে পূরণ করিতে হইবে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহ
বলা হয়, অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি নির্বাচন করিবার বস্তু ("Econ
are matters of choice.")। পরিমিত আয় এবং দুষ্প্রা
আমাদের সব অভাব দূর করা সম্ভবপর নয় বলিয়াই এই মনোনয়নে
এই সমস্যার সমাধানের জন্য মানুষকে যে সকল কাজে ব্যাপৃত
কাজগুলির অনুশীলন করাও অর্থবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।
(Prof. Viner) মতে, অর্থবিজ্ঞানীগণ যাহা করেন, তাহাই অর্থ
বিষয়, ("Economics is what economists do —Vin
ভাইনারের যুক্তি গ্রহণ করি, তবে অর্থবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু অত্যন্ত
অপর দিকে আমরা যদি রবিন্সের মত অনুযায়ী শুধু ম
কাজকর্মগুলিকেই অর্থবিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তু বলিয়া মনে
অর্থবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। সমাজবদ্ধ মানুষের
সমস্যাও অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। অর্থবিজ্ঞান একদিকে
কল্যাণের (material welfare) কারণ ব্যাখ্যা করে, অপরদিকে
জন্য নিছক বুদ্ধিচর্চাও করে। অর্থবিজ্ঞান শুধু কিভাবে অর্থনৈতি
যায় তাহাই আলোচনা করে না, ইহা সমাজবদ্ধ মানুষের বিভিন্ন
সমাধান এবং মানুষের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন সম্বন্ধেও আলোচনা
হইতে বিবেচনা করিলে অর্থবিজ্ঞান এক দিকে তত্ত্বমূলক (Theo
দিকে ফলিত (Applied) বিজ্ঞান।

অর্থবিজ্ঞান যে মূলতঃ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কা
অনুশীলন করে, এই যুক্তি সর্বপ্রথম প্রদান করেন অধ্যাপক মার্শা

ক্লাসিক্যাল অর্থ-বিজ্ঞানীদের অভিমত

পূর্বে অ্যাডাম স্মিথ অর্থবিজ্ঞানকে একটি
science of wealth") বলিয়া বর্ণনা করেন
অর্থবিজ্ঞানকে সম্পদের সহিত সংশ্লিষ্ট একটি
করেন। কিন্তু ক্লাসিক্যাল (classical) অর্থবিজ্ঞানীদের এই সংজ্ঞা
দার্শনিকগণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কার্লাইল (Carlyle),
প্রমুখ দার্শনিকগণ অর্থবিজ্ঞানের এই সংজ্ঞাটির তীব্র সমালোচনা

মার্শালের অভিমত

মতে অর্থবিজ্ঞান ছিল একটি "মণের
Mammon)। এইরূপ তীব্র সমালোচনার

প্রতি অনেকেরই একটি বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়। অর্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে এই বিরূপ মনোভাবের পরিবর্তন ঘটান অধ্যাপক মার্শাল। মার্শালের মতে, অর্থবিজ্ঞানের বিবেচ্য বিষয় "ধন" নহে, "মানুষ"।

মানুষের অভাব যাহাতে পূরণ হইতে পারে সেইজন্য ধনের প্রয়োজন। ধন উপার্জন করিবার পিছনে প্রেরণা হইতেছে মানুষের অভাব দূর করার তাগিদ। অভাব পূরণের জন্য ধনের প্রয়োজন এবং সেইজন্য মানুষ ধন উপার্জন করিবার চেষ্টা করে। সেইজন্য মার্শালের মত আমরা একদিকে "ধনের" কথা আলোচনা করি; কিন্তু আমরা অধিকতর প্রয়োজনীয় দিকে আলোচনা করি মানুষের কর্মনিরত জীবনের একটি অংশ।[১]

অধ্যাপক মার্শালের মতে, অর্থবিজ্ঞান হইতেছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কাজের অনুশীলন ("Economics is a study of man's action in the ordinary business of life.")। মানুষ কিভাবে অর্থ উপার্জন করে এবং অভাব পূরণের জন্য কিভাবে উপার্জিত অর্থ ব্যয় করে,—অর্থবিজ্ঞান তাহা অনুশীলন করে। মানুষের অর্থোপার্জন এবং অর্থব্যয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য বিভিন্ন অভাব দূর করা। মানুষের অনেক অভাব; একটি অভাব পূরণ করিলেই আমাদের সামনে আর একটি অভাব দেখা যায়। অথচ আমাদের আয় অথবা আর্থিক সঙ্গতি খুবই অল্প। দৈনন্দিন জীবনে আমাদের অন্যতম কাজ হইতেছে কিভাবে সীমাহীন অভাব এবং সীমিত আয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা যায়, তাহার চেষ্টা করা; অর্থবিজ্ঞান এই কাজের অনুশীলন করে। অর্থোপার্জনের দ্বারা আমরা যখন আমাদের অভাব দূর করার চেষ্টা করি, তখন আমাদের টাকার মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্য বিনিময় করিতে হয়। কখনও আমরা কোন জিনিস কিনি, আবার কখনও কোন জিনিস বিক্রয় করি। কোন জিনিস বিক্রয় করিবার জন্য আমাদের সেই জিনিসটি উৎপাদন করিতে হয়। বেচা-কেনার এই কাজও অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। দৈনন্দিন জীবন মানুষের অনেক কাজ আছে; সেগুলির সবই অর্থশাস্ত্রের আলোচনার বস্তু নয়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের শুধু একটি বিশেষ দিক্, যাহা সীমাবদ্ধ আয়ের সাহায্যে সীমাহীন অভাব দূর করিবার প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত, অর্থশাস্ত্রে তাহাই আলোচিত হয়। মানুষের অর্থোপার্জন এবং অর্থব্যয়ের কাজ সমাজের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। সমাজের বাহিরে যাঁহারা বাস করেন, যেমন, সন্ন্যাসী ও ফকিরগণ, তাঁহাদের অভাবের তাড়নাও নাই, অর্থোপার্জনেরও তাগিদ নাই। সন্ন্যাসী এবং ফকিরের হয়ত অনেক কাজ থাকিতে পারে,—কিন্তু সেই সকল কাজের অনুশীলন অর্থবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নহে। সমাজে বাস করিলেই মানুষকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজে ব্যস্ত থাকিতে হয় এবং সেই সকল কাজ অর্থের মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য। যাহারা সমাজে বাস করে না,

১। **"It is on the one side, a study of wealth and on the other, and more important side, a par of the study of man."**

তাহাদের কাজের সহিত অর্থবিজ্ঞানের কোন সংস্রব নাই। এইজন্য অর্থবিজ্ঞানকে একটি "সমাজিক বিজ্ঞান" ('a Social Science') বলা হয়।

অর্থবিজ্ঞানের সংজ্ঞা (Definition of Economics): অর্থবিজ্ঞান মূলতঃ মানুষের অর্থনৈতিক কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট। মানুষ সীমাবদ্ধ উপায় এবং দুষ্প্রাপ্য সামগ্রীর সাহায্যে যখন বিভিন্ন অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা করে, তখন সেই কাজকে অর্থনৈতিক কাজ (economic activity) বলা হয়। অনেক সময় বলা হইয়া থাকে, অর্থবিজ্ঞান মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অর্থের ভূমিকা লইয়া আলোচনা করে।[১] কিন্তু, এই যুক্তি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে, এবং মানুষের অর্থনৈতিক কাজগুলি যে অর্থের সাহায্যে পরিমাপযোগ্য সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু, সেইজন্য অর্থই মানুষের মূল লক্ষ্য নয়। মানুষের দুষ্প্রাপ্য উপকরণের সাহায্যে বিভিন্ন অভাব পূরণ করিবার প্রচেষ্টায় অর্থের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। অর্থের সাহায্যে মানুষ বিভিন্ন সামগ্রী কিনিতে পারে। সেই সামগ্রীগুলিই মূলতঃ মানুষের অভাব মোচনের জন্য প্রয়োজনীয়। অর্থবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় "অর্থ" নহে, "মানুষ"। মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যেগুলি অর্থনৈতিক, অর্থাৎ যেগুলি একদিকে উপকরণ অথবা সঙ্গতির দুষ্প্রাপ্যতা এবং অপরদিকে অভাবের প্রাচুর্যের মধ্যে সামঞ্জস্য আনিবার চেষ্টা করে সেইগুলিই প্রকৃত পক্ষে অর্থবিজ্ঞান পর্যালোচনা করে। সেইজন্য অধ্যাপক রবিন্স বলেন, "মানুষের অভাব এবং তাহা মোচন করার জন্য দুষ্প্রাপ্য সঙ্গতির (যেগুলির বিকল্প ব্যবহার আছে) মধ্যে সম্পর্কের বিন্যস্ত মানুষের আচরণ অনুশীলন করাই অর্থশাস্ত্রের কাজ"।[২] রবিন্সের সংজ্ঞার মধ্যে তিনটি ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দেখা যায়। প্রথমত, অভাবের সীমা নাই। দ্বিতীয়ত, অভাব মিটাইবার উপায় খুবই সীমাবদ্ধ। তৃতীয়ত, সীমাবদ্ধ উপায় এবং অনন্ত অভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়ন করিতে হয়। মানুষের অনেক অভাব। এই অভাবগুলির মধ্যে কোন্‌টি অথবা কোন্‌গুলি আগে পূরণ করিতে হইবে, তাহা নির্বাচন করিতে হয়। অথচ এই অভাব মোচনের জন্য বিভিন্ন উপকরণ অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। রবিন্সের মতে, দুষ্প্রাপ্যতা (scarcity) এবং নির্বাচন (choice) হইতেছে আসল সমস্যা। এই দুইটি সমস্যা হইতেই বিনিময়ের (exchange) সৃষ্টি হয়। বিনিময়ের ক্ষেত্রেও অর্থের প্রয়োজনীয়তা আছে। অর্থের দুষ্প্রাপ্যতা আমাদের বিনিময় করিবার প্রবণতাকে প্রভাবিত করে। কারণ, বিনিময় হইতেছে অর্থের একটি কাজ। সুতরাং, দুষ্প্রাপ্যতা, নির্বাচন এবং বিনিময়,—এই তিনটিই আমাদের সমুদয় অর্থনৈতিক সমস্যার মূলে রহিয়াছে। অর্থনৈতিক কাজের মধ্যে অর্থের কার্যকারিতা আছে এবং আমরা তাহা বিবেচনা করিব; কিন্তু, সেই জন্য অর্থই অর্থবিজ্ঞানের একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নয়।

১। "Economics studies the part played by money in human affairs." Cairncross.

২। "Economics is a study of human behaviour as the relationship between ends and scarce means which have alternative uses."

রবিন্সের সংজ্ঞাটি একদিক হইতে বিবেচনা করিলে অত্যন্ত সংকীর্ণ। সমাজবর্জিত মানুষেরও (যেমন, রবিনসন্ ক্রুসো) অভাব থাকে এবং সেই অভাব মোচন করিবার উপকরণও অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। রবিন্সের সংজ্ঞা গ্রহণ করিলে এই প্রকার সমাজবর্জিত ব্যক্তির অর্থনৈতিক কাজকর্মও অনুশীলন করিতে হয়। কিন্তু অর্থবিজ্ঞান সমাজ-বহির্ভূত মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ অনুশীলন করে না। সমাজের মধ্যে থাকিয়া মানুষ কিভাবে দুষ্প্রাপ্য উপকরণের সাহায্যে অভাব মোচন করিবার চেষ্টা করে এবং সেই প্রচেষ্টা কিভাবে বিনিময়ের মাধ্যমে কার্যকর হয়, অর্থবিজ্ঞান তাহাই অনুশীলন করে। সেইজন্য মানুষ কিভাবে সীমিত উপকরণের সাহায্যে অনন্ত অভাব মিটাইবার চেষ্টা করে এবং সেই প্রচেষ্টা কিভাবে বিনিময়ের মাধ্যমে কার্যকরী হয়, অর্থবিজ্ঞান তাহাই অনুশীলন করে।

মানুষের সীমিত আয়ের মাধ্যমে অনন্ত অভাব দূর করিবার প্রচেষ্টা যখন বিনিময়ের মাধ্যমে কার্যকরী হয়, তখন আমরা দেখিতে পাই উৎপাদক কতিপয় জিনিস উৎপাদন করে এবং ক্রেতা অর্থের মাধ্যমে উৎপাদকের নিকট হইতে সেই জিনিস ক্রয় করে। ইহা হইতেই উৎপাদন (Production) এবং ভোগের (Consumption) সৃষ্টি হয়। উৎপাদন করিবার সময় উৎপাদক বিবেচনা করিয়া দেখে কোন্ জিনিসটি আগে এবং কোন্ জিনিসটি পরে উৎপাদন করা উচিত, অথবা কোন জিনিসটি মানুষের একটি বিশেষ অভাব মিটাইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সুতরাং, জিনিসপত্র কিনিবার সময়ে অথবা অভাব মিটাইবার সময়ে যেমন নির্বাচনের প্রশ্ন উঠে, জিনিসপত্র উৎপাদন করিবার ক্ষেত্রেও সেই প্রকার নির্বাচনের প্রশ্ন উঠে। সেইজন্যই অর্থনৈতিক সমস্যা মূলতঃ সমাজ-জীবনের দুষ্প্রাপ্যতা নির্বাচন এবং বিনিময়ের সমস্যা।

অর্থবিজ্ঞানের মূল সমস্যাগুলি কি ?ঃ

অর্থবিজ্ঞানীগণ যে সকল সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করেন, সেই সমস্যাগুলি মূলতঃ অর্থনৈতিক সমস্যা। রবিন্স অর্থবিজ্ঞানের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাহাতেই আমরা তিনটি সমস্যার উল্লেখ দেখিতে পাই, প্রথম সমস্যা হইতেছে অনন্ত অভাব দূর করিবার সমস্যা। দ্বিতীয় সমস্যা হইতেছে প্রথম সমস্যার সমাধানের জন্য উপকরণের ব্যবস্থা করা। আমাদের অভাব মিটাইবার উপকরণ খুবই সীমাবদ্ধ। তৃতীয় সমস্যা হইতেছে এই অনন্ত অভাব এবং সীমাবদ্ধ উপায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়ন করা। এই সমস্যাগুলির সমাধান কিভাবে করা যায়, সেই সম্বন্ধে যখন অর্থবিজ্ঞানীগণ আলোচনা করেন, তখন বাস্তব জীবনের তিনটি প্রধান সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করিতে হয়। সেইগুলি হইতেছে, উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা (scarcity of means), অভাবের মধ্যে নির্বাচন (choice among wants) এবং বিনিময়ের (exchange) সমস্যা। এই সমস্যাগুলি হইতেই সৃষ্টি হয় উৎপাদন (production), ভোগ (consumption) এবং বিনিময়-মূল্য নির্ধারণের (price determination) সমস্যা। শুধু তাহাই নহে, কোন্ জিনিসের উৎপাদন এবং তাহা বিক্রয় হইয়া গেলে

বিক্রয়লব্ধ আয় কিভাবে বণ্টিত হইবে, সেই সমস্যার উত্তরও অর্থবিজ্ঞানীগণকে দিতে হয়। তাহা হইতেছে জাতীয় আয় বণ্টনের সমস্যা। উৎপাদনের উপকরণগুলি কি নীতি অনুযায়ী জাতীয় উৎপাদন বা জাতীয় আয়ের অংশ পাইবে, তাহাও স্থির করিতে হয়।

শুধু তত্ত্বের দিক দিয়া বিবেচনা করিলেই চলিবে না; অর্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব বাস্তবে প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্রে অর্থবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। সেই সমস্যগুলি হইতেছে ফলিত অর্থবিজ্ঞানের (Applied Economics) সমস্যা। সেই সমস্যাগুলি যথেষ্ট পরিমাণে দেশ ও কালের অবস্থার উপর নির্ভরশীল। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, ভারতে কি পরিমাণ ঘাট্‌তি বাজেট অথবা কর ধার্য করা যাইতে পারে, সেই সম্বন্ধে যদি অর্থবিজ্ঞানীদের প্রশ্ন করা হয়, তবে তাঁহারা প্রথমে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন ভারতের মত দেশে ঘাট্‌তি বাজেট এবং কর ধার্য করিবার নীতি কি পরিমাণে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, এবং ইহার পর তাঁহারা এই প্রশ্নের সমাধান করিতে পারিবেন।

অর্থবিজ্ঞান ও বস্তুজাত কল্যাণের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Economics and Material Welfare): অধ্যাপক ক্যানান (Prof. Cannan) তাঁহার "Wealth" নামক বইয়ে অর্থবিজ্ঞানকে মানুষের "বস্তুগত কল্যাণের কারণসমূহ অনুশীলনকারী বিজ্ঞান" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে সম্পদের প্রয়োজনীয়তা হইতেছে মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হইবার জন্য। সুতরাং অর্থবিজ্ঞান মূলতঃ মানুষের বস্তুগত কল্যাণ কিভাবে হইতে পারে তাহারই অনুশীলন করে।

আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীগণের মধ্যে অনেকেই ক্যানানের এই সংজ্ঞার সমালোচনা করিয়াছেন। 'কল্যাণ' (Welfare) শব্দটির অর্থ এই ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নয়। প্রথমত, মানুষের কল্যাণ যদি শুধু সম্পদ হইতেই হয়, তবে অ্যাডাম স্মিথের সংজ্ঞার ("অর্থবিজ্ঞান হইতেছে একটি সম্পদ বিজ্ঞান") সহিত ইহার মূলতঃ কোন পার্থক্য থাকে না। দ্বিতীয়ত, কল্যাণ এবং সম্পদ এক জিনিস নয়। দেশে অধিক পরিমাণে মদ তৈয়ারী হইলে সম্পদ বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ইহাতে প্রকৃত কল্যাণ হয় না। তৃতীয়ত, মানুষ শুধু বস্তুগত সামগ্রী (material goods) ব্যবহার করে না বিভিন্ন ধরনের সেবাস্রোত (flow of services) ব্যবহার করে। কিন্তু ক্যানান শুধু বস্তুগত সামগ্রীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। চতুর্থত, বস্তুগত সামগ্রী এমনিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে বস্তুগত সামগ্রী হইতে প্রাপ্ত উপযোগিতা। সর্বশেষে, অর্থবিজ্ঞানকে আমরা যদি শুধু বস্তুগত কল্যাণের কারণ অনুশীলনকারী বিজ্ঞান বলিয়া বর্ণনা করি, তবে ইহাকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক বিজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের একমাত্র আদর্শ হইতেছে সত্যের অন্বেষণ করা,—ইহার কোন উদ্দেশ্যমূলক আদর্শ থাকে না। অর্থবিজ্ঞান বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার উপর আলোক সম্পাত করে,—মূল-বিচার (value judgment)

'কল্যাণ' এবং 'সম্পদ' এক জিনিস নয়

করা ইহার কাজ নয়। লর্ড কেইনসের মতে, অর্থবিজ্ঞান এমন কতিপয় স্থির সিদ্ধান্ত দেয় না যাহার সাহায্যে অবিলম্বে কতিপয় নীতি তৈয়ারী করা যায়। ইহা একটি বিশেষ তত্ত্ব নহে, ইহা একটি প্রক্রিয়া অথবা মনের যন্ত্র মাত্র, যাহা ইহার অধিকারীকে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সাহায্য করে।[১] এই যুক্তি অনুযায়ী অর্থবিজ্ঞান আমাদের সাহায্য করে কিভাবে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা যায় সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের পথ নির্দেশ করিবার সময় অর্থবিজ্ঞানের আলোচনা করিতে হইবে উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা এবং ইহাদের বিভিন্ন ভাবে প্রয়োগ করিবার দৃষ্টিকোণ হইতে,—বস্তুগত কল্যাণের কারণ অনুসন্ধানের দৃষ্টিকোণ হইতে নয়।

অর্থবিজ্ঞান ও নীতি নির্দেশনা

দেখা যাইতেছে, ক্যানান অর্থবিজ্ঞানকে একটি ফল প্রদায়ী বিজ্ঞান (fruit-bearing science) বলিয়া মনে করেন। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে কোন বিজ্ঞানই উদ্দেশ্যমূলক নয়, ইহা ভাল-মন্দ আলোচনা না করিয়া কি ঘটিয়াছে এবং কি ঘটিতে পারে তাহাই আলোচনা করে। তবে কোন কোন অর্থবিজ্ঞানীর মতে, অর্থবিজ্ঞান মানুষের অর্থনৈতিক কাজগুলির আলোচনার সহিত মূলতঃ সংশ্লিষ্ট থাকিলেও বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিবার জন্য বস্তুগত কল্যাণের কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা একেবারে উপেক্ষা করিতে পারে না। কোন অর্থবিজ্ঞানীই বর্তমানে মূল্য বিচারের (value judgment) দায়িত্ব একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন না। সামাজিক জীবনে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন অথবা কল্যাণ বৃদ্ধির সমস্যা সম্পর্কেও আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীগণ চিন্তা করিয়া থাকেন। আধুনিক অর্থবিজ্ঞান শুধু কিভাবে সীমিত আয়ের সাহায্যে অনন্ত অভাব দূর করা যায় তাহাই বিবেচনা করে না, কিভাবে মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের সাহায্যে সামাজিক কল্যাণ বাড়ানো যাইতে পারে তাহাও বিবেচনা করে।

আধুনিক অর্থবিজ্ঞান বস্তুগত কল্যাণের দিকটি একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারে না

অর্থনৈতিক সমস্যা ও অর্থনৈতিক কল্যাণ (Economic Problems and Economic Welfare):

মানুষের অভাব সীমাহীন; কিন্তু এই অভাব দূর করিবার উপায় খুবই সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধ উপায়ের সাহায্যে যখন মানুষ তাহার সীমাহীন অভাব দূর করার চেষ্টা করে তখনই ইহাকে অর্থনৈতিক কাজ (economic activity) বলা হয়। অর্থনৈতিক কাজের ফলে মানুষের কল্যাণ সাধিত হয় কিনা, সেই বিষয়ে স্বভাবতঃই অনেক প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে। অভাব দূর করিতে পারিলে মানুষের যে তৃপ্তি এবং উপকার হয় তাহাই তাহার ব্যক্তিগত কল্যাণ (Individual Welfare)। ব্যক্তিগত কল্যাণের

১। "Economics does not furnish a body of settled conclusions immediately applicable to policy. It is a method rather than a doctrine, an apparatus of mind, a technique of thinking which enables its possessors to draw correct conclusions".

পর মানুষ বিবেচনা করে সমষ্টিগত কল্যাণ (Group Welfare) এবং সামাজিক কল্যাণের (Social Welfare) কথা। অভাব পূরণের মাধ্যমে যখন মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে কতিপয় সুবিধা পায়, তখন তাহাকে সমাজের কথাও ভাবিতে হয়। কারণ, তাহার কাজের প্রভাব সমাজের উপর হইতে পারে। সমাজের কল্যাণ-অকল্যাণের উপর তাহার নিজের কল্যাণ ও অকল্যাণ নির্ভর করে। সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক এমন কোন অর্থনৈতিক কাজ নিজের স্বার্থে মানুষ যে করে না, তাহা নহে। তবে অর্থনৈতিক কাজের প্রভাবে সমাজের কল্যাণ এবং অকল্যাণ দুই-ই হয়। যেমন, যাহারা বিষ অথবা মদ তৈয়ারী করে তাহারা এই কাজের মাধ্যমেই নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে। অথচ তাহাদের এই কাজের ফলে অনেক সময়েই সমাজের অকল্যাণ হয়। কল-কারখানার কাজ খুব বেশী পরিমাণে চলিতে থাকিলে একদিকে যেমন জাতীয় উৎপাদন বাড়ে, অপরদিকে সেই প্রকার কারখানার কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানিরও আশংকা থাকে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে দেশের সামগ্রিকভাবে কল্যাণ সাধিত হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে অনেকের ব্যক্তিগত ক্ষতি যে হয় না তাহা নহে। তবে এই কথা অস্বীকার করা যায় না যে সমুদয় অর্থনৈতিক কাজের মাধ্যমে যদি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয় এবং ইহাতে যদি সমাজের দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা এবং অন্যান্য সমস্যার সমাধান হয়, তবে অর্থনৈতিক কাজগুলি সমাজের কল্যাণ সাধন করিবার সহায়ক হয়। জাতীয় উৎপাদন বাড়াইয়া শ্রমিকদের উৎপাদনী শক্তি এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে হইলে আমাদের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজের উপরেই নির্ভর করিতে হয় এবং ইহাতেই দেশের ব্যক্তিসমষ্টির এবং ব্যক্তির কল্যাণ হয়।

অর্থবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক (Relation between Economics and other Social Sciences) :

অর্থশাস্ত্র একটি সমাজবিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সঙ্গে এইজন্যই অর্থশাস্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

অর্থবিজ্ঞানের সহিত সমাজতত্ত্বের সম্পর্ক (Relation between Economics and Sociology) : অর্থবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু আলোচনা করিয়া আমরা দেখিলাম, ইহা মূলত একটি সমাজবিজ্ঞান। সমাজবদ্ধ মানুষের সীমিত আয়ের সাহায্যে সীমাহীন অভাব মোচনের যে প্রয়াস, অর্থবিজ্ঞান ইহারই অনুশীলন করে। অন্যান্য সমাজতত্ত্বের সহিতও অর্থবিজ্ঞানের সম্পর্ক খুবই নিকট। সমাজতত্ত্ব (Sciology) কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক। সমাজতত্ত্ব সমাজ জীবনের সমস্ত দিক আলোচনা করে। অর্থবিজ্ঞান সমাজতত্ত্বের অন্যতম শাখা হইলেও অর্থবিজ্ঞানের লক্ষ্য এবং পরিধি সমাজতত্ত্বের লক্ষ্য ও পরিধি হইতে পৃথক। অর্থবিজ্ঞানে আমরা সমাজ জীবনের শুধু অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচনা করি, সব রকম সমস্যার আলোচনা করি না।

অর্থবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক (Economics and Political Science) : অর্থবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

উভয় বিজ্ঞানেরই উদ্দেশ্য মানুষের সর্বাবিধ কল্যাণ করা। কোন দেশের অর্থনৈতিক নীতি (Economic policy) সেই দেশের রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোর উপর নির্ভর করে।

রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র, বর্তমান বিশ্বের এই দুইটি আদর্শ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিজ্ঞান উভয়কেই কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কখনই হইতে পারে না। প্রাচীন অর্থনীতিবিদগণ মনে করিতেন যে, অর্থবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি বিভাগ। কিন্তু বর্তমানে এই দুইটি বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। অর্থবিজ্ঞান মানুষের শুধু অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অনুশীলন করে, অর্থাৎ মানুষ কিভাবে সীমিত আয়ের সাহায্যে অপরিমিত অভাব দূর করার চেষ্টা করে তাহার অনুশীলন করে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তু হইতেছে রাষ্ট্রের সৃষ্টি, গঠন, কাঠামো, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, পররাষ্ট্রের সহিত কোন বিশেষ রাষ্ট্রের সম্পর্ক, সরকারের ক্রিয়াকলাপ, নাগরিকদের অধিকার এবং শাসনতন্ত্রে সরকার ও নাগরিকদের মধ্যে সম্পর্ক। অর্থবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয়েই সমাজ-বিজ্ঞানের শাখা। এই দুইটি পরস্পরের সহিত বিশেষভাবে সংযুক্ত। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ইহার অর্থনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করে।

অর্থবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র (Economics and Ethics): অনেকে মনে করেন, অর্থবিজ্ঞানের সহিত নীতিশাস্ত্রের কোন যোগাযোগ নাই। তাহাদের মতে, যে কোন অর্থনৈতিক নীতি তখনই সার্থক হয় যখন ইহা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের

অর্থবিজ্ঞান নীতিশাস্ত্রের সংস্রব-বর্জিত

পক্ষে অনুকূল হয় এবং সেইজন্য ইহা নীতিশাস্ত্রের সহিত জড়িত নাও থাকিতে পারে, কিন্তু এই যুক্তি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। যে সকল নীতি মানুষের নৈতিক কল্যাণ সাধন করিতে পারে, নীতিশাস্ত্রে সেইগুলিরই অনুশীলন করা হয়। অর্থবিজ্ঞানেরও উদ্দেশ্য মানব-সমাজের সর্ববিধ কল্যাণ সাধন করা। যদিও অর্থবিজ্ঞানে আমরা শুধু মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপগুলিরই অনুশীলন করি, তবু মানুষের সমুদয় অর্থনৈতিক প্রচেষ্টায় নৈতিক বা আদর্শগত মান উন্নত করিতে আজকাল সব রাষ্ট্রই চেষ্টা করে। একজন লোকের পক্ষে অপর লোককে কোন সময়েই বঞ্চনা করা উচিত নয়—ইহা নীতিশাস্ত্রের একটি নীতি। অনুরূপভাবে আমরা দেখিতে পাই, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার একটি নীতি হইতেছে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা এবং দেশের লোকের সর্ববিধ কল্যাণ সাধিত হইবার জন্য একটি কল্যাণ-রাষ্ট্র (welfare state) প্রতিষ্ঠা করা। এই ক্ষেত্রে অর্থ-বিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অধ্যাপক মার্শাল অর্থশাস্ত্রকে নীতিশাস্ত্রের পরিচারিকা ("Hand-maid of Ethics") বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অর্থবিজ্ঞানে আমরা কোন নীতির সামাজিক প্রভাব উপেক্ষা করিতে পারি এবং সেক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হয় যেন সমাজের উপর ইহার কোন বিশেষ খারাপ প্রভাব না হয়।

অর্থবিজ্ঞান কি একটি বিজ্ঞান? (Is Economics a Science ?): অর্থবিজ্ঞানকে প্রকৃতই একটি বিজ্ঞান বলা চলে কিনা, সেই বিষয়ে অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। কোন বিষয় সম্বন্ধে সুশৃংখলভাবে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও গবেষণার সাহায্যে যখন আমরা বিশেষ জ্ঞানলাভ করি, তখনই ইহাকে বিজ্ঞান বলা হয়। এই জ্ঞানের উদ্দেশ্য হইতেছে বিভিন্ন সূত্র নির্ণয় করা এবং সেগুলি প্রয়োগ করিয়া বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন করা ও সত্যাসত্য স্থির করা। পদার্থবিদ্যা একটি বিজ্ঞান ; কারণ, বহিঃপ্রকৃতির কতিপয় নিয়ম ইহা পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও গবেষণার সাহায্যে অনুশীলন করে। মনোবিজ্ঞান মনোজগতের নিয়মগুলির বিশদ অনুশীলন করে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অর্থনৈতিক কাজগুলির নিয়মগুলি বিচার করা অর্থবিজ্ঞানের কাজ। সেইজন্য অনেকের মতে অর্থবিজ্ঞানকেও একটি বিজ্ঞান বলা উচিত। অর্থবিজ্ঞান একটি সামাজিক বিজ্ঞান। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীগণ যে সকল বিষয় লইয়া গবেষণা করেন সেইগুলি পরিমাপ করা সম্ভব। অনেকের মতে মানুষের অর্থনৈতিক কাজগুলিরও আর্থিক মূল্য আছে এবং অর্থের মাধ্যমে সেইগুলি পরিমাপ করা সম্ভব। কিন্তু, অর্থবিজ্ঞানের সূত্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সূত্রগুলির ন্যায় সর্বদা নির্ভুল নয়। অর্থনৈতিক সূত্রগুলির ভিত্তি হইতেছে দৈনন্দিন জীবনে মানুষের আচরণের সামঞ্জস্য। কিন্তু, মানুষের আচরণের সামঞ্জস্য সব সময় বজায় থাকে না।

অর্থবিজ্ঞানের সূত্র সর্বদা নির্ভুল নয়

অর্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলি স্থির করিবার সময় আমাদের অনেক ক্ষেত্রেই অনুমান ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতে হয়। একই অবস্থায় সকল মানুষ একই আচরণ করে না। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে। প্রথমত, মানুষের সব কাজ ইচ্ছাধীন নয়। ইচ্ছা করিলেই সব ক্রেতা একই জিনিস হইতে সমান উপযোগ পাইবে না। দ্বিতীয়ত, পূর্বেই বলা হইয়াছে অর্থবিজ্ঞানের সূত্র নির্ধারণ করিবার সময় অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতে হয়। যেমন ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়ম (Law of Increasing Returns)। আমাদের কতিপয় কাজ অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তৃতীয়ত, অর্থবিজ্ঞানীর ভবিষ্যৎ বাণী সব সময়েই সত্য হয় না। তাহা ছাড়া, অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে কোন ব্যাপারে একমত হওয়া খুব কমই দেখা যায়। স্যার লয়েড জর্জ একবার বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "Whenever six economists are gathered, there are seven opinions." অর্থাৎ, ছয়জন অর্থবিজ্ঞানী একত্রিত হইলে সাতটি মতামত ব্যক্ত হয়। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি, অর্থবিজ্ঞানের সূত্র নিখুঁত নহে। কতিপয় সর্ত পূরণ হইলেই অর্থবিজ্ঞানের একটি সূত্র কার্যকরী হইতে পারে। যেমন, কোন ক্রেতা যদি একটি জিনিস ক্রমাগত কিনতে আরম্ভ করে, তখন যদি ক্রেতার আয় ও রুচি, এবং অন্যান্য জিনিসের দাম স্থির থাকে, তবে ক্রীত জিনিসগুলি হইতে তাহার প্রান্তিক উপযোগ ক্রমেই কমিতে থাকিবে। এখানে আমরা

দেখিতে পাইতেছি যে যদি "অন্যান্য জিনিস" ("other things") স্থির থাকে, তবেই এই ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগের নিয়মটি (Law of Diminishing Marginal Utility) কার্যকর হইবে।

কিন্তু অর্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলি সর্বদা নির্ভুল নয় বলিয়া অথবা অর্থবিজ্ঞানীদের ভবিষ্যৎ বাণী সর্বদা সত্য হয় না বলিয়া অর্থবিজ্ঞানকে একটি বিজ্ঞান হিসাবে গণ্য না করা ঠিক নহে। সকল বিজ্ঞানেই বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে। এমন কি প্রকৃতি বিজ্ঞানেও আমরা অনেক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মত-পার্থক্য দেখিতে পাই। বৈজ্ঞানিক এবং অর্থবিজ্ঞানীর কর্মধারা একই, প্রদত্ত বিষয়ে যুক্তির প্রয়োগ করিয়া সাধারণ সূত্র বাহির করা। সুতরাং, এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিলে অর্থবিজ্ঞানকে একটি বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে।

অর্থবিজ্ঞানের নিয়মের প্রকৃতি (Nature of the Laws of Economics) : প্রত্যেক বিজ্ঞানের কতিপয় নিয়ম থাকে, সেই প্রকার অর্থবিজ্ঞানেরও কতিপয় নিয়ম আছে। শুধু বিজ্ঞান কেন, নীতিশাস্ত্র, রাজনীতিশাস্ত্র ইত্যাদিরও কতিপয় নিয়ম আছে। নিয়ম কথাটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন বিজ্ঞানের নিয়ম আলোচনা কালে আমরা সেই বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির কার্যকারণ সম্পর্ক সম্বন্ধে বিবেচনা করি। অর্থবিজ্ঞানেও আমরা এই অর্থেই বিভিন্ন নিয়ম আলোচনা করিয়া থাকি। পদার্থবিদ্যা যেমন বলে, মাধ্যাকর্ষণের নিয়মবলে যে কোন জিনিসকে উৎক্ষিপ্ত করিলে উহা মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে নিম্নাভিমুখী হইবে, অথবা রসায়নশাস্ত্রের নিয়ম যেমন বলে যে, দুই ভাগ হাইড্রোজেনের সহিত এক ভাগ অক্সিজেন মিশাইলে জল প্রস্তুত হইবে, সেই প্রকার অর্থবিজ্ঞানের নিয়ম বলে যে দাম বাড়িলে চাহিদা কমে এবং দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে। কিন্তু এখানে একটি জিনিস বিশেষভাবে বিবেচ্য। পদার্থবিজ্ঞান অথবা রসায়নশাস্ত্রের নিয়মগুলি যেমন অকাট্য এবং অভ্রান্ত,—অর্থ-বিজ্ঞানের নিয়ম সেই প্রকার অকাট্য এবং অভ্রান্ত নয়।

প্রকৃত বিজ্ঞানের নিয়মের ন্যায় অর্থ-বিজ্ঞানের নিয়ম নিখুঁত নয়

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে কোন বিশেষ অবস্থায় কোন জিনিসের দাম কমিলে ইহার জন্য ক্রেতার চাহিদা নাও বাড়িতে পারে। অর্থবিজ্ঞানের নিয়মে এই ধরণের ব্যতিক্রম থাকে বলিয়াই অর্থবিজ্ঞানীগণ কোন বিশেষ অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক ভবিষ্যৎ বাণী করিতে পারেন না। অধ্যাপক সেলিগম্যান বলেন যে, অর্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলি অনুমান সিদ্ধ ("Economic laws are essentially hypothetical")। অর্থবিজ্ঞানে যদি "অপরাপর বিষয় অপরিবর্তিত থাকে" ("other things being equal"), তবেই দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে। কিন্তু, যদি অপরাপর বিষয় অপরিবর্তিত না থাকে, যদি ইতিমধ্যে ক্রেতার আয় ও রুচির পরিবর্তন ঘটে অথবা সংশ্লিষ্ট জিনিসটির গুণের তারতম্য ঘটে অথবা ইহার বিকল্প জিনিসগুলির (substitutes) দাম কমিয়া যায়, তবে সেই জিনিসের দাম কমিলে চাহিদা নাও বাড়িতে পারে। সেজন্যই

সেলিগম্যান বলেন যে, অর্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলি অনুমানের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু, এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, সকল বৈজ্ঞানিক নিয়মই অনুমান-সিদ্ধ। তবে অর্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলি বেশী পরিমাণে অনুমানের উপর নির্ভরশীল। বায়বীয় চাপ যদি খুব প্রবল হয় এবং ইহা যদি ঊর্ধ্বের উৎক্ষিপ্ত জিনিসকে নিম্নাভিমুখী হইতে বাধা দেয়, তবে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম কার্যকরী হইবে না। সেই প্রকার প্রয়োজনীয় চাপ ও উত্তাপ না থাকিলে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন মিশাইলেও জল পাওয়া যাইবে না। দেখা যাইতেছে, প্রাকৃতিক নিয়মগুলিও অনুমানের উপর নির্ভরশীল। তবে অর্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলি অধিক পরিমাণে অনুমানের উপর নির্ভরশীল।

সব নিয়মই অনুমান-সিদ্ধ, তবে অর্থ-বিজ্ঞানের নিয়মগুলি অধিক পরিমাণে অনুমানের উপর নির্ভরশীল

অধ্যাপক মার্শাল অর্থবিজ্ঞানের নিয়মকে মাধ্যাকর্ষণের সহিত তুলনা না করিয়া জোয়ার ভাঁটার নিয়মের সহিত তুলনা করিয়াছেন। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বলে যে, অন্য কোন কারণ না থাকিলে দুইটি বস্তু একটি নির্দিষ্ট গতিতে পরস্পরকে আকর্ষণ করিবে। এই নিয়মটি সর্বদাই সত্য। কিন্তু, অর্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলিকে এই নিয়মের সহিত তুলনা করা যায় না। জোয়ার-ভাঁটার নিয়মের সহিত অর্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলি তুলনা করা যাইতে পারে। সাধারণভাবে জোয়ার-ভাঁটা সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করা যায় বটে কিন্তু তাহা কতটা বেগে আসিবে অথবা কত ইঞ্চি জল উঠিবে তাহা সঠিক বলা যায় না; সেইজন্য জোয়ার-ভাঁটা সম্পর্কে আমাদের অনুমানের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতে হয়। অর্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলিও অনুরূপ।

আবার অর্থবিজ্ঞানের কতিপয় নিয়ম আছে যেগুলি অনুমানসিদ্ধ নয়। যেমন, টাকা খরচ করিবার এবং সঞ্চয় করিবার নিয়ম, আয় বাড়িলে ব্যয় বাড়ে এবং আয় ক্রমাগত বাড়িতে থাকিলে শেষ পর্যন্ত ব্যয় অপেক্ষা সঞ্চয় বাড়িতে থাকে। এই নিয়মটি অনুমানসিদ্ধ নয়।

অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের নির্বাচন (Economic decisions as choices): অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলিকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি; যথা, ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত (Private decisions) এবং ব্যবসায়গত সিদ্ধান্ত (Business decisions)। ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত চার প্রকার; যথা, (১) একজন ব্যক্তিকে প্রথমেই স্থির করিতে হইবে যে উপার্জনের জন্য সে কতক্ষণ কাজ করিবে এবং কতক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করিবে; (২) তাহাকে স্থির করিতে হইবে যে উপার্জিত আয়ের কতটা অংশ সে বর্তমানে খরচ করিবে এবং কতটা অংশ ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্য সে সঞ্চয় করিবে; (৩) তাহাকে স্থির করিতে হইবে যে তাহার মোট সম্পদ সে কিভাবে রাখিবে অথবা বণ্টন করিবে এবং (৪) তাহাকে স্থির করিতে হইবে যে বিভিন্ন ভোগ-সামগ্রীর উপর কিভাবে সে তাহার মোট খরচের পরিমাণ বণ্টন করিবে। উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত। একটি লোকের কাজের সময়ের উপর তাহার আয় নির্ভর করে,

আয়ের উপর খরচের পরিমাণ এবং কিভাবে বিভিন্ন সম্পদ বণ্টন করিতে হইবে তাহা নির্ভর করে। খরচের পরিমাণের উপর নির্ভর করে কোন্ জিনিস কতটা কিনিতে হইবে। কোনও জিনিস সম্পর্কে যখন কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তখনই সেই জিনিসটির নানাদিক বিবেচিত হয় এবং ইহার বর্জনীয় দিকটি বর্জন করিয়া গ্রহণীয় দিকটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ব্যবসায় সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি বিভিন্ন ফার্ম (Firms) অথবা উদ্যোক্তাগণের (Entrepreneurs) দ্বারা গৃহীত হয়। এই ধরণের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে উৎপাদন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। কোন্ জিনিস কি পরিমাণে এবং কিভাবে উৎপাদন করিতে হইবে সে বিষয়ে প্রত্যেক উদ্যোক্তা অথবা ফার্মকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে কোন্‌টিকে কি পরিমাণে ব্যবহার করিতে হইবে সেই সম্বন্ধেও উৎপাদককে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। ব্যবসায় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার সময়ে ফার্মের মূল উদ্দেশ্য থাকে সর্বাধিক লাভ অর্জন করা। এই উদ্দেশ্যে উৎপাদককে ভারসাম্য (equilibrium) অর্জন করিতে হয়। আধুনিক মূল্য-তত্ত্ব অনুযায়ী এই ভারসাম্য অর্জিত হয় তখনই যখন প্রান্তিক রেভিনিউ (Marginal Revenue) প্রান্তিক খরচের (Marginal Cost) সমান হয়। ঠিক যে পরিমাণ জিনিস উৎপাদন করিলে উৎপাদকের প্রান্তিক রেভিনিউ এবং প্রান্তিক খরচ সমান হয়, সেই পরিমাণ জিনিসই উৎপাদক উৎপাদন করিবে। কিন্তু, বর্তমানে কোন কোন ধনবিজ্ঞানী মনে করেন যে, প্রান্তিক রেভিনিউর ধারণার গুরুত্ব উৎপাদকের কাছে তত বেশী নয়। কারণ, উৎপাদকগণ চেষ্টা করে যাহাতে মোট খরচ নির্বাহ করিবার পরে মোট রেভিনিউ যেন সর্বাধিক হয়। কিন্তু ভারসাম্যের ব্যাখ্যা করিতে হইলে প্রান্তিক রেভিনিউ এবং প্রান্তিক ব্যয়ের ভারসাম্যকে অবলম্বন করিলে ধনবিজ্ঞানের বিশ্লেষণগুলি সহজ হয়।

ভারসাম্য (Equilibrium) : ভারসাম্যে আদৌ পৌছান সম্ভবপর কিনা সেই বিষয়েও বিতর্কের অবকাশ আছে। যে সকল তথ্যের ভিত্তিতে আমরা আমাদের বিশ্লেষণ চালাইয়া থাকি, সেইগুলি যদি কিছুকাল স্থির (static) থাকে তবে বিষয়টি ভারসাম্যের অবস্থায় পৌছিয়া থাকে। ভারসাম্য সাধারণতঃ অল্পস্থায়ী (temporary) হয়। কারণ, প্রতিনিয়ত অর্থনৈতিক শক্তিগুলির ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে ভারসাম্য কখনই স্থির থাকিতে পারে না। কোনও ফার্মের ক্ষেত্রে 'ভারসাম্য' কথাটির অর্থ হইতেছে এই যে চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ফার্মটি এমন এক পর্যায়ে পৌছিয়াছে যে অতিরিক্ত কোন জিনিস উৎপাদন করিলে যাহা অতিরিক্ত খরচ হয় (প্রান্তিক খরচ বা Marginal Cost) তাহা সেই অতিরিক্ত উৎপাদনটির বিক্রয়লব্ধ অর্থের (প্রান্তিক আয় বা marginal revenue) সমান। যখন ফার্মের ভারসাম্য অর্জিত হয়, তখন ফার্মটি সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনকারী উৎপাদন (Profit-maximising output) করে। এই বিন্দুতে পৌছিবার জন্য দুইটি সর্ত পুরণ হওয়া দরকার।

(১) প্রান্তিক খরচ প্রান্তিক আয়ের সমান হইবে, এবং (২) প্রান্তিক খরচ রেখা নীচের দিক হইতে আসিয়া প্রান্তিক আয় রেখাকে ছেদ করিবে যাহাতে মুনাফার পরিমাণ সর্বোচ্চ হয়। কোন শিল্পের ক্ষেত্রে ভারসাম্যের সর্ত দুইটি: (১) শিল্পটির অন্তর্ভূক্ত সব ফার্মই ভারসাম্য অবস্থায় থাকিবে, এবং (২) সব ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করিবে।

সামগ্রিক ও আংশিক ভারসাম্য (General and Partial Equilibrium): বাজারে একটি জিনিসের দাম আর একটি জিনিসের দামের উপর নির্ভর করে এবং একটি জিনিসের চাহিদা ও যোগান অপর জিনিসের চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে। অনুরূপভাবে একটি উপাদানের চাহিদা ও যোগান অপর একটি উপাদানের চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভরশীল। বাজারের পরস্পর নির্ভরশীল দাম এবং যোগান ও চাহিদার যে পরিবর্তন হয় তাহা একই সঙ্গে বিশ্লেষণ করা এবং প্রতিটি জিনিসের এমন দাম নিরূপণ করা যাহাত সকল শিল্পেই ভারসাম্য বজায় থাকে, —অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের এই পদ্ধতিটি হইতেছে সামগ্রিক ভারসাম্য বিশ্লেষণের (Theory of General Equilibrium) পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অবলম্বন করিলে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের কাজ খুব জটিল হইয়া পড়ে বলিয়া অধ্যাপক মার্শাল প্রতি শিল্প অথবা জিনিসের বাজারের ভারসাম্যের সর্ত (Partial equilibrium) আলাদা ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই ধরণের বিশ্লেষণে কোন জিনিসের চাহিদা, যোগান অথবা দাম বিশ্লেষণ করিবার সময় অন্য জিনিসের চাহিদা, যোগান অথবা দাম এবং এক কথায় অন্য সব কিছু ("other things") স্থির ধরিয়া লইতে হয়। এইজন্য অধ্যাপক মার্শাল কোন অর্থনৈতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিবার সময় "other things remain constant" এই ধারণার উপর নির্ভর করিতেন।

ব্যষ্টিগত অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সমষ্টিগত অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ (Micro-economic analysis and Macro-economic analysis): যখন অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে বিভিন্ন ইউনিটগুলিকে (ফার্ম, ক্রেতা প্রভৃতি) পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আলাদাভাবে উহাদের সম্বন্ধে এবং উহাদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্পর্কে অনুশীলন করা হয়, তখন সেই অর্থনতিক বিশ্লেষণকে আমরা ব্যষ্টিগত অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ বা Micro-economic analysis বলিতে পারি। এই পদ্ধতিতে অর্থ ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের বিশ্লেষণ করা হয়। ব্যক্তিগত চাহিদা, ফার্ম বা ক্রেতার ব্যক্তিগত আচরণ, পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন শিল্পের সংগঠন, প্রভৃতি ব্যষ্টিগত অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের অন্তর্ভুক্ত।

আবার এই ইউনিটগুলিকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ না করিয়া অর্থাৎ আলাদাভাবে কোন জিনিসের দাম অথবা কোন ফার্মের উৎপাদন লইয়া বিশ্লেষণ না করিয়া আমরা যদি সামগ্রিক আয় (aggregate income), সামগ্রিক উৎপাদন অথবা সামগ্রিক দাম লইয়া আলোচনা করি, তবে সেই বিশ্লেষণকে সমষ্টিগত অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ বা

Macro-economic analysis বলা হয়। জাতীয় আয় মোট সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, সামগ্রিক মূল্যস্তর, সামগ্রিকভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য প্রভৃতি সবই সমষ্টিগত অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের অন্তর্ভুক্ত। ব্যষ্টিগত অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের সহিত সমষ্টিগত বিশ্লেষণের ঘনিষ্ট যোগাযোগ আছে। ব্যক্তিগতভাবে উৎপাদকগণ উৎপাদনের পরিমাণ না বাড়াইলে জাতীয় উৎপাদন বাড়েনা। ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগস্পৃহা কমিয়া গেলে দেশে সামগ্রিক ভাবে মন্দা দেখা দিতে পারে। অপর দিকে দেশে মন্দা দেখা দিলে বিনিয়োগকারীর ব্যক্তিগত বিনিয়োগ প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে।

অর্থনৈতিক নীতি নিরূপণের (determination of economic policy) দিক হইতে বিচার করিলে সমষ্টি বিচারের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের উপযোগিতা আছে। জাতীয় আয় বা উৎপাদন সম্বন্ধে ধারণা না থাকিলে সামগ্রিকভাবে কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনুসরণ করা, কর স্থাপন করা এবং উৎপাদন কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। অবশ্য এই ধরণের সমষ্টি বিচারের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করার কতিপয় বাস্তব অসুবিধাও আছে। সামগ্রিক উৎপাদনের হিসাব করিবার সময় বিভিন্ন ইউনিটগুলির উৎপাদনসমূহ যোগ করার সময়ে অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

লর্ড কেইনসের বিখ্যাত বই "General Theory of Employment, Interest and Money" প্রকাশিত হইবার পর সমষ্টিগত অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের পরিধি বিশেষভাবে বিস্তৃত হয়।

অর্থনৈতিক কাঠামোর পরস্পর নির্ভরশীল কর্মধারা (Interdependent flows of activities in the economic structure) :

অর্থনৈতিক কাঠামোয় বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের মধ্যে আমরা পারস্পরিক নির্ভরশীলতা দেখিতে পাই। বাজারে চাহিদার সৃষ্টি হওয়া এবং উৎপাদন ব্যবস্থার সচলতা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর তিনটি মূল সমস্যা হইতেছে :—

(১) কি কি জিনিস উৎপাদন করিতে হইবে, (২) কেমন করিয়া উৎপাদন করিতে হইবে, এবং (৩) যাহাদের জন্য উৎপাদন করিতে হইবে।

উৎপাদক যাহা উৎপাদন করে তাহা গৃহস্থ (Household) ক্রয় করিয়া থাকে। যে সকল জিনিসের জন্য গৃহস্থের চাহিদা থাকিবে স্বভাবতঃই উৎপাদক সেই সকল জিনিস উৎপাদন করিবে। অপর দিকে গৃহস্থের হাতে উৎপাদনের উপাদানের যোগানও (Supply of the Factors of Production) থাকে। একদিকে আমরা দেখিতে পাই জিনিস পত্রের বাজার যেখানে উৎপাদকের হাতে থাকে যোগান এবং গৃহস্থের থাকে চাহিদা; অপরদিকে আমরা দেখিতে পাই উৎপাদনের উপাদানের বাজার (Factor Market) যেখানে গৃহস্থের হাতে থাকে উপাদানের যোগান। (যেমন, শ্রম, মূলধন জমি) এবং উৎপাদকের থাকে চাহিদা। উৎপাদনের উপাদানের বাজারে তিনটি মূল্য নির্ধারিত হইয়া থাকে, শ্রমের জন্য মজুরি, জমির জন্য খাজনা এবং মূলধনের জন্য সুদ। অপরদিকে

জিনিসের বাজারে চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে জিনিসের মূল্য নির্ধারিত হইয়া থাকে। যে প্রক্রিয়ায় এই দুইটি শ্রেণীর পরস্পর আবদ্ধ তাহা নিম্নের চিত্রে দেখান হইল। এই চিত্রে তীর চিহ্নগুলি বিভিন্ন দিকের নির্দেশ দিতেছে। বাহিরের তীরগুলি দেখাইতেছে যে জমি, মূলধন এবং শ্রম উৎপাদনের উপাদানের
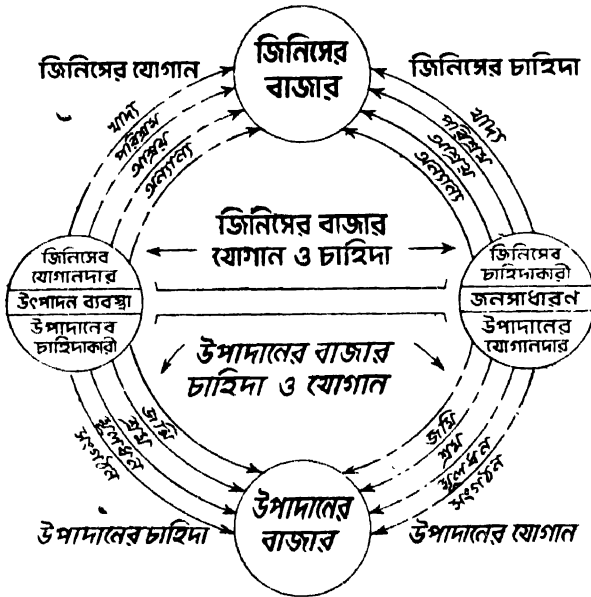
চিত্র নং ১

বাজার হইয়া শেষপর্যন্ত উৎপাদকের নিকট আসিতেছে। বিভিন্ন জিনিসপত্রেও ইহাদের বাজার হইয়া গৃহস্থের নিকট উপস্থিত হইতেছে। উৎপাদনের উপাদানের মূল্যস্বরূপ উৎপাদকগণ গৃহস্থকে মজুরি, খাজনা ও সুদ প্রদান করিতেছে। অনুরূপভাবে গৃহস্থগণও বিভিন্ন জিনিসের জন্য উৎপাদনের মূল্য প্রদান করিতেছে। বাহিরের তীরগুলি বস্তুগত স্রোত (Flow of goods) বুঝাইতেছে এবং ভিতরের তীরগুলি আর্থিক স্রোত (Financial Flows) বুঝাইতেছে।

উৎপাদকগণ যখনই কোন জিনিস উৎপাদন করে তখন তাহাদের উদ্দেশ্য থাকে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা এবং গৃহস্থগণ যখন কোন জিনিস ক্রয় করে তখন তাহাদের উদ্দেশ্য থাকে সর্বাধিক পরিতৃপ্তি লাভ করা। আবার গৃহস্থগণ যখন উৎপাদনের উপাদান বিক্রয় করিবে, তখন সর্বাধিক মূল্য বা পারিশ্রমিক পাইবার চেষ্টা করিবে এবং উৎপাদকগণ যখন সেই উপাদান ক্রয় করিবে তখন তাহাদের চাহিদা অনুযায়ী মূল্য প্রদান করিবে। কোন উপাদানের জন্য চাহিদা মূলতঃ ইহার প্রান্তিক উৎপাদনী

শক্তির উপর নির্ভরশীল এবং কোন জিনিসের জন্য চাহিদা মূলতঃ ইহার প্রান্তিক উপযোগের উপর নির্ভরশীল।

Exercise

1. "Economics is a study of human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses."—Discuss the statement. ["মানুষের অভাব এবং তাহা মোচন করার জন্য দুষ্প্রাপ্য সম্পত্তির (যেগুলির বিকল্প ব্যবহার আছে) মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষের আচরণ অনুশীলন করা অর্থশাস্ত্রের কাজ"—উক্তিটি আলোচনা কর।] (৪-৫ পৃষ্ঠা)

2. What are the types of problems to which economists attempt to find answers? (C. U. B. Com. 1957). [অর্থবিজ্ঞানীগণ কি কি সমস্যার উত্তর পাইবার চেষ্টা করেন? (৬-৬ পৃষ্ঠা, ১৫-১৬ পৃষ্ঠা)

3. Is Economics a study of the causes of material welfare? How far do the economic activities promote economic welfare? [অর্থশাস্ত্র কি বস্তুগত কল্যাণের কারণ অনুশীলন করে? অর্থ নৈতিক ক্রিয়াকলাপ কিভাবে অর্থ নৈতিক কল্যাণ বাড়াইয়া থাকে?] (৬-৮ পৃষ্ঠা

4. Discuss the relation between (a) Economics and Sociology, (e) Economics and Political Science and (e) Economics and Ethics[অর্থবিজ্ঞানের সহিত (ক) সমাজতত্ত্ব, (খ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং (গ) নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক আলোচনা কর।] (৮-৯ পৃষ্ঠা)

5. Is Economics a Science? "Economic Laws are hypothetical." Examine the statement. [অর্থশাস্ত্র কি একটি বিজ্ঞান? "অর্থ নৈতিক নিয়মগুলি অনুমানসিদ্ধ"—উক্তিটি পরীক্ষা কর। (১০-১২ পৃষ্ঠা)

6. "Economic decisions are matters of choice"—Discuss the Statement. "অর্থ নৈতিক সিদ্ধান্তগুলি নির্বাচনের বস্তু"—উক্তিটি আলোচনা কর।] (১২(১৩ পৃষ্ঠা)

7. What do you mean by 'Equilibrium'? Distinguish between General Equilibrium and Partial Equilibrium. ['ভারসাম্য' বলিতে কি বোঝ? ভারসাম্য এবং আংশিক ভারসাম্যের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।] (১২-১৪ পৃষ্ঠা)

8. Distinguish between Micro-economic analysis and Macro-economic anaiysis. ব্যষ্টিগত অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সমষ্টিগত অর্থ নৈতিক বিশ্লেষণের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।] (২৮-১৫ পৃষ্ঠা)

9. Write a note on the nature of the flow of activities in an economic structure. [অর্থ নৈতিক কাঠামোয় পরস্পর নির্ভরশীল কর্মধারার উপর একটি টীকা লিখ।] (১৫-১৬ পৃষ্ঠা)

10, Discuss the nature of economic activities. [অর্থ নৈতিক ক্রিয়াকলাপের স্বরূপ আলোচনা কর।] (১-৩ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্থবিজ্ঞানের কতিপয় মৌলিক ধারণা
(Some Fundamental Concepts of Economics)

সম্পদের সংজ্ঞা (Definition of Wealth): সাধারণ অর্থে সম্পদ বলিতে টাকাকড়ি বুঝায়। কিন্তু অর্থবিজ্ঞানে ইহার একটি বিশেষ অর্থ আছে। সম্পদ হইতেছে একটি অর্থনৈতিক দ্রব্য (economic good) অর্থনৈতিক দ্রব্য বলিতে আমরা বুঝি এমন একটি জিনিস যাহার যোগান খুব বেশী নয়, অথচ যাহার সাহায্যে আমরা আমাদের অভাব মিটাইতে পারি। এই দ্রব্যগুলি পাইবার জন্য মানুষ দাম দিতে প্রস্তুত থাকে।

সম্পদের চারিটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, ইহার উপযোগ (Utility) বা অভাব পূরণ করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। দ্বিতীয়ত, ইহার যোগান সীমিত বা অপ্রচুর (Scarce) থাকা চাই। তৃতীয়ত, ইহা হস্তান্তরযোগ্য (transferable) হওয়া চাই। চতুর্থত, ইহা একটি বাহিরের বস্তু (external good) হওয়া চাই। সম্পদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, ইহা মানুষের অভাব মিটাইতে পারে। যে জিনিসের জন্য মানুষের কোন চাহিদা নাই, তাহাকে আমরা সম্পদ বলিতে পারি না। তাহা ছাড়া, জিনিসটির সরবরাহ অপ্রচুর হওয়া চাই। নদী হইতে আমরা যে জল পাই, তাহার সরবরাহ প্রচুর; সুতরাং নদীর জলকে আমরা সম্পদ বলিব না। কিন্তু কর্পোরেশনের জলের কল হইতে আমর' যে জল পাই, তাহার সরবরাহ অপ্রচুর; সুতরাং ইহাকে আমরা সম্পদ বলিতে পারি। বাহ্য, হস্তান্তরযোগ্য এবং সীমাবদ্ধ দ্রব্যাদির যদি অভাব মিটাইবার ক্ষমতা থাকে তবেই সেইগুলিকে আমরা সম্পদ বলিতে পারি; সম্পদ অনেক সময় অবাস্তব পদার্থও হইতে পারে; কিন্তু সেইক্ষেত্রে সেইগুলিকে বাহ্য ও হস্তান্তরযোগ্য হইতে হয়। যেমন ব্যবসায়ের সুনাম, বই ছাপাইবার স্বত্ব প্রভৃতি অবাস্তব পদার্থগুলি বাহ্য হস্তান্তরযোগ্য বলিয়া সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হয়। কিন্তু নদীর জল অথবা খোলা মাঠের মুক্ত বাতাস সম্পদ নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে আমরা সম্পদ বলিতে পারি না। কারণ, ইহা বাহিরের বস্তু নয়।

ব্যক্তিগত সম্পদ ছাড়াও আমরা যৌথ সম্পদ (Collective wealth) এবং জাতীয় সম্পদ (National wealth) ইত্যাদি দেখিতে পাই। কোনও শহরের রাস্তাঘাট, পার্ক ইত্যাদির মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য। এই সকল দ্রব্যাদিকে আমরা যৌথ সম্পদ বলি। সব রকম ব্যক্তিগত এবং যৌথ সম্পদের সমষ্টিকে আমরা জাতীয় ধন বলি। সরকারী ঋণপত্র, বৈদেশিক অর্থসাহায্য ইত্যাদি জাতীয় ধনের অন্তর্গত। 'সম্পদ' এবং 'কল্যাণ' একই অর্থে ব্যবহার করা যায় না। দেশে অধিক পরিমাণে মদ তৈয়ারী হইলে সম্পদ

বাড়ে, কিন্তু ইহাতে দেশের কল্যাণ হয় না। সম্পদ হইতেছে অভাব পূরণের জন্য প্রস্তুত একটি সামগ্রী যাহা অপ্রচুর, হস্তান্তরযোগ্য, বাহ্য এবং উপযোগী। কিন্তু, কল্যাণ হইতেছে একটি মানসিক অবস্থা; ব্যক্তিভেদে, দেশভেদে, কালভেদে এবং সমাজভেদে 'কল্যাণ' সম্পর্কে মানুষের ধারণার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। সুতরাং সম্পদ বাড়িলেই যে কল্যাণ বাড়িবে সেই বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নাই। তবে সম্পদ বাড়িলে বস্তুগত কল্যাণ (material welfare) অনেক ক্ষেত্রেই বাড়ে।

দ্রব্য (Goods): যে সব সামগ্রীর সাহায্যে মানুষ তাহার অভাব মিটাইতে পারে এবং মানুষের নিকট যেগুলির উপযোগ আছে, সেইগুলিই অর্থশাস্ত্রে দ্রব্য (Goods) বলিয়া অভিহিত হয়। উপযোগ (Utility) বলিতে আমরা বুঝি যে কোন জিনিসের অভাব মিটাইবার ক্ষমতা। বিভিন্ন দ্রব্য বাস্তব অথবা অবাস্তব পদার্থ হইতে পারে। যেমন, শ্রমিকের সেবা (Service of labour) একটি বাস্তব পদার্থ (material goods) না হইলেও অর্থশাস্ত্রে দ্রব্য বলিয়া অভিহিত হয়। কতিপয় দ্রব্য আছে যেগুলি আমরাপ্রকৃতির নিকট হইতে পাইয়া থাকি; সেইগুলিকে আমরা মূল্যহীন দ্রব্য (Free gaods) বলিয়া থাকি। মূল্যহীন দ্রব্যগুলির সরবরাহ এত বেশী যে, ব্যবহার করার পরেও সেইগুলির অতিরিক্ত যোগান থাকে। কিন্তু আবার কতিপয় দ্রব্য আছে

অর্থনৈতিক দ্রব্য

যেগুলির যোগান খুব বেশী নয়, অথচ সেগুলির সাহায্যে আমরা আমাদের অভাব মিটাইতে পারি। এই সামগ্রীগুলির যোগান সীমিত বলিয়া এইগুলিকে অর্থনৈতিক দ্রব্য বা মূল্যবান দ্রব্য (economic goods) বলা হয়। এই দ্রব্যগুলি পাইবার জন্য লোকে দাম দিতে প্রস্তুত থাকে। খাদ্য, কাপড় ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ভোগসামগ্রীগুলি সবই মূল্যবান দ্রব্য। আবার নদীর জল একটি মূল্যহীন দ্রব্য। অথচ শহরে আমরা কল হইতে যে জল পাই তাহা মূল্যবান দ্রব্য; কারণ, এই জলের যোগান সীমাবদ্ধ এবং এই জলের জন্য আমাদের কিছু দাম দিতে হয়। যখন কোন দ্রব্য শুধু ভোগের জন্য ব্যবহার করা হয়, তখন ইহাকে ভোগ্য দ্রব্য বা ভোগ-সামগ্রী (consumption good) বলা হয়; আবার যখন কোন দ্রব্যকে অন্য কোন দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়, তখন ইহাকে মূলধন-সামগ্রী (capital good) বলা হয়।

ভোগ (Consumption): অভাব মিটাইবার জন্য যখন মানুষ কোন দ্রব্য ব্যবহার করে অথবা ইহা ক্রয় করে, তখন সেই কাজকে আমরা ভোগ বলি। অভাব দূর করিবার উপায় হইতেছে ভোগ। ক্রেতাগণ স্থির করে, অভাব পূরণের জন্য তাহাদের কোন্ জিনিস কত পরিমাণে ক্রয় করা উচিত।

মানুষ তিন প্রকার দ্রব্য ভোগ করে। যথা, একান্ত আবশ্যক দ্রব্যাদি (necessaries), স্বাচ্ছন্দ্য দ্রব্যাদি (comforts) এবং বিলাস দ্রব্যাদি (luxuries)। একান্ত আবশ্যক দ্রব্যাদির মধ্যে কতিপয় দ্রব্য জীবন ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। আবার কতিপয় দ্রব্য কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়ক। কতিপয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য আছে

যেগুলি অভ্যাসবশত মানুষের একান্ত আবশ্যক দ্রব্যাদি হিসাবে বিবেচিত হয়; যেমন—তামাক, চা, পান ইত্যাদির অভ্যাস; অবার কতিপয় সামগ্রী আছে যেগুলি কোন কোন ক্রেতার নিকট বিলাস সামগ্রী, আবার কাহারও নিকট প্রয়োজনীয় অথবা স্বাচ্ছন্দ্য দ্রব্য; যেমন—বৈদ্যুতিক পাখা। বিলাস সামগ্রী মাত্রেই যে নিন্দনীয়, তাহা নহে। অর্থশাস্ত্রের দিক হইতে চিন্তা করিলে বিভিন্ন বিলাস সামগ্রীর উৎপাদন পরোক্ষভাবে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করে।

অভাবের বৈশিষ্ট্য (Features of Wants):

কোন কিছু পাইবার জন্য যখন আমাদের চাহিদা অথবা আকাংখা থাকে, তখন ইহাকে অভাব বলা যায়। অভাবের প্রধানত চারিটি বৈশিষ্ট্য আছে।

প্রথমত, মানুষের অভাবের কোন সীমা নাই। একটি বিশেষ অভাব পূরণ হইলেই আমাদের আর একটি নূতন অভাবের সৃষ্টি হয়। কোন মানুষই বলিতে পারে না যে তাহার সব অভাবই দূর হইয়াছে।

দ্বিতীয়ত, যদিও মানুষের অভাব সীমাহীন তবুও একটি বিশেষ অভাবের সীমা আছে। একটি জিনিস মানুষ যতই পাইতে থাকে, জিনিসটির অভাব ততই কমিতে থাকে। যেমন, কোন পানীয় জিনিস গ্রহণ করিবার পরিতৃপ্তি।

তৃতীয়ত, অনেক সময় মানুষের বিভিন্ন অভাবগুলি পরস্পরের প্রতিযোগী (competitive) হয়। আমি চা পান করিব অথবা কফি পান করিব,—এই বিষয়ে প্রশ্ন উঠিলে আমরা দেখিতে পাই যে মানুষের সব অভাবই পরস্পরের প্রতিযোগী। তাহা ছাড়া, অনেক সময় দেখা যায়, অনেকগুলি অভাবের মধ্যে কোন্‌টি আগে পুরণ করিতে হইবে তাহা লইয়া সমস্যার সৃষ্টি হয়। তখন মানুষকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ অভাবটি আগে দূর করিতে হয়।

চতুর্থত, অনেক সময় মানুষের বিভিন্ন অভাবগুলি পরস্পরের পরিপূরক (complementary) হয়; যেমন, কলম থাকিলে কালির প্রয়োজন; অথবা মোটরগাড়ী থাকিলে পেট্রোলের প্রয়োজন। একটি অভাব পুরণ করিতে হইলে অপর একটি অভাবও পূরণ করিতে হয়।

উপযোগ (Utility): উপযোগ বলিতে আমরা বুঝি, কোন জিনিসের অভাব মিটাইবার ক্ষমতা। কোন জিনিস কিনিবার পর নিছক ভোগের পরিতৃপ্তিকে উপযোগ বলে না। কোন জিনিস অভাব পুরণ করে বলিয়া যদি ইহার জন্য আমাদের চাহিদা থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, জিনিসটির উপযোগ আছে। উপযোগ জিনিসটিকে কখনই সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না। কারণ ইহা একটি মানসিক ব্যাপার। তবে কোন্‌ জিনিসের উপযোগ বেশী তাহা ঐ জিনিসের জন্য আমরা কত বেশী টাকা খরচ করিতে পারি, তাহার দ্বারা বুঝিতে পারি।

মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ (Total Utility and Marginal Utility): যখন ক্রেতা কোন জিনিসের কতিপয় ইউনিট বা মাত্রা ক্রয় করে, তখন

সবগুলি ইউনিট হইতে সে যত উপযোগ পায়, সেইগুলির যোগফলকেই মোট উপযোগ বলা হয়। কিন্তু, কতিপয় ইউনিট কিনিয়া ফেলিবার পর ক্রেতা যদি আরও একটি অতিরিক্ত ইউনিট ক্রয় করে, তবে সেই অতিরিক্ত ইউনিট হইতে যে অতিরিক্ত উপযোগ পাওয়া যায় তাহাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে। ধরা যাক্ একজন লোক ১০টি কমলালেবু কিনিয়াছে। ইহার পর সে যদি আরও একটি কমলালেবু ক্রয় করে, তবে একাদশ কমলালেবু হইতে সে যতটা অতিরিক্ত উপযোগ লাভ করিবে, তাহাই প্রান্তিক উপযোগ।

উৎপাদনমূলক এবং অনুৎপাদনমূলক শ্রমশক্তি (Productive and Unproductive Labour): অষ্টাদশ শতাব্দীর 'ফিজিয়োক্র্যাট (Physiocrat) অর্থনীতিবিদগণের মতে শ্রমশক্তি উৎপাদনমূলক এবং অনুৎপাদনমূলক এই দুই প্রকার ছিল। অর্থশাস্ত্রের জনক এড্যাম স্মিথের মতে শ্রমশক্তিকে উৎপাদনের ভিত্তিতে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যে শ্রমের সাহায্যে কোন বাস্তব পদার্থ (material good) উৎপাদন করা সম্ভবপর, তাহাই উৎপাদনমূলক শ্রম (productive labour) এবং যে শ্রমের সাহায্যে কতিপয় অবাস্তব পদার্থ অথবা সেবা (immaterial goods or services) উৎপাদন করা সম্ভবপর, তাহাই অনুৎপাদনমূলক শ্রম (unproductive labour)। এ্যাডম স্মিথের মতে চিকিৎসক, আইন ব্যবসায়ী, শিক্ষক, সংগীতজ্ঞ এবং গৃহকর্মে নিযুক্ত ভৃত্য, তাহাদের সব পরিশ্রমই অনুৎপাদনমূলক। কারণ, তাহাদের কাজের সাহায্যে কোন বাস্তব পদার্থের উৎপাদন হয় না। এই ধরণের শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞানসম্মত নহে। যে শ্রমিক গৃহস্থালীর জিনিসপত্র প্রস্তুত করে, তাহার শ্রমকে উৎপাদনমূলক বলা হইবে। গৃহস্থালীর জিনিসপত্র রন্ধন কাজের জন্য শ্রম একান্ত আবশ্যক, অথচ যে শ্রমিক রন্ধন কাজ করে তাহার শ্রমকে এড্যাম স্মিথ অনুৎপাদনমূলক শ্রম হিসাবে গণ্য করিতেন। তবে গৃহস্থালীর জিনিসপত্রগুলি প্রস্তুত করিবার সার্থকতা কোথায়? সুতরাং এ্যাডম স্মিথের যুক্তিকে আমরা বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

আধুনিক অর্থশাস্ত্রবিদগণ শ্রমশক্তির এই বিভাগ সমর্থন করেন না। তাঁহাদের মতে শ্রমিকের চেষ্টায় যদি কোন বস্তুর উপযোগিতা বাড়ে, তবেই সেই শ্রম উৎপাদনমূলক। হউক যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রমিক কোন জিনিস উৎপাদন করে যাহা, বাস্তব অথবা অবাস্তব যাহাই না কেন, মানুষের অভাব মিটায় ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার শ্রমকে আমরা উৎপাদনমূলক শ্রম (productive labour) বলিতে পারি। সব রকম পরিশ্রমেই উদ্দেশ্য হইতেছে কোন অভাব পূরণ করা, সুতরাং সব রকম শ্রমই উৎপাদনমূলক। প্রকৃত প্রশ্ন ইহা নহে যে কোন্ শ্রম উৎপাদনমূলক এবং কোন্ শ্রম অনুৎপাদনমূলক। প্রকৃত প্রশ্ন হইতেছে, কোন্ শ্রম বেশী উৎপাদনমূলক এবং কোন্ শ্রম কম উৎপাদনমূলক।

আধুনিক লেখকদের মতে, উপযোগ সৃষ্টি করিতে পারে যে শ্রম, সেই শ্রম

উৎপাদনশীল। আমরা যাহা সৃষ্টি করিব, তাহা যদি কাহারও কাজে লাগে, তবেই সেই শ্রম উৎপাদনশীল।

ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্য (Value-in-use and Value-in-exchange) : কোন জিনিস ব্যবহার করিয়া আমরা যে উপযোগ পাই, তাহাকে ব্যবহার-মূল্য বলে। কিন্তু এই উপযোগ লাভের জন্য জিনিসটির বিনিময়ে আমাদের যে মূল্য প্রদান করিতে হয়, তাহাকে বিনিময়-মূল্য বলা হয়। চাহিদার তুলনায় কোন জিনিসের যোগান সীমাবদ্ধ থাকিলে ইহার বিনিময়-মূল্য বেশী হয়। সুতরাং বিনিময়-মূল্যের জন্য জিনিসটির উপযোগই যথেষ্ট নহে, ইহার যোগান অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ হওয়া চাই। সুতরাং কোন জিনিসের বিনিময় মূল্যই প্রকৃতপক্ষে ইহার দাম (price)। ইহা খুবই আশ্চর্যজনক যে মানুষ যেখানে জল এবং বায়ু ছাড়া বাঁচিতে পারে না, সেখানে নদীর জলের এবং খোলা বায়ুর কোন দাম নাই ; অথচ যেখানে সোনার অলংকার না হইলেও মানুষের পক্ষে বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর সেখানে সোনার দাম খুবই বেশী। ব্যবহার-মূল্য এবং বিনিময়-মূল্যের এই পার্থক্যকে এড্যাম স্মিথ অসম্ভব অথচ বাস্তব সত্য (paradox) বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন জিনিসের প্রান্তিক উপযোগ নিরূপণ করিলেই এই ঘটনাটির সঠিক বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর। যে জিনিসের ব্যবহার খুব বেশী অথচ যোগান অল্প স্বভাবতঃই সেই জিনিসের জন্য ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগ বেশী থাকে। সুতরাং সেই জিনিসের বিনিময়-মূল্য বেশী। আবার যে জিনিস যখন খুশী তখনই যে কোন পরিমাণে পাওয়া যায়, স্বভাবতঃই সেই জিনিসের জন্য ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগ কম থাকে। সুতরাং সেই জিনিসের ব্যবহার-মূল্য বেশী হইলেও বিনিময়-মূল্য অল্প।

Exercise

1. Discuss the characteristics of Wealth.
[সম্পদের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।] (১৮-১৯ পৃষ্ঠা)

2. Write notes on :
(a) Free goods. (b) Economic goods, (c) Consumption, (d) Wants, (e) Utility, (f) Total utility and Marginal utility.
টীকা লিখ :
[(ক) মূল্যহীন দ্রব্য, (খ) অর্থ নৈতিক দ্রব্য, (গ) ভোগ, (ঘ) অভাব, (ঙ) উপযোগ, (চ) মোট উপযোগ এবং প্রান্তিক উপযোগ।] (১৮-২১ পৃষ্ঠা)

3. Distinguish between (a) Productive Labour and Unproductive Labour, (b) Value-in-use and Value-in-exechange.
[(ক) উৎপাদনমূলক ও অনুৎপাদনমূলক শ্রম এবং (খ) ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্যের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।] (২১-২২ পৃষ্ঠা)

তৃতীয় অধ্যায়

জাতীয় আয়
(National Income)

জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা (Definition of National Income) : দেশের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে কোন না কোন জিনিস বা সেবা স্রোতের (flow of goods of services) সৃষ্টি হয়। কোন ব্যক্তি কর্তৃক সৃষ্ট এই জিনিস অথবা সেবাস্রোত হইতেছে ব্যক্তির আয়। সমাজের সকল ব্যক্তির অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা হইতে যে সকল জিনিস বা সেবাস্রোতের সৃষ্টি হয় সেইগুলিকে আমরা স্থূল জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product) বলিয়া থাকি। এই আয় হইতেছে ব্যয়ের উৎস। মানুষের জীবনযাত্রা এই আয়ের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তি সম্বন্ধে যাহা খাটে, সামগ্রিকভাবে সমস্ত জাতি সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। সেইজন্য অর্থবিজ্ঞানীগণ কোন দেশের বা সমাজের অর্থনৈতিক নীতি নিরূপণ করিবার জন্য প্রথমেই জাতীয় আয় নিরূপণ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। দেশের উৎপাদন স্তরের হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আয়েরও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

অর্থবিজ্ঞানে যে কোন সেবামূলক কাজের (service) মূল্য হিসাবে যে অর্থ প্রদান করা হয়, তাহাকেই আয় বলা হয়। "আয়ের" সৃষ্টির জন্য তিনটি সর্ত পুরণ হওয়া দরকার : (১) সেবামূলক কাজটির জন্য চাহিদা থাকা প্রয়োজন, (২) এই সেবামূলক কাজের জন্য একটি বাজার থাকা প্রয়োজন, এবং (৩) একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এই সেবামূলক কাজের চাহিদা বজায় থাকা প্রয়োজন। দেশের ভিতর যত প্রকারের সেবাস্রোতের সৃষ্টি হইতেছে, ততপ্রকারের আয়েরও সৃষ্টি হইতেছে। সেই সেবাস্রোতের পরিণতি হইতেছে আয়ের সৃষ্টি অথবা উৎপাদন।

মার্শাল প্রদত্ত সংজ্ঞা

প্রতি বৎসর আমাদের বহু প্রয়োজনীয় জিনিস (যেমন, খাদ্যশস্য ও অন্যান্য শস্য, লৌহ, ইস্পাত, কয়লা, কাপড়, জামা, জুতা) দেশে উৎপাদিত হয়। সহজভাবে বলিতে গেলে সেইগুলির সমষ্টিই আমাদের স্থূল জাতীয় আয় (gross national income)। অধ্যাপক মার্শালের সংজ্ঞা অনুযায়ী দেশের শ্রম ও মূলধন প্রকৃতি প্রদত্ত সমুদয় সম্পদগুলির সাহায্যে এক বৎসরে নীট বস্তুগত এবং সেবাস্রোত যাহা সৃষ্টি করে তাহাই জাতীয় আয়।[১] মার্শাল জাতীয়

("The labour and capital of a country acting on its natural resources produce annually a certain net aggregate of commodities, material and immaterial, including services of all kinds. This is the true net annual income, or revenue of the country or the national dividend"—Marshall).

আয়ের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে যত প্রকারের জিনিসপত্র এবং নানা ধরনের কাজ বা সেবাস্রোতের সৃষ্টি হয় তাহাদের মূল্য যোগ করিলে স্থূল জাতীয় উৎপাদনের (Gross National ProductG.) পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। এই স্থূল জাতীয় উৎপাদন করিবার সময় আমাদের কয়েকটি জিনিস মনে রাখিতে হইবে। প্রথমত, একটি জিনিস যাহাতে দুইবার গণনা (double counting) করা না হয়, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যেমন একটি বই ছাপাইতে পাঁচ টাকা লাগিয়াছে এবং তাহা হিসাবে ধরা হইল। বইটির মলাটটি তৈয়ারী করিতে আট আনার রং লাগিয়াছে। এই রং-এর দাম আবার আলাদা করিয়া হিসাবে ধরিলে ভুল হইবে। কারণ, বইয়ের মলাটে যে রং লাগিয়াছে তাহার পরিমাণ বইয়ের দামের মধ্যেই ধরা হইয়াছে। বইয়ের দাম এবং রং-এর দাম আলাদাভাবে যোগ করিলে একই জিনিস (অর্থাৎ রং-এর দাম) দুইবার গণনা করা হইবে। দ্বিতীয়ত, আবার কোন জিনিস জাতীয় উৎপাদনের হিসাবে ধরিতে হইলে জিনিসটিকে একটি সম্পূর্ণ জিনিস (final product) হইতে হইবে। অসম্পূর্ণ জিনিসগুলি, যেমন জুতা তৈয়ারীর কাঁচা চামড়া, মোটর গাড়ীর লোহা ও ইস্পাত, ইত্যাদি জাতীয় উৎপাদনের হিসাবে আসিবে না। তৃতীয়ত, উৎপন্ন জিনিসগুলি যদি বিক্রয় হইয়া যায় তবে ইহাদের বাজার মূল্য জাতীয় আয়ের হিসাবে ধরিতে হইবে। আর যদি জিনিসগুলি বিক্রয় না হইয়া থাকে তবে ইহাদের উৎপাদন ব্যয় ধরিতে হইবে।

স্থূল জাতীয় উৎপাদন (G. N. P.)

স্থূল জাতীয় উৎপাদন (G.N.P.) হইতে জিনিসপত্রের ক্ষয়ক্ষতি (depreciation) বাবদ ধার্য করা অর্থ বাদ দিলে আমরা নীট জাতীয় উৎপাদন (Net National Product.) বাহির করিতে পারি। সব জিনিসেরই ব্যবহার-জনিত ক্ষয় ক্ষতি থাকে। প্রত্যেক শিল্পেই উৎপাদিত বিভিন্ন জিনিসের ক্ষয়-ক্ষতির জন্য উৎপাদন খরচের মধ্যে কিছু টাকা ধরিয়া লওয়া হয়। মোট জাতীয় উৎপাদন হইতে এই টাকা বাদ দিলে নীট জাতীয় উৎপাদন নিরূপণ করা সম্ভবপর হয়। নীট জাতীয় উৎপাদন হইতে পরোক্ষ কর (Indirect taxation) বাদ দিলে জাতীয় আয় নিরূপিত হয়।

নীট জাতীয় উৎপাদন (N. N. P.)

এই নীট জাতীয় আয় উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বণ্টিত হয়। যেমন জমির জন্য জমির মালিক খাজনা পায়, শ্রমের জন্য শ্রমিক মজুরি পায়, মূলধনের জন্য মূলধনের মালিক সুদ পায় এবং সংগঠনের জন্য উদ্যোক্তা মুনাফা পায়।

জাতীয় আয়

অধ্যাপক পিগু (Prof. Pigou) সাধারণ মানদণ্ড হিসাবে অর্থের মাধ্যমে (measuring rod of money) জাতীয় আয়ের হিসাব করিয়াছেন। অধ্যাপক হিক্‌সও (Prof. Hicks) অনুরূপভাবে অর্থের মাধ্যমে জাতীয় আয়ের পরিমাপ

করিবার কথা বলিয়াছেন। অধ্যাপক পিগুর মতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে (এক বৎসর) দেশে উৎপাদিত সমুদয় জিনিস ও সেবাস্রোতের আর্থিক মূল্য হিসাব করিয়া ইহা যোগ করিলেই মোট জাতীয় আয় (Gross National Income) পাওয়া যায়। ইহা হইতে মূলধনের ক্ষয়-ক্ষতি বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ বাদ দিলে নীট জাতীয় আয় (Net National Income) পাওয়া যায়। জাতীয় আয় নির্ধারণকালে রপ্তানির ফলে বিদেশ হইতে প্রাপ্ত যে আয় হয় তাহা যোগ করিতে হইবে এবং বিদেশীগণ আমাদের দেশ হইতে যাহা আয় করে, তাহা বাদ দিতে হইবে।

অধ্যাপক পিগুর অভিমত

অর্থের মাধ্যমে জাতীয় আয় নিরূপণ করার কতিপয় অসুবিধা আছে। প্রথমত, এমন অনেক জিনিস আছে যেগুলি বিক্রয় করা হয় না, সরাসরি উৎপাদকের ভোগের কাজে লাগে। সেক্ষেত্রে কোন জিনিসের আর্থিক মূল্য নির্ধারণ করা অসুবিধা। দ্বিতীয়ত, অর্থের নিজস্ব মূল্য অনেক সময়েই স্থির থাকে না।

অর্থের মাধ্যমে জাতীয় আয়ের হিসাব করিবার অসুবিধা দূর করিবার জন্য দেশে উৎপাদিত সমুদয় জিনিসের ও সেবাস্রোতের মূল্য স্থির করিতে হইবে, এবং যদি অর্থের মূল্যের পরিবর্তন হয়, তবে তাহা পরিমাপ করিয়া জাতীয় আয়ের হিসাব করিতে হইবে।

জাতীয় আয়ের পরিমাপ (Measurement of National Income): জাতীয় আয় পরিমাপের সাধারণতঃ তিনটি পদ্ধতি আছে—যথা, আয় গণনা পদ্ধতি (Census of Income Method or Income-Received Method), উৎপাদন গণনা পদ্ধতি (Census of Production method) এবং ভোগ-সঞ্চয় গণনা পদ্ধতি (Census of Consumption-Saving method)।

আয়-গণনা পদ্ধতি অনুযায়ী দেশের সরকারী ও বেসরকারী সমুদয় কার্যরত ব্যক্তিদের সমগ্র আয়ের পরিমাণ, উৎপাদনে নিযুক্ত জমির নীট খাজনা, শ্রমের নীট মজুরী ও মাহিনা, মূলধনের নীট সুদ এবং সমুদয় উদ্যোক্তা ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নীট লাভ ইত্যাদির সমষ্টি সংগ্রহ করিয়া জাতীয় আয় নিরূপিত হয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী জাতীয় আয় পরিমাপ করিলে দেখিতে হইবে অর্থের বিনিময়ে উৎপাদন অথবা আয় বাড়িতেছে কি না। শুধু অর্থের বিনিময়ে হস্তান্তরিত হইয়া (Transfer Payments) কোন জিনিসের মালিকানার পরিবর্তন হইলে অথবা অনায়াসলভ্য কোন জিনিস লাভ করিলে (উৎপাদন বৃদ্ধি না হওয়া সত্ত্বেও) জাতীয় আয়ের পরিমাণ বাড়ে না। কোন ব্যক্তি যদি তাহার সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া অর্থ পায়, অথবা কোনও আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে সাহায্য বাবদ কোন অর্থ পায়, তবে তাহা জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে না। আবার, যদি কোনও উৎপাদক তাহার নিজস্ব মূলধন অথবা শ্রম (যাহার জন্য সে অর্থমূল্য

আয়-গণনা পদ্ধতি বৈশিষ্ট্য

প্রদান করে না) অন্য কোন উপাদান উৎপাদন করিবার জন্য প্রয়োগ করে, তবে সেই সকল উপাদানের আয় জাতীয় আয়ের হিসাবের মধ্যে ধরা হইবে। যে সকল জিনিস বা সেবা বিনামূল্যে পাওয়া যায়, যেমন বাড়ীতে মায়ের সেবা, সেইগুলি কোন অর্থমূল্য সৃষ্টি করে না বলিয়া জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না। কিন্তু একই সেবা যদি কোন গৃহ-পরিচারিকা প্রদান করে এবং তাহার জন্য যদি সে বেতন পায়, তবে তাহার সেই আয় জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে। উৎপাদক যদি উৎপাদিত সামগ্রী নিজেই ভোগ করে অথবা অন্য কোন জিনিসের সহিত বিনিময় করে তবে ইহাকেও আয় গণ্য করিয়া (সেই সামগ্রীর মূল্য নির্ধারণ করিয়া) জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জাতীয় আয় যদি আয়ের উৎস হইতে পরিমাপ করা হয় তবে আয়কর হিসাবে রাষ্ট্র যাহা গ্রহণ করে তাহা জাতীয় আয়ের হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হয়। সমুদয় পরোক্ষ করও জাতীয় আয়ের হিসাব হইতে বাদ দিতে হয়। নীট জাতীয় উৎপাদন (N.N.P.) হইতে পরোক্ষ কর বাদ দিলে যাহা থাকে তাহা হইতেছে উৎপাদনের ব্যয়ের ভিত্তিতে জাতীয় আয় (National Income at factor cost)। উৎপাদন গণনা পদ্ধতি অনুযায়ী দেশের মোট উৎপাদন পরিমাণের মূল্য যোগ করিয়া অথবা যে সকল দ্রব্য অর্থ দ্বারা বিনিময় করা হয় তাহাদের মূল্য যোগ করিয়া জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা হয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী জাতীয় উৎপাদনের মূল্য নির্ধারণ করিবার সময় কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হয়। প্রথমত, কোন জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করিবার সময় ইহা যেন একাধিকবার গণনা করা (double counting) না হয়। দ্বিতীয়ত, বিদেশ হইতে প্রাপ্ত কোন প্রকার আয় জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং বিদেশের ঋণ পরিশোধ বাদ দিতে হইবে। তৃতীয়ত, যন্ত্রপাতির এবং বিভিন্ন মূলধন সামগ্রীর ক্ষয়-ক্ষতি (Depreciation) বাবদ বরাদ্দ অর্থ জাতীয় আয় লইতে বাদ দিতে হইবে। চতুর্থত, জাতীয় আয়ের হিসাব করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে যে কেবলমাত্র সর্বশেষ স্তরের উৎপাদিত জিনিসগুলির (final goods) মূল্যই যোগ করিতে হইবে। সর্বশেষে, রাষ্ট্র যে সকল সেবামূলক কাজ (relief services) বিনামূল্যে জনসাধারণকে প্রদান করিয়া থাকে, সেইগুলি জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে কিনা, সেই বিষয়ে অর্থবিজ্ঞানীগণ একমত নহেন। তবে এই সকল সেবামূলক কাজের ব্যয়ভার রাষ্ট্রকেই বহন করিতে হয়। সুতরাং, সেই ব্যয়ের মূল্য হিসাব করিয়া জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

উৎপাদন-গণনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

দুইবার গণনা পরিহার এবং ক্ষয়-ক্ষতি বাবদ বরাদ্দ

ভোগ ও সঞ্চয় গণনা পদ্ধতির হিসাব অনুযায়ী দেশের সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ভোগ ও সঞ্চয় যোগ করিয়া জাতীয় আয়ের হিসাব করা হয়। সমাজের মোট আয় মোট ব্যয়ের সমান। জনসাধারণ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আয়ের সম্পূর্ণ অথবা কিছু অংশ ভোগসামগ্রী কিনিবার জন্য খরচ করে এবং অবশিষ্ট অংশ সঞ্চয় করে। যাহা

সঞ্চয় করা হয়, তাহাই ভবিষ্যতে বিনিয়োগের কাজে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং এই পদ্ধতি অনুযায়ী সমাজের মোট ভোগ ও সঞ্চয় অথবা বিনিয়োগ ব্যয় মোট জাতীয় আয়ের সমান। কিন্তু এই পদ্ধতির প্রয়োগ খুবই অল্প দেখা যায়।

ভোগ ও সঞ্চয় গণনা পদ্ধতি

সামাজিক হিসাব-নিকাশ (Social Accounting): আধুনিককালে জাতীয় আয়ের হিসাবের উপর ভিত্তি করিয়া সামাজিক হিসাব-নিকাশ নির্ণয় করিবার চেষ্টা বিভিন্ন দেশে চলিতেছে। যৌথ কোম্পানী যেমন উদ্বৃত্ত হিসাবের তালিকা (Balance Sheet) বা লাভ ক্ষতির হিসাব (Profit and Loss Accounts) তৈয়ারী করে, সেই প্রকার জাতীয় আয়েরও হিসাব প্রস্তুত করা হয়। এই সামাজিক হিসাব-নিকাশ নানাভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। প্রথমত, সমাজের সকল শ্রেণীর ব্যক্তির আয়ের (মজুরি, সুদ, খাজনা ও মুনাফা সমেত) একটি হিসাব-তালিকা প্রস্তুত করা হয় এবং তাহাদের ব্যয় ও সঞ্চয়ের আর একটি হিসাব-তালিকা তৈয়ারী করা হয়। ইহার পর এই দুইটি হিসাব মিলাইয়া দেখা হয়। এই দুইটি হিসাবের মধ্যে মিল থাকা উচিত। কারণ লোকের আয় সর্বদাই লোকের ব্যয় ও সঞ্চয়ের সমান হয়। অনুরূপভাবে সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব তৈয়ারী করা হয়। অনেক সময় বৈদেশিক লেনদেনের হিসাব এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হিসাব করা হয়। আবার আর একটি হিসাব করিয়া দেখা যাইতে পারে যে দেশের মোট ব্যক্তিগত সঞ্চয় (Private Saving) এবং যৌথ কোম্পানীগুলির সঞ্চয় (Corporate Saving) ও বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের অথবা সরকারের সঞ্চয়ের (Public Savings) পরিমাণ এবং দেশের বিভিন্ন ধরণের বিনিয়োগ ও সম্পত্তি বৃদ্ধির পরিমাণ সমান হইতেছে কিনা। যদি ইহা সমান না হয় তবে আবার নূতন করিয়া হিসাব করিতে হইবে। কারণ, মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ মোট বিনিয়োগের সমান হইবে। অনগ্রসর দেশগুলিতে সঠিক সামাজিক হিসাব-নিকাশ করা এখনও সম্ভবপর নহে। কারণ, বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহের সুবিধা এই দেশগুলিতে খুব কম। সামাজিক হিসাব-নিকাশের তালিকার সাহায্যে আমরা দেশের অর্থনৈতিক জীবনের বিশেষ বিশেষ পরিবর্তনগুলির একটি স্পষ্ট ধারণা পাইয়া থাকি।

জাতীয় আয় পরিমাপের অসুবিধা (Difficulties in the Measurement of National Income): জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার পথে কতকগুলি বিশেষ অসুবিধা আছে। প্রথম অসুবিধা হইতেছে পরিসংখ্যানের (statistics) স্বল্পতা এবং তাহার উপর নির্ভর করার অসুবিধা। দেশের মধ্যে মোট কত শস্য উৎপন্ন হয় এবং বিভিন্ন প্রকারের শিল্পসামগ্রী কি পরিমাণে উৎপন্ন হয়, এই সম্বন্ধে সঠিক তথ্য খুব কমই আছে। অনগ্রসর দেশগুলিতে এই সমস্যা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। দ্বিতীয়ত, জনসাধারণের মধ্যে যদি নিরক্ষরের সংখ্যা বেশী থাকে এবং আয়কর দিতে হয় না এমন লোকের সংখ্যা বেশী থাকে তবে জাতীয় আয়ের সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। তৃতীয়ত,

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যদি কৃষিজাত এবং শিল্পজাত উৎপাদন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে পরিচালিত হয় এবং সেইগুলি সংঘবদ্ধ ভাবে না হয়, তবে জাতীয় আয় পরিমাপ করা খুব কষ্টসাধ্য হয়। চতুর্থত, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ছোট ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইহাদের আয়-ব্যয় অথবা লাভ-ক্ষতির হিসাব রাখে না। ইহাতে জাতীয় আয় পরিমাপ করা অসুবিধাজনক হয়। পঞ্চমত, যদি উৎপাদন ব্যবস্থা পারিবারিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে এবং যদি উৎপাদিত জিনিসগুলির অধিকাংশ প্রস্তুতকারীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয় কিংবা জিনিসে জিনিসে বিনিময় (barter) হয়, তবে ঐ জিনিসগুলির মূল্য অর্থের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় না বলিয়া জাতীয় আয়ের হিসাব করা আরও কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। ষষ্ঠত, অনেক সময় দেখা যায়, একই ব্যক্তি একাধিক উৎস হইতে আয় অর্জন করিয়া থাকে। জাতীয় আয়ের হিসাব তৈয়ারী করিবার সময় কোন্ ক্ষেত্র হইতে কি পরিমাণ আয় অর্জিত হইতেছে তাহার সঠিক হিসাব করা কঠিন হইয়া পড়ে। সপ্তমত, কোন জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করিবার সময় দুইবার গণনা করিয়া ফেলার (double counting) সম্ভাবনাও জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার পক্ষে একটি প্রধান সমস্যা। অষ্টমত, যন্ত্রপাতির ও বিভিন্ন মূলধন-সামগ্রীর ক্ষয়-ক্ষতি (Depreciation) বাবদ কত অর্থ বরাদ্দ করা উচিত এবং এই খাতে কত অর্থ মোট জাতীয় উৎপাদন হইতে বাদ দিতে হইবে তাহাও জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। তাহা ছাড়া, যে সমস্ত সেবামূলক কাজের জন্য কোন বেতন দেওয়া হয় না (unpaid services) সেইগুলি জাতীয় আয় হইতে বাদ দিতে হয়। কোন ব্যক্তি যদি তাঁহার মহিলা প্রাইভেট সেক্রেটারীকে বেতন দিয়া থাকেন, তবে তাহা জাতীয় আয়ের অংশ হইবে ; আবার যদি তিনি তাঁহাকে (সেক্রেটারীকে) বিবাহ করিয়া বসেন, তবে তাঁহাকে কাজের জন্য বেতন দিতে হইবে না এবং তাহা জাতীয় আয়ের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে না। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের এই ছোট-খাটো ঘটনাগুলি জাতীয় আয়ের সঠিক হিসাব করিবার পথে সমস্যার সৃষ্টি করে। আবার অর্থের মূল্যও সর্বদা স্থির থাকে না, সেইজন্য জাতীয় আয়ের পরিমাপ অর্থের হিসাবে করিতে গেলে কখনই সঠিক হয় না। সর্বশেষে, জাতীয় আয়ের পরিমাপ করিবার সময় সরকারী আয়-ব্যয় আর একটি সমস্যার সৃষ্টি করে। আমেরিকান লেখক কুজনেটসের (Prof. Kuznets) মতে, যে সকল কর উপাদানগুলির আয়ের উপর ধার্য করা হয় এবং আয় হইতে দেওয়া হয়, শুধু সেই করলব্ধ রাজস্ব জাতীয় আয়েয় হিসাবে ধরা হইবে। পরোক্ষ করগুলি জাতীয় আয়ের হিসাবে গণনা করা উচিত নয়। কিন্তু কোন্ কর আয় হইতে দেওয়া হয় এবং কোন্‌টি হয় না, তাহা নির্ণয় করা খুবই অসুবিধাজনক। সাধারণতঃ কোন লোকের মোট আয় যদি জাতীয় আয়ে ধরা হয় তবে তাহার নিকট হইতে আয়করের দরুণ প্রাপ্ত রাজস্ব জাতীয় আয়ে ধরা উচিত নয়। কারণ, এক্ষেত্রে একই আয়ের দুইবার গণনা (double

counting) হয়। পরোক্ষ কর সর্বদাই জাতীয় আয়ের হিসাব হইতে বাদ দেওয়া উচিত। সরকারী ব্যয়ের ক্ষেত্রেও জাতীয় আয়ের হিসাব করিবার সময় সমস্যার সৃষ্টি হয়। যে সমস্ত সেবা-মূলক কাজ রাষ্ট্র করিয়া থাকে, সেইগুলির জন্য যে টাকা খরচ হয়, তাহা জাতীয় আয়ের হিসাবে ধরা হইবে কিনা সেই বিষয়ে অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে সেবামূলক কাজের জন্য রাষ্ট্র যে টাকা খরচ করে উহাকে মূল্য হিসাবে ধরিয়া লইয়া জাতীয় আয়ের সহিত হিসাব করা যাইতে পারে। জাতীয় আয়ের সঠিক পরিমাপ করিতে হইলে দেশের জনসংখ্যার পরিবর্তন, মূল্যস্তরের হ্রাস-বৃদ্ধি, বৈদেশিক বাণিজ্য-ব্যবস্থার পরিবর্তন ইত্যাদিও বিবেচনা করিতে হইবে।

জাতীয় আয় নিরূপণের উপযোগিতা (Importance of the Measurement of National Income):

জাতীয় আয় নিরূপণের অনেক উপযোগিতা আছে। প্রথমত, জাতীয় আয় কোন দেশের জীবনযাত্রার মান নির্ধারণে সহায়তা করে।

দ্বিতীয়ত, জাতীয় আয় পরিমাপের দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে কোন দেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন উন্নতি করিতেছে কিনা। বিভিন্ন বৎসরে জাতীয় আয়ের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করিয়া আমরা বুঝিতে পারি দেশের শিল্পোৎপাদন, কৃষির উন্নতি এবং মূলধন-সৃষ্টি কি পরিমাণে হইয়াছে। তাহা ছাড়া, অর্থব্যবস্থায় বাণিজ্য-চক্রের জন্য, মুদ্রাস্ফীতির চাপের জন্য এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিবর্তনের জন্য দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে পরিবর্তন হয়, তাহা জাতীয় আয়ের পরিমাপের সহায্যে আমরা বুঝিতে পারি।

তৃতীয়ত, আমরা যে কোন দুইটি দেশের জাতীয় আয় তুলনা করিয়া সেই দুই দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণের তুলনামূলক আলোচনা করিতে পারি।

চতুর্থত, জাতীয় আয় নিরূপণের সময় আমরা যে সকল তথ্য লই তাহার দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি ঠিক করিয়া লইতে পারি। জাতীয় আয় নিরূপণ করিবার পূর্বে অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় হাত দেওয়া একরূপ অসম্ভব।

Exercise

1. Examine the significance of national income estimate and explain the different methods that may be adopted for measuring the national income of a country.

[জাতীয় আয় পরিমাপের তাৎপর্য পরীক্ষা কর এবং একটি দেশের জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।] (২৯ পৃষ্ঠা ; ২৩-২৭ পৃষ্ঠা)

2. Carefully examine the difficulties in the measurement of National Income. Discuss the importance of the concept of National income in the study of Economics.

[জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার অসুবিধাগুলি পরীক্ষা কর। অর্থশাস্ত্রে "জাতীয় আয়" বিষয়টির গুরুত্ব আলোচনা কর।] (২৭-২৯ পৃষ্ঠা)

3. Write a short note on 'Social Accounting. (C. U. B. Com. 1950)

[সামাজিক হিসাব-নিকাশের উপর একটি টীকা লিখ।] (২৭ পৃষ্ঠা)

4. What do you mean by National Income of a country ? How is it estimated ?

[একটি দেশের জাতীয় আয় বলিতে তুমি কি বোঝ ? কিভাবে ইহা পরিমাপ করা যায় ?]

(২৩-২৭ পৃষ্ঠা)

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রম এবং জনসংখ্যা তত্ত্ব
(Labour and the Theories of Population)

শ্রম (Labour) : সাধারণ অর্থে শ্রম বলিতে বুঝায় মানুষের দৈহিক বা মানসিক পরিশ্রম যাহা কোন দ্রব্য অথবা সেবাকার্য উৎপাদনে নিযুক্ত।

অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী যাহারা বেতন অথবা মজুরির বিনিময়ে কাজ করে তাহারাই শ্রমিক। তবে সাধারণতঃ শ্রমিক বলিতে যাহারা শুধু শারীরিক পরিশ্রম করে তাহাদেরই বুঝায়। শ্রমিক সরবরাহ অনেকগুলি উপাদানের উপর নির্ভর করে যথা,—জনসংখ্যা, শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান, শ্রমিকের মজুরী, শ্রমিকের উপর শ্রমিক সংঘের (Trade Union) প্রভাব, শ্রমিকদের গতিশীলতা (Mobility) অথবা এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাইবার প্রবণতা ইত্যাদি। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান মূলতঃ শ্রমিকদের আয়ের উপর নির্ভর করে। অন্যান্য যে সকল উপাদান শ্রমিক সরবরাহকে প্রভাবিত করে সেগুলি কোন না কোন ভাবে শ্রমিকের কর্মদক্ষতাকে প্রভাবিত করে অথবা শ্রমিকের কর্মদক্ষতা দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুতরাং শ্রমিক সরবরাহ মূলতঃ শ্রমিকদের সংখ্যা এবং শ্রমিকদের দক্ষতার উপর নির্ভর করে। শুধু তাহাই নহে, শ্রমিকগণ কতক্ষণ কাজ করিতে ইচ্ছুক, অর্থাৎ তাহাদের কাজের দিন ও ঘণ্টার উপরেও শ্রমিক সরবরাহ নির্ভর করে। অবশ্য এই ব্যাপারে শ্রমিকগণ তাহাদের সংঘের নির্দেশ অনুযায়ী অনেক ক্ষেত্রে চালিত হয়।

শ্রমিক সরবরাহের কারণ দুইটি

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব (Malthusian Theory of Population) : অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে ম্যালথাস নামে একজন অর্থনীতিবিদ জনসংখ্যা সম্বন্ধে একটি

তত্ত্বের অবতারণা করেন। ম্যালথাসের মতে যখনই কোন দেশে উৎপাদিত খাদ্যের পরিমাণের সাহায্যে সেই দেশের লোকসংখ্যার খাদ্যের সংস্থান হয় না, তখনই সেই দেশকে অতি-জনাকীর্ণ (over-populated) বলা যায়। ম্যালথাসের মতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয় জ্যামিতিক হারে (যেমন, ২×২×২×২×...), আর দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ে গাণিতিক হারে (২+২+২+২+...)। যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং খাদ্যশস্য উৎপাদনের হার সমান হয়, তখন দেশে প্রকৃত জনসংখ্যা বিদ্যমান থাকে। যদি কোন দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশী হয়, তখন সেই দেশকে আমরা অতি-জনাকীর্ণ বলিতে পারি না। ম্যালথাসের মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খাদ্যশস্য উৎপাদনের বৃদ্ধির হারকে অতিক্রম করিয়া গেলেই সংশ্লিষ্ট দেশ অতি-জনাকীর্ণ দেশে পরিণত হয়।

যদি কোন দেশ অতি-জনাকীর্ণ হয়, তবে বাড়তি জনসংখ্যা কমাইবার দুইটি উপায় সম্বন্ধে ম্যালথাস নির্দেশ দিয়াছেন। এই দুইটি উপায়ের মধ্যে একটি হইতেছে নিবৃত্তিমূলক নিয়ন্ত্রণ (preventive checks)। অপরটি সাধারণতঃ প্রাকৃতিক কারণে এমনিতেই ঘটিয়া থাকে। যেমন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, রোগ ইত্যাদি কারণে প্রতি বৎসর কিছু না কিছু লোক মারা যায়।

নিবৃত্তিমূলক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে প্রধান ব্যবস্থাগুলি হইতেছে অধিক বয়সে বিবাহ, জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন ইত্যাদি।

আমরা ম্যালথাসের নীতির সমালোচনা করিতে পারি। প্রথমত, খাদ্যশস্যের উৎপাদনের উপর নির্ভর করিয়া আমরা বলিতে পারি না কোন দেশ আদৌ অতি-জনাকীর্ণ কিনা। কোন দেশে সাময়িকভাবে খাদ্যের ঘাটতি হইলে সেই দেশ বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানি করিতে পারে। প্রশ্ন হইতেছে; যে হারে জনসংখ্যা বাড়িতেছে, সেই হারে বাড়তি জনশক্তিকে প্রকৃতভাবে কাজে লাগান যাইতেছে কিনা। জনসংখ্যার প্রকৃত সমস্যা হইতেছে সুষ্ঠু উৎপাদন এবং উৎপাদিত সামগ্রীর ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের সমস্যা। শুধু খাদ্যশস্যের উৎপাদন নহে, মোট উৎপাদনের সহিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনা করা উচিত।

সমালোচনা

দ্বিতীয়ত, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত শ্রমিকের সংখ্যাও বাড়ে এবং এই নূতন শ্রমশক্তিকে যদি উৎপাদনের কাজে লাগান যায়, তবে দেশের কৃষি এবং শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনও বাড়িতে পারে।

আধুনিককালে জন্ম নিয়ন্ত্রণের উপকারিতা অনেকেই অনুভব করিতেছেন এবং ইহাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও পরিমাণে কমিয়াছে। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার হওয়ায় এবং অর্থনৈতিক চাপের সৃষ্টি হওয়ায় স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই বিবাহের বয়স অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং অনেকের মতে ম্যালথাসের মতবাদ বর্তমানকালে অযৌক্তিক। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে জনসংখ্যার চাপ কমাইবার জন্য ম্যালথাসই সর্বপ্রথম নিবৃত্তিমূলক নিয়ন্ত্রণের (preventive checks) কথা বলিয়াছিলেন।

তবে বর্তমানকালের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শুধু খাদ্যশস্যের উৎপাদনের সহিত জনসংখ্যাকে যুক্ত করা উচিত নয়। এখন আমাদের দেখিতে হইবে দেশের আয় এবং অর্থনৈতিক সঙ্গতির পরিপ্রেক্ষিতে কাম্য জনসংখ্যা কিভাবে নির্ণয় করা যায়।

কাম্য জনসংখ্যা-তত্ত্ব (Optimum Theory population) : এই তত্ত্ব অনুযায়ী কোন দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধি কি প্রকার হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিবার জন্য খাদ্যশস্য উৎপাদনের উপর নির্ভর করা উচিত নহে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত দেশের উৎপাদন, আয় এবং কর্মসংস্থান কতখানি বাড়িয়াছে তাহাই আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে। যদি দেখা যায় জনসংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের আয় ও উৎপাদন সেই হারে বাড়িতেছে না এবং বর্ধিত জনশক্তিকে কোন কাজে নিয়োগ করা যাইতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে দেশটি অতি জনাকীর্ণ। দেশের সমুদয় অর্থনৈতিক সম্পদ কতখানি আছে এবং সেই অর্থনৈতিক সম্পদের সাহায্যে সমগ্র জনসংখ্যাকে কাজে লাগানো যায় কিনা তাহাই কাম্য জনসংখ্যা-তত্ত্বের বিবেচ্য বিষয়। যদি দেখা যায় যে হারে জনসংখ্যা বাড়িতেছে, দেশের আয় ও উৎপাদন তাহা অপেক্ষা বেশী হারে বাড়িতেছে, তখন বুঝিতে হইবে দেশের জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম (Under-population)। যদি দেখা যায়, যে হারে জনসংখ্যা বাড়িতেছে দেশের আয়, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান ঠিক সেই হারে বাড়িতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে দেশে ঠিক কাম্য জনসংখ্যা (Optimum Population) রহিয়াছে। আবার যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেশের আয়, উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশী হয় তবে বুঝিতে হইবে যে দেশটি অতি-জনাকীর্ণ (Over-populated)। নিম্নের চিত্রে ইহা পরিষ্কারভাবে বুঝান হইয়াছে।
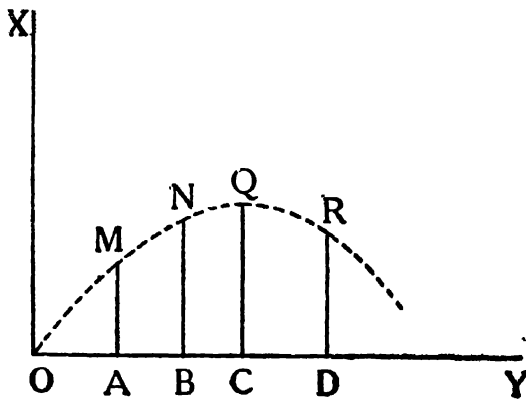
চিত্র নং ২

এই চিত্রে OY এবং OX রেখা দ্বারা যথাক্রমে জনসংখ্যা ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির

পরিমাণ বুঝাইতেছে। জনসংখ্যা OA হইতে OB, এবং OB হইতে OC পর্যন্ত বাড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আয়ও ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। যখন জনসংখ্যা OC পর্যন্ত বাড়িয়াছে তখন জাতীয় আয়ের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থায় জাতীয় আয় CQ পর্যন্ত বাড়িয়াছে। OC হইতেছে কাম্য জনসংখ্যা। ইহার পর জনসংখ্যা যদি আরও বাড়িয়া যায়, জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার কমিতে থাকিবে। উপরের চিত্রে যখন OD জনসংখ্যা হইবে তখন ইহাকে আমরা অতিপ্রজননতা বলিতে পারি।

শ্রমিকের কর্মদক্ষতা (Efficiency of Labour): শ্রমিকের কর্মদক্ষতা প্রধানতঃ তাহার শারীরিক কর্মদক্ষতা বা স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। শ্রমিকের শারীরিক গঠনের উপর জলবায়ুর যথেষ্ট প্রভাব থাকে। পুষ্টিকর আহার, উত্তম বাসস্থানের ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজের ব্যবস্থা ইত্যাদির উপর শ্রমিকের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। জন্মগত ও জাতিগত কারণেও শ্রমিকের দক্ষতা বাড়িতে অথবা কমিতে পারে। সাধারণতঃ পার্বত্য জাতির শ্রমিকগণ উত্তম স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। আবার, শীতপ্রধান দেশে আবহাওয়ার প্রভাবে শ্রমিকগণ যতটা শারীরিকভাবে কর্মক্ষম হয়, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শ্রমিকগণ সেই পরিমাণে শারীরিক কর্মক্ষমতা অর্জন করিতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, শ্রমিকদের উপযুক্ত পরিমাণে সাধারণ এবং কারিগরী শিক্ষা অর্জন করা চাই। শিক্ষিত শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়, কর্মক্ষমতাও বাড়ে। কারিগরী শিক্ষা অর্জন করিলে শ্রমিকগণ উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে শিখে এবং সেইগুলি ব্যবহার করিয়া দেশে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে পারে। সাধারণ শিক্ষা শ্রমিকের সাধারণ বুদ্ধি বাড়াইয়া দেয়, বাজারের হালচাল সম্বন্ধে শ্রমিককে অবহিত থাকিতে সাহায্য করে এবং তাহার বুদ্ধিকে মার্জিত ও নৈতিক গুণের দ্বারা উন্নত করে। ইহাতে শ্রমিকের দক্ষতা অনেক বাড়িয়া যায়। নৈতিক শিক্ষা শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ আবশ্যক।

তৃতীয়ত, শ্রমিকের দক্ষতা অনেক পরিমাণে তাহার কাজ করার প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে। মালিক ও শ্রমিক, এই দুই শ্রেণীর মধ্যে যদি প্রীতির সম্পর্ক না থাকে, তবে শ্রমিক ভালভাবে কাজ করার জন্য উৎসাহিত হয় না। তাহা ছাড়া, শীঘ্র কাজে উন্নতির আশা না থাকিলেও শ্রমিক ভালভাবে কাজ করিবার প্রেরণা পায় না। কাজে উন্নতি হইবার যদি সম্ভাবনা থাকে এবং যদি সেই সম্ভাবনা তাহার দক্ষতার উপর নির্ভর করে, তবে শ্রমিক আরও বেশী উৎপাদন করিবার এবং ভালভাবে উৎপাদন করিবার জন্য চেষ্টা করে। ইহাতে তাহার দক্ষতা এবং উৎপাদনীশক্তি বাড়িয়া যায়।

চতুর্থত, কাজ করিবার পরিবেশ অনেক সময়ে শ্রমিকের কর্মদক্ষতাকে প্রভাবিত করে। যদি কাজের পরিবেশ আনন্দদায়ক হয় এবং শ্রমিকের সুবিধা অনুযায়ী কাজ

করিবার সময় নির্ধারিত হয়, তবে শ্রমিকদের ভালভাবে কাজ করিবার উৎসাহ বাড়ে। শ্রমিকদের খেলাধূলার সুবন্দোবস্ত মালিকদেরই করিয়া দেওয়া উচিত।

পঞ্চমত, শ্রমিকসংঘের ক্রিয়াকলাপও শ্রমিকদের দক্ষতাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। শ্রমিকসংঘ শুধু শ্রমিকদের মজুরির হার বাড়াইবার চেষ্টাই করে না, নানাবিধ উপায়ে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি বিধানেরও চেষ্টা করে। শ্রমিকসংঘ যদি সুসংগঠিত হয় তবে ইহা যাহাতে শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ে সেইজন্য শ্রমিকদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা, বিভিন্ন নৈতিক গুণ, কারিগরী শিক্ষা ইত্যাদির প্রসার করিতে পারে।

ষষ্ঠত, শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বাড়াইবার ব্যাপারে শিল্প-মালিকদেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। নিয়মিতভাবে এবং যতদূর সম্ভব বেশী পরিমাণে শ্রমিকদের মজুরি প্রদান, মুনাফার অংশ প্রদান এবং বিশেষ ক্ষেত্রে বোনাস প্রদান এবং নিজের চেষ্টায় শ্রমিকদের স্বীয় দক্ষতা বাড়াইবার জন্য প্রেরণা দান ইত্যাদি কাজের দায়িত্ব শিল্পমালিকদেরই এবং শিল্পমালিকগণ এই কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত করিতে পারিলে শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বাড়ে।

কারিগরী কর্মকুশলতা (Technical skill): আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের কিছু না কিছু কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন হইতে হয়। কারণ উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে আমাদের বর্তমানে উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি এবং মূলধন সামগ্রীর উপর নির্ভর করিতে হয়। শ্রমিকদের কারিগরী কর্মকুশলতার উপর তাহাদের উৎপাদনীশক্তি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে এবং ইহাতে তাহাদের আয় এবং সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রভাবিত হয়। সুতরাং কারিগরী কর্মকুশলতা সৃষ্টির সমস্যা মূলধন সৃষ্টির সমস্যারই একটি অংশ। শুধু যন্ত্রপাতির সাহায্যে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি করা সম্ভব নয়। যন্ত্রপাতিগুলি ঠিকভাবে ব্যবহার করিবার মত কারিগরী কর্মদক্ষতা শ্রমিকদের থাকা প্রয়োজন। যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিবার বিদ্যা আয়ত্ত করার সহিত বিভিন্ন ধরণের যন্ত্র উদ্ভাবনের জ্ঞানও শ্রমিকদের অর্জন করা উচিত। শিল্পোন্নয়নের জন্য মূলধন সৃষ্টির যেমন প্রয়োজন, শ্রমিকদের কারিগরী কর্মকুশলতারও ঠিক অনুরূপ প্রয়োজন। উন্নত এবং অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে শ্রমিকদের কারিগরী কর্মকুশলতার যে পার্থক্য আমরা দেখিতে পাই, তাহার প্রধান কারণ হইতেছে উভয় দেশের মধ্যে শ্রমশক্তি বিনিয়োগ পদ্ধতির পার্থক্য।

কারিগরী কর্ম-কুশলতার গুরুত্ব

কারিগরী কর্মকুশলতা অর্জনের উপায় (Factors governing the formation of technical skill): শ্রমিকদের কারিগরী কর্মকুশলতা বাড়াইবার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন শ্রমশক্তি বিনিয়োগ করিবার পদ্ধতির পরিবর্তন; এই উদ্দেশ্যে শ্রমশক্তি কারিগরী শিক্ষালাভ করিবার আগে যাহাতে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করিতে পারে সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করিবার পর শ্রমিকদের

কারিগরী শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কারিগরী শিক্ষার কেন্দ্র বা কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে।

দ্বিতীয়ত, শুধু কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপন করিলেই চলিবে না, শ্রমিকগণের কারিগরী নৈপুণ্য বাড়াইবার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা উচিত। সরকার বিদেশ হইতে এই ব্যাপারে সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন। বিশেষতঃ, অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে বিদেশী কারিগরী বিশেষজ্ঞদের সাহায্য ব্যতীত শ্রমিকদের কারিগরী জ্ঞান বাড়াইবার অন্য কোন উপায় নাই। কারখানাগুলিতে শ্রমিকদের কারিগরী জ্ঞান বাড়াইবার জন্য তাহাদের শিক্ষানবীশ করা যাইতে পারে এবং কারিগরী বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে তাহাদের হাতে-কলমে কারিগরী বিদ্যা প্রদান করা যাইতে পারে।

তৃতীয়ত, সরকারের উচিত দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে কারিগরী শিক্ষাকে একটি বিশেষ মর্যাদা দেওয়া এবং কারিগরী শিক্ষালাভের উপযুক্ত ছাত্রদের বিদেশে এই শিক্ষালাভের জন্য প্রেরণ করা।

চতুর্থত, দেশের ভিতরে যে সব বিদেশী এবং স্বদেশী শিল্পপ্রতিষ্ঠান আছে তাহাদের রাজী করাইতে হইবে শ্রমিকদের কারিগরী কর্মকুশলতা লাভের ব্যাপক ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য।

পঞ্চমত, কারিগরী শিক্ষার প্রসার করিতে হইলে শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থার এবং জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে মজুরি নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত। নিপুণ বা কর্মকুশল শ্রমিকদের পুরস্কার বা অধিক মজুরি প্রদান করিলে অনিপুণ শ্রমিকদের মধ্যে কর্মকুশল হইবার আকাংখা দেখা যাইবে।

সর্বশেষে, শ্রমিকদের কারিগরী দক্ষতা বাড়াইবার জন্য অধিক পরিমাণে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা উচিত।

কারিগরী দক্ষতা কিভাবে বাড়ান যাইতে পারে তাহা আলোচিত হইয়াছে। কারিগরী দক্ষতা অনেক সময় বংশগত দক্ষতার (hereditary skill) উপর নির্ভর করে। একজন কারিগরী বিশেষজ্ঞের ছেলের ছোটবেলা হইতেই কারিগরী জ্ঞানের দিকে বিশেষ ঝোঁক থাকিতে পারে এবং ইহাতে তাহার কারিগরী কর্মকুশলতা বাড়িতে পারে। যন্ত্র নির্মাণ করিবার কারখানা স্থাপন করিয়া এবং ক্ষুদ্রায়তন ও কুটীরশিল্পগুলির উন্নতি করিয়াও শ্রমিকদের কারিগরী বিদ্যা বাড়াইবার চেষ্টা চলিতে পারে। শ্রমিকদের মধ্যে যদি প্রগতিশীল মনোবৃত্তির প্রসার করা যায়, তবে কৃষিপ্রধান অনুন্নত দেশেও কারিগরী জ্ঞানের দিকে তাহাদের ঝোঁক বাড়িতে পারে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে এবং জাপানে শ্রমিকদের মধ্যে বড় হইবার আকাংখাই তাহাদের কারিগরী জ্ঞান লাভের প্রেরণা দিয়াছে।

Exercise

1. Fully explain the Malthusian Theory of Population. [ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা কর।] (৩০-৩২ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the Optimum Theory of Population. [কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বটি আলোচনা কর।] (৩২-৩৩ পৃষ্ঠা)

3. Examine the factors which determine the efficiency of a worker. [একজন শ্রমিকের কর্মদক্ষতা নিরূপণকারী উপাদানগুলি পরীক্ষা কর।] (৩৩-৩৪ পৃষ্ঠা)

4. Define Optimum Population. Discuss the factors which determine this with specific examples.

[কাম্য জনসংখ্যার সংজ্ঞা প্রদান কর। ইহা কি কি উপাদানের দ্বারা নির্ধারিত হয় তাহা উদাহরণ সহযোগে আলোচনা কর।]

5. Discuss the factors governing technical skill of the labourers. [শ্রমিকদের কারিগরী দক্ষতা নিয়ন্ত্রণকারী উপাদানগুলি আলোচনা কর। (৩৪-৩৫ পৃষ্ঠা)

পঞ্চম অধ্যায় | জমি (Land)

জমি (Land): জমি উৎপাদনের একটি বিশিষ্ট উপাদান। অর্থবিজ্ঞানে জমি বলিতে সমুদয় প্রাকৃতিক সম্পদকে বুঝায়। যাহা প্রকৃতির দান এবং মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট নয়, তাহাই জমি। উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে আমরা জমির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই: (১) উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে চাষবাসের পক্ষে উপযোগী জমির পরিমাণ সমগ্র দেশে সীমাবদ্ধ; মানুষ নিজের ইচ্ছায় মোট জমির পরিমাণ বাড়াইতে বা কমাইতে পারে না। কিন্তু উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণগুলির যোগান সর্বদা সীমাবদ্ধ নয়।

জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ

(২) জমির কোনো উৎপাদন খরচ নাই। জমি হইতেছে প্রকৃতির সম্পদ। মানুষ ইহা সৃষ্টি করে নাই। এই প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করিয়াই মানুষ ইহার সাহায্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করে। প্রাকৃতিক সম্পদগুলি—যেমন, জমির উর্বরতা, জলবায়ু প্রভৃতির উপর মানুষের হাত নাই।

জমির উৎপাদন খরচ নাই

(৩) জমিকে স্থানান্তরিত করা যায় না। একটি জমি যতই উর্বর অথবা যতই অনুর্বর হউক না কেন, ইহাকে এক জায়গা হইতে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা যায় না। তবে জমির মালিকানা-স্বত্ব হস্তান্তরিত করা যায়। জমির গতিশীলতা নাই।

জমিকে স্থানান্তরিত করা যায় না

(৪) সমগ্র দেশের পক্ষে জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ থাকিলে কোনও বিশেষ

শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা খামারের পক্ষে জমির বিকল্প ব্যবহার আছে এবং সেইজন্য ইহার যোগান উক্ত প্রতিষ্ঠান বা খামারের কাছে পরিবর্তনশীল। জমির বিকল্প আয় (Transfer earning) খাজনাকে প্রভাবিত করে।

জমির বিকল্প আয় আছে এবং একটি বিশেষ শিল্পের পক্ষে ইহার যোগান সীমিত থাকে না

(৫) জমির উর্বরতা সর্বদা সমান নহে। জমি বিভিন্ন জাতীয় (heterogeneous) হইতে পারে। আমাদের দেশেই আমরা বিভিন্ন জাতীয় জমি দেখিতে পাই। পশ্চিমবঙ্গে জমি যত উর্বর, রাজস্থানে জমি তত উর্বর নয়। জমির অবস্থানের তারতম্য এবং জমির উৎপাদনী শক্তির তারতম্য খাজনা তত্ত্বকে বিশেষ প্রভাবিত করিয়াছে।

জমি বিভিন্ন জাতীয় হইতে পারে এবং ইহার উর্বরতা সর্বত্র সমান নাও হইতে পাবে

(৬) জমির ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান বিধি (Law of Diminishing Returns) বিশেষভাবে কার্যকর হয়। জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ থাকার দরুন জমির মধ্যে যদি আমরা কোন পরিবর্তন (variable) উপাদান প্রয়োগ করি, তবে যে হারে উৎপাদন-খরচ বাড়ে সেই হারে উৎপাদন বাড়ে না। তখনই ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধিটি কার্যকর হয়

জমির উৎপাদনী শক্তি (Productivity of Land)—অনেকে মনে করেন জমির উৎপাদনী শক্তি প্রকৃতিদত্ত দান। রিকার্ডো মনে করিতেন জমির একটি "আদিম ও অবিনশ্বর ক্ষমতা" ('original and indestructible power') আছে। কিন্তু এই ধারণা ভুল। আদিম ক্ষমতা বলিতে কি বুঝায় তাহা স্পষ্ট নয়। মানুষ সেচ-ব্যবস্থার উন্নতি করিয়া, উৎকৃষ্ট সার ব্যবহার করিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে জমির উর্বরতা বাড়াইতে থাকে। জমি কর্ষণ না করিলে কোন কিছু উৎপাদন করাও সম্ভবপর নহে। জমি মাত্রেই যে উর্বর হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। আবার বর্তমান আণবিক যুগে কোন জমিকেই আমরা অবিনশ্বর বলিতে পারি না। হাইড্রোজেন বোমার সাহায্যে জমি নষ্ট করিয়া ফেলা অসম্ভব নহে। সুতরাং বিজ্ঞানের যুগে জমির আদিম ও অবিনশ্বর ক্ষমতা আছে, এই কথা বলা অবান্তর।

জমির উৎপাদনী-শক্তি একদিকে যেমন প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, অপরদিকে ইহা মানুষের প্রচেষ্টার উপরেও নির্ভর করে। একটি জমি হয়ত প্রকৃতির দানে বিশেষ উর্বর হইতে পারে। কিন্তু মানুষ চেষ্টা করিয়াও ইহার উর্বরতা বাড়াইতে পারে। সব জমির উৎপাদনী শক্তি সমান নয়। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয়, কোন জমির বাড়তি উৎপাদনী-শক্তি মানুষের চেষ্টায় সম্ভবপর হয়, প্রকৃতির অযাচিত দানে নহে। জমির উর্বরতা বাড়াইয়া মানুষ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা করিতে পারে এবং সেই চেষ্টায় সফল হইতে পারে।

অনুন্নত দেশগুলিতে যেমন, ভারতে অনেক সময়ে আমরা অনেক পতিত বা অনাবাদী জমি দেখিতে পাই। জমি হইতে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে হইলে এই অনাবাদী বা পতিত জমিগুলিতে চাষবাসের ব্যবস্থা করিতে হয়। সুতরাং

জমির উৎপাদনী শক্তি বাড়াইবার সমস্যা প্রকৃতপক্ষে জমির অভাব অথবা ইহার উৎপাদনী শক্তির অভাব নয়। প্রশ্ন হইল ইহার উৎপাদনী-শক্তি বাড়াইবার সমস্যা, এবং এইজন্য প্রয়োজন কর্মদক্ষ শ্রমশক্তি এবং উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগের।

কিভাবে জমির উৎপাদনী-শক্তি বাড়ানো যায়

ভারতের মত দেশে জমির উৎপাদনী-শক্তি বাড়াইবার জন্য জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, পর্যাপ্ত পরিমাণে জলসেচের ব্যবস্থা করিতে পারিলেও জমির উৎপাদনী শক্তি বাড়ানো যায়। তৃতীয়ত, একাধিক শস্য ফলানো এবং পালটি শস্য উৎপাদনের (rotation of crops) ব্যবস্থা চালু করিলে এবং সেই উদ্দেশ্যে উন্নতধরনের বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা রাখিতে পারিলে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো যায় এবং জমিরও উৎপাদনী শক্তি ইহাতে বাড়ে। সর্বশেষে, ভাল ট্র্যাক্টর দিয়া চাষ করিলে, সমবায়ের মাধ্যমে বৃহদায়তনে উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলে এবং জমির উপবিভাজন ও বিখণ্ডন (Subdivision and Fragmentation of Lands) বন্ধ করিতে পারিলে জমির উৎপাদনী শক্তি বাড়িয়া যায়। ভারতে জমির উৎপাদনী শক্তি বাড়াইবার জন্য বিভিন্ন পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে জলসেচের ব্যবস্থা এবং সমবায় কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে এবং জমিতে উন্নত ধরনের বীজ ও সার প্রয়োগ করার ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে।

জমির উৎপাদনী-শক্তি বাড়াইবার ব্যবস্থা

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম (Law of Diminishing Returns) :

জমির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার সীমাবদ্ধ যোগান। জমির যোগানের এই সীমাবদ্ধতাই ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন নিয়মের প্রধান কারণ। ইহা খুবই স্বাভাবিক যে একটি সীমাবদ্ধ উপাদানের (জমি) সহিত যদি এমন একটি উপাদান প্রয়োগ করা হয় যাহার পরিমাণ আমরা ইচ্ছা করিলেই বাড়াইতে পারি (যেমন মূলধন অথবা শ্রম), তবে উৎপাদন এমন একটি পর্যায়ে আসিবে যখন দেখা যাইবে, যে হারে শেষোক্ত উপাদানের পরিমাণ বাড়িতেছে, সেই হারে উৎপাদন আর বাড়িতেছে না। এই অবস্থার প্রধান কারণ হইতেছে একটি উপাদানের সীমিত যোগান। এই নিয়মটির অন্য কোনও প্রমাণের প্রয়োজন হয় না।[১]

এই নিয়মটি বিশেষভাবে কৃষিক্ষেত্রের প্রযোজ্য মনে করা হয়। এই নিয়ম অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে আমরা যত বেশী মূলধন অথবা শ্রমিক নিয়োগ করি, জমিতে উৎপাদন ঠিক সেই পরিমাণে বাড়ে না, অবশ্য যদি আমরা ধরিয়া লই যে ইতিমধ্যে কোন উপকরণেরই উৎপাদিকা শক্তির পরিবর্তন হয় নাই। দ্বিগুণ পরিমাণ শ্রম এবং মূলধন দিয়া চাষ করিলে প্রথমে হয়ত উৎপাদন বৃদ্ধি দ্বিগুণ হইতে পারে, কিন্তু

---

১ "The Law of Diminishing Returns is a logical necessity,—it requires no further proof."—(Joan Robinson.)

তিনগুণ অথবা চারগুণ শ্রম এবং মূলধন দিয়া চাষ করিলে উৎপাদন তিনগুণ অথবা চারগুণ বৃদ্ধি হইবে না। একটি উদাহরণের সাহায্যে এই নিয়মটি বুঝানো যাইতে পারে।

ধরা যাক্, প্রতি বিঘা জমিতে নিযুক্ত প্রত্যেক শ্রমিক নির্দিষ্ট পরিমাণে মূলধনসহ (যথা, লাঙ্গল, বীজ, সার প্রভৃতি) ধান উৎপাদনের প্রচেষ্টা চালাইতেছে, তখন নিম্নলিখিতভাবে উৎপাদনের পরিবর্তন হইতে পারে।

শ্রমিকের সংখ্যা (মূলধন সহ)	উৎপাদিত সামগ্রীর পরিমাণ (কুইন্টালে)	শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন (কুইন্টালে)	শ্রমিক পিছু গড় উৎপাদন (কুইন্টালে)
১	২০	—	২০
২	৪৬	২৬	২৩
৩	৭২	২৬	২৪
৪	৯৬	২৪	২৪
৫	১১০	১৪	২২
৬	১২০	১০	২০
৭	১২৬	৬	১৮
৮	১২৮	২	১৬
৯	১২৬	—২	১৪

উপরের উদাহরণ হইতে দেখা যাইতেছে, প্রথম দুইজন পর্যন্ত শ্রমিক নিযুক্ত হইলে মোট উৎপাদন, প্রান্তিক উৎপাদন এবং শ্রমিকপিছু গড় উৎপাদনের হার বাড়িতেছে। তৃতীয় শ্রমিক নিযুক্ত হইলে প্রান্তিক উৎপাদন স্থির থাকিতেছে। দুইজন পর্যন্ত শ্রমিক নিযুক্ত হইলে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বিধি (Law of Increasing Returns) কার্যকর হইতেছে। দ্বিতীয় শ্রমিকের পর তৃতীয় শ্রমিক নিযুক্ত হইবার পর প্রান্তিক উৎপাদন স্থির আছে এবং গড় উৎপাদন সামান্য বাড়িয়াছে। চতুর্থ শ্রমিক নিযুক্ত হইবার পর হইতে প্রান্তিক উৎপাদনের হার ক্রমশঃ কমিতেছে। তৃতীয় শ্রমিকের পর চতুর্থ শ্রমিক নিযুক্ত হইলে গড় উৎপাদন স্থির থাকিলেও প্রান্তিক উৎপাদন কম হইয়াছে। এইভাবে পর পর যতই শ্রমিক নিযুক্ত হইতেছে, প্রান্তিক উৎপাদন এবং গড় উৎপাদন ততই কমিতেছে। ইহাই হইতেছে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি (Law of Diminishing Returns)। ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে যখন কোন জিনিস উৎপাদন করিবার জন্য একাধিক উপকরণের যোগান বাড়াইয়া দেওয়া হয় অথচ একটি নির্দিষ্ট উপকরণ স্থির থাকে (এক্ষেত্রে জমি), তখন উৎপাদন বৃদ্ধির

হার প্রথমে কিছু বাড়িলেও পরে কমিয়া যায়। উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া যাইতে আরম্ভ করিলে প্রতি ইউনিট উৎপাদন খরচ বাড়িতে থাকে। সেজন্য ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনবিধি কার্যকর হইলে আমরা ক্রমবর্ধমান খরচ দেখিতে পাই।

নিম্নে প্রদত্ত চিত্রের সাহায্যে এই নিয়মটি বুঝানো যাইতে পারে।

এই চিত্রে OY রেখা দ্বারা শ্রমের পরিমাণ এবং OX রেখা দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ সূচিত হইতেছে। OA হইতে AB পরিমাণ শ্রম বাড়াইয়া অতিরিক্ত উৎপাদন হইতেছে NN_1 পরিমাণ এবং মোট উৎপাদন হইতেছে BN_1 পরিমাণ। আবার শ্রমের পরিমাণ OC পর্যন্ত বাড়াইলে অতিরিক্ত উৎপাদন হইতেছে PP_1 পরিমাণ।
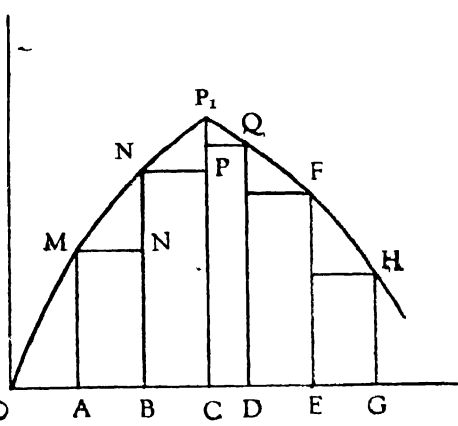
চিত্র নং ৩

কিন্তু ইহার পর শ্রমিকের পরিমাণ আরও বাড়াইলে প্রান্তিক উৎপাদনের হার আরও কমিয়া যাইতেছে।

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটি এই ধারণার উপর ভিত্তিশীল যে অন্যান্য অবস্থার কোন পরিবর্তন হইলে এই নিয়মটি না-ও কার্যকর হইতে পারে। উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষের ব্যবস্থা করিলে উৎপাদন না কমিয়া হয়ত বাড়িয়া যাইতে পারে। যেমন, ট্র্যাক্টরের সাহায্যে চাষ করিলে কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদন বাড়িয়া যাইবে।

খনি এবং মাছ ধরিবার ক্ষেত্রেও ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটি প্রয়োগ করা যায়। কোন কয়লা খনির মালিক যদি বেশী কয়লা তুলিতে চায়, তবে তাহাকে খনির আরও নীচে যাইতে হইবে। কিন্তু যতই সে খনির ভিতরে প্রবেশ করিবে, ততই তাহার নিজের নিরাপত্তা বিধান এবং খনি হইতে কয়লা উত্তোলন করার খাতে খরচের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। তখন খনি হইতে অতিরিক্ত কয়লা উত্তোলন করিবার জন্য খরচের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং তখন ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম এই ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে। মাছ ধরিবার সময়েও এই নিয়ম প্রয়োগ করা যায়। বেশী করিয়া মাছ ধরিতে হইলে নদীর অথবা সমুদ্রের ভিতর অনেক দূর যাইতে হইবে। যতই নদীর অথবা সমুদ্রের ভিতরে অনেক দূর যাওয়া হইবে, ততই মাছ ধরিবার খরচ বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং অতিরিক্ত মাছ ধরিবার জন্য শুধু খরচের পরিমাণই বাড়িয়া

খনি ও মাছ ধরিবার ক্ষেত্রে এই নিয়মের প্রয়োগ

যাইবে। দেখা যাইতেছে, ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটি মাছ ধরিবার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। শিল্পক্ষেত্রে সাধারণতঃ ক্রমবর্ধমান উৎপানের নিয়ম কার্যকর হয়। যদি শিল্পক্ষেত্রে কখনও কোন উপকরণের যোগান স্থির থাকে অথচ অন্য কোন উপকরণের পরিবর্তনন হয় তবে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম কার্যকর হয়।

এই নিয়ম অনুযায়ী উৎপাদনের খরচ ক্রমেই বাড়িয়া যায়

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম অনুযায়ী উপকরণের প্রয়োগ অনুসারে খরচের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়ম কার্যকর হইলে উৎপাদন খরচের পরিমাণ কমিয়া যায়। যখন নির্দিষ্ট হারে উৎপাদন বৃদ্ধির নিয়ম কার্যকর হয়, তখন খরচের পরিমাণও স্থির থাকে।

এই নিয়মের ব্যতিক্রম

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন নিয়মের দুইটি ব্যতিক্রম আছে। প্রথমত, এমন হইতে পারে, যে জমিতে উৎপাদন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা পূর্বে উপযুক্ত পরিমাণে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া চাষ করা হয় নাই, সুতরাং প্রথমেই অধিক শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিলে এইরূপ জমিতে উৎপাদনের হার না কমিয়া হয়ত বাড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহা একটি সাময়িক ব্যাপার; কালক্রমে উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম এখানে কার্যকরী হইবেই।

দ্বিতীয়ত, উন্নতধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষের ব্যবস্থা করিলে উৎপাদন না কমিয়া হয়ত বাড়িয়া যাইতে পারে। যেমন, ট্র্যাক্টরের সাহায্যে চাষ করিলে কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদন বাড়িয়া যাইবে।

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটি কৃষিক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য হয়; এই কারণে বলা হয় যে জমির যোগান খুবই সীমাবদ্ধ। যখন উৎপাদনের কোন একটি উপাদানের যোগান অন্যান্য উপাদানগুলির তুলনায় সীমাবদ্ধ থাকে, তখন ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটি কার্যকর হয়। কিন্তু, এইজন্য যে এই নিয়মটি শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না, তাহা নহে। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সাময়িক ভাবে শিল্পক্ষেত্রেও এই নিয়মটি কার্যকর হয়। ধরা যাক্, কোন শিল্পে হঠাৎ উৎপাদন বাড়াইবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল; অথচ, প্রয়োজনীয় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নূতন যন্ত্রপাতি বসানো সম্ভবপর নয়, তখন পুরাতন যন্ত্রপাতির সাহায্যে যদি অধিক শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করা হয়, তবে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটি কার্যকর হইতে পারে। কিন্তু, ইহা, একটি সাময়িক ব্যাপার মাত্র। প্রকৃতপক্ষে শিল্পক্ষেত্রে এই অবস্থা বরাবর থাকে না। সেইজন্যই শিল্পক্ষেত্র হইতে কৃষিক্ষেত্রেই ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটি বিশেষভাবে কার্যকর হয়।

ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়ম (Law of Increasing Returns): ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়ম অনুযায়ী কোনও শিল্পে যদি অধিক পরিমাণে মূলধন অথবা শ্রম বিনিয়োগ করা যায় তবে বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধির অনুপাতে উৎপাদনের পরিমাণ বেশী হারে বাড়ে। এই উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান কারণ হইতেছে উন্নত উৎপাদন-কৌশল

অথবা উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত উপাদানগুলির দক্ষতা ও উৎপাদনী শক্তির (Productive Efficiency) বৃদ্ধি। উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত উপাদানগুলির উৎপাদনীশক্তি যতই বাড়িবে ততই অবিভাজ্য উপকরণগুলির (indivisible factors) প্রকৃত সদ্ব্যবহার হইবে এবং ইহার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির হারও বাড়িবে। ইহাই হইতেছে ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়মটির মূল কারণ। ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়মটি কোনও উপাদানের যোগানের প্রাচুর্য অথবা স্বল্পতার উপর নির্ভরশীল নয়। কারণ অনুর্বর জমির প্রাচুর্য থাকিলেই উৎপাদনের হার বাড়িবে না। উৎপাদনের হার ক্রমবর্ধমান হইবে কিনা তাহা নির্ভর করে সেই জমির উর্বরতা এবং উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত মূলধন ও শ্রমের উৎপাদনী শক্তি উপর। একটি মেসিনকে যতই কাজে লাগানো যাইবে, ততই ইহার সাহায্যে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হইবে এবং উৎপাদন খরচ কমানো সম্ভব হইবে। অর্থাৎ, মেসিনটি হইতেছে একটি অবিভাজ্য (indivisible) উপাদান। এই অবিভাজ্য উপাদানটির সদ্ব্যবহার হইলেই উপাদানের উৎপাদনীশক্তি বৃদ্ধি এবং উৎপাদনের ব্যয় সংকোচ হইবে; উপাদানের উৎপাদনী শক্তি বৃদ্ধি এবং অবিভাজ্য উপকরণের সদ্ব্যবহারই হইতেছে ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়ম কার্যকর হওয়ার কারণ। এই নিয়ম কার্যকর হইলে ফার্মের আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক ব্যয় সংকোচ (internal and external economies) হয়।

পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়ম (Law of Variable Proportions): আধুনিক লেখকগণ ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটির কথা না বলিয়া পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়ম (Law of Variable Proportions) সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, যদি কোন উপাদানের সীমিত যোগান থাকে তবে ঐ উপাদানটির সহিত অন্যান্য উপাদান পরিবর্তিত করিয়া উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করিলেই এমন একটি পর্যায় আসিবে যখন উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমেই কমিতে থাকিবে। উৎপাদনক্ষেত্রে কম-বেশী সকল উপাদানের যোগান সীমিত। সুতরাং কোন উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদন বাড়িবে কিনা অথবা বাড়িলেও কি অনুপাতে বাড়িবে তাহা যে উপাদানগুলি উৎপাদনে প্রয়োগ করা হইয়াছে সেইগুলির যোগান এবং উৎপাদনী শক্তির উপর নির্ভর করে। কখনও উৎপাদন বৃদ্ধির হার খুব বেশী হইতে পারে। তখন ইহাকে আমরা ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়ম (Law of Increasing Returns) বলি, আবার কখনও উৎপাদন বৃদ্ধির হার সাময়িকভাবে স্থির থাকিতে পারে। তখন ইহাকে আমরা অপরিবর্তিত উৎপাদন বৃদ্ধির নিয়ম (Law of Constant Returns) বলি। যদি উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমেই কমিতে থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে কোনও একটি উপাদানের পরিমাণ স্থির থাকার দরুণ অন্য উপাদানের পরিমাণ বাড়াইবার সময় উৎপাদন বৃদ্ধির অনুপাত কমিয়া যাইতেছে। অধ্যাপিকা জোয়ান রবিনসনের (Prof. Joan Robinson) উক্তি উদ্ধৃত করিয়া

আমরা বলিতে পারি, "একটি অপরিবর্তিত উপাদানের বদলে অপর একটি উপাদান নিয়োগের একটি সীমা আছে, অথবা অন্যভাবে বলিতে গেলে বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পরিবর্ততার স্থিতিস্থাপকতা অসীম নয়।"[১]

যদি দেখা যায় যে বিভিন্ন উপাদানের নিয়োগে উৎপাদন বৃদ্ধির অনুপাত ক্রমেই বাড়িতেছে, তবে বুঝিতে হইবে যে, হয় উৎপাদনের কৌশল উন্নততর হইয়াছে অথবা কোন উপাদানের উৎপাদনী শক্তি বাড়িয়া গিয়াছে। সেজন্য উৎপাদনের অবিভাজ্য উপকরণগুলির (indivisible factors) প্রকৃত সদ্ব্যবহার হইতেছে এবং ইহার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির হারও বাড়িয়াছে। ইহাই ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়মটির মূল কারণ। যদি দেখা যায় যে উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমিতেছে, তবে বুঝিতে হইবে যে কোন উপাদানের পরিমাণ সাময়িকভাবে স্থির থাকার দরুণ একটি উপাদানের পরিবর্তে অপর একটি উপাদান একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর আর নিয়োগ করা যাইতেছে না। আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীগণ ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটিকে এইজন্য অনুপাত পরিবর্তনের নিয়মের একটি বিশেষ পর্যায় বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন।[২] যেহেতু সব উপাদানের যোগানই অল্পবিস্তর সীমিত, সেজন্য শ্রম, মূলধন, সংগঠন ইত্যাদির ব্যবহার ক্রমাগত বাড়াইতে থাকিলে এমন একটি সময় আসিবে যখন কোন না কোন উপাদান স্থির থাকিবে। সেই সময়েই ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটি কার্যকরী হইবে। সুতরাং জমি ছাড়া, উৎপাদনের যে কোন উপাদানেরই পরিমাণ যদি সাময়িকভাবে স্থির থাকে এবং অন্যান্য উপাদানগুলির পরিমাণ যদি স্থির না থাকে, তবেই ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটি কার্যকর হইবে। ক্রম-হ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটি এই কারণেই উৎপাদনের সকল বিভাগে প্রযোজ্য।

ক্রমহ্রাসমান ও ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়ম দুইটির মূল ভিত্তি (Bases of the Law of Diminishing Returns and the Eaw of Increasing Returns) : ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটির মূল ভিত্তি হইতেছে এই যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উপাদানে (যেমন, জমি), যদি একটি পরিবর্তনীয় উপাদান (যেমন, শ্রম) বেশী করিয়া নিয়োগ করা হয়, তবে পরিবর্তনীয় উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট উপাদানের প্রতিস্থাপন স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Substitution) সীমিত থাকিবে এবং এইজন্য জমিতে অধিক পরিমাণে শ্রম নিয়োগ করিলেও, উৎপাদন বৃদ্ধির অনুপাতে খরচের হার বেশী বাড়িতে থাকিবে। কিন্তু, ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়মটি কোন উপাদানের স্বল্পতা বা প্রাচুর্যের উপর

---

১. **"There is a limit to the extent to which a fixed factor of production can be substituted for a variable factor, or in other words, the elasticity of substitution between them is not infinite."**

২. **"The Law of Diminishing Returns is only one phase of the universal Law of Variable Proportions."**

নির্ভরশীল নয়; ইহা মূলতঃ নির্ভরশীল সংশ্লিষ্ট উপাদানের উৎপাদনী শক্তি ও পারদর্শিতার (productive efficiency) উপর। যদি উৎপাদন প্রচেষ্টায় নিযোজিত উপাদানগুলির কর্মশক্তি এবং উৎপাদনী শক্তি বাড়িয়া যায়, তবে উৎপাদন খরচের হার কমিতে থাকে এবং উৎপাদনের পরিমাণও বাড়িতে থাকে।

যদি একটি উপাদানের উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতি ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম এবং ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়মের মূল কারণ হইত, তবে বলা যাইত যে দুইটি নিয়ম পরস্পরের সমান্তরাল। ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটি তখনই কার্যকর হয় যখন একটি উপাদানের যোগান সীমাবদ্ধ এবং অন্যান্য উপাদানগুলির যোগান পরিবর্তনীয় থাকে। উপাদানগুলির উৎপাদনী শক্তির সহিত ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম জড়িত নয়। অপরপক্ষে ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়মটি তখনই কার্যকর হয় যখন কোন উপাদানের উৎপাদনীশক্তি বাড়িয়া যায়। ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটি কার্যকর হইবার জন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না; কারণ, ইহা যুক্তির দিক দিয়া প্রয়োজনীয় ("···a logical necessity") যে একটি উপাদানের যোগান স্থির থাকিলে এবং অপর উপাদানগুলির যোগান পরিবর্তনীয় থাকিলে স্থির উপাদানের মধ্যে পরিবর্তনীয় উপাদান একটি নির্দিষ্ট সীমার পর প্রয়োগ করা যায় না; কারণ সেক্ষেত্রে ইহাদের elasticity of substitution সীমাবদ্ধ থাকে। অপরপক্ষে ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়মটি একটি ঐতিহাসিক নিয়ম এবং অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তিশীল (an empirical fact))। আমাদের অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা দেখিতে পাই যে কোন উপাদানের উৎপাদনী শক্তি বাড়িয়া গেলে ইহার প্রতি ইউনিটে খরচ কমিয়া আসে। সুতরাং এই দুইটি নিয়ম পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, পরস্পরের সমান্তরাল নয়।

Exercise

1. Explain the Law of Diminishing Returns indicating the premises upon which it is based.

[কি কি ধারনার উপর ইহা ভিত্তিশীল তাহা দেখাইয়া ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটি ব্যাখ্যা কর।] (৩৮-৪১ পৃষ্ঠা)

2. Explain the Law of Increasing Returns and analyse the causes of Increasing Returns. (৪১-৪২ পৃষ্ঠা)

[ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়মটি ব্যাখ্যা কর এবং ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের কারণগুলি বিশ্লেষণ কর।]

3. "The Law of Diminishing Returns is a logical necessity; the Law of Increasing Returns is an empirical fact- Discuss the statement.

[ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটি হইতেছে যুক্তিসিদ্ধ, কিন্তু ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়মটি অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তিশীল—উক্তিটি আলোচনা কর।] (২৩-৪৪ পৃষ্ঠা)

4. Is the Law of Diminishing Returns parallel to the Law of Increasing Returns? (৪৩-৪৪ পৃষ্ঠা)

[ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটি কি ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়মটির সমান্তরাল ?]

5. Discuss the characteristics of Land. Write a note on the Productivity of Land. (৩৬-৩৮ পৃষ্ঠা)

[জমির বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। জমির উৎপাদনী শক্তির উপর একটি টীকা লিখ।]

ষষ্ঠ অধ্যায় | মূলধন (Capital)

মূলধনের সংজ্ঞা (Definition of Capital): ব্যবসায় বাণিজ্যে 'মূলধন' কথাটি বিশেষ প্রচলিত। মূলধন বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি সেই টাকা যাহার সাহায্যে ব্যবসায় চালান যায়। কিন্তু অর্থশাস্ত্রে 'মূলধন' কথাটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। দেশে টাকার পরিমাণ বাড়িয়া গেলেই যে মূলধনের বৃদ্ধি হয় তাহা নহে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতবর্ষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যেরকমভাবে টাকার পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছিল, সেই অনুপাতে মূলধনের বৃদ্ধি হয় নাই। মূলধন বলিতে আমরা একদিকে যন্ত্রপাতি অথবা উৎপাদনের সাজসরঞ্জাম বুঝি। অষ্ট্রিয়ান অর্থবিজ্ঞানীগণ মূলধনের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন. "মূলধন হইতেছে উৎপাদনের একটি উৎপাদিত উপকরণ।" ("Capital is a produced means of production")।

টাকা মূলধন কিনা

টাকার সাহায্যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ভোগ-সামগ্রী ক্রয় করি ততক্ষণ পর্যন্ত টাকা উৎপাদনের কোন কাজে লাগে না। যখন টাকার সাহায্যে আমরা উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ (যথা, শ্রমশক্তি, জমি ইত্যাদি) ক্রয় করি, এবং ইহার সাহায্যে মূলধন সামগ্রী ক্রয় করি, তখন টাকা মূলধন বৃদ্ধির সহায়ক হয়। কিন্তু এইজন্য টাকাকে মূলধন বলা চলে না।

মূলধন ও ধনের পার্থক্য

মূলধন এবং ধনের মধ্যে পার্থক্য হইতেছে এই যে সব মূলধনই ধন, কিন্তু সব ধনই মূলধন নহে। যে ধন বা সম্পদ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অভাব পূরণের জন্য ভোগ-সামগ্রী ক্রয়ে ব্যবহৃত হয় সেই ধন মূলধন নহে। কিন্তু ধনের যে অংশ পুনরুৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়, সেই অংশকে মূলধন বলা চলে। সুতরাং কোন সম্পদ প্রকৃতই মূলধন কিনা তাহা বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে কি কাজে সম্পদটিকে ব্যবহার করা হইতেছে। ধরা

যাক, একটি বাড়ীতে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হইল, ইহা নিশ্চয়ই মূলধন নহে। কিন্তু যদি সেই বাড়ীতে কোন স্কুল প্রতিষ্ঠা না করিয়া একটি কারখানা স্থাপন করা হয় তবে বাড়ীটি মূলধন হিসাবে পরিগণিত হইবে।

স্থায়ী বা স্থাবর এবং চলতি বা অস্থাবর মূলধন (Fixed and Circulating Capital): মূলধনকে সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি হইতেছে স্থায়ী বা স্থাবর (Fixed Capital) এবং অপরটি হইতেছে চলতি বা অস্থাবর মূলধন (Circulating Capital)। যে সামগ্রী বহু দিন ধরিয়া এবং বারে বারে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা যায় সেই সামগ্রীকে স্থায়ী বা স্থাবর মূলধন বলা হয়। যেমন—চরকা, তাঁত, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি স্থায়ী মূলধন। আবার উৎপাদনের কাজে মাত্র একবার ব্যবহার করা চলে এই রকম সামগ্রীকে চলতি বা অস্থাবর মূলধন বলা হয়। যেমন—তুলা হইতে সূতা তৈয়ারী করা হইলে সেই সূতার সাহায্যে কাপড় তৈয়ারী করা হয়। সূতা তৈয়ারী হইয়া গেলে তুলার আর অস্তিত্ব থাকে না। এই তুলাকে আমরা চলতি বা অস্থাবর মূলধন বলিতে পারি। কিন্তু সূতা কাটিবার যন্ত্রটি একটি স্থায়ী মূলধন।

বিশিষ্ট মূলধন এবং অবিশিষ্ট মূলধন (Specialised or Sunk Capital and Unspecialised or Floating Capital): মূলধনের আর একটি প্রকারভেদ আছে,—তাহা অনুযায়ী যখন যন্ত্রপাতি মাত্র একটি বিশেষ শ্রেণীর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়, তখন ইহাকে বিশিষ্ট বা নিমজ্জমান মূলধন (Specialised or Sunk Capital) বলা হয়। যেমন—লৌহ তৈয়ারী করিবার কারখানায় যে চুল্লী ব্যবহৃত হয়, তাহা অন্য কোন শিল্পে ব্যবহার করা সম্ভব নহে। আবার যে সকল সামগ্রী শুধু একটি বিশেষ শ্রেণীর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত না হইয়া অনেকগুলি জিনিসের উৎপাদনে ব্যবহৃত হইতে পারে, সেই সামগ্রীগুলিকে নির্বিশেষ বা ভাসমান মূলধন (Unspecialised or Floating Capital) বলা হয়।

ভোগকারীর মূলধন এবং উৎপাদনের মূলধন (Consumer Capital and Producer Capital): ভোগকারীর মূলধন বলিতে আমরা বুঝি এমন মূলধন যাহা উৎপাদনের সময় লোকে ভোগ করে। উৎপাদনের সময় ভোগকারীগণ খাদ্য, বাসস্থান, পোষাক ইত্যাদি যাহা কিছু ভোগ করে তাহাই ভোগকারীর মূলধন (Consumer Capital)। উৎপাদকগণ যে সমস্ত মন্ত্রপাতি, কলকব্জা বা অন্যান্য সরঞ্জাম ব্যবহার করে সেগুলি হইতেছে উৎপাদকের মূলধন (Producer Capital)।

উপরে মূলধনের যে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে, তাহা সামাজিক মূলধনের বিভিন্ন রূপ। সামাজিক মূলধন (Social Capital) বলিতে আমরা বুঝি সেই মূলধন যাহা হইতে সমাজের আয়ের সৃষ্টি হয়। আর এক প্রকার মূলধন আমরা দেখিতে পাই, তাহা হইতেছে ব্যক্তিগত মূলধন (Private or Personal Capital)। লোকেরা যে

সকল জিনিস হইতে আয় করে, যেমন বাসগৃহ, কোম্পানীর কাগজ, দোকানপাট, সেইগুলিকে আমরা ব্যক্তিগত মূলধন বলি। সামাজিক মূলধনের সহিত ব্যক্তিগত মূলধন যোগ করিলে আমরা জাতীয় মূলধনের (National Capital) পরিমাপ করিতে পারি।

জমি ও মূলধনের মধ্যে সাদৃশ্য এবং পার্থক্য : জমি ও মূলধনের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়। মূলধনের ন্যায় জমিও ক্ষয়িষ্ণু। মূলধনের ব্যবহার চলিতে থাকিলে উহার উৎপাদনী শক্তি একদিন না একদিন কমিয়া আসে সেইপ্রকার জমিরও ব্যবহার চলিতে থাকিলেও একদিন না একদিন উহার উর্বরতা কমিয়া আসে। মূলধন যেরূপ নূতন সৃষ্টি করা যায়, জমি সেই প্রকার নূতন সৃষ্টি করা যায় না বটে, কিন্তু, মানুষ নিজের পরিশ্রমে জমির উর্বরতা এবং উৎপাদনীশক্তি বাড়াইতে পারে। জমি ও মূলধনের মধ্যে এই সাদৃশ্য থাকিলেও ইহাদের মধ্যে পার্থক্যই বেশী। প্রথমত, জমি হইতেছে একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। কিন্তু মূলধন হইতেছে একটি উৎপাদিত উপাদান। দ্বিতীয়ত, জমির যোগান সীমাবদ্ধ; ইচ্ছামত ইহাকে বাড়ানো বা কমানো যায় না। তৃতীয়ত, মূলধন যদি বারবার ব্যবহার করা হয় তবে ইহা হয়ত নষ্ট হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু জমি যদি বারবার ব্যবহার করা হয়, উহার উর্বরতা শেষ পর্যন্ত কমিলেও উহা কখনই নষ্ট হইয়া যাইবে না। চতুর্থত, মূলধন স্থানান্তরযোগ্য। কিন্তু জমি স্থানান্তরযোগ্য নয়। সবশেসে, মূলধন হইতে আমরা যে আয় পাই, তাহা সব ক্ষেত্রেই এক প্রকার (uniform)। কিন্তু জমি হইতে প্রাপ্ত খাজনা সব জমির ক্ষেত্রে একপ্রকার নয়। জমির প্রকার ভেদে খাজনারও তারতম্য ঘটে।

মূলধনের কাজ (Functions of Capital) **:** আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় মূলধনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূলধনের দুইটি বিশেষ গুণ আছে—একটি হইতেছে ইহার বর্তমান উৎপাদনী শক্তি (Productivity) এবং অপরটি হইতেছে ইহার ভবিষ্যৎ উৎপাদনীশক্তি। মূলধন বিনিয়োগ করিলে বিনিয়োগকারী শুধু বর্তমানের জন্যই নহে, ভবিষ্যতের জন্যও মুনাফার আশা করিয়া থাকে। চিরাচরিত উৎপাদন প্রথার পরিবর্তে বর্তমানে উন্নত ধরণের উৎপাদন প্রথা চালু হইয়াছে। গরু এবং লাঙ্গলের সাহায্যে যতটা ফসল উৎপন্ন হয়, ভারী ট্র্যাক্টরের সাহায্যে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী ফসল উৎপন্ন করা যাইতে পারে। সুতরাং মূলধনের প্রথম এবং প্রধান কাজ হইতেছে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। আধুনিককালে বৃহদায়তন ব্যবস্থা চালু করিয়া দেশের শিল্পোন্নয়ন অর্জন করার মধ্যে মূলধনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অস্থাবর মূলধন বিভিন্ন শিল্পে কাঁচামাল সরবরাহ করিয়া করিয়া থাকে। দৈনন্দিন জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিস আমরা অস্থাবর মূলধন হইতে পাই। মূলধনের আর একটি কাজ হইতেছে উৎপাদন পদ্ধতিকে পরোক্ষ করা। দৈনন্দিন জীবনে আমাদের বিভিন্ন অভাব পূরণ করিবার জন্য সরাসরিভাবে কোন জিনিস উৎপাদন

করিবার কাজে আত্মনিয়োগ না করিয়া আমরা প্রথমে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি উৎপন্ন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণে আত্মনিয়োগ করিতে পারি।

মূলধনের বিনিয়োগ হইলে উৎপাদন বাড়ে, উৎপাদন ব্যয় কমে, জিনিস পত্রের দাম কমিয়া যায়, সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় এবং সূক্ষ্মভাবে শ্রমবিভাগ করাও সম্ভবপর হয়।

মূলধনের আর একটি বিশেষ কাজ হইতেছে অনুন্নত দেশগুলির আর্থিক উন্নতিসাধনে সহায়তা করা। উদাহরণস্বরূপ ভারতবর্ষের কথা ধরা যাক। ভারতের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। কৃষকদের আয় খুব অল্প, কারণ চিরাচরিত পদ্ধতি অনুযায়ী উৎপাদন কাজ চালাইয়া যাওয়ায় তাহাদের উৎপাদন খুব অল্প হয়। আধুনিক ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করিলে তাহাদের উৎপাদন ও আয় বাড়িতে পারে। সুতরাং কৃষকদের হাতে মূলধনের পরিমাণ বাড়িলেই তাহাদের আয়ের বৃদ্ধি হইবে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে। দেশের দ্রুত শিল্পোন্নয়ন দ্রুত মূলধন বৃদ্ধির হারের উপর নির্ভর করে।

মূলধন সঞ্চয় (Accumulation of Capital) **:** মূলধন বৃদ্ধি মূলতঃ সঞ্চয়-বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। সঞ্চয় বলিতে শুধু টাকা জমানো বুঝায় না। সঞ্চয় বলিতে আমরা সহজে উৎপাদনের উপকরণগুলিকে কিছু পরিমাণে ভোগের কবল হইতে মুক্ত করিয়া বিনিয়োগের কাজে এবং মূলধন সৃষ্টির কাজে নিয়োগ করাও বুঝি। মূলধন সৃষ্টি সম্ভবপর হয় তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে। প্রাথমিক পর্যায়ে মূলধন সৃষ্টির জন্য সঞ্চয়ের সৃষ্টি করা আবশ্যক ; সঞ্চয়ের সৃষ্টি দুইটি উপাদানের উপর নির্ভরশীল। একটি হইতেছে সঞ্চয়কারীর সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা (will to save) এবং অপরটি হইতেছে সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা (power to save)। সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তি সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কারণের উপর নির্ভর করে—(১) ভবিষ্যতের সংস্থান করিবার জন্য সাবধানী এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ আয়ের কিছু অংশ সঞ্চয় করিতে চায়। (২) নিজের আপনজনের প্রতি স্নেহ-ভালবাসাও মানুষকে সঞ্চয় করিবার প্রেরণা দেয়। (৩) ভবিষ্যতে ব্যবসায়ের লেনদেনের জন্য প্রয়োজন হইতে পারে এই ধারণা হইতেও লোকে সঞ্চয় করে। (৪) যাহারা ব্যবসায়ী তাহাদের কিছু টাকা সর্বদাই সঞ্চিত রাখিতে হয় যাহাতে ভবিষ্যতে কোন লাভজনক ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ আসিলে টাকার অভাব না হয়। তাহা ছাড়া ফাট্‌কা কারবারীদেরও নিজেদের ফাটকা ব্যবসায় চালাইয়া যাইবার জন্য কিছু টাকা সর্বদা সঞ্চিত রাখিতে হয়। (৫) উচ্চাকাংখা এবং সমাজে সম্মান প্রতিপত্তি লাভের দুর্বার আকর্ষণ হইতেও লোকে টাকা সঞ্চয় করিতে চায়। (৬) সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা প্রধানতঃ নির্ভর করে সঞ্চয়কারীর আয়ের উপর। আয় অর্জিত হইলে লোকে প্রথমেই একান্ত প্রয়োজনীয় ভোগসামগ্রীগুলি ক্রয় করে এবং ইহার পর কিছু টাকা সঞ্চয় করে। কতটা টাকা সঞ্চয় করা সম্ভবপর তাহা নির্ভর করে সঞ্চয়কারীর আয়ের উপর। (৭) যদি জনসাধারণ নির্ভয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যাংক, বীমা-

কোম্পানী, শেয়ার প্রভৃতিতে টাকা জমা রাখিতে পারে তবে তাহাদের সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তি বাড়ে। (৮) যদি ব্যাংকের সুদের হার বাড়িয়া যায়, তবে আমানতকারীর সঞ্চয়ের প্রবৃত্তিও বাড়িয়া যায়। (৯) যদি দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং ব্যাংক ব্যবস্থার ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব (stability) থাকে তবে লোকের সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি বাড়িয়া যায়।

সঞ্চয় করিবার ক্ষমতাও নির্ভর করে আয়ের উপর। যাহারা বড়লোক তাহারা যে পরিমাণ সঞ্চয় করিতে পারে, গরীব লোকেরা সেই পরিমাণ সঞ্চয় করিতে পারে না। শ্রমিকেরা বেশী সঞ্চয় করিতে পারে না, কারণ তাহাদের মজুরি-হার সাধারণতঃ অল্প থাকে। যাহারা গরীব, তাহাদের ভোগ করিবার প্রবণতা বেশী থাকে; কারণ, তাহাদের যে পরিমাণ অভাব, সেই পরিমাণে অভাব দূর করিবার মত আর্থিক সঙ্গতি থাকে না। কিন্তু যাহারা বড়লোক তাহাদের সঞ্চয় করিবার প্রবণতাও বেশী, ক্ষমতাও বেশী। মূলধন সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে সঞ্চয় সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। মূলধন সৃষ্টির দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রয়োজন দেশের সমুদয় সঞ্চয়ের একত্রীকরণ করা বা সংহতি সাধন করা। তৃতীয় পর্যায়ে এই সঞ্চয়কে বিনিয়োগ করিতে হয়। সঞ্চয়কে যখন বিনিয়োগ করা হয় তখনই মূলধনের বৃদ্ধি ঘটে। অনুন্নত দেশগুলিতে আমরা যে প্রচ্ছন্ন বেকার অবস্থা দেখিতে পাই তাহার সমাধান করিতে পারিলেও অনেক টাকা বাঁচিয়া যায় এবং ইহাতে সঞ্চয়ের বৃদ্ধি হয়।

অনগ্রসর দেশগুলিতে মূলধন সৃষ্টির সমস্যা (Problems of capital formation in underdeveloped economies): অনগ্রসর দেশগুলিতে মূলধন সৃষ্টির আলোচনা করিবার সময় আমাদের প্রথমেই সেই দেশগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য জানিতে হইবে। অনগ্রসর দেশ বলিতে আমরা বুঝি এমন একটি দেশ যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় এবং প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মূলধন সৃষ্টির হার অত্যন্ত অল্প। এই দেশগুলি মূলতঃ কৃষিপ্রধান এবং ইহাদের গ্রামাঞ্চলে দেশের অধিকাংশ লোক কোনরকমে জীবনধারণ করে। এই অঞ্চলকে "Subsistence sector" বলা হয়। এই দেশগুলিতে মূলধনসৃষ্টির হার খুব কম। কারণ, জাতীয় আয়ের পরিমাণ, জনপ্রতি আয়ের পরিমাণ শ্রমিকদেরই উৎপাদনীশক্তি, মূলধনের পরিমাণ এবং সঞ্চয়ের পরিমাণ খুবই কম।

অনগ্রসর দেশগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য

অনগ্রসর দেশগুলির গ্রামাঞ্চলে আমরা এক ধরণের বেকার সমস্যা দেখিতে পাই, ইহাকে প্রচ্ছন্ন বেকার অবস্থা (Disguised unemployment) বলে। ক্ষুদ্র জমিতে যতজন লোকের চাষ করা উচিত, জনসংখ্যার চাপে তাহা অপেক্ষা বেশী লোক সেই জমিতে চাষ করে বলিয়া অতিরিক্ত শ্রমিকদের কাজ অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। অথচ, তাহাদের যদি কৃষিক্ষেত্র হইতে সরাইয়া আনিয়া শিল্পক্ষেত্রে নিয়োগ করা যায়, তবে কৃষির উৎপাদন কমিবে না, অথচ শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়িবে। এই অতিরিক্ত

শ্রমিকগণ এক ধরণের বেকার ; তাহারা বেকার ঠিক কাজের অভাবে নহে, কারণ কাজে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও তাহাদের কাজ অনাবশ্যক বলিয়াই তাহারা প্রচ্ছন্নভাবে বেকার হিসাবে পরিগণিত হয়। এই প্রচ্ছন্ন বেকার অবস্থা ছাড়াও অনগ্রসর দেশে আমরা আর এক ধরণের বেকার অবস্থা দেখিতে পাই, ইহাকে মরশুমী বেকার অবস্থা (Seasonal unemployment) বলা হয়। কৃষকগণ বৎসরের সকল সময় কাজে লিপ্ত থাকে না, জমি হইতে একটি ফসল উঠাইবার পর অন্য একটি ফসল না হওয়া পর্যন্ত তাহারা কর্মহীন হইয়া বসিয়া থাকে ; অথচ এমন কোন পার্শ্ববর্তী বা পরিপূরক কাজের ব্যবস্থা থাকে না যাহাতে তাহারা কাজ পাইতে পারে। তাহাদের এইভাবে বসিয়া থাকাকে মরশুমী বেকার অবস্থা বলা হয়। অনুন্নত দেশের উৎপাদন পদ্ধতিও অত্যন্ত অনুন্নত।

অনগ্রসর দেশের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে শ্রমিকদের কারিগরী কর্মকুশলতার অভাব। স্বল্প আয়, জীবনযাত্রার নীচু মান এবং দেশে কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্রের বা কারিগরী বিদ্যালয়ের অভাবহেতু অনগ্রসর দেশের শ্রমিকদের কারিগরী জ্ঞানও অল্প থাকে।

অনগ্রসর দেশগুলির বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাব-নিকাশ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে এই দেশগুলি হইতে সস্তা দরে বিভিন্ন কাঁচামাল বিদেশে চলিয়া যায় এবং বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় ভোগ সামগ্রী এই দেশে আসে। ইহাতে বাণিজ্যের অবস্থা প্রায়ই প্রতিকূল থাকে। অনগ্রসর দেশগুলির উপর এতকাল বিদেশী প্রভুত্ব থাকায় ফলেই এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।

সর্বশেষে অনগ্রসর দেশগুলিতে জনসাধারণের উপজীবিকার মধ্যেও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। জনসাধারণের উপজীবিকা সাধারণতঃ তিন প্রকার ; যথা,— কৃষিক্ষেত্র, শিল্পক্ষেত্র এবং কারণিক অথবা শাসন সংক্রান্ত (Clerical or Administrative)। প্রথমটিকে প্রাথমিক উপজীবিকা (Primary Occupation) বলা হয়। দ্বিতীয়টি হইতেছে মাধ্যমিক উপজীবিকা (Secondary Occupation) এবং তৃতীয়টি হইতেছে "Tertiary Occupation". অনগ্রসর দেশগুলিতে জনসাধারণ অধিকাংশই প্রাথমিক উপজীবিকার কাজ গ্রহণ করে। দেশে যতই অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়, ততই শিল্পক্ষেত্রে অথবা অন্যান্য ক্ষেত্রে লোকে বেশী করিয়া কাজ গ্রহণ করে।

অনগ্রসর দেশের মূলধন সৃষ্টির উপায় (Requirements for capital formation of an underdeveloped country) : অনগ্রসর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রথমেই জাতীয় আয় বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে। জাতীয় আয় বাড়াইতে হইলে দেশের শিল্পগুলিকে উন্নত করিতে হইবে। সুতরাং অনগ্রসর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান উপায় হইল দেশের দ্রুত শিল্পায়ন যাহাতে সম্ভবপর হইতে পারে সেইজন্য একটি পরিকল্পিত কর্মসূচী তৈয়ারী করা।

যাহাতে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন সম্ভবপর হইতে পারে, সেইজন্য শিল্প শ্রমিকদের কারিগরী

কর্মকুশলতা বাড়াইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে অধিকসংখ্যক কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত এবং বিদেশী কারিগরী বিশেষজ্ঞদের সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। তাহা ছাড়া, দ্রুত শিল্পোন্নয়নের অর্থ হইল বেশী করিয়া মূলধন সৃষ্টির ব্যবস্থা করা। মূলধন সৃষ্টি নির্ভর করে, (১) সঞ্চয়ের সৃষ্টি (Creation of Savings), (২) সঞ্চিত আর্থিক সম্পদের একত্রীকরণ বা সংহতিকরণ (Mobilisation of Savings) এবং (৩) সঞ্চয়ের উপযুক্ত বিনিয়োগের (Investment of Savings) উপর। সঞ্চয় বাড়াইবার জন্য ভোগ সামগ্রীর উপর খরচের পরিমাণ কমান যাইতে পারে।

দ্বিতীয়ত, অনগ্রসর দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিদেশী সাহায্য বা সহযোগিতার প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক ব্যাংক বা বিশ্ব ব্যাংক (World Bank) প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে বিদেশী মূলধন গ্রহণে অনুন্নত দেশের জনসাধারণের অনিচ্ছা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। শুধু আর্থিক সাহায্যই নহে, বিদেশ হইতে কারিগরি সহযোগিতাও (Technical Co-operation) লাভ করা যাইতে পারে।

তৃতীয়ত, অনগ্রসর দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না যদি বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গৃহীত না হয়। প্রচ্ছন্ন বেকার সমস্যা এবং মরশুমী বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য পার্শ্ববর্তী উপজীবিকা হিসাবে কুটীর ও গ্রামীণ ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে উন্নত করা যাইতে পারে। প্রচ্ছন্ন বেকার অবস্থার মধ্যে মূলতঃ কিছু পরিমাণ সঞ্চয় (Potential saving) নিহিত থাকে। যদি এই সমস্যার সমাধান করা যায়, তবে সঞ্চয় সৃষ্টির কাজ অনেক পরিমাণে সফল হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের গোড়ার কথা হইতেছে জনপ্রতি জাতীয় আয় বাড়ানো। এই উদ্দেশ্যে একদিকে যেমন জাতীয় আয় বাড়াইতে হইবে, অপরদিকে সেই প্রকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাইতে হইবে। উপরের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্যা মূলতঃ মূলধন সৃষ্টির সমস্যা। মূলধন সৃষ্টি প্রধানতঃ নির্ভর করে সঞ্চয়ের সৃষ্টি, সঞ্চয় সংগ্রহকরণ বা একত্রীকরণ এবং সঞ্চয়ের বিনিয়োগের উপর। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগের হার বাড়াইতে হইবে ; সঞ্চয় বাড়াইলেই বিনিয়োগের হার বাড়ানো সম্ভবপর। সেইজন্য অধ্যাপক লুইয়ের (Prof. Lewis) মতে অনগ্রসর দেশগুলিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল সমস্যা হইতেছে কি ভাবে সঞ্চয়ের পরিমাণ শতকরা ৫ অথবা ৬ ভাগ হইতে ১০ অথবা ১২ ভাগ পর্যন্ত বাড়ানো যায়। সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িলে ইহার সদ্ব্যবহার বা উপযুক্ত বিনিয়োগের প্রশ্ন উঠে। এই উদ্দেশ্যে অনুন্নত দেশগুলিকে বিদেশী কারিগরি বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় মূলধন বা যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে হয়। এইজন্য অনুন্নত দেশগুলির সর্বদাই কিছু বিদেশী মুদ্রা সঞ্চয় করিয়া রাখা উচিত। বিদেশী মুদ্রা অর্জনের

অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল সমস্যা

উপায় হইতেছে দেশের যে সমস্ত জিনিসের জন্য বিদেশে ভাল চাহিদা আছে, সেইগুলির উৎপাদন বাড়াইয়া রপ্তানির ব্যবস্থা করা। তাহা ছাড়া, বৈদেশিক ঋণের সাহায্যেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো যাইতে পারে।

কিন্তু গড় উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ ফলপ্রসূ নাও হইতে পারে যদি সেই সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রিত করা না হয়। ভারতে পরিকল্পনা কমিশন পরিবার পরিকল্পনার (Family Planning) নীতি কার্যকর করিবার জন্য বিশেষভাবে সুপারিশ করিয়াছেন। যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো যায়, তবে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রতি আয় বাড়িয়া যাইবে এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান ও সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলিতে শুধু গুরুভার শিল্পগুলির উন্নয়ন বা যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা স্থাপন বুঝায় না। সমাজ সেবার ব্যবস্থা না থাকিলে এবং সামাজিক কল্যাণ (Social welfare) বৃদ্ধির প্রচেষ্টা না থাকিলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিরর্থক হইয়া পড়ে। দেশে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র (Welfare State) প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে দেশে জাতীয় আয়ের অসম বণ্টন কমাইতে হইবে, উপযুক্ত শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করিতে হইবে, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করিতে হইবে, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ ও জলসেচের ব্যবস্থা করিয়া জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীদের নাগরিক জীবনের সমুদয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিতে হইবে। এই ব্যবস্থাগুলি অবলম্বিত হইলে সামাজিক মূলধনের (social capital) পরিমাণ বাড়িবে এবং একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হইবে। এই কাজে সরকারী হস্তক্ষেপের খুবই প্রয়োজন এবং সেই জন্যই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক উন্নয়নের আর্থিক চাহিদা (Financial requirements) মিটাইবার সময় সরকারকে জনসাধারণের উপর কর ধার্য করিতে হয় অথবা জনসাধারণের নিকট হইতে টাকা ধার করিতে হয়। তাহা ছাড়া, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে নূতন টাকা ছাপাইয়াও সরকার এই কাজে অগ্রণী হইতে পারে।

Exercise

1. **Define Capital. Is Money Capital? Distinguish between Wealth and Capital.** [মূলধনের সংজ্ঞা প্রদান কর। টাকা কি মূলধন? সম্পদ ও মূলধনের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।] (৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা)

2. **Distinguish between (a) Fixed and circulating capital. (b) Specialised capital and Unspecialised capital, (c) Consumer capital and Producer capital. Is land capital?** [(ক) স্থাবর এবং অস্থাবর মূলধন, (খ) বিশিষ্ট এবং অবিশিষ্ট মূলধন, এবং (গ) ভোগকারীর মূলধন ও উৎপাদকের মূলধনের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। জমি কি মূলধন।] (৪৬-৪৮ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the functions of Capital. Discuss the conditions on which the supply of capital in a country depends. [মূলধনের কাজ আলোচনা কর। কোন দেশে মূলধনের যোগান যে সর্তগুলির উপর নির্ভরশীল সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।] (৪৭-৪৯ পৃষ্ঠা)

4. Discuss the problems of and the requirements for capital formation in underdeveloped countries. [অনুন্নত দেশগুলিতে মূলধন সৃষ্টির সমস্যা এবং মূলধন সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।] (৪৯-৫২ পৃষ্ঠা)

সপ্তম অধ্যায়

উৎপাদনের সংগঠন
(Organisation of Production)

উদ্যোক্তার কাজ (Functions of an Entrepreneur): আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে পূর্ণ সংহতি আনয়ন করিবার, উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয় মূল্য নিরূপণ করিবার এবং সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার জন্য নীতি নির্ধারণ করিবার প্রয়োজন সর্বদাই অনুভূত হয়, এবং এই কাজগুলি যিনি অথবা যাঁহারা সম্পাদন করেন, তাঁহাকে বা তাঁহাদের উদ্যোক্তা বা ব্যবস্থাপক (entrepreneur) বলা হয়।

উদ্যোক্তা কাহাকে বলে?

উদ্যোক্তাকে অনেক কাজ করিতে হয়। ব্যবসায় আরম্ভ হইবার অনেক আগেই উদ্যোক্তাকে ব্যবসায়ের সব রকম সম্ভাব্য খরচ সম্পর্কে হিসাব তৈয়ারী করিতে হয় এবং কি আয়তনে উৎপাদন করিতে হইবে তাহা স্থির করিতে হয়। দ্বিতীয়ত, উদ্যোক্তাকে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল, যন্ত্রপাতি, শ্রমিক এবং জমি ইত্যাদি উপকরণ সংগ্রহ করিতে হয় এবং সেইগুলির সদ্ব্যবহার করিতে হয়। ব্যবসায় হইতে যে আয় হয় তাহা হইতে জমির জন্য খাজনা, মূলধনের জন্য সুদ, শ্রমিকের জন্য মজুরি উদ্যোক্তাকেই প্রদান করিতে হয় এবং সেই বিষয়ে সমুদয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। তৃতীয়ত, উদ্যোক্তার প্রধান কাজ হইতেছে ব্যবসায়ের বিনিয়োগ এবং অন্যান্য ব্যাপারে ঝুঁকি গ্রহণ করা। সব রকম ব্যবসায়েই লাভের আশার সহিত লোকসানেরও আশংকা থাকে। যদি কোন ব্যবসায়ে লোকসান হয়, তবে সেই লোকসানের সমুদয় ঝুঁকি উদ্যোক্তাকেই বহন করিতে হয়। চতুর্থত, শিল্প-ব্যবস্থার এবং কোন শিল্পের উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির

উদ্যোক্তার বিভিন্ন কাজ

জন্য নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করা অথবা নানাপ্রকার গবেষণামূলক কাজকর্মের সাহায্যে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা করা ইত্যাদিও উদ্যোক্তারই কাজ। সর্বাপেক্ষা কম খরচে কি ভাবে 'কাম্য উৎপাদন' (optimum output) করা যায় সেই চেষ্টা উদ্যোক্তাকেই করিতে হয়। এইজন্য উদ্যোক্তাকে চেষ্টা করিতে হয় নূতন পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করিয়া যাহাতে উৎপাদন বাড়ান যায় এবং উৎপাদন ব্যয় কমান যায়। অনেক ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা উৎপাদন ব্যবস্থার নূতনত্ব (Innovation) উদ্ভাবন করেন। বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে যাহাতে পূর্ণ সমন্বয় রক্ষিত হয় সেই চেষ্টাও, উদ্যোক্তা করিয়া থাকেন।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্যোক্তার গুরুত্ব খুবই বেশী। ক্রেতাদের বিভিন্ন ধরণের পছন্দ, কোন জিনিসের ভবিষ্যৎ চাহিদা, কাঁচামালের ভবিষ্যৎ দাম, বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনিশ্চয়তার মধ্যেই উদ্যোক্তাকে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-নীতি, বিক্রয়-করণ নীতি এবং মূল্যনীতি স্থির করিতে হয়।

যৌথ মূলধনী ব্যবসায় (Joint-Stock Business) : আধুনিক কালে যৌথ-মূলধনী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ প্রচলিত। বহুলোক কোন কোম্পানীর শেয়ার অথবা অংশপত্র কিনিয়া উক্ত কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডার হইতে পারেন। শেয়ার-হোল্ডারগণ নিজেদের মধ্য হইতে একটি পরিচালক-সভা বা Board of Directors নির্ধারিত করেন। এই পরিচালক সভাই শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষ হইতে সমগ্র শিল্পটি পরিচালনা করেন এবং উদ্যোক্তার ন্যায় ব্যবসায়ের সমুদয় ঝুঁকির দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ের শেয়ারহোল্ডারদের দায় সীমাবদ্ধ (Limited Liabilities)। অর্থাৎ, কোন শেয়ারহোল্ডার যত অংশ শেয়ার ক্রয় করেন, শিল্পের ঋণের সেই অংশের জন্য তাহাকে ঋণ বহন করিতে হয়।

যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ে মূলধন সংগ্রহের উপায় (Ways of raising capital for Joint-Stock Company): যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ে আমরা চারপ্রকার মূলধন দেখিতে পাই। প্রথমত, এই জাতীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান শেয়ার বিক্রয় করিয়া যে পরিমাণ টাকা তুলিয়া ব্যবসায় শুরু করিবার অনুমতি সরকারের নিকট হইতে লাভ করে তাহাকে অনুমোদিত মূলধন (Authorised Capital) বলে। এই অনুমোদিত মূলধনের যে পরিমাণ মূল্যের শেয়ারবিক্রয়ের জন্য বাজারে চালু করা হয়, তাহাকে ইস্যু মূলধন (Issued Capital) বলা হয়। এই ইস্যু মূলধনের যে পরিমাণ বাজারে বিক্রীত হয় তাহাকে বিক্রীত মূলধন (Subscribed Capital) বলা হয়। ক্রয় করিতে প্রতিশ্রুত এই প্রকার শেয়ারের যে পরিমাণ মূল্য প্রকৃতপক্ষে অংশীদারগণের নিকট হইতে আদায় করা হয় তাহাকে আদায়ীকৃত মূলধন (Paid-up Capital) বলা হয়।

যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ের চারপ্রকার মূলধন

যৌথ-মূলধনী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণতঃ দুইটি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ

করে। প্রথমত, শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করা যাইতে পারে। যাঁহারা শেয়ার ক্রয় করেন তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির মালিক এবং ব্যবসায়ের সমুদয় ঝুঁকি সীমাবদ্ধ পরিমাণে তাঁহাদেরই বহন করিতে হয়। যদি ব্যবসায়ে লাভ হয় তবে বৎসরের শেষে তাঁহাদের শেয়ার অনুযায়ী তাঁহারা লভ্যাংশ (Dividend) পাইয়া থাকেন।

মূলধন সংগ্রহের উপায়

দ্বিতীয়ত, যৌথ-মূলধনী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি ঋণপত্র বা বণ্ড (Bonds) বা ডিবেঞ্চার (Debentures) বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিয়া থাকে। যাহারা ডিবেঞ্চার বা ঋণপত্র ক্রয় করে, তাহারা প্রতিষ্ঠানের মহাজন। তাহাদের নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করিতে হয়। যদি কোন বৎসর যৌথ-মূলধনী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লোকসান হয়, তবুও ইহাকে ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার ক্রেতাদের সুদ প্রদান করিতে হয়। এই ঋণপত্র অনুসারে ঋণ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গ্রহণ করা হয় এবং এই সময়টি অতিক্রান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঋণ শোধ করা হয়।

যে সকল শেয়ার যৌথ-মূলধনী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি কর্তৃক বিক্রীত হয় সেইগুলি দুই প্রকারের যথা—সাধারণ (Ordinary) এবং অগ্রাধিকার মূলক শেয়ার (Preferential share)। অগ্রাধিকারমূলক শেয়ারের মালিকগণকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জিত হইলে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। যদি কোন বৎসর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কোন লাভ না হয়, তবে এই প্রকার শেয়ারের বিপক্ষে কোন কিছুই দেওয়া হয় না, কিন্তু যদি অগ্রাধিকারমূলক শেয়ারগুলি সঞ্চয় মূলক (Cumulative) হয়, তবে কোন বৎসর লভ্যাংশ প্রদান না করা হইলে পরবর্তী বৎসরে আগেকার বৎসরের পাওনা লভ্যাংশ দিতে হয়। আগে সঞ্চয়মূলক শেয়ারগুলির মালিকদের লভ্যাংশ প্রদান করিতে হয়। তাহাদের লভ্যাংশ প্রদান করিবার পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদান করা যায়। যদি কোন বৎসর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির মুনাফা অর্জিত হয়, তবেই সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণ কিছু লভ্যাংশ পাইবার আশা করিতে পারে।

দুই প্রকার শেয়ার, সঞ্চয়মূলক এবং অগ্রাধিকারমূলক, শেয়ারের সুবিধা

যৌথ মূলধনী কারবারের সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and Demerits of a Joint-Stock Company): যৌথ মূলধনী কারবারের কতিপয় সুবিধা ও অসুবিধা আছে। প্রথমত, যৌথ-মূলধনী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে মূলধন সংগ্রহ করা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি অপেক্ষা কিছু সহজ। বর্তমানে কোন দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। এইজন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন। কিন্তু এক-মালিকানা কারবার অথবা অংশীদারী কারবারে প্রচুর পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব নহে। যৌথ মূলধনী কারবারে প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারদের দায় সীমাবদ্ধ বলিয়া একজনের দোষে অপর আর একজনকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। সেইজন্য বড়লোকদের পক্ষে

যৌথ মূলধনী কারবারের সুবিধা

যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ে নিরাপদে মূলধন বিনিয়োগ করা অথবা শেয়ার ক্রয় করা সম্ভবপর হয়। দ্বিতীয়ত, যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ে অন্য কারবার অপেক্ষা বেশী পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করা যায় বলিয়া বিনিয়োগের পরিমাণও বেশী হয়। ইহাতে উৎপাদন খরচ কমিয়া যায়। তৃতীয়ত, এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বেশী মাহিনা প্রদান করিয়া কর্মকুশল কারিগর বা দক্ষ শ্রমিকদের নিয়োগ করা সম্ভবপর। ইহাতে উৎপাদনের পরিমাণই যে বাড়ে তাহা নহে, উৎপাদিত সামগ্রীর মানও যথেষ্ট উন্নত হয়। সামগ্রিক ভাবে ইহাতে শিল্পের উৎপাদনীশক্তি (Productivity) বাড়ে। সর্বশেষে, যৌথ-মূলধনী কারবারের মূলধনের পরিমাণ অন্য কারবার হইতে অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়ায় শিল্পক্ষেত্রে বৃহদায়তন উৎপাদনের সমুদয় সুবিধা ভোগ করা সম্ভবপর। অনেকক্ষেত্রে বড় বড় যৌথ-মূলধনী কারবারের সাহায্যে নূতন ধরণের উৎপাদন পদ্ধতি এবং যন্ত্রপাতির আবিষ্কার সম্ভবপর হইয়াছে।

উপরোক্ত গুণগুলি থাকা সত্ত্বেও যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ে আমরা কতিপয় ত্রুটি দেখিতে পাই। প্রথমত, একটি যৌথ-মূলধনী কারবারে অনেক শেয়ারহোল্ডার থাকে।

যৌথ-মূলধনী কারবারের অসুবিধা

তাহাদের পক্ষে ব্যবসায় পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে। যদি পরিচালক সভার (Board of Directors) সদস্যগণ খুব সৎ প্রকৃতির না হন, তবে শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে। দ্বিতীয়ত, এই ধরণের ব্যবসায় সাধারণতঃ বৃহদায়তন হওয়ায় কারবারের প্রকৃত মালিক, অর্থাৎ শেয়ারহোল্ডার অথবা পরিচালকসভার সদস্যগণের সহিত কর্মচারীদের প্রকৃত যোগাযোগ থাকে না। ইহাতে কর্মচারীদের পক্ষেও আন্তরিক ভাবে কাজ চালাইয়া যাওয়া সব সময়ে সম্ভব হয় না। আমরা আজকাল শিল্পবিরোধের প্রাচুর্য দেখিতে পাই, ইহার অন্যতম কারণ হইতেছে মালিক ও শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে প্রকৃত যোগসূত্রের অভাব। কারবারের সাফল্যের জন্য বেতনভুক্ কর্মচারীগণ যে সর্বদাই আন্তরিকভাবে পরিশ্রম করে তাহা নহে।

উপরোক্ত ত্রুটিগুলি থাকা সত্ত্বেও যৌথ-মূলধনী ব্যবসায় দিনের পর দিন জনপ্রিয়তা অর্জন করিতেছে। আজকাল অনেক সরকারী প্রতিষ্ঠানও যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের ব্যবসায় সংগঠন (Other different types of business organisation) :

এক মালিকানা কারবার (One-man Business) : যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের শুধু একজনই মালিক, তাহাকে এক মালিকানা কারবার বলে। ব্যবসায়ের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তিনিই উদ্যোক্তার কাজ করেন এবং ব্যবসায়ের সমুদয় ঝুঁকি ও দায়িত্ব বহন করেন। তিনি নিজেই প্রতিষ্ঠানের মালিক বলিয়া নিজের মূলধন নিজেই খাটান। উৎপাদন কত পরিমাণে হইবে এবং উৎপাদিত সামগ্রী কি দামে বিক্রীত হইবে, তাহাও তিনিই স্থির করেন। ব্যবসায়ে যদি লাভ হয় তবে তিনিই সম্পূর্ণ

লাভের অধিকারী হইবেন; আর যদি ব্যবসায়ে ক্ষতি হয়, তবে তাঁহাকেই সব ক্ষতির বোঝা বহন করিতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রে মালিক নিজেই শ্রমিকের ভূমিকা অবলম্বন করেন; অবশ্য ইহা দেখা যায় তখনই যখন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির আকার খুবই ছোট থাকে। এই ব্যবসায়ে একটি প্রধান সুবিধা হইতেছে এই যে এখানে ব্যবসায়ের মালিকানা ও পরিচালনা একই ব্যক্তির হাতে থাকায় শিল্পের উৎপাদনী শক্তি বাড়িয়া যায়। কিন্তু এক-মালিকানা কারবারের প্রধান ত্রুটি হইতেছে এই যে এই প্রকার ব্যবসায়ে মূলধনের খুব অভাব হয়। দেশের ব্যাংক অথবা অন্যান্য আর্থিক সংস্থাগুলি এই প্রকার ব্যবসায়কে টাকা ঋণরূপে প্রদান করিতে সর্বদা উৎসাহী হয় না। তাহা ছাড়া, উদ্যোক্তাদেরও যে সব সময় শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় বুদ্ধি থাকে তাহা নহে। অনেক সময় দেখা যায় কোন প্রতিষ্ঠানের মালিকের দোষে তাহার প্রতিষ্ঠান নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এইজন্য আজকাল জনসাধারণ অংশীদারী ব্যবসায় এবং বিশেষতঃ যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকিতেছে।

এক-মালিকানা ব্যবসার সুবিধা ও অসুবিধা

অংশীদারী কারবার (Partnership Business): অংশীদারী কারবারে কয়েকজন লোক মিলিত ভাবে মূলধন সরবরাহ করে এবং ব্যবসায়ের সমুদয় ঝুঁকি বহন করে। উৎপাদনের পরিমাণ অথবা দাম নির্ধারণ ইত্যাদি যাবতীয় কাজ অংশীদারগণ নিজেরাই স্থির করে। এই প্রকার ব্যবসায়ের প্রধান সুবিধা হইতেছে এই যে ইহাতে এক-মালিকানা ব্যবসায়ের তুলনায় অধিক পরিমাণে মূলধন পাওয়া যায়। ব্যবসায়ের ঝুঁকি ও লোকসানের দায়িত্বও শুধু একজনের থাকে না, ইহা কয়েকজন অংশীদারের মধ্যে তাহাদের অংশের পরিমাণ অনুযায়ী বণ্টিত হয়। অংশীদারের ব্যবসায়ে লাভ অথবা ক্ষতি হইতে পারে। কিন্তু ব্যবসায়ে যাঁহারা অংশীদার তাঁহাদের দায় অসীম (Unlimited liabilities)। এই ব্যবসায়ে মালিকানা ও ব্যবসায় পরিচালনা একই ব্যক্তির হাতে অর্পিত হয় বলিয়া উৎপাদন ব্যবস্থা অধিকতর দক্ষতার সহিত পরিচালিত হয়। অনেক সময় হয়ত একজন অংশীদারের অনেক মূলধন আছে দেখা যায় অথচ পরিচালনাগত কর্মকুশলতা নাই। তখন তিনি এমন আর একজন অংশীদার স্থির করিবেন যাহার পরিচালনগত কর্মকুশলতা আছে অথচ ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন নাই।

অংশীদারী কারবারে সুবিধা ও অসুবিধা

সমবায় (Co-operation): বর্তমানে আমরা আর এক ধরণের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাই যাহা সমবায়ের নীতির উপর ভিত্তিশীল। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ে যে সমস্ত ত্রুটি আমরা দেখিতে পাই সেইগুলি দূর করিবার পক্ষে সমবায়মূলক প্রতিষ্ঠান খুবই উপযোগী। সমবায়মূলক প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকরাই প্রতিষ্ঠানের মালিক; তাহারা নিজেরাই মূলধন, শ্রম, ভূমি প্রভৃতি উপকরণ সংগ্রহ করে এবং নিজেরা পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ব্যবসায় পরিচালনা করে। ব্যবসায়ের যে মুনাফা থাকে, তাহাতে সকলেরই অংশ থাকে। যদি কখনও লোকসান হয়, তবে

সকলেই ইহার বোঝা বহন করে। কয়েকজন লোক স্বেচ্ছায় ঐক্যবদ্ধ হইলেই সমবায়-মূলক প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়া সম্ভবপর। যখন কতিপয় লোক কোন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাম্যের ভিত্তিতে নিজেদের ইচ্ছায় ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন তাহারা সমবায় সমিতি (Co-operative Society) গঠন করিয়াছে বলা যায়। সমবায়ের কতিপয় মূলনীতি আছে। সেইগুলি হইতেছে একতা, সাম্য, সংহতি, নৈকট্য মিতব্যয়িতা ইত্যাদি। যে সকল লোক স্বেচ্ছায় একত্রিত হইয়া সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠন করে তাহাদের মধ্যে একতা (unity) ও সংহতি (solidarity) বজায় থাকা চাই। তাহাদের পরস্পরের নিকটে বাস করা চাই এবং খরচ করার সময় তাহাদের খুব মিতব্যয়ী হওয়া চাই। সততাই সমবায়ের মূল ভিত্তি।

সমবায়ের নীতি

সরকারী কারবার (State Management): আধুনিককালে সরকারী কারবারের দিকেও কোন কোন দেশে একটি ঝোঁক দেখা যায়। এই প্রতিষ্ঠানগুলি সরকার স্থাপন করেন। ইহার তহবিলের অর্থ আসে সরকার হইতেই; অনেক সময় সরকার জনসাধারণের নিকট শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়াও সরকারী কারবারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করেন। ভারতবর্ষে রেলওয়ে একটি সরকারী কারবার। পশ্চিমবঙ্গে স্টেট বাস সার্ভিস একটি সরকারী কারবার। সরকারই ইহার পরিচালনা করেন। সরকারী কারবারের সাফল্য নির্ভর করে সরকারী কর্মচারীদের কর্মকুশলতা ও সততার উপর। রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় প্রতিযোগিতার কোন প্রকার সম্ভাবনা থাকে না বলিয়া অর্থের অনেক অপচয় বন্ধ করার সুবিধা থাকে। কিন্তু, সরকারী কারবার পরিচালনার ব্যবস্থাও ত্রুটিহীন নয়। অনেক সময় সরকারী কর্মচারীদের আন্তরিকতা, কর্মক্ষমতা ও সততার অভাবে ইহাদের পরিচালনা ত্রুটিপূর্ণ হইয়া পড়ে। সরকারী কারবারের বিরুদ্ধে একটি যুক্তি হইতেছে এই যে ইহার ফলে ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত উদ্যম (Private incentives) ও উৎসাহ নষ্ট হয়। তাহা ছাড়া, নিয়মিত বাঁধাধরা কাজ করিতে করিতে সরকারী কর্মচারীদের পরিচালনগত যোগ্যতা অনেক ক্ষেত্রে কমিয়া যায়। তবুও বর্তমানে সরকারী কারবারের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। একটি দেশ যতই সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হইবে, সরকারী কারবারের সংখ্যাও ততই বাড়িবে।

সংগঠন কি একটি আলাদা উপাদান? (Is organisation a separate Factor of Production ?): আধুনিক লেখকদের মতে সংগঠন উৎপাদনের একটি আলাদা উপাদান নয়। তাঁহাদের মতে উদ্যোক্তা যে সকল কাজ করে সেইগুলিও এক-প্রকার শ্রম। প্রত্যেক শ্রমিককেই কিছু না কিছু সংগঠনের কাজ করিতে হয়. উদ্যোক্তা যে সকল কাজ করে সেগুলিও এক ধরণের শ্রম। উদ্যোক্তার কাজ এবং শ্রমের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা নিছক পরিমাণগত,—এই পার্থক্যকে মৌলিক পার্থক্য বলা যাইতে পারে না। উদ্যোক্তা ব্যবসায়ের ঝুঁকি বহন করে এবং এজন্য তাঁহার যে আয় হয়, তাহাকে আমরা মুনাফা বলি। সেই হিসাবে চিন্তা করিলে জমির মালিক অথবা

শ্রমিক প্রত্যেকেরই কাজের মধ্যে কিছু না কিছু ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকে। সেইজন্য জমির খাজনা এবং শ্রমের জন্য মজুরির মধ্যেও আমরা কিছু পরিমাণে মুনাফার অংশ আছে বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। তবে অর্থনৈতিক কাজগুলির বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য উদ্যোক্তাকে আমরা একটি পৃথক উপাদান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারি।

শ্রম-বিভাগ (Division of Labour): আধুনিক যুগে উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমেই জটিল হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু জটিল হইলেও উৎপাদন ব্যবস্থা সুষ্ঠভাবে চালনা করা যায় যদি ইহাতে শ্রম-বিভাগের (Division of Labour) ব্যবস্থা থাকে। উৎপাদনের কাজকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভাগ করিয়া প্রত্যেকটি অংশ পৃথক লোকের হাতে ছাড়িয়া দিলে সেই ব্যবস্থাকে শ্রম-বিভাগ বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাক্ বাটার জুতার দোকানে কতিপয় কর্মচারী আছেন যাঁহারা জুতা বিক্রয় করেন ; আবার কতিপয় কর্মচারী আছেন যাঁহারা প্রচার বিভাগে কাজ করেন। আবার কতিপয় কর্মচারী আছেন যাঁহারা জুতা তৈয়ারী করেন , সর্বশেষে কতিপয় কর্মচারী পরিশুদ্ধ চামড়া তৈয়ারী করা অথবা রং দেওয়ার বিভাগে কাজ করেন। এখানে আমরা শ্রম বিভাগ দেখিতে পাই। বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল এই যে উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রম-বিভাগ থাকিলে আমরা শ্রমিকের বিভিন্ন কাজে বিশেষ বৈশিষ্ট্য (Specialisation) দেখিতে পাই। শ্রম-বিভাগ আছে বলিয়াই বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে বিনিময় (Exchange) হয়। একজন শ্রমিক হয়ত একটি জিনিস তৈয়ারী করিল, অপর একজন শ্রমিক হয়ত আর একটি জিনিস তৈয়ারী করিল। তখন দুইটি জিনিসের মধ্যে প্রয়োজন হইলে বিনিময় করা সম্ভবপর। শুধু তাহাই নহে শ্রম-বিভাগে শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা (Co-operation) বজায় থাকে।

শ্রম-বিভাগের প্রকারভেদ (Different forms of Division of Labour): শ্রম-বিভাগ দুই প্রকার হইতে পারে যথা, সহজ শ্রম-বিভাগ ব্যবস্থা ও জটিল শ্রম-বিভাগ ব্যবস্থা। সহজ শ্রম-বিভাগকে আমরা দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারি, ব্যবসায় ও বৃত্তিগত বিভাগ (Division into trade and occupation) এবং সম্পূর্ণ পদ্ধতিতে শ্রম-বিভাগ (Division of labour into complete processes)। যদি একটি মুচী নিজেই চামড়া পরিষ্কার করিয়া জুতা তৈয়ারী করে এবং নিজেই ইহা বাজারে বিক্রয় করে, তবেই উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে আমরা সম্পূর্ণ শ্রম-বিভাগ পদ্ধতি দেখিতে পাই। কিন্তু, যদি মুচী নিজ হাতে সম্পূর্ণভাবে জুতা তৈয়ারী না করে এবং জুতা তৈয়ারী করিবার এক একটি অংশ যদি বিভিন্ন লোকের মধ্যে ভাগ করিয়া দেয়, তবে ইহাকে অসম্পূর্ণ পদ্ধতিতে শ্রম-বিভাগ (Division of labour into incomplete processes) বলা হয়। যখন দেখিতে পাই তাঁতী কাপড় বোনে অথবা কুমার মাটির খেলনা অথবা বাসন তৈয়ারী করে, তখন ইহাকে আমরা বৃত্তিগত বা ব্যবসায়গত শ্রম-বিভাগ বলি। আর এক ধরণের শ্রম-বিভাগ আছে, ইহাকে আমরা আঞ্চলিক

শ্রম-বিভাগ (Territorial division of labour) বলি। যেমন, বাংলাদেশে পাট উৎপন্ন হয় এবং মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের কালো মাটিতে তুলা উৎপন্ন হয়।

শ্রম-বিভাগের সুবিধা (Advantages of Division of Labour) **:** শ্রম-বিভাগের প্রধান সুবিধা হইল জটিল বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমেই সহজ হইয়া যায়; কোন বড় কারখানার যদিমাত্র একজন উদ্যোক্তা থাকিতেন তবে তাহার পক্ষে হয়ত এই কারখানার সমুদয় কাজ ব্যক্তিগতভাবে দেখাশোনা করা সম্ভবপর হইত না এবং ইহাতে উৎপাদনের কাজ ব্যাহত হইত। কিন্তু, শ্রম-বিভাগের ব্যবস্থা থাকিলে যে কোন ব্যবসায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভবপর। শিল্পোন্নয়নের যুগে শ্রম-বিভাগের গুরুত্ব ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে।

পরিচালনার সুবিধা

শ্রম-বিভাগের ফলস্বরূপ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। উৎপাদন ব্যবস্থা যতই বৃহদায়তন হইবে, শ্রম-বিভাগও তত বেশী হইবে। শ্রম-বিভাগের জন্য যে দুইটি জিনিসের বিশেষ প্রয়োজন, তাহা হইতেছে, বাজারের বিস্তার এবং অব্যাহত উৎপাদন।

উৎপাদন বৃদ্ধি

শ্রম-বিভাগের ফলে শ্রমিকগণ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে বিশেষ নৈপুণ্য (Specialisation) অর্জন করিয়া থাকে—ইহাতে একদিকে যেমন উৎপাদন ব্যবস্থার উৎকর্ষ বাড়ে, অপরদিকে সেইপ্রকার উৎপাদিত সামগ্রীগুলিও উন্নত ধরণের হয় এবং সেইজন্য সেইগুলি বিক্রয় করিবার সুযোগও যথেষ্ট বাড়িয়া যায়। শুধু কর্মনৈপুণ্যই নহে, শ্রম-বিভাগের ফলে শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতাও অনেক বাড়িয়া যায় এবং ইহাতে উৎপাদন-ব্যবস্থাও বিশেষ উন্নত হয়।

শ্রমিকদের কর্মকুশলতা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি

শ্রম-বিভাগের ফলে বর্তমান যান্ত্রিক যুগের উৎপাদনব্যবস্থা অনেক সহজ হইয়া গিয়াছে। কোন জিনিস উৎপাদনে অনেক সময় বাঁচান যায় যদি সেই উৎপাদন ব্যবস্থায় যথোপযুক্ত শ্রম-বিভাগের ব্যবস্থা করা যায়। কারণ যদি উৎপাদনের বিশেষ অংশের জন্য কোন শ্রমিককে নিযুক্ত করা হয় তবে তাহার পক্ষে উৎপাদন কৌশল আয়ত্ত করিতে বেশী সময় লাগে না। কিন্তু সেই শ্রমিককে যদি উৎপাদনের সমুদয় অংশের জন্য নিযুক্ত করা হয়, তবে তাহার পক্ষে উৎপাদন কৌশল আয়ত্ত করিতে অনেক সময় লাগে। উৎপাদন ব্যবস্থা সরল হইয়া গেলে নূতন নূতন যন্ত্র উদ্ভাবনের এবং শিল্পোৎপাদন সম্বন্ধে নূতন গবেষণার পথও পরিষ্কার হয়।

উৎপাদন ব্যবস্থা সহজ হইয়াছে

শ্রম-বিভাগের অসুবিধা (Disadvantages of Division of Labour) **:** শ্রম-বিভাগের কতিপয় অসুবিধাও আছে। শ্রম-বিভাগের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক শ্রমিক কাজের একটি বিশেষ অংশ লইয়া ব্যস্ত থাকে। ইহাতে কাজে একঘেয়েমী আসে এবং শ্রমিকের উৎপাদনী শক্তি

কাজের একঘেয়েমী

অনেক পরিমাণে নষ্ট হয়। শ্রমিকদের যদি কাজে উৎসাহ কমিয়া আসে, তবে উৎপাদন ব্যবস্থার উৎকর্ষ অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, শ্রম-বিভাগের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমেই বৃহদায়তন হইয়া পড়ে ইহাতে মালিকের সহিত শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে না। তাহা ছাড়া, বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় স্বভাবতঃই নূতন ধরণের যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করিবার চেষ্টা মালিক শ্রেণীর থাকে; ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকদের কাজের সময় অথবা বাসস্থানের ব্যবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে। সর্বোপরি, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের অভাবে শিল্প-বিরোধের পরিমাণও বাড়িয়া যায়; অর্থাৎ শ্রমিক ও মালিকশ্রেণীর মধ্যে কলহ লাগিয়াই থাকে।

শিল্প বিরোধের সৃষ্টি

আঞ্চলিত শ্রম-বিভাগের একটি প্রধান দোষ হইতেছে এই যে কোন প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য হয়ত জনসাধারণকে একটি বিশেষ অঞ্চলের উপর নির্ভর করিতে হয়। যদি দেশে যুদ্ধবিগ্রহ অথবা কোন প্রাকৃতিক কারণে অথবা অন্য যে কোন কারণে এই অঞ্চলে উৎপাদন হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়, তবে সমগ্র দেশকে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। তাহা ছাড়া, এই প্রকার শ্রম-বিভাগের ফলে একটি শিল্প যদি কখনও একটি বিশেষ স্থানেই উন্নত হয়, তখনই সেই স্থানে এক শ্রেণীর শ্রমিকদের জন্য বিশেষ চাহিদা দেখা যায় এবং সমস্ত শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে মজুরির বৈষম্য দেখা যায়।

আঞ্চলিক শ্রম-বিভাগের অসুবিধা

আধুনিক শিল্প-ব্যবস্থা শ্রম-বিভাগের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। শুধু শিল্প ব্যবস্থাই নহে, আধুনিক সমাজব্যবস্থাও শ্রম-বিভাগের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। আধুনিক যুগে এককভাবে উৎপাদন ব্যবস্থা চালাইয়া যাওয়া সম্ভবপর নয়। কোন জিনিস উৎপন্ন করিতে হইলে আমাদের প্রথম প্রয়োজন হইতেছে কাঁচা মাল সংগ্রহ করা। দ্বিতীয়ত, জিনিসটি উৎপন্ন করিবার সময় আমাদের মূলধন ও শ্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে হয়। ক্ষুদ্রায়তন হোক আর বৃহদায়তন হোক যে কোন উৎপাদন ব্যবস্থার গোড়ায় এই দুইটি জিনিসের প্রয়োজন, এবং এইজন্যই কিছু না কিছু শ্রমবিভাগের প্রয়োজনীয়তা যে কোন প্রকার উৎপাদন ব্যবস্থায় অনুভূত হইবেই। উৎপন্ন জিনিসগুলিকে দেশের ভিতরে অথবা দেশের বাহিরে বিক্রয় করিতে হইলেও আমাদের শ্রম-বিভাগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আমরা দেখিতে পাই আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাগ। যে দেশ যে জিনিস উৎপাদনে কতিপয় আপেক্ষিক সুবিধা ভোগ করে, সেই দেশ সেই জিনিসটি উৎপাদন করে। বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার মধ্যেও আমরা শ্রম-বিভাগ দেখিতে পাই। অংশীদারী কারবারের অংশীদারদের মধ্যে যৌথ-মূলধনী কারবারের ডিরেক্টর বা পরিচালকের মধ্যে এবং সমবায় কর্মীদের মধ্যে শ্রম-বিভাগ থাকে। তাহা না হইলে কোন কাজই সুসম্পন্ন হয় না। সামাজিক ব্যবস্থায়ও আবার শ্রম-বিভাগ দেখিতে পাই। কৃষক চাষ করে, এবং কারখানার শ্রমিক কারখানার কাজ করে,—যে জিনিসের সাহায্যে কারখানার

শ্রমিককে কাজ করিতে হয় তাহার কিছু জিনিস (কাঁচা মাল বা raw materials) আসে কৃষিক্ষেত্র হইতে। দেশের শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন কাজ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। শিল্প-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করে সরকার অথবা ব্যবসায়ী শ্রেণী। এইভাবে আমরা দেখিতে পাই আধুনিক সমাজও শ্রম-বিভাগের উপর ভিত্তিশীল।

শ্রম-বিভাগের সীমা (Limits to Division of Labour) : শ্রম-বিভাগের একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে ; তাহা নির্ভর করে বাজারের উপর ("Division of Labour is limited by the extent of the market.") কি পরিমাণ শ্রম বিভাগের ব্যবস্থা একটি শিল্পে হইতে পারে, তাহা সেই শিল্পের উৎপাদন ব্যবস্থার আয়তনের উপর নির্ভর করে ; যেমন বৃহদায়তন উৎপাদনে বেশী পরিমাণে শ্রম-বিভাগ হয় এবং ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনে কম পরিমাণে শ্রম-বিভাগ হয়। উৎপাদনের আয়তন আবার উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয় করিবার মত বাজার আছে কিনা, তাহার উপর নির্ভর করে। ধরা যাক্ একটি জিনিসের জন্য বাজারে খুবই চাহিদা আছে। উৎপাদক তখন ইহা বেশী করিয়া উৎপাদন করিবে, বেশী উৎপাদন করিতে গেলে শ্রম-বিভাগও বেশী পরিমাণে হইবে।

আবার যদি সেই জিনিসের জন্য বাজারের চাহিদা খুবই অল্প থাকে, তবে উৎপাদনকারী ইহা বেশী করিয়া উৎপাদন করিবে না। সেইজন্যই বলা হয়, শ্রম বিভাগ বাজারের বিস্তারের পরিমাণ দ্বারা সীমাবদ্ধ। শ্রম-বিভাগের প্রসার অনেক ক্ষেত্রে শিল্প ও উৎপাদন পদ্ধতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়। তাহা ছাড়া, মূলধনের পরিমাণের উপরেও শ্রম-বিভাগের পরিমাণ কত হইবে তাহা নির্ভর করে।

বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Large-scale Production) : যখন উৎপাদন ব্যবস্থার আয়তন বড় হয় এবং বিভিন্ন উপাদানগুলিকে বৃহৎ মাত্রায় নিয়োগ করা হয়, তখন উৎপাদনকে আমরা বৃহদায়তন উৎপাদন (large-scale production) বলিয়া থাকি। অধ্যাপক মার্শাল বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধাগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—আভ্যন্তরীণ সুবিধা ও ব্যয়-সংকোচ (Internal Economies) এবং বাহ্যিক সুবিধা ও ব্যয়-সংকোচ (External Economies)। যখন কোনও একটি প্রতিষ্ঠান বৃহদায়তনে উৎপাদন করিয়া নিজের প্রচেষ্টায় এবং যোগ্যতায় কতিপয় সুবিধা লাভ করে তখন ইহাকে আভ্যন্তরীণ ব্যয়-সংকোচ (Internal Economies) বলা হয়। কিন্তু যখন কতিপয় সুবিধা শিল্পপ্রতিষ্ঠান নিজের চেষ্টায় পায় না,—যখন সেই সুবিধাগুলির সৃষ্টি হয় বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির মিলিত সংস্থার চেষ্টায়, তখন সেই সুবিধাগুলি সম্মিলিত শিল্পের কাছে আভ্যন্তরীণ হইলেও কোনও একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কাছে ইহা বাহ্যিক। একটি বিশেষ শিল্পপ্রতিষ্ঠান যখন নিজের চেষ্টায় উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণগুলির সদ্ব্যবহার করে, তখন শিল্পে একদিকে যেমন উৎপাদন বাড়ে, অপরদিকে সেই প্রকার

বৃহদায়তন উৎপাদনের দুই প্রকার সুবিধা—আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক

উৎপাদনের খরচ কমিয়া যায়। বিশেষতঃ, উৎপাদনের কোন অবিভাজ্য উপকরণ (Indivisible factor of production) থাকিলে ইহা যতই ব্যবহার করা হইবে, ইহার খরচ তুতই কমিয়া যাইবে। একটি উদাহরণ দিলে কথাটি পরিষ্কার হইবে। ধরা যাক্ একটি মেসিন হইতে আমরা কোন জিনিসের ২০টি ইউনিট পাইতে পারি, অর্থাৎ মেসিনটি ২০ ইউনিট কোন জিনিস উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু আমাদের যদি ১০ ইউনিট জিনিসের প্রয়োজন হয়, তখন আমরা মেসিনটিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া উহার একটি অংশ ব্যবহার করিতে পারি না, কারণ মেসিনটি অবিভাজ্য। স্থতরাং দশ ইউনিট উৎপাদন করিবার প্রয়োজন থাকিলেও আমাদের সম্পূর্ণ মেসিনটিই ব্যবহার করিতে হইবে। যদি মেসিনটি ব্যবহার করিতে ২০ টাকা খরচ হয় তবে সেক্ষেত্রে প্রতি ইউনিটের জন্য খরচ হয় দুই টাকা। কিন্তু যদি আমরা ২০ ইউনিট উৎপাদন করি, তবে প্রতি ইউনিটের জন্য খরচ হইবে এক টাকা। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে উৎপাদন যতই বাড়িতে থাকিবে, প্রতি ইউনিটের স্থির উৎপাদন খরচও ততই কমিতে থাকিবে।

দ্বিতীয়ত, বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় আমরা যন্ত্রগত ব্যয়সংকোচের (technical economies) স্থবিধা লাভ করি, বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে বাষ্প এবং বিদ্যুৎ ব্যবহার করা চলে ; ইহাতে উৎপাদন খরচ কমিয়া যায়। তাহা ছাড়া, একটি জিনিসের উৎপাদন বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক (subsidiary) কতিপয় জিনিসের উৎপাদন বাড়িয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, জুতা তৈয়ারীর কারখানা চেষ্টা করিলে চামড়ার থলি তৈয়ারী করিবার কারখানাও স্থাপন করিতে পারে।

তৃতীয়ত, বৃহদায়তনে উৎপাদন করিলে, উৎপাদনধারার সংযুক্তি হয় এবং ইহার ফলে আমরা কতিপয় স্থবিধা (economies of linked process) পাই। যেমন—সময়, যানবাহনের খরচ, জ্বালানি ও বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের খরচ একই সঙ্গে কমিয়া যায়। তাহা ছাড়া, বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় একটি কারখানা নিজের পরিত্যক্ত উপাদানগুলির সাহায্যে বিভিন্ন উপদ্রব্য (by-product) তৈয়ারী করিতে পারে। ইহাকে আমরা "economies of by-product" বলিতে পারি।

চতুর্থত, বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিচালনার দিক হইতেও একটি ফার্ম কতিপয় বিশেষ স্থবিধা লাভ করে ; ইহাকে পরিচালনগত স্থবিধা বা "economies of management" বলা হয়। ক্ষুদ্র ফার্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রম-বিভাগ দেখা যায় এবং শ্রম-বিভাগের সব স্থবিধা পাওয়া যায়। কিন্তু, বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় এই স্থবিধা বেশী দিন পাওয়া যায় না। কারণ, ফার্মটির আয়তন যতই বড় হইতে থাকিবে, পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সংযোগ সাধন করা ততই জটিল হইয়া পড়ে।

পঞ্চমত, বৃহদায়তন ফার্মগুলি কতিপয় বিশেষ বাণিজ্যিক ব্যয়-সংকোচের স্থবিধা

(commercial economies) লাভ করে। কারণ ইহার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে কাঁচামাল সংগ্রহ করা, পাইকারী জিনিস কেনা অথবা বাজারে ঋণ-সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়। বিজ্ঞাপন দেওয়ার ক্ষেত্রেও বড় ফার্মের ইউনিট প্রতি খরচ কম হয়। বড় ফার্ম ব্যাংক হইতে সুবিধাজনক শর্তে ঋণ আদায় করিতে পারে এবং দরকার হইলে শেয়ার ও ডিবেঞ্চার সুবিধাজনক ভাবে বিক্রয় করিতে পারে; ইহাকে আর্থিক ব্যয় সংকোচের সুবিধা (financial economies) বলা যাইতে পারে। সর্বশেষে, বড় বড় ফার্মগুলি ছোট ফার্ম অপেক্ষা আনুপাতিকভাবে কম ঝুঁকির ভার বহন করে। বৃহদায়তনে উৎপাদন চলিতে থাকিলে মোট উৎপাদনের হিসাবে আনুপাতিক ভাবে ঝুঁকি কমিতে থাকে। একটি জিনিসের ক্ষেত্রে লোকসান হইলে উৎপাদক আরেকটি জিনিসের বিক্রয়লব্ধ লাভ হইতে সেই লোকসান পূরণ করিবার চেষ্টা করিতে পারে। বৃহদায়তনে উৎপাদন সুরু হইলে বিক্রয়-বাজারের আয়তনও বড় হয়।

আভ্যন্তরীণ ব্যয়-সংকোচের সহিত একটি ফার্ম কতিপয় বাহ্যিক ব্যয়-সংকোচের সুবিধাও লাভ করে। কয়েকটি ফার্ম মিলিতভাবে নিজেদের চেষ্টায় কোন জিনিসের জন্য একটি বৃহৎ বিক্রয়-বাজারের সৃষ্টি করিলে অনুরূপ জিনিস উৎপাদনকারী ছোট ছোট ফার্মগুলিও সেই বিক্রয়-বাজারের সুবিধা পাইয়া থাকে, ইহাতে জিনিসটির বিক্রয় বেশী হয়। আবার বৃহদায়তনে উৎপাদন করে এইরূপ কারখানার প্রতি শ্রমিকগণ স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয়; ফলে শিল্পোন্নত অঞ্চলগুলিতে শ্রমিক সরবরাহ সর্বদাই বেশী থাকে। সেক্ষেত্রে ছোট ছোট ফার্মগুলিও শ্রমিক সরবরাহের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকে। শিল্পের কেন্দ্রীয়করণ বা স্থানীয়করণের জন্য একটি ফার্ম যে সুবিধাগুলি পাইয়া থাকে সেইগুলির অধিকাংশই ব্যয়-সংকোচের বাহ্যিক কারণের মধ্যে পড়ে।

বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার অসুবিধা (Diseconomies of Large-scale Production): বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় কতিপয় অসুবিধাও আছে। সূক্ষ্ম কারুকার্যসমন্বিত জিনিস উৎপাদন করা বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় সম্ভবপর হয় না; কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় ইহা সম্ভবপর হয়। বাজারে এক ধরণের কতিপয় ক্রেতা থাকে যাহারা সর্বদাই হস্তজাত জিনিসপত্র কিনিতে চাহে। দ্বিতীয়ত, বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় ফার্মের শ্রমিকদের সহিত মালিকের কখনই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে না। ইহাতে শিল্পবিরোধের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়. মালিকের পক্ষেও উৎপাদনের খুঁটিনাটির সব খবর রাখা সম্ভবপর নয়। তৃতীয়ত, বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অধিক পরিমাণে যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করা হয়। ইহাতে অনেক ক্ষেত্রেই কিছু লোককে কাজ হইতে ছাঁটাই করিতে হয় এবং এইভাবে বেকার সমস্যার তীব্রতা বাড়িয়া যায়। চতুর্থত, বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির আর একটি অসুবিধা হইতেছে এই যে ইহাদের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন বিভাগের পরিচালকদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা খুব

কঠিন হয়। সর্বশেষে, বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে অধিক পরিমাণে বিনিয়োগের ঝুঁকিও বহন করিতে হয়। বেশী করিয়া টাকা ধার করিতে গেলে সুদের হার বেশী দেওয়ার বোঝাও বহন করিতে হয়।

বৃহদায়তন উৎপাদনের এই অসুবিধাগুলি (diseconomies) ইহার সীমা নির্ধারণ করে। উৎপাদনের উপাদানগুলির যোগান সর্বদাই সীমাবদ্ধ। সুতরাং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির আয়তন বাড়াইবার একটি সীমা সর্বদাই থাকে। এই সীমা অতিক্রম করিয়া গেলেই উৎপাদন খরচ বাড়িতে থাকে এবং বিবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

শিল্প স্থানীয়করণ (Localisation of Industries): আঞ্চলিক শ্রম বিভাগের প্রভাবে (Territorial Division of Labour) অনেক সময় একটি শিল্প বিশেষ একটি স্থানে কেন্দ্রীভূত থাকে। ইহাকে শিল্পের স্থানীয়করণ বলে। যেমন, বোম্বাই ও আমেদাবাদে বস্ত্রশিল্প, কলিকাতা ও ইহার আশেপাশে পাটশিল্প এবং উত্তরপ্রদেশে চিনিশিল্প কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

শিল্প স্থানীয়করণের কারণ (Causes of Localisation of Industries): শিল্প স্থানীয়করণের কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হইতেছে কাঁচামালের নিকটে শিল্পের অবস্থান (nearness to raw materials)। যেমন পূর্ববঙ্গে কাঁচা মাল (পাট) বেশী করিয়া উৎপাদিত হইত বলিয়া কলিকাতার আশেপাশে পাটশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। জামসেদপুরের কাছাকাছি লোহা, কয়লা প্রভৃতি খনিজ সামগ্রী আছে বলিয়াই সেখানে ইস্পাতের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে রাজ্যে কাঁচা তুলা পাওয়া যায় বলিয়াই বোম্বাই ও আমেদাবাদে বস্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয়ত, কোন শিল্পের কোন স্থানে কেন্দ্রীভূত হইবার আর একটি কারণ হইল ইহার শক্তি-সম্পদের উৎসের নিকট অবস্থান (nearness to sources of power)। পূর্বে জলশক্তির দ্বারা অনেক কারখানা চালিত হইত। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, পশ্চিমবঙ্গের পাটকলগুলি হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত।

তৃতীয়ত, বাজারের নিকট অবস্থান (nearness to market) শিল্প স্থানীয়করণের আর একটি কারণ। কলিকাতায় পাটশিল্পের প্রতিষ্ঠা পাটজাত দ্রব্যাদির বিরাট বাজার সৃষ্টি করিয়াছে। সাধারণতঃ বড় বড় শহর, রেলওয়ে জংসন ইত্যাদি স্থানে বিভিন্ন শিল্প কেন্দ্রীভূত হয়।

চতুর্থত, প্রচুর পরিমাণে শ্রমিকের যোগানও (supply of labour) শিল্প স্থানীয়করণকে প্রভাবিত করে। দক্ষ কারিগর বা কর্মকুশল শ্রমিক ব্যতীত কোন শিল্পই উন্নত হইতে পারে না। যে স্থানে কর্মকুশল শ্রমিকের প্রচুর সরবরাহ থাকে, সেই স্থানেই শিল্পপতিগণ নিজেদের শিল্পকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন।

পঞ্চমত, ভৌগোলিক কারণ, যেমন জলবায়ু, প্রাকৃতিক কারণ, জমির উর্বরতা ইত্যাদি কারণও শিল্প স্থানীয়করণকে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশে অধিক পাটের উৎপাদন হওয়ার অন্যতম কারণ ইহার জলবায়ু এবং জমির গুণ, এবং সেইজন্য পাট-

শিল্পের কাঁচা মাল এখানে এত বেশী। সুতরাং পাটশিল্প যে বাংলাদেশেই (যেখানে কলিকাতার মত এত বড় শহর ও বিরাট বাজারের সম্ভাবনা আছে) কেন্দ্রীভূত হইবে, তাহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই।

ষষ্ঠত, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাও শিল্প স্থানীয়করণকে প্রভাবিত করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, কলিকাতা যখন ভারতের রাজধানী ছিল তখন বিভিন্ন শিল্প সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা এবং সাহায্যের আশায় কলিকাতা ও ইহার আশেপাশে কেন্দ্রীভূত হইত।

শিল্প স্থানীয়করণ সাধারণতঃ, বৃহদায়তন উৎপাদন এবং শ্রম বিভাগের অন্যতম প্রভাব। যে সকল দেশ শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে, সেগুলিতেও আমরা শিল্প স্থানীয়করণ দেখিতে পাই। আধুনিককালে আমরা শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের (decentralisation of industries) দিকে একটি ঝোঁক দেখিতে পাই। ভারতবর্ষে গ্রামীণ ও কুটীর শিল্পগুলিকে বিকেন্দ্রীত করার চেষ্টা করা হইতেছে। শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ করিবার প্রধান কারণ হইতেছে শিল্প স্থানীয়করণের অপগুণগুলি প্রতিরোধ করার প্রয়াস। কিন্তু, শিল্প স্থানিকতার কতিপয় গুণও আছে। আমরা এখন শিল্প স্থানীকরণের ফলাফল আলোচনা করিব।

শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ

শিল্প স্থানীয়করণের সুফল (Good effects of Localisation of Industries): শিল্প স্থানিকতার প্রধান গুণ হইতেছে এই যে, একটি স্থানে শিল্প কেন্দ্রীভূত হইলে সেখানকার উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্রী বিশেষ সুনাম অর্জন করে। যেমন, শান্তিপুরের ধুতি ও শাড়ী অথবা আহ্‌মেদাবাদ মিলগুলির কাপড় ক্রেতার নিকট বিশেষ আদরণীয় হয়। সুইজারল্যাণ্ডের ঘড়িশিল্প সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া সুনাম অর্জন করিয়াছে। দ্বিতীয়ত, কোন একটি বিশেষ স্থানে শিল্প কেন্দ্রীভূত হইলে যে শুধু ইহার উৎপন্ন সামগ্রীর সুনাম হয় তাহা নহে, সেইস্থানে কর্মকুশল কারিগরও সহজলভ্য হয়; ভাল তাঁতী শান্তিপুরেই পাওয়া যায়। যে স্থানে শিল্পগুলি কেন্দ্রীভূত হয়, বিভিন্ন অঞ্চলের সুদক্ষ কারিগর ও শ্রমিকগণ সেই স্থানে কাজের আশায় একত্রিত হয়। তৃতীয়ত, শিল্প স্থানীয়করণের ফলে শিল্পাঞ্চলে একটি শিল্প-পরিবেশের সৃষ্টি হয় যাহাতে শিল্প-কারিগরদের সন্তান-সন্ততিগণও সেই শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে প্রাথমিক জ্ঞান এবং অনেক সময় পারদর্শিতা অর্জন করে। শৈশব হইতেই ভবিষ্যতের কারিগরগণ সংশ্লিষ্ট শিল্প সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্ঞাতব্য তথ্য আয়ত্ত করে এবং সেই কাজে উৎসাহী হয়। চতুর্থত, শিল্প স্থানীয়করণের ফলে শিল্পাঞ্চলে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাও উত্তমরূপে গড়িয়া উঠে এবং সেই অঞ্চলে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম হয় ও অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়। সর্বশেষে, শিল্প স্থানীয়করণের ফলে শিল্পাঞ্চলের আশেপাশে অনেক পরিপূরক শিল্প (subsidiary industries) গড়িয়া উঠে। উদাহরণস্বরূপ কলিকাতার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কলিকাতার আশেপাশে অনেক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এই শিল্পগুলির অধিকাংশই পরিপূরক শিল্প হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে।

তাহা ছাড়া, কোন শিল্পের বিশেষ সাহায্যে আসে এই প্রকার শিল্পগুলিও সংশ্লিষ্ট শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উন্নত হয়।

শিল্প স্থানীয়করণের কুফল (Bad effects of Localisation of Industries) : শিল্প স্থানীয়করণের প্রধান ত্রুটি হইতেছে এই যে যদি কোন শিল্পের ব্যবসায়ে কখনও মন্দা দেখা দেয় তখন শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট সকলেরই আর্থিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়, তখন অনেক লোক বেকার হইয়া যায় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। ভারতে দেশ-বিভাগের অব্যবহিত পরে যখন পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্প বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, তখন অনেক লোক বেকার হইয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের সময় একস্থানে একটি শিল্প কেন্দ্রীভূত থাকা দেশের নিরাপত্তার পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্প কেন্দ্রীভূত, কিন্তু যুদ্ধের সময় যদি কলিকাতা শহর আক্রান্ত হয়, তবে দেশের পাটশিল্পকে বিরাট ক্ষতি ও দুর্গতির সম্মুখীন হইতে হইবে। কিন্তু শিল্পটি যদি কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীভূত না হইয়া সমগ্র দেশে বিকেন্দ্রীভূত হইত, তবে বিপদের সম্ভাবনা থাকিত না। দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য এবং শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের জন্য সমগ্র দেশ একটি বিশেষ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত একটি শিল্পের উপর নির্ভর করিবে,—অর্থনৈতিক বিবেচনার দিক হইতে ইহা সমর্থনযোগ্য নহে। সেই জন্যই আজকাল শিল্প বিকেন্দ্রীকরণের (decentralisation of industries) দিকে ঝোঁক দেখা যাইতেছে। তৃতীয়ত, শিল্প স্থানীয়করণের ফলে বড় বড় দেশগুলিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। অনেকে যুক্তরাষ্ট্রের (Federal State) ক্ষেত্র মনে করেন না।

ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা টিঁকিয়া থাকার কারণ (Causes of the survival of small-scale production) : বৃহদায়তন উৎপাদনের অনেক সুবিধা আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু এইগুলি থাকা সত্ত্বেও আমরা ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা টিঁকিয়া থাকিতে দেখিতে পাই। ইহার প্রথম কারণ বৃহদায়তন ব্যবস্থার যে শুধু কতিপয় সুবিধা আছে তাহা নহে, ইহার কতিপয় অসুবিধাও আছে। একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে বৃহদায়তন উৎপাদনের ফলে শুধু উৎপাদন খরচই বাড়িতে থাকে। বৃহদায়তন উৎপাদনের সীমা নির্ভর করে বাজারের বিস্তৃতির (extent of the market) উপর। বাজারের বিস্তৃতি নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট জিনিসের চাহিদার উপর। অনেক জিনিস আছে যেগুলি বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপন্ন হয় না। সূক্ষ্ম কারুকার্য, হাতের তৈয়ারী জিনিস, এইগুলিরও একটি চাহিদা আছে এবং সেই চাহিদা মিটাইতে হইলে বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা হইতে ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থাই অধিকতর উপযোগী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, খুব মিহি কাপড় হয়ত একটি মিল তৈয়ারী করিতে পারে। কিন্তু উহার উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য এবং বিভিন্ন ধরণের নক্সা তৈয়ারী করিয়া উহাকে রুচি-সম্পন্ন করিয়া তোলা একটি মিলের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তখনই ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

দ্বিতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসারের ফলে কতিপয় ভৌগোলিক বাধা (Geographical obstacles) এবং মনস্তাত্ত্বিক বাধা (Psychological obstacles) থাকে। যদি কোন জিনিস উৎপাদন করিবার জন্য দরকারী কাঁচামাল সমস্ত দেশে ছড়াইয়া থাকে অথবা ভোগকারীগণ বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া থাকে, তবে অনেক ক্ষেত্রে বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হয়।

তৃতীয়ত, জিনিসপত্রের পৃথকীকরণ (product differentiation) করিলে বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান নিজের নিজের জিনিসগুলির বৈশিষ্ট্য বাড়াইবার চেষ্টা করে; তখনও ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

চতুর্থত, কতিপয় উৎপাদন ক্ষেত্র আছে যেখানে বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা লাভজনক নয়, উদাহরণস্বরূপ কৃষিকাজ ও হস্তচালিত শিল্পের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির একটি বিশেষ সুবিধা আছে। সেইগুলিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকগণ নিজেরাই সকল বিভাগের বিভিন্ন কাজের দেখাশোনা করিয়া থাকেন; ইহাতে শ্রমিকদের পক্ষে কাজে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হয় না।

পঞ্চমত, যে সকল উদ্যোক্তা ব্যবসায়ে অতিরিক্ত ঝুঁকি বহন করিতে সাহসী হয় না, তাহারা স্বভাবতঃই ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা পছন্দ করে।

এই সমস্ত কারণে আমরা আধুনিককালে বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার যুগেও ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা টিঁকিয়া থাকিতে দেখিতে পাই। জাপানে এবং আমেরিকায় ইহা বিশেষভাবে দেখা যায়। উৎপাদন ব্যবস্থাকে সকল দিক হইতেই ভাল করিতে হইলে বৃহদায়তন এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির পরস্পরের প্রতিযোগী না হইয়া সহযোগী হওয়া উচিত।

শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তন (Size of a business firm): একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তন কত বড় হইবে তাহা নিম্নলিখিত কারণগুলির উপর নির্ভর করে।

প্রথমত, একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্ভর করে ইহার তৈয়ারী বিভিন্ন জিনিসের চাহিদার উপর। যদি কোন জিনিসের জন্য ব্যাপক চাহিদা থাকে এবং যদি ইহার বাজারের আয়তন বড় হয়, তবে ইহা উৎপন্ন করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আয়তনও বড় হয়। দ্বিতীয়ত, উৎপাদন যদি এরকম হয় যে বড় বড় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা এবং অধিক পরিমাণে মূলধন নিয়োগ করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে, তবে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তন বড় হইয়া যায়। তৃতীয়ত, বাজারের নৈকট্য এবং পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধাও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আয়তনকে প্রভাবিত করে। চতুর্থত, পরিচালনগত সুবিধা ও অসুবিধার উপরও কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্ভর করে। যেখানে পরিচালনা ব্যবস্থা খুব সহজ নয় সেখানে শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তন সাধারণতঃ ছোট হয়। পঞ্চমত, যদি কাঁচামালের সরবরাহ অপর্যাপ্ত হয় এবং উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানগুলি সহজলভ্য হয়, তবে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের

আয়তন বড় হয়। ষষ্ঠত, ব্যবসায়ে ঝুঁকির পরিমাণ এবং আর্থিক বা মূলধন-জনিত সুযোগ-সুবিধার উপরেও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্ভর করে। অধ্যাপক ই. এ. জি. রবিনসনের (Prof. E.A.G. Robinson) মতে প্রধানতঃ পাঁচটি জিনিসের উপর শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্ভর করে। সেইগুলি হইতেছে, বড় বড় যন্ত্রপাতি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা, বাজারের বিস্তৃতি, পরিচালন জনিত সুবিধা, ঝুঁকিবহনের ক্ষমতা এবং মূলধনের প্রাচুর্য।

উপরে বর্ণিত কারণগুলি ছাড়াও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আয়তনকে প্রভাবিত করে এরকম কতিপয় উপাদান আছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান ব্যয়-সংকোচনের আশা লইয়া উহার আয়তন বাড়াইয়া দেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে একচেটিয়া মুনাফা পাইবার আশায় অথবা বাজার হইতে সহজে মূলধন সংগ্রহের আশায় কতিপয় ছোট ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠান একত্রিত হইয়া একটি বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। আবার, বাজারে প্রতিপত্তি লাভের আশায়, অথবা সরকার হইতে কতিপয় সুযোগ-সুবিধা লাভের আশা লইয়াও কোন কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান নিজেদের আয়তন বাড়াইয়া থাকে।

একটি ফার্মের আয়তন বৃদ্ধির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হইতেছে, মূলধনের অপ্রাচুর্য, সংগঠনের অভাব, কাঁচামালের অভাব, শ্রমিকদের কম উৎপাদনী শক্তি, বাজারের আয়তন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা, শ্রমিক-মালিক বিরোধ, শিল্প-গবেষণার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণার অভাব এবং ঝুঁকির বোঝা বহন করিবার ক্ষেত্রে সাহসের অভাব।

সর্বোত্তম আয়তনের ফার্ম (Optimum Firm): কারবার যে আয়তনের হইলে একদিকে সর্বাধিক লাভ অর্জিত হয় এবং অপর দিকে গড় উৎপাদন খরচ সর্বনিম্ন হয়, উহাকে সেই শিল্পের সর্বোত্তম আয়তনের ফার্ম (optimum firm) বলে। প্রথম দিকে যখন কোন ফার্ম উৎপাদন বাড়াইতে আরম্ভ করে, তখন উহার উৎপাদন খরচ কমিতে থাকে। এইভাবে উৎপাদন বাড়াইতে বাড়াইতে অথবা কারবারের আয়তন বাড়াইতে বাড়াইতে ফার্মটি এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হইবে যখন উহার উৎপাদন খরচ সর্বনিম্ন হইবে। এই পর্যায়ের পরেও যদি ফার্মটি উৎপাদন বাড়াইতে থাকে তবে বৃহদায়তন উৎপাদনের নানারকম অসুবিধা দেখা দিবে এবং উৎপাদন খরচ বাড়িতে আরম্ভ করিবে। সুতরাং কারবারের যে আয়তনে উৎপাদন ব্যয় সর্বনিম্ন হয় অথচ লাভের পরিমাণ সর্বাধিক থাকে ফার্মের পক্ষে সেই আয়তনেই ব্যবসায় চালান উচিত এবং সেই আয়তনই হইতেছে সর্বোত্তম আয়তন (optimum scale)। তত্ত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালে কোন ফার্ম সর্বোত্তম আয়তনের হইতে পারে অথবা সর্বোত্তম মাত্রায় উৎপাদন করিতে পারে। ৪নং চিত্রে একটি ফার্মের সর্বোত্তম আয়তন দেখান যাইতেছে:

৪নং চিত্রে যখন OT পরিমাণ জিনিস উৎপাদিত হইতেছে তখন গড় খরচ (AC), প্রান্তিক খরচ (MC), প্রান্তিক আয় (MR) এবং দাম পরস্পরের সমান। শুধু তাহাই

নহে, দাম সর্বনিম্ন গড় খরচের সমান; কারণ, গড় খরচের curveটি ইহার সর্বনিম্ন বিন্দুতে গড় আয় রেখার (average revenue curve) সহিত স্পর্শক (tangent) হইয়াছে। OT হইতেছে সর্বোত্তম উৎপাদন (optimum output)। যখন উৎপাদন এই অবস্থায় থাকে তখনই একটি ফার্মকে আমরা সর্বোত্তম আয়তনের ফার্ম বলিতে পারি।
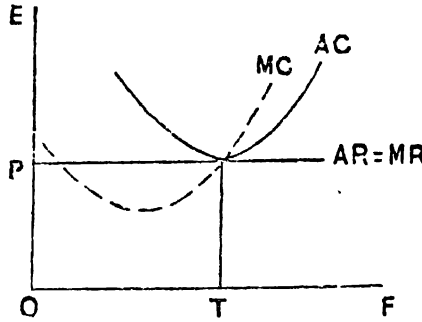
চিত্র নং ৪

বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন সময় এবং বিভিন্ন শিল্প অনুযায়ী সর্বোত্তম ফার্মের আয়তনে পার্থক্য দেখা যায়। কোন ফার্মের সর্বোত্তম আয়তন নানা অবস্থার উপর নির্ভর করে, যথা, যন্ত্রগত সুবিধা, মালিকের দক্ষতা, মূলধন সংগ্রহ অথবা কাঁচামাল সংগ্রহের সুবিধা বা অসুবিধা; বাজারের আয়তন, প্রতিযোগিতার প্রকৃতি, ব্যবসায়ে ঝুঁকির পরিমাণ, ইত্যাদি। বিভিন্ন উপাদানের এবং সম্পদের আদর্শ বণ্টন (ideal allocation of resources) হইলেই একান্ত কাম্য উৎপাদন হওয়া সম্ভবপর। কাম্য উৎপাদনে গড় খরচ সর্বনিম্ন হয় এবং মুনাফা সর্বাধিক পরিমাণ হয়; অর্থাৎ, এমনভাবে বিভিন্ন সম্পদ বণ্টিত হয় যে সর্বনিম্ন খরচ এবং সর্বোচ্চ মুনাফার শর্ত একই সঙ্গে পূরণ হয়।

বৃহদায়তন উৎপাদনের ভিত্তি: (Basis of Large-scale Production) **:** আধুনিক শিল্পোৎপাদন ক্রমেই বৃহদায়তন হইতেছে। বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা শ্রম বিভাগের উপর ভিত্তিশীল। শ্রম-বিভাগের একটি প্রধান গুণ হইতেছে ইহার বিশেষীকরণ (specialisation)। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানই নানাভাবে ব্যয় সংকোচনের চেষ্টা করিয়া থাকে। এজন্য প্রত্যেক অংশের কাজসর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তিকে দিয়া করান হয়। এইভাবে শ্রমিকগণ নিজ নিজ স্থানে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করিয়া থাকে। শুধু বিশেষীকরণই নহে, সহযোগিতাও (co-operation) আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি। শ্রম-বিভাগের সহিত মিকদের পরস্পরের মধ্যে এবং শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে সহযোগিতার প্রসার ঘটে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আমরা দেখিতে পাই, যে দেশ কোন একটি বিশেষ জিনিস উৎপাদনে পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছে, সেই দেশ সেই জিনিসটি উৎপন্ন করে।

সমবায় আধুনিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। একটি জিনিসের বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উৎপাদিত হয়। বিভিন্ন অংশগুলি তৈয়ারী করিবার জন্য আমরা পরস্পর নির্ভরশীলতা ও সমবায়ের প্রয়োজন অনুভব করি।

আধুনিককালে আমরা যে সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান দেখিতে পাই, সেইগুলির অধিকাংশই যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়। যৌথ-মূলধনী কারবারে আমরা পরিচালকদের শ্রম-বিভাগ এবং পারস্পরিক সহযোগিতা দেখতে পাই। অংশীদারী কারবারেও অংশীদারদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা থাকে। ইহা ছাড়া, আধুনিক কালে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। সমবায়ের ভিত্তিতে শিল্প-গবেষণা করা এবং উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয়করণের ব্যবস্থা করা আজকাল প্রায়ই দেখা যায়। শিল্প-সমবায় (Industrial Co-operatives) গঠন করিয়া একই সামগ্রী প্রস্তুতকারী বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের বিজ্ঞাপন, অন্যান্য প্রচারকার্য প্রভৃতি ব্যয় সংকোচনের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। সেজন্যই বলা হয়, আধুনিক শিল্পব্যবস্থা অনেক অংশেই বিশেষত্বকরণ এবং সমবায়ের উপর ভিত্তিশীল।

Exercise

1. Discuss the functions and importance of an entrepreneur in the modern industrial organisation. (৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা)

[আধুনিক শিল্প-ব্যবস্থায় উদ্যোক্তার কাজ এবং গুরুত্ব আলোচনা কর।]

2. What is a Joint Stock Company ? How does a Joint Stock Company raise capital ? Discuss the merits and demerits of a Joint Stock Company. (৫৪-৫৬ পৃষ্ঠা)

[যৌথ-মূলধনী কারবার কাহাকে বলে ? কিভাবে একটি যৌথ-মূলধনী কারবার মূলধন সংগ্রহ করে। যৌথ-মূলধনী কারবারের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।]

3. Write notes on : (a) Single Proprietorship, (b) Partnership. (c) Co-operation, and (d) State enterprises. [(ক) একমালিকানা কারবার, (খ) অংশীদারী কারবার, (গ) সমবায় এবং (ঘ) সরকারী কারবারের উপর টীকা লিখ।] (৫৬-৫৮ পৃষ্ঠা)

4. What is meant by Division of Labour ? Discuss the advantages and dis-advantages of Division of Labour. "Division of labour is limited by the extent of the market". Discuss the Statement. (৫৯-৬২ পৃষ্ঠা)

[শ্রম-বিভাগ বলিতে কি বোঝায় ? শ্রম-বিভাগের সুবিধা এবং অসুবিধা আলোচনা কর। "শ্রম-বিভাগ বাজারের আয়তনের দ্বারা সীমিত" উক্তিটি আলোচনা কর।

5. Distinguish between the internal and external economies of a firm giving suitable examples of both.

[ফার্মের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয়সংকোচ ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য দেখাও এবং উভয়ের উপযুক্ত উদাহরণ দাও।]

6. Discuss the advantages and disadvantages of large-scale production.

[বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।] (৬২-৬৫ পৃষ্ঠা)

7. What are the factors leading to localisation of industries? Mention the effects of such localisation.

[কি কি উপাদানের ফলে শিল্প স্থানীয়করণ সম্ভব হয়? শিল্প স্থানীয়করণের ফলাফল উল্লেখ কর।] [৬৫-৬৭ পৃষ্ঠা]

8. What is meant by the optimum size of a firm? State the factors which determine it. (৬৯-৭০ পৃষ্ঠা)

[কোন ফার্মের সর্বোত্তম আয়তন বলিতে কি বুঝায়? কি কি উপাদান ইহা নিরূপণ করে বর্ণনা কর।]

9. Discuss the factors that determine the size of a business unit in competitive industry. (৬৮-৬৯ পৃষ্ঠা)

[প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে কোন ব্যবসায় সংস্থার আয়তন কি কি উপাদানের উপর নির্ভরশীল তাহা আলোচনা কর।]

অষ্টম অধ্যায় | ক্রেতার আচরণ (Consumer's Behaviour)

উপযোগ (Utility): মানুষের পক্ষে কোন জিনিস কিনিতে চাহিবার প্রধান কারণ, ইহার দ্বারা কোন একটি অভাব পূরণ করা সম্ভবপর। কোন জিনিস ভাল অথবা মন্দ হইতে পারে। কিন্তু, যদি সেই জিনিসের কোন অভাব দূর করিবার ক্ষমতা থাকে, তবেই ইহার "উপযোগ" (Utility) আছে বলা যাইতে পারে। সাধারণ অর্থে, উপযোগ বলিতে বুঝায় কোন জিনিসের প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু, অর্থশাস্ত্রে উপযোগ বলিতে বুঝায় ক্রেতার কোন অভাব পূরণ করিবার ক্ষমতা। যখন ক্রেতা কোন জিনিসের কতিপয় ইউনিট বা মাত্রা ক্রয় করে, তখন সবগুলি ইউনিট হইতে সে যত উপযোগ পায়, সেইগুলির যোগফলকেই মোট উপযোগ (Total Utility) বলা যায়। কিন্তু কতিপয় ইউনিট কিনিবার পর ক্রেতা যদি আরও একটি অতিরিক্ত ইউনিট ক্রয় করে, তবে সেই অতিরিক্ত ইউনিট হইতে যে উপযোগ পাওয়া যায়, তাহাকে বলা হয় প্রান্তিক উপযোগ (Marginal Utility)।

ধরা যাক্ আমি পাঁচটি কমলালেবু কিনিলাম। এই পাঁচটি কমলালেবু আমার যতখানি অভাব পূরণ করে, অর্থাৎ এই পাঁচটি কমলালেবুর যতখানি উপযোগ, তাহাই ইহার মোট উপযোগ (Total Utility)। আবার পাঁচটি কমলালেবু কিনিবার পর আমি যদি আরও একটি কমলালেবু কিনি, তবে ষষ্ঠ কমলালেবুটি হইতে যে উপযোগ পাই, তাহাই প্রান্তিক উপযোগ (Marginal Utility)। মোট উপযোগ এবং

প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে যে সম্পর্ক তাহা আমরা ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগের নিয়ম (Law of Diminishing Marginal Urility) হইতে বুঝিতে পারি।

উপভোগ তত্ত্ব (Utility Theory): উপযোগের (utility) ভিত্তিতে ক্রেতার ক্রিয়াকলাপ আলোচনা করিতে হইলে আমাদের মার্শাল প্রদত্ত ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগের নিয়মের (Law of Diminishing Marginal Utility) উপর নির্ভর করিতে হয়।

মানুষের অভাবের কোন শেষ নাই; কিন্তু, একটি বিশেষ অভাবের শেষ আছে। যেমন, আমি কমলালেবু যতই কিনিতে থাকিব, ততই কমলালেবু কিনিবার আকাংখা কমিয়া আসিবে। এমন একটি অবস্থায় আমি উপনীত হইব যখন কমলালেবুর কোন উপযোগই আমার নিকট থাকিবে না। এই নিয়মটি বুঝাইবার সময় দুইটি কথা মনে রাখিতে হইবে। প্রথমত, কোন ক্রেতা যখনই কোন জিনিস কিনিবে, তখন তাহার রুচি, অভ্যাস এবং আয়ের কোন পরিবর্তন হইবে না, ইহা ধরিয়া লইতে হইবে। দ্বিতীয়ত, জিনিসটি কিনিবার সময় অন্য যে কোন বিকল্প জিনিসের দাম অপরিবর্তিত আছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

এখন একটি উদাহরণের সাহায্যে এই নিয়মটি বুঝান যাইতে পারে। ধরা যাক, একজন লোক এক কাপ চা কিনিয়া পান করিল। প্রথমে এক কাপ চা ভালই লাগিবে। ইহার পর যদি সে আরও এক কাপ চা কিনিয়া পান করে, তখনও ইহা ভাল লাগিতে পারে; কিন্তু দ্বিতীয় কাপ হইতে যতখানি উপযোগ পাওয়া যাইবে, প্রথম কাপ হইতে তাহা কম হইবে। ইহার পর যদি তৃতীয়বার আর এক কাপ চা কেনা হয়, তখন তৃতীয়বারের চা হইতে যে উপযোগ পাওয়া যায়, তাহা দ্বিতীয়বার অপেক্ষা আরও কম। এইভাবে একজন লোক যতই একটি জিনিস কিনিতে, থাকিবে, পরবর্তী ইউনিটগুলির উপযোগ ততই কমিতে থাকিবে। নিম্নের ৫নং চিত্রের সাহায্যে এই নিয়মটি বুঝানো যাইতে পারে।
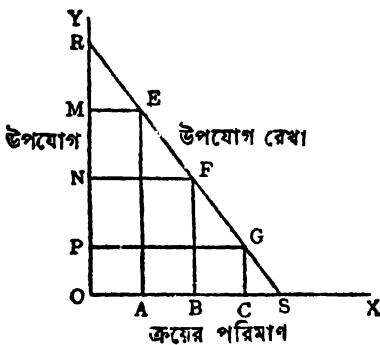
নিম্নের চিত্রে OX রেখা একটি জিনিস ক্রয়ের পরিমাণ এবং OY রেখা উপযোগ বুঝাইতেছে। যখন OA পরিমাণ জিনিস কেনা হইয়াছে, তখন ক্রেতার নিকট ইহার উপযোগ হইতেছে AE, ইহার পর যখন AB পরিমাণ জিনিস কেনা হইল, তখন উপযোগ হইতেছে BF, ইহার পর BC পরিমাণ জিনিস কেনা হইলে উপযোগ কমিয়া CG হইল। এইভাবে

চিত্র নং ৫

যতই একটি জিনিস কেনা যাইতেছে সেই জিনিস হইতে উপযোগ ততই কমিয়া যাইতেছে।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ নিয়মের কতিপয় ব্যতিক্রম আছে। যেমন, কৃপণ যতই টাকা জমাইতে থাকিবে, তাহার নিকট টাকা হইতে উপযোগ ততই কমিতে থাকিবে না। অথবা যে বালকের নিকট ডাকটিকিট জমানো একটি খেয়াল, সে যদি ক্রমাগত ডাকটিকিট পাইতে থাকে, তবুও তাহার নিকট ডাকটিকিটের উপযোগ কমিবে না। কিন্তু কৃপণ অথবা খেয়ালী বালকের ক্রিয়াকলাপ অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় নহে। কারণ তাহারা কখনই স্বাভাবিক ক্রেতা নহে এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপকে আমরা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বলিতে পারি না।

এই নিয়মের ব্যতিক্রম

একটি জিনিস পাইতে থাকিলে ইহার উপযোগ ক্রেতার নিকট তখনই কমিবে যখন ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যদি জিনিসটি খুব দুর্লভ হয় তবে ইহার প্রথম ইউনিট কিনিবার পর দ্বিতীয় ইউনিটের উপযোগ নাও কমিতে পারে। আবার, জিনিসটি যদি এরূপ হয় যে ভবিষ্যতে ইহার দাম বাড়িয়া যাইতে পারে, তবে বর্তমানে জিনিসটি বেশী পরিমাণে কেনা হইতে থাকিলেও উহার উপযোগ কমিতে থাকিবে না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই নিয়মটি ব্যাখ্যা করিবার সময় আমাদের ধরিয়া লইতে হইবে যে ক্রেতার রুচি, অভ্যাস এবং আয়ের কোন পরিবর্তন হইবে না। যদি ক্রেতার রুচি, অভ্যাস এবং আয়ের পরিবর্তন হয়, তবে কোন জিনিস বেশী পরিমাণে কিনিতে থাকিলেও তাহার নিকট ইহার উপযোগ নাও কমিতে পারে। তাহা ছাড়া, অন্যান্য বিকল্প জিনিসের দামও অপরিবর্তিত ধরিয়া লইতে হয়। ধরা যাক, একজন লোক কমলালেবু কিনিতেছে, এমন সময় যদি পরবর্তী লেবু, আপেল, আঙুর ইত্যাদি ফলের দাম খুব বাড়িয়া যায় তবে কমলালেবু ক্রমাগত কিনিতে থাকিলেও, ইহার উপযোগ হয়ত তাহার নিকট নাও কমিতে পারে। কিন্তু, এই নিয়মটি বুঝাইবার সময় অধ্যাপক মার্শাল ধরিয়া লইয়াছেন যে ক্রেতার আয়, রুচি ও অভ্যাস এবং অন্যান্য বিকল্প জিনিসের দাম, সবই অপরিবর্তিত থাকিবে। এই নিয়ম হইতে আমরা প্রান্তিক উপযোগ (Marginal Utility) এবং মোট উপযোগের (Total Utility) মধ্যে একটি সম্পর্ক বাহির করিতে পারি।

মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের সম্পর্ক (Relation between Total Utility and Marginal Utility): যখন কোন জিনিস কেনা হয়, তখন ইহার সবগুলি ইউনিট হইতে যে উপযোগ পাওয়া যায়, তাহার সমষ্টিকে বলা হয় মোট উপযোগ। কিন্তু বর্তমান ইউনিটগুলির অতিরিক্ত একটি ইউনিট যদি কেনা হয়, তবে অতিরিক্ত ইউনিট হইতে যে অতিরিক্ত উপযোগ পাওয়া যায়, তাহাকে বলা হয় প্রান্তিক উপযোগ। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগের নিয়ম হইতে আমরা দেখিতে পাই, মোট উপযোগ যতই বাড়িতে থাকে, প্রান্তিক উপযোগ

ততই কমিতে থাকে। যখন প্রান্তিক উপযোগ সর্বনিম্ন হয়, তখন মোট উপযোগ সর্বাধিক পরিমাণ হয়। পূর্বে চা পানের যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল, তাহা হইতেই ইহা বুঝা যাইবে। আমরা যতই চা গ্রহণ করি, ততই ইহার প্রান্তিক উপযোগ কমিয়া আসে; অথচ, আমরা যতই ইহা গ্রহণ করি, ইহার মোট উপযোগ তত বাড়ে।

উপযোগ কি পরিমাণে বাড়িতেছে অথবা কমিতেছে তাহা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কারণ, উপযোগ মূলতঃ একটি মানসিক অনুভূতি; অর্থ দিয়া ইহার পরিমাপ করা যায় না। কিন্তু, অধ্যাপক মার্শাল মনে করেন, একটি জিনিসের জন্য ক্রেতা যে পরিমাণ অর্থ দিতে প্রস্তুত, তাহার দ্বারাই ক্রেতার নিকট সেই জিনিসের উপযোগ পরিমাপ করা যায়। কিন্তু, ইহা প্রকৃতই উপযোগের পরিমাপ নহে। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ নিয়মের ইহাই প্রধান ত্রুটি। কারণ উপযোগ কখনই পরিমাপযোগ্য নহে।

উপযোগ মূলতঃ মনস্তত্ত্বের ব্যাপার

সমালোচনা: উপযোগের ভিত্তিতে ক্রেতার ক্রিয়াকলাপ বুঝাইবার যে চেষ্টা অধ্যাপক মার্শাল করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা হইতেছে এই যে উপযোগ কখনই পরিমাপযোগ্য নয়; ইহা একটি মানসিক অনুভূতি মাত্র। অধ্যাপক মার্শাল বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, আমরা যখনই টাকা দিয়া কোন জিনিস কিনি, তখন সেই জিনিস হইতে কি পরিমাণে উপযোগ পাওয়া যায় তাহা প্রদত্ত টাকার পরিমাণের সাহায্যেই আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু এই যুক্তি ঠিক নয়। বিভিন্ন অভাব পূরণের যে তৃপ্তি তাহা যোগ করা যায় না অথবা টাকার পরিমাণের ভিত্তিতে তাহার পরিমাপও করা যায় না। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন ক্রেতা একই জিনিস কিনিয়া হয়ত বিভিন্ন স্তরের তৃপ্তি লাভ করিতে পারে। সেইগুলিরও পরিমাপ করা সম্ভবপর নহে। দ্বিতীয়ত, ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ নিয়মটি ব্যাখ্যা করিবার সময় মার্শাল অন্যান্য সব জিনিস অপরিবর্তিত ("Other things remaining constant") ধরিয়া লইয়াছেন। মার্শালের মতে টাকার প্রান্তিক উপযোগ সমান থাকে। অর্থাৎ জিনিস কিনিবার সময় ক্রেতার আয়ের পরিবর্তন হইবে না—এই ধারণাটিও ঠিক নয়। গতিশীল জগতে মানুষের আয়ের পরিবর্তন হইবেই। আয়ের পরিবর্তনের সহিত মানুষের রুচি ও চাহিদার পরিবর্তন হয়। ইহাতে ক্রেতা যে জিনিসটি কিনিবার জন্য বাজারে যায়, সেই জিনিসটির বিকল্প জিনিসগুলির (substitutes) দামের পরিবর্তন হইতে পারে।

সুতরাং উপযোগের ভিত্তিতে জিনিস কিনিবার সময় ক্রিয়াকলাপ সঠিক ভাবে বুঝান সম্ভবপর নয়। এজন্য অধ্যাপক পেরেটো (Prof. Pareto) এবং পরবর্তীকালে অধ্যাপক হিক্স (Prof. Hicks) এবং অধ্যাপক এলেন (Prof. Allen) প্রান্তিক উপযোগের বদলে প্রান্তিক পছন্দের তালিকা (Scale of Preference) অনুযায়ী জিনিস কিনিবার সময় ক্রেতার ক্রিয়াকলাপ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

সমপ্রান্তিক উপযোগের নিয়ম (Law of Equi-marginal Utility): সমপ্রান্তিক উপযোগের নিয়মটির মূল কথা হইতেছে এই যে, যখন কোন ব্যক্তি তাহার

নির্দিষ্ট পরিমাণ আয়ের সাহায্যে কতিপয় জিনিস (যেমন, A, B, C, ইত্যাদি) কিনিতে চাহে, তখন সে তাহার নির্দিষ্ট আয়কে এমনভাবে বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে বণ্টন করিবে যে প্রত্যেকটি জিনিস হইতেই তাহার প্রান্তিক উপযোগ সমান হইবে। যদি A কিনিয়া B অপেক্ষা বেশী উপযোগ পাওয়া যায়, তবে ক্রেতা B কম করিয়া কিনিয়া A বেশী করিয়া কিনিবে। ক্রেতার উদ্দেশ্য হইতেছে, A, B, C, প্রভৃতি জিনিস এমনভাবে কিনিয়া ফেলা যেন সব জিনিস হইতেই তাহার পরিতৃপ্তি সর্বাধিক হয়। এইজন্য এই নিয়মটির আর একটি নাম হইতেছে "সর্বাধিক পরিতৃপ্তির নিয়ম" (Doctrine of Maximum Satisfaction)। এক্ষেত্রে একটি জিনিসের বদলে অপর একটি জিনিস বেশী করিয়া ক্রয় করা হয় বলিয়া এই নিয়মটির আরও একটি নাম হইতেছে 'প্রতিস্থাপনের নিয়ম' (Principle of Substitution)। যদি ক্রেতা দেখে যে, কফি হইতে চায়ের দাম বেশী অথচ দুইটিই তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয়, তখন সে তাহার নির্দিষ্ট আয় চা এবং কফির মধ্যে এমনভাবে বণ্টন করিবে যেন উভয় ক্ষেত্রেই মূল্যপ্রদান ও উপযোগ প্রাপ্তির অনুপাত সমান থাকে,—অর্থাৎ, উভয় ক্ষেত্রেই যেন সমান তৃপ্তি পাওয়া যায় এবং সমান প্রান্তিক উপযোগ হয়।[১] চা কিনিয়া এরকম যেন মনে না হয় যে চা আরও কম কিনিয়া কফি বেশী করিয়া কিনিলেও চলিত, অথবা কফি কিনিয়া এরকম যেন মনে না হয় যে কফি আরও কম কিনিয়া চা বেশী করিয়া কিনিলেও চলিত। ক্রেতা চা এবং কফি কিনিয়া যে তৃপ্তি লাভ করিবে এবং ইহার জন্য যে দাম দিবে, তাহার অনুপাত সর্বদাই সমান থাকিবে। এই অবস্থায় চা এবং কফি কিনিবে ক্রেতার ভারসাম্য (consumer's equilibrium) অর্জিত হইবে। এই নিয়মটিকে নিম্নলিখিতভাবে বুঝান যায়—

$$\frac{\text{চায়ের প্রান্তিক উপযোগ}}{\text{চায়ের দাম}} = \frac{\text{কফির প্রান্তিক উপযোগ}}{\text{কফির দাম}}$$

অধ্যাপক মার্শালের এই নিয়মটিই পরবর্তী অর্থবিজ্ঞানীদের নিরপেক্ষ রেখা পদ্ধতি মাধ্যমে ক্রেতার আচরণ সম্বন্ধে আলোচনার ভিত্তি।

ধরা যাক বাজারে a, b, c,—এই জাতীয় অসংখ্য জিনিস রহিয়াছে। MU_a, MU_b, MU_c···হইতেছে যথাক্রমে এই জিনিসগুলির প্রান্তিক উপযোগ। P_a, P_b, P_c···এই জিনিসগুলির মূল্য নির্দেশ করিতেছে। ক্রেতার ভারসাম্য অর্জন করিবার জন্য সমপ্রান্তিক উপযোগের নিয়ম অনুযায়ী নিম্নের সর্তটি পালন করিতে হইবে।

$$\frac{MU_a}{P_a} = \frac{MU_b}{P_b} = \frac{MU_c}{P_c} = \cdots = \frac{MU_n}{P_n}$$

নিম্নের চিত্রে ক্রেতার আয় হইতেছে OA+OB এবং ক্রেতা ঐ আয় এমনভাবে

১। মার্শালের ভাষায়, **"If a person has a thing which he can put to several uses he will distribute it between these uses in such a way that it has the same marginal utility in all."**

ব্যক্তিগত চাহিদা হইতে বাজারের চাহিদা নির্ণয় করা যায়। মনে করি যে বাজারে একাধিক ক্রেতা রহিয়াছে। বাজারের চাহিদা বলিতে আমরা বুঝি যে ঐ একাধিক ক্রেতা বাজারে সমবেত ভাবে কত ক্রয় করিতেছে। বুঝিবার সুবিধার জন্য মনে করি যে বাজারে দুইজন মাত্র ক্রেতা রহিয়াছে, A এবং B। এই দুইজনের সমবেত ক্রয়ের ফলে বাজারে মোট চাহিদার কি অবস্থা তাহা নিম্নের চিত্রের সাহায্যে দেখান হইল।

এই চিত্রে দেখান হইতেছে যখন বাজার দাম OP, তখন A কিনিতেছে PP_1 এবং B কিনিতেছে PP_2 পরিমাণ। সুতরাং OP দামে বাজারে বিক্রয় হইতেছে $PP_1 + PP_2 = PP_3$ পরিমাণ। এইভাবে যখন বাজার দাম OQ তখন বাজারে বিক্রয় হইতেছে $QQ_1 + QQ_2 = OQ_3$ পরিমাণ। অর্থাৎ A এবং B এই দুইজনের চাহিদা রেখাকে বিভিন্ন দামে যোগ করিয়া আমরা বাজার-চাহিদা রেখা DD পাইয়া থাকি। সুতরাং বাজার চাহিদার পশ্চাতে রহিয়াছে ব্যক্তিগত চাহিদা রেখাগুলি।
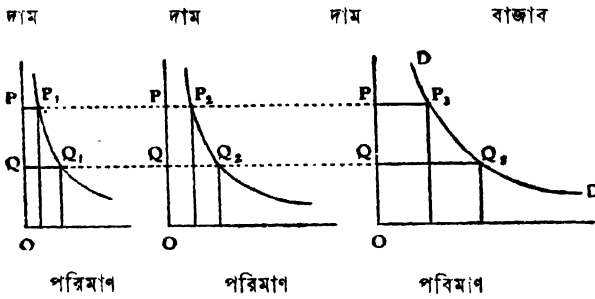
চিত্র নং ১৪

নিরপেক্ষ রেখাতত্ত্ব ও চাহিদার নিয়ম (Indifference Curve Analysis and the Law of Demand): দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে ইহাই চাহিদার নিয়ম। প্রকৃত পক্ষে দামের পরিবর্তনের প্রভাব আয়-প্রভাব এবং প্রতিস্থাপন প্রভাবের উপর নির্ভর করে। চাহিদার নিয়মে আয়-প্রভাব এবং প্রতিস্থাপন প্রভাব কিভাবে কার্যকর হয় তাহা নিম্নের চিত্রে দেখানো হইয়াছে।
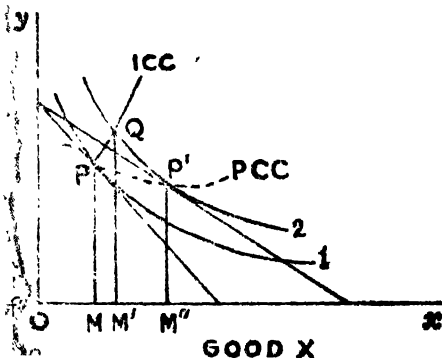
চিত্র নং ১৫

এই চিত্রে প্রথমে আমরা আয়-প্রভাব দেখিতে পাই; আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতা X-এর ক্রয়ের পরিমাণ OM হইতে OM′ পর্যন্ত বাড়াইতেছে এবং ভারসাম্য P বিন্দু হইতে Q বিন্দুতে চলিয়া যাইতেছে।

ইহার পর যদি X-এর দাম কমিয়া যায়, তবে আমরা প্রতিস্থাপন-প্রভাব দেখিতে পাই এবং ক্রেতার ভারসাম্য সেই ক্ষেত্রে বিন্দুতে না হইয়া P' বিন্দুতে হইবে। ইহাতে X-এর চাহিদা OM' হইতে OM" পর্যন্ত বাড়িবে। P এবং P' বিন্দু দুইটিকে একটি রেখার দ্বারা যোগ করিলে আমরা Price Consumption Curve (PCC') পাই। ইহাই মূল্য-প্রভাব। চাহিদার নিয়মে মূল্য-প্রভাব (Price effect) প্রতিভাত হয়। প্রথমে কোন জিনিসের দাম কমিয়া গেলেই ক্রেতার প্রকৃত আয় (Real Income) বাড়ে, ইহাতে আয়-প্রভাব কার্যকর হয়। আবার, কোন জিনিসের দাম কমিয়া গেলে অন্য জিনিসের অনুপাতে ইহার প্রান্তিক গুরুত্ব (marginal significance) বাড়িয়া যায় এবং সেইজন্য ক্রেতা ইহা বেশী করিয়া কিনিয়া অন্য জিনিস কম করিয়া কিনে। এখানে প্রতিস্থান-প্রভাব কার্যকর হয়। এই দুইটি প্রভাবের যৌথ ফল স্বরূপ কোন জিনিসের দাম কমিলে সেই জিনিসের চাহিদা বাড়িয়া যায়। ইহাই চাহিদার নিয়ম।

নিম্নের চিত্রে নিরপেক্ষ রেখা হইতে কিভাবে চাহিদা রেখা অঙ্কন করা যায় তাহা দেখানো হইয়াছে।
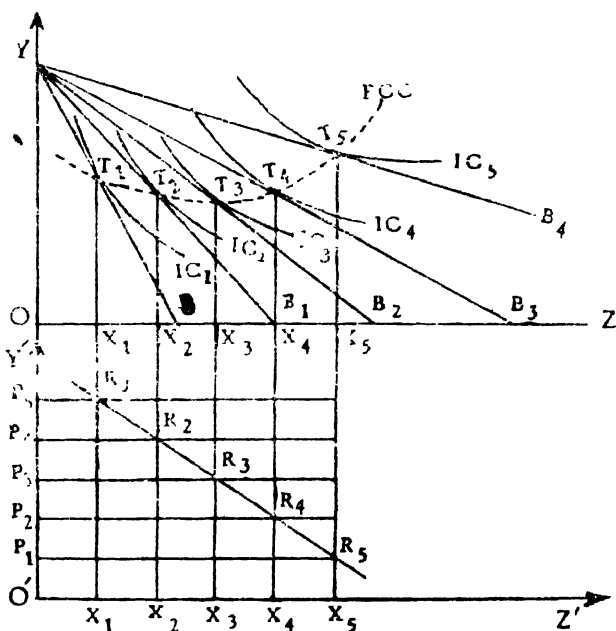
চিত্র নং ১৬

এই চিত্রের উপরের অংশে OY রেখা অর্থের পরিমাণ দেখাইতেছে। YB, YB_1, YB_2, YB_3, YB_4 প্রভৃতি রেখা কোন জিনিসের দাম (ধরা যাক চা-এর দাম) বুঝাইতেছে। Ic_1, Ic_2, Ic_3, Ic_4, Ic_5 প্রভৃতি হইতেছে ক্রেতার নিরপেক্ষ রেখা।

T_1, T_2, T_3, T_4, T_5 প্রভৃতি হইতেছে যথাক্রমে ক্রেতার ভারসাম্যের বিন্দু। PCC রেখা হইতেছে মূল্য অনুযায়ী ভোগ রেখা (Price-Consumption Curve)। যখন T_1 হইতেছে $O'X_1$ ভারসাম্য বিন্দু, তখন জিনিসটির দাম হইতেছে $O'P_5$ এবং ইহার জন্য চাহিদা হইতেছে OX_1 অথবা $O'X_1$; অনুরূপভাবে দাম কমিলে চাহিদা বাড়িতেছে। দাম P_4 হইতে P_3 পর্যন্ত অথবা P_3 হইতে P_2 পর্যন্ত কমিতে থাকিলে চাহিদাও যথাক্রমে $O'X_1$ হইতে $O'X_2$, পর্যন্ত এবং $O'X_2$ হইতে $O'X_3$ পর্যন্ত বাড়িয়া যাইতেছে। কারণ, চিত্রটির উপরের অংশে দাম কমিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে মূল্য রেখাগুলিও পরিবর্তিত হইতেছে (যেমন YB হইতে YB_1, অথবা YB_1 হইতে YB_3, প্রভৃতি) এবং ক্রেতার ভারসাম্যের বিন্দুও পরিবর্তিত হইতেছে (যেমন, T_1 হইতে T_2, অথবা T_2 হইতে T_3 প্রভৃতি)। চিত্রটির নিম্ন অংশে R_1, R_2, R_3, R_4, R_5 এই বিন্দুগুলি যথাক্রমে T_1, T_2, T_3, T_4, T_5 প্রভৃতি ভারসাম্য-বিন্দুর ভিত্তিতে অঙ্কিত হইয়াছে। R_1, R_2, R_3, R_4, R_5 প্রভৃতি বিন্দুকে যোগ করিলে যে রেখা পাওয়া যায় তাহাই চাহিদা রেখা। কারণ, এই রেখা অনুযায়ী দাম কমিয়া গেলে জিনিসের চাহিদা বাড়িয়া যাইতেছে।

কোন জিনিসের চাহিদা শুধুমাত্র ক্রেতার আয় অথবা সেই জিনিসের দামের উপরই নির্ভর করে না, অন্য জিনিসের দাম পরিবর্তিত হইলেও ক্রেতার চাহিদা পরিবর্তিত হইতে পারে। কারণ অন্য জিনিসের দাম কমিলে সেই জিনিসের জন্য স্বাভাবিক ভাবে চাহিদা বাড়িবে। ফলে সেই জিনিস বেশী করিয়া কিনিয়া ক্রেতা অধিক তৃপ্তি পাইতে চেষ্টা করিবে। অন্য জিনিসের দাম কমার দরুণ একদিকে ক্রেতার উপর আয়-প্রভাব ও অন্যদিকে প্রতিস্থাপন-প্রভাব কার্যকর হইবে। এই উভয় প্রভাবের ফলে চাহিদাও পরিবর্তিত হইবে। নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে অন্য জিনিসের দামের পরিবর্তনের দরুণ ক্রেতার উপর কি ভাবে দাম-প্রভাব কার্যকর হয় তাহা দেখান হইয়াছে। এখানে OA রেখা বস্ত্র এবং OP রেখা খাদ্যসামগ্রী বুঝাইতেছে। খাদ্যের দাম কমিলে ক্রেতার ভোগ সম্ভাবনা রেখা AB হইতে AB_1 হইবে। ভারসাম্য বিন্দুও P হইতে Q-তে পরিবর্তিত হইবে। যেহেতু খাদ্যের দাম কমিয়াছে সেজন্য ক্রেতা পূর্বের আয়ে এখন বেশী পরিমাণ খাদ্য কিনিবে। বস্ত্রের দাম অপরিবর্তিত থাকার দরুণ ভোগ সম্ভাবনা রেখা A বিন্দু হইতে AB_1, রেখা দ্বারা সূচিত হইতেছে।
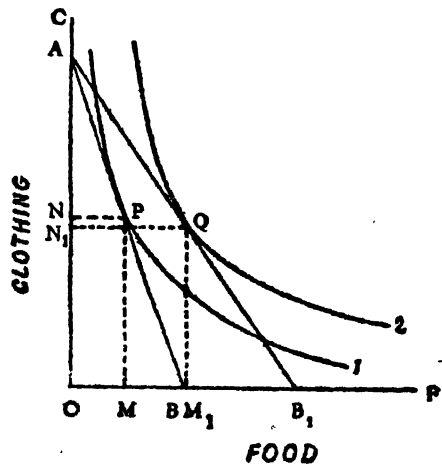
চিত্র নং ১৭

বস্ত্রের চাহিদার পরিবর্তন হইতেছে ON হইতে ON_1 এবং খাদ্যের চাহিদার পরিবর্তন হইতেছে OM হইতে OM_1। এই পরিবর্তনে ক্রেতার তৃপ্তিরও পরিবর্তন হইতেছে। কারণ Q বিন্দু উন্নত নিরপেক্ষ রেখার উপরে রহিয়াছে।

অতএব দেখা যায় যে কোন জিনিসের জন্য ক্রেতার চাহিদা শুধুমাত্র সেই জিনিসের দামের উপরই নির্ভর করে না ; ইহা নির্ভর করে তাহার আয় ও অন্যান্য জিনিসের দামের উপরও।

যদি ক্রেতার আয় Y, খাদ্যের দাম P_1 ও বস্ত্রের দাম P_2 দ্বারা বোঝান যায় তাহা হইলে ভোগ সম্ভাবনা রেখার সমীকরণটি হইবে—

$$Y = P_1\ (\text{Food}) + P_2\ (\text{Clothing}).$$

কারণ, ক্রেতা তাহার আয় (Y) বস্ত্র ও খাদ্য ক্রয়ের জন্য ব্যয় করিবে।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Demand) : চাহিদার নিয়মে আমরা দেখি, দামের পরিবর্তনের সহিত ক্রয়ের পরিমাণের একটি সম্পর্ক রহিয়াছে, দাম বাড়িলে চাহিদা কমে, ও দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে। কিন্তু সকল চাহিদা তালিকায় দামের পরিবর্তনের সহিত চাহিদার পরিবর্তনের হার সমান থাকে না। নীচের দুইটি চাহিদা তালিকার তুলনা করা যাইতে পারে।

দাম	ক্রয়ের পরিমাণ	দাম	ক্রয়ের পরিমাণ
১০ টাকা	২৫ (ইউনিট)	১০ টাকা	২৫ (ইউনিট)
৮ ,,	৩০ ,,	৮ ,,	৪০ ,,
৫ ,,	৪০ ,,	৫ ,,	৬০ ,,
২ ,,	৪৬ ,,	২ ,,	৯০ ,,

এখানে দ্বিতীয় তালিকাটিতে ক্রয়ের পরিবর্তনের হার অধিক। আমরা এক্ষেত্রে দ্বিতীয় তালিকাটির চাহিদাকে দামের পরিবর্তনের সহিত অধিক স্থিতিস্থাপক (elastic) বলিব।

এক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলিতে মূল্য-স্থিতিস্থাপকতা (price elasticity of demand) বুঝায়। অনুরূপভাবে আয়ের পরিবর্তনের হারের সহিত চাহিদার পরিবর্তনের হারের সম্পর্ক স্থাপন করিয়া আমরা চাহিদার আয়-স্থিতিস্থাপকতা (Income elasticity of demand) বাহির করিতে পারি। স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপের জন্য মূল্য স্থিতিস্থাপকতার যে সংজ্ঞা আরোপ করা হইয়াছে, তাহা হইল—

$$\text{মূল্য স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{চাহিদার শতকরা পরিবর্তন।}}{\text{দামের শতকরা পরিবর্তন।}}$$

মনে করি, দাম $= P$; ক্রয়ের পরিমাণ $= Q$, দামের পরিবর্তন $= \Delta P$; এবং ক্রয়ের পরিবর্তন $= \Delta Q$। সুতরাং চাহিদার শতকরা পরিবর্তন $= \Delta Q/Q$ এবং দামের শতকরা পরিবর্তন হইল $\Delta P/P$। অতএব চাহিদার মূল্য স্থিতিস্থাপকতা :

$$ed = \frac{\Delta Q}{Q} \div \frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta Q}{Q} \times \frac{P}{\Delta P}$$

মনে করি, প্রথমাবস্থায় কোন জিনিসের দাম ছিল ১০ টাকা এবং ক্রয়ের পরিমাণ ছিল ২০ ইউনিট। ইহার পর দাম কমিয়া হইল ৮ টাকা এবং ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া হইল ৩২ ইউনিট। এক্ষেত্রে P = ১০ টাকা; Q = ২০ ইউনিট; △P = ২ টাকা, △Q = ১২ ইউনিট। অতএব চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হইবে $\frac{১২}{২} \times \frac{১০}{২০}$ = ৩।

চিত্র নং ১৮

যদি আমরা চাহিদার রেখাচিত্রটি জানি, তাহা হইলে জ্যামিতিক প্রক্রিয়াতেও স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করা যায়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে সে ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতা চাহিদা রেখার কোন এক বিন্দুতে নির্দেশ করা হইবে।
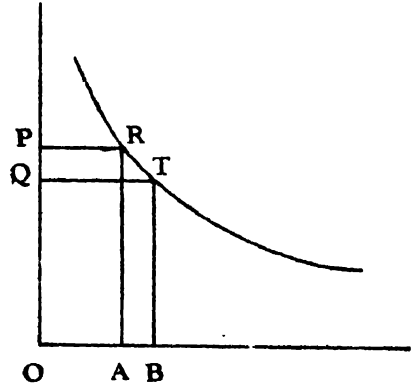
উপরের ১৮ নং চিত্রে চাহিদা রেখায় R বিন্দুতে OP দাম এবং ক্রয়ের পরিমাণ OA ধরা হইতেছে। দাম যখন OQ তখন ক্রয়ের পরিমাণ OB। সুতরাং চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা $ed = \frac{AB}{OA} \times \frac{OP}{QP}$

চাহিদা—স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ (Measurement of Price Elasticity of Demand):

এক্ষেত্রে আমরা R বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করিতেছি। এবন R বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কত, তাহা পরিমাপ করিতে গেলে R বিন্দুতে একটি স্পর্শক টানা প্রয়োজন। পরবর্তী চিত্রে এই পরিমাপের প্রক্রিয়াটি দেখান হইয়াছে।
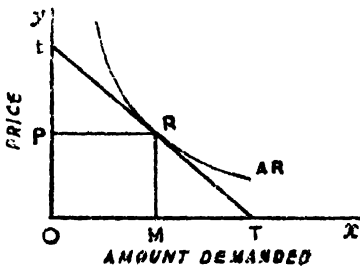
চিত্র নং ১৯(ক)
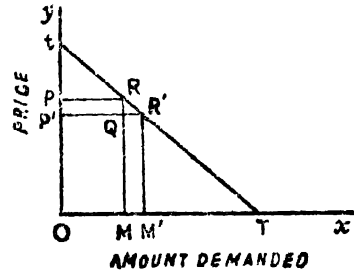
চিত্র নং ১৯(খ)

উপরের ১৯(ক) চিত্রে R বিন্দুতে tT স্পর্শক টানা হইয়াছে। OY রেখা মূল্য এবং OX রেখা চাহিদার পরিমাণ বুঝাইতেছে। ইহা হইতেতেছে অপর একটি বিন্দু। এখন পূর্ব সংজ্ঞা অনুযায়ী, R বিন্দুতে যে স্থিতিস্থাপকতা তাহা চিত্র নং ১৯(খ) অনুযায়ী

দেখানো হইয়াছে,—

$$ed=\frac{MM'}{OM}\div\frac{PP'}{OP}।$$

বিকল্পভাবে $=\frac{MM'}{OM}\times\frac{OP}{PP'}=\frac{QR'}{OM}\times\frac{RM}{QR}=\frac{QR'}{QR}\times\frac{RM}{OM}$। কিন্তু, যেহেতু RQR' এবং RMT ত্রিভুজ দুইটি একই প্রকার, আমরা $\frac{QR'}{QR}$-কে $\frac{TM}{RM}$ লিখিতে পারি।

সুতরাং $\frac{QR'}{QR}\times\frac{RM}{OM}$ সমীকরণটিকে আমরা $\frac{TM}{RM}\times\frac{RM}{OM}$ লিখিতে পারি। উভয় দিকে RM কাটিয়া ফেলার পর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা দাঁড়াইতেছে $\frac{TM}{OM}$; কিন্তু যেহেতু MTR এবং PRt ত্রিভুজ দুইটি একই প্রকার, সেইজন্য $\frac{TM}{OM}=\frac{RT}{Rt}$

এখন যদি RT ও Rt সমান হয়, তবে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এক-এর সমান। যদি RT > Rt হয়, তবে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১ হইতে বেশী এবং যদি RT < Rt হয় তবে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১ হইতে কম।

চিত্র নং ২০
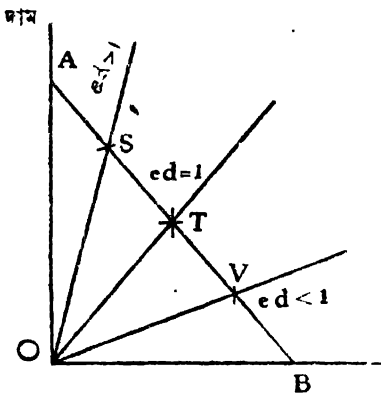
মনে হইতে পারে যে চাহিদা রেখা বক্র হইলেই কেবলমাত্র উহার বিভিন্ন বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা ভিন্ন ভিন্ন হইবে। কিন্তু বাস্তবপক্ষে যদি চাহিদা রেখা সরলরেখাও হয় তাহা হইলেও উহার বিভিন্ন বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন হইবে। পার্শ্বের ২০ নং চিত্রে ইহা দেখানো হইয়াছে। এই চিত্রে AB একটি সরল চাহিদা রেখা লওয়া হইয়াছে, যাহা দাম ও পরিমাণ, এই দুইটি অক্ষতে যথাক্রমে A এবং B বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে। T হইল এই AB রেখার মধ্য বিন্দু।

আমাদের পূর্ব পরিমাপ অনুযায়ী, T বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হইল,

$$ed=\frac{TB}{TA}=১\ (\because TB=TA)$$

সেইরূপ S বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা $ed=\frac{SB}{SA}>১\ (\because SB>SA)$

এবং V বিন্দুতে $ed=\frac{VB}{VA}<১\ (\because VB<VA)$।

স্থিতিস্থাপকতার এই যে পরিমাপ করা হইল, ইহা কোন একটি বিন্দুর স্থিতিস্থাপকতা নির্দেশ করে। কিন্তু অর্থবিজ্ঞানে অনেক সময় সমগ্র তালিকার স্থিতিস্থাপকতাও পরিমাপযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। যখন এইভাবে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের চেষ্টা করা হয়, তখন ক্রেতার মোট ব্যয়ের পরিমাণের সাহায্যে (outlay method) ঐ স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করা হয়। ২১নং চিত্রে এইরূপে স্থিতিস্থাপকতার পরিমাণের প্রক্রিয়াটি দেখান হইয়াছে। বুঝিবার সুবিধার জন্য আমরা একটি A′B′C′ চাহিদা রেখা লইয়া আলোচনা করিতেছি। দাম যখন OP তখন
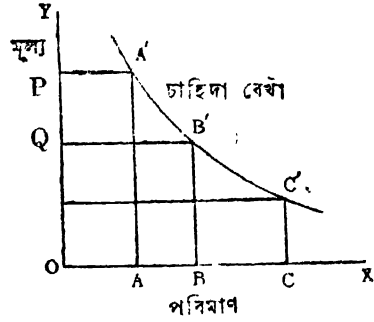
চিত্র নং ২১

ক্রয়ের পরিমাণ OA। সুতরাং ক্রেতার মোট ব্যয়ের পরিমাণ হইল, $OA \times OP = OPA'A$। দাম যখন কমিয়া OQ হইল, তখন ক্রয়ের পরিমাণ OB। সুতরাং মোট ব্যয়ের পরিমাণ $OQ \times OB = OQB'B$। যদি OQB′B, OPA′A অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তালিকাটির স্থিতিস্থাপকতা ১ অপেক্ষা অধিক। যদি OQB′B, OPA′A অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে স্থিতিস্থাপকতা ১ অপেক্ষা কম; এবং যদি OQB′B, এবং OPA′A সমান হয়, তাহা হইলে স্থিতিস্থাপকতা ১-এর সমান। সাধারণতঃ যে চাহিদা রেখা অপেক্ষাকৃত খাড়া হয়, সেই চাহিদা রেখার স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষাকৃত কম হয়। যেমন ২২নং চিত্রে চাহিদা তালিকা AA-র স্থিতিস্থাপকতা BB-র স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষা কম। কিন্তু যে
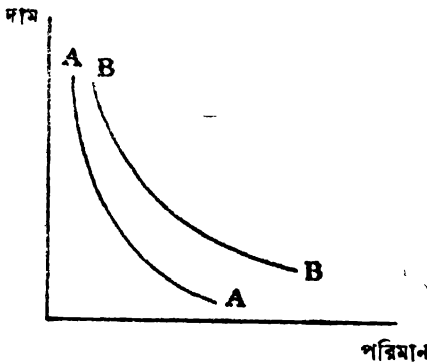
চিত্র নং ২২

চাহিদা তালিকার স্থিতিস্থাপকতা ১-এর সমান, তাহার একটি বিশেষ চেহারা আছে, যাহাকে জ্যামিতিতে rectangular hyperbola বলা হয়। পরপৃষ্ঠায় ২৩নং চিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে। এই চাহিদা রেখা অনুযায়ী মোট ব্যয় $OPAB =$ মোট ব্যয় OQCD। আমরা এই চাহিদা রেখার উপর যে কোন বিন্দুই লই না কেন, সেই বিন্দুতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ APOB-র সমান হইবে।

চাহিদার মূল্য—স্থিতিস্থাপকতার বিভিন্ন মাত্রা (Different degrees of Price Elastity of Demand) :

স্থিতিস্থাপকতার যে সংজ্ঞা আমরা দিয়াছি, তাহাতে সামান্য দাম কমিলেই যদি ক্রয়ের পরিমাণ সীমাহীন হয়, তাহাতে স্থিতিস্থাপকতা হইবে **অসীম** ($ed = \infty$)। আবার যদি দাম কমিলেও ক্রয়ের পরিমাণের কোন পরিবর্তন না হয়, সে ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতা হইবে শূন্য ($ed = 0$)। এই দুই বিশেষ প্রকারের স্থিতিস্থাপকতা যথাক্রমে নিম্নের দুইটি চিত্রের সাহায্যে দেখান হইয়াছে।

চিত্র নং ২৩
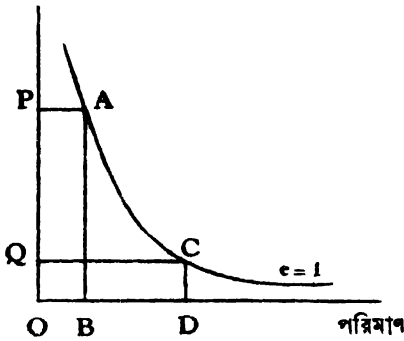
২৪নং চিত্রে দেখান হইয়াছে দামের সামান্য পরিবর্তন হইলেই ক্রয়েব পরিবর্তনের পরিমাণ এতই ব্যাপক হয় যে চাহিদা রেখাটি Y-অক্ষের সহিত সমান্তরাল হইয়া যায়। সুতরাং এই ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতা অসীম। DD' রেখা ইহাই বুঝাইতেছে। ২৫নং চিত্রে দামের, যতই পরিবর্তন ঘটুক না কেন, তাহাতে ক্রয়ের পরিমাণের কোন পরিবর্তন হয় না। সুতরাং এক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা শূন্য।

সাধারণতঃ যখন চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১ হইতে বেশী হয়, তখনই তাহাকে
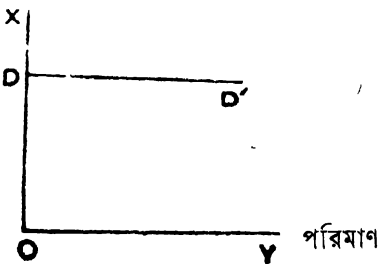
চিত্র নং ২৪
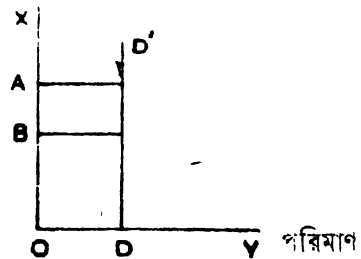
চিত্র নং ২৫

আপেক্ষিকভাবে স্থিতিস্থাপক চাহিদা (Relatively Elastic Demadd) বলা হয়, এবং যখন উহা ১ হইতে কম হয়, তখন উহাকে আপেক্ষিকভাবে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা (Relatively Inelastic Demand) বলে।

চাপ স্থিতিস্থাপকতা (Arc Elasticity): স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করিবার জন্য চাপ স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটি বিকল্প প্রক্রিয়া হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

এই ধারণা অনুযায়ী ২৬নং চিত্রে A এবং B এই দুইটি বিন্দুকে কিভাবে যোগ করা হইয়াছে তাহার উপর স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ নির্ভর করিবে। OP_0 দামে OQ_0 পরিমাণ জিনিস কেনা হইতেছে এবং OP_1 দামে OQ_1 পরিমাণ জিনিস কেনা হইতেছে। A এবং B এই দুইটি বিন্দু বিভিন্ন দামের পরিপ্রেক্ষিতে দুইটি বিভিন্ন পরিমাণ নির্দেশ করিতেছে। এখন A এবং B বিন্দুকে যোগ করিয়া যে চাপ (arc) পাওয়া যায়, তাহার সাহায্যে স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করা যায়। নিম্নে চাপ স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা দেওয়া হইল :

চাপ স্থিতিস্থাপকতা
(Arc Elasticity) $= \dfrac{Q_0 - Q_1}{Q_0 + Q_1} \div \dfrac{P_0 - P_1}{P_0 + P_1}$

$$= \frac{Q_0 - Q_1}{P_0 - P_1} \times \frac{P_0 + P_1}{Q_0 + Q_1}$$

চিত্র নং ২৬

এখানে 'P' এবং 'Q' যথাক্রমে দাম এবং ক্রয়ের পরিমাণ বুঝাইতেছে।

পার্শ্বের চিত্রে A এবং B দুইটি বিন্দু AB রেখা দ্বারা সংযোজিত হইয়াছে। AB চাপের উপর যে স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করা হয় তাহাকে চাপ (Arc) স্থিতিস্থাপকতা বল হয়।
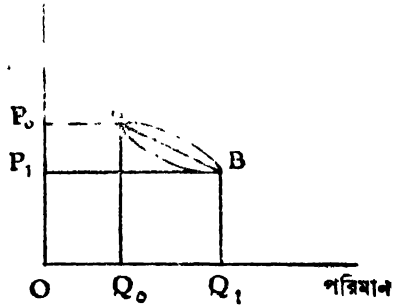
পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা (Cross Elasticity) : মনে করি ক্রেতা বাজারে X এবং Y এই দুইটি জিনিস কিনিবে। মনে করি X-র চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১ হইতে বেশী। ক্রেতা এমনভাবে তাহার আয়কে X এবং Y-এর উপর বণ্টন করিয়া দিবে যাহাতে সে উভয় দিক হইতেই সম-প্রান্তিক উপযোগ লাভ করে। এখন মনে করি, X-এর দাম কোন কারণে কমিয়া গেল। যেহেতু X-এর স্থিতিস্থাপকতা ১ হইতে বেশী, সুতরাং X-এর উপর মোট ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং এই অতিরিক্ত অর্থ Y হইতে সরাইয়া আনিয়া X-এর উপর ব্যয় করিতে হইবে। অতএব Y-এর ক্রয়ের পরিমাণ ব্যাহত হইবে। Y-এর ক্রয়ের পরিমাণ কতটা কমিবে তাহা নির্ভর করিবে Y-এর পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার উপর (cross elasticity)। পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতাকে আমরা নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারি।

পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা বা cross elasticity

$$= \frac{\text{Y-এর চাহিদার শতকরা পরিবর্তন}}{\text{X-এর দামের শতকরা পরিবর্তন}} = \frac{\Delta Y}{Y} \div \frac{\Delta PX}{PX}$$

এখানে Y এবং ΔY হইল Y-এর ক্রয়ের প্রারম্ভিক এবং পরিবর্তিত অবস্থা এবং PX ও ΔPX হইল যথাক্রমে X-এর মূল্যের প্রারম্ভিক এবং পরিবর্তিত অবস্থা।

আয়গত স্থিতিস্থাপকতা (Income Elasticity of Demand) : কেবলমাত্র দাম কমিলেই যে ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এমন নয়। ক্রেতার আয়

বৃদ্ধি পাইলে ক্রেতা একই দামে বেশী পরিমাণ জিনিস কিনিতে পারে। সুতরাং আয়ের পরিবর্তনের সহিত চাহিদার পরিবর্তনের সম্পর্ক স্থাপন করা যাইতে পারে। ইহাকে আয়গত স্থিতিস্থাপকতা বলে। ইহার সংজ্ঞা নিম্নলিখিত রূপ :

$$\text{আয়গত স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{চাহিদার শতকরা পরিবর্তন}}{\text{আয়ের শতকরা পরিবর্তন}}$$

প্রতিস্থাপনগত স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Substitution): প্রতিস্থাপনগত স্থিতিস্থাপকতা ব্যাখ্যা করিতে হইলে দুইটি জিনিস (ধরা যাক এক্ষেত্রে X এবং Y) বিবেচনা করিতে হয়, এবং একটির অনুপাতে অপরটির প্রান্তিক গুরুত্ব (Marginal significance) কতটা পরিবর্তিত হইতেছে ও সেই ভিত্তিতে দুইটি জিনিসের অনুপাত আপেক্ষিকভাবে কতটা বাড়িয়াছে তাহাও বিবেচনা করিতে হয়। প্রতিস্থাপনগত স্থিতিস্থাপকতা নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

$$\text{প্রতিস্থাপনগত স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Substitution)} = \frac{\text{দুইটি জিনিসের অনুপাতের (X/Y) আপেক্ষিক বৃদ্ধি (Relative increase in the ratio of two goods possessed X/Y)}}{\text{Y-এর অনুপাতে X-এর প্রান্তিক গুরুত্বের আপেক্ষিক হ্রাস (Relative decrease in marginal significance of X in terms of Y)}}$$

মূল্য স্থিতিস্থাপকতার সঙ্গে আয়গত স্থিতিস্থাপকতা এবং প্রতিস্থাপনগত স্থিতিস্থাপকতার সম্পর্ক :

চাহিদার মূল্য-স্থিতিস্থাপকতা (Price Elasticity of Demand) চাহিদার, আয়গত স্থিতিস্থাপকতা (Income Elasticity of Demand) এবং প্রতিস্থাপনগত স্থিতিস্থাপকতার (Elasticity of Substitution) উপর নির্ভরশীল। নিম্নলিখিত সমীকরণ দ্বারা তাহা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

$$e_p = K_x . e_i + (1 - K_x) e_s$$

এখানে e_p হইতেছে চাহিদার মূল্যস্থিতিস্থাপকতা; e_i হইতেছে চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা; e_s হইতেছে প্রতিস্থাপনগত স্থিতিস্থাপকতা; K_x হইতেছে, বর্ধিত আয়ের যতটা অংশ X কিনিবার জন্য খরচ করা হইতেছে ততটা (ইহা আয়গত স্থিতিস্থাপকতার উপর, অর্থাৎ e_i-এর উপর নির্ভরশীল); এবং $(1 - K_x)$ হইতেছে বর্ধিত আয়ের যতটা অংশ X এর পরিবর্তে ইহার বিকল্প জিনিসের জন্য খরচ করা হইয়াছে ততটা (ইহা প্রতিস্থাপনগত স্থিতিস্থাপকতা অর্থাৎ; e_s-এর উপর নির্ভরশীল)। দেখা যাইতেছে চাহিদার মূল্যস্থিতিস্থাপকতা একদিকে আয়গত স্থিতিস্থাপকতা এবং অপরদিকে প্রতিস্থাপনগত স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভরশীল।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার নিয়ন্ত্রণকারী কারণসমূহ (Factors governingElasticity of Demand) : চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা প্রধানতঃ নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট জিনিসটির কোনও বিকল্প (Substitute) জিনিস আছে কি না ইহার উপর। যে জিনিসের বিকল্প সামগ্রী যত বেশী সেই জিনিসের চাহিদাও তত বেশী স্থিতিস্থাপক। দ্বিতীয়ত, একান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলির চাহিদা সাধারণতঃ অস্থিতিস্থাপক। লবণের কোনও বিকল্প সামগ্রী নাই এবং ইহা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। সেইজন্য লবণের জন্য আমাদের চাহিদা খুবই অস্থিতিস্থাপক। তৃতীয়ত, বিলাস সামগ্রীগুলির (Luxury goods) জন্য চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়। সাধারণ লোকের পক্ষে হয়ত একটি মোটর গাড়ী অপরিহার্য নয়। কিন্তু যদি মোটর গাড়ী সস্তা হইয়া যায়, তবে অনেকেই, যাহারা আগে মোটর গাড়ী কিনিবার কথা ভাবিত না, এখন মোটর গাড়ী কিনিতে চাহিবে। আবার আমাদের কাছে যাহা বিলাস সামগ্রী অন্য লোকের কাছে তাহা খুব প্রয়োজনীয় সামগ্রী। সুতরাং আমাদের কাছে যে জিনিসের চাহিদা স্থিতিস্থাপক, অন্য লোকের কাছে সেই জিনিসের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইতে পারে। আমার কাছে মোটর গাড়ী বিলাস সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইলেও একজন চিকিৎসকের কাছে একটি মোটর গাড়ী প্রয়োজনীয় সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কি কি উপাদানের উপর নির্ভর করে
১

আবার আমার যদি মোটর গাড়ী কিনিবার ক্ষমতা থাকে, তবে আমি বড়লোক বলিয়াই হয়ত ইহাকে একটি প্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসাবে গণ্য করিতে পারি। এক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ক্রেতার আয়ের উপর নির্ভর করে।

কোন জিনিসের প্রচলিত দাম যদি খুব কম থাকে, তবে সেই জিনিসটির চাহিদা সাধারণতঃ অপরিবর্তনীয় থাকে। আবার যদি কোন জিনিসের প্রচলিত দাম খুব বেশী থাকে সেই জিনিসটির দামের সামান্য পরিবর্তন চাহিদাকে সাধারণতঃ বিশেষভাবে প্রভাবিত করে না। তাহা ছাড়া, যে সমস্ত জিনিসের উপর আমরা আয়ের অতি সামান্য অংশই খরচ করিয়া থাকি, সেই জিনিসগুলির চাহিদা সাধারণতঃ দামের পরিবর্তনের দ্বারা বিষেশভাবে প্রভাবিত হয় না।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার গুরুত্ব (Practical importance of the concept of elasticity of demand) : চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার তত্ত্বটি বাস্তব ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকর হয়। দেশে যদি জিনিসপত্রের দাম পরিবর্তিত হয় তবে তাহা ক্রেতাদের চাহিদার উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাহা আমরা জিনিসগুলির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হইতে জানিতে পারি। এইভাবে জিনিসপত্রের দামের পরিবর্তন হইতে আমরা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধেও একটি ধারণা করিতে-পারি।

দ্বিতীয়ত, সরকারের কর ধার্য করিবার নীতি নিরূপণ করিবার সময়েও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার তত্ত্বটি কার্যকর হয়। কোন জিনিসের উপর কর ধার্য করা হইলে

উহা করদাতাগণের করপ্রদান ব্যাপারে কিরূপ বোঝার (Incidence of Taxation) সৃষ্টি করিবে তাহা আমরা সংশ্লিষ্ট জিনিসটির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হইতে জানিতে পারি। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলিতে পারি, লবণের চাহিদা সর্বদাই অস্থিতিস্থাপক, সুতরাং যদি লবণের উপর কর ধার্য করা হয়, তবে ইহা করদাতাগণের উপর একটি বোঝার সৃষ্টি করিবে। আবার কোন বিলাস-সামগ্রীর চাহিদা হয়ত স্থিতিস্থাপক, সুতরাং ইহার উপর কর ধার্য করা হইলে জনগণের উপর ইহা একটি বড রকমের বোঝার সৃষ্টি করিবে না। অতএব, দেখা যাইতেছে কোন জিনিসের উপর কর ধার্য করিবার আগে সরকারকে দেখিতে হয় জিনিসটির জন্য লোকের চাহিদা স্থিতিস্থাপক কিনা।

তৃতীয়ত, একচেটিয়া ব্যবসায়ীগণের (monopolists) কোন জিনিস উৎপাদন এবং ইহার মূল্য নির্ধারণ করিবার ব্যাপারে এই তত্ত্বটি বিশেষ উপযোগী। যদি কোনও জিনিসের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়, তবে একচেটিয়া ব্যবসায়ী যতখুশী জিনিসটির দাম বাড়াইতে পারে না। আবার যদি জিনিসটির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে একচেটিয়া কারবারী বিক্রয়ের পরিমাণ কমাইয়াও বেশী দামে জিনিসটি বিক্রয় করিতে পারে এবং অধিক মুনাফা অর্জন করিতে পারে।

চতুর্থত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটির কার্যকারিতা দেখা যায়। আমাদের দেশের কোনও জিনিসের জন্য (যেমন পাট অথবা চা) যদি বিদেশীদের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয় তবে তাহারা সেই জিনিসটি বেশী করিয়া আমদানি করিবে; আমরাও সেই জিনিসটি বেশী করিয়া রপ্তানি করিতে পারিব। সুতরাং কোন দেশের বাণিজ্য ব্যালান্স (Balance of trade) অনুকূল (favourable) থাকিবে কিনা তাহা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে আমাদের রপ্তানি-যোগ্য জিনিসগুলির জন্য বিদেশীদের চাহিদার অস্থিতিস্থাপকতার উপর। আবার দুই দেশের মুদ্রার বিনিময় হারও নির্ভর করে একটি দেশের প্রতি অপর দেশের মুদ্রার জন্য চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এবং দুই মুদ্রার যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর।

সর্বশেষে, শ্রমজীবীদের মজুরি নিরূপণ করিবার সময়ও এই তত্ত্বটির কার্যকারিতা দেখা যায়। যদি কোন একটি কাজের জন্য একজন বিশেষ পারদর্শী শ্রমিকের প্রয়োজন হয় এবং যদি সেই শ্রমিকের জন্য মালিকের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে শ্রমিক মালিকের নিকট হইতে বেশী মজুরি আদায় করিতে পারে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাস্তব ক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার যথেষ্ট কার্যকারিতা আছে।

ভোগোদ্বৃত্ত (Consumer's Surplus): অধ্যাপক মার্শাল ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্বটির অবতারণা করেন। ক্রেতা যে দামে কোন জিনিস কিনিতে প্রস্তুত থাকে, অনেক সময় তাহা অপেক্ষা কম দামে সে সেই জিনিস কিনে; সাধারণ অর্থে ইহাকেই

আমরা ভোগোদ্বৃত্ত বলি। মোট উপযোগ এবং প্রান্তিক উপযোগের সাহায্যে ভোগোদ্বৃত্ত নির্ধারণ করা যায়।

ক্রেতা যে দামে কোন জিনিস কিনিতে চাহে, তাহাকে আমরা ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা-মূল্য (individual demand price) বলি এবং যে দামে ক্রেতা বাস্তবিকপক্ষে জিনিস কেনে, তাহাকে আমরা বাজার মূল্য (market price) বলি। ব্যক্তিগত চাহিদা-মূল্য বাজার-মূল্য হইতে যত বেশী, তত হইতেছে ভোগোদ্বৃত্তের (consumer's surplus) পরিমাণ। যদি কোন জিনিসের জন্য ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা-মূল্য হঠাৎ বাড়িয়া যায় অথচ বাজার-মূল্য ঠিক থাকে, তবে ভোগোদ্বৃত্ত বেশী হয়। আবার যদি ব্যক্তিগত চাহিদা-মূল্য বাজার-মূল্যের সমান হয় তবে ভোগোদ্বৃত্ত থাকে না। ধরা যাক, একজন ক্রেতা একটি কমলালেবু ছয় আনা দিয়া কিনিতে চায়। দ্বিতীয় কমলালেবুটি কিনিতে হইলে সে পাঁচ আনা দিতে রাজী থাকে। তৃতীয় কমলালেবুটি কিনিতে হইলে সে চার আনা দিতে প্রস্তুত। চতুর্থ কমলালেবুটি কিনিবার সময় সে তিন আনা দিতে প্রস্তুত; এক্ষেত্রে চতুর্থ কমলালেবুর জন্য সে যাহা দিতে প্রস্তুত আছে তাহাই প্রান্তিক উপযোগ। বাজার দর প্রান্তিক উপযোগের সমান। সুতরাং এক্ষেত্রে বাজার-দর হইতেছে তিন আনা, এবং তিন আনায় সে চারিটি কমলালেবু কিনিতেছে। চারিটি কমলালেবুর জন্য তাহাকে মোট বার আনা খরচ করিতে হইতেছে যদিও চারিটি লেবুর জন্য সে মোট আঠারো আনা বা এক টাকা দুই আনা (ছয় আনা + পাঁচ আনা + চার আনা + তিন আনা) দিতে প্রস্তুত। এক্ষেত্রে ক্রেতা মোট ছয় আনার (১৵০ − ৸০) ভোগোদ্বৃত্ত বা উদ্বৃত্ত তৃপ্তি (Surplus satisfaction) লাভ করিয়াছে। প্রথম কমলালেবুর ক্ষেত্রে তিন আনা, দ্বিতীয় কমলালেবুর ক্ষেত্রে দুই আনা এবং তৃতীয় কমলালেবুর ক্ষেত্রে এক আনা,—মোট ছয় আনা ভোগোদ্বৃত্ত হইয়াছে। চতুর্থ কমলালেবু হইতে ক্রেতার কোন উদ্বৃত্ত তৃপ্তি নাই। নিম্নলিখিত সূত্রটির সাহায্যে আমরা এই তত্ত্বটি মনে রাখিতে পারি :

ভোগোদ্বৃত্ত = মোট উপযোগ − (প্রান্তিক উপযোগ × ক্রীত জিনিসের সংখ্যা)।
Consumer's Surplus − Total Utility − (Marginal Utility × Number of units purchased)

যদি বাজার-মূল্য ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা-মূল্য অপেক্ষাও বেশী হয়, তবে ক্রেতার তো কোন উদ্বৃত্ত থাকেই না বরং উৎপাদকের কিছু উদ্বৃত্ত (Producer's surplus) থাকে। ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্বটিকে আমরা নিম্নের চিত্রটির সাহায্যে বুঝাইতে পারি।

নিম্নের ২৭ নং চিত্রে OX রেখা দ্বারা ক্রয়ের পরিমাণ এবং OY রেখা দ্বারা দাম ও উপযোগ বুঝাইতেছে। যখন ক্রেতা জিনিসটির OQ ইউনিট কিনে, তখন সে QP পরিমাণ উপযোগ পায় এবং ইহার পর যখন সে QM ইউনিট কিনে; তখন সে MN পরিমাণ প্রান্তিক উপযোগ পায়। মোট OM জিনিস কিনিবার জন্য ক্রেতা যে একটা পরিমাণ টাকা খরচ করিতে প্রস্তুত আছে। মোট উপযোগের ভিত্তিতে

ক্রেতা এই পরিমাণ টাকা খরচ করিতে পারে। কিন্তু দাম প্রান্তিক উপযোগের (এক্ষেত্রে MN) সমান হয় বলিয়া বাজারে OP দাম নির্ধারিত হইবে। সুতরাং এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত চাহিদা-মূল্য বাজার মূল্য হইতে DNP পরিমাণ বেশী হইতেছে। সুতরাং OP হইবে বাজার-মূল্য এবং এই দামেই ক্রেতা OQ এবং QM ইউনিট কিনিবে। ইহাতে ক্রেতা মোট DNP পরিমাণ অতিরিক্ত তৃপ্তি পাইতেছে। কারণ এই দুইটি জিনিস হইতে ক্রেতার মোট উপযোগ হইতেছে DOMN পরিমাণ এবং এখানে প্রান্তিক উপযোগ হইতেছে MN। এক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগকে দুই দিয়া গুণ করিলে (Mg. Utility × Number of units) উপযোগের পরিমাণ দাঁড়ায় OPNM ; মোট উপযোগ (অর্থাৎ ODNM) হইতে প্রান্তিক উপযোগের সমষ্টি OPNM) বাদ দিলে যাহা থাকে (অর্থাৎ, DNP) তাহাই ক্রেতার অতিরিক্ত তৃপ্তি। ইহাকেই আমরা ভোগোদ্বৃত্ত বলি। এই চিত্রে ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাণটিকে কয়েকটি বিন্দু দিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে।
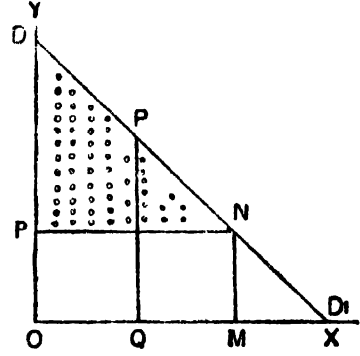
চিত্র নং ২৭

ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্বের সমালোচনা (Criticisms of the theory of Consumer's Surplus): ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্বটি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগের নিয়মের (Law of Diminishing Marginal Utility) উপর ভিত্তিশীল। প্রথমত, এই তত্ত্বে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে বাজারের বিভিন্ন আয়ের ক্রেতাদের নিকট টাকার প্রান্তিক উপযোগিতা সমান। কিন্তু, এই ধারণাটি ঠিক নয়। মার্শাল বলেন যে ক্রেতা যদি তাহার আয়ের খুব সামান্য অংশ ভোগের জন্য খরচ করে, তবে টাকার প্রান্তিক উপযোগ বিশেষ পরিবর্তিত হয় না। কিন্তু, যখন ক্রেতা তাহার আয়ের অধিকাংশই কোন জিনিস কিনিবার জন্য খরচ করে, তখন টাকার প্রান্তিক উপযোগ সমান থাকে না। অধ্যাপক হিক্‌স্ (Prof. Hicks) ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্বটির সংস্কার করিয়াছেন। কোন জিনিসের দাম কমিয়া গেলে লোকের সেই পরিমাণ আয় বাড়িয়া যায়। ভোগোদ্বৃত্ত অনেকটা সেই বর্ধিত আয়ের মত। আমি হয়ত কোন জিনিসের পাঁচ ইউনিট তিন টাকা দরে কিনিতেছি। যদি জিনিসটির প্রতি ইউনিটের দাম দুই টাকা হইয়া যায় তবে পাঁচ ইউনিট কিনিবার সময় আমার পাঁচ টাকা বাঁচিবে। এই পাঁচ টাকা দিয়া আমি অন্য জিনিস কিনিতে পারি, সুতরাং এক্ষেত্রে জিনিসটির দাম কমিয়া যাওয়ার দরুণ আমার ভোগোদ্বৃত্ত পাঁচ টাকার কম হইবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে

হিক্‌স্ কর্তৃক ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্বটির পুনর্বাসন

বিবেচনা করিয়া অধ্যাপক হিক্‌স্ বলেন, "...the best way of looking at consumer's surplus is to regard it as a means of expressing, in terms of money income, the gain which accrues to the consumer as a result of a fall in price."

অধ্যাপক হিক্‌স্ চার প্রকার ভোগোদ্বৃত্তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা, (i) Quantity Compensating Variation in income. (ii) Quantity Equilibrating Variation in Income, (iii) Price Compensating Variation in income and (iv) Price Equilibrating Variation in income. কোন জিনিস যদি বাজার হইতে প্রত্যাহার (withdraw) করা হয় এবং এইজন্য যদি ক্রেতা ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তবে যতটা ক্ষতিপূরণ পাইলে ক্রেতা পুনরায় তাহার আগেকার পছন্দের স্তরে (level of satisfaction) ফিরিয়া যাইতে পারে, ততটাই হইতেছে *Quantity Compensating Variation in Income*। অনুরূপভাবে যদি কোন জিনিসের দাম বাড়িয়া যাইবার জন্য ক্রেতার ক্ষতি হয় এবং সেই ক্ষতিপূরণ, দিলে যদি ক্রেতা আগেকার পছন্দের স্তরে ফিরিয়া যাইতে পারে. তবে সেই ক্ষতিপূরণের পরিমাণটিকে আমরা বলিতে পারি *Price Compensating Variation in Income*। আবার, যদি বাজারে কোন জিনিসের যোগান বাড়িয়া যাইবার জন্য ক্রেতার পছন্দের স্তর অনেক উঁচুতে উঠিয়া যায়, তবে তাহার উপর যতটা পরিমাণ কর ধার্য করিলে অথবা অন্য কোন প্রকার চাপ দিলে সে পুনরায় আগেকার পছন্দের স্তরে ফিরিয়া আসিতে পারে, ততটাই হইতেছে *Quantity Equilibrating Variation in Income*। অনুরূপভাবে যদি কোন জিনিসের দাম কমিয়া যাইবার জন্য ক্রেতার অতিরিক্ত সুবিধা হইয়া যায় তবে দাম যতটা কমাইলে সে পুনরায় আগেকার পছন্দ স্তরে ফিরিয়া আসিতে পারে ততটাই হইতেছে *Price Equilibrating Variation in Income*। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত চাহিদা-মূল্য (Individual demand Price) একেবারেই আনুমানিক। কোন জিনিস যদি বাজারে পাওয়া না যায়, তবে ইহার জন্য আমরা কত দাম দিতে প্রস্তুত থাকিব, তাহা বলা শক্ত। এই সমালোচনার উত্তরে বলা হয় যে ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা-মূল্য আনুমানিক হইলেও বাজার-মূল্য যদি পরিবর্তিত হয়, তাহা ক্রেতার উপর কি প্রতিক্রিয়া করিবে, তাহা বলা শক্ত নয়।

দ্বিতীয়ত, যে সমস্ত জিনিসের বিকল্প জিনিস (substitutes) বা প্রতিযোগী জিনিস পাওয়া যায়, সেইগুলির ক্ষেত্রে ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাপ করা যায় না। অধ্যাপক মার্শালের মতে বিকল্প জিনিসগুলিকে একই চাহিদার তালিকাভুক্ত করিতে পারিলে এই অসুবিধা দূর করা যায়।

তৃতীয়ত, প্যাটেন (Patten) এই তত্ত্বের সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে একজন ক্রেতা যতই একটি জিনিস কিনিতে থাকিবে, ততই তাহার নিকট

প্রাক্তন ইউনিটগুলির উপযোগ কমিয়া আসিবে, এবং অবশেষে ক্রেতা এমন একটি অবস্থায় উপনীত হইবে যখন জিনিসটি আরও বেশী করিয়া কিনিলেও আর ভোগোদ্বৃত্ত থাকিবে না।

সর্বশেষে, এই তত্ত্বটির প্রকৃতই কোন উপযোগিতা আছে কিনা সেই বিষয়ে অধ্যাপক নিকলসন (Prof. Nicholson) সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ১০০ পাউণ্ডের উপযোগ ১০০ পাউণ্ডের উপযোগের সমান বলিবার কোনই বাস্তব প্রয়োজনীয়তা নাই। অধ্যাপক মার্শাল কিন্তু মনে করেন যে দুইটি দেশের অর্থনৈতিক মানের তুলনা করিবার জন্য এই তত্ত্বটির সার্থকতা আছে।

ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাণ সঠিক ভাবে পরিমাপ না করিতে পারিলেও এই তত্ত্বটির মোটেই উপযোগিতা নাই, একথা বলা ঠিক নয়। যদিও এই তত্ত্বটির কতিপয় ত্রুটি আছে, তবুও ইহার বাস্তব কার্যকারিতা আছে।

ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্বটির বাস্তব কার্যকারিতা (Practical utility of the concept of Consumer's Surplus): প্রথমত, এই তত্ত্বটি হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে দাম এবং তৃপ্তি বা উপযোগ বলিতে এক জিনিস বুঝায় না। দাম এবং উপযোগের মধ্যে পার্থক্য থাকিতে পারে। লবণ জিনিসটির উপযোগ খুবই বেশী; কিন্তু সেই অনুপাতে দাম হয়ত খুব অল্প। এই তত্ত্বের সাহায্যে ব্যবহারিক মূল্য এবং বিনিময় মূল্যের পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভবপর।

দ্বিতীয়ত, এই তত্ত্বটির সাহায্যে এক দেশের লোক যে পরিমাণ উপযোগ পায় তাহার সহিত অন্য দেশের লোক একই জিনিস ব্যবহার হইতে যে উপযোগ পায় তাহার তুলনা করা চলে। ইহা হইতেই আমরা দুই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার একটি তুলনা করিতে পারি।

তৃতীয়ত, একচেটিয়া কারবারে বিক্রেতা যখন কোন জিনিসের দাম স্থির করে তখন এই তত্ত্বটি বিশেষ কার্যকর হয়। কারণ, বিক্রেতা এমনভাবে দাম স্থির করে যেন ভোগকারীর কোন উদ্বৃত্তই না থাকে।

চতুর্থত, কর ধার্য করিবার সময়েও সরকারী নীতি নির্ধারণে এই তত্ত্বটি বিশেষ সহায়ক। সরকার এমন জিনিসের উপর কর ধার্য করিবে যেগুলি হইতে ক্রেতারা যথেষ্ট পরিমাণে উদ্বৃত্ত তৃপ্তি পাইয়া থাকে এবং যে কর ধার্য করিলে তাহারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। সরকার সাধারণতঃ এমন ভাবে কর ধার্য করেন যাহার ফলে ক্রেতাদেরও কিছু পরিমাণে উদ্বৃত্ত তৃপ্তি থাকে এবং সরকারের রাজস্ব কিছু পরিমাণে বাড়ে।

সবশেষে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও এই তত্ত্বটির কার্যকারিতা আছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কতিপয় বিদেশী জিনিস আমদানি করিয়া এবং সেইগুলি ব্যবহার করিয়া যদি বেশী উপযোগ পাওয়া যায়, তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে।

Exercise

1. Explain the Law of Diminishing Marginal Utility. State the relation between Marginal Utility and Total Utility with illustrations.

[ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগের নিয়মটি ব্যাখ্যা কর। প্রান্তিক উপযোগ এবং মোট উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা কর।] (৭৩-৭৫ পৃষ্ঠা)

2. What do you mean by an indifference curve? What are its properties? How can you explain the equilibrium of the consumer in terms of an indifference map? [নিরপেক্ষ রেখা বলিতে তুমি কি বুঝ? ইহার কি কি বৈশিষ্ট্য? নিরপেক্ষ রেখা অবলম্বনে তুমি কি ভাবে ক্রেতার ভারসাম্য ব্যাখ্যা করিতে পার?] (৭৭-৮১ পৃষ্ঠা ; ৮৩-৮৫ পৃষ্ঠা)

3. How can you explain the equilibrium of a consumer in terms of the indifference curve analysis. [নিরপেক্ষ রেখার বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুমি কি ভাবে ক্রেতার ভারসাম্য ব্যাখ্যা করিতে পার?] (৭৯-৮১ পৃষ্ঠা ; ৮৩-৮৫ পৃষ্ঠা)

4. Write a note on "Inferior Goods." ["নিকৃষ্ট জিনিসের" উপর একটি টীকা লিখ।] (৮৫ পৃষ্ঠা)

5. Explain the concept of price elasticity of demand. What are the primary determinants of the price elasticity of demand for a commodity? ["চাহিদার মূল্য স্থিতিস্থাপকতা"র ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। কোন জিনিসের মূল্য স্থিতিস্থাপকতা নিরূপণকারী প্রাথমিক উপাদানগুলি কি কি?] (৯০-৯৪ পৃষ্ঠা ; ৯৬-৯৭ পৃষ্ঠা)

6. How would you measure Price Elasticity of Demand.
[তুমি কি ভাবে চাহিদার মূল্য স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করিবে?] (৯০-৯৩ পৃষ্ঠা)

7. How would you derive the Law of Demand from Indifference curve analysis? [নিরপেক্ষ রেখার বিশ্লেষণ হইতে তুমি কিভাবে চাহিদার নিয়ম নির্ণয় করিতে পার?] (৮৭-৯০ পৃষ্ঠা)

8. Distinguish between Income effect and Substitution Effect. How is the Law of Demand related to these concepts. [আয়-প্রভাব এবং প্রতিস্থাপন প্রভাবের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। চাহিদার নিয়ম এই ধারণাগুলির সহিত কি ভাবে জড়িত?] (৮১-৮৩ পৃষ্ঠা, ৮৬ পৃষ্ঠা ; ৮৭-৮৮ পৃষ্ঠা)

9. Show that Price effect is composite of income effect and Substitution effect. মূল্য-প্রভাব যে আয়-প্রভাব এবং প্রতিস্থাপন-প্রভাবের সংমিশ্রণ তাহা দেখাও।] (৮২-৮৩ পৃষ্ঠা)

10. Explain why demand curves slopes downwards to the rights.
[চাহিদা রেখা ডান দিকে নিম্নাভিমুখী কেন তাহা ব্যাখ্যা কর।]

[সংকেত : এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে চাহিদার নিয়ম ব্যাখ্যা করিতে হইবে এবং দেখাইতে হইবে যে দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়িলে চাহিদা কমে বলিয়াই চাহিদা রেখা নিম্নাভিমুখী হইবে ; তাহা না হইলে এই নিয়মের ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। ৮৮ পৃষ্ঠায় অঙ্কিত ১৬ নং চিত্রের সাহায্যে দেখাও যে চাহিদার নিয়ম আয়-প্রভাব এবং প্রতিস্থাপন-প্রভাবের উপর নির্ভরশীল বলিয়া এবং প্রকৃতপক্ষে ইহা মূল্য-প্রভাবকে প্রকাশিত করে বলিয়া যেভাবে চাহিদা রেখা অঙ্কিত হয় তাহা ডান দিক নিম্নাভিমুখী। ১৬ নং চিত্রে R_1, R_2, R_3, R_4, R_5 রেখা ইহাই দেখাইতেছে।]

11. What are the factors governing elasticity of demand?
[চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নিয়ন্ত্রণকারী উপাদানগুলি কি কি?] (৯৬-৯৭ পৃষ্ঠা)

12. Write notes on :

(a) Are Elasticity, (b) Cross Elasticity, (c) Income elasticity and (d) Elasticity of Substitution.

[টীকা লিখ :— (ক) চাপ স্থিতিস্থাপকতা, (খ) পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা, (গ) আয়গত স্থিতিস্থাপকতা, (ঘ) প্রতিস্থাপনগত স্থিতিস্থাপকতা ।] (৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা)

13. Write a note on the Law of Equi-marginal Utility. [সমপ্রান্তিক উপযোগের নিয়মটির উপর একটি টীকা লিখ ।] (৭৫-৭৭ পৃষ্ঠা)

14. Discuss the practical Utility of the concept of Elasticity of Demand.

[চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ধারণাটির বাস্তব উপাদান আলোচনা কর ।] (৯৭-৯৮ পৃষ্ঠা)

15. Write short notes on :

(a) Income Effect. (b) Substitution Effect, and (c) Price Effect. [সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :—(ক) আয় প্রভাব, (খ) প্রতিস্থাপন প্রভাব এবং (গ) মূল্য প্রভাব ।] (৮১-৮৩ পৃষ্ঠা)

16. If a consumer is at a point on his consumption posibility line where it crosses an indifference curve. Explain why he cannot have reached equilibrium. Which way would he move ?

[কোন ক্রেতা যদি তাহার ভোগ-সম্ভাবনা রেখার উপর এমন একটি বিন্দুতে থাকে যেখানে ইহা নিরপেক্ষ রেখাকে ছেদ করে, তবে কেন সে ভারসাম্য অর্জন করিতে পারে না তাহা ব্যাখ্যা কর। তাহাকে তখন কোন পথে চলিতে হইবে ?] (৮২-৮৫ পৃষ্ঠা)

17. Explain Marshall's doctrine of Consumer's Surplus and comment on its Theoretical validity and practical utility. [মার্শালের ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্বটি ব্যাখ্যা কর এবং ইহার তত্ত্বগত যৌক্তিকতা ও বাস্তব উপযোগিতার উপর মন্তব্য কর ।] (৯৮-১০১ পৃষ্ঠা)

18. How was Professor Hicks rehabilitated the doctrine of consumer's surplus. [অধ্যাপক হিক্স কিভাবে ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্বটির পুনর্বাসন করিয়াছেন ?] (১০০-১০২ পৃষ্ঠা)

নবম অধ্যায়

জিনিসের যোগান ও উৎপাদন খরচ (Supply of Commodity and Cost of Production)

যোগানের নিয়ম (Law of Supply) : যোগানের নিয়ম অনুযায়ী কোন জিনিসের দাম বাড়িয়া গেলে জিনিসটির যোগান বাড়িয়া যায় এবং দাম কমিয়া গেলে যোগান কমিয়া যায় । একটি যোগান তালিকার (Supply Schedule) সাহায্যে ইহা বুঝান যাইতে পারে । নিম্নে একটি যোগান তালিকা দেওয়া হইল ।

জিনিসের দাম	জিনিসের যোগান
৮৲	১০০ ইউনিট
৬৲	৮০ ইউনিট
৫৲	৭০ ইউনিট
৪৲	৬০ ইউনিট

এই তালিকায় দেখা যাইতেছে, কোন জিনিসের দাম যতই কমে যোগানও ততই কমে, ইহাই যোগানের নিয়ম। নিম্নের চিত্রের সাহায্যে ইহা দেখানো হইয়াছে।

এই চিত্রে OX রেখা দ্বারা কোন জিনিসের দাম এবং OY রেখা দ্বারা ইহার যোগান সূচিত হইতেছে। যখন জিনিসের দাম AA′ তখন জিনিসটির যোগান হইতেছে OA; যখন দাম বাড়িয়া হইতেছে BB′, তখন যোগান বাড়িয়া হইতেছে OB; আবার যখন দাম আরও বাড়িয়া CC′ হইতেছে, তখন যোগান আরও বাড়িয়া হইতেছে OC। এইভাবে দাম বাড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসটির যোগান বাড়িয়া যাইতেছে। বিকল্পভাবে বলা যাইতে পারে, দাম কমিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসটির যোগান কমিয়া যায়।
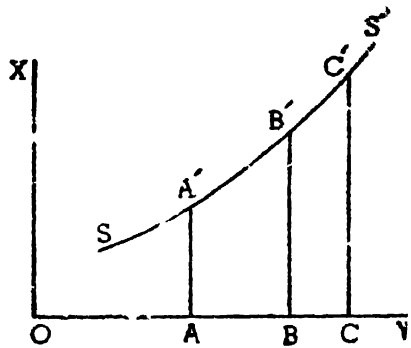
চিত্র নং ২৮

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Supply): কোন জিনিসের দামের সামান্য পরিবর্তন হইলে যোগান যে হারে পরিবর্তিত হয় তাহাকে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলে। ধরা যাক্, কোন জিনিসের দাম যখন চার টাকা তখন ইহার যোগানের পরিমাণ পঁচিশ ইউনিট। যখন জিনিসের দাম বাড়িয়া আট টাকা হয়, তখন ইহার যোগানের পরিমাণ বাড়িয়া পঞ্চাশ ইউনিট হয়। এই ক্ষেত্রে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা ১। কিন্তু দাম চার টাকা হইতে আট টাকা পর্যন্ত বাড়িয়া গেলে যদি যোগান পঁচিশ হইতে একশত ইউনিট পর্যন্ত বাড়িয়া যায় তবে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা ১ অপেক্ষা বেশী আবার দাম বাড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও যদি জিনিসটির যোগান স্থির থাকে, তবে যোগান সম্পূর্ণভাবে অস্থিতিস্থাপক (inelastic), এবং দাম যে হারে বাড়ে যোগান যদি সেই হারে না বাড়ে তবে জিনিসটির যোগান আপেক্ষিক ভাবে অস্থিতিস্থাপক (relatively inelastic) বা ১ হইতে কম।

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা আমরা নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করিতে পারি।

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা,

$$Es = \frac{\text{যোগানের শতকরা পরিবর্তন}}{\text{দামের শতকরা পরিবর্তন}} = \frac{\Delta Q}{Q} \div \frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta Q}{Q} \times \frac{P}{\Delta P}$$

এখানে Q এবং $\triangle Q$ হইতেছে যোগানের প্রারম্ভিক এবং পরিবর্তিত অবস্থা ; P এবং $\triangle P$ হইতেছে দামের প্রারম্ভিক এবং পরিবর্তিত অবস্থা। ২৯নং চিত্রে আমরা পরিবর্তিত যোগানের স্থিতিস্থাপকতা দেখাইতে পারি।
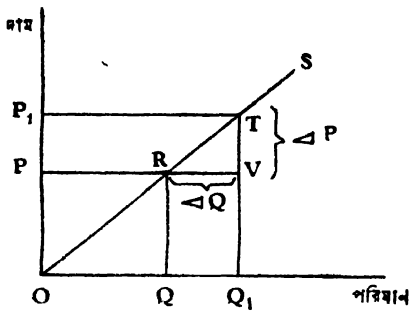
চিত্র নং ২৯

এই চিত্রে OS হইতেছে যোগান রেখা। এই যোগান রেখার উপর R এবং T দুইটি বিন্দু লইলাম। যোগানের স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা প্রয়োগ করিয়া আমরা পাইলাম,

$$Es=\frac{\triangle Q}{\triangle P}\cdot\frac{P}{Q}=\frac{RV}{TV}\cdot\frac{RQ}{OQ}$$

যেহেতু $\triangle TVR$ এবং $\triangle RQO$ সমানুপাতিক ত্রিভুজ, অতএব

$\frac{RQ}{OQ}=\frac{TV}{RV}$, সুতরাং $Es=\frac{RV}{TV}\cdot\frac{RQ}{OQ}=\frac{RV}{TV}\cdot\frac{TV}{RV}=1.$

সুতরাং উপরোক্ত যোগান রেখাটি যখন মূল বিন্দুর ভিতর দিয়া যাইবে, তখন ইহার যোগান ১ স্থিতিস্থাপকতা সম্পন্ন।

নিম্নের ৩০নং চিত্রে বিকল্পভাবে আমরা যোগানের স্থিতিস্থাপকতা দেখাইতে পারি। যদি যোগান রেখায় একটি স্পর্শক টানা হয় এবং ইহা যদি পরিমাণ অক্ষটিকে ছেদ করে, তবে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা ১ হইতে কম এবং যদি সেই স্পর্শকটি দাম অক্ষকে ছেদ করে তবে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা ১ হইতে বেশী। P বিন্দুতে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা হইতেছে ১, S বিন্দুতে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা ১ হইতে বেশী এবং Q বিন্দুতে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা ১ হইতে কম।
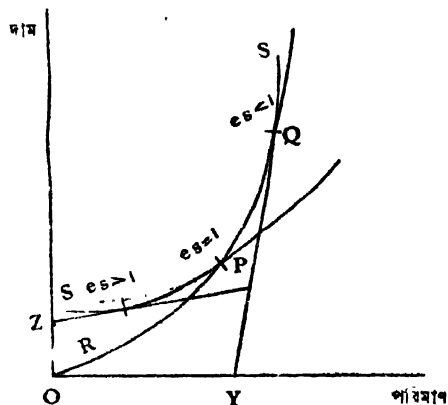
চিত্র নং ৩০

যে সকল জিনিসের উৎপাদন পদ্ধতি খুব নমনীয় (flexible), অর্থাৎ যে সকল জিনিসের উৎপাদন পদ্ধতির সহজেই পরিবর্তন করা যায়, সেই সকল জিনিসের যোগান স্থিতিস্থাপক হইতে পারে। আবার যে জিনিসগুলি স্থায়ী, সেইগুলিরও যোগান স্থিতিস্থাপক হয়। কারণ, যদি এই জিনিসগুলির দাম কমিয়া যায়, তবে বিক্রেতা সেই-

সেগুলি মজুত করিয়া রাখিতে পারে এবং যদি জিনিসগুলির দাম বাড়িয়া যায় তবে সে জিনিসগুলি বিক্রয় করিতে পারে। আবার যে সকল জিনিসের বাজার বহুদিকে প্রসারিত হয় সেই সকল জিনিসের যোগান স্থিতিস্থাপক হয়; যে বাজারে জিনিসগুলির দাম কমিয়া যায় বিক্রেতা সেই বাজারে জিনিসগুলি বিক্রয় না করিয়া অন্য বাজারে বিক্রয় করিতে পারে। তাহা ছাড়া, কোন জিনিস উৎপাদন করিবার সময় যদি দেখা যায় যে জিনিসটির উৎপাদন যে হারে বাড়ে, উৎপাদন ব্যয় তাহা অপেক্ষা বেশী হারে বাড়ে, তবে জিনিসটির যোগান অস্থিতিস্থাপক হয়। অনুরূপভাবে বলা যাইতে পারে উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত যদি উৎপাদনের ব্যয় খুব না বাড়ে, তবে জিনিসটির যোগান স্থিতিস্থাপক হয়। যোগানের স্থিতিস্থাপকতা মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। যদি কোন জিনিসের চাহিদা বাড়িয়া যায়, অথচ সেই অনুপাতে যোগান না বাড়ে, অর্থাৎ যদি যোগান অস্থিতিস্থাপক হয় তবে জিনিসের দাম বাড়িয়া যায়। মজুরি নির্ধারণ করার সময় শ্রমিকের যোগানের স্থিতিস্থাপকতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

স্থির খরচ এবং প্রাথমিক খরচ (Fixed Cost and Prime Cost): একটি জিনিস উৎপাদন করিতে যে মোট খরচ (total cost) হয় তাহার মধ্যে কিছু খরচ আছে যাহা উৎপাদন বাড়ুক আর নাই বাড়ুক সব রকম অবস্থায় নির্বাহ করিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, খাজনা, ক্ষয় ক্ষতি বাবদ ধার্য খরচ, দীর্ঘমেয়াদী ঋণের জন্য সুদ, কর্মচারীর বেতন ইত্যাদি খরচ উৎপাদককে সব অবস্থায় নির্বাহ করিতে হয়। এই প্রকার খরচকে স্থির খরচ বা নির্দিষ্ট খরচ (Fixed Cost or Overhead Cost or Supplementary Cost) বলে। আবার কতিপয় খরচ আছে যাহা পরিবর্তনীয় (Variable Cost), অর্থাৎ উৎপাদন বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে এই খরচ বাড়িয়া যায়, আবার উৎপাদন কমিবার সঙ্গে সঙ্গে এই খরচ কমিয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, উৎপাদন বাড়িলে অধিক শ্রমিক নিয়োগ করিতে হয় এবং এইজন্য শ্রমিকগণকে দেয় মজুরির মোট পরিমাণ (অর্থাৎ উৎপাদনের খরচ) বাড়িয়া যায়, অথবা উৎপাদন বাড়াইবার জন্য বেশী করিয়া কাঁচামাল কিনিতে হয় এবং এইজন্যও খরচের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। পরিবর্তনীয় খরচকে প্রাথমিক খরচও (Prime Cost) বলা হয়।

প্রাথমিক খরচ এবং স্থির খরচ, এই দুই প্রকার খরচের সমষ্টিকেই বলা হয় মোট খরচ (total cost)। আবার উৎপাদনের ক্ষেত্রে এমন অনেক জিনিস আছে যেগুলির জন্য কাহাকেও মূল্য প্রদান করিতে হয় না; যেমন, উৎপাদকের নিজস্ব মূলধন। এক্ষেত্রে উৎপাদকের নিজস্ব শ্রমের জন্য মজুরি এবং নিজস্ব মূলধনের জন্য সুদ আরোপিত মূল্য (imputed value) হিসাবে বিবেচনা করিতে হইবে এবং তাহা মোট খরচের হিসাবে ধরিতে হইবে। যদি উৎপাদক নিজেই পরিশ্রম না করিত তবে তাহাকে শ্রমিক নিযুক্ত করিতে হইত; অথবা উৎপাদক যদি নিজেই মূলধন সরবরাহ না করিত তবে তাহাকে মূলধন ধার করিতে হইত।

স্থির খরচ (Fixed Cost) এবং প্রাথমিক খরচের (Prime Cost) মধ্যে প্রকৃতপক্ষে সীমারেখা টানা যায় না। যাহা স্বল্পকালীন মূল্য নির্ণয় করিবার সময় স্থির খরচ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাই দীর্ঘকালীন দাম নির্ণয় করিবার সময় প্রাথমিক খরচ হিসাবে বিবেচিত হয়। দীর্ঘকালে উৎপাদনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সব রকমের খরচই পরিবর্তনীয় এবং তাহা মোট উৎপাদন ব্যয়ের অংশ। দীর্ঘকালীন দাম নির্ণয় করিবার সময় উৎপাদককে দেখিতে হয় যেন দাম মোট খরচ অপেক্ষা কম না হয়। কিন্তু স্বল্পকালীন দাম নির্ণয় করিবার সময় অন্ততঃ উৎপাদনের প্রাথমিক খরচ যেন উঠিয়া আসে বিক্রেতা সেই চেষ্টা করে। দীর্ঘকালীন বাজারে বাজার-দর কখনই উৎপাদন-ব্যয়ের নীচে নামিতে পারে না। যদি বাজার-দর কখনও উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা কম, হয়, তবে বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং উৎপাদন বন্ধ হইয়া যায়।

মোট খরচকে মোট উৎপাদন দিয়া ভাগ করিলে যাহা ভাগফল হয় তাহা হইতেছে উৎপাদনের গড় খরচ (average cost of production)। আবার উৎপাদনের কিছু অংশ নিযুক্ত হইবার পর যদি একটু অতিরিক্ত অংশ পুনরায় নিযুক্ত করা হয় তবে যে বাড়তি উৎপাদন হইবে, তাহা হইতেছে সেই উৎপাদনের প্রান্তিক খরচ (marginal cost of production)। প্রাথমিক বা পরিবর্তনীয় খরচেও আমরা গড় খরচ নির্ণয় করিতে পারি,—সেই খরচকে গড় পরিবর্তনীয় খরচ (average variable cost) বলা হয়। অনুরূপভাবে স্থির খরচের গড় খরচ বাহির করা যায়,—ইহাকে আমরা গড় স্থির খরচ (average fixed cost) বলি।

গড় খরচ (Average Cost Curve): গড় খরচের আকৃতি কেন ইংরাজী অক্ষর U-এর মত হয়, তাহা আলোচনা করিবার সময় আমাদের অল্প সময় এবং দীর্ঘ সময় এই দুইটি সময়ের ভিত্তিতে আলোচনা করিতে হইবে।

স্বল্পকালীন ব্যাখ্যা

স্বল্পকালে দেখা যায় যতই উৎপাদন বাড়ে, ততই গড়পড়তা স্থির খরচ ক্রমশঃ কমিয়া আসে। আবার স্বল্পকালে উৎপাদন বাড়াইতে চাহিলে পরিবর্তনীয় উপাদানগুলিকে (variable factors) ইহাদের ক্ষমতা অনুযায়ী ভালভাবে ব্যবহার করিয়া প্রথমে কিছু পরিমাণে প্রাথমিক খরচ কমাইতে পারিলেও পরিণামে উৎপাদন বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে খরচ বাড়িয়া যায়। পরবর্তী পৃষ্ঠার ৩১নং চিত্রে ইহা পরিষ্কার হইবে।

এই চিত্রে AFC রেখাটি গড় স্থির খরচ বুঝাইতেছে। উৎপাদন যতই বাড়িতেছে গড়পড়তা স্থির খরচ ততই কমিয়া যাইতেছে। AVC রেখাটি গড় পরিবর্তনীয় খরচ বুঝাইতেছে। উৎপাদন বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই গড় পরিবর্তনীয় খরচ কিছু পরিমাণে কমিয়া গেলেও পরিণামে ইহা বাড়িয়া যাইতেছে। এই দুইটি খরচের সমষ্টি হইতেছে গড় মোট খরচ। এই চিত্রে AFC এবং AVC এই দুইটি রেখার সমষ্টি হিসাবে AC বা গড় মোট খরচের রেখাটি টানা হইয়াছে। এই ঘটনাটি অল্প সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ৩১নং চিত্রে যে ভগ্ন

রেখাটি ক্রমশঃ উপরের দিকে গিয়াছে তাহা হইতেছে প্রান্তিক খরচ রেখা। স্বল্পকালীন
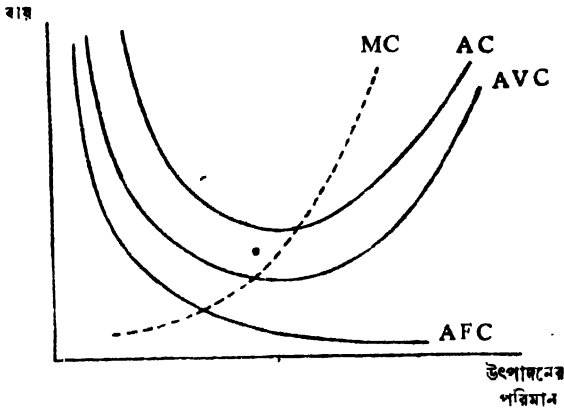
চিত্র নং ৩১

ব্যাপারে গড় মোট খরচের রেখাটি ইংরাজী অক্ষর U-র মত। নিম্নের ৩২নং চিত্রে ইহা দেখানো হইয়াছে।
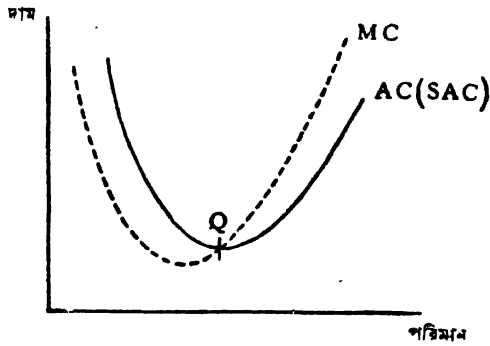
চিত্র নং ৩২

দীর্ঘকালীন বাজারেও গড়পড়তা মোট খরচের রেখাটি U-এর আকৃতি হয়। তবে সেই আকৃতি স্বল্পকালীন বাজারের মত এত প্রকট নয়। দীর্ঘকালে আমরা বিভিন্ন মাত্রায় (scales) উৎপাদন করিতে পারি। কিন্তু, স্বল্পকালে মাত্র একটি মাত্রায় উৎপাদন হয়। সেইজন্য দীর্ঘকালীন বাজারে আমরা গড় মোট খরচের যে রেখাটি আঁকি তাহাতে স্বল্পকালীন বাজারে কতিপয় উৎপাদনমাত্রা (scales of operation) অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই কথাটিকে আমরা

দীর্ঘকালীন ব্যাখ্যা

একটি উদাহরণের সাহায্যে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে পারি। ধরা যাক, আমরা কোন বৎসরে জানুয়ারী হইতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত একটি বিশেষ মাত্রা (scale) অনুযায়ী উৎপাদনের কাজ চালাইতেছি। কিন্তু এই মাত্রায় উৎপাদন বেশী পরিমাণে বাড়ানো সম্ভবপর না হওয়ায় আমরা আবার মে মাস হইতে আগস্ট মাস পর্যন্ত অন্য একটি মাত্রায় উৎপাদন করিতেছি। কিন্তু, এই মাত্রায়ও উৎপাদন একটি নির্দিষ্ট সীমার বেশী বাড়ানো যায় না। সেজন্য আমাদের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত আর একটি মাত্রায় উৎপাদনের কাজ চালাইতে হইয়াছে। এখন জানুয়ারী মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এই এক বৎসরে আমরা নির্দিষ্ট পর্যায়ে উৎপাদন কাজ চালাই নাই, আমরা সমস্ত বৎসরের মধ্যে তিনটি বিভিন্ন মাত্রায় উৎপাদনের কাজ চালাইয়াছি। সুতরাং এই তিনটি স্বল্পকালীন বাজারের সমষ্টিকে একসঙ্গে একটি দীর্ঘকালীন বাজার বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। নিম্নের ৩৩ নং চিত্রে ইহা দেখান হইল।

এই চিত্রে SAC_1, SAC_2, SAC_3, এই তিনটি রেখা হইতেছে তিনটি স্বল্পকালীন বাজারের গড় উৎপাদন খরচ রেখা, (Short run average cost curves)।

এই তিনটি গড় উৎপাদন খরচ রেখা অবলম্বন করিয়া দীর্ঘকালীন গড় উৎপাদন খরচের রেখাটি (long-run average cost curve) টানা হইতেছে। গড় LAC রেখাটি হইতেছে দীর্ঘকালীন উৎপাদন খরচ রেখা।
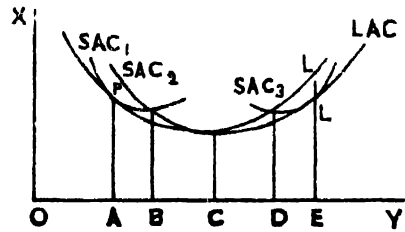
চিত্র নং ৩৩

সাধারণভাবে বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই দীর্ঘকালীন গড় উৎপাদন খরচ রেখা ইংরাজী অক্ষর U-এর আকৃতি সম্পন্ন হইলেও স্বল্পকালীন গড় উৎপাদন খরচ রেখার ন্যায় এতটা U-এর মত আকৃতি সম্পন্ন নয়। দীর্ঘকালে আমরা উৎপাদন যত খুশী বাড়াইতে পারি; ইহাতে গড় স্থায়ী উৎপাদন খরচ কমিয়া যায় এবং পরিবর্তনীয় খরচও খুব বিশেষ বাড়ে না। এইজন্য দীর্ঘকালে গড় উৎপাদন খরচ রেখাটি খুব বেশী রকম U-এর আকৃতি সম্পন্ন হয় না।

গড় খরচের অনুরূপ আমরা প্রান্তিক খরচ রেখা অঙ্কন করিতে পারি। গড় খরচ রেখা যখন নীচের দিকে অথবা উপরের দিকে যায়, প্রান্তিক খরচ রেখাও তখন নীচের দিকে অথবা উপরের দিকে যায়।

উৎপাদনের আসল খরচ এবং বিকল্প খরচ (Real Cost and Opportunity Cost of Production): ক্লাসিক্যাল অর্থ-বিজ্ঞানীগণ উৎপাদন খরচকে

দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন :—একটি হইতেছে উৎপাদনের আর্থিক খরচ (Money cost of production) এবং অপরটি হইতেছে উৎপাদনের আসল খরচ (Real cost of production)। তাঁহাদের মতে কোন জিনিস উৎপাদনের জন্য যে টাকা খরচ হয়, সেই টাকা হইতেছে ইহার আর্থিক খরচ যেমন, শ্রমিকের মজুরি, মূলধনের জন্য সুদ ইত্যাদি। আসল খরচ হইতেছে মানুষের পরিশ্রম, শক্তির অপচয়, মূলধনের ব্যবহার, সুষ্ঠু উৎপাদন পরিচালনার জন্য ত্যাগ স্বীকার ইত্যাদি। সমাজের দিক হইতে চিন্তা করিলে এই খরচ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই খরচের পরিমাপ করা অত্যন্ত কঠিন। কারণ, অর্থের মাধ্যমে সব সময় আসল খরচ নিরূপণ করা সম্ভবপর নয়।

আর্থিক খরচ

প্রকৃত খরচ

অষ্ট্রিয়ার অর্থনীতিবিদগণ এই আসল খরচের তত্ত্বটির সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে আসল খরচের পরিবর্তন ইহার স্থানান্তরজনিত খরচের উপর নির্ভরশীল। বিকল্প খরচের উপর (Opportunity Cost) আমাদের অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তাঁহাদের মতে, কোন জিনিস উৎপাদনের পিছনে রহিয়াছে সেই জিনিসটির স্থানান্তরজনিত খরচ। আমরা একটি উদাহরণের সাহায্যে ইহা বুঝাইতে পারি। ধরা যাক, একটি জমিতে ধান উৎপাদিত হইতেছে এবং ইহাতে জমির মালিকের মুনাফার পরিমাণ হইতেছে একশত টাকা। কিন্তু যদি ইহাতে ধান উৎপাদিত না হইয়া পাট উৎপাদিত হইত, তবে ইহার মুনাফার পরিমাণ হইত একশত পঁচিশ টাকা। এক্ষেত্রে জমির মালিক জমিতে ধান উৎপাদন না করিয়া পাট উৎপাদন করিতে চাহিবে। কিন্তু, কৃষককে যদি এই জমিতে ধান উৎপাদন করিতে হয়, তবে জমির মালিক কৃষকের নিকট হইতে একশত টাকার অতিরিক্ত পঁচিশ টাকা দাবি করিবে এবং কৃষককেও তাহা দিতে হইবে। কৃষকের কাছে এই পঁচিশ টাকা হইবে জমির পরিবর্তন-খরচ (Transfer Cost) অথবা বিকল্প খরচ (Opportunity Cost)।

বিকল্প খরচ

বিকল্প ব্যয়ের তাৎপর্য : যখন ভারসাম্যের অভাব থাকে তখন প্রকৃত যোগান প্রকৃত চাহিদার সমান হয় না ; চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ফাঁক থাকিয়া যায়। যোগান উৎপাদন খরচের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু উৎপাদন খরচের হিসাবের মধ্যে বিকল্প ব্যয়ও (Opportunity Cost) অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। একটি জিনিস উৎপাদন করিতে প্রকৃতপক্ষে হয়ত ১০ টাকা খরচ হয়, কিন্তু যে জিনিসটি উৎপাদন করা হইল তাহা উৎপাদন না করিয়া উৎপাদক যদি অন্য একটি জিনিস উৎপাদন করিত তবে তাঁহার হয়ত আরও ২ টাকা লাভ হইত। এই অবস্থায় উৎপাদক যখন প্রথম জিনিসটি উৎপাদন করিতেছে তখন দ্বিতীয় জিনিসটি উৎপাদন না করার দরুন তাহার যে ২ টাকা লাভ কম হইল, তাহাও প্রথম জিনিসের মোট উৎপাদন খরচের ভিতর অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। সুতরাং প্রথম জিনিসটির মোট উৎপাদন খরচ ১০ টাকার পরিবর্তে ১২ টাকা ধরিতে হইবে এবং ইহার মধ্যে ২ টাকা হইবে বিকল্প ব্যয়ের উপাদান। যদি

উৎপাদক জিনিসটি বিক্রয় করিয়া ১২ টাকা পায়, অর্থাৎ ক্রেতা যদি জিনিসটি ক্রয় করিবার জন্য ১২ টাকা দিতে রাজী থাকে, তবেই উৎপাদক প্রথম জিনিসটি উৎপাদন করিবে এবং ভারসাম্য অর্জন করিবে। কিন্তু ক্রেতা যদি জিনিসটির জন্য ১০ টাকার বেশী দিতে রাজী না থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে এইক্ষেত্রে উৎপাদকের ভারসাম্য অর্জিত হয় নাই; কারণ, যে দাম বাজারে নির্ধারিত হইতে যাইতেছে তাহাতে তাহার বিকল্প খরচ উঠিয়া আসিতেছে না। সুতরাং উৎপাদক তখন প্রথম জিনিসটি উৎপাদন না করিয়া দ্বিতীয় জিনিসটি উৎপাদন করিবে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, দামের মধ্যে বিকল্প কোন জিনিস উৎপাদনের বিকল্প খরচ ঠিকভাবে প্রতিফলিত না হইলে উৎপাদক কিংবা ফার্মের পক্ষে ভারসাম্য অর্জন করা সম্ভব হইতেছে না।

উপরের উদাহরণ অনুযায়ী ধরা যাক্, যদি ক্রেতা জিনিসটির জন্য ১১ টাকা দাম দিতে প্রস্তুত থাকে, তবুও উৎপাদকের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে বিকল্প খরচ দামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হইতেছে না, সেইক্ষেত্রে বিকল্প খরচ আংশিকভাবে (১ টাকা পরিমাণ) দামের মধ্যে প্রতিফলিত হইতেছে, সম্পূর্ণভাবে নহে। ইহাও ভারসাম্যের অভাব বলিয়া ধরা হইবে। ভারসাম্য যখন অর্জিত হয় তখন প্রান্তিক খরচ প্রান্তিক আয়ের সমান হয়। কিন্তু যদি সেই প্রান্তিক খরচ সম্পূর্ণভাবে বিকল্প খরচকে অন্তর্ভুক্ত না করে, তবে প্রান্তিক খরচ ও প্রান্তিক আয়ের সেই সমতাকে ভারসাম্যের অবস্থা বলা যায় না। যদি প্রান্তিক খরচ এবং প্রান্তিক আয়ের কোন সমতাকে ভারসাম্যের অবস্থা বলা হয় তবে ধরিয়া লইতে হইবে যে প্রান্তিক খরচের মধ্যে বিকল্প খরচ সম্পূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত আছে, তাহা না হইলে ভারসাম্যের অভাব হইত।

প্রান্তিক খরচ (Marginal Cost): উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন উপাদানের পরিমাণ একটি ইউনিট অথবা অল্প একটু পরিমাণ (প্রান্তিক ইউনিট) বাড়িলে কোন ফার্মের মোট খরচ যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাহাকে প্রান্তিক খরচ বলে। কিন্তু এক ইউনিট উৎপাদন বাড়াইতে হইলে স্থির খরচের (Fixed Cost) পরিমাণ না বাড়াইলেও চলে; শুধু পরিবর্তনীয় খরচের (Variable Cost) পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়াও উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো চলে। এক ইউনিট উৎপাদন বাড়ানো উচিত হইবে কি না তাহা অবস্থার দীর্ঘকালীন বিবেচনার উপর নির্ভর করে না; অল্প সময়ে যখনই উৎপাদন অল্প একটু বাড়াইবার প্রশ্ন উঠে তখনই সেই বর্ধিত উৎপাদনের জন্য অতিরিক্ত খরচের কথা আমরা ভাবি। অতিরিক্ত উৎপাদন বাড়ানো হইবে কি না তাহা নির্দিষ্ট উৎপাদনের মাত্রার (given scale of production) মধ্যেই স্থির করিতে হয়। এক ইউনিট অতিরিক্ত উৎপাদন বাড়াইবার জন্য স্বল্পকালে কোন ফার্মই স্থির খরচ বাড়াইয়া উৎপাদনের মাত্রা পরিবর্তিত করিতে চাহিবে না; পরিবর্তনীয় উপাদানগুলির সাহায্যেই যখন অতিরিক্ত এক ইউনিট উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করা হয়, তখন যে অতিরিক্ত খরচ হয় তাহা অতিরিক্ত পরিবর্তনীয় খরচ (Vari-

able Cost) এবং তাহাই সেক্ষেত্রে প্রান্তিক খরচ। সুতরাং উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য পরিবর্তনীয় খরচের পরিমাণ যতটুকু বাড়ানো দরকার হয়, তাহাকেই প্রান্তিক খরচ বলে।

গড় খরচ এবং প্রান্তিক খরচের মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Average Cost and Marginal Cost): উৎপাদন বাড়িতে আরম্ভ করিলে গড় মোট খরচের মধ্যে গড় স্থির খরচের (Average fixed cost) পরিমাণ ক্রমশঃ কমিতে থাকে। কিন্তু গড় পরিবর্তনীয় খরচ উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে কমিতে থাকিলেও উপাদানগুলির যথোপযুক্ত ব্যবহার হইয়া গেলে ইহা ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। এই গড় খরচের সহিত প্রান্তিক খরচের সম্পর্ক আছে। যখন প্রান্তিক খরচ কম থাকে অর্থাৎ একটি অতিরিক্ত ইউনিট উৎপাদন করিবার খরচের পরিমাণ বেশী হয় না, তখন গড় খরচও কম হয়। কিন্তু গড় খরচ বাড়িতে থাকিলে প্রান্তিক খরচ আরও বেশী পরিমাণে বাড়িতে থাকে। আবার যদি গড় খরচ স্থির থাকে, তবে প্রান্তিক খরচও স্থির থাকে। নিম্নের তালিকার সাহায্যে ইহা দেখানো হইয়াছে।

মোট উৎপাদন	মোট খরচ (টাকায়)	গড় খরচ (টাকায়)	প্রান্তিক খরচ (টাকায়)
২	৪	২	—
৩	৬	২	২
৪	৮	২	২
৫	৪৫	৯	৩৭
৬	৯০	১৫	৪৫
৭	৯৮	১৪	৮
৮	১০৪	১৩	৬

এই তালিকায় দেখা যায় ৪ ইউনিট পর্যন্ত উৎপাদন করিবার সময় গড় খরচ স্থির থাকে এবং সেই সঙ্গে প্রান্তিক খরচও স্থির থাকে। ৫ এবং ৬ ইউনিট উৎপাদন করিবার সময় গড় খরচ বাড়িয়া যাইতেছে এবং সেই সঙ্গে প্রান্তিক খরচ আরও বাড়িয়া যাইতেছে। ৭ এবং ৮ ইউনিট উৎপাদন করিবার সময় গড় খরচ কমিয়া যাইতেছে এবং সেই সঙ্গে প্রান্তিক খরচ কমিয়া যাইতেছে। যখনই দেখা যাইবে গড় খরচ রেখা নিম্নাভিমুখী তখনই প্রান্তিক খরচ রেখা ইহার নীচে থাকিবে; আবার যখনই দেখা যাইবে গড় খরচ রেখা ঊর্দ্ধমুখী তখনই প্রান্তিক খরচ রেখা ইহার উপ বাঁদিকে

উর্দ্ধমুখী হইবে। ৩২ নং চিত্রে যখন AC রেখা নিম্নাভিমুখী তখন MC রেখা ইহার নীচে আছে, আবার যখন AC রেখা উর্দ্ধমুখী তখন MC রেখা ইহার বাঁদিকে উর্দ্ধমুখী।

ফার্মের যোগান রেখা (Supply Curve of a Firm) : ফার্মের যোগান রেখা ফার্মের প্রান্তিক উৎপাদন খরচের (marginal cost of production) উপর নির্ভরশীল। অল্প সময়ে গড় খরচ রেখার আকৃতি বেশী পরিমাণে U-আকারের মত হওয়ায় প্রান্তিক খরচ রেখাও খাড়াভাবে উর্দ্ধমুখী হয় ; ইহার ফলে যোগান রেখাও উর্দ্ধমুখী হয়। স্বল্পকালে কোন ফার্ম যদি মোট উৎপাদন খরচের মধ্যে স্থির খরচের (Fixed cost) অংশটিকে উপেক্ষা করে এবং শুধু পরিবর্তনীয় খরচ (Variable cost) পূরণ করিবার জন্য সচেষ্ট হয়, তবে ইহার যোগান রেখা গড় মোট খরচ রেখার নীচেও যাইতে পারে ; কিন্তু যদি দাম কখনও গড় পরিবর্তনীয় খরচের নীচেও চলিয়া যায় তবে ফার্ম তাহার কারবার বন্ধ করিয়া দিবে ; এই অবস্থাকে *Shut down point* বা ব্যবসায় গুটাইবার বিন্দু বলা হয়। ফার্মের যোগান রেখা অঙ্কন করিবার পক্ষে এই বিন্দু গুরুত্বপূর্ণ; এই বিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া প্রান্তিক খরচ রেখা যতটা উর্দ্ধমুখী থাকে ততটাই হইতেছে ফার্মের যোগান রেখা। নিম্নের ৩৪নং চিত্রে ইহা দেখানো হইয়াছে। এই চিত্রে যখন দাম হইতেছে OP_3 তখন ইহা গড় পরিবর্তনীয় খরচের সমান। ইহা ফার্মের Shut down Point সূচিত করে। কারণ, যদি দাম এই বিন্দুর নীচে থাকে, তবে ফার্ম কারবার বন্ধ করিয়া দিবে। এই বিন্দু হইতে উর্দ্ধমুখী প্রান্তিক খরচ রেখাকে ভগ্নরেখা হিসাবে দেখানো হইয়াছে। এই ভগ্ন রেখাটিকে আমরা ফার্মের স্বল্পকালীন যোগান রেখা বলিতে পারি।
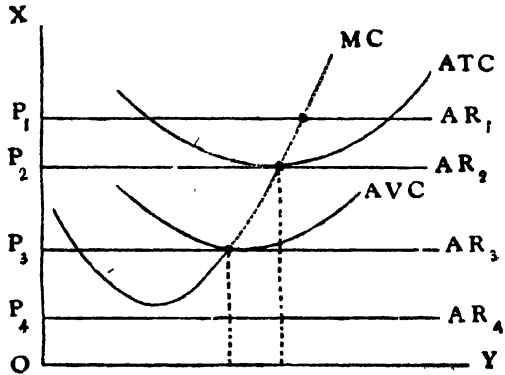
চিত্র নং ৩৪

ফার্মের যোগান রেখার আকৃতির বিভিন্নতা ইহার প্রান্তিক খরচ রেখার আকৃতির বিভিন্নতার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ যদি প্রান্তিক খরচ রেখার আকৃতি খুব খাড়াভাবে উর্দ্ধমুখী না হইয়া হেলানভাবে উর্দ্ধমুখী হয়, তবে ফার্মের যোগান রেখার অনুরূপ আকৃতি হয়। দাম অথবা প্রান্তিক খরচ রেখার উপরোক্ত চিত্র অনুযায়ী ফার্মের যোগানও বেশী হইবে। উপরের চিত্রে আমরা যোগান রেখার তিনটি আকৃতি দেখিতে পাই।

দীর্ঘকালীন যোগান রেখা। যদি সব ফার্মেরই যোগান স্থির থাকে তবে প্রত্যেকটি ফার্মেরই যোগান রেখা লম্বভাবে উর্দ্ধমুখী হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্পটির যোগান রেখাও লম্বভাবে উর্দ্ধমুখী (vertical) হইবে। যদি সব ফার্মের যোগান রেখা খাড়াভাবে উর্দ্ধমুখী হয়, তবে সংশ্লিষ্ট শিল্পের যোগান রেখাও উর্দ্ধমুখী হইবে। যদি সব ফার্মের যোগান রেখা দীর্ঘকালে সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয়, অর্থাৎ সমান্তরাল আকৃতির (horizontal) হয় তবে সংশ্লিষ্ট শিল্পের যোগান রেখাও সমান্তরাল আকৃতির (horizontal) হইবে। ৩৭নং চিত্রে ইহা দেখানো হইয়াছে। এই চিত্রে MSC রেখাটি হইতেছে শিল্পের খুব স্বল্পকালীন যোগান রেখা। এই যোগান রেখা অনুযায়ী চাহিদার পরিবর্তন হইলেও যোগান OA-ই থাকিবে। চাহিদা বাড়িলে দাম বাড়িবে; চাহিদা কমিলে দাম কমিবে; কিন্তু এইরূপ লম্বমুখী (vertical) যোগান রেখায় যোগান সব অবস্থায় স্থির থাকিবে। SSC রেখাটি সাধারণভাবে স্বল্পকালীন যোগান রেখা বুঝাইতেছে। যে হারে চাহিদার পরিবর্তন হইতেছে সেই হারে যোগানের পরিবর্তন হইতেছে না। LSC রেখাটি শিল্পের সাধারণভাবে দীর্ঘকালীন যোগান রেখা; এই রেখা অনুযায়ী চাহিদার পরিবর্তন অনুযায়ী যোগানের অনেকটা পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু তবুও দীর্ঘকালে চাহিদার পরিবর্তন এবং যোগানের পরিবর্তন সমান হয় নাই। LSC রেখাটি পরিমাণ অক্ষের সহিত সমান্তরালভাবে (horizontally) টানা হইয়াছে এবং এই রেখা অনুযায়ী যোগান সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক; অর্থাৎ, যে হারে চাহিদার পরিবর্তন হইবে অনুরূপ হারে যোগানেরও পরিবর্তন হইবে। এইজন্য ৩৭ নং চিত্রে দেখা যাইতেছে OP দাম সর্বদা স্থির।

শিল্পের যে যোগান রেখা উপরে অঙ্কিত হইল তাহা পূর্ণ প্রতিযোগিতার উপর ভিত্তিশীল। এই ক্ষেত্রে শিল্পের কোন বাহ্যিক সুবিধা বা অসুবিধার (external economies or diseconomies) অস্তিত্ব বিবেচিত হয় নাই। অবশ্য যদি ইহা বিবেচিত হইত, তবে আমাদের আলোচনার কোন ব্যতিক্রম হইত না। কারণ বাহ্যিক সুবিধা (external economies) অর্জিত হইলে ফার্মের যোগান রেখা খুব খাড়া (steep) হইত না এবং ইহার ফলে শিল্পের যোগান রেখাও খুব খাড়া হইত না। আবার বাহ্যিক অসুবিধার (external diseconomies) সৃষ্টি হইলে ফার্মের যোগান রেখাও খুব খাড়া (steep) হইত এবং ইহার ফলে শিল্পের যোগান রেখাও খুব খাড়া (steep) হইত।

শিল্পের নিম্নাভিমুখী যোগান রেখার সহিত উৎপাদনের বাহ্যিক সুবিধা অথবা অসুবিধার সম্পর্ক (Relation between the external economies or diseconomies and the falling supply curve of an industry):

কোন শিল্পের যোগান রেখা হইতেছে শিল্পটির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ফার্মের যোগান রেখার সমষ্টি। ফার্মের যোগান রেখা ইহার প্রান্তিক খরচের পরিচায়ক, অর্থাৎ, প্রান্তিক খরচ যদি ক্রমেই বাড়িতে থাকে তবে ফার্মের যোগান রেখাও খাড়াভাবে (steeply)

উপরে উঠিতে থাকে ; ফার্মের যোগান রেখা যদি খাড়াভাবে উপরে উঠিতে থাকে তবে শিল্পের যোগান রেখাও খাড়াভাবে উপরে উঠিতে থাকে। উৎপাদন খরচ ক্রমেই বাড়িতে থাকিবে যদি বৃহদায়তন উৎপাদনে ফার্মের কতিপয় অর্থনৈতিক বাহ্যিক অসুবিধা (external diseconomies) দেখা যায়। শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ফার্ম যদি বাহ্যিক অর্থনৈতিক অসুবিধা ভোগ করে, তবে সামগ্রিকভাবে শিল্পের খরচও বাড়িয়া যাইবে এবং শিল্পটির যোগান রেখা খাড়াভাবে উর্দ্ধমুখী হইবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যদি কোন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ফার্ম শ্রমিক সরবরাহের (labour supply) ক্ষেত্রে অথবা কাঁচামাল সরবরাহে ক্ষেত্রে (supply of raw materials) অসুবিধা (diseconomies) ভোগ করে, তবে সব ফার্মেরই খরচ বাড়িবে এবং সামগ্রিকভাবে শিল্পের যোগান রেখাও খাড়াভাবে উপরে উঠিতে থাকিবে।

অপরপক্ষে যদি বিভিন্ন ফার্ম বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতিপয় বাহ্যিক আর্থিক সুবিধা (external economies) ভোগ করে তবে সব ফার্মেরই উৎপাদন খরচ কমিতে থাকিবে এবং সামগ্রিকভাবে শিল্পটির যোগান রেখাও কম খাড়াভাবে (less steeply) উপরে উঠিতে থাকিবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, বিভিন্ন ফার্ম একসঙ্গে যন্ত্রগত ব্যয় সংকোচের সুবিধা (technical economies), পরিচালনগত সুবিধা (managerial economies), কাঁচামাল সরবরাহের সুবিধা (economies in supply of raw materials), আর্থিক ব্যয় সংকোচের সুবিধা (financial economies), বাণিজ্যিক ব্যয় সংকোচের সুবিধা (commercial economies) এবং উৎপাদন ধারার সংযুক্তির বিভিন্ন সুবিধা (economies of linked process) ভোগ করিতে পারে এবং এই সকল ক্ষেত্রে সব ফার্মের যোগান রেখা বিশেষ খাড়াভাবে (steeply) উর্দ্ধমুখী হইবে না। সুতরাং শিল্পের যোগান রেখাও সেইক্ষেত্রে কম খাড়াভাবে উর্দ্ধমুখী হইবে। উপরের ৩৭ নং চিত্রে বিভিন্ন সময়ে শিল্পের যোগান রেখা কিরূপ হয় তাহা দেখান হইয়াছে।

৩৭ নং চিত্রে MSC রেখা, SSC রেখা, LSC রেখা হইতেছে যথাক্রমে শিল্পের অতিস্বল্পকালীন যোগান রেখা, স্বল্পকালীন যোগান রেখা এবং দীর্ঘকালীন যোগান রেখা LSC′ রেখা হইতেছে অতি দীর্ঘকালীন যোগান রেখা। অতি স্বল্পকালীন যোগান স্থির আছে ধরা হইয়াছে এবং সেইজন্যই অতি-স্বল্পকালীন যোগান রেখা উর্দ্ধমুখী সরল রেখা হিসাবে টানা হইয়াছে। কিন্তু স্বল্পকালীন অথবা দীর্ঘকালীন রেখাগুলি যেভাবে টানা হইয়াছে তাহা হইতে আরও খাড়াভাবে রেখাগুলি টানা হইত যদি বাহ্যিক আর্থিক অসুবিধাগুলি (external diseconomies) বিশেষভাবে দেখা যাইত অপরপক্ষে এই রেখাগুলি আরও কম খাড়াভাবে টানা হইত যদি বিভিন্ন ফার্ম বাহ্যিক ব্যয় সংকোচনের সুবিধাগুলি (external economies) আরও বেশী করিয়া ভোগ করিত। ৩৭ নং চিত্রে যে যোগান রেখা অঙ্কিত হইয়াছে তাহা পূর্ণ প্রতিযোগিতা

উপর ভিত্তিশীল। এইক্ষেত্রে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে শিল্পটির ক্ষেত্রে কোন নীট বাহ্যিক আর্থিক সুবিধা অথবা অসুবিধা (Net external economies or dis-economies) নাই।

ফার্মের "Break-Even" **বিন্দু এবং শিল্পের যোগান রেখা:** ফার্মের যোগান রেখার আকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় আমরা ফার্মের "Shut down Point"-এর সহিত ইহার যোগান রেখার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করিয়াছি। এখন আমরা ফার্মের "Break-Even Point"-এর সহিত ইহার যোগান রেখার সম্পর্ক আলোচনা করিব। এই বিন্দুর সহিত ফার্মের যোগান রেখার সম্পর্ক আলোচনা করিলেই ইহার সহিত শিল্পের যোগান রেখার সম্পর্ক প্রতিভাত হইবে। কারণ, শিল্পের যোগান রেখা ইহার অন্তর্ভুক্ত সমুদয় ফার্মের যোগান রেখারই সমষ্টি।

ফার্মের *'Break-Even'* বিন্দু আমরা নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারি। ৪০ নং চিত্রের O বিন্দুতে একটি ৪৫° ডিগ্রী কোন অঙ্কিত করিয়া আমরা খরচ, বিক্রয় এবং বিক্রয়লব্ধ আয়ের মধ্যে সম্পর্ক দেখাইতেছি। অর্থাৎ OX পরিমাণ বিক্রয় হইলে ফার্মের X_1D_1 পরিমাণ আয় হইতেছে। D_1 বিন্দুতে যে বিক্রয়লব্ধ আয় হইতেছে, তাহা মোট খরচের সমান। যদি বিক্রয়ের পরিমাণ OX_1-এর কম হয়, তবে মোট খরচের পরিমাণ বিক্রয়লব্ধ আয় অপেক্ষা বেশী হয়। D_1 বিন্দুটিকে আমরা Break-even বিন্দু বলিতে পারি। ইহার পর যদি ফার্ম বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া দেয় তবে এই চিত্র অনুযায়ী মোট খরচ অপেক্ষা বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ বেশী হয় এবং ফার্ম মুনাফা অর্জন করে। মুনাফার পরিমাণ সর্বাধিক পরিমাণ হয় যখন OX পরিমাণ বিক্রয় হয়। কারণ, এই পরিমাণ জিনিস বিক্রয় হইলে বিক্রয়লব্ধ আয় রেখা (Revenue Line) এবং মোট খরচ রেখার (Total Cost line) মধ্যে দূরত্ব সর্বাধিক হয়। ইহার পর যদি ফার্ম বিক্রয়ের পরিমাণ আরও বাড়াইয়া দেয় অর্থাৎ যদি ফার্ম OX_2 পরিমাণ জিনিস বিক্রয় করে তবে মোট খরচ পুনরায় মোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান হয়। OX_2 পরিমাণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে X_2D_2 হইতেছে বিক্রয়লব্ধ আয় এবং মোট খরচ। এখানে D_2 বিন্দুতে পুনরায় ফার্মের Break-even Point অর্জিত হইয়াছে।
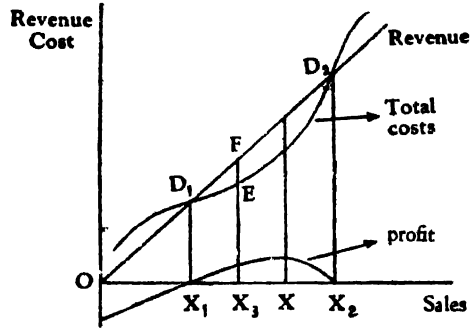
চিত্র নং ৩৮

যখন ফার্মের বিক্রয়ের পরিমাণ এই প্রকার হয় যে মোট খরচ ও মোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান হয়, এবং ইহার কম অথবা বেশী বিক্রয় হইলে মোট খরচ ও মোট

বিক্রয়লব্ধ আয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় তখনই আমরা বুঝিতে পারি কখন Break-even Point অর্জিত হইবে। এই বিন্দুটি নিরূপিত হইলে দাম গড় খরচের সমান হয়। যে চিত্রের সাহায্যে (৩৪ নং চিত্র) আমরা একটি ফার্মের Shut down Point ব্যাখ্যা করিয়াছি সেই চিত্রের সাহায্যে আমরা Break-event Point দেখাইতে পারি ; অর্থাৎ, যখন দাম হইতেছে OP_2 এবং দাম গড় মোট খরচের সমান তখনই ফার্মটি Break-even point অর্জন করিয়াছে ; কারণ, এখন যে উৎপাদন হয়, তাহা অপেক্ষা উৎপাদন আরও কম হইলে অথবা বেশী হইলে গড় খরচ গড় আয় হইতে বেশী হয় এবং ফার্ম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই অবস্থায় দীর্ঘকালে ফার্মের যোগান রেখা গড় খরচের সর্বনিম্ন বিন্দুর নীচে যাইতে পারে না। কারণ সেক্ষেত্রে ফার্ম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

Exercise

1. Discuss the Law of Supply and Construct a Supply Schedule.
[যোগানের নিয়ম আলোচনা কর এবং একটি যোগান তালিকা প্রস্তুত কর।] (১০৪-১০৫ পৃষ্ঠা)

2. Explain the concept of Elasticity of Supply. On what factory does the Elasticity of Supply depend? [যোগানের স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কিত ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। যোগানের স্থিতিস্থাপকতা কি কি উপাদানের উপর নির্ভর করে?] (১০৫-১০৭ পৃষ্ঠা)

3. Define overhead costs. Is it true that Overhead Costs are true costs only in the long run? [স্থির খরচের সংজ্ঞা প্রদান কর। ইহা কি সত্য যে শুধু দীর্ঘকালেই স্থির খরচ প্রকৃত খরচ হইয়া থাকে?] (১০৭-১০৮ পৃষ্ঠা)

4. Explain the concept of cost as used in economic analysis. Why are all costs variable in the long run? [অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে খরচ সম্পর্কিত ধারণাটি পরীক্ষা কর। দীর্ঘকালে সব খরচই পরিবর্তনীয় কেন?] (১০৭-১০৮ পৃষ্ঠা)

5. Distinguish between Prime Costs and Supplementary Costs and examine the impor ance of this distinction in the fixing of Prices.
[প্রাথমিক খরচ এবং স্থির খরচের মধ্যে পার্থক্য দেখাও এবং মূল্য নির্ধারণে এই পার্থক্যের গুরুত্ব পরীক্ষা কর।] (১০৭-১০৮ পৃষ্ঠা)

6. Why do we find that the average cost is U-shaped and why is this U-shape more pronounced in the short run than in the long run? [আমরা গড় খরচ রেখা U-আকৃতির দেখিতে পাই কেন এবং এই U-আকৃতি দীর্ঘকাল অপেক্ষা স্বল্পকালে বেশী প্রতিভাত কেন?] (১০৮-১১০ পৃষ্ঠা)

7, Write a critical note on the nature of the cost curve in a competitive industry. (প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে খরচরেখার স্বরূপের উপর একটি সমালোচনামূলক টীকা লিখ।) (১০৮-১১০ পৃষ্ঠা)

8. What do you mean by Opportunity Cost ? Distinguish between Real cost and opportunity cost. "In a condition of disequilibrium Prices do not fully reflect opportunity eosts." Explain the statement. (বিকল্প খরচ বলিতে তুমি কি বুঝ ? আসল খরচ এবং বিকল্প খরচের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। "ভারসাম্যের অভাবে দামের মধ্যে বিকল্প খরচ সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয় না।"—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।) (১১০-১১২ পৃষ্ঠা)

9. Write a note on Marginal Cost, and Point out the relationship between Average Cost and Marginal Cost. (প্রান্তিক খরচের উপর একটি টীকা লিখ, এবং গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচের মধ্যে সম্পর্ক দেখাও।) (১১২-১১৪ পৃষ্ঠা)

10. How is the supply curve of a firm drawn ? (কোন কার্মের যোগান রেখা কি ভাবে অঙ্কিত হয় ?) (১১৪-১১৬ পৃষ্ঠা)

11. Explain how the supply curve of an industry is determined and how it is related to the supply curves of the firms ? (শিল্পের যোগান রেখা কি ভাবে নিরূপিত হয় এবং কি ভাবে ইহা ফার্মের যোগান রেখার সহিত সম্পর্কযুক্ত ?) (১১৬-১১৭ পৃষ্ঠা)

12. Can you use the external economies and diseconomies of large scale production to explain the case of a falling supply curve of an industry ? (কোন শিল্পে নিম্নাভিমুখী যোগানরেখার ব্যাখ্যা করিবার জন্য তুমি কি বৃহদায়তন উপাদানের বাহ্যিক ব্যয় সংস্কারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি ব্যবহার করিতে পার ?) (১১৭-১১৯ পৃষ্ঠা)

13. Explain the concepts of (a) Fixed Cost and Variable Cost. (b) Marginal Cost and Average Cost. Why does Marginal Cost consist of Variable Cost only ? (১০৬-১০৭ পৃষ্ঠা ; ১১২-১১৪ পৃষ্ঠা)

((ক) স্থির খরচ ও পরিবর্তনীয় খরচ, এবং (খ) প্রান্তিক খরচ ও গড় খরচ ব্যাখ্যা কর। প্রান্তিক খরচে শুধু পরিবর্তনীয় খরচ অন্তর্ভুক্ত হয় কেন ?)

14. Show how the Break-Even Point of a fiirm is related to the supply cusve of an industry. (একটি ফার্মের Break-even বিন্দু কিভাবে শিল্পের যোগানরেখার সহিত সম্পর্কযুক্ত দেখাও।) (১১৯-১২০ পৃষ্ঠা)

দশম অধ্যায়

উৎপাদনক্ষেত্রে উপাদানের সমন্বয় এবং উৎপাদকের ভারসাম্য

(Co-ordination of the Factors of Production and the Equilibrium of the Producer)

উৎপাদকের ভারসাম্য (Equilibrium of the Producer) : ক্রেতার সামনে যেমন বিভিন্ন অভাব পুরণ করিবার সময় একটি নির্বাচনের সমস্যা (problem of choice) দেখা যায়, উৎপাদকের সামনেও উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনুরূপ সমস্যা দেখা যায়। সর্বাধিক পরিতৃপ্তির জন্য কোন জিনিস কতটা কিনিতে হইবে, ক্রেতাকে

তাহা ঠিক করিতে হয়। অনুরূপভাবে উৎপাদককেও স্থির করিতে হয়, একটি নির্দিষ্ট জিনিস উৎপাদন করিবার জন্য বিভিন্ন উপাদান কতটা নিয়োগ করিতে হইবে। একই জিনিস উৎপাদন করিতে হইলে উৎপাদক হয়ত বেশী পরিমাণে মূলধন এবং কম পরিমাণে শ্রম, অথবা বেশী পরিমাণে শ্রমএবং কম পরিমাণে মূলধন নিয়োগ করিতে পারে। কিন্তু কতটা মূলধন ও কতটা শ্রম নিয়োগ করা হইবে তাহা একদিকে নির্ভর করে মূলধন এবং শ্রমের মূল্যের উপর এবং অপর দিকে নির্ভর করে কারিগরি অবস্থার (technical conditions) উপর। ক্রেতার আচরণের ন্যায় উৎপাদকের আচরণও নিরপেক্ষ রেখার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ক্রেতার ক্ষেত্রে কোন নিরপেক্ষ রেখা যেমন একটি পরিতৃপ্তির স্তর (level of satisfaction) বুঝায়, উৎপাদকের ক্ষেত্রে সেইপ্রকার কোন নিরপেক্ষ রেখা বুঝায় একটি নির্দিষ্ট উৎপাদনের স্তর (level of production)। উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা যে নিরপেক্ষ রেখাগুলি টানি সেইগুলিকে Production Possibility Curves অথবা Equal Product Curves বলা হয়। নিম্নের চিত্রে কতকগুলি সমউৎপাদন রেখা দেখান হইয়াছে। OX রেখার দ্বারা জমি এবং OY রেখাদ্বারা মূলধন বুঝাইতেছে। জমি এবং মূলধনের সম্মিলনে (Combination) বিভিন্ন সম-উৎপাদন রেখা অথবা উৎপাদকের নিরপেক্ষ রেখা অঙ্কন করা হইয়াছে; এই রেখাগুলি যথাক্রমে ১০, ২০, ৩০ এবং ৪০ ইউনিট উৎপাদন বুঝাইতেছে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা যদি কয়েকটি সম-উৎপাদন রেখা (Equal Product Curves) টানি, তবে একটি রেখা হইতে আরেকটি রেখার দূরত্বের সাহায্যে আমরা উৎপাদনের পরিমাণগত তারতম্য বুঝিতে পারি।
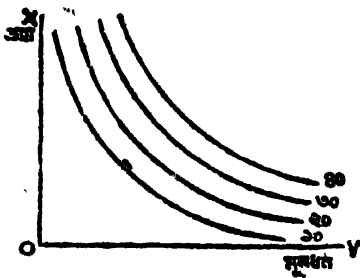
চিত্র নং ৩৯

ক্রেতার নিরপেক্ষ রেখাগুলির যেমন তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে, উৎপাদকের নিরপেক্ষ রেখাগুলিরও সেই প্রকার তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে। অর্থাৎ, একটি সম-উৎপাদনের রেখা বাম হইতে ডানদিকে নিম্নাভিমুখী হইবে; উৎস বিন্দুর দিকে Convex আকৃতির হইবে এবং দুইটি সম-উৎপাদন রেখা পরস্পরকে ছেদ করিতে পারিবে না। এই বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যাখ্যায় বলা যায়, যদি সম-উৎপাদন রেখা বাম হইতে ডানদিকে নিম্নাভিমুখী না হইয়া উর্দ্ধমুখী অথবা কোন অক্ষের সহিত সমান্তরাল হইত তবে বিভিন্ন উপাদানের সম্মিলনে যে একই পরিমাণ উৎপাদন হইতেছে তাহা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হইত না। আবার যদি সম-উৎপাদন রেখা Convex আকৃতির না হইত, তবে একটি উপাদান বেশী করিয়া ব্যবহার করিলে যে আরেকটি উপাদান কম করিয়া ব্যবহার করিতে হইবে, অর্থাৎ উপাদানগুলির প্রান্তিক প্রতিস্থাপন যোগ্যতা যে ক্রমহ্রাসমান (Diminishing Merginal Technical Rate of Substitution) হইবে

তাহা ব্যাখ্যা করা যাইত না। দুইটি সম-উৎপাদন রেখা দুইটি নির্দিষ্ট উৎপাদন মাত্রা বুঝায় ; সুতরাং তাহারা কখনও পরস্পরকে ছেদ করিতে পারে না।

একটি সম-উৎপাদন রেখার উপর যে কোন বিন্দুতেই দুইটি উপাদানের একটি সমন্বয় হইবে। কিন্তু এই প্রকার যে কোন সমন্বয়েই একই পরিমাণ উৎপাদন হইবে। অর্থাৎ কোন সম-উৎপাদন রেখা দ্বারা যদি কোন জিনিসের ২০ ইউনিট উৎপাদন বুঝায় এবং জমি ও মূলধন যদি দুইটি উপাদান হয়, তবে সম-উৎপাদন রেখার উপর জমি এবং মূলধন যে কোন সম্মিলনেই ২০ ইউনিট জিনিস উৎপাদিত হইবে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, উৎপাদক জমি এবং মূলধন উপাদান দুইটির কোন্ সম্মিলনে উৎপাদন করিবে। এই ক্ষেত্রে ক্রেতার ন্যায় উৎপাদকেরও একটি বাজেট থাকে এবং সেই বাজেট নিরূপণ করিবার সময় উপাদানগুলির দামের কথা ক্রেতাকে বিবেচনা করিতে রেখা নিম্নের চিত্রে দেখান হইয়াছে উৎপাদক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আয় লইয়া বাজারে প্রবেশ করে। এই চিত্রে AB রেখা হইতেছে উৎপাদকের বাজেট রেখা। যদি তাহার সম্পূর্ণ আয় মূলধনই ক্রয় করে তবে OB পরিমাণ মূলধন ক্রীত হইবে। তখন শ্রম ক্রয় করিবার মত আর টাকা থাকিবেনা। যদি বিক্রেতা সম্পূর্ণ আয়ে শুধু শ্রম নিয়োগ করে, তবে OB পরিমাণ শ্রম নিযুক্ত হইবে।
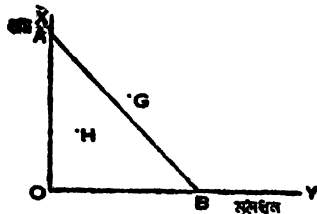
চিত্র নং ৪০

তখন মূলধন ক্রয় করিবার মত টাকা থাকিবেনা। নির্দিষ্ট আয়ে উৎপাদক মূলধন ও শ্রমের কোন কোন সমন্বয় ক্রয় করিতে পারে তাহা AB রেখার দ্বারা সূচিত হয়। উৎপাদক G অথবা H বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জন করিতে পারিবেনা ; কারণ এই দুইটি বিন্দুর কোনটিতেই উৎপাদক সম্পূর্ণ আয় খরচ করিতে পারিবে না। যখন এই বাজেট রেখা বা AB রেখা কোন সম-উৎপাদন রেখার সহিত tangent হইবে, তখনই উৎপাদকের ভারসাম্য (producer's equilibrium) অর্জিত হইবে। ৪১ নং চিত্রে ইহাই দেখানো হইয়াছে :—
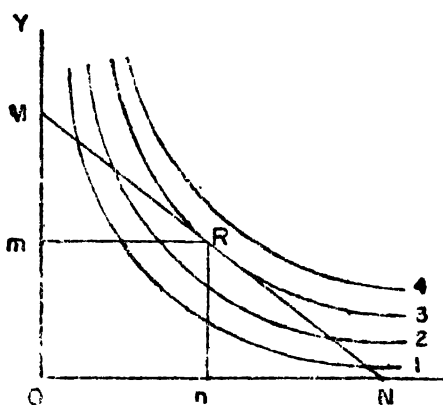
চিত্র নং ৪১

ধরা যাক, ৪১ নং চিত্রে OX রেখা দ্বারা মূলধনের পরিমাণ এবং OY রেখা দ্বারা

শ্রমের পরিমাণ ধরা হইয়াছে। 1, 2, 3, 4, প্রভৃতি হইতেছে কতিপয় সম-উৎপাদন রেখা (Equal Product Curves); এখানে 1, 2, 3, 4, প্রভৃতি রেখা দ্বারা কোন জিনিসের যথাক্রমে ১০ ইউনিট, ২০ ইউনিট, ৩০ ইউনিট এবং ৪০ ইউনিট উৎপাদন বুঝাইতেছে। ৩০ ইউনিট উৎপাদনের জন্য যে সম-উৎপাদন রেখাটি টানা হইয়াছে তাহার সহিত উৎপাদকের বাজেট রেখা বা মূল্য রেখা (price line) R বিন্দুতে tangent হইয়াছে। সুতরাং R বিন্দুতেই উৎপাদকের ভারসাম্য অর্জিত হইয়াছে। এই ভারসাম্য অনুযায়ী উৎপাদক ৩০ ইউনিট জিনিস উৎপাদন করিবার জন্য On পরিমাণ মূলধন এবং Om পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করিবে। ত্রিশ ইউনিট জিনিস উৎপাদনের জন্য ইহাই হইতেছে মূলধন ও শ্রমের আদর্শ সমন্বয়। ত্রিশ ইউনিট উৎপাদনের জন্য ইহাই সর্বনিম্ন খরচ। অথবা এই ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট খরচে ইহাই সর্বাধিক উৎপাদন। উৎপাদনের স্তর যত বাড়িয়া যাইবে সম-উৎপাদনের রেখাও তত উঁচুতে উঠিয়া যাইবে; সেই জন্য মূল্য রেখারও পরিবর্তন হইবে এবং উৎপাদকের ভারসাম্যেরও পরিবর্তন হইবে। নিম্নের চিত্রে B, C, এবং D বিন্দু হইতেছে বিভিন্ন পর্যায় উৎপাদনকারীর ভারসাম্যের অবস্থা B বিন্দুতে কোন জিনিস যতটা উৎপাদিত হইতেছে, C বিন্দুতে তাহা অপেক্ষা বেশী উৎপাদন হইতেছে এবং শ্রম ও মূলধন নিয়োগের পরিমাণও সেক্ষেত্রে বেশী হইয়াছে। অনুরূপভাবে D বিন্দুতে উৎপাদন আরও বেশী হইয়াছে। O, B, C, D প্রভৃতি বিন্দুর ভিতর দিয়া OE রেখাটি গিয়াছে তাহা মাত্রাগতভাবে উৎপাদন (Returns to Scale) অথবা উৎপাদন সম্প্রসারণের পথ (Expansion Path) বুঝাইতেছে। উৎপাদকের এই ভারসাম্য হইতে আমরা প্রতিদানের নিয়ম (Laws of Returns) বাহির করিতে পারি। যদি প্রথম সম-উৎপাদন রেখা হইতে দ্বিতীয় সম-উৎপাদন রেখার দূরত্ব এবং দ্বিতীয় সম-উৎপাদন রেখা হইতে তৃতীয় সম-উৎপাদন রেখার দূরত্ব অথবা তৃতীয় সম-উৎপাদন রেখা হইতে চতুর্থ সম-উৎপাদন রেখার দূরত্ব সমান হয়, তবে ইহাকে উৎপাদন বৃদ্ধির স্থির মাত্রা (Constant Returns to Scale) বলা হয়। যদি উপরের চিত্রে BC=CD হয়, তবে OE রেখা উৎপাদন বৃদ্ধির স্থির মাত্রা বুঝাইবে। এই ক্ষেত্রে যে হারে উৎপাদন বাড়িতেছে, সেই হারে উৎপাদন খরচ বাড়িতেছে। কিন্তু যদি একটি উৎপাদন-স্তর হইতে অপর উৎপাদন স্তরে যাইবার সময় উৎপাদন খরচের মাত্রা আনুপাতিকভাবে বেশী হয়, একটি তবে আমরা ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম (Law of Diminishing Returns or Decreasing Returns to Scale) কার্যকর হইতে দেখিতে পাই। যখন একটি উপাদানের পরিবর্তে আরেকটি উপাদান যথেচ্ছভাবে নিয়োগ করা যায় না, অর্থাৎ যখন
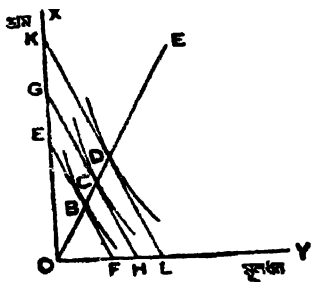
চিত্র নং ৪২

উপাদান পরিবর্ততা (Substitutability of a factor or elasticity of substitution of a factor for another) সীমিত হয়, তখনই আমরা ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটিকে কার্যকর হইতে দেখিতে পাই। জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ থাকে বলিয়া মূলধন অথবা শ্রমের সহিত জমির পরিবর্ততা সীমিত থাকে।

উৎপাদকের আচরণ ও ক্রেতার আচরণের তুলনা: ক্রেতার আচরণের মূল লক্ষ্য হইল ক্রীত জিনিসগুলি হইতে সর্বাধিক পর্যায়ে পরিতৃপ্তি অর্জন করা। উৎপাদকের আচরণের মূল লক্ষ্য হইতেছে উৎপাদন হইতে সর্বাধিক পরিমাণ মুনাফা অর্জন করা অথবা উৎপাদনের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকিলে উৎপাদন খরচ সর্বনিম্ন রাখা। উভয়ের আচরণ নিরপেক্ষ রেখার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ক্রেতার নিরপেক্ষ রেখা এবং উৎপাদকের নিরপেক্ষ রেখার একই বৈশিষ্ট্য। উভয়ের নিরপেক্ষ রেখাই (১) বাম দিক হইতে ডান দিকে নিম্নাভিমুখী হইবে, (২) উভয় নিরপেক্ষ রেখাই Convex আকৃতির হইবে এবং (৩) উভয় ক্ষেত্রেই একটি নিরপেক্ষ রেখা অপর নিরপেক্ষ রেখাকে ছেদ করিবে না। কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। ক্রেতার ক্ষেত্রে একটি নিরপেক্ষ রেখা হইতে আরও উঁচুতে অপর একটি নিরপেক্ষ রেখার দূরত্ব পরিতৃপ্তির বৃদ্ধি সূচিত করে; কিন্তু এই ক্ষেত্রে পরিতৃপ্তি বাড়িয়াছে, শুধু এই কথাই বলা যায়, কতটা বাড়িয়াছে, তাহা বলা সম্ভবপর নয়। কারণ পরিতৃপ্তি কখনই পরিমাপযোগ্য নহে। অপর পক্ষে উৎপাদকের ক্ষেত্রে একটি নিরপেক্ষ রেখা হইতে উঁচুতে অপর একটি নিরপেক্ষ রেখার দূরত্ব উৎপাদনের বৃদ্ধি সূচিত করে এবং সেই ক্ষেত্রে উৎপাদন কতটা বাড়িয়াছে তাহা বলা সম্ভবপর। ক্রেতা যেমন তাহার পছন্দের সূত্র (Scale of Preference) অনুযায়ী একটি জিনিসের সহিত অপর জিনিসের পরিবর্ততা (Substitutability) স্থির করে, উৎপাদক সেই প্রকার দুইটি উপাদানের মূল্যের অনুপাতের উপর নির্ভর করিয়া ইহাদের পরিবর্তন স্থির করে। ক্রেতার ক্ষেত্রে যাহাকে আমরা বলি *Marginal Rate of Substitution*; উৎপাদকের ক্ষেত্রে তাহাকে আমরা বলি *Marginal Technical Rate of Substitution*; আবার ক্রেতার ক্ষেত্রে যেমন আমরা আয় প্রভাব (Income effect) দেখিতে পাই, উৎপাদকের ক্ষেত্রেও সেই প্রকার আমরা দেখিতে পাই ফার্মের সম্প্রসারণ রেখা (Expansion path)। ক্রেতার ক্ষেত্রে যেমন বাজেট নিরপেক্ষ রেখার সহিত স্পর্শক হইলে (tangent) ভারসাম্য অর্জিত হয়, ফার্মের ক্ষেত্রেও সেই প্রকার উৎপাদন-খরচ রেখা উৎপাদকের নিরপেক্ষ রেখার সহিত স্পর্শক হইলে ভারসাম্য অর্জিত হয়। ক্রেতার আচরণ হইতে আমরা যেমন চাহিদার নিয়ম (Law of Demand) নিরূপণ করিতে পারি, উৎপাদকের আচরণ হইতে আমরা সেই প্রকার উৎপাদনের নিয়ম (Laws of Returns) নিরূপণ করিতে পারি। ক্রেতার পক্ষে কোন জিনিসের চাহিদা যেমন সংশ্লিষ্ট জিনিসের প্রান্তিক উপযোগের উপর নির্ভরশীল,

উৎপাদকের ক্ষেত্রে কোন উপাদানের জন্য চাহিদা সংশ্লিষ্ট উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনী-শক্তির উপর নির্ভরশীল।

উৎপাদকের ভারসাম্যের উৎপাদনের নিয়মগুলির সম্পর্ক (Relation between the Laws of Returns and the theory of Production Function) যখন উৎপাদনের খরচ দেখা সম-উৎপাদন দেখার সহিত Equal Product Curve) স্পর্শক (Tangent) হয় তখন উৎপাদকের ভারসাম্য অর্জিত হয়। যখন আমরা কতিপয় সম-উৎপাদন রেখা পর পর অঙ্কিত করি, তখন তাহা হইতে আমরা উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতিদামের নিয়ম (Laws of Returns) বাহির করিতে পারি। যদি প্রথম সম-উৎপাদন রেখা হইতে দ্বিতীয় সম-উৎপাদন রেখার মধ্যে যে দূরত্ব তাহা হইতে দ্বিতীয় সম-উৎপাদন রেখা এবং তৃতীয় সম-উৎপাদন রেখার দূরত্ব কম হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়ম (Law of Increasing Returns) কার্যকর হইতেছে। আবার যদি বিভিন্ন সম-উৎপাদন রেখার মধ্যে দূরত্ব সমান থাকে অর্থাৎ, যদি এমন হয় যে প্রথম সম-উৎপাদন রেখা হইতে দ্বিতীয় সম-উৎপাদন রেখা এবং দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় সম-উৎপাদন রেখার দূরত্ব সমান, তবে বুঝিতে হইবে যে উৎপাদন বৃদ্ধির স্থির মাত্রা (Constant Returns to Scale) কার্যকর হইবে। কিন্তু যদি একটি উৎপাদনের স্তর হইতে অপর একটি উৎপাদন স্তরে যাইবার সময় উৎপাদন খরচের মাত্রা আনুপাতিক ভাবে বেশী হয়, অর্থাৎ যদি প্রথম সম-উৎপাদন রেখা হইতে দ্বিতীয় সম-উৎপাদন রেখা এবং দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় সম-উৎপাদন রেখার দূরত্ব ক্রমশঃ বেশী হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম (Law of Diminishing Returns, অথবা Decreasing Ruturns to Scale) চালু হইয়াছে। নিম্নের চিত্রে বিভিন্ন উৎপাদনের নিয়ম কিভাবে কার্যকর হয় তাহা দেখানো হইয়াছে।

নিম্নের ৪৩নং চিত্রে কতিপয় সম-উৎপাদন রেখা অঙ্কিত হইয়াছে। এখানে প্রথম সম-উৎপাদন রেখা হইতে দ্বিতীয় সম-উৎপাদন রেখার দূরত্ব অপেক্ষা দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় রেখার দূরত্ব কম; সুতরাং এক্ষেত্রে ক্রম-বর্ধমান উৎপাদনের নিয়ম কার্যকর হইতেছে। আবার, চতুর্থ রেখা হইতে পঞ্চম রেখা এবং পঞ্চম রেখা হইতে ষষ্ঠ রেখার দূরত্ব সমান; সুতরাং এক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির মাত্রা স্থির। আবার পঞ্চম রেখা হইতে ষষ্ঠ রেখার দূরত্ব অপেক্ষা ষষ্ঠ রেখা হইতে সপ্তম রেখার দূরত্ব বেশী; সুতরাং সেক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম কার্যকর হইতেছে।
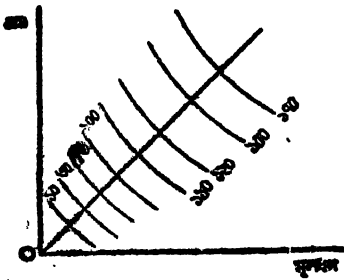
চিত্র নং ৪৩

Exercise

1. Explain the equilibrium of a producer, given a set of iso-quants and the inso-cost line. [কতিপয় সম-উৎপাদনরেখা এবং সম-খরচ রেখা দেওয়া থাকিলে উৎপাদকের ভারসাম্য ব্যাখ্যা কর।] (১২১-২৪ পৃষ্ঠা)

2. What do you mean by equal product curves ? Given the equal produet curves and the equal cost line, show how the producer can maximise his output or minimise his cost. (সম-উৎপাদন রেখা বলিতে তুমি কি বুঝ ? সম উৎপাদন রেখা এবং সম-খরচ রেখা দেওয়া থাকিলে, উৎপাদক কিভাবে সর্বাধিক পরিমাণে উৎপাদন করিতে পারে অথবা খরচের পরিমাণ সর্বনিম্ন করিতে পারে দেখাও।) (১২১-২৪ পৃষ্ঠা)

3. Write a note on the expansion path of a firm and show how the Laws of Returns can be derived from the theory of producer's behaviour.

(ফার্মের সম্প্রসারণ পথের উপর একটি টীকা লিখ এবং উৎপাদকের আচরণ সংক্রান্ত তত্ত্ব হইতে হইতে কিভাবে উৎপাদনের নিয়মগুলি অর্জন করা যায় দেখাও।) (১২৪-২৫ পৃষ্ঠা ; ১২৬ পৃষ্ঠা)

4. Compare the producer's behaviour and the consumer's behaviour.

(উৎপাদকেব আচরণ ও ক্রেতার আচবণ তুলনা কর।) (১২৫-২৬ পৃষ্ঠা)

একাদশ অধ্যায় | বাজার, ফার্ম এবং মূল্যতত্ত্ব (The Market, The Firm and the Theory of Price)

আধুনিক অর্থব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল হইতেছে বাজার। বাজারের মাধ্যমে বিক্রেতা তাহার উৎপাদিত জিনিস বাজারে বিক্রয় করে এবং ক্রেতা তাহার চাহিদা অনুযায়ী জিনিস ক্রয় করে। মানুষ যখন একটি জিনিসের বিনিময়ে অপর একটি জিনিস পাইবার চেষ্টা করিল, তখন হইতেই বাজারের সৃষ্টি হয়। ক্রমে একটি ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বাজারেরও সম্প্রসারণ হইতে থাকে।

বাজার বলিতে কি বুঝায় ? (What is a Market ?) : সাধারণ অর্থে বাজার বলিতে আমরা বুঝি এমন একটি স্থান যেখানে অনেক দোকান থাকে এবং অনেক ক্রেতা-বিক্রেতা বিভিন্ন জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করে। কিন্তু, অর্থশাস্ত্রে বাজার কথাটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। অর্থশাস্ত্রে বাজার বলিতে কোন জিনিসের বাজার বুঝায় ; যেমন, পাটের বাজার, সোনা-রূপার বাজার, শেয়ার বাজার, চায়ের বাজার, ইত্যাদি। বাজার বলিতে বুঝায় কোন জিনিসের জন্য ক্রেতাবিক্রেতার মধ্যে লেনদেনের সম্পর্ক। বিভিন্ন জিনিসের জন্য বিভিন্ন বাজার থাকে। বাজারের সংশ্লিষ্ট জিনিসের জন্য ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ই

বাজারের উপাদান
১। পৃথক পৃথক জিনিস
২। দাম
৩। ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে সহজ সম্পর্ক

থাকা চাই। বিক্রেতা একটি দামে জিনিস বিক্রয় করিতে থাকে ; ক্রেতা একটি দামে জিনিস ক্রয় করে। সুতরাং বাজারে একটি দাম থাকিবে এবং সেই দামে বিক্রেতা জিনিস বিক্রয় করিবে এবং ক্রেতা জিনিস ক্রয় করিবে। এই দামের মধ্যে সেই ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে একটি সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

একটি জিনিসের বাজার যে সর্বদা একটি নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ থাকিবে তাহা নহে। একটি নির্দিষ্ট জিনিসের ক্রেতা পৃথিবীর নানা স্থানে অবস্থান করিতে পারে। পৃথিবীর

বাজার একটি নির্দিষ্ট স্থান নহে

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে লেনদেন কোন নির্দিষ্ট স্থানে কেন্দ্রীভূত নাও হইতে পারে। চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম, টেলিফোন প্রভৃতি যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে লেনদেন চলিতে পারে। আবার পণ্য ছাড়াও অন্যান্য সেবাকার্যের বাজার থাকিতে পারে। যেমন—শেয়ার বাজার, টাকার বাজার, শ্রমের বাজার, বৈদেশিক মুদ্রার বাজার, প্রভৃতি।

বাজারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Markets): বিভিন্নভাবে বাজারের শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। পরিধি অনুযায়ী স্থানীয় (Local), আঞ্চলিক (Regional), জাতীয় (National) এবং আন্তর্জাতিক (International) বাজারের সৃষ্টি হইতে পারে। একটি নির্দিষ্ট স্থানে যদি ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে লেনদেন বা ক্রয়-বিক্রয় চলিতে থাকে তবে উহাকে স্থানীয় বাজার বলা যাইতে পারে। একটি অঞ্চলের মধ্যে যদি এই ক্রয়-বিক্রয় আবদ্ধ থাকে, তবে

পরিধি অনুযায়ী বাজারের শ্রেণীবিভাগ স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজার

আমরা আঞ্চলিক বাজার দেখিতে পাই। এমন অনেক জিনিস আছে যেগুলির ক্রয়-বিক্রয় সমগ্র দেশ জুড়িয়া চলে অথচ দেশের বাহিরে ইহারা যায় না। সেই জিনিসগুলির বাজারকে জাতীয় বাজার বলা হইয়া থাকে। আবার এমন অনেক জিনিস আছে যেগুলির চাহিদা সমগ্র পৃথিবীতে দেখা যায় এবং পৃথিবীর যে কোন স্থানে এই জিনিসগুলির লেনদেন বা ক্রয়-বিক্রয় চলিতে পারে, সেই সকল জিনিসের বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার বলা হয় ; যেমন, সোনার বাজার, পাটের বাজার, চায়ের বাজার, প্রভৃতি হইতেছে আন্তর্জাতিক বাজার। সময়ের তারতম্য অনুযায়ী বাজারের শ্রেণীবিভাগ হইতে পারে। মার্শাল সময়ের ভিত্তিতে চার প্রকার

সময়ের তারতম্য অনুযায়ী বাজারের শ্রেণীবিভাগ

বাজারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যথা ; অতি স্বল্পকালীন বাজার (Very short-period market), স্বল্পকালীন বাজার (Short-period market), দীর্ঘকালীন বাজার (Long-period market), এবং অতি দীর্ঘকালীন বাজার (Very long-period market)। অতি স্বল্পকালীন বাজারে যোগান স্থির থাকে। অথবা অন্যভাবে বলিতে গেলে যদি বাজারে যোগানের পরিমাণ পরিবর্তন করা সম্ভবপর না হয়, তবে যতক্ষণ যোগান অপরিবর্তিত থাকিবে ততক্ষণ বাজারটিকে অতি স্বল্পকালীন

বাজার বলা হয়। কোনও একদিন যদি বাজারে মাছের চাহিদা খুব বেশী থাকে, অথচ মাছের যোগান স্থির থাকে, তবে সেই দিনটিকে অতি স্বল্পকাল বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং বাজারটি অতি স্বল্পকালীন বাজার বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এই বাজারে যোগান স্থির থাকিলেও চাহিদা পরিবর্তিত হইতে পারে।

অতিস্বল্পকালীন বাজার

স্বল্পকালীন বাজারে যোগান স্থির থাকে না বটে, তবে চাহিদা যে হারে পরিবর্তিত হয়, যোগান সেই হারে পরিবর্তিত হয় না। স্বল্পকালীন বাজারে সময় এত বেশী নয় যে চাহিদার পরিবর্তন হইলে যোগান সর্বদাই সমান হারে পরিবর্তিত হইবে।

স্বল্পকালীন বাজার

দীর্ঘকালীন বাজারে চাহিদা পরিবর্তিত হইলে যোগানও পরিবর্তিত হয়; তবে চাহিদার পরিবর্তনের হার এবং যোগানের পরিবর্তনের হার সমান নাও হইতে পারে। অর্থাৎ যখন যেরূপ প্রয়োজন, সেইভাবে উৎপাদক যোগানের পরিবর্তন করিবার যথেষ্ট সময় পায়। কিন্তু দীর্ঘকালের পরিধি যদি খুব বেশী হয় এবং উৎপাদক যদি যোগান পরিবর্তন করিবার এমন সময় পায় যে চাহিদা যতই বাড়িবে, যোগান ঠিক ততই বাড়িবে, তবে বাজারে চাহিদা ও যোগান সমান থাকিবে এবং মূল্যও স্থিতিশীল থাকিবে।

দীর্ঘকালীন বাজার

অতিদীর্ঘকালীন বাজার

বাজারের পরিধি (Extent of the Market): সব বাজারের পরিধি সমান নয়। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি, কোন বাজার স্থানীয়, জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক হইতে পারে। বাজারের আয়তন সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির উপর নির্ভরশীল।

প্রথমত, কোন জিনিসের বাজার কত বড় হইবে তাহা সেই জিনিসের স্থায়িত্বের (durability) উপর নির্ভর করে। যে জিনিস যত স্থায়ী হইবে, সেই জিনিসের বাজারও তত ব্যাপক হইবে। ক্ষণভঙ্গুর জিনিসের বাজার বিশেষ সম্প্রসারিত হয় না। কারণ বাজার সম্প্রসারিত হইবার কালেই জিনিসটি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

স্থায়িত্ব

দ্বিতীয়ত, যে জিনিস যত সহজে এক জায়গা হইতে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা চলে সেই জিনিসের বাজারের আয়তনও তত ব্যাপক হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, ইউরোপে প্রস্তুত কোন জিনিস হয়ত সহজেই ভারতে পাঠানো চলে, তাহা হইলে ভারতীয়দের চাহিদা অনুযায়ী ইউরোপের উৎপাদকের পক্ষে এই জিনিস পাঠানো সম্ভব হইবে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে জিনিসটির বাজারও সম্প্রসারিত হইবে। সহজে স্থানান্তরে প্রেরণের সুবিধা (portability) আছে বলিয়াই সোনার বাজার এত সম্প্রসারিত হইয়াছে। সিগারেটের বাজারও বিশেষ সম্প্রসারিত হয়;

সহজে স্থানান্তরে প্রেরণ করিবার সুবিধা

কারণ, এক স্থান হইতে অপর স্থানে এই জিনিসটি পাঠাইতে বিশেষ অসুবিধা হয় না।

তৃতীয়ত, যে সকল জিনিসের সহজে চিনিয়া লইবার যোগ্যতা (cognizability) আছে, সেই সকল জিনিসের বাজারও বিশেষ বিস্তৃত হয়। এইজন্যই সোনা হীরা, মুক্তা, প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুর বাজার, সরকারী ঋণপত্রের বাজার, কোম্পানী কাগজের বাজার বিশেষ ভাবে বিস্তৃত।

সহজে চিনিবার যোগ্যতা

সর্বশেষে, কোনও জিনিসের বিস্তৃত বাজারের প্রধান শর্ত হইল ইহার ব্যাপক চাহিদা (wide demand)। সোনার চাহিদা সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া দেখা যায়, সেইজন্য সোনার বাজার সমগ্র পৃথিবীতে সম্প্রসারিত। গমের চাহিদা পৃথিবীর সর্বত্র; সেইজন্য গমের বাজারও সমগ্র পৃথিবীতেই বিস্তৃত।

ব্যাপক চাহিদা

গড় আয় ও প্রান্তিক আয় (Average Revenue and Marginal Revenue): কোন জিনিসের বিভিন্ন ইউনিট বিক্রয় করিয়া আমরা যে বিক্রয় লব্ধ আয় (Total Revenue) পাই তাহাকে মোট বিক্রীত ইউনিটগুলির সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে আমরা গড় আয় (Average Revenue) নিরূপণ করিতে পারি। আবার বিভিন্ন ইউনিট বিক্রীত হইবার পর একটি অতিরিক্ত ইউনিট বিক্রয় করিলে আমরা যে অতিরিক্ত আয় উপার্জন করি, তাহাকে প্রান্তিক আয় (Marginal Revenue) বলা হয়। গড় আয় স্থির থাকিলে, প্রান্তিক আয় স্থির থাকে; গড় আয় কমিলে প্রান্তিক আয় কমে এবং গড় আয় বাড়িয়া গেলে প্রান্তিক আয় বাড়িয়া যায়। নিম্নের তালিকা হইতে ইহা বুঝা যাইবে।

মোট বিক্রীত ইউনিট	মোট বিক্রয়লব্ধ আয় (টাকায়)	গড় আয় (টাকায়)	প্রান্তিক আয় (টাকায়)
২	৪	২	—
৩	৬	২	২
৪	৮	২	২
৫	৪৫	৯	৩৭
৬	৯৬	১৬	৫১
৭	১০৫	১৫	৯
৮	১১২	১৪	৭

এই তালিকায় দেখা যায় যে প্রথম চার ইউনিট বিক্রয় করিবার সময় গড় আয় স্থির আছে এই সেই সঙ্গে প্রান্তিক আয়ও স্থির আছে। পাঁচ এবং ছয় ইউনিট বিক্রয় করিবার সময় গড় আয় বাড়িয়া যাইতেছে এবং সেই সঙ্গে প্রান্তিক আয়ও বাড়িয়া যাইতেছে। আবার সাত এবং আট ইউনিট বিক্রয় করিবার সময় গড় আয় পুনরায় কমিয়া যাইতেছে এবং সেই সঙ্গে প্রান্তিক আয়ও কমিয়া যাইতেছে।

ফার্মের ভারসাম্য (Equilibrium of a Firm) **:** যে অর্থ নৈতিক ইউনিটের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের জিনিস উৎপাদিত এবং বিক্রীত হয়, সেই ইউনিটকে আমরা ফার্ম (Firm) বলিতে পারি। একটি ফার্ম হইতেছে একাধারে উৎপাদক ও বিক্রেতা। ফার্মের লক্ষ্য হইতেছে সর্বাধিক পরিমাণ লাভ অর্জন করা। ক্রেতা যেমন সর্বদাই তাহার আচরণের দ্বারা সর্বাধিক পরিতৃপ্তি (maximum satisfaction) পাইবার চেষ্টা করে, ফার্ম বা বিক্রেতারও তাহার আচরণের দ্বারা সর্বাধিক লাভ (maximum profit) অর্জন করিবার চেষ্টা করে। ফার্মের ভারসাম্য তখনই অর্জিত হয় তখন ফার্মের পক্ষে এমন পরিমাণে কোন জিনিস উৎপাদন করা সম্ভব যাহা ফার্মকে সর্বোচ্চ পরিমাণ মুনাফা প্রদান করে।

কোন ফার্মের মোট লাভের পরিমাণ জানিতে হইলে মোট আয় (Total Revenue) হইতে মোট ব্যয় (Total Cost) বাদ দিতে হইবে। সুতরাং মোট লাভ=মোট আয়−মোট ব্যয়।

চিত্র নং ৪৪

৪১ নং চিত্রে TR এবং TC রেখা যথাক্রমে মোট আয় এবং মোট খরচ রেখা। যখন OZ পরিমাণ জিনিস প্রস্তুত হইতেছে, তখন মোট আয এবং মোট খরচের মধ্যে পার্থক্য হইতেছে XY এবং এই চিত্র অনুযায়ী ইহাই সর্বাপেক্ষা বেশী আর্থক্য। অর্থাৎ X এবং Y-এর দূরত্ব এক্ষেত্রে মোট আয় এবং মোট খরচের মধ্যে সর্বাধিক পার্থক্য ; সুতরাং এখানেই মোট লাভের পরিমাণ সর্বাধিক।
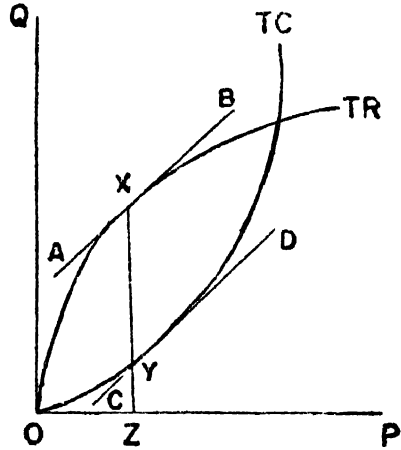
যখন ফার্মটি সর্বোচ্চ পরিমাণ লাভ অর্জন করে তখন প্রান্তিক উৎপাদন খরচ (Marginal Cost) এবং প্রান্তিক রেভিনিউ (Marginal Revenue) সমান হয়। কোন জিনিসের যোগান ইহার উৎপাদন খরচের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং কোন জিনিসের যোগান অতিরিক্ত বাড়ানো হইবে কিনা তাহা প্রান্তিক উৎপাদন খরচের (Marginal Cost of Production) উপর নির্ভর করে। কোন জিনিসের বর্তমান ইউনিটগুলির উপর যদি অতিরিক্ত কোন ইউনিট উৎপাদন করা হয়, তবে সেই অতিরিক্ত ইউনিট উৎপাদন করিবার জন্য যে অতিরিক্ত খরচ হয় তাহাকেই প্রান্তিক খরচ বলে, এবং প্রান্তিক উৎপাদন বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যায় তাহাকে প্রান্তিক আয় বলে। ফার্মের ভারসাম্য অর্জন করিবার দুইটি শর্ত আছে। প্রথমটি হইতেছে ফার্মের প্রান্তিক খরচ

(marginal Cost) ইহার প্রান্তিক আয়ের (marginal revenue) সমান হইবে, এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে ফার্মের প্রান্তিক খরচ রেখা নীচের দিক হইতে আসিয়া প্রান্তিক আয় রেখাকে ছেদ করিবে। ফার্মের ভারসাম্যের ক্ষেত্রে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচের সমতা একটি প্রয়োজনীয় শর্ত বটে; কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। ফার্মের ভারসাম্য অর্জন করিবার জন্য প্রান্তিক খরচ রেখাটিকে নীচের দিক হইতে আসিয়া প্রান্তিক আয় রেখাকে ছেদ করা চাই,—তাহা না হইলে মুনাফার পরিমাণ সর্বাধিক হইবে না, নিম্নের চিত্রে ইহা দেখানো হইয়াছে। এই চিত্রে OY রেখা দ্বারা গড় এবং প্রান্তিক আয় ধরা হইয়াছে; OX রেখা উৎপাদনের পরিমাণ বুঝাইতেছে। OP হইতেছে প্রান্তিক আয়। ইহা গড় আয়েরও সমান; কারণ এক্ষেত্রে বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এই চিত্রে প্রান্তিক খরচ রেখা প্রান্তিক আয় রেখাকে দুইটি বিন্দুতে, অর্থাৎ, F এবং E বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। F বিন্দুতে
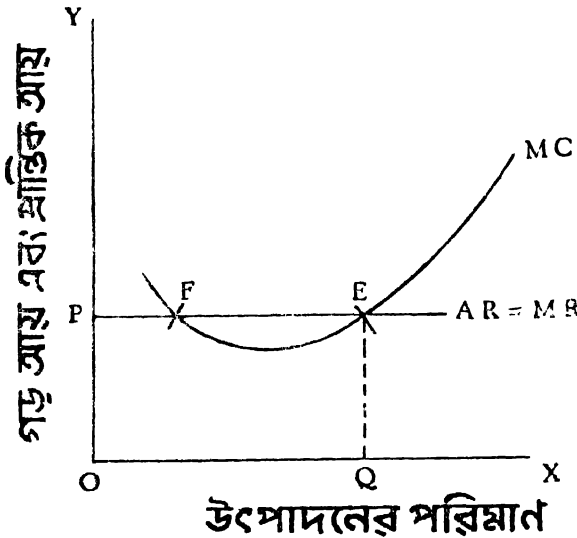
চিত্র নং ৪৫

প্রান্তিক খরচ রেখা উপরের দিক হইতে আসিয়া প্রান্তিক আয় রেখাকে ছেদ করিয়াছে; এক্ষেত্রে ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক পরিমাণ হয় নাই, বরং বলা চলে F বিন্দুতে ফার্মের পক্ষে ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হইয়াছে, এবং এই বিন্দুতে ফার্মের সর্বনিম্ন পরিমাণ মুনাফা হইয়াছে। কিন্তু E বিন্দুতে প্রান্তিক খরচ রেখা নীচের দিক হইতে আসিয়া প্রান্তিক আয় রেখাকে ছেদ করিয়াছে এবং এই বিন্দুতে ফার্মের সর্বাধিক মুনাফা অর্জিত হইয়াছে। F বিন্দুর পর হইতে E বিন্দুতে পৌঁছানো পর্যন্ত ফার্ম যতই উৎপাদনের পরিমান বাড়াইয়াছে, ততই মুনাফার পরিমাণ

বাড়িয়াছে। E বিন্দুতে পৌঁছিবার পর ফার্মের পক্ষে আর উৎপাদন বাড়াইয়া লাভের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব নয়; কারণ, E বিন্দুর পর প্রান্তিক খরচ রেখা আবার প্রান্তিক আয় রেখার উপর উঠিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ, E বিন্দুতে যে OQ উৎপাদন হইতেছে, ইহার পর যদি ফার্ম আরও উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করে, তবে লাভের পরিবর্তে ক্ষতির সৃষ্টি হইবে। সুতরাং OQ হইতেছে ফার্মের সর্বোচ্চ লাভ প্রদানকারী উৎপাদন। দেখা যাইতেছে, ফার্মের ভারসাম্যের শর্ত হইতেছে দুইটি: যথা, (১) প্রান্তিক আয় প্রান্তিক খরচের সমান হইবে, এবং (২) প্রান্তিক খরচ রেখা নীচের দিক হইতে আসিয়া প্রান্তিক আয় রেখাকে ছেদ করিবে।

বাজারের ভারসাম্য,—চাহিদা ও যোগানের সমতা (Equilibrium in the Market—Demand and Supply Equality): যখন ক্রেতাদের চাহিদা বিক্রেতার যোগানের সমান হয় তখন বাজারে সামগ্রিকভাবে ভারসাম্য অর্জিত হয়। কোন জিনিসের জন্য ক্রেতাদের চাহিদা ইহার প্রান্তিক উপযোগের উপর নির্ভর করে। যখন দাম বেশী হয় তখন চাহিদা কম থাকে এবং যখন দাম কম হয় তখন চাহিদা বাড়ে। ক্রেতার চাহিদাকে আমরা একটি চাহিদা তালিকায় সাজাইতে পারি। ব্যক্তিগত চাহিদার সমষ্টি লইয়া আমরা বাজারের সামগ্রিক চাহিদা তালিকা (Market Demand Schedule) প্রস্তুত করিতে পারি। নিম্নে একটি চাহিদা তালিকা (Demand Schedule) দেওয়া হইল:—

দাম	চাহিদা
৫	১০০০ ইউনিট
৪	১৫০০ ,,
৩	২২০০ ,,
২	২৯০০ ,,

অনুরূপভাবে ব্যক্তিগত যোগান রেখার সমষ্টি লইয়া আমরা একটি বাজারের যোগান তালিকা (Market Supply Schedule) প্রস্তুত করিতে পারি। যোগান তালিকা যোগানের নিয়মের উপর ভিত্তিশীল। যোগানের নিয়ম অনুযায়ী দাম বাড়িলে যোগান বাড়ে, দাম কমিলে যোগান কমে। নিম্নে একটি যোগান তালিকা দেওয়া হইল:—

দাম	যোগান
৫	৫০০০ ইউনিট
৪	৩৪০০ ,,
৩	২২০০ ,,
২	১৪০০ ,,

দেখা যাইতেছে, দাম বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কোন জিনিসের যোগান বাড়িয়া যায়। যোগান দাম (Supply Price) শুধু উৎপাদন খরচের উপরেই নির্ভর করে না। ব্যবসায়ীদের হাতে মজুত মাল এবং বিক্রেতাদের তাড়াতাড়ি কোন জিনিস বিক্রয়

করিবার ইচ্ছার উপরেও যোগান দাম নির্ভর করে। মূল্য নিরূপিত হইবে তখনই যখন চাহিদা যোগানের সমান হইবে। অর্থাৎ উপরোক্ত উদাহরণ অনুযায়ী যখন কোন জিনিসের দাম তিন টাকা হইবে তখন ইহার চাহিদা হইবে ২২০০ ইউনিট এবং যোগান হইবে ২২০০ ইউনিট। সুতরাং তিন টাকাই বাজার দাম হইবে। পার্শ্ববর্তী ৪৬ নং চিত্রে DD′ হইতেছে চাহিদা রেখা এবং SS′ হইতেছে যোগান রেখা। P বিন্দুতে চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হইতেছে। Q বিন্দুতে চাহিদা যোগান অপেক্ষা বেশী এবং S′ বিন্দুতে যোগান চাহিদা অপেক্ষা বেশী। এই চিত্রে PB হইতেছে দাম। P বিন্দুতে ভারসাম্য (Equilibrium) অর্জিত হইয়াছে, কেন না, এই বিন্দুতে জিনিসের চাহিদা ইহার যোগানের সমান হইতেছে।
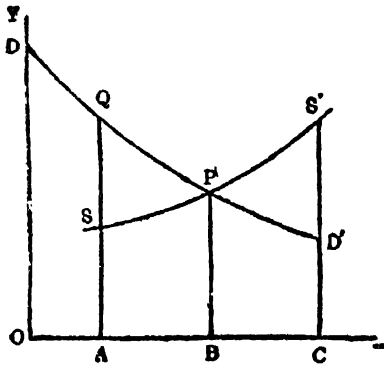
চিত্র নং ৪৬

পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দাম নিরূপণ, এবং প্রান্তিক খরচ, প্রান্তিক আয়, ও গড় খরচের দাম মধ্যে সম্পর্ক (Price determination under Perfect Competition, and the relation between Marginal Cost, Marginal Revenue, Average Cost and Price under Perfect Competition): পূর্ণ প্রতিযোগিতা হইতেছে এমন একটি বাজার যেখানে (১) স্বল্পকালে অল্পসংখ্যক এবং দীর্ঘকালে অনেক ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে ; অর্থাৎ, দীর্ঘকালে বিভিন্ন ফার্ম অবাধে বাজারে প্রবেশ করিতে পারে ; (২) ক্রেতাদের চাহিদা সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক হয় ; (৩) ক্রেতা ও বিক্রেতা একই জিনিস কেনাবেচা করে, অর্থাৎ জিনিসটি সর্বদা এবং সর্বত্র একজাতীয় (homogeneous) ; (৪) বাজার শুধু একটি বাজার-দাম থাকে, এবং কোন বিক্রেতা অথবা ক্রেতার পক্ষে ইহার পরিবর্তন করা সম্ভব নয় (এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, ক্রেতার চাহিদা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হইলে বাজার দাম নির্দিষ্ট থাকে এবং চাহিদা রেখা পরিমাণ অক্ষ রেখার [quantity axis] সমান্তরাল হয়) ; (৫) ক্রেতা-বিক্রেতা সকলেরই বাজার-দাম সম্পর্কে অথবা বাজার সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকে, এবং (৬) উৎপাদনের সব উপকরণই সম্পূর্ণভাবে সচল (mobile) থাকে। কোন জিনিসের যোগান ইহার উৎপাদন খরচের উপর নির্ভর করে। সুতরাং কোন জিনিসের যোগান অতিরিক্ত বাড়ান হইবে কিনা তাহা প্রান্তিক উৎপাদন খরচের (Marginal Cost of Production) উপর নির্ভর করে। বর্তমান জিনিসগুলির উপর যদি অতিরিক্ত কোন ইউনিট উৎপাদন করা হয়, তবে সেই অতিরিক্ত ইউনিট উৎপাদন

দামের সহিত প্রান্তিক উপযোগ ও প্রান্তিক খরচের সম্পর্ক

করিবার জন্য যে অতিরিক্ত খরচ হইবে তাহাকেই প্রান্তিক খরচ বলে। আবার চাহিদা নির্ভর করে প্রান্তিক উপযোগের উপর। যখন কোন জিনিসের চাহিদা ইহার যোগানের সমান হইবে, তখন সেই জিনিসের প্রান্তিক উপযোগ ও প্রান্তিক খরচ সমান হইবে। অর্থাৎ বিক্রেতা যত টাকা দিয়া জিনিসটি তৈয়ারী করিবে, ক্রেতা তত টাকা দিয়া জিনিসটি কিনিতে প্রস্তুত থাকিবে। সুতরাং পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দাম একদিকে প্রান্তিক উপযোগ এবং অপরদিকে প্রান্তিক খরচের সমান।

একটি জিনিসের প্রান্তিক উৎপাদন খরচ ক্রেতার কাছে যতখানি, ততখানি হইতেছে বিক্রেতার প্রান্তিক আয়। কারণ, আমি যদি কোন জিনিস হইতে পাঁচ টাকার পরিমাণ উপযোগ পাই তবে পাঁচ টাকা দিয়া জিনিসটি কিনিতে আমি প্রস্তুত থাকিব। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে বিক্রেতার বিক্রয়লব্ধ আয় (Revenue) হইতেছে পাঁচ টাকা। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগ বিক্রেতার প্রান্তিক আয়ের সমান। সুতরাং যখন চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হইয়া উৎপাদকের ভারসাম্য (Equilibrium) অর্জিত হয়, তখন প্রান্তিক আয় (Marginal Revenue) প্রান্তিক খরচের সমান হয়। ধরা যাক্, কোন জিনিসের দশটি ইউনিট বেচিয়া ২০ টাকা পাওয়া যায়; ইহার পর ১টি ইউনিট বেচিয়া ২২ টাকা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে বিক্রেতার প্রান্তিক আয় হইতেছে ২ টাকা। যদি একাদশ ইউনিটের খরচ ২ টাকা হয় তবেই ভারসাম্য অর্জিত হইবে যদি উৎপাদন খরচ ২ টাকার কম হয়, তবে বিক্রেতার লাভ হইবে এবং সেইজন্য সে আরও বেশী উৎপাদন করিবে। উৎপাদন বাড়িলে পুনরায় উৎপাদন খরচ বাড়িয়া যাইবে; এইভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রান্তিক খরচ এবং প্রান্তিক আয় সমান না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদক কোন জিনিসের উৎপাদন চালাইতে থাকে।

প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচ

পূর্ণ প্রতিযোগিতায় যে মূল্য নিরূপিত হয়, তাহার একটি সূত্র দেওয়া যায়; যথা মূল্য (Price)=প্রান্তিক আয় (Marginal Revenue) = প্রান্তিক খরচ (Marginal Cost)। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় প্রান্তিক আয় দামের সমান; আবার প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচ পরস্পরের সমান। সুতরাং দাম এবং প্রান্তিক খরচ সমান। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় যতক্ষণ দাম প্রান্তিক খরচ অপেক্ষা বেশী থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিক্রেতা যোগান বাড়াইতে থাকিবে। যোগান বাড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তিক খরচও বাড়িতে থাকিবে। অথচ দাম পূর্ণ প্রতিযোগিতায় স্থির থাকে। উৎপাদন বা যোগান বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তিক খরচও বাড়িতে থাকে এবং প্রান্তিক খরচ ক্রমশঃ বাড়িয়া দামের সমান হয়, তখনই বিক্রেতা আর যোগান বাড়ানো বন্ধ করে। কারণ, তখন যোগান বাড়ানো বিক্রেতার পক্ষে লাভজনক হয় না। দেখা যাইতেছে, পূর্ণ প্রতিযোগিতার বিশেষ শর্তগুলিই চূড়ান্ত ভাবে দাম ও প্রান্তিক খরচকে পরস্পরের সমান করে।

স্বল্পকালীন মূল্য

কোন জিনিসের স্বল্পকালীন দাম প্রান্তিক খরচের সমান হইলেও গড় খরচ অপেক্ষা বেশী হইতে পারে এবং বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান কিছু মুনাফা অর্জন করিতে পারে। ৪৭নং চিত্রে যখন দাম হইতেছে OR_2 তখন Z বিন্দুতে প্রান্তিক খরচ প্রান্তিক আয়ের সমান। কিন্তু R_2C_2 রেখাটি হইতেছে বিক্রেতার বিক্রয়লব্ধ গড় আয় রেখা (Average Revenue Curve) এবং ইহা তাহার প্রান্তিক আয়ের (Marginal Revenue) সমান। এখানে দাম গড় খরচ হইতে কিছু বেশী। R_2ZYX ক্ষেত্রটি এখানে অতিরিক্ত মুনাফার পরিমাণ বুঝাইতেছে।
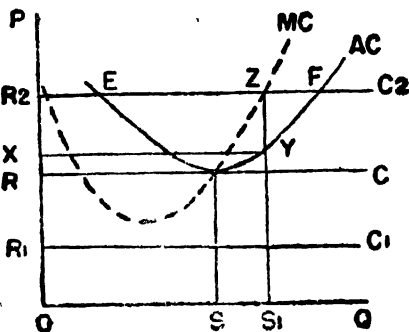
চিত্র নং ৪৭

অল্প সময়ে এই মুনাফা থাকিবার কারণ হইতেছে এই যে অধিক সংখ্যক বিক্রেতা এই অল্প সময়ে বাজারে প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু যেই একজন বিক্রেতা কিছু মুনাফা অর্জন করিবে, তখনই মুনাফার লোভে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য বিক্রেতারা বাজারে প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে এই অতিরিক্ত মুনাফা দূর হইয়া যাইবে।

দীর্ঘ সময়ে দেখা যায় যে দাম একদিকে প্রান্তিক খরচের সমান হয় এবং অপরদিকে ইহা গড় খরচের (Average Cost) সমান হয়। দাম যে শুধু গড়পড়তা খরচের সমান হয় তাহাই নহে ইহা সর্বনিম্ন গড় খরচের (Minimum Average Cost) সমান হয়। তখনই ফার্মটিকে আমরা Optimum Firm বলি। অর্থাৎ ফার্মটি তখন এমন একটি পর্যায়ে আসে যে ইহা সর্বনিম্ন খরচে নির্দিষ্ট পরিমাণ জিনিস উৎপাদন করিতে পারে এবং ইহাই হয় তাহার কাম্য উৎপাদন। ৪৮নং চিত্রে একটি Optimum Firm-এর অবস্থা দেখানো হইল।

চিত্র নং ৪৮

এই চিত্রে দাম শুধু প্রান্তিক খরচের সমানই নহে। ইহা সর্বনিম্ন গড় খরচেরও সমান। OT পরিমাণ জিনিসকে আমরা সর্বাপেক্ষা কাম্য পরিমাণ জিনিস (Optimum Output) বলি এবং ফার্মটিকে সর্বোত্তম ফার্ম (Optimum Firm) বলি। এই অবস্থায় গড় মোট খরচের
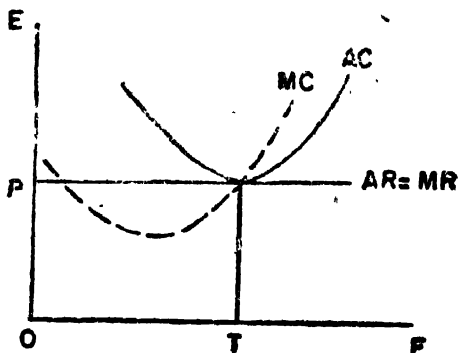
মধ্যেই কিছু মুনাফা অন্তর্ভুক্ত থাকে। ইহাই স্বাভাবিক মুনাফা (Normal Profit)। এই মুনাফা না থাকিলে কোনও ফার্মই কিছু উৎপাদন করিত না।

আমরা দেখিয়াছি, পূর্ণ প্রতিযোগিতায় একটি ফার্ম তখনই ভারসাম্য অর্জন করে যখন প্রান্তিক খরচ (Marginal Cost) প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের (Marginal Revenue) সমান হয় এবং প্রান্তিক খরচ রেখা নীচের দিক হইতে আসিয়া প্রান্তিক আয় রেখাকে ছেদ করে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার সব অবস্থায়ই বাজারের দামও প্রান্তিক খরচের সমান হয়। যদি দাম প্রান্তিক খরচের সমান না হইত, তবে ইহা প্রান্তিক খরচ অপেক্ষা বেশী অথবা কম হইত,—কিন্তু তাহা অসম্ভব ছিল। কারণ, দাম কোন অবস্থায়ই প্রান্তিক খরচের কম হইতে পারে না যেহেতু সেই অবস্থায় বিক্রেতার ক্ষতি হয়। আবার পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দাম প্রান্তিক খরচের বেশীও হইতে পারে না। কারণ প্রতিযোগী বিক্রেতাদের মধ্যে একজন না একজন দাম কমাইয়া প্রান্তিক খরচের সমান দাম স্থির করিবে ; তাহা ছাড়া, পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ক্রেতারাও জানে জিনিসটির প্রান্তিক খরচ কত। তাহারা কিছুতেই প্রান্তিক খরচের বেশী দাম দিবে না। তাহাদের চাহিদা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক। সেইজন্য বাজারে যে দাম নির্ধারিত হইবে, সেই দামে তাহারা যত খুশী জিনিস কিনিতে পারে এবং বাজারে চূড়ান্তভাবে শুধু একটি মাত্রই দাম নিরূপিত হইবে এব তাহাও বিক্রেতাদের মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতার ফলেই স্থির হইবে। সেই দাম অল্প সময়ের জন্যই হোক আর দীর্ঘ সময়ের জন্যই হোক প্রান্তিক খরচের সমান হয়।

দাম ও প্রান্তিক খরচের মধ্যে সম্পর্ক

গড় খরচের সঙ্গে দামের সম্পর্ক অল্প সময় এবং দীর্ঘ সময় এই দুইটি সময়ের ভিত্তিতে নিরূপিত হয়। অল্প সময়ে যখন বাজারে ফার্মের সংখ্যা সীমাবদ্ধ থাকে তখন বাজারের দাম সাধারণতঃ গড় পরিবর্তনীয় খরচ (Average Variable Cost) অপেক্ষা বেশী হয়। ইহাতে প্রত্যেক ফার্মই কিছু না কিছু অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করে। এই অতিরিক্ত মুনাফাই ধীরে ধীরে অন্যান্য ফার্মকে আকৃষ্ট করে এবং দীর্ঘকালে সবগুলি ফার্মের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে দাম গড় খরচের সমান হয়। দীর্ঘকালে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে গড় স্থায়ী খরচও (Average Fixed Cost) ক্রমশঃ উঠিয়া আসিতে আরম্ভ করে এবং চূড়ান্তভাবে প্রত্যেক ফার্মই সর্বনিম্ন গড় মোট খরচের (Minimum Average Total Cost) সমান দাম স্থির করে।

দাম ও গড় খরচের মধ্যে সম্পর্ক

শিল্পের ভারসাম্য (Equilibrium of the Industry) : শিল্পের ভারসাম্য দুইটি শর্তের উপর নির্ভরশীল। প্রথমটি হইতেছে, শিল্পের অন্তর্ভুক্ত সব ফার্ম ভারসাম্য অর্জন করিবে, অর্থাৎ, কোন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত সব ফার্মের ক্ষেত্রেই প্রান্তিক আয় প্রান্তিক খরচের সমান হইবে এবং প্রান্তিক খরচ রেখা নীচের দিক হইতে আসিয়া প্রান্তিক আয় রেখাকে ছেদ করিবে। দ্বিতীয়টি হইতেছে, শিল্পটির অন্তর্ভুক্ত সব ফার্মই স্বাভাবিক মুনাফা (Normal Profit) অর্জন করিবে। অর্থাৎ, সব ফার্মের

ক্ষেত্রেই দাম এবং গড় খরচ পরস্পরের সমান হইবে। বাজারে যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে তবে শিল্পের ভারসাম্য অর্জিত হইবার শর্ত হইতেছে, দাম = প্রান্তিক আয় = গড় খরচ। উপরের চিত্রে যখন উৎপাদনের পরিমাণ OT, তখন শুধু যে শিল্পটির অন্তর্ভুক্ত সব ফার্মেরই সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জিত হইয়াছে তাহা নহে, সব ফার্মের ক্ষেত্রেই দাম ও গড় খরচ পরস্পরের সমান হইয়াছে। যদি বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা না থাকে, তখনও শিল্পের ভারসাম্য অর্জিত হইবার দুইটি শর্ত আছে; যথা, (১) প্রান্তিক আয় = প্রান্তিক খরচ (প্রান্তিক খরচরেখা নীচের দিক হইতে আসিয়া প্রান্তিক আয় রেখাকে ছেদ করে।) এবং (২) দাম = গড় খরচ। অবশ্য বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা না থাকিলে দাম সর্বদাই প্রান্তিক খরচ অথবা প্রান্তিক আয় অপেক্ষা বেশী থাকে।

মূল্যতত্ত্বে সময়ের উপাদান এবং বাজার দাম ও স্বাভাবিক দাম (Time Element in the Theory of Value,—Market Price and Normal Price): একটি নির্দিষ্ট সময়ে (খুব অল্প সময়ে) যোগান এবং চাহিদার পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে যে দাম নিরূপিত হয় তাহাকে আমরা বাজার দাম বলি। খুব অল্প সময়ে যোগান স্থির থাকে। সময় যত বাড়িতে থাকে, তত ধীরে ধীরে যোগানের পরিমাণ বাড়িতে থাকে। সুতরাং অল্প সময়ে দাম নিরূপণ করিবার সময় যোগান স্থির থাকে বলিয়া এবং চাহিদা পরিবর্তনশীল থাকে বলিয়া চাহিদার প্রভাব আপেক্ষিকভাবে বেশী হয়। কিন্তু অল্প সময়ে যদি যোগানের কিছু পরিবর্তন হয়, তখন চাহিদা ও যোগানের সাহায্যে যে দাম নিরূপিত হয়, তাহা হইতেছে স্বল্পকালীন স্বাভাবিক মূল্য (Short-run Normal Value)। দীর্ঘ সময়ে চাহিদার পরিবর্তন অনুযায়ী যোগানেরও পরিবর্তন হয়, তখন চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে যে দাম নিরূপিত হয় তাহাই স্বাভাবিক মূল্য (Long-run Normal Price)।

অধ্যাপক মার্শাল মূল্যতত্ত্বে সময়ের উপাদান (time element in the theory of value) সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁহার মতে যতক্ষণ যোগান একদম স্থির থাকে অথচ চাহিদা পরিবর্তনশীল থাকে, সেই সময়টিকে আমরা খুব অল্প সময় (very short period) বলিতে পারি। আবার যখন দেখা যায়, যে হারে চাহিদার পরিবর্তন হয় সেই হারে যোগানের পরিবর্তন
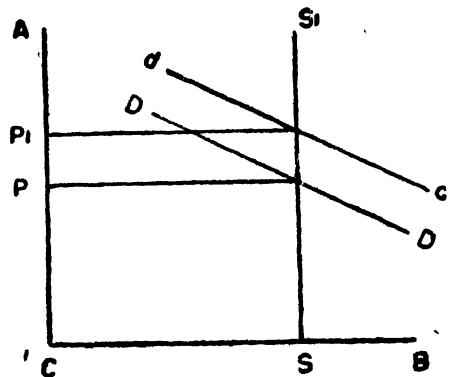
চিত্র নং ৪৯

হয় না এবং যোগান যখন সামান্য পরিবর্তিত হয় সেই সময়টিকে আমরা অল্প সময় (short period) বলিতে পারি। যখন চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যোগানও সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়, তখন সেই সময়টিকে আমরা দীর্ঘ সময় (long period) বলিতে পারি। সাধারণতঃ সময় যত অল্প হয়, তত দাম নিরূপণে যোগান অপেক্ষা চাহিদার গুরুত্ব আপেক্ষিকভাবে বেশী হয় এবং সময় যত দীর্ঘ হয়, তত দাম নিরূপণে চাহিদা অপেক্ষা যোগানের আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশী হয়। খুব অল্প সময়ে কিভাবে চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে দাম নিরূপিত হয়, তাহা উপরের ৪৯নং চিত্রে দেখানো হইল।

মূল্যতত্ত্বে সময়ের উপাদান

এই চিত্রে CS হইতেছে কোন জিনিসের নির্দিষ্ট যোগান। SS_1 হইতেছে যোগান রেখা। যখন চাহিদা রেখা হইতেছে DD, তখন চাহিদা রেখা ও যোগান রেখার পারস্পরিক প্রভাবের ফলে CP দাম নিরূপিত হইতেছে। আবার যখন চাহিদা বাড়িয়া যায় এবং চাহিদা রেখা হয় dd, তখন যোগান রেখা ও চাহিদা রেখার পারস্পরিক প্রভাবের ফলে দাম হইতেছে CP_1। ইহা হইল খুব অল্প সময়ের দাম। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কোন একটি তারিখে বাজারে মাছের সরবরাহ স্থির আছে, অথচ চাহিদা খুব বেশী। যদি দেখা যায় চাহিদা বাড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে যোগান বাড়িতেছে না, তখন দাম বেশী হইবে। আবার যোগান স্থির থাকা কালে যদি চাহিদা হঠাৎ কমিয়া যায়, তবে দামও কমিয়া যাইবে।

খুব স্বল্পকালীন দাম যোগান স্থির ও পরিবর্তনশীল

আবার, অল্প সময়ে (short run) যখন চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যোগান কিছু পরিমাণে পরিবর্তিত হয়, তখন দাম কিভাবে নিরূপিত হয়, তাহা নিম্নের ৫০নং চিত্রে দেখানো হইল—

এই চিত্রে যখন চাহিদা হইতেছে DD এবং যোগান রেখা হইতেছে SS, তখন দাম হইতেছে OR; কিন্তু চাহিদা যখন DD হইতে D_1D_1 রেখা পর্যন্ত বাড়িয়া গেল, তখন যোগানেরও পরিবর্তন হইল বটে (SS রেখা হইতে S_1S_1 রেখা), কিন্তু সেই অনুপাতে বৃদ্ধি হইল না। যোগানের পরিমাণ বাড়িল OE হইতে OE_1 পর্যন্ত। ইহার ফলে দাম হইতেছে OR_1; দেখা যাইতেছে এক্ষেত্রে দাম নিরূপণে যোগান অপেক্ষা চাহিদার আপেক্ষিক গুরুত্ব কিছু বেশী

স্বল্পকালীন দাম ; চাহিদা পরিবর্তনশীল, যোগান অল্পপরিমাণে পরিবর্তনশীল
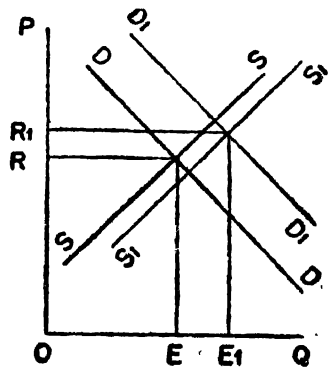
চিত্র নং ৫০

কিন্তু দীর্ঘকালে চাহিদার যেমন পরিবর্তন হয়, যোগানেরও সেইরূপ পরিবর্তন হয়। ইহার ফলে দাম নিরূপণে যোগানের গুরুত্ব আপেক্ষিকভাবে বাড়িয়া যায় এবং চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে দাম নিরূপিত হয়। ৫১নং চিত্রে তাহাই দেখানো হইয়াছে। এই চিত্রে যখন চাহিদা D_1D_1 রেখা হইতে D_2D_2 রেখা পর্যন্ত বাড়িয়া যায়, তখন যোগানও সেই অনুপাতে বাড়িয়া যায়, (S_1S_1 রেখা হইতে S_2S_2 রেখা পর্যন্ত অথবা OM হইতে ON পর্যন্ত)। ইহার ফলে দাম স্বাভাবিক থাকে; চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের ফলে দামের কোন পরিবর্তন হয় না।

দীর্ঘকালীন দাম, চাহিদা ও যোগান পরিবর্তনশীল

চিত্র নং ৫১

দীর্ঘকালে ফার্মের দিক হইতে চিন্তা করিলে বলা যায়, বাজারের দাম সর্বনিম্ন গড় মোট খরচের সমান হয়। যতক্ষণ দাম সর্বনিম্ন গড় মোট খরচের সমান না হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত অতিরিক্ত মুনাফার লোভে অনেক ফার্ম বাজারে প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিতে থাকিবে। এই প্রতিযোগিতার ফলস্বরূপ দাম সর্বনিম্ন গড় মোট খরচের সমান হইবে। এই অবস্থায় প্রত্যেক ফার্মই স্বাভাবিক মুনাফা (Normal Profit) অর্জন করে। দাম যখন খরচের সমান হয়, তখন কিছু মুনাফা খরচের মধ্যে ধরিয়া লওয়া হয়; তখন এই মুনাফার পরিমাণ হইতেছে এমন যে তাহা না পাইলে কোন ফার্মই উৎপাদন কাজে অগ্রসর হয় না। উৎপাদনের কাজে প্রত্যেক উদ্যোক্তাই অন্ততঃ এমন কিছু মুনাফা অর্জন করিবে যাহা না পাইলে সে কোন কিছু উৎপাদনই করিবে না। ইহাই স্বাভাবিক মুনাফা (Normal Profit)।

স্বাভাবিক মুনাফা

চাহিদা ও যোগানের বিভিন্ন ধরণের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া (Different types of mutual interactions of demand and supply): চাহিদা ও যোগানের সাহায্যে যে শুধু একটি স্থিতিশীল (static) এবং অপরিবর্তনীয় অবস্থায় ভারসাম্য এবং দাম নিরূপণ করা যায় তাহা নহে; গতিশীল অর্থনৈতিক কাঠামোয় এই উপাদান দুইটিকে আমরা প্রয়োগ করিতে পারি। পার্শ্বের এবং পরবর্তী চিত্রগুলিতে আমরা চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়াগুলি দেখাইতে পারি। প্রথমত, ৫২নং চিত্রে আমরা একটি "dynamic cobweb" অথবা "converging cobweb"-এর প্রয়োগ দেখাইতেছি।
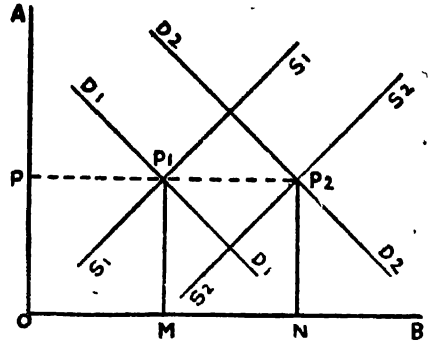
ধরা যাক্ এই চিত্রে বিক্রেতা বর্তমান দামে বিক্রয়যোগ্য জিনিসের পরিমাণ নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। যদি দাম বেশী থাকে তবে বিক্রেতা বেশী পরিমাণে কোন জিনিস বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিবে, তাহাতে যোগান বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু যোগান বাড়িয়া গেলে পরবর্তী সময়ে দাম কমিয়া যাইবে। দাম কমিয়া গেলে পুনরায় পরবর্তী সময়ে যোগান কমিয়া যাইবে। যোগান কমিয়া গেলে আবার দাম বাড়িবে, দাম বাড়িলে পরবর্তী সময়ে পুনরায় যোগান বাড়িবে, আবার পরবর্তী সময়ে দাম কমিবে; দাম কমিলে আবার পরবর্তী সময়ে যোগান কমিবে। ৫২ নং চিত্রে P_3, P_1, P_2, প্রভৃতি বিন্দুগুলি দামের পরিবর্তন বুঝাইতেছে এবং তাহা অনুযায়ী চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন হইতেছে। এইভাবে চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে চূড়ান্তভাবে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য অর্জিত হইবে। ইহা তখনই সম্ভবপর হইবে যখন চাহিদারেখার অনুপাতে যোগান রেখার slope খাড়া হইবে এবং যোগান একটু অস্থিতিস্থাপক হইবে। যদি চাহিদা রেখা এবং যোগান রেখার স্থিতিস্থাপকতা একই প্রকার থাকে এবং উভয় রেখারই এক প্রকার slope থাকে তবে ভারসাম্য অর্জন অনিশ্চিত হইবে। কারণ সেই ক্ষেত্রে অনবরত চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন (persistent oscillations) হইবে এবং ইহা কখনই স্থির পর্যায়ে আসিবে না। ৫৩ নং চিত্রে ইহা দেখানো হইয়াছে।
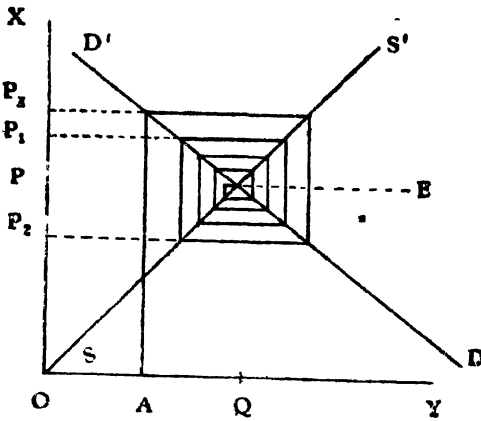
চিত্র নং ৫২

চিত্র নং ৫৩

কিন্তু যোগান যদি স্থিতিস্থাপক হয় এবং চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার অনুপাতে
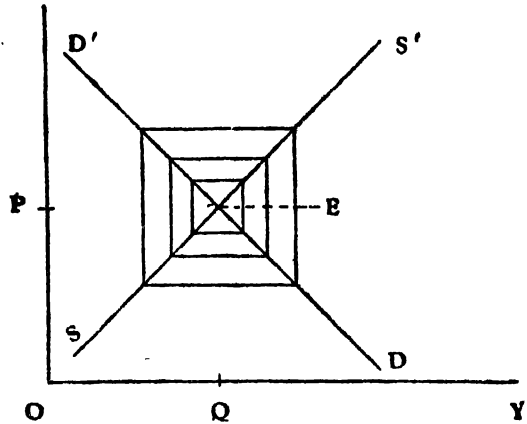
যোগানের স্থিতিস্থাপকতা যদি একটু বেশী হয় তবে চাহিদা ও যোগানের স্থায়ী ভারসাম্য অর্জন করা কঠিন হইয়া পড়ে। সেইক্ষেত্রে ইহাকে আমরা বলি "diverging cobweb"। পরবর্তী ৫৪নং চিত্রে তাহা দেখানো হইতেছে :—
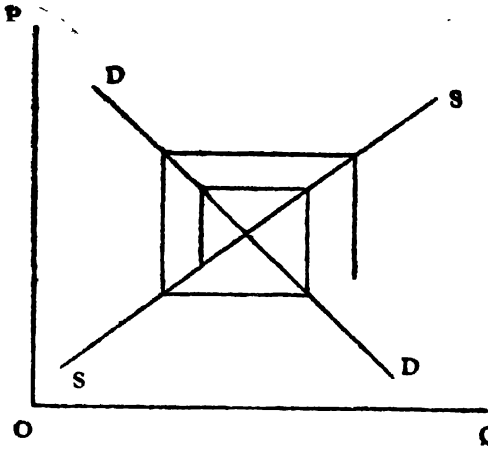
চিত্র নং ৫৪

এই চিত্রে চাহিদা ও যোগানের স্থায়ী ভারসাম্য অর্জন করা সম্ভব হইতেছে না। যে অনুপাতে দাম ও চাহিদার পরিবর্তন হইতেছে না, তাহা হইতে বেশী অনুপাতে যোগানের পরিবর্তন হইতেছে।

এই বিশ্লেষণ হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে চাহিদা ও যোগানের উপাদানকে শুধু স্থায়ী ও স্থিতিশীল ভারসাম্য অর্জনের জন্য প্রয়োগ করা হয় না। গতিশীল অর্থনৈতিক কাঠামোয় চাহিদা ও যোগানের প্রতিনিয়ত পরিবর্তন এবং পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া হয় এবং তাহাই দামের মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার দাম, এবং ক্রমহ্রাসমান ও ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়ম (Competitive Price, and the Laws of Diminishing and Increasing Returns): ক্রমহ্রাসমান এবং ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়মটি পূর্ণ প্রতিযোগিতার মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে কার্যকর হয় কিনা, বিশেষতঃ ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়মটি (Law of Increasing Returns) পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কার্যকরী হইতে পারে কিনা, সেই বিষয়ে অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে।

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতা

পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটি বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করে না। উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে ফার্মে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটি কার্যকর হয়, সেই ফার্মের প্রান্তিক এবং গড়পড়তা খরচ বেশী হয়। কিন্তু সেই ফার্মের ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন দাম সর্বনিম্ন গড় খরচ (Minimum Average Cost) ও প্রান্তিক আয়ের (Marginal Revenue) সমান হয়।

কিন্তু যখন ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়মটি কার্যকর হয়, তখন ফার্মটি আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয় সংকোচের সুবিধা পায় ; ইহাতে উৎপাদন খরচ ক্রমেই কমিয়া আসে। এই অবস্থায় সব ফার্মই অধিক উৎপাদন করিয়া উৎপাদন খরচ কমাইবার চেষ্টা করে। এই অবস্থায় সব ফার্মই উৎপাদনের খরচ কমিয়া যাইবার দরুণ অধিক

মুনাফা অর্জন করে। সুতরাং দীর্ঘকালীন ভারসাম্য (Long-run Equilibrium) অর্জন করা কোন ফার্মের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে।

ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়ম এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতা

একটি শিল্পের অনেকগুলি ফার্ম থাকে। ফার্মগুলির আয়তন সমান নয়, সুতরাং বিভিন্ন ফার্মের প্রান্তিক উৎপাদন খরচ বিভিন্ন পরিমাণ। যে সকল ফার্ম একেবারে নূতন, সেইগুলির প্রান্তিক উৎপাদন খরচ হয়তো খুব বেশী হইতে পারে এবং এমন কি দাম অপেক্ষাও বেশী হইতে পারে। এই ফার্ম লোকসান হওয়া সত্ত্বেও ব্যবসায় চালাইয়া যাইবে; কারণ, সে জানে সাময়িক লোকসান হইলেও ভবিষ্যতে হয়ত ব্যবসায় হইতে লাভ হইতে পারে। নূতন ফার্মের যে অবস্থা, অতি পুরাতন ফার্মেরও সেই অবস্থা। পুরাতন ফার্মগুলির পরিচালকের যোগ্যতা কমিয়া যাইতে পারে অথবা নূতন অবস্থার সহিত সেইগুলি হয়ত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারে না। এই অবস্থায় এই ফার্ম-গুলিকেও কম লাভে দ্রব্য-সামগ্রী বিক্রয় করিতে হয়। আবার এমন কতিপয় ফার্ম বাজারে থাকিতে পারে যেগুলি খুবই দক্ষ ব্যবসায়ী। তাহাদের উৎপাদন খরচ সর্বাপেক্ষা কম হয় এবং তাহারা প্রচুর লাভ করে। কিন্তু, যদি দাম দক্ষ ফার্মগুলির প্রান্তিক উৎপাদন খরচের সমান হয়, তবে, তাহাদের অপেক্ষা কম দক্ষ ফার্মগুলির উৎপাদন খরচ দাম অপেক্ষা বেশী হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যদি একই শিল্পে বিভিন্ন আয়তনের বিভিন্ন যোগ্যতাসম্পন্ন অনেক ফার্ম থাকে, তবে তাহাদের উৎপাদন খরচও বিভিন্ন হয় এবং তাহা জিনিসটির দাম অপেক্ষা বেশী হয়।

উৎপাদন ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়মটি কার্যকর হইবে কিনা সেই বিষয়ে অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে।

অধ্যাপক মার্শালের মতে শিল্পের মধ্যেই এমন একটি ফার্ম থাকে যাহাকে ঐ শিল্পের প্রতিনিধিস্থানীয় ফার্ম অথবা Representative Firm বলা যাইতে পারে। ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়ম কার্যকর থাকা কালেই এই প্রতিনিধিস্থানীয় ফার্মের প্রান্তিক উৎপাদান ব্যয় দামের সমান হইবে। মার্শালের মতে প্রতিনিধিস্থানীয় ফার্ম হইতেছে এমন একটি ফার্ম যাহা ব্যবসায়ে একেবারে নূতনও নয় এবং পুরাতন বৃহদায়তন ফার্মও নয়, যে ফার্ম মোটামুটি অনেকদিন যাবৎ স্বাভাবিক দক্ষতার সহিত ব্যবসায় পরিচালনা করিয়াছে ও উৎপাদনের সমুদয় আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সুযোগ-সুবিধা অর্জন করিয়া ব্যবসায়ের স্বাভাবিক সাফল্য অর্জন করিয়াছে এবং যে ফার্মের আয়তন বড়ও নয়, আবার একেবারে ছোটও নয়।[১]

১। **"A Representative Firm is one which has had a fairly long life and fair success, which is managed with normal ability and which has normal access to the economies, external and internal, which belong to that aggregate volume of production."—*Marshall.***

মার্শাল প্রতিনিধিস্থানীয় ফার্ম সম্বন্ধে যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, বিভিন্ন অর্থবিজ্ঞানীগণ ইহার সমালোচনা করিয়াছেন। অধ্যাপক রবিন্সের মতে এই তত্ত্বটি সম্পূর্ণভাবে অসার এবং অবাস্তব।[২] বর্তমানকালে পূর্ণ প্রতিযোগিতা আমরা দেখিতে পাই না; তাহা ছাড়া, বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থাও আধুনিককালে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইহার ফলে প্রতিনিধিস্থানীয় ফার্মের তত্ত্বটি প্রকৃতপক্ষে অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়ম অধিককাল ধরিয়া কার্যকর হয় না। দীর্ঘকালে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন অথবা ক্রমবর্ধমান খরচের নিয়ম কার্যকর হয়। উৎপাদন যখন এমন একটি পর্যায়ে আসে যে কোন একটি উপাদান বাড়ানো আর সম্ভব নয় তখনই উৎপাদন বৃদ্ধির খরচ বাড়িয়া যায়। এই অবস্থায় প্রতিনিধিস্থানীয় ফার্মের তত্ত্বটি প্রয়োজনীয় নয়। আবার যদি ক্রমবর্ধমান উৎপাদন নিয়মটি দীর্ঘকালে কার্যকর হয়, তবে উৎপাদন খরচ ক্রমেই কমিতে থাকে। যে ফার্মের উৎপাদন খরচ সর্বাপেক্ষা কম, সেই ফার্ম বাজারে একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিবে। সুতরাং দীর্ঘকালে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন নিয়মটি পূর্ণ প্রতিযোগিতার সহিত খাপ খায় না।

একচেটিয়া বাজারে দাম নিরূপণ (Determination of Price under Monopoly): একচেটিয়া বাজার বলিতে সাধারণতঃ বুঝায়, একজন অথবা অল্প কয়েকজন বিক্রেতা বাজারে কোন জিনিসের যোগান সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করে।

একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্য

যখন বাজারে মাত্র একজন বিক্রেতা থাকে তখন বাজারটিকে সম্পূর্ণভাবে একচেটিয়া বাজার (Pure Monopoly) বলা হয়। কিন্তু এই ধরণের বাজার কদাচিৎ দেখা যায়। একচেটিয়া কারবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে একচেটিয়া বিক্রেতা ইচ্ছামত যোগান বাড়াইতে অথবা কমাইতে পারে। যখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একত্রিত হইয়া কোনও একচেটিয়া সংঘ (Monopoly Combination) গঠন করে তখনও কোন জিনিসের যোগানের উপর সংশ্লিষ্ট সংঘের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে। দ্বিতীয়ত, একচেটিয়া কারবারে কোন জিনিসের জন্য ক্রেতার চাহিদা সম্পূর্ণভাবে অস্থিতিস্থাপক থাকে না। তৃতীয়ত, একচেটিয়া বিক্রেতা সর্বদাই সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের চেষ্টা করিতে থাকে। শুধু সর্বোচ্চ মুনাফাই নহে, একচেটিয়া কারবারে বিক্রেতা কিছু অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করিবার চেষ্টাও করিয়া থাকে। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় সব বিক্রেতা সর্বোচ্চ মুনাফা পাইয়া থাকে; অর্থাৎ

একচেটিয়া কারবার এবং পূর্ণপ্রতিযোগিতার মধ্যে পার্থক্য

প্রান্তিক আয় প্রান্তিক খরচের সমান হয়। একচেটিয়া কারবারেও সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জিত হয় যখন প্রান্তিক আয় প্রান্তিক খরচের সমান হয়। আবার পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে চাহিদা সম্পূর্ণ

২। **"The concept of a Representative Firm is wholly an unsubstantial notion."—*Robbins.***

স্থিতিস্থাপক হয়, কিন্তু একচেটিয়া কারবারে চাহিদা মোটামুটিভাবে অস্থিতিস্থাপক থাকে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার দাম প্রান্তিক খরচের সমান হয়; কিন্তু একচেটিয়া কারবারের দাম প্রান্তিক খরচ অপেক্ষা বেশী হয়।

একচেটিয়া কারবারের মূল্য নিরূপণও চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে; তবে যোগান সম্পূর্ণভাবে একচেটিয়া বিক্রেতার নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে, কিন্তু, সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক নহে। একচেটিয়া বিক্রেতা যে দাম ধার্য করে তাহাই বাজারের দাম হয়, কিন্তু একচেটিয়া বিক্রেতা দাম ধার্য করিবার সময় ক্রেতাদের চাহিদাকে উপেক্ষা করিতে পারে না এবং নিয়ন্ত্রণও করিতে পারে না। একচেটিয়া বিক্রেতা নিজের ইচ্ছামত দাম বাড়াইতে পারে না। কারণ অতিরিক্তভাবে দাম বাড়াইয়া দিলে ক্রেতারা ঐ জিনিসটি নাও কিনিতে পারে এবং বিকল্প জিনিসের সন্ধান করিতে পারে। ইহাতে বাজারে একচেটিয়া বিক্রেতার আধিপত্য নষ্ট হইয়া যাইবে এবং লাভের পরিমাণও কমিয়া যাইবে। একচেটিয়া বাজারে যে দাম নিরূপিত হয় তাহা প্রান্তিক খরচ অপেক্ষা বেশী। একচেটিয়া বিক্রেতার দাম বাড়াইয়া দিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া সে যত খুশী দাম বাড়াইবে না; সে মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিবে কোন্ দামে কত বিক্রয় করিলে মোট লাভ কত হইবে। যে দামে লাভ সর্বাপেক্ষা বেশী হইবে, সেই দামেই একচেটিয়া বিক্রেতা তাহার জিনিস বেচিবে। নিম্নের উদাহরণের সাহায্যে ইহা পরিষ্কার হইবে:—

চাহিদার প্রভাব

একচেটিয়া কারবারে দাম নিরূপণ

প্রতি ইউনিটের দাম		বিক্রয়ের পরিমাণ	মোট প্রাপ্ত অর্থ
৫৲	×	১০ ইউনিট	৫০ টাকা
৬৲	×	৯ ”	৫৪ টাকা
৭৲	×	৮ ”	৫৬ টাকা
৮৲	×	৬ ”	৪৮ টাকা

এই উদাহরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে আট টাকা দাম হইলেই বিক্রেতার প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ সর্বাধিক হইবে না। যদি সাত টাকা দাম হয়, তবে এক্ষেত্রে বিক্রেতা সর্বাধিক পরিমাণ অর্থ পাইতেছে। এখানে দাম যাহাই হোক না কেন, বিক্রেতার উৎপাদন খরচ একই আছে। বিক্রয়লব্ধ মোট অর্থ হইতে মোট খরচের পরিমাণ বাদ দিলে যাহা থাকিবে, তাহাই বিক্রেতার লাভ। এক্ষেত্রে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে মোট খরচের পরিমাণ বাদ দিলে বিক্রেতার লাভের পরিমাণ তখনই সর্বাধিক হইবে যখন দাম সাত টাকা। নিম্নের ৫৫নং চিত্রে একচেটিয়া বিক্রেতা কিভাবে দাম নিরূপণ করে তাহা দেখানো হইল।

এই চিত্রে E বিন্দুতে একচেটিয়া বিক্রেতার ভারসাম্য (Equilibrium) অর্জিত হইয়াছে। এই বিন্দুতে বিক্রেতার প্রান্তিক আয় (Marginal Revenue) এবং প্রান্তিক খরচ (Marginal Cost) সমান এবং তাহার লাভের পরিমাণও সর্বাধিক। বিক্রেতা

OB পরিমাণ জিনিস বাজারে বিক্রয় করিবে। কিন্তু একচেটিয়া বিক্রেতা যে দাম নিরূপণ করিবে, তাহা Q বিন্দুর উপর থাকিবে, অর্থাৎ আরও বেশী হইবে।
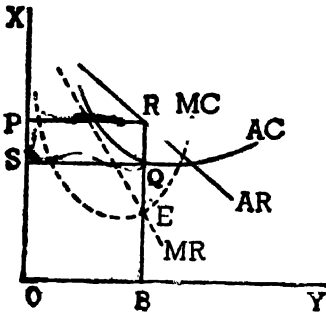
চিত্র নং ৫৫

বিক্রেতা দাম কি পরিমাণ বাড়াইবে তাহা ক্রেতাদের চাহিদা বিবেচনা করিয়া এবং সর্বাধিক পরিমাণ লাভ কোন্ দামে অর্জিত হইবে তাহা বিবেচনা করিয়া নিরূপিত হইবে। এক্ষেত্রে দাম হইবে BR ; কারণ, দাম যদি ইহা অপেক্ষা বেশী হয়, তবে ক্রেতাগণ আর জিনিসটি কিনিবে না। আবার, দাম যদি ইহা অপেক্ষা কম হয়, তবে বিক্রেতা আরও অধিক পরিমাণ লাভ হইতে বঞ্চিত হইবে। AR রেখাটি ক্রেতাদের চাহিদা বুঝাইতেছে। R বিন্দুতে বিক্রেতা যে দাম নিরূপণ করিতেছে, তাহা ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী সর্বাধিক হইয়াছে। এখন দাম হইতে গড় খরচ বাদ দিলে যাহা থাকিবে তাহাই বিক্রেতার অতিরিক্ত লাভ। এই চিত্রে BQ হইতেছে গড় খরচ। BR দাম হইতে BQ খরচ বাদ দিলে যাহা থাকে, (অর্থাৎ PRQS আয়তন) তাহাই হইবে বিক্রেতার অতিরিক্ত লাভ।

একচেটিয়া বিক্রেতা যদিও কোন জিনিসের যোগান সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, তবুও সে ক্রেতাদের চাহিদাকে উপেক্ষা করিতে পারে না। ক্রেতাদের চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে সেই জিনিসটির দামেরও পরিবর্তন করে। যদি কখনও দেখা যায় চাহিদা স্থিতিস্থাপক (elastic), অর্থাৎ, কোন জিনিসের দাম সামান্য কমিয়া গেলে ইহার চাহিদা প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া যায়, তখন একচেটিয়া বিক্রেতা জিনিসটির দাম কম রাখে। আবার যদি কখনও দেখা যায় যে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক (inelastic), তবে একচেটিয়া বিক্রেতা দাম বেশী রাখে। কিন্তু দাম কত বেশী হইবে তাহা নির্ভর করে চাহিদা কত বেশী অস্থিতিস্থাপক তাহার উপর। যদি দাম খুব বেশী হইয়া গেলে চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইবার সম্ভাবনা থাকে তবে একচেটিয়া বিক্রেতা দাম বেশী বাড়াইবে না।

একচেটিয়া বাজারে দামের তারতম্য (Price Discrimination in a Monopolistic Market): একচেটিয়া বাজারে আমরা অনেক সময় দামের তারতম্য দেখিতে পাই। অর্থাৎ একচেটিয়া বিক্রেতা বাজারে জিনিসটির সমগ্র যোগান নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়া সব ক্রেতার নিকট এক দামে জিনিস বিক্রয় করে না। সে বিভিন্ন ক্রেতার নিকট হইতে বিভিন্ন দাম গ্রহণ করে। দামের এই তারতম্য অনেক সময় সংশ্লিষ্ট জিনিসের প্রকৃতির (nature of the commodity) জন্য হয়। এমন কতিপয় জিনিস আছে যেগুলির

দামের তারতম্যের অর্থ

প্রতি ক্রেতার আকর্ষণ আছে এবং এই জিনিসগুলির দাম এই ধরণের অন্যান্য জিনিসের দাম অপেক্ষা বেশী হইলেও ক্রেতা কিনে। আবার দামের তারতম্য অনেক সময় ক্রেতার কতিপয় বৈশিষ্ট্যের জন্যও (consumer's peculiarities) হয়। অনেক ক্রেতা আছে যাহারা কোন জিনিস কিনিবার সময় দাম একটু বেশী দিতে হইলেও কিছু মনে করে না, বিক্রেতা যদি অন্যান্য ক্রেতার নিকট হইতে যে দাম গ্রহণ করে তাহা অপেক্ষা তাহাদের নিকট হইতে কিছু বেশী দাম গ্রহণ করে, তবুও তাহারা কিছু মনে করে না। ইহা ছাড়া, দামের তারতম্য অনেক সময় বাজারের দূরত্ব (distance) অথবা এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাইবার অসুবিধার (frontier barriers) জন্যও হয়।

দামেব তারতম্য কখন হওয়া সম্ভব

দামের তারতম্য সাধারণতঃ একচেটিয়া বাজারেই (Monopoly) দেখা যায়। কিন্তু, একচেটিয়া বাজার হইলেই যে দামের তারতম্য হইবে তাহা নহে। যদি একচেটিয়া বাজারে বিভিন্ন ক্রেতার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন ধরণের হয়, এবং একজন ক্রেতা সস্তায় একটি জিনিস কিনিয়া যদি একটু বেশী দামে অপর একজনের কাছে বিক্রয় না করিয়া ফেলে অর্থাৎ যদি জিনিসটির পুনর্বিক্রয় (resale) না হয়, তবেই একচেটিয়া বাজারের দামের তারতম্য (Price Discrimination) হওয়া সম্ভবপর। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় (Perfect Competition) দামের তারতম্য হয় না। কারণ, পূর্ণ প্রতিযোগিতায় সব ক্রেতা জিনিসটির উৎপাদন খরচ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত। সেইক্ষেত্রে সকলেরই চাহিদা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক ও তাহা সব ক্ষেত্রেই এক প্রকার, এবং বাজারে শুধু একটিই দাম থাকে বলিয়া একজন বিক্রেতার পক্ষে বিভিন্ন ক্রেতার নিকট হইতে বিভিন্ন দাম গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে যদি অল্প দামের বাজার হইতে বেশী দামের বাজারে সংশ্লিষ্ট জিনিসটির পুনর্বিক্রীত হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তবেই বিক্রেতার পক্ষে বিভিন্ন ক্রেতার নিকট হইতে বিভিন্ন দাম লওয়া সম্ভবপর। নিম্নের ৫৬নং চিত্রে একচেটিয়া বাজারে কিভাবে দামের তারতম্য হয়, তাহা দেখান হইল :—
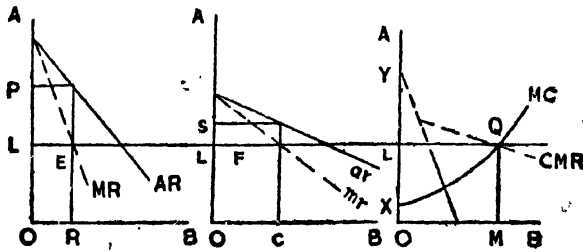
চিত্র নং ৫৬

ধরা যাক, বাজারে বর্তমানে দুইজন ক্রেতা এবং তাঁহাদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একপ্রকার নয়। প্রথম দুইটি চিত্রে AR হইতেছে প্রথম ক্রেতার চাহিদা রেখা এবং

ar হইতেছে দ্বিতীয় ক্রেতার চাহিদা রেখা। তৃতীয় চিত্রটিতে CMR হইতেছে দুইজন ক্রেতার সম্মিলিত প্রান্তিক আয় রেখা এবং MC হইতেছে বিক্রেতার প্রান্তিক খরচ রেখা। Q বিন্দুতে একচেটিয়া বিক্রেতার প্রান্তিক খরচ এবং তাহার মোট প্রান্তিক আয় সমান হইতেছে। এইখানেই বিক্রেতার ভারসাম্য এবং সর্বাধিক লাভ অর্জন হইতেছে। বিক্রেতা এখন মোট OM পরিমাণ জিনিস দুইজন ক্রেতার মধ্যে দুই দামে বিক্রয় করিবে। এই হিসাবে প্রথম ক্রেতার ক্ষেত্রে বিক্রেতার ভারসাম্য অর্জিত হইয়াছে E বিন্দুতে এবং দ্বিতীয় ক্রেতার ক্ষেত্রে বিক্রেতার ভারসাম্য অর্জিত হইয়াছে F বিন্দুতে। কারণ, যথাক্রমে এই বিন্দু দুইটিতে দুইজন ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী বিক্রেতার প্রান্তিক আয় এবং প্রান্তিক খরচ সমান হইয়াছে। সুতরাং, বিক্রেতা প্রথম ক্রেতার চাহিদার উপর নির্ভর করিয়া OP দামে OR পরিমাণ জিনিস তাহার কাছে বিক্রয় করিবে এবং দ্বিতীয় ক্রেতার চাহিদার উপর নির্ভর করিয়া OS দামে তাহার (দ্বিতীয় ক্রেতা) নিকট OC পরিমাণ জিনিস বিক্রয় করিবে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় OR এবং OC, বিক্রেতার মোট বিক্রীত সামগ্রী OM-এর সমান।

দামের তারতম্য করা কখন লাভজনক হয়

একচেটিয়া বিক্রেতার পক্ষে বিভিন্ন ক্রেতার মধ্যে দামের তারতম্য করা তখনই লাভজনক হয় যখন বাজারে ক্রেতাদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন হয়। যদি ক্রেতাদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একই ধরণের হয়, তবে বিক্রেতার পক্ষে দামের তারতম্য করা লাভজনক হয় না। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ক্রেতা যেন আলাদাভাবে বিক্রেতার জন্য আলাদা আলাদা বাজারের সৃষ্টি করে যাহাতে একজন ক্রেতার নিকট হইতে যে দাম গ্রহণ করা হইবে তাহা অন্য একজন ক্রেতা না জানিতে পারে। যদি বিভিন্ন ক্রেতার নিকট বিভিন্ন দাম গ্রহণ করার ব্যাপারে জানাজানি হইয়া যায়, তখনই দামের তারতম্যের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় এবং জিনিসগুলি সস্তা দাম হইতে বেশী দামে পুনর্বিক্রয়ের সম্ভাবনা দেখা যায়।

বিভিন্ন ধরণের দামের তারতম্য: একচেটিয়া বিক্রেতা দামের ধরণের তারতম্য করিতে পারে। প্রথমত, বিভিন্ন ক্রেতার কোন জিনিসের জন্য চাহিদার তীব্রতা বিভিন্ন হইতে পারে। যে ক্রেতার চাহিদা খুব বেশী এবং একটি জিনিস কিনিবার জন্য খরচ করিবার ক্ষমতা খুব বেশী, তাহার নিকট একটি জিনিস বিক্রয় করিবার সময় বেশী দাম গ্রহণ করা যাইতে পারে। আবার যে ক্রেতার চাহিদা বেশী নয়, এবং একটি জিনিস কিনিবার জন্য খরচ করিবার ক্ষমতাও খুব বেশী নয়, তাহার নিকট বিক্রেতা বেশী দাম চাহিতে পারে না। রেলগাড়ীর বিভিন্ন শ্রেণীর কামরার ভাড়াও বিভিন্ন। অধ্যাপক পিগু ইহাকে ব্যক্তিগত দাম-তারতম্য (Personal Price Discrimination) বলিয়া মনে করেন।

ব্যক্তিগত দামতারতম্য

দ্বিতীয়ত, একচেটিয়া বিক্রেতা একই জিনিস বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দামে বিক্রয়

করিতে পারে। যে অঞ্চলে ধনী ক্রেতার সংখ্যা অধিক সেই অঞ্চলে বিক্রেতা একটি জিনিস বেশী দামে বিক্রয় করিতে পারে; আবার সেই জিনিস অন্য অঞ্চলে যেখানে অধিকাংশই ক্রেতাই গরীব সেই অঞ্চলে অল্প দামে বিক্রয় করিতে পারে। ইহাকে আমরা আঞ্চলিক বা স্থানগত দাম-তারতম্য (Regional or Local Price Discrimination) বলি। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমরা ডাম্পিং (Dumping) দেখিতে পাই। ডাম্পিং কথাটির অর্থ হইতেছে, বিদেশের বাজারে কম দামে কোন জিনিস বিক্রয় করিয়া সেই জিনিস বেশী দামে নিজস্ব দেশে বিক্রয় করা।

স্থানগত দাম-তারতম্য

তৃতীয়ত, একই জিনিসের বিভিন্ন ধরণের ব্যবহারের মধ্যেও একচেটিয়া বিক্রেতা দামের তারতম্য করিতে পারে। কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী কলিকাতা শহরে বিদ্যুতের একমাত্র বিক্রেতা হিসাবে নাগরিকদের নিকট যে দামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে, কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানীকে ইহা অপেক্ষা অনেক অল্প দামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। ইহাকে আমরা ব্যবসায়গত দাম-তামতম্য (Trade Price Discrimination) বলিতে পারি।

ব্যবসায়গত দাম তারতম্য

অধ্যাপক পিগুর (Prof. Pigou) মতে দামের তারতম্যের তিনটি পর্যায় আছে।

প্রথমত, একচেটিয়া বিক্রেতা বিভিন্ন ক্রেতার নিকট হইতে এমনভাবে একটি জিনিসের জন্য দাম গ্রহণ করিতে পারে যে কোন ক্রেতারই ভোগোদ্বৃত্ত থাকিবে না। এই ধরণের দাম তারতম্যকে অধ্যাপক পিগু প্রথম পর্যায়ের দাম-তারতম্য (Price Discrimination of the First Degree) বলিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, একচেটিয়া বিক্রেতা বিভিন্ন ক্রেতার নিকট হইতে এমনভাবে একটি জিনিসের জন্য দাম গ্রহণ করিতে পারে যে সব ক্রেতারই অল্প পরিমাণে ভোগোদ্বৃত্ত থাকিবে। এই ধরণের দাম তারতম্যকে অধ্যাপক পিগু দ্বিতীয় পর্যায়ের দাম-তারতম্য (Price Discrimination of the Second Degree) বলিয়াছেন।

দাম তারতম্যের তিনটি পর্যায়

তৃতীয়ত, একচেটিয়া বিক্রেতা যদি কোন জিনিসের বিভিন্ন দাম স্থির করিয়া রাখে এবং ক্রেতাগণ নিজেদের চাহিদা অথবা ইচ্ছানুযায়ী দাম দিয়া জিনিসটি ক্রয় করে তবে আমরা তৃতীয় পর্যায়ের দাম-তারতম্য (Price Discrimination of the Third Degree) দেখিতে পাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, রেল কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন শ্রেণীর ভাড়া আগে হইতেই স্থির করিয়া রাখে, ক্রেতা কোন্ শ্রেণীর টিকিট কিনিবে, তাহা ক্রেতার ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে।

একচেটিয়া ক্ষমতার মাত্রার পরিমাপ (Measure of the Degree of Monopoly Power):

একচেটিয়া ক্ষমতার মাত্রা পরিমাণ করিবার কয়েকটি পন্থা আছে। নিম্নে তিনটি বিকল্প পন্থা আলোচিত হইল। প্রথমত, একচেটিয়া কারবারীর নীট একচেটিয়া

বিক্রয়লব্ধ আয়ের (Net Monopoly Revnue) দ্বারা একচেটিয়া ক্ষমতা পরিমাপ করা যায়। এই আয়ের বা মুনাফার পরিমাণ যত বেশী হইবে, একচেটিয়া ক্ষমতাও তত বেশী হইবে। দ্বিতীয়ত, লার্ণারের (Lerner) সূত্র অনুযায়ী একদিকে দাম এবং প্রান্তিক খরচের মধ্যে পার্থক্য, অর্থাৎ, প্রান্তিক খরচ অপেক্ষা দামের উদ্বৃত্ত এবং অপরদিকে দাম, এই দুইটির অনুপাত বাহির করিয়া একচেটিয়া ক্ষমতার মাত্রা পরিমাপ করা যায়। লার্ণারের সূত্র (Lerner's Formula) হইল

$$\frac{\text{দাম—প্রান্তিক খরচ}}{\text{দাম}} \quad \left(\text{অর্থাৎ} \quad \frac{\text{Price—Marginal Cost}}{\text{Price}} \right)$$

অথবা বিকল্পভাবে, $\frac{\text{গড় আয়—প্রান্তিক আয়}}{\text{গড় আয়}}$

অর্থাৎ, $\left(\frac{\text{Average Revenue—Marginal Revenue}}{\text{Average Revenue}} \right)$।

দাম এবং গড় আয় পরস্পরের সমান, এবং ভারসাম্যের বিন্দুতে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচ পরস্পরের সমান। সুতরাং লার্ণারের সূত্রটি উপরোক্ত দুইটির যে কোন একটি পন্থায় ব্যাখ্যা করা যায়। তৃতীয়ত, চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা (Cross Elasticity of Demand) দ্বারা একচেটিয়া ক্ষমতার মাত্রা পরিমাপ করা যাইতে পারে। একচেটিয়া সামগ্রীর বিকল্প সামগ্রী যত অনিখুঁত হইবে, একচেটিয়া কারবারও তত নিখুঁত হইবে, অর্থাৎ, একচেটিয়া সামগ্রীর পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা যত কম হইবে, একচেটিয়া ক্ষমতার মাত্রা তত বেশী হইবে।

একচেটিয়া কারবারের সীমা (Limits to Monopoly): একচেটিয়া কারবার সাধারণতঃ বরাবর চলিতে পারে না। কারণ, একচেটিয়া বিক্রেতা যদি বরাবর ক্রেতাদের বেশী করিয়া শোষণ করিতে থাকে এবং বেশী করিয়া দাম চাহিতে থাকে, তবে বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বী বিক্রেতার আবির্ভাব হওয়ার আশংকা থাকে। যতক্ষণ কোন জিনিসের জন্য ক্রেতার চাহিদা অস্থিতিস্থাপক (Inelastic) থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত একচেটিয়া বিক্রেতার পক্ষে বেশী করিয়া দাম ধার্য করা সম্ভবপর। কিন্তু বেশী দাম দিয়া যদি বরাবরই একই জিনিস কিনিতে হয়, তবে ক্রেতারাও চেষ্টা করিবে বিকল্প জিনিস সংগ্রহের জন্য। এই জন্যই দাম নিরূপণের সময় একচেটিয়া বিক্রেতা সর্বদাই ক্রেতাদের চাহিদার দিকটিও বিবেচনা করিবে।

প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা

দ্বিতীয়ত, দাম অতিরিক্ত বেশী হইয়া গেলে সরকার এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন এবং সংশ্লিষ্ট জিনিসের দাম নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন। জনস্বার্থের খাতিরে রাষ্ট্রকে তখন একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ করিয়া দাম কমাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে হয়।

তৃতীয়ত, দাম অসম্ভবরূপে বাড়াইয়া দিলে একচেটিয়া বিক্রেতা বিদেশী

প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারে। সর্বশেষে, জনমতের ভয়েও একচেটিয়া বিক্রেতা যতখুশী দাম বাড়াইতে পারে না।

যদিও একচেটিয়া বিক্রেতা কোন জিনিসের দাম যত খুশী বাড়াইতে পারে না, তবুও একচেটিয়া বাজারে কোন জিনিসের দাম পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের দাম অপেক্ষা বেশী থাকে। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কোন জিনিসের দাম সব সময়েই প্রান্তিক খরচের সমান হয়। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে দাম প্রান্তিক খরচ অপেক্ষা বেশী হয়। তাহা ছাড়া, পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালে দাম যে শুধু প্রান্তিক খরচের সমান হয়, তাহাই নহে, দাম গড় মোট খরচেরও সমান হয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় যেমন বিক্রেতার একমাত্র লক্ষ্য সর্বাধিক লাভ করা, একচেটিয়া কারবারেও বিক্রেতার একমাত্র লক্ষ্য সর্বাধিক লাভ করা। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে বিক্রেতা কতিপয় বিশেষ সুবিধা ভোগ করে বলিয়া (যেমন, যোগানের উপর নিয়ন্ত্রণ, ক্রেতার অস্থিতিস্থাপক চাহিদা, ইত্যাদি) সে সর্বাধিক লাভ অর্জন করিয়াও অর্থাৎ, প্রান্তিক খরচকে প্রান্তিক আয়ের সমান করিয়াও দামটি প্রান্তিক খরচের বেশী রাখিতে পারে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দাম এবং একচেটিয়া বাজারের দাম

একচেটিয়া কারবারের গুণ ও দোষ (Merits and defects of Monopoly): একচেটিয়া কারবারের গুণ ও দোষ উভয়ই আছে। প্রথমত, একচেটিয়া কারবারের একটি প্রধান গুণ হইতেছে এই যে ইহার উৎপাদনব্যয় সংক্ষেপ হয়। কারণ, একচেটিয়া কারবার সাধারণতঃ একটি বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান, সুতরাং এখানে বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার সব রকম সুবিধা পাওয়া যায়। একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে বেশী দামে জিনিস বিক্রয় করা সম্ভবপর হয়। বেশী দামে জিনিস বিক্রয় করিয়া একচেটিয়া কারবারী যে লাভ করে তাহার সাহায্যে একচেটিয়া কারবারী উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি করিয়া বাজারে নিজের একাধিপত্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ইহার উত্তরে বলা যায় যে প্রতিযোগিতার বাজারে উৎপাদন খরচ যথেষ্ট কমিয়া যায়। বরং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, একচেটিয়া কারবার হইতেও প্রতিযোগিতার বাজারে উৎপাদন খরচ বেশী কম হয়। দ্বিতীয়ত, একচেটিয়া কারবারে যোগানের উপর একচেটিয়া বিক্রেতার কর্তৃত্ব থাকে বলিয়া এবং চাহিদা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক থাকে বলিয়া একচেটিয়া বিক্রেতাকে বেশী ঝুঁকির বোঝা বহন করিতে হয় না। পক্ষান্তরে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ঝুঁকির সম্ভাবনা বেশী থাকে। তৃতীয়ত, একচেটিয়া কারবারে অতিরিক্ত উৎপাদন (excess production or over-production) হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে; মূল্যস্তরের পরিবর্তনের সম্ভাবনাও খুব বেশী হয় না। চতুর্থত, একচেটিয়া বিক্রেতার পক্ষে অনেক সময় বিভিন্ন ক্রেতার জন্য বিভিন্ন দাম ধার্য করা সম্ভবপর হয় এবং ইহাতে লাভের সম্ভাবনা বেশী থাকে। কিন্তু প্রতিযোগিতার বাজারে এইভাবে অতিরিক্ত লাভের সম্ভাবনা দেখা যায় না।

একচেটিয়া কারবারের গুণ

পঞ্চমত, জনস্বার্থের পক্ষে প্রয়োজনীয় শিল্পে অথবা সেবায় (public utility services) একচেটিয়া কারবার বিশেষ বাঞ্ছনীয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একই সহরে পাঁচটি বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থাকিলে অসুবিধার সৃষ্টি হয় এবং অপব্যয়ও হয়।

একচেটিয়া কারবারের কোন সামাজিক সুবিধা আছে কিনা সেই বিষয়ে অর্থ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে একচেটিয়া কারবারে বিক্রেতা ক্রেতাদের শোষণ করে বলিয়া এবং একচেটিয়া বাজারে ক্রেতাদের কোন প্রকার কর্তৃত্ব থাকে না বলিয়া একচেটিয়া কারবার যে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর, তাহা নহে। যদি একচেটিয়া বিক্রেতা বড় লোকের নিকট হইতে বেশী দাম এবং গরীব লোকের নিকট হইতে কম দাম গ্রহণ করে, তবে একচেটিয়া কারবার সামাজের অকল্যাণ সাধন করে না। তাহা ছাড়া, একচেটিয়া কারবারে ব্যবসায়ীগণ প্রচুর লাভ অর্জন করে বলিয়া মূলধন বিনিয়োগের সম্ভাবনাও অনেক বাড়িয়া যায় বলিয়া অনেকে মনে করেন। ইহাতে সমাজের পক্ষে মঙ্গল হয়। কিন্তু, একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে একচেটিয়া কারবারের যতই গুণ থাকুক না কেন, ইহার গুণ অপেক্ষা ত্রুটির পরিমাণ অনেক বেশী।

একচেটিয়া কারবার সামাজিক সুবিধা

একচেটিয়া কারবারের প্রধান দোষ হইতেছে, একচেটিয়া ব্যবসায়ের ফলে আমরা শ্রমিক শোষণ এবং শুধু একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের হাতে সমাজের অর্থনৈতিক শক্তিকে কেন্দ্রীভূত হইতে দেখিতে পাই। ইহাতে সমাজের ধনবণ্টন ব্যবস্থায় অসাম্যের সৃষ্টি হয়।

একচেটিয়া কারবারে বিক্রেতাকে শুধু একটি উদ্দেশ্য লইয়াই প্রধানতঃ চলিতে হয়। তাহা হইতেছে সর্বাধিক লাভ করা। যেখানে উৎপাদনের উদ্দেশ্য হইতেছে যেভাবেই হউক লাভ করা এবং যেখানে যোগানের উপর বিক্রেতার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে, সেখানে উৎপাদনের উৎকর্ষ অনেক পরিমাণে নষ্ট হয়। দ্বিতীয়ত, একচেটিয়া কারবারে জিনিসপত্রের দাম অযথা বাড়িয়া যায়, ইহাতে সাধারণ ক্রেতাদের পক্ষে খুব অসুবিধা হয়। তাহা ছাড়া, ক্রেতাদের অস্থিতিস্থাপক চাহিদার সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিক্রেতা ক্রেতাদের শোষণ করে। তৃতীয়ত, একচেটিয়া ব্যবসায়ের ফলে ধন বণ্টন ব্যবস্থায় অসাম্য বাড়িয়া যায় এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন একচেটিয়া ব্যবসায়ীর হাতে সমাজের সমগ্র অর্থ নৈতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়। চতুর্থত, একচেটিয়া কারবারে শ্রমিকগণ তাহাদের ন্যায্য মজুরী হইতে বঞ্চিত হয়। শ্রমিকগণ যে জিনিস উৎপান করে, তাহা বিক্রয় করিয়া একচেটিয়া ব্যবসায়ী প্রচুর লাভ করে; অথচ, শ্রমিকগণ কখনই এই লাভের অংশ পায় না। পঞ্চমত, পূর্ণ প্রতিযোগিতায় বিক্রেতা যত খুশী কোন জিনিস বিক্রয় করিতে পারে। কিন্তু একচেটিয়া কারবারে কোন জিনিসের যোগানের উপর বিক্রেতার কর্তৃত্ব থাকিলেও সে যতখুশী জিনিসটি বিক্রয় করিতে পারে না। ইহাতে

একচেটিয়া কারবারের দোষ

সামগ্রিক-ভাবে উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া যায়। সর্বশেষে, একচেটিয়া ব্যবসায়ীগণ অনেক সময় অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য অসাধু উপায় অবলম্বন করে। বাজারে কোন জিনিসের কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করিয়া চোরা-কারবারের প্রচলন করা, নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে যাহাতে সরকারের আইনগুলি প্রণীত হয় সেইজন্য অবৈধভাবে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা ও সরকারী কর্মচারীদের উৎকোচ প্রদান করা, ইত্যাদি অসাধু উপায় অবলম্বনের দৃষ্টান্ত আধুনিক একচেটিয়া ব্যবসায়ে বিরল নয়। সুতরাং সমাজের কল্যাণের জন্য অনেক ক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে।

একচেটিয়া কারবারের নিয়ন্ত্রণ (Control of Monopoly) : একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রধান উপায় হইতেছে সরকারী হস্তক্ষেপ। প্রথমত, একচেটিয়া কারবারে বিক্রেতাগণ অনেক সময় যে সকল অসাধু উপায় অবলম্বন করে, সেইগুলি সরকার আইনের সাহায্যে বন্ধ করিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র আইন করিয়া একদিকে দাম বাড়িয়া যাওয়া প্রতিরোধ করিতে পারে এবং অপর দিকে ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় জিনিস মজুত করিয়া রাখিয়া বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করার নীতি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। সরকার একচেটিয়া বাজারের নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন জিনিসের সর্বোচ্চ দাম নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে।

তৃতীয়ত, সরকার অতিরিক্ত মুনাফার উপর কর ধার্য করিতে পারে এবং এইভাবে একচেটিয়া কারবারীদের অধিক লাভ করিবার নীতি প্রতিরোধ করিতে পারে। আবার সরকার এইরকম আইন করিয়া দিতে পারে যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ হইয়া গেলে একচেটিয়া কারবারী আর দাম বাড়াইতে পারিবে না।

চতুর্থত, যে সকল শিল্প প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়িয়া যায় রাষ্ট্র সেইগুলির উপর কর ধার্য করিতে পারে। এই পদ্ধতি এমনভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে যেন সব শিল্পের প্রান্তিক নীট উৎপাদন (Marginal Net Product) সমান হয় এবং সব শিল্প যেন একান্ত কাম্য উৎপাদনের (Optimum Output) জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে।

আমেরিকায় Sherman Anti-Trust Law এবং Clayton Act-এর মাধ্যমে একচেটিয়া কারবার গঠন করা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু, আমেরিকায় আইন করিয়াও একচেটিয়া কারবার গঠন করা একেবারে বন্ধ করা সম্ভবপর হয় নাই। কারণ আইন ফাঁকি দেওয়ার নানা উপায় বাহির হইয়া গিয়াছে এবং একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বদলে হোল্ডিং কোম্পানী এবং অন্যান্য সংঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় দাম নিরূপণ (Price Determination under Imperfect Competition) : অপূর্ণ প্রতিযোগিতার সংজ্ঞা কি হইবে তাহা লইয়া অধ্যাপিকা জোয়ান রবিনসন (Prof. Joan Robirson) তাহার

"Economics of Imperfect Competition" গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় আমরা পূর্ণ প্রতিযোগিতার অধিকাংশ শর্তগুলির অনুপস্থিতি দেখিতে পাই। অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় বিক্রেতাদের জিনিস একই প্রকৃতির (homogeneous) নয়, ক্রেতাদের চাহিদা সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক নয় এবং ক্রেতা ও বিক্রেতাদের বাজার সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান নাই। তবে অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের সংখ্যা অল্পকালে সীমিত থাকে, এবং দীর্ঘকাল বাজারে ফার্মের অবাধ প্রবেশ (free entry) থাকে। ইহার ফলে দীর্ঘকালে প্রতিযোগিতার মাত্রা বাড়িয়া যায়। কিন্তু, যেহেতু চাহিদা কখনই সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক হয় না, সেজন্য অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় কোন ফার্ম সর্বোত্তম মাত্রায় উৎপাদন করিতে পারে না। অর্থাৎ, দাম কখনই সর্বনিম্ন গড় খরচের (Minimum Average Cost) সমান হয় না। অথচ দীর্ঘকালে বাজারে ফার্মের অবাধ প্রবেশ থাকার দরুণ দাম এবং গড় খরচ (সর্বনিম্ন গড় খরচ নহে) সমান হয় এবং ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা (Normal Profit) অর্জন করে। কিন্তু ইহাতে ফার্মের অতিরিক্ত অব্যবহৃত উৎপাদনী ক্ষমতা (excess capacity) থাকিয়া যায় এবং ইহাতে সম্পদের অপচয় (wastage of resources) হয়। স্বল্পকালে বাজারে ফার্মের অবাধ প্রবেশ না থাকায় ফার্মের পক্ষে অতিরিক্ত মুনাফা (excess profit) অর্জন করা সম্ভবপর।

স্বল্প কালই হোক, আর দীর্ঘকালই হোক, অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় কোন ফার্ম সর্বাগ্রে চেষ্টা করিবে সর্বোচ্চ মুনাফা প্রদানকারী (best-profit output) যাহাতে হয় সেইভাবে উৎপাদন করিতে। উৎপাদন সর্বোচ্চ মুনাফা প্রদান করে তখনই যখন প্রান্তিক খরচ রেখা (Marginal Cost Curve) নীচের দিক হইতে আসিয়া প্রান্তিক আয় রেখাকে (Marginal Revenue Curve) ছেদ করে। যেহেতু চাহিদা সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক নহে সেজন্য গড় আয় রেখা (Average Revenue Curve) নিম্নাভিমুখী হয় এবং প্রান্তিক আয় রেখা (Marginal Revenue Curve) ইহার নীচে থাকে, সেইজন্য দাম সর্বদা প্রান্তিক আয় অপেক্ষা বেশী থাকে, এবং যেহেতু প্রান্তিক আয় এবং প্রান্তিক খরচ সমান, দাম প্রান্তিক খরচ অপেক্ষা বেশী থাকে। চেম্বারলিন যেমন একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতায় (Monopolistic Competition) বিক্রয়করণ জনিত খরচ (Selling Cost) এবং উৎপাদিত সামগ্রীর পৃথকীকরণ (Product Differentiation)-এর উপর গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন, অধ্যাপিকা জোয়ান রবিনসন সেই প্রকার অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বিশ্লেষণে ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই।[১]

যদি একচেটিয়া-ভাবাপন্ন প্রতিযোগিতা হয় একচেটিয়া কারবার এবং পূর্ণ

১। চেম্বারলিনের অভিযোগ হইতেছে, "Imperfect and Monopolistic Competition have been commonly linked together as dealing with the same subject. Their similarities seem to be adequately appreciated, their dissimilarities hardly recognised."

প্রতিযোগিতার সংমিশ্রণ ("a blending of Monopoly and Competition"), তবে অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় আমরা দেখিতে পাই, একচেটিয়া কারবার এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতার উপাদান পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র ("Monopoly and Competition are mutually exclusive")।

এখন দেখা যাক, স্বল্পকালে ও দীর্ঘকালে অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় কিভাবে ভারসাম্য অর্জিত হয় এবং দাম স্থির হয়। নিম্নের চিত্রগুলিতে ইহা দেখানো হইল :—
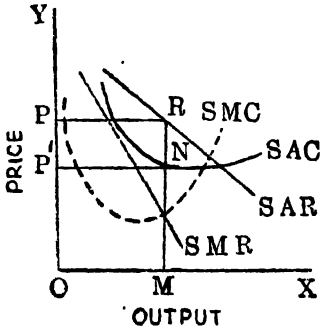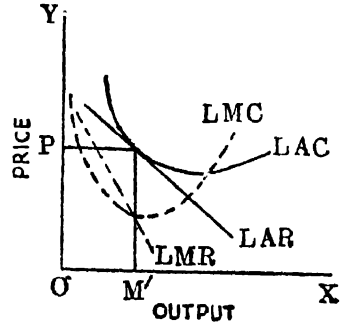
চিত্র নং ৫৭ চিত্র নং ৫৮

এই চিত্রগুলি হইতে বোঝা যাইতেছে যে স্বল্পকালই হোক আর দীর্ঘকালই হোক, ফার্মের ভারসাম্য অর্জিত হইবে যেখানে প্রান্তিক খরচ এবং প্রান্তিক আয় সমান হয়। উপরে অঙ্কিত চিত্রগুলিতে SMC, SMR, LMC এবং LMR হইতেছে যথাক্রমে স্বল্পকালীন প্রান্তিক খরচ রেখা, স্বল্পকালীন আয় রেখা, দীর্ঘকালীন খরচ রেখা এবং দীর্ঘকালীন প্রান্তিক আয় রেখা। তাহা ছাড়া, SAR এবং LAR রেখা দুইটি হইতেছে যথাক্রমে স্বল্পকালীন এবং দীর্ঘকালীন গড় আয় রেখা। স্বল্পকালে OM এবং দীর্ঘকালে OM' হইতেছে ভারসাম্য অর্জনকারী অথবা সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনকারী উৎপাদন; OP হইতেছে দাম, স্বল্পকালে দাম গড় খরচ অপেক্ষা যতটা বেশী ততটা হইতেছে অতিরিক্ত মুনাফা। দীর্ঘকালে দাম গড় খরচের সমান বটে, কিন্তু সর্বনিম্ন গড় খরচের সমান নহে। সুতরাং দীর্ঘকালে ফার্মের স্বাভাবিক মুনাফা (Normal Profit) অর্জিত হইলেও, সর্বোত্তম পর্যায়ে উৎপাদন (Optimum Output) হয় নাই। এইজন্য এইক্ষেত্রে ফার্মের কিছু অতিরিক্ত এবং অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা (excess capacity) রহিয়া গিয়াছে এবং সম্পদেরও কিছু অপচয় হইয়াছে। অথচ দাম স্বল্পকালে ও দীর্ঘকালে প্রান্তিক খরচ অপেক্ষা বেশী।

একচেটিয়াভাবাপন্ন প্রতিযোগিতা (Monopolistic Competition) : অধ্যাপক চেম্বারলিনের (Prof. Chamberlin) মতে বাস্তব জগতে আমরা পূর্ণ প্রতিযোগিতা বা সম্পূর্ণভাবে একচেটিয়া বাজার (Pure Monopoly) কোনটিই দেখিতে পাই না। আমরা বাস্তবে যেধরণের বাজার দেখিতে পাই, তাহাতে পূর্ণ প্রতিযোগিতা

এবং একচেটিয়া কারবার উভয়েরই কিছু কিছু উপাদান আছে। এই ধরণের বাজারকে অধ্যাপক চেম্বারলিন একচেটিয়াভাবাপন্ন প্রতিযোগিতা (Monopolistic Competiti ɔn) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অধ্যাপক চেম্বারলিনের মতে একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য আছে:

(১) বাজারে অনেক ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে। (২) অল্প সময়ে বিভিন্ন ফার্ম বাজারে প্রবেশ করতে পারে না ; কিন্তু, দীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন ফার্ম স্বাধীনভাবে বাজারে প্রবেশ করিতে পারে এবং বাজারটিকে অনেক পরিমাণে প্রতিযোগিতামূলক করিতে পারে। (৩) সব বিক্রেতা এক ধরণের জিনিস বিক্রয় করে না, তাহাদের বিক্রয়ের জিনিসগুলির মধ্যে গুণগত পার্থক্য (differentiation) থাকে। বিক্রেতাগণ তাহাদের নিজ নিজ জিনিসের উৎকর্ষ প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপন (advertisement) দেওয়া এবং অন্যান্য প্রচার-কাজ করিয়া থাকে। এইজন্য তাহারা কিছু পরিমাণ বিক্রয়-জনিত খরচ (Selling Cost) করিয়া থাকে। এই খরচের ফলে ক্রেতার চাহিদা বাড়িয়া যায় এবং নূতন নূতন জিনিসের জন্যও চাহিদার সৃষ্টি হয়। (৪) বিক্রেতার ভারসাম্য অর্জিত হয় তখন, যখন তাহার প্রান্তিক খরচ (Marginal Cost) প্রান্তিক আয়ের (Margina Revenue) সমান হয়। কিন্তু দাম প্রান্তিক খরচ অথবা প্রান্তিক আয় অপেক্ষা বেশী হয়। স্বল্পকালীন দামও গড়পড়তা মোট খরচ অপেক্ষা বেশী হয়। কিন্তু, দীর্ঘকালীন দাম গড় মোট খরচের (Average Total Cost) সমান হয়। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে দীর্ঘকালীন দাম গড়পড়তা মোট খরচের সমান হইলেও গড়পড়তা মোট খরচ তখন পূর্ণ প্রতিযোগিতার ন্যায় ইহার সর্বনিম্ন পর্যায়ে (minimum level) থাকে না। অল্প সময়ে প্রত্যেকটি ফার্ম আলাদাভাবে ভারসাম্য অর্জন করে। কিন্তু, দীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন ফার্ম একটি দলে (Group) একত্রিত হইয়া ভারসাম্য অর্জন করে। ইহাকে সমষ্টিগত ভারসাম্য বা (Group Equilibrium) বলে। (৫) দীর্ঘকাল ক্রেতাদের চাহিদা অনেক পরিমাণে স্থিতিস্থাপক থাকে। কিন্তু এই স্থিতিস্থাপকতা পূর্ণ প্রতিযোগিতার মত সম্পূর্ণ নয়।

একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বৈশিষ্টগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে এই বাজারে একচেটিয়া কারবার এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতা উভয়েরই কিছু কিছু উপাদান আছে। যখন দেখিতে পাই, বাজারে অনেক বিক্রেতা, দীর্ঘকালে সব বিক্রেতাই স্বাধীন-ভাবে বাজারে প্রবেশ করিতে পারে, দীর্ঘকালে দাম গড় খরচের সমান হয় এবং কেহই কোনভাবে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করে না (অথচ অল্প সময়ে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করিতে পারে), তখন আমরা বাজারে প্রতিযোগিতার মাত্রা (degree of competition) বেশী দেখিতে পাই। আবার যখন দেখিতে পাই, দাম প্রান্তিক খরচ অপেক্ষা বেশী এবং চাহিদা কোন অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক হয় না, তখনই বাজারে আমরা একচেটিয়া কারবারের উপাদান দেখিতে পাই। সেজন্যই বলা

হয় একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা হইতেছে একচেটিয়া কারবার এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতার সমন্বয়।

চিত্র নং ৫৯

চিত্র নং ৬০
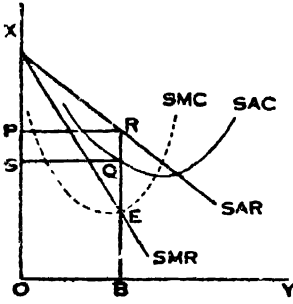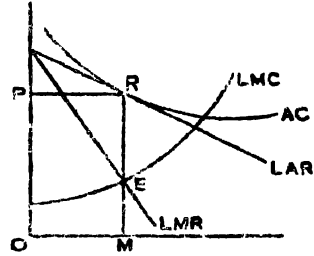
৫৯ এবং ৬০ নং চিত্রে স্বল্পকালে এবং দীর্ঘকালে একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতায় কিভাবে দাম নিরূপিত হয়, তাহা দেখান হইয়াছে।

অল্প সময়ে উপরের প্রথম চিত্রটিতে একটি ফার্ম E বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জন করিবে। কারণ, এখানে তাহার প্রান্তিক খরচ ও প্রান্তিক আয় সমান হইয়াছে। OB পরিমাণ জিনিস বাজারে বিক্রীত হইবে। কিন্তু, দাম হইবে BR, অথবা OP. দাম প্রান্তিক খরচ অপেক্ষা বেশী। এখানে বাজারে একচেটিয়া কারবারের উৎপাদন দেখা যায়, BQ হইতেছে স্বল্পকালীন গড় খরচ। BR হইতে BQ বাদ দিলে, অর্থাৎ দাম হইতে গড় খরচ বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহা, অর্থাৎ PRQS আয়তন, হইতেছে বিক্রেতার অতিরিক্ত লাভ।

৬০ নং চিত্রটিতে দীর্ঘকালীন দাম নিরূপণ দেখান হইল। দীর্ঘকালে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বাড়িয়া যায়; কারণ বিভিন্ন ফার্ম বাজারে প্রবেশ করিয়া নিজ নিজ জিনিসের উৎকর্ষ বাড়াইবার চেষ্টা করে এবং তাহার প্রচার করে। ইহার ফলে ক্রেতাদেরও চাহিদা বাড়িয়া যায় এবং ফার্মেরও গড় খরচ বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে দাম নিরূপিত হয় P বিন্দুতে যেখানে ইহা গড় মোট খরচের (Average Total Cost) সমান। উপরের চিত্রে R বিন্দুতে চাহিদা রেখা-গড় খরচ রেখার সহিত স্পর্শক হইয়াছে, অর্থাৎ, দাম গড়খরচের সমান হইয়াছে। কিন্তু এখানে E বিন্দুতে, যেখানে প্রান্তিক আয় প্রান্তিক খরচের সমান, বিভিন্ন ফার্ম দলবদ্ধভাবে ভারসাম্য অর্জন করিতেছে। ইহাকে সমষ্টিগত ভারসাম্য (Group Equilibrium) বলা হয়। এক্ষেত্রে কোন ফার্মই অতিরিক্ত মুনাফা (excess profit) অর্জন করিতেছে না। এখানেও OM পরিমাণ জিনিস বাজারে বিক্রীত হইবে। মনে রাখিতে হইবে, এই OM পরিমাণ উৎপাদন একান্ত কাম্য উৎপাদন অথবা (Optimum Output) অপেক্ষা কম। এখানেই পূর্ণ প্রতিযোগিতার সঙ্গে একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার প্রধান পার্থক্য।

বিক্রয়করণ খরচ (Selling Cost or Advertisement Cost): একচেটিয়া ভাবাপন্ন প্রতিযোগিতায় সব বিক্রেতারই জিনিসের মধ্যে তারতম্য (differentiation) থাকে। ইহাতে প্রত্যেকেই নিজের জিনিসের বিশেষ গুণগুলি বাজারের ক্রেতাদের জানাইবার জন্য প্রচার কাজ আরম্ভ করে। এইজন্য যে খরচ হয়, সেই খরচকেই আমরা Selling Cost বলি। এই ধরণের খরচের ফলে শুধু যে ক্রেতাদের চাহিদা বাড়িয়া যায়, তাহাই নহে কোন জিনিসের জন্য ক্রেতাদের নূতন চাহিদারও সৃষ্টি হয়; অপর দিকে এই বিজ্ঞাপনের খরচ অথবা প্রচারের খরচ হইবার জন্য ফার্মের গড় খরচও বাড়িয়া যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রচার কার্য জনিত অতিরিক্ত খরচ হয় তাহা অপেক্ষা প্রান্তিক আয় বেশী হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত একটি ফার্ম এই প্রকার খরচ করিতে থাকিবে। একচেটিয়া ভাবাপন্ন প্রতিযোগিতায় আমরা ইহা দেখিতে পাই, উৎপাদক যখনই এই ধরণের খরচ করে, তখনই ক্রেতাদের চাহিদা রেখা উপরের দিকে উঠিয়া যায়। বিক্রয় জনিত খরচ মূল্যকে প্রভাবিত করে। একদিকে ইহা চাহিদা বাড়াইয়া দেয়, অপর দিকে ইহা উৎপাদন খরচকেও প্রভাবিত করে। একচেটিয়াভাবাপন্ন প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালে মূল্য গড় খরচের সমান হয়, চাহিদাও আপেক্ষিকভাবে স্থিতিস্থাপক থাকে। ইহার কারণ হইতেছে এই যে দীর্ঘকালে বিভিন্ন ফার্ম অবাধে বাজারে প্রবেশ করিতে পারে, এবং বাজারে প্রবেশ করিয়া সেই ফার্মগুলি নিজেদের উৎপাদিত সামগ্রী উন্নত করিয়াও সেইগুলি প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপন খাতে খরচ (Selling Cost) করিয়া পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। বিজ্ঞাপন জনিত খরচের দরুণ চাহিদা আপেক্ষিকভাবে স্থিতিস্থাপক হয়, মোট খরচের পরিমাণও বাড়িয়া যায়। যে বিন্দুতে গড় আয় রেখা গড় খরচ রেখাকে স্পর্শ করে সেই বিন্দুতে দাম নিরূপিত হয়। বিক্রয় জনিত খরচ এইভাবে দাম নিরূপণকে প্রভাবিত করে।

একটি ফার্মের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হইল কিভাবে উৎপাদন, দাম এবং বিক্রয়করণ খরচের মধ্যে একটি আদর্শ সমন্বয় সাধন করা যায়। এমনভাবে সেই সমন্বয় সাধন করিতে হয় যেন ফার্মের লাভের পরিমাণ সর্বাধিক হয়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতা, অপূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া-ভাবাপন্ন প্রতিযোগিতার মধ্যে তুলনা (Perfect Competition, Imperfect Competition and Monopolistic Competition.—a comparative study): যখন বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে, ক্রেতাদের চাহিদা সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক (elastic) থাকে, স্বল্পকালে না হইলেও দীর্ঘকালে বাজারে যে কোন ফার্মেরই প্রবেশাধিকার থাকে, বাজারে শুধু একটিই দাম থাকে যে দামকে কোন বিক্রেতা অথবা কোন ক্রেতা চেষ্টা করিয়াও প্রভাবিত করিতে পারে না, ক্রেতা ও বিক্রেতাদের বাজার সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান থাকে, ক্রেতা ও বিক্রেতা সকলেই একধরণের জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করে এবং

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য

উৎপাদনের সমুদয় উপাদান সম্পূর্ণভাবে গতিশীল (mobile) থাকে, অর্থাৎ একস্থান হইতে অন্যস্থানে উপাদানগুলিকে যে কোন ভাবেই ব্যবহার করা চলে, তখনই সেই বাজারকে আমরা পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার বলি।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রেতা সর্বদাই সর্বাধিক লাভের (maximum profit) জন্য চেষ্টা করে। তাহা সম্ভবপর হয় যখন উৎপাদকের প্রান্তিক খরচ (Marginal Cost) তাহার প্রান্তিক আয়ের (Marginal Revenue) সমান হয়। এইস্থানেই বিক্রেতা ভারসাম্য (Equilibrium) অর্জন করে। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কোন জিনিসের দাম ইহার প্রান্তিক উৎপাদন খরচের সমান হয়। দীর্ঘকালে দামটি শুধু প্রান্তিক উৎপাদন খরচ নহে, সর্বনিম্ন গড় খরচেরও সমান হয়। তখন বিক্রেতা স্বাভাবিক লাভ (Normal Profit) অর্জন করে; কিন্তু সর্বাপেক্ষা কাম্য উৎপাদন (Optimum Output) করিতে পারে।

ভারসাম্য এবং দাম নিরূপণ

কিন্তু, পূর্ণ প্রতিযোগিতা বাস্তবে খুব কমই দেখা যায়। আমরা এমন বাজার খুব কমই দেখিতে পাই যেখানে সব ক্রেতার চাহিদা সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক এবং সব ক্রেতা ও বিক্রেতা একই ধরণের জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করে।

অপর পক্ষে পূর্ণ একচেটিয়া কারবারও (Pure Monopoly) আজকাল বাজারে খুব কম দেখা যায়। যাহা আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, তাহাকে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা (Imperfect Competition) বলা চলে। অধ্যাপিকা জোয়ান রবিনসন (Prof. Joan Robinson) দেখাইয়াছেন, অপূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া কারবারের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা শ্রেণীগত নয়, মাত্রাগত ("difference in degree not in kind")। অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় বাজারে একজন বিক্রেতা থাকে না, কয়েকজন বিক্রেতা থাকে। এই বাজারে চাহিদাও সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক থাকে না। বিক্রেতার প্রান্তিক খরচ এবং প্রান্তিক আয় সমান হয় এবং এই দুইটি সমান হইলে বিক্রেতা সর্বাধিক লাভ করে; কিন্তু, দাম প্রান্তিক খরচ অথবা প্রান্তিক আয় অপেক্ষা বেশী হয়। অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় সব ক্রেতা ও বিক্রেতা সম্পূর্ণভাবে একধরণের জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করে না, এবং বিক্রেতার পক্ষে কোন কোন ক্ষেত্রে (যখন অল্পদামের বাজার হইতে কোন জিনিসকে বেশী দামের বাজারে সরাইয়া না লওয়া যায়) বিভিন্ন ক্রেতার নিকট হইতে বিভিন্ন দাম গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়। একচেটিয়া কারবারে বিক্রেতা যে নীতি অনুসরণ করিয়া দাম নিরূপণ করে, অপূর্ণ প্রতিযোগিতায়ও বিক্রেতাগণ সেই নীতি অনুসরণ করিয়া দাম নিরূপণ করে। অর্থাৎ বেশী দাম হইলেই বেশী মুনাফা হইবে, এই নীতি তাহারা পরিহার করে এবং বিভিন্ন দামে কত আয় হইবে তাহা হিসাব করিয়া দেখিয়া যে দামে সর্বাধিক মুনাফা পাওয়া যায়, সেই দামই তাহারা নিরূপণ করে। অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় সব বিক্রেতাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে একচেটিয়া বিক্রেত

জোয়ান রবিনসন প্রদত্ত অপূর্ণ প্রতিযোগিতা তত্ত্ব

অধ্যাপিকা জোয়ান রবিনসন প্রদত্ত অপূর্ণ প্রতিযোগিতার তত্ত্বটি চেম্বারলিন (Prof. Chamberlin) গ্রহণ করেন না। তাঁহার মতে বাজারে আমরা যে প্রতিযোগিতা দেখিতে পাই, তাহা হইতেছে পূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া কারবারের যৌথ প্রভাব। ইহাকে আমরা একচেটিয়া-ভাবাপন্ন প্রতিযোগিতা (Monopolistic Competition) বলিতে পারি। একচেটিয়া-ভাবাপন্ন প্রতিযোগিতা হইতেছে একচেটিয়া কারবার এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতার সমন্বয় ("Monopolistic Competitiion is a composite of Monopoly and Competition".—Chamberlin)। এই বাজারে বিভিন্ন বিক্রেতার বিক্রয়যোগ্য জিনিসগুলির মধ্যে গুণগত পার্থক্য (differentiation) থাকে, এবং তাহারা নিজেদের জিনিসগুলির প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপন এবং অন্যান্য কাজের (advertisement) সাহায্য গ্রহণ করে। স্বল্পকালীন দাম নিরূপণের সময় তাহারা একচেটিয়া বিক্রেতাদের ন্যায় অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করে বটে. দীর্ঘকালীন বাজারে সব বিক্রেতা একত্রিত হইয়া যে দাম স্থির করে তাহাতে কাহারও অতিরিক্ত লাভ থাকে না। এই অবস্থাটি অনেকটা প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ন্যায়। ক্রেতার চাহিদা সব সময়ে বিক্রেতার প্রদত্ত বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রভাবিত হয়, বিক্রেতার মোট খরচের মধ্যেও বিজ্ঞাপন দেওয়ার খরচ ধরিয়া লইতে হয়। তাহা ছাড়া, দীর্ঘকালে একচেটিয়া ভাবাপন্ন প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ফার্ম বাজারে প্রবেশ করিতে পারে, ক্রেতাদের চাহিদাও অনেক পরিমাণে স্থিতিস্থাপক হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ পরিমাণে স্থিতিস্থাপক হয় না। একচেটিয়া ভাবাপন্ন প্রতিযোগিতায়ও বিক্রেতার ভারসাম্য অর্জিত হয় যখন প্রান্তিক খরচ প্রান্তিক আয়ের সমান হয়। কিন্তু, একচেটিয়া বাজারের ন্যায় একদিকে দাম প্রান্তিক খরচ অপেক্ষা বেশী হয়, অপরদিকে পূর্ণ প্রতিযোগিতার জন্য দীর্ঘকালে দাম গড় মোট খরচের সমান হয় এবং কাহারও ক্ষেত্রে অতিরিক্ত লাভ থাকে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, একচেটিয়াভাবাপন্ন প্রতিযোগিতা হইতেছে পূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া বাজারের সমন্বয়।

অধ্যাপক চেম্বারলিন প্রদত্ত একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা

অলিগোপলি বাজারে বিক্রেতার আচরণ (Oligopolistic Behaviour): Oligopoly বলিতে আমরা এমন একটি বাজার বুঝি যেখানে অল্প কয়েকজন বিক্রেতা থাকে এবং তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক রেষারেষি থাকে ; একজন বিক্রেতা যাহা কিছু করে, অপর বিক্রেতার মধ্যে তাহার প্রতিক্রিয়া হইবে। আবার দ্বিতীয় বিক্রেতা যাহা কিছু করে, প্রথম বিক্রেতার উপর তাহার প্রতিক্রিয়া হইবে। একজন যদি বাজারের দাম কমাইয়া দেয় তবে অপর বিক্রেতা দাম আরও কমাইয়া দেয়। বাজারে এই ধরণের যদি মাত্র দুইজন বিক্রেতা থাকে, তবে বাজারটিকে আমরা Duopoly বলি। যদি এই সকল বিক্রেতার সংখ্যা দুইজনের বেশী হয়, তবেই বাজারটিকে আমরা বলি Oligopoly ; কুর্ণো (Cournot) নামক একজন অর্থবিজ্ঞানী মনে করিতেন যে দুইজন বিক্রেতার প্রতিক্রিয়া যদি কোন ক্ষেত্রে এক প্রকার হয়, তবেই দাম স্থির

থাকে। কিন্তু এজ্‌ওয়ার্থ (Edgeworth) নামক আরেকজন অর্থবিজ্ঞানী মনে করেন যে, দুইজন বিক্রেতার পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া হইতেই একটি Contract বা চুক্তির সৃষ্টি হইবে এবং তাহা অনুযায়ী দাম স্থির হইবে। যদিও এইভাবে নিরূপিত দাম কখনই স্থির (stable or determinate) থাকিবে না, তবুও দামের পরিবর্তন কখনই চুক্তি-রেখা বা Contract Curve-এর বাহিরে যাইবে না।

'অলিগোপলি বাজারে চাহিদা রেখার বৈশিষ্ট্য (Features of the Demand Curve facing an Oligopolist) : দাম নিরূপণে ধনবিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মগুলি 'অলিগোপলি' বাজারের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় না। অলিগোপলি বাজারে প্রত্যেক বিক্রেতাই মনে করে যে তাঁহার প্রতিযোগীরা তাহাকে বাজার হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে। ইহার ফলে বাজারে এমন একটি দাম স্থির হইবে যাহা হইতে কোন বিক্রেতাই বিচ্যুত হইতে চাহিবে না। ইহাকে আমরা Price rigidity বলিতে পারি এবং ইহা অলিগোপলি বাজারের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই দাম অপরিবর্তনশীলতার জন্য অলিগোপলি বাজারে যে চাহিদারেখার সৃষ্টি হয়, তাহাতে একটি কোন kink যুক্ত হইয়া যায়। সেইজন্য অলিগোপলি বাজারের চাহিদারেখাকে (Kinky Demand Curve) বলা হয়। ৬১নং চিত্রে ইহা দেখানো হইয়াছে।

৬১নং চিত্রে OP অথবা QD হইতেছে বাজার দাম। বাজার দাম চাহিদারেখার উপর D বিন্দুতে স্থির থাকিবে এবং ইহার ফলেই চাহিদারেখায় কোনের (kink) সৃষ্টি হইবে। চাহিদারেখার AD অংশটি অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক (elastic) এবং DE অংশটি অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক (inelastic)। ইহার কারণ এই যে, যদি কোন বিক্রেতা OP অথবা QD হইতে বেশী দাম চাহে, তাহা হইলে তাহাকে বহিষ্কারের সহজ সুযোগ মনে করিয়া অন্যান্য বিক্রেতারা দাম বাড়াইবে না। ইহার ফলে প্রথম বিক্রেতার বিক্রয়ের পরিমাণ কমিবে এবং তাহাকে পুনরায় QD দামে ফিরিয়া আসিতে হইবে। অপর দিকে যদি কোন বিক্রেতা QD হইতে দাম কম করিতে চাহে, তবে অন্যান্য বিক্রেতারাও দাম কমাইবে। ফলে তাহার একক দাম বৃদ্ধিতে বিক্রয় বাড়িবে না। সুতরাং চূড়ান্ত পর্যায়ে দাম D বিন্দুতেই স্থির থাকিবে এবং চাহিদা রেখায়ও কোনের সৃষ্টি হইবে। চাহিদা রেখার (Demand Curve or Average Revenue Curve) এইরূপ আকৃতির জন্য প্রান্তিক আয় রেখার (Marginal Revenue Curve) আকৃতিতেও বিচ্ছিন্নতা দেখা যাইবে এবং
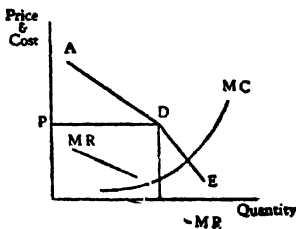
চিত্র নং ৬১

ইহার একটি অংশ ঋণাত্মক (negative) হইতে পারে। উপরে ৬১নং চিত্রে ইহা দেখানো হইয়াছে। এই অবস্থায় প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচের সাহায্যে ভারসাম্য নিরূপিত হয় না।

নেতৃস্থানীয় অলিগোপলিষ্ট (Price Leader or Output Leader): 'অলিগোপলি' বাজারে সব বিক্রেতাই যে সর্বদা সমান শক্তিশালী হইবে এবং সমানভাবে বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অনেক সময় দেখা যায় বিক্রেতাদের মধ্যেই একজন অন্য প্রতিযোগী অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী হইয়া গিয়াছেন। তখন তাহাকে নেতৃস্থানীয় অলিগোপলিষ্ট বলা হয়। নেতৃস্থানীয় অলিগোপলিষ্ট যখন দাম স্থির করে তখন তাহাকে বলা হয় Price Leader ; আবার যখন সে কতটা বিক্রয় করিবে তাহা সর্বাগ্রে স্থির করে তখন তাহাকে বলা হয় Output Leader। বাজারে দাম স্থির করিবার সময় নেতৃস্থানীয় অলিগোপলিষ্ট যে দাম নিরূপণ করে অপর বিক্রেতাগণও তাহা অনুকরণ করে। তখন অপর বিক্রেতাগণকে আমরা Price-Follower বলি। কিন্তু যখন উভয় বিক্রেতাই সমান শক্তিশালী হয় তখন তাহাদের মধ্যে রেষারেষি খুব তীব্র হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিক্রেতাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ ক্ষেত্রে কিছু কিছু একচেটিয়ামূলক প্রভাব আছে। সেইক্ষেত্রে একচেটিয়া বাজারের নিয়ম অনুসরণ করিয়া অলিগোপলিষ্টগণ নিজ নিজ ক্ষেত্রে দাম নিরূপণ করিতে পারে।

একচেটিয়া কারবার, একচেটিয়া ভাবাপন্ন প্রতিযোগিতা এবং অলিগোপলি বাজারের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য:

একচেটিয়া কারবার (Monopoly)	একচেটিয়া ভাবাপন্ন প্রতিযোগিতা (Monopolistic Competition)	অলিগোপলি (Oligopoly)
(১) একজন বিক্রেতা, অনেক ক্রেতা; বাজারে ফার্মগুলি স্বাধীনভাবে প্রবেশ করিতে পারে না।	(১) অল্প সময়ে অল্পসংখ্যক বিক্রেতা, দীর্ঘকালে বিভিন্ন ফার্মের অবাধ প্রবেশ।	(১) অল্প কয়েকজন বিক্রেতা, কিন্তু পারস্পরিক রেষারেষি খুব তীব্র।
(২) ভারসাম্যের শর্ত,—প্রান্তিক ব্যয়=প্রান্তিক আয়।	(২) প্রান্তিক ব্যয় = প্রান্তিক আয়। কিন্তু দাম প্রান্তিক আয় অথবা প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা বেশী।	(২) প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচের সমতার শর্তটির দ্বারা এই বাজারে ফার্মের ভারসাম্য অর্জিত হয় না।

একচেটিয়া কারবার, একচেটিয়া ভাবাপন্ন প্রতিযোগিতা এবং অলিগোপলি বাজারের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ঃ

একচেটিয়া কারবার (Monopoly)	একচেটিয়াভাবাপন্ন প্রতিযোগিতা (Monopolistic Competition)	অলিগোপলি (Oligopoly)
(৩) চাহিদা সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক নয়।	(৩) চাহিদা কখনই সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক নহে। স্বল্পকালে দাম গড় খরচ অপেক্ষা বেশী এবং অতিরিক্ত মুনাফা। কিন্তু দীর্ঘকালে দাম গড় খরচের সমান এবং স্বাভাবিক মুনাফা (Normal Profit) থাকে।	(৩) চাহিদা রেখায় কোণের (Kink) সৃষ্টি হয়। কোণের ক্ষেত্রে দামের স্থিরতা হয়।
(৪) শুধু সবাধিক পরিমাণ মুনাফা নয়, অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করাও একচেটিয়া কারবারীর উদ্দেশ্য। অতিরিক্ত মুনাফা = মূল্য – গড় খরচ (Price – Average Cost)। দাম সর্বদা গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচ অপেক্ষা বেশী।	(৪) দীর্ঘকালে দাম গড় খরচের সমান হইলেও সর্বনিম্ন গড় খরচের সমান নহে। বিক্রয়করণ খরচ (Selling Cost) মোট খরচের অংশ।	(৪) সাধারণতঃ বিভিন্ন বিক্রেতার মধ্যে রেষারেষির ফলে দামের স্থিরতা নষ্ট হইয়া যায়। ফার্মগুলির মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার (Collusion) মাধ্যমে দাম স্থির হইতে পারে। নেতৃ-স্থানীয় ফার্ম (Price Leader) দাম নিরূপণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। নেতৃ-স্থানীয় ফার্ম যে দাম নির্ধারিত করে, অন্যান্য ফার্ম তাহা অনুসরণ করে। কিন্তু যদি দুইটি ফার্মের উভয়েই নিজেদের নেতৃ-স্থানীয় ফার্ম বলিয়া মনে করে, তবে উৎপাদন অথবা দাম অনিশ্চিত (Indeterminate) থাকে।

একচেটিয়া কারবার, একচেটিয়া ভাবাপন্ন প্রতিযোগিতা এবং অলিগোপলি বাজারের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য :

(৫) বিক্রেতা অনেক ক্ষেত্রেই লাভজনকভাবে বিভিন্ন ক্রেতার নিকট হইতে বিভিন্ন দাম গ্রহণ করিয়া থাকে। (Price Discrimination)।	(৫) একচেটিয়া ভাবাপন্ন বাজারে বিভিন্ন ক্রেতার নিকট হইতে বিভিন্ন দাম লওয়া হয় না।	(৫) অলিগোপলি বাজারেও বিভিন্ন ক্রেতার জন্য বিভিন্ন দাম হয় না।
(৬) একচেটিয়া কারবারে বিভিন্ন জিনিসের গুণগত তারতম্যের (Product Differentiation) প্রশ্ন আসে না। একচেটিয়া কারবারীর উৎপাদিত জিনিসের গুণগত বৈশিষ্ট্য একপ্রকারই থাকে।	(৬) বিভিন্ন বিক্রেতার বিক্রয়যোগ্য জিনিসের গুণের তারতম্য থাকে (Product Differentiation)।	(৬) কোন কোন ক্ষেত্রে জিনিসের গুণের তারতম্য (differentiation) হইতে পারে। সেক্ষেত্রে ইহাকে Differentiated Oligopoly বলা হয়।

[অলিগোপলি বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির বিস্তৃত আলোচনার জন্য শুধু এই কয়টি ইঙ্গিত যথেষ্ট নহে।

করভার বণ্টনের ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (Interaction of Demand and Supply in case of incidence of taxation) : চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে দাম নিরূপিত হয়। যখন চাহিদা অথবা যোগান বাড়ে তখন চাহিদা বা যোগান রেখাই সম্পূর্ণভাবে দক্ষিণ পার্শ্বে সরিয়া যায়।

মনে করি বাজারে কোন একটি জিনিসের উপর পরোক্ষ কর ধার্য করা হইয়াছে। মনে করি সেই পরোক্ষ করটি বিক্রয় কর। এই বিক্রয় কর ধার্য করার ফলে বিক্রেতারা করের পরিমাণ অনুযায়ী দাম বাড়াইতে বাধ্য হইবে। সুতরাং যোগান রেখাটি সম্পূর্ণভাবে বামপার্শ্বে উপরের দিকে সরিয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহার ফলে বাজারে একটি নূতন ভারসাম্য সৃষ্টি হইবে, বাজার দাম বাড়িবে এবং ক্রেতারা পূর্বাপেক্ষা জিনিসটি কম করিয়া কিনিবে। পর পৃষ্ঠার ৬২নং রেখাচিত্রের সাহায্যে বর্তমান পরিস্থিতিটি সহজে বুঝা যাইবে। কর ধার্য করিবার পূর্বে DD ছিল বাজার চাহিদা রেখা এবং SS ছিল বাজার যোগান রেখা এবং P বিন্দুতে বাজারে ভারসাম্য নির্ধারিত হইয়াছিল। ক্রেতারা TP মূল্যে OT পরিমাণ জিনিস কিনিত। এখন জিনিসটির প্রতি এককের

উপর SS′ পরিমাণ কর ধার্য করা হইল। ফলে যোগান রেখাটি S′S′ স্থানে অবস্থিত হইল। SS রেখা এবং S′S′ রেখার ভিতর লম্ব-দূরত্ব করের পরিমাণ নির্দেশ করিতেছে। বর্তমানে N বিন্দুতে ভারসাম্য রক্ষিত হইতেছে। ক্রেতারা MN দামে OM পরিমাণ জিনিস কিনিতেছে। এই MN দামের ভিতর কিন্তু বিক্রেতারা পাইতেছে KM এবং সরকার পাইতেছে KN; এখানে দেখা যাইতেছে KN
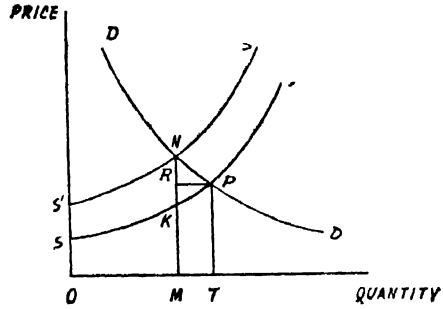
চিত্র নং ৬২

পরিমাণ দাম বাড়িবার ফলে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়কেই ইহার অংশীদার হইতে হইয়াছে। KN-এর ভিতর ক্রেতা RN পরিমাণ দিতেছে এবং বিক্রেতা RK পরিমাণ দিতেছে। ক্রেতাকে পূর্বাপেক্ষা RN পরিমাণ অধিক দাম দিতে হইতেছে বলিয়া RN হইল ক্রেতার করভার (incidence) এবং যেহেতু বিক্রেতার বিক্রয় হ্রাস পাইয়াছে, সুতরাং RK হইল বিক্রেতার করভার (incidence)।

এইক্ষেত্রে একটি সাধারণ ভুলের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনেক সময় এইরূপ একটি যুক্তির অবতারণা করা হয় যে, কর ধার্য করার ফলে দাম বাড়িয়া যায় এবং দাম বাড়িবার ফলে চাহিদা হ্রাস পায় এবং চাহিদা হ্রাস পাইলে আবার দাম কমিয়া যায়। সুতরাং কর ধার্য করার ফলে দাম বাড়িতে পারে না। উপরের আলোচনা হইতে আমরা এই যুক্তি খণ্ডন করিতে পারি। কর ধার্য করার ফলে যোগান রেখা সরিয়া যায় এবং ফলে এক নূতন ভারসাম্য অর্জিত হয়। ক্রেতারা অধিক দামে কম করিয়া জিনিস কিনে। ইহার অর্থ এই নয় যে চাহিদা হ্রাস পাইয়াছে। চাহিদা হ্রাস পাইলে সম্পূর্ণ চাহিদা রেখাটি নিম্নে সরিয়া আসিত। কিন্তু উপরে অঙ্কিত ৬২ নং চিত্রে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে চাহিদা রেখা স্থির আছে এবং উহার উপরেই N বিন্দুতে চাহিদা এবং যোগান সমান হইতেছে। সুতরাং কর ধার্য করার ফলে দাম বাড়িবে এবং ক্রেতারা অধিক দামে কম করিয়া জিনিসটি কিনিবে। তদুপরি ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়েই এই দাম বৃদ্ধির বোঝা বহন করিবে। আমাদের চিত্র অনুযায়ী ক্রেতার ভার RN এবং বিক্রেতার ভার RK। যখন বাজারে অনেক সময় কোন কোন জিনিসের অস্বাভাবিক দাম, সুতরাং কর ধার্য হইলে কোন জিনিসের দাম বাড়িবে কিনা তাহার নিশ্চয়তা নাই—এই জাতীয় যুক্তি ঠিক নহে।

দামের উপর নিয়ন্ত্রণ বা রেশনিং-এর প্রভাব (Effect of Price Control or effect of Rationing on Price): অনেক সময় বাজারে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে যোগান অনুযায়ী চাহিদা খুব বেশী এবং সেজন্য দামও খুব বেশী; অথচ জরুরী

অবস্থার জন্য সঙ্গে সঙ্গে যোগান বাড়াইয়া দেওয়া সম্ভব নয়। এই অবস্থায় জিনিস-পত্রের দাম অসম্ভব বাড়িয়া যায়, ক্রেতাদের অশেষ দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়, বিক্রেতারা অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে। এই অবস্থা বেশী দিন ধরিয়া চলিতে থাকিলে দেশে রাজনৈতিক অরাজকতার সৃষ্টি হইবার আশংকা থাকে বলিয়া সরকারকে বাধ্য হইয়া মূল্য নিয়ন্ত্রণ (Price Control) এবং রেশনিং ব্যবস্থার (Rationing System) প্রবর্তন করিতে হয়।

মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং রেশনিং ব্যবস্থায়ও চাহিদা ও যোগানের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। তাহা নিম্নের ৬৩নং চিত্রে দেখান হইয়াছে।

যদি স্বাভাবিক ভাবে দাম নির্ধারিত হইত তাহা হইলে E বিন্দুতে চাহিদা এবং যোগান সমান হইত। কিন্তু মনে করি E বিন্দুতে দাম বেশী বলিয়া ক্রেতাদের নিকট মনে হইতেছে। সুতরাং সরকার বাধ্য হইয়া OM স্তরে মূল্য স্থির করিয়া দিল। কিন্তু OM দামে বাজারে অতিরিক্ত GH পরিমাণ চাহিদা রহিয়াছে, কেননা বাজারে মোট যোগানের পরিমাণ MG। স্পষ্টতঃই MG যোগানের দ্বারা MH চাহিদা মিটানো যায় না। সুতরাং সরকারকে বাধ্য হইয়াই রেশনিং-এর মাধ্যমে ক্রেতাদের চাহিদা মিটাইতে হইবে। সরকার দুই প্রকার ব্যবস্থা করিতে পারেন। প্রথমত, সরকার রেশনকার্ডের সাহায্যে প্রতি ক্রেতার ভোগের পরিমাণ এমনভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারেন, যাহাতে মোট ভোগের পরিমাণ MG অতিক্রম না করে। দ্বিতীয়ত, সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থার সাহায্যে মোট চাহিদা DD হইতে dd তে কমাইয়া আনিতে পারেন। (৬৩ নং চিত্র অনুযায়ী dd রেখা G বিন্দুর ভিতর দিয়া যাইতেছে) সুতরাং, ক্রয়ের পরিমাণ MG-তে সীমিত রাখিতে হইবে।
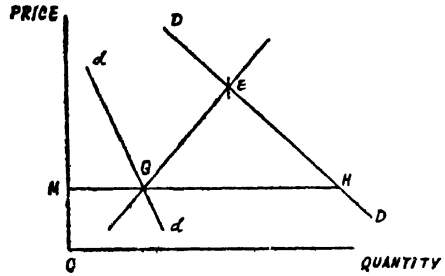
চিত্র নং ৬৩

এখানে দেখা যাইতেছে যে যোগান স্থির বলিয়া এমন ভাবে দাম নির্ধারিত করা হইতেছে (যদিও কৃত্রিম উপায়ে) যাহাতে চাহিদা এবং যোগান সমান হয়। এই ব্যবস্থাকে রেশনিং বলা হয়। যখন বাজার দাম বৃদ্ধি পায়, তখন অপ্রয়োজনীয় ভোগ বন্ধ হয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। যখন বাজার দাম হ্রাস পায় তখন ভোগ বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন হ্রাস পায়।

রেশনিং ব্যবস্থার ফলে ক্রেতার চাহিদা সম্পূর্ণভাবে মিটান যায় না বটে,—তবে বাজারের বর্তমান যোগান যাহাতে সব ক্রেতাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে বণ্টিত হয় এবং তাহার জন্য ক্রেতাদের যাহাতে অস্বাভাবিক বেশী দাম দিতে না হয় সেইজন্য রেশনিং ব্যবস্থার একটি সাময়িক উপযোগিতা আছে।

দেশে জরুরী অবস্থায় ভোগ নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। কারণ ইহাতে সঞ্চয় বাড়ে। সেইজন্য জনসাধারণের ভোগকে সীমিত (rationed) করা হয়। রেশনিং প্রথার বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহাতে জনসাধারণের চাহিদা বাহ্যতঃ নিয়ন্ত্রিত হয়। জিনিসপত্র ক্রয় করার ক্ষেত্রেও ক্রেতাদের স্বাধীনতা থাকে না। ইহার ফলে তাহাদের চাহিদা নষ্ট হয় না; বরং একটি চাপা চাহিদার (suppressed demand) সৃষ্টি হয়। ক্রেতা যদি জিনিসপত্র ক্রয় করিবার সময় তাহার স্বাধীনতা হারায়, তবে সে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা খরচ করিয়াও সেই খরচ অনুযায়ী তৃপ্তি পায় না। এই ব্যবস্থার একটি কুফল আছে। ইহাতে বাজারে সংশ্লিষ্ট ভোগসামগ্রীগুলির যোগান কমিয়া যায় এবং এই কৃত্রিম দুষ্প্রাপ্যতার দরুণ চোরা-কারবারের (black marketing) সৃষ্টি হয়। তবুও জনগণের চাহিদা কমাইবার জন্য রেশনিং প্রথা চালু করা দরকার হয়। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এবং ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোয় ক্রেতাদের জিনিসপত্র ক্রয় করিবার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে, এবং রাষ্ট্র এইক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে না। মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হইলে তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্য রেশনিং প্রথা অথবা জিনিসপত্রের উপর কৃত্রিম নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার প্রথা প্রবর্তন করিবার দরকার হয়। ইহাতে ক্রেতাদের চাহিদা যদিও নষ্ট হয় না, তবুও চাহিদার গতি পরিবর্তিত হয় এবং ইহাতে সাময়িক ভাবে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য জোর করিয়া বজায় রাখিবার চেষ্টা চালান হয়।

Exercise

1. What do you mean by a Market? On what factors does the extent of a market depend? What are the different types of Market in Economics?
(বাজার বলিতে তুমি কি বুঝ? কি কি উপাদানের উপর বাজারের আয়তন নির্ভর করে? বিভিন্ন ধরনের বাজার কি কি আছে?) (১২৭-১৩০ পৃষ্ঠা)

2. What do you mean by Average Revenue and Marginal Revenue? What is the relationship between Average Revenue and Marginal Revenue?
(গড় আয় এবং প্রান্তিক আয় বলিতে তুমি কি বুঝ? গড় আয় এবং প্রান্তিক আয়ের মধ্যে কি সম্পর্ক?) (১৩০ পৃষ্ঠা)

3. Show how Price is determined by an interaction of the forces of demand and supply. (চাহিদা এবং যোগানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় কিভাবে দাম স্থির হয় দেখাও।)
(১৩৩-১৩৪ পৃষ্ঠা)

4. Explain the conditions of Equilibrium of a Firm.
(ফার্মের ভারসাম্যের শর্ত ব্যাখ্যা কর।) (১৩১-১৩৩ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the relation between Price, Marginal Cost and Average Cost in a Perfectly Competitive market both in the short run and in the long run.)
(অল্প সময়ে এবং দীর্ঘ সময়ে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম, প্রান্তিক খরচ এবং গড় খরচের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।) (১৩৪-১৩৭ পৃষ্ঠা)

6. Explain the concepts of Marginal Revenue, Marginal Cost and Average Cost. Why in the long run must the firms be operating at the point of lowest Long-run Average Cost in case of Perfect Competition ?

(প্রান্তিক আয়, প্রান্তিক খরচ এবং গড় খরচ কাহাকে বলে ব্যাখ্যা কর। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালে ফার্মগুলি সর্বনিম্ন গড় খরচে কেন ব্যবসায় চালায় ?) (১১২-১১৩ ; ১২০ ; ১৩৬-১৩৭ পৃষ্ঠা)

7. Discuss the time element in the theory of value pointing out the dominant influences that determine Market Price and Normal Price.

(মূল্যতত্ত্বে সময়ের উপাদান আলোচনা কর এবং বাজার মূল্য ও স্বাভাবিক মূল্য কি কি প্রধান উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত হয় তাহা দেখাও।) (১৩৮-১৪০ পৃষ্ঠা)

8. Explain the assumptions of Perfect Competition and show why Marginal Cost will equal Price under Perfect Competition.

[পূর্ণ প্রতিযোগিতার শর্তগুলি ব্যাখ্যা কর এবং দেখাও কেন পূর্ণ প্রতিযোগিতায় প্রান্তিক খরচ দামের সমান হইবে।] (১৩৪-১৩৭ পৃষ্ঠা)

9. Discuss the conditions of Equilibrium of a Firm under Perfect Competition both in the short run as well as the long run.

[পূর্ণ প্রতিযোগিতায় স্বল্পকালে ও দীর্ঘকালে ফার্মের ভারসাম্যের শর্তগুলি আলোচনা কর।]
(১৩৪-১৩৭ পৃষ্ঠা)

10. "The tools of supply and demand are not restricted to handling static and unchanging situations, but can also be used fruitfully to analyse the dynamic situations of change".—Discuss the statement.

["যোগান এবং চাহিদার উপকরণগুলি শুধুমাত্র স্থিতিশীল এবং অপরিবর্তনীয় ঘটনাগুলির ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেই সীমিত নয়, এইগুলিকে গতিশীল পরিবর্তিত অবস্থার ব্যাখ্যা করার জন্যও ভালভাবে প্রয়োগ করা চলে।" —উক্তিটি আলোচনা কর।] (১৪০-১৪২ পৃষ্ঠা)

11. Write a note on the Equilibrium of an Industry.

[কোন শিল্পের ভারসাম্যের উপর একটি টীকা লিখ।] (১৩৭-১৩৮ পৃষ্ঠা)

12. Discuss the problems of Competitive Price under Increasing Returns and Diminishing Returns.

[ক্রমবর্ধমান এবং ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক দামের সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা কর।] (১৪২-১৪৪ পৃষ্ঠা)

13. "The concept of a Representative Firm is wholly an unsubstantial notion." —Examine the statement.

["প্রতিনিধিস্থানীয় ফার্মের ধারণাটি সম্পূর্ণ অসার" —উক্তিটি পরীক্ষা কর।] (১৪২-১৪৪ পৃষ্ঠা)

14. What do you mean by Monopoly ? On what principles does the monopolist fix the price of his products ?

[একচেটিয়া কারবার সম্পর্কে তোমার কি ধারণা ? কোন্ নীতিগুলির ভিত্তিতে একচেটিয়া কারবারী তাহার দাম নির্ধারণ করে ?] (১৪৪-১৪৬ পৃষ্ঠা)

15. Under what conditions is Price Discrimination possible and profitable ?

[কি কি শর্তাধীনে দামের তারতম্য করা সম্ভবপর এবং লাভজনক ?] (১৪৬-১৪৮ পৃষ্ঠা)

16. What are the different types of Price Discrimination ?

[বিভিন্ন ধরণের দামের তারতম্য কি কি ?] (১৪৮-১৪৯ পৃষ্ঠা)

17. What are the limits to the power of a monopolist to charge any price he likes ? [একচেটিয়া কারবারীর ইচ্ছামত দাম নির্ধারণ করার কি কি সীমা আছে ?]
(১৪০-১৪১ পৃষ্ঠা)

18. Why is Competition often imperfect in a market for a commodity ? How are prices determined under Imperfect Competition ?
[কোন জিনিসের বাজারে প্রতিযোগিতা প্রায়ই অপূর্ণ হয় কেন ? অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় ?]
(১৪৩-১৪৭ পৃষ্ঠা)

19. "Imperfect Competition may result in wastage of resources, too high price, and yet no profits for the Imperfect Competitors."
["অপূর্ণ প্রতিযোগিতার পরিণতি হইতে পারে সম্পদের অপচয়, খুব বেশী দাম অথচ মুনাফার অভাবের মধ্যে," —উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।]
(১৪৫-১৪৭ পৃষ্ঠা)

20. Compare Perfect Competition, Imperfect Competition and Monopolistic Competition.
[পূর্ণ প্রতিযোগিতা, অপূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া ভাবাপন্ন প্রতিযোগিতার মধ্যে তুলনা কর।]
(১৫৮-১৬০ পৃষ্ঠা)

21.. "Monopolistic Competition is a composite of both Perfect Competition and Monopoly." —Explain the statement.
["একচেটিয়া ভাবাপন্ন প্রতিযোগিতা হইতেছে পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া কারবারের সংমিশ্রণ" —উক্তিটি আলোচনা কর।]
(১৫৫-১৫৭ পৃষ্ঠা)

22. Discuss the principles which determine value in an imperfect market.
[অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মূল্য নির্ধারণের নীতিগুলি আলোচনা কর।]
(১৪৩-১৪৭ পৃষ্ঠা)

23. What do you mean by Monopolistic Competition ? How is Price determined under Monopolistic Competition in the short run and in the long run ?
[একচেটিয়া ভাবাপন্ন প্রতিযোগিতা সম্পর্কে তোমার কি ধারণা ? একচেটিয়া ভাবাপন্ন প্রতিযোগিতায় স্বল্পকালে ও দীর্ঘকালে কিভাবে দাম নিরূপিত হয় ?]
(১৫৫-১৫৭ পৃষ্ঠা)

24. What do you mean by Selling Cost ? How does Selling Cost influence price under Monopolistic Competition ?
[বিক্রয়করণ খরচ বলিতে তুমি কি বোঝ ? একচেটিয়া ভাবাপন্ন প্রতিযোগিতায় দাম কিভাবে বিক্রয়করণ খরচ দ্বারা প্রভাবিত হয় ?]
(১৫৮ পৃষ্ঠা)

25. Write notes on oligopolistic behaviour and the features of the demand curve facing an oligopolist.
[অলিগোপলি বাজারে বিক্রেতার আচরণ এবং অলিগোপলি বাজারে চাহিদা রেখার বৈশিষ্ট্যের উপর টীকা লিখ।]
(১৬০-১৬২ পৃষ্ঠা)

26. Discuss the merits and defects of Monopoly.
[একচেটিয়া কারবারের গুণ ও দোষ সম্পর্কে আলোচনা কর।]
(১৫১-১৫২ পৃষ্ঠা)

27. How can Monopoly be controlled ?
[একচেটিয়া কারবার কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায় ?]
(১৫৩ পৃষ্ঠা)

28. Do you accept the following argument ? "The effect of a tax on a commodity might seem at first sight to be an advance in price to the consumer. But an advance in price will diminish the demand. And a reduced demand will send the price down again. It is not certain, therefore after all, that the tax will really raise the price." Give reasons for your answer.

[তুমি কি নিম্নের যুক্তিটি গ্রহণ কর ?

"কোন জিনিসের উপর কর ধার্য করা হইলে প্রথমেই ইহা দাম বাড়াইবে বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু দাম বাড়িলে চাহিদা কমিয়া যাইবে, এবং চাহিদা কমিলে পুনরায় দাম কমিবে। সুতরাং করটি যে দাম বাড়াইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।" তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি প্রদান কর।] (১৬৪-১৬৫ পৃষ্ঠা)

29. "Although rationing is the fairest method of reducing consumption in an emergency, it restricts the freedom of choice of consumers and thereby reduces the satisfaction which they get from a given expenditure" —Discuss the statement.

["যদিও জরুরী অবস্থায় রেশনিং-এর প্রথা হইতেছে ভোগ হ্রাস করিবার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা, কিন্তু ইহা ক্রেতার নির্বাচনের স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং একটি নির্দিষ্ট ব্যয় হইতে যে তৃপ্তি পাওয়া যায় তাহা হ্রাস করে" —উক্তিটি আলোচনা কর।] (১৬৫-১৬৭ পৃষ্ঠা)

30. Point out the similarities and differences between Monopoly, Monopolistic Competition and Oligopoly.

[একচেটিয়া কারবার, একচেটিয়াভাবাপন্ন প্রতিযোগিতা এবং অলিগোপলির মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি আলোচনা কর।] (১৬১-১৬৪ পৃষ্ঠা)

31. How would you measure the degree of Monopoly Power ? [একচেটিয়া ক্ষমতার মাত্রা তুমি কিভাবে পরিমাপ করিবে ?] (১৪৯-১৫০ পৃষ্ঠা)

দ্বাদশ অধ্যায়

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত মূল্য
(Interdependent Prices)

এমন কতিপয় জিনিস আছে যেগুলির দাম পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত। এই জিনিসগুলি প্রতিযোগী জিনিস, সংযুক্ত খরচের সামগ্রী অথবা সহযোগী জিনিস হইতে পারে।

প্রতিযোগী সামগ্রী (Competing Goods or Substitutes) ঃ যখন বিভিন্ন জিনিসের যে কোন একটির সাহায্যেই কোন একটি অভাব দূর করা যায়, অর্থাৎ, যখন একটি জিনিসের পরিবর্তে অপর একটি নির্দিষ্ট জিনিস ব্যবহার করিলেই চলে তখন সেই জিনিসগুলিকে আমরা প্রতিযোগী সামগ্রী (competing

goods) বলি। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, চা অথবা কফি যে কোন একটির সাহায্যে আমরা আমাদের গরম পানীয়ের চাহিদা মিটাইতে পারি। সুতরাং এই জিনিসগুলি পরস্পরের প্রতিযোগী। প্রতিযোগী সামগ্রীগুলির দাম ইহাদের প্রান্তিক খরচ এবং প্রান্তিক উপযোগের সমান। এই প্রতিযোগী সামগ্রীগুলির মধ্যে একটির দাম বাড়িলে অপরটির দাম বাড়ে আবার একটির দাম কমিলে অপরটির দাম কমে। যখন চা সস্তা হইয়া যায় তখন লোকে বেশী করিয়া চা ক্রয় করে এবং কম করিয়া কফি ক্রয় করে। ইহার ফলে কফির বিক্রেতাগণও কফির দাম কমাইবে। আবার চায়ের দাম বাড়িয়া গেলে লোকে বেশী করিয়া কফি কিনিবে। ইহাতে কফির চাহিদা বাড়িবে এবং দামও বাড়িবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে একটির দাম বাড়িলে অপরটির দাম বাড়ে।

সংযুক্ত যোগান বা সংযুক্ত খরচের সামগ্রী (Joint Supply or Joint Cost Goods) : যখন একই খরচে একাধিক জিনিস উৎপন্ন হয় এবং একটির যোগান অপরটির যোগানের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকে তখন ইহাকে সংযুক্ত যোগান (Joint Supply) বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ পশম ও মাংস, গ্যাস ও কোক ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সংযুক্ত যোগানের জিনিসগুলির মধ্যে একটির দাম বাড়িলে উহার উৎপাদন বাড়িবে এবং একই সঙ্গে অন্য জিনিসেরও উৎপাদন বাড়িবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পশমের দাম বাড়িলে পশমের উৎপাদন বাড়িবে এবং সেই সঙ্গে মাংসেরও যোগান বেশী হইবে। কিন্তু যদি মাংসের চাহিদা স্থির থাকিয়া যায় এবং শুধু পশমের উৎপাদন বাড়িয়াছে বলিয়া মাংসের যোগান বাড়ে, তবে মাংসের দাম কমিবে। আবার যদি বিক্রেতা মাংসের যোগান কমাইতে থাকে, তবে পশমের যোগান কমিবে এবং পশমের দাম বাড়িবে। সুতরাং সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে জিনিসগুলির দাম পরস্পরের বিপরীতমুখী দেখা যায়।

সংযুক্ত চাহিদা বা পরিপূরক চাহিদা (Joint Demand or Complementary Demand) বা সহযোগী সামগ্রী (Complementary Goods) : যখন একটি জিনিসের চাহিদা মিটাইতে হইলে অন্যান্য জিনিসের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, তখন সেই জিনিসগুলিকে সহযোগী সামগ্রী (Complementary Goods) বলা হয় এবং সংশ্লিষ্ট জিনিস এবং সহযোগী জিনিসগুলির চাহিদাকে একযোগে সংযুক্ত চাহিদা বা পরিপূরক চাহিদা বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কাগজে কিছু লিখিতে হইলে কালি এবং কলমের দরকার হয়, অথবা, চা তৈয়ারী করিতে হইলে দুধ ও চিনির প্রয়োজন হয়। এই ধরণের জিনিসগুলিকে সহযোগী জিনিস বলা হয়। এইগুলির ক্ষেত্রে একটি জিনিসের জন্য প্রত্যক্ষ চাহিদা বাড়িলে সহযোগী জিনিসগুলির চাহিদা পরোক্ষভাবে বাড়িয়া যায়। বাড়ী তৈয়ারীর জন্য চাহিদা বাড়িলে, সিমেন্ট, চূণ, ইট, প্রভৃতির চাহিদা

বাড়িবে। এই জিনিসগুলির ক্ষেত্রে একটির দাম বাড়িলে অপরগুলিরও দাম বাড়িয়া যায়। ফাউণ্টেনপেনের দাম বাড়িলে কালির দাম বাড়িয়া যাইবার ঝোঁক দেখা যাইবে। কারণ, লোকে যদি ফাউণ্টেনপেন কম করিয়া কিনে তবে কালিও কম করিয়া কিনিবে। ইহাতে কালি প্রস্তুতকারকদের ক্ষতি হইবে, সুতরাং তাহারা দাম বাড়াইয়া দিয়া চাহিদার ঘাটতি জনিত ক্ষতি পূরণ করিবার চেষ্টা করিবে। সংযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে পৃথক পৃথকভাবে জিনিসগুলির দাম নিরূপণ করায় অসুবিধা দেখা যায়, তবে যেহেতু জিনিসগুলির অনুপাত পরিবর্তন করা যায়, সেইজন্য এই অসুবিধা দূর করা সম্ভবপর।

সংযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে দাম নিরূপিত হয় সহযোগী সামগ্রীগুলির প্রত্যেকের প্রান্তিক উপযোগ এবং প্রান্তিক উৎপাদন খরচের দ্বারা। এই জিনিসগুলির ক্ষেত্রে আমরা একটির অনুপাত বাড়াইয়া বা কমাইয়া এবং অপর জিনিসগুলির অনুপাত অপরিবর্তিত রাখিয়া প্রথম জিনিসটির প্রান্তিক উপযোগ বাহির করিতে পারি। অনুরূপভাবে জিনিসটির প্রান্তিক উৎপাদন খরচ বাহির করাও সম্ভব। যখন জিনিসটির প্রান্তিক উৎপাদন খচর ইহার প্রান্তিক উপযোগের সমান, তখনই ইহার দাম নিরূপিত হয়। কোন ক্ষেত্রে যদি কোন সহযোগী সামগ্রী একান্ত অপরিহার্য হইয়া পড়ে, অথবা ইহার জন্য চাহিদা অস্থিতিস্থাপক থাকে অথবা ইহার জন্য খরচ মোট খরচের একটি ক্ষুদ্র অংশ হয়, তখন ইহা বেশী দাম পাইতে পারে।

সংযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে দাম নিরূপণ

সংমিশ্রিত চাহিদা (Composite Demand) : একটি জিনিসকে যদি আমরা বিভিন্নভাবে ব্যবহার করিতে পারি, তবে ইহার জন্য আমাদের প্রতিযোগী চাহিদা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, লোহা এমনই একটি ধাতু যাহা বিভিন্ন কাজে প্রয়োজনীয় হয়। ঘরবাড়ী তৈয়ারী করা, রাস্তার উপরে লোহার সেতু তৈয়ারী করা, রেলগাড়ী তৈয়ারী করা এবং যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করা ইত্যাদি সব কাজেই লোহার দরকার হয়। এখন বিভিন্ন কাজের জন্য কত লোহার দরকার তাহার মোট হিসাব করিয়া লোহার মোট চাহিদা নিরূপিত হয়। বিভিন্ন কাজে আমরা এমনভাবে এই জিনিসটি ব্যবহার করিব যে সব ক্ষেত্রেই ইহার প্রান্তিক উপযোগ একপ্রকার হয়। কোন বিশেষ কাজে যদি জিনিসটির প্রান্তিক উপযোগ ইহার দাম অপেক্ষা বেশী হয়, তবে জিনিসটি আরও বেশী করিয়া ব্যবহার করা হইবে। অবশেষে সব রকম ব্যবহারের ক্ষেত্রেই জিনিসটির দাম ইহার প্রান্তিক উপযোগের সমান হইবে।

সংমিশ্রিত যোগান (Composite Supply) : যখন একই অভাব বা আকাংখা বিভিন্ন জিনিসে পরিতৃপ্ত হইতে পারে তখন ঐ জিনিসগুলির যোগানকে সংমিশ্রিত যোগান বলা হয়। যেমন, চা, কফি ও কোকো দ্বারা আমাদের পানীয়ের প্রয়োজন মিটিতে পারে। ট্রাম অথবা বাসের দ্বারা আমরা একস্থান হইতে অন্যস্থানে

যাইতে পারি। প্রয়োজন হইলে আমরা একটির পরিবর্তে অন্যটিকে ব্যবহার করিতে পারি। সুতরাং একটি জিনিস অপর একটির পরিবর্তী (Substitute)। সংমিশ্রিত যোগানের ক্ষেত্রে একটির দামের হ্রাসবৃদ্ধি অপরটির দামের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইয়া থাকে। যেমন, চা-এর দাম কমিলে কফির ক্রেতাগণ অধিক পরিমাণে চা কিনিতে চাহিতে পারে; সেইজন্য কফির বিক্রেতাগণও তাহাদের জিনিসের দাম কমাইয়া দিবে।

উদ্ভূত চাহিদা (Derived Demand) : এমন অনেক জিনিস আছে যেগুলির চাহিদা অন্যান্য জিনিসের চাহিদা হইতে উদ্ভূত হয়। উৎপাদনের উপকরণগুলির চাহিদা উদ্ভূত চাহিদার দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। জমি, শ্রম, মূলধন প্রভৃতি উপাদানের জন্য উৎপাদকের যে চাহিদা হয়, সেই চাহিদা নির্ভর করে এই সকল উপকরণগুলি কর্তৃক প্রস্তুত জিনিসের উপর। শেষ উৎপাদিত দ্রব্য (finished products) হইতেই উৎপাদনের উপকরণগুলির চাহিদার সৃষ্টি হয়, এবং এইজন্য এই চাহিদা উদ্ভূত চাহিদা হিসাবে পরিচিত।[১] উদ্ভূত চাহিদার ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম উৎপাদনের উপকরণের অনুপাতের তারতম্য করিয়া ইহাদের প্রান্তিক উৎপাদন-শীলতা নিরূপণ করিতে হয়। অনুপাতের পরিবর্তন হইলে প্রত্যেক উপকরণের দাম ইহার প্রান্তিক উৎপাদনের দামের সমান হয়। অনুপাত যদি অপরিবর্তনীয় হয়, তবে উপাদানগুলির পৃথক দাম নিরূপণ করা সম্ভবপর নয়। কোন কোন সময়ে উৎপাদন-উপকরণের যোগান সংকুচিত করিয়া ইহার দাম বাড়ানো সম্ভবপর। মার্শালের মতে চারিটি ক্ষেত্রে ইহা সম্ভবপর হইতে পারে। প্রথমত, যদি উপাদানটি অত্যাবশ্যক হয়, দ্বিতীয়ত, যদি উপাদানগুলি কর্তৃক উৎপাদিত জিনিসের জন্য লোকের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক থাকে; তৃতীয়ত, যদি উপকরণের দাম মোট উৎপাদন ব্যয়ের সামান্য অংশ মাত্র হয়, এবং চতুর্থত, যদি এমন হয় যে অন্যান্য উপকরণের চাহিদা সামান্য কমিলে এখানে সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলির দাম কমিয়া যায়।

সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে দাম নিরূপণ (Determination of Price under Joint Supply) : যখন একই খরচে একাধিক জিনিস তৈয়ারী হয়, তখন ইহাকে আমরা সংযুক্ত যোগান (Joint Supply) বলি। যেমন,—রেশম ও মাংস, গ্যাস ও কোক্ ইত্যাদি।

যুক্তভাবে উৎপাদিত জিনিসগুলির দাম দুইভাবে নিরূপিত হয়। এমন কতিপয় জিনিস আছে যেগুলির উৎপাদনের অনুপাত পরিবর্তন করা সম্ভবপর (Proportions can be varied.)। এখানে মাংসের পরিমাণ স্থির ধরিয়া লইয়া উলের প্রান্তিক খরচ নিরূপণ করা যাইতেছে। ধরা যাক্, উলের দাম বেশী হইয়াছে বলিয়া উৎপাদক

১। অধ্যাপক মার্শালের মতে, "The direct demand for the finished product is, in effect, split up into many derived demands for the things used in producing it." (Marshall—Principles of Economics).

বেশী করিয়া উল তৈয়ারী করিতে চাহে। এখন বিক্রেতাকে ভেড়া কিনিতে হইবে শুধু উল বাড়াইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য। ইহাতে সে কিছু মাংসও পাইবে; কিন্তু মাংসের জন্য বিশেষ চাহিদা নাই। বর্তমানে বিক্রেতা ১৫ টাকা খরচ করিয়া ৮ সের মাংস ও ৭ সের উল পাইতেছে। পূর্বে ১৪ টাকা খরচ করিয়া ৮ সের মাংস ও ৬ সের উল পাইত। সুতরাং এক্ষেত্রে এক ইউনিট অতিরিক্ত উলের জন্য তাহার অতিরিক্ত ১ টাকা খরচ হইতেছে। ইহাই হইল উলের প্রান্তিক খরচ। সুতরাং উলের প্রান্তিক খরচ হইল ১ টাকা। বাজার দর প্রান্তিক খরচের সমান। সুতরাং সাত সের উল কিনিতে খরচ হইয়াছে ৭ টাকা। এখানে ১৫ টাকা হইতে ৭ টাকা বাদ দিলে যে ৮ টাকা তাহা হইতেছে আটসের মাংসের দাম। এইভাবে উলের পরিমাণ স্থির ধরিয়া মাংসের প্রান্তিক খরচ বাহির করা যায়।

আরও একটি নীতি অনুসরণ করিয়া সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে দাম নিরূপণ করা যাইতে পারে; তাহা হইতেছে "যে দাম আদায় করা সম্ভবপর" ("What the traffic will bear") নীতি। এই নীতি অনুযায়ী বাজারে যে দাম আদায় করা চলে সেই দামের অনুপাতে খরচের হিসাব করিতে হয়। সংযুক্ত যোগানের জিনিসগুলি বিক্রয় করিবার সময় আমাদের দেখিতে হইবে যে আমাদের যে খরচ হইয়াছে তাহা যেন উঠিয়া আসে। ধরা যাক্, আমরা দশ সের তুলা বিক্রয় করিয়া ২৫ টাকা পাইলাম এবং চার সের তুলাবীজ বিক্রয় করিয়া ৭ টাকা পাইলাম। এই দুইটি জিনিস তৈয়ারী করিতে খরচ হইয়াছিল ১৬ টাকা। এখন এই দুইটি জিনিস বিক্রয় করিয়া আমরা পাইলাম ৩২ টাকা। এক্ষেত্রে বিক্রয়লব্ধ অর্থ মোট খরচ অপেক্ষা বেশী। সুতরাং আমরা ইচ্ছা করিলে আরও তুলা ও তুলাবীজ উৎপাদন করিতে পারি। ইহাতে তুলা এবং তুলাবীজের মোট উৎপাদন খরচ আরও বাড়িয়া যাইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ উৎপাদনের খরচের সমান না হইতেছে ততক্ষণ উৎপাদন বাড়ানো চলে।

আমাদের দেখিতে হইবে, তুলা এবং তুলাবীজের দাম এমন হওয়া চাই যেন দুইটির বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে মোট খরচ উঠিয়া আসে। ইহা ছাড়া, তুলা অথবা তুলাবীজ প্রত্যেকটিরই দাম ইহার প্রান্তিক উপযোগের দ্বারা নিরূপিত হইবে। ইহাই হইতেছে বাজারে "যে দাম আদায় করা সম্ভব" ("What the traffic will bear".) নীতি।

বিকল্পভাবে সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে দাম নিরূপণের প্রশ্নটি নিম্নলিখিত চিত্রের সাহায্যে বুঝান যাইতে পারে। ধরা যাক্, একটি ফার্ম একই সঙ্গে X এবং Y দুইটি জিনিস উৎপাদন করিতেছে। যখন একটি ফার্ম একই সঙ্গে দুইটি জিনিস উৎপাদন করে তখন তাহার আচরণ কিরূপ হইবে তাহাই পরবর্তী পৃষ্ঠার ৬৪নং চিত্রে দেখানো হইয়াছে। ফার্ম তাহার মোট খরচ কত তাহা জানে, এবং মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ (Total Reveune) কত হইবে তাহাও জানে। ফার্ম কখন কত ইউনিট X অথবা

কত ইউনিট Y বিক্রয় করিবে তাহা অবস্থার উপর নির্ভর করে ; বাজারে X অথবা Y উভয়েরই দামের পরিবর্তন হইতে পারে। যদি X এবং Y উভয়েরই অনুপাত পরিবর্তনীয় (variable) হয় তবে ফার্মের পক্ষে X এবং Y-এর বিভিন্ন সম্মিলন (combinations) হইতে সর্বনিম্ন খরচ হয় এই প্রকার সম্মেলন নিরূপণ করা কঠিন হয় না। পার্শ্বের চিত্রে C_1, C_2, C_3, C_4 প্রভৃতি হইতেছে X এবং Y-এর বিভিন্ন অনুপাতে উৎপাদন করিবার সম্ভাব্য খরচের ভিত্তিতে অঙ্কিত ব্যয় রেখা, এই রেখার উপরে X এবং Y-এর যে সম্মিলনগুলি (combinations) আছে, সেইগুলি অনুযায়ী উৎপাদন করিলে খরচের পরিমাণ একই থাকে। Ra, Rb, Rc, Rd, প্রভৃতি রেখাগুলি X এবং Y-এর বিভিন্ন সম্মিলন বিক্রয় করা হইলে তাহা হইতে যে বিক্রয়লব্ধ অর্থ পাওয়া যাইবে তাহা সূচিত করে। অর্থশাস্ত্রের ভাষায় C_1, C_2, C_3, C_4 প্রভৃতি রেখাগুলিকে Cost Contour এবং Ra, Rb, Rc, Rd প্রভৃতি রেখাগুলিকে Revenue Contour বলা হয়। ব্যয় রেখাগুলিকে মূল বিন্দুর প্রতি concave আকৃতি করার কারণ হইতেছে এই যে X-এর অনুপাতে Y অথবা Y-এর অনুপাতে X ক্রমাগত বাড়াইতে থাকিলে খরচের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। E_1, E_2, E_3 E_4 প্রভৃতি বিন্দুগুলি হইতেছে বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যয় রেখা এবং আয় রেখার বিভিন্ন স্পর্শক বিন্দু (points of tangency). O—E_1, E_2, E_3, E_4 রেখাটি ফার্মের বিক্রয় পরিকল্পনা (Sales Plan) সূচিত করে। যদি X-এর অনুপাতে Y-এর দাম বাড়ে, তবে আয় রেখাগুলি এখন যতটা খাড়া অবস্থায় (steeply) বাড়িতেছে, ততটা খাড়া অবস্থায় বাড়িবে না। অর্থাৎ ফার্মের বিক্রয় পরিকল্পনা সূচিত করে যে এই রেখা আরও বাম দিক দিয়া যাইবে। উপরের চিত্রে তাহা বুঝানো হইয়াছে।
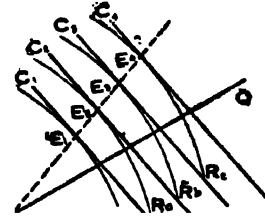
চিত্র নং ৬৪

রেল মাশুল নিরূপণ (Determination of Railway Rates) : রেলভাড়া কিভাবে নির্ণীত হইবে তাহা লইয়া অধ্যাপক পিগু (Prof. Pigou) এবং অধ্যাপক টাউসিগের (Prof. Taussig) মধ্যে গুরুতর মতভেদ আছে। অধ্যাপক টাউসিগের মতে রেল পরিবহণ হইতেছে সংযুক্ত যোগানের অন্তর্গত। কারণ, রেল পরিবহণের মোট খরচের একটি মোট অংশ স্থির থাকে। রেল লাইনের উপর দিয়া এক্সপ্রেস গাড়ী, প্যাসেঞ্জার গাড়ী অথবা মালগাড়ী, যে কোন গাড়ীই যাক্ না কেন, রেল লাইন খুলিবার এবং ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবার খরচ একই হয়। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন যাত্রীকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইতে হইলে এবং বিভিন্ন জিনিসপত্র একস্থান হইতে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত করিতে হইলে যে খরচ হয় তাহা পৃথক করা যায় না। সুতরাং রেল পরিবহণ ব্যবস্থা সংযুক্ত যোগানেরই অংশ।

কিন্তু অধ্যাপক পিগুর মতে রেল পরিবহণ সংযুক্ত যোগানের অংশ নয়। গন্তব্য স্থানে গাড়ী পৌঁছিবার পর ইহাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে, শুধু এই একটি মাত্র ক্ষেত্র ছাড়া অধ্যাপক পিগুর মতে রেল পরিবহণকে সংযুক্ত যোগানের অংশ বলা যায় না। যাত্রী বহনের জন্য রেল কর্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থা করেন, মালবহণের পক্ষে সেই ব্যবস্থা অনুকূল নাও হইতে পারে। যখন একটি জিনিসের উৎপাদন অপর একটি জিনিসের উৎপাদনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, শুধু তখনই সংযুক্ত যোগান দেখা যায়। রেল পরিবহণের ক্ষেত্রে এই প্রকার সংযুক্ত যোগান দেখা যায় না। অধ্যাপক পিগুর মতে রেল মাশুল নির্ধারণের ক্ষেত্রে একচেটিয়া বাজারে যেমন দামের তারতম্য (Price discrimination) দেখা যায় সেই প্রকার দাম-তারতম্য দেখা যায়। রেল পরিবহণের কর্তৃপক্ষ জানেন যে বিভিন্ন যাত্রীদের রেল-ভ্রমণের সুবিধার জন্য চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন। রেল কর্তৃপক্ষ সেইজন্য বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন মাশুল ধার্য করেন। কারণ, রেল কর্তৃপক্ষ জানেন যে বিভিন্ন যাত্রী তাহাদের চাহিদার তীব্রতা অনুযায়ী প্রথম, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শ্রেণীর মাশুল দিবে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, যে রেল মাশুল কিভাবে নিরূপিত হয়। এক্ষেত্রে সাধারণতঃ দুইটি নীতি অনুসৃত হয়; যথা, রেল চলাচলের খরচনীতি (Cost of Service Principle) এবং পরিবহণের মূল নীতি (Value of Service Principle)।

রেল চলাচলের খরচ নীতি অনুযায়ী একস্থান হইতে অন্য স্থানে একটি মাল লইয়া যাইতে যে খরচ হয় সেই খরচের ভিত্তির উপর ইহার মাশুল নিরূপিত হয়। অবশ্য কতিপয় বিশেষ জিনিস লইয়া যাইবার সময় (যে সমস্ত জিনিসের জন্য বিশেষ যত্ন নিতে হয়, যেমন, কাঁচ অথবা ঔষধ) রেল কর্তৃপক্ষ পরিবহণ খরচের উপরেও কিছু মাশুল ধার্য করিয়া থাকেন। দশ মণ কয়লা লইতে যে খরচ, সেই খরচে বহু টাকার ঔষধ লইয়া যাওয়া যায়। সুতরাং রেল কর্তৃপক্ষ এই নিয়ম অনুযায়ী সব সময়ে ভাড়া ধার্য করিতে পারে না।

দ্বিতীয় নীতিটি হইতেছে পরিবহণের মূল্যনীতি। এই নীতি অনুযায়ী রেল কর্তৃপক্ষ বেশী মূল্যের জিনিসের উপর বেশী মাশুল এবং কম মূল্যের জিনিসের উপর কম মাশুল ধার্য করেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা হইতেছে "যে রকম দাম আদায় করা সম্ভব" নীতি ("What the traffic will bear")। মাল প্রেরকের চাহিদার তীব্রতা অনুযায়ী রেল কর্তৃপক্ষ মাশুল ধার্য করিয়া থাকে এবং সেই মাশুল প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়।

Exercise

1. State briefly the relation between Prices of (a) Competing Goods (b) Prices of Joint Cost Goods and (c) Prices of Complementary Goods.

[(ক) প্রতিযোগী সামগ্রী, (খ) সংযুক্ত-খরচ সামগ্রী এবং (গ) সহযোগী সামগ্রীর দামের মধ্যে সম্পর্ক সংক্ষেপে বর্ণনা কর।] (১৭০-৭২ পৃষ্ঠা)

2. Show how prices of goods are determined under conditions of Joint Demand and Joint Supply. [সংযুক্ত চাহিদা ও সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে জিনিসপত্রের দাম কি ভাবে নিরুপিত হয় দেখাও ।] (১৭১-১৭২ পৃষ্ঠা ; ১৭৩-১৭৫ পৃষ্ঠা)

3. How are the prices of Joint Products determined in a Perfectly Competitive Market ? [পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সংযুক্ত সামগ্রীর দাম কিভাবে নিরূপিত হয় ?] (১৭৩-১৭৫ পৃষ্ঠা)

4. How are Railway Rates determined ? Is Railway an instance of Joint Cost ? [রেলওয়ে হার কিভাবে নিরূপিত হয় ? রেলওয়ে কি সংযুক্ত খরচের একটি উদাহরণ ?] (১৭৫-১৭৬ পৃষ্ঠা)

5. Write notes on : (a) Composite Demand (b) Composite Supply, and (c) "What the traffic will bear" principle.
[টীকা লিখ : (ক) সংমিশ্রিত চাহিদা, (খ) সংমিশ্রিত যোগান, এবং (গ) "যে রকম দাম আদায় করা সম্ভব" নীতি ।] (১৭২-১৭৩ পৃষ্ঠা ; ১৭৩)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ফাটকা ব্যবসায়
(Speculation)

ফাটকা ব্যবসায়ের স্বরূপ (Nature of Speculation) : ফাটকা ব্যবসায় হইতেছে প্রধানতঃ ঝুঁকির ব্যবসায়। ভবিষ্যতে কোন জিনিসের দামের উঠানামা সম্বন্ধে অনুমান করিয়া বর্তমান বেচাকেনা হইতে লাভ অর্জন করাকে ফাটকা ব্যবসায় বলে।[১] ফাটকা কারবারীর সঙ্গে চালান কারবারীর (arbitragers) পার্থক্য আছে। চালানকারবারীগণ দামের স্থানগত পার্থক্য লইয়া কারবার করে এবং বর্তমান দাম লইয়াই মাথা ঘামায় ; ফাটকা কারবারীর ন্যায় ভবিষ্যতের দাম লইয়া তাহারা মাথা ঘামায় না। অবশ্য ফাটকা কারবারীও অনেক সময় "চালান কারবারী" (arbitrager) হিসাবে কাজ করে। যদি সে বর্তমান হইতে ভবিষ্যতে মাল চালান দেয় তবে তাহাকে "চালান কারবারী" বলা যায়। তবে এই ধরণের চালান কারবারকে সময়ের মধ্য দিয়া চালান কারবার (arbitrage through time) অথবা ভবিষ্যৎ লইয়া কারবার (dealings in futures) বলিয়া বর্ণনা করা যায়। যদি ফাটকা কারবারী কোন জিনিসের বর্তমান বাজার দামের ভিত্তিতে এই ধারণা করে যে ভবিষ্যতে ইহার দাম বাড়িবে, তবে ভবিষ্যতের লাভের আশায় এখন হইতে সে ইহা কিনিতে আরম্ভ

ফাটকা ব্যবসায় কাহাকে বলে

১। Seligman বলেন, "By speculation is meant the purchase or sale of anything in the hope of profit from anticipated change in its price."

করিবে। আবার যদি ফাটকা ব্যবসায়ী এই ধারণা করে যে ভবিষ্যতে দাম কমিবে, তবে সে এখনই জিনিসটি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিবে ; উভয় ক্ষেত্রে তাহাকে একটি ঝুঁকি গ্রহণ করিতে হয়। যদি তাহার অনুমান সত্য হয় তবে সে অধিক লাভ করিতে সমর্থ হইবে। এইজন্যই বলা হয় ফাটকা ব্যবসায় মূলতঃ ঝুঁকির ব্যবসায়। যদি ফাটকা কারবারী বুঝিতে পারে ভবিষ্যতে কোন জিনিসের দাম বাড়িবে, তবে সে এখনই একজন উদ্যোক্তা বা কোন ফার্মের সঙ্গে এমন একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইবে যে ভবিষ্যতে উদ্যোক্তা বা কোন ফার্ম সংশ্লিষ্ট জিনিসটি বর্তমানের দামে সরবরাহ করিবে। আবার, যদি ফাটকা ব্যবসায়ী মনে করে যে ভবিষ্যতে দাম কমিবে, তবে সে এখনই একজন উদ্যোক্তা বা একটি ফার্মের সহিত এমন একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইবে যে ভবিষ্যতের দামে সেই উদ্যোক্তা অথবা ফার্ম ফাটকা ব্যবসায়ীকে সংশ্লিষ্ট জিনিসটি সরবরাহ করিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ফাটকা ব্যবসায় মূলতঃ একটি ঝুঁকির ব্যবসায়। ফাটকা কারবারী এই ঝুঁকি বহন করিতে যত দক্ষ হইবে, ততই তাহার ফাটকা ব্যবসায় লাভপ্রদ হইবে। উদ্যোক্তাগণও তখন আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় আত্মনিয়োগ করে।

ইহা মূলতঃ ঝুঁকির ব্যবসায়

ফাটকা ব্যবসায় (Speculation) এবং জুয়াখেলা (Gambling), উভয়ই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কতিপয় ধারণার ভিত্তিতে চালিত হয়, কিন্তু জুয়াখেলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে ধারণা করা হয়, তাহার কোন অর্থনৈতিক কার্যক্রম (economic programme) নাই অথবা ইহা উৎপাদন ব্যবস্থার সহিত জড়িত নয়। কিন্তু ফাটকা ব্যবসায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার একটি অর্থনৈতিক দিক আছে এবং তাহা দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার সহিত বিশেষভাবে জড়িত। জুয়াখেলাকে বে-আইনী ফাটকা-ব্যবসায় (illegitimate speculation) বলিয়া গণ্য করা হয়। জুয়াখেলা কখনই অর্থনৈতিক কাজ নহে। ইহা শুধু নীতি বিগর্হিতই নহে, ইহা অর্থনৈতিক তত্ত্বের দিক হইতেও অসমর্থনীয়। জুয়াখেলার ফলে আয়ের অসাম্য ও অনিশ্চয়তা বাড়িয়া যায়। জুয়া কখনও বাজার দামের উপর প্রতিক্রিয়া করে না; কিন্তু প্রকৃত ফাটকা কারবার বাজার দামের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

ফাটকা ব্যবসায় ও জুয়াখেলার মধ্যে পার্থক্য

ফাটকা ব্যবসায় কতিপয় শর্তের উপর নির্ভর করে। প্রথমত, যে জিনিসটি লইয়া ফাটকা ব্যবসায় করা হয়, তাহার চাহিদা ব্যাপক হওয়া চাই। দ্বিতীয়ত, যে জিনিসটি লইয়া ফাটকা ব্যবসায় চলে তাহার গুণগত শ্রেণীবিভাগ হওয়া চাই। তৃতীয়ত, জিনিসটি এমন হওয়া চাই যাহা সহজেই চেনা যায় (cognisable) এবং সহজেই মাপা যায় (measurable)। চতুর্থত, জিনিসটির যোগান যত অনিশ্চিত হইবে, ততই ফাটকা ব্যবসার সক্রিয় হইবে।

ফাটকা ব্যবসায়ের শর্ত

শেয়ার বাজারের (share market or stock exchange) সহিত ফাটকা বাজারের কোন তফাৎ নেই। শেয়ার বাজারে শেয়ারের দাম ভবিষ্যতে কত উঠানামা করিবে ইহার ভিত্তিতে শেয়ার বাজারে যাহারা মূল শেয়ার কেনাবেচা করে তাহাদের Jobbers বলা হয়। তাহাদের কাজে সহায়তা করে দালালগণ (brokers)। যদি ফাটকা কারবারী ধারণা করে যে ভবিষ্যতে কোন জিনিসের দাম কমিবে তবে সে বর্তমানের বেশী দামে ভবিষ্যতে জিনিসটি বিক্রয় করিবার জন্য উদ্যোক্তা অথবা ফার্মের সঙ্গে চুক্তি করিবে এবং যদি তাহার অনুমান বাস্তবে রূপায়িত হয় তবে ভবিষ্যতে সে কম দামে জিনিসটি ক্রয় করিয়া বর্তমানের চুক্তি অনুযায়ী বেশী দামে বিক্রয় করিবে।

শেয়ার বাজার ও ফাটকা বাজার

ইহাকে বলা হয় "selling short"-আবার আমরা অন্য ধরণের ফাটকা কারবার দেখিতে পাই,—ইহাকে বলা হয় "buying long"-এই নিয়ম অনুযায়ী ফাটকা কারবারী যদি মনে করে যে ভবিষ্যতে দাম বাড়িবে তবে সে উদ্যোক্তা অথবা ফার্মের সঙ্গে বর্তমানের কম দামে ভবিষ্যতে জিনিষটি ক্রয় করিবার চুক্তি করিবে এবং যদি ভবিষ্যতে তাহার অনুমান বাস্তবে রূপায়িত হয় তবে সে বর্তমানের চুক্তি অনুযায়ী কম দামে জিনিস ক্রয় করিয়া বেশী দামে ইহা বিক্রয় করিবে এবং লাভ করিবে।

"selling short" এবং buying long"

অনেক সময় দেখা যায়, ফাটকা কারবারী ভবিষ্যতে লোকসানের সম্ভাবনা এড়াইবার জন্য একটি ঝুঁকির দ্বারা অন্য একটি ঝুঁকি হইতে নিজেকে রক্ষা করে। অর্থাৎ যদি সে কোন উদ্যোক্তার সঙ্গে "selling short" নীতি অনুসরণ করিয়া কোন চুক্তি করে তবে যাহাতে ভবিষ্যতে লোকসানগ্রস্ত না হইতে হয় সেইজন্য সে আরও একজন উদ্যোক্তার সঙ্গে "buying long" নীতি অনুসরণ করিয়া একটি অগ্রিম চুক্তি করিয়া রাখে। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় "Covering" অথবা "Hedging."

আরও এক ধরণের ফাটকা কারবার দেখা যায়, ইহাকে ভাবী ফাটকা কারবার অথবা Future Market বলা হয়। অনেক সময় ফাটকা কারবারে দেখা যায়, দীর্ঘ সময় অন্তর বিক্রেতা ক্রেতার নিকট মাল হস্তান্তরিত করিবার চুক্তি করে। ইহাতে যে দামে মাল হস্তান্তরিত করার কথা তাহার সহিত যে দিনটিতে মাল প্রকৃতপক্ষে হস্তান্তরিত হয় সেই দিনটিতে সেই মালের বাজারদামের পার্থক্য লইয়া দেনাপাওনার হিসাব-নিকাশ হয়। তখন ইহাকে ভাবী ফাটকা কারবার বা Future Market বলা হয়।

সাধারণতঃ ফাটকা কারবারের দুইটি রূপ দেখা যায়, যথা—(১) তেজী কারবার এবং (২) মন্দা কারবার। তেজী ফাটকা কারবারীগণ দাম বৃদ্ধির অনুমান করে এবং দাম বাড়াইবার চেষ্টা করে। তাহাদের "Bulls" বলা হয়। মন্দা ফাটকা কারবারীগণ দাম হ্রাসের অনুমান করে এবং দাম কমাইবার চেষ্টা করে; তাহাদের "Bears" বলা হয়।

ফাটকা কারবারের প্রয়োজনীয়তা বা উপকার (Necessity or Benefits of Speculation) : ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে ফাটকা কারবারের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে, তাহা ফাটকা কারবারের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলেই প্রতীয়মান হয়। ফাটকা কারবারের প্রধান উপকারিতা হইতেছে এই যে উহাতে উৎপাদন ব্যবস্থার ঝুঁকি ফাটকা কারবারী অধিক পরিমাণে বহন করে বলিয়া উদ্যোক্তা অথবা ফার্মের ঝুঁকি অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। ইহাতে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা অথবা ফার্ম অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে উৎপাদনের কাজে মনোনিবেশ করিতে পারে। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদিত জিনিস বিক্রয়ের সমস্যা এবং উৎপাদন কাজ চালাইবার জন্য উপকরণ এবং কাঁচামাল সংগ্রহ করার ব্যাপারে যে ঝুঁকি থাকে, তাহার অধিকাংশ কাজ বহন করে ফাটকা কারবারী, সেইজন্য ব্যবসায়ের স্বার্থে অনেক ক্ষেত্রে ফাটকা কারবার প্রয়োজন হয়।

উদ্যোক্তার ঝুঁকি কমিয়া যায়

দ্বিতীয়ত, সুষ্ঠুভাবে ফাটকা কারবার চলিতে থাকিলে এবং ফাটকা কারবারী ঝুঁকি বহনের কাজে দক্ষ ও অভিজ্ঞ থাকিলে দামের উঠানামা অনেক পরিমাণে বন্ধ হইয়া যায় এবং চাহিদা ও যোগানের সমতা আসে। ধরা যাক্ কোন ফাটকা কারবারী মনে করিল যে ভবিষ্যতে জিনিসটির দাম কমিয়া যাইবে, তবে সে এখনই জিনিসটি বেশী করিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিবে; ফলে এখনই জিনিসটির যোগান বাড়িয়া যাইবে এবং দাম কমিতে আরম্ভ করিবে। সুতরাং যদি কোন জিনিসের চাহিদার তুলনায় যোগানের স্বল্পতার দরুণ এখন দাম বাড়িয়া যায়, তবে ভবিষ্যতে দাম কমিতে পারে—ফাটকা কারবারীর এই ধারণা এখনই তাহার যোগান বাড়াইয়া দিতে পারে এবং দাম কমাইয়া দিতে পারে। আবার যদি এখন চাহিদার তুলনায় যোগানের প্রাচুর্য থাকায় দাম কমিয়া যায় তবে সুষ্ঠু ফাটকা কারবার হইলে এখনই যোগান কমাইয়া দাম কিছু বাড়াইয়া দেওয়া হয়। যদি ফাটকা কারবারী মনে করে যে ভবিষ্যতে দাম বাড়িবে তবে সে হয়ত এখন হইতেই জিনিস কিনিয়া ভবিষ্যতে বিক্রয় করিবার জন্য মজুত করিয়া রাখিবে। ইহাতে এখনই চাহিদা কিছু বাড়িবে এবং যোগান কিছু কমিবে। এইভাবে চাহিদা ও যোগানের সমতা আসিবে। বাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্যও কোন কোন ক্ষেত্রে ফাটকা কারবারের প্রয়োজন আছে।

ফাটকা কারবার চাহিদার ও যোগানের সমতা আনয়ন করার সহায়ক

তৃতীয়ত, শেয়ার বাজারে ফাটকা কারবারের দরুণ শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং মূলধন সৃষ্টির কাজ ভালভাবে সম্পাদিত হয়। বিনিয়োগকারীগণ শেয়ার বাজারে ফাটকা কারবার দেখিয়া কোন বিশেষ ক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগ করা লাভজনক হইবে কিনা তাহা বুঝিতে পারে। ইহাতে দেশের শিল্পোন্নয়নের কাজ অব্যাহত থাকে, কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হয় এবং ব্যবসায়ীগণও লাভবান হয়। ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পক্ষে ইহার গুরুত্ব খুবই বেশী।

চতুর্থত, শেয়ার বাজারে যখন খুশী তখনই শেয়ার বেচাকেনা সম্ভবপর হয় বলিয়া মূলধনের ক্রয়শক্তি সর্বদাই অক্ষুণ্ণ থাকে। বিনিয়োগকারীদের পক্ষে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা। যদি কেহ কখনও বিনিয়োগে টাকা খাটাইতে চায় তবে সে শেয়ার বাজারে তাহার শেয়ারগুলি বিক্রয় করিয়া দিতে পারে।

ফাটকা কারবারের কুফল (Evils of Speculation): ফাটকা কারবারী যদি দূরদর্শী এবং সৎ না হয়, যদি সে বাজার সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে এবং অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়া ফাটকা কারবার চালাইতে থাকে, তবে ইহা সমাজের পক্ষে অমঙ্গলজনক হয়। আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে আমরা আক্রমণাত্মক (aggressive) অথবা একচেটিয়ামূলক ফাটকা ব্যবসায় (monopolistic speculation) দেখিতে পাই। কোন কোন ফাটকা কারবারী বাজারে একাধিপত্য অর্জন করিয়া নিজেদের প্রভাব খাটাইয়া শেয়ারের দামকে প্রভাবিত করে। ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে শেয়ারের দামের উঠানামা বন্ধ হয় না; বরং ইহাদের উঠানামার তীব্রতা আরও বাড়িয়া যায়। যে সমস্ত ফাটকা কারবারী বাজার সম্পর্কে অজ্ঞ, তাহাদের দূরদর্শিতার অভাবেও শেয়ারের দামের উঠানামার তীব্রতা বাড়িয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, ফাটকা কারবারীগণ অনেক ক্ষেত্রে অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে। কোন কোন সময়ে তাহারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে বাজারে এমন গুজব রটাইয়া দেয় যে অদূর ভবিষ্যতে শেয়ারের দাম কমিবে। জনসাধারণ তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া যখন শেয়ার বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে, তখন শেয়ারের যোগান বাড়িয়া যাওয়ায় ফাটকা কারবারী সস্তা দামে সেইগুলি গোপনে কিনিয়া লয়। এইভাবে ফাটকা কারবারী শেয়ারগুলির উপর একচেটিয়ামূলক আধিপত্য অর্জন করে এবং কিছুদিন বাদে নিজেরই নিরূপিত বেশী দামে সেইগুলি বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভবান হয়। অনেক সময় বড় বড় কোম্পানীর নামে দুর্নাম ছড়াইয়া তাহারা জনগণকে সেই কোম্পানীর শেয়ারগুলি সস্তা দামে বিক্রয় করিতে বাধ্য করে, এবং গোপনে নিজেরাই সেই শেয়ারগুলি কিনিয়া লয় যাহাতে ভবিষ্যতে বেশী দামে সেইগুলি বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভবান হওয়া যায়।

ফাটকা কারবারীগণের এই ধরণের কাজ বাজারের চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য (equilibrium) নষ্ট করে। তাহা ছাড়া, এই ধরণের কাজ মূলধন বিনিয়োগের কাজ ব্যাহত করে। বিশেষতঃ, অনুন্নত দেশগুলির মূলধন সৃষ্টির পক্ষে এই ধরণের ফাটকা কারবার অত্যন্ত অহিতকর।

লর্ড কেইনসের মতে স্থির নদীর উপর বুদ্‌বুদ্ যেমন কোন ক্ষতি করে না, ফাটকা কারবারও এমনিতে বিনিয়োগের বিশেষ ক্ষতি করে না। কিন্তু অবস্থাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয় যখন বিনিয়োগ শুধু ফাটকা কারবারকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠে। যদি দেশের মূলধন গঠনের কাজ ফাটকা কারবারেরই পরিণতি হয়, অর্থাৎ যদি ইহা

ফাটকা ব্যবসায়কে কেন্দ্র করিয়াই উঠানামা করিতে থাকে, তবে ইহা সমাজের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হয়।[১]

ষ্টক এক্সচেঞ্জ বা শেয়ার মার্কেট (Stock Exchange or Share Market) : যে বাজারে বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়, সেই বাজারকে শেয়ার মার্কেট বা ষ্টক এক্সচেঞ্জ বলা হয়। এই বাজারে যাহারা ফাটকা কারবার করে, তাহাদের বলা হয় Jobbers এবং Jobbers ও জনগণের মধ্যে যাহারা যোগাযোগ স্থাপন করে, তাহাদের বলা হয় দালাল (brokers)। বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা কতখানি, তাহা বিবেচনা করিয়া ফাটকা কারবারীগণ সেই সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে। যে সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ (dividend) বেশী, সাধারণতঃ, সেই সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শেয়ার ফাটকা কারবারীগণ কিনিয়া ফেলে। যদি কখনও দেখা যায় যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর লাভের সম্ভাবনা খুব কম, তবে তাহারা সেই কোম্পানীর শেয়ারগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলে। ষ্টক এক্সচেঞ্জের কাজ কতটা সুশৃংখল ভাবে সম্পন্ন হইবে তাহা ফাটকা কারবারীগণের দূরদর্শিতার উপর নির্ভর করে।

ষ্টক এক্সচেঞ্জের কাজ (Functions of the Stock Exchange) : দেশের অর্থনৈতিক জীবনে ষ্টক এক্সচেঞ্জ সহজে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রথমত, ষ্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা সম্ভবপর হয় বলিয়া মূলধনের নগদ ক্রয়শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে এবং জনসাধারণও শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধা থাকায় মূলধন বিনিয়োগে উৎসাহিত হয়। তাহা না হইলে জনসাধারণ অনিশ্চিত-কালের জন্য তাহাদের মূলধন কোন শিল্পের শেয়ার ক্রয় করিয়া আটকাইয়া রাখিতে সাহসী হইত না।

দ্বিতীয়ত, ষ্টক এক্সচেঞ্জের কাজকর্মের ফলে মূলধনের বিনিয়োগের সময় বিনিয়োগ-কারীগণ জানিতে পারে কোন্ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ অবস্থা কিরূপ অথবা কোন্ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ করিলে তাহা লাভজনক হইবে।

তৃতীয়ত, ষ্টক এক্সচেঞ্জ থাকায় শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ উচিত দামে সম্পন্ন হয়। ষ্টক এক্সচেঞ্জ যদি সুষ্ঠুভাবে কাজ করে তবে বিশিষ্ট কোম্পানীগুলির শেয়ারের দাম খুব বিশেষ উঠানামা করে না। যদি ষ্টক এক্সচেঞ্জ না থাকিত, তবে ক্রেতাকে হয়ত বেশী দামে শেয়ার ক্রয় করিতে হইত অথবা বিক্রেতাকেও হয়ত ক্রেতার সুবিধা অনুযায়ী অল্প দামে শেয়ার বিক্রয় করিতে হইত। ষ্টক এক্সচেঞ্জ থাকার ফলে শেয়ারের ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ উচিত দামে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারে।

১। "Speculators may do no harm as bubbles on a steady stream of enterprise. But the position is serious when enterprise becomes the bubble on a whirlpool of speculation. When the capital development of a country becomes the byproduct of the activities of a casino, the job is likely to be ill-done."—Keynes.—(General Theory of Employment, Interest and Money.)

চতুর্থত, ষ্টক এক্সচেঞ্জ থাকার ফলে বড় বড় কোম্পানীগুলির পক্ষে সহজেই শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব। তাহা ছাড়া, ষ্টক এক্সচেঞ্জের কাজকর্ম বিবেচনা করিয়াই কোন্ কোম্পানীর অবস্থা কিরূপ তাহা ধারণা করা যায়।

ষ্টক এক্সচেঞ্জ বন্ধ করা উচিত কিনা?

ষ্টক এক্সচেঞ্জকে বন্ধ করিয়া দিলে দেশের ভাল হইবে এই রকম ধারণা পোষণ করা উচিত নহে। ষ্টক এক্সচেঞ্জের অনেক অর্থনৈতিক কাজ (economic functions) আছে। ইহা দেশের মূলধন বিনিয়োগে বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা অববম্বন করে। সুতরাং ষ্টক এক্সচেঞ্জ বন্ধ করিয়া দিলে সমাজের মঙ্গল হইবে এই রকম গ্যারাণ্টি নাই ; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে ষ্টক এক্সচেঞ্জ বন্ধ করিয়া দিলে অর্থনৈতিক দিক হইতে সমাজের ক্ষতিও হইতে পারে। তবে যদি ষ্টক এক্সচেঞ্জে একচেটিয়া মূলক ফাটকা কারবারের আধিপত্য হয় অথবা যদি ফাটকা কারবারীগণ অদূরদর্শী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অসাধু হয়, তবে ইহা সমাজের পক্ষে হিতকর হয় না এবং সেইক্ষেত্রে ষ্টক এক্সচেঞ্জ বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

কাঁচা মালের ফাটকা কারবার কাহাকে বলে?

আবার কাঁচামালের ফাটকা বাজার (Produce Exchange Market) বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত কিনা সেই বিষয়েও একটি প্রশ্ন উঠে। কাঁচা মালের বাজারে দুই ধরণের ফাটকা কারবারী দেখা যায়। একদল লোক আছে যাহারা কাঁচামাল দিয়া জিনিসপত্র প্রস্তুত করে, এবং অন্য একদল লোক আছে যাহারা কাঁচামালের ফাটকা কারবার করিয়া বিভিন্ন লেনদেনের মাধ্যমে লাভ করিতে চায়। যদি কেহ মনে করে যে ভবিষ্যতে কোন কাঁচামালের দাম বাড়িবে এবং এই আশায় সে এখনই সস্তাদরে কাঁচা মাল কিনিয়া রাখে অথবা, ফাটকা কারবারী উদ্যোক্তাদের সঙ্গে এই রকম চুক্তি করে যে বর্তমানের দরে সে ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট কাঁচা-মালের সরবরাহ পাইবে তাহা হইলে এই ধরণের চুক্তিকে ভবিষ্যৎ চুক্তি (Forward Contracts or Future Market) বলে। যদি বর্তমানে সে অল্প দামে জিনিসটি কিনিয়া রাখিতে পারে অথবা ভবিষ্যতেও অল্প দামে জিনিসটির সরবরাহ পাইয়া ইহা বেশী দামে বিক্রয় করিতে পারে, তবে সে লাভবান হইবে। আবার যদি ভবিষ্যতে জিনিসটি কম দামেই বিক্রয় হয় তবে ফাটকা কারবারীর লোকসান হইবে। এই লোকসানের সম্ভাবনা হইতে মুক্ত থাকার জন্য ফাটকা কারবারী সাধারণতঃ আরও একটি অগ্রিম চুক্তি করিয়া রাখে. এই চুক্তি অনুযায়ী যদি ভবিষ্যতে দাম না বাড়ে অথবা দাম কমিয়া যায়, তবে সে বর্তমানের দামেই জিনিসগুলি উদ্যোক্তার কাছে বিক্রয় করিবে। এই ধরণের দুইটি চুক্তি যুগপৎ সম্পাদিত হইলে আমরা ইহাকে Hegding Operations বলি। একটি চুক্তি দ্বারা সে কাঁচামাল ক্রয় করে এবং অপর চুক্তির সাহায্যে সে উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় করে। এইভাবে কাঁচামালের ফাটকা কারবার যদি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয় তবে ব্যবসায়ে ঝুঁকির (risk) সম্ভাবনা অনেক সময়েই কমিয়া যায়।

সুতরাং কাঁচামালের ফাটকা কারবার বন্ধ করিয়া দিলে দেশের মঙ্গল হইবে এই যুক্তি সব সময়ে খাটে না। তবে যদি কাঁচামালের ফাটকা কারবারের জন্য অথবা কাঁচামাল ব্যবসায়ীগণ ও মুনাফাখোরগণ আটকাইয়া রাখে এবং ইহাতে বাজারে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের কৃত্রিম দুষ্প্রাপ্যতা (artificial scarcity) হয়, তবে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যায় এবং সেইক্ষেত্রে দরকার বিশেষে কাঁচামালের ফাটকা কারবার বন্ধ করিয়া দিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

ফাটকা কারবারের নিয়ন্ত্রণ (Control of Speculation): বৈধ ভাবে যে ফাটকা কারবার বাজারে চলে তাহা নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন হয় না। তাহা ছাড়া, এই ধরণের ফাটকা কারবার মূলধন বিনিয়োগের পক্ষে সহায়ক। কিন্তু যদি ফাটকা কারবার অবৈধভাবে চালিত হয়, তবে সমাজের কল্যাণের জন্যই ইহার নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক।

আইনের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ

সাধারণতঃ আইনের সাহায্যে অবৈধ ফাটকা কারবার নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আইনেরও ফাঁক আছে। সুতরাং, শুধু আইন প্রণয়ন করিয়া অবৈধ ফাটকা কারবার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। অবৈধ ফাটকা কারবার বন্ধ করিবার আর একটি উপায় হইল ইহার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা।

অধ্যাপক লার্ণারের অভিমত

অধ্যাপক লার্ণারের (Prof. Lerner) মতে অবৈধ ফাটকা কারবার বন্ধ করিবার জন্য রাষ্ট্রের পাল্টা ফাটকা কারবারের (counter speculation) ব্যবস্থা করিয়া উহার প্রতিবিধান করা উচিত।

Exercise

1. Describe the nature and necessity of Speculation in a modern community. [আধুনিক সমাজে ফাটকা কারবারের স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।] (১৭৭-১৮১ পৃষ্ঠা)

2. Carefully explain the possible beneficial and harmful effects of Speculation. (ফাটকা কারবারের সম্ভাব্য সুফল এবং কুফল সতর্কতার সহিত ব্যাখ্যা কর।) (১৭৭-১৮২ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the functions of Stock Exchange indicating, in particular, how they promote the investment of capital. (স্টক একচেঞ্জের ক্রিয়াকলাপ, বিশেষত, ইহারা কিভাবে মূলধনের বিনিয়োগ বাড়াইয়া দেয় তাহা দেখাইয়া আলোচনা কর।) (১২৮-১৮৪ পৃষ্ঠা)

4. Do you think that it will be beneficial if the Stock Exchange and Produce Exchange are closed down. (তুমি কি মনে কর যে স্টক এক্সচেঞ্জ এবং কাঁচামালের এক্সচেঞ্জ বাজার তুলিয়া দিলে ভাল হইবে ?) (১৮২-১৮৪ পৃষ্ঠা)

5. How can Speculation be controlled ? (ফাটকা কারবার কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায় ?) (১৮৪ পৃষ্ঠা)

চতুর্দশ অধ্যায় | প্রান্তিক উৎপাদনের বিধি এবং বণ্টন তত্ত্ব

প্রান্তিক উৎপাদনের মাধ্যমে উৎপাদনের উপাদানের দাম নির্ধারিত হওয়ার কারণ এই যে কোন একটি উপাদানের একটি ইউনিট যতটা উৎপাদন করিতেছে তাহার বেশী সেই ইউনিটটি মূল্য হিসাবে দাবি করিতে পারে না। কাজেই প্রতিটি ইউনিটের প্রান্তিক উৎপাদন কত তাহার হিসাব রাখা দরকার। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে উৎপাদনের উপাদানের জন্য যে চাহিদা তাহা প্রত্যক্ষ চাহিদা নহে পরোক্ষ চাহিদা (Derived Demand)। জাতীয় উৎপাদনে প্রত্যেকটি উপাদানের অংশ নির্ণয় করাই বণ্টনতত্ত্বের (Theory of Distribution) মূলকথা। জমির খাজনা, শ্রমিকের মজুরি, মূলধনের সুদ এবং উদ্যোক্তার লাভ ইত্যাদি নিরূপণ করাই হইতেছে বণ্টন তত্ত্বের সমস্যা। যে আয় বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে বণ্টিত হয়, তাহা ব্যক্তিগত আয় নহে, কর্মগত আয় (functional income)। কোন জিনিসের দাম যেমন চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নিরূপিত হয়, কোন উপাদানের দামও সেই প্রকার চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নিরূপিত হয়। কোন জিনিসের দাম যেমন ক্রেতার নিকট সেই জিনিসের প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়, কোন উপকরণ ব্যবহারের দাম সেই উপকরণের প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্যের সমান হয়। ক্রমহ্রাসমান উপযোগের নিয়ম হইতে যেমন আমরা প্রান্তিক উপযোগ সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারি, সেই প্রকার ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম হইতে আমরা কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন কত তাহা বুঝিতে পারি।

ধরা যাক্, কোন একটি উপাদানের জন্য (মনে করি, শ্রমের জন্য) উৎপাদনকারীর চাহিদা বেশী ; কারণ সে মনে করে শ্রমকে উৎপাদনে নিয়োগ করিয়া সে এমন জিনিস প্রস্তুত করিতে পারিবে যাহা বাজারে বিক্রয় করা যাইবে। সুতরাং সংশ্লিষ্ট জিনিসটির জন্য বাজারে প্রত্যক্ষ চাহিদা রহিয়াছে ; তাহা হইতেই উপাদানের জন্য চাহিদার সৃষ্টি হইয়াছে। এ জন্যই বলা হয় যে উৎপাদনের উপাদানের জন্য যে চাহিদা তাহা পরোক্ষ চাহিদা (Derived Demand)। বণ্টনতত্ত্ব এবং প্রান্তিক উৎপাদন বিধি (Marginal Productivity Theory of Distribution)।

প্রান্তিক উৎপাদন বিধির কার্যকলাপ বুঝিতে হইলে কতকগুলি বিশেষ ধারণা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। প্রথমত, মনে করিতে হইবে যে, যে উপাদানটির প্রান্তিক উৎপাদন নির্ণয় করা হইতেছে, সেই উপাদানটি ব্যতীত অন্যান্য সকল উপাদানের পরিমাণ নির্দিষ্ট। দ্বিতীয়ত, উপাদানটিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা সম্ভব। তৃতীয়ত, উৎপাদনের উপাদানের প্রতিটি ইউনিটই সমজাতীয় (Homogeneous)। যদি বিভিন্ন ইউনিটের ভিতর গুণগত প্রভেদ থাকে তাহা হইলে

প্রান্তিক উৎপাদনের কোন তুলনা করা সম্ভব হয় না। চতুর্থত, উৎপাদনের উপাদানের বাজার এবং জিনিসের বাজার, সাধারণতঃ পূর্ণ প্রতিযোগিতা ধরিয়া লওয়া হয়, যদিও প্রান্তিক উৎপাদন তত্ত্বটির জন্য এইরূপ অনুমান করিবার জন্য কোন প্রয়োজন নাই।

কোন একটি ইউনিটকে নিয়োগ করিবার ফলে, অন্যান্য উপাদানের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকিলে মোট উৎপাদনে যে পরিবর্তন হয় তাহাই প্রান্তিক উৎপাদন। উৎপাদনকারী প্রতিটি ইউনিটকে নিয়োগ করিবার পূর্বে তাহার প্রান্তিক উৎপাদন জানিয়া লইবে। নিম্নলিখিত তালিকায় প্রান্তিক উৎপাদন নির্ধারণ করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে 'শ্রম' হইতেছে পরিবর্তনীয় উপাদান, অন্যান্য উপাদানগুলি অপরিবর্তনীয় ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

তালিকা নং ১

শ্রমের ইউনিট	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
০	০	০
১	৩	৩
২	৮	৫
৩	১৫	৭
৪	২৫	১০
৫	৩২	৭
৬	৩৮	৬
৭	৪২	৪

এই তালিকা হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে প্রান্তিক উৎপাদন প্রথম দিকে বাড়িতেছে, কিন্তু পঞ্চম ইউনিট হইতে কমিতেছে। তাহার কারণ, প্রথম দিকে ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের বিধি বলবৎ আছে, কিন্তু শেষের দিকে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের বিধি কার্যকর হইয়াছে। কিন্তু যখন উৎপাদনকারী উপাদান নিয়োগ করিবে তখন এই স্থূল-প্রান্তিক উৎপাদন (Marginal Physical Product বা MPP) লাভ করাই তাহার একমাত্র লক্ষ্য নহে। উৎপাদনকারীর প্রধান লক্ষ্য অধিক উপার্জন করা। সুতরাং প্রান্তিক উৎপাদন বাজারে বিক্রয় করিয়া কত পাওয়া যাইবে তাহার দিকেই উৎপাদনকারীর লক্ষ্য থাকিবে। এই প্রসঙ্গে দুইটি নূতন নামের অবতারণা করা যাইতে পারে। প্রথমটি হইল, প্রান্তিক উৎপাদন বাজারে বিক্রয় করিয়া যাহা পাওয়া যাইবে। ইহাকে প্রান্তিক উৎপাদনের বাজার দাম বা Value of the Marginal Product বা VMP বলা হয়। যদি জিনিসের বাজার দাম হয় P এবং আমরা প্রান্তিক উৎপাদনকে সংক্ষেপে লিখি MP, তাহা হইলে $VMP = P \times MP$। দ্বিতীয়টি হইতেছে, প্রান্তিক উৎপাদন বিক্রয় জনিত লব্ধ অর্থ বা Marginal Revenue Product বা MRP। প্রান্তিক উৎপাদন বাজারে বিক্রয় করিলে মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থে যে পরিবর্তন হয় তাহাই Marginal

Revenue Product। যদি বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বজায় থাকে তাহা হইলে প্রান্তিক উৎপাদনের মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং প্রান্তিক উৎপাদনের দাম সমান হইবে। $P \times MP = MR \times MP$, অতএব বলা যাইতে পারে $VMP = MRP$,। নিম্নলিখিত তালিকার সাহায্যে ইহা বুঝান হইয়াছে।

তালিকা নং ২

উপাদানের ইউনিট	মোট উৎপাদন	দ্রব্যের বাজার দাম	মোট বিক্রয় লব্ধ অর্থ TR	MP	VMP	MRP
০	০	২ টাকা	০	০	০	০
১	৩	”	৬	৩	৬	৬
২	৮	”	১৬	৫	১০	১০
৩	১৬	”	৩২	৮	১৬	১৬
৪	২৩	”	৪৬	৭	১৪	১৪
৫	২৯	”	৫৮	৬	১২	১২
৬	৩৪	”	৬৮	৫	১০	১০
৭	৩৭	”	৭৪	৩	৬	৬

এই তালিকায় দেখা যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত বাজার দাম অপরিবর্তিত, ততক্ষণ পর্যন্ত VMP এবং MRP পরস্পরের সমান। কিন্তু যখনই বাজার দামের পরিবর্তন ঘটিতেছে তখনই VMP এবং MRP-র ভিতর প্রভেদ ঘটিতেছে। যদি আমরা বাজার দামকে অপরিবর্তিত রাখি তাহা হইলে VMP-র অনুসরণে MRP প্রথম দিকে বাড়িবে এবং তাহার পর কমিতে থাকিবে। তাহার কারণ, যেহেতু একটি মাত্র উপাদানকে পরিবর্তিত করিয়া অপর সকল উপাদানকে অপরিবর্তিত রাখা হইয়াছে, অতএব প্রথমদিকে ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদনের বিধি এবং শেষের দিকে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের বিধি কার্যকর হইবে। যেহেতু বাজার দাম অপরিবর্তিত, অতএব VMP এবং MRP প্রথমদিকে বৃদ্ধি পাইয়া পরে হ্রাস পাইবে।

সুতরাং আমরা MRP রেখা এবং প্রান্ত ও গড়ের সম্পর্ক হইতে ARP রেখা অঙ্কন করিতে পারি। উপরের চিত্রে এই দুইটি রেখা অঙ্কিত হইয়াছে। আমরা মনে করি, আলোচ্য উৎপাদনের উপাদানটি হইল শ্রম। অন্যান্য সকল উপাদানের পরিমাণ অপরিবর্তনীয়।
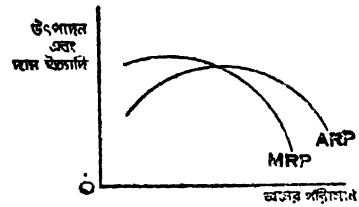
চিত্র নং ৬৮

এখানে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে MRP রেখার ঊর্দ্ধমুখী অংশে ভারসাম্য হইতে পারে না কেন না এই অংশে প্রান্তিক উৎপাদন বাড়িতেছে। এক্ষেত্রে উৎপাদনকারী শ্রমের পরিমাণ বাড়াইয়া লাভবানই হইবে। সুতরাং ভারসাম্য হইতে হইলে MRP

রেখার নিম্নগামী অংশেই হইতে হইবে। সেইজন্য অধিকাংশ রেখাচিত্রেই MRP রেখার বা ARP রেখার নিম্নগামী অংশ দেখান হয়।

যখন উৎপাদনকারী একাধিক উপাদান ক্রয় করে তখন ভারসাম্য অবস্থায় শেষ ইউনিট অর্থ যে কোন উৎপাদনের উপাদানের উপর ব্যয়িত হউক না কেন, তাহা সমান উৎপাদন অর্জন করিবে। মনে করি দুইটি উৎপাদনের উপাদান, শ্রম এবং মূলধন, রহিয়াছে। উহাদের প্রান্তিক উৎপাদন এবং মূল্য যথাক্রমে MP*L*, MPC এবং P.*L*, P.*C* দ্বারা নির্দেশিত হইতেছে। ভারসাম্য অবস্থায় প্রান্তিক উৎপাদন এবং উহার মূল্য সমান। সুতরাং P*L* পরিমাণ উৎপাদন-ব্যয় করিয়া MP*L* পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যায়। ভারসাম্য অবস্থায় ১ ইউনিট শ্রম কিংবা মূলধন যাহার উপরই ব্যয় করা হউক না কেন তাহা হইতে সমান উৎপাদন পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ ভারসাম্য অবস্থায় $\frac{MPL}{PL}=\frac{MPC}{PC}$। যদি দুই-এর অধিক উপাদান থাকে, তাহা হইলেও ঐ একই নীতি প্রয়োগ করা যইতে পারে। এই ভারসাম্য ঘুরাইয়া অন্যভাবেও বলা যাইতে পারে।

MP*L* উৎপাদন পাইবার জন্য ব্যয় হয় P *L*. সুতরাং ১ ইউনিট উৎপাদন পাইবার জন্য ব্যয় হইতেছে $\frac{P.L}{MPL}$। সুতরাং $\frac{P.L}{MPL}$ কে আমরা প্রান্তিক ব্যয় বলিতে পারি। ভারসাম্য অবস্থার প্রান্তিক ব্যয় শ্রম এবং মূলধন উভয়ের ক্ষেত্রেই সমান হইবে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে $MC=\frac{P.L}{MPL}=\frac{P.C}{MPC}$। ক্রেতার ভোগের ক্ষেত্রেও আমরা এইরূপ একটি সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলাম, যাহার নাম আমরা দিয়াছিলাম সম-প্রান্তিক উপযোগিতার নিয়ম (Law of Equi-Marginal Utility)। অনুরূপভাবে উপরের নিয়মকে আমরা সম-প্রান্তিক উৎপাদনের বিধি বলিতে পারি।[১]

১। এখানে উৎপাদকের ভারসাম্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। (বর্তমান বইয়ের ১২৩-২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) ৪১ নং চিত্রে (১২৩ পৃষ্ঠায়) R বিন্দুতে যখন সম-উৎপাদন রেখার সহিত MN রেখা স্পর্শক (tangent) হইয়াছে, এখন সেই বিন্দুতে সম-উৎপাদন রেখার বক্রতা (Slope) হইতেছে $\frac{\text{শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন}}{\text{মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন}}=\frac{MPL}{MPC}$ আবার ৪১ নং চিত্রে MN রেখা অথবা ৪০ নং চিত্রে যে AB বাজেট রেখা অঙ্কন করা হইয়াছে তাহার বক্রতা (Slope) হইতেছে $\frac{\text{শ্রমের দরুণ প্রান্তিক ব্যয়}}{\text{মূলধনের দরুণ প্রান্তিক ব্যয়}}=\frac{P.L.}{P.C.}$ সুতরাং R বিন্দুতে যেখানে বাজেট রেখা সম-উৎপাদন রেখার সহিত স্পর্শক হইয়াছে, সেখানে $\frac{\text{শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন}}{\text{মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন}}=\frac{\text{শ্রমের দরুণ প্রান্তিক ব্যয়}}{\text{মূলধনের দরুণ প্রান্তিক ব্যয়}}$

অথবা, $\frac{MPL}{MPC}=\frac{P.L.}{P.C.}$

প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তির নিয়ম অনুযায়ী উপাদানের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া একটি নির্দিষ্ট উপাদানের পরিমাণ যতই বাড়ানো হইবে, সেই নির্দিষ্ট উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তি ততই কমিয়া আসিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনের দাম ঐ উপাদানের দাম হইতে বেশী থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত উদ্যোক্তা ঐ উপাদানটি বেশী করিয়া নিয়োগ করিবে। যখন ঐ উপাদানটির দাম ইহার প্রান্তিক উৎপাদনের দামের সমান হয়, সেই পর্যায় পর্যন্ত আসিয়া উৎপাদক উপাদানটি আরও নিয়োগ করা বন্ধ করিয়া দিবে। কারণ এই পর্যায়ের পরে উপাদানটিকে আরও নিয়োগ করিলে দেখা যাইবে যে প্রান্তিক উৎপাদন অপেক্ষা উপাদানটির দাম বেশী।

উপাদানের দাম ইহার প্রান্তিক উৎপাদনের দামের সমান

অধ্যাপক মার্শালের প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তির তত্ত্বটি বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা আছে এই ধারণার উপর ভিত্তিশীল। বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে কোন জিনিসের দাম ইহার প্রান্তিক আয়ের (Marginal Revenue) সমান হয়। সুতরাং পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কোন উপাদানের দাম হইবে ইহার প্রান্তিক উৎপাদন বিক্রয় করিয়া যে আয় হয় (Marginal Revenue Productivity) তাহার সমান। যদি প্রান্তিক উৎপাদন বিক্রয় করিয়া উদ্যোক্তার বেশী আয় হয়, তবে সংশ্লিষ্ট উপাদানটির দাম বেশী হয়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার ধারণা

সুতরাং যতক্ষণ বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে ততক্ষণ প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্য (Value of the Marginal Product) প্রান্তিক উৎপাদন বিক্রয় করিয়া যে আয় হয় (Marginal Revenue Product) তাহার সমান। কিন্তু, যখন বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে না অথবা একচেটিয়া কারবারের সৃষ্টি হয়, তখন প্রান্তিক উৎপাদনের দাম প্রান্তিক উৎপাদনের বিক্রয় হইতে যে আয় হয় তাহা অপেক্ষা বেশী থাকে।

এই তত্ত্বটি পূর্ণ প্রতিযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হয় যে প্রত্যেকটি উপাদান ইহার প্রান্তিক উৎপাদন বিক্রয় করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহার হিসাবে পারিশ্রমিক পাইলে মোট উৎপাদনের মূল্য সম্পূর্ণভাবে বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বণ্টিত হইয়া যায় এবং বণ্টনযোগ্য আয় কিছুই থাকে না ("Total product is exhausted")। কিন্তু, এই ধারণাটি পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেই ঠিক হয়। কারণ, পূর্ণ প্রতিযোগিতায় প্রান্তিক উৎপাদন বিক্রয় করিয়া যে আয় হয় তাহাই প্রান্তিক উৎপাদনের দাম। কিন্তু, যদি বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা না থাকে, তবে প্রান্তিক উৎপাদন বিক্রয় করিয়া যে আয় হয় তাহা প্রান্তিক উৎপাদনের প্রকৃত দাম অপেক্ষা কম। সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটি উপাদান ইহার প্রান্তিক উৎপাদনের বিক্রয়জনিত যে আয় হয় তাহার হিসাবে পারিশ্রমিক পাইলেও মোট উৎপাদনের মূল্যের সম্পূর্ণ পরিমাণ সব উপাদানের মধ্যে বণ্টিত হয় না।

পূর্ণ প্রতিযোগিতায় মোট উৎপাদনের মূল্য সম্পূর্ণভাবে বণ্টিত হয়

প্রান্তিক উৎপাদনীশক্তি তত্ত্বটি ধরিয়া লয় যে প্রত্যেক উপাদানেরই সব ইউনিটগুলি একই প্রকৃতির (homogeneous) এবং একটি ইউনিট যে কোন ইউনিটের বদলে নিয়োগ করা চলে। তাহা ছাড়া, এই তত্ত্বের আরও একটি ধারণা হইতেছে এই যে উৎপাদনের জন্য সবগুলি উপকরণ প্রয়োজন হইলেও প্রান্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা একটি উপাদান বেশী করিয়া এবং অন্য একটি উপাদান কম করিয়া ব্যবহার করিতে পারি। সর্বশেষে আমরা বলিতে পারি, এই তত্ত্বটি ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই তত্ত্বের অন্যান্য ধারণা

সমালোচনা: বিভিন্ন অর্থবিজ্ঞানী এই তত্ত্বটির সমালোচনা করিয়াছেন। প্রথমত, এই তত্ত্বটি উপাদানের চাহিদার উপর বেশী গুরুত্ব দেয়, যোগানের উপর বেশী গুরুত্ব দেয় না। অথচ কোন উপাদানের মূল্য নিরূপণ করিতে হইলে চাহিদা এবং যোগান উভয়েরই উপর নির্ভর করিতে হয়। যে উপাদানের উৎপাদনী শক্তি বেশী সেই উপাদানের জন্য উদ্যোক্তার চাহিদা বেশী। কিন্তু কোন উপাদানের যোগান অনেকগুলি কারণের উপর নির্ভর করিতে পারে। এই তত্ত্বে উপাদানের যোগান সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই।

এই তত্ত্বে যোগান সম্পর্কে আলোচনা হয় নাই

দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের জন্য কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনীশক্তি অন্যান্য উপাদানের উৎপাদনী শক্তির উপরেও নির্ভর করে। সুতরাং উপাদানসমূহের প্রান্তিক উৎপাদন শক্তি পৃথক করা যায় না। উৎপাদনের জন্য সবগুলি উপাদানই সমান ভাবে দায়ী। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, একজন শ্রমিকের উৎপাদনী শক্তি কত হইবে তাহা সেই শ্রমিক যে মেসিন অথবা যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজ করে তাহার উপর নির্ভরশীল হইবে। যদি উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণগুলি খুব উৎপাদনক্ষম হয় এবং শ্রমিক নিপুণ না হয়, তবুও শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন অন্যান্য উপাদানগুলির সহযোগে বেশী হইবে। সুতরাং অন্যান্য উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনা শক্তি সম্বন্ধে ধারণা না থাকিলে কোন বিশেষ একটি উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনাশক্তি নিরূপণ করা সম্ভব নহে।

উপাদানসমূহের প্রান্তিক উৎপাদনীশক্তি পরস্পরের সম্পর্কযুক্ত

তৃতীয়ত, মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তি নিরূপণ করা খুব দুঃসাধ্য। কারণ, মূলধন এমনই একটি জিনিস যাহার পিছনে আছে শ্রম এবং সময় ("a product of time and labour")। অর্থাৎ, মূলধনের যেমন বর্তমান মূল্য ও উৎপাদনী শক্তি আছে, ভবিষ্যতেও ইহার একটি মূল্য এবং উৎপাদনী শক্তি আছে। কিন্তু, ভবিষ্যতে মূলধনের উৎপাদনী শক্তি কি প্রকার হইবে, সেই সম্বন্ধে বর্তমানে ধারণা করিয়া লওয়া সহজ নহে।

চতুর্থত, কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তি পরিমাপ করা সম্ভবপর নয়। অনেক সময় দেখা যায়, কোন উপাদানের এক ইউনিট কমাইয়া দিলে উৎপাদন যে অনুপাতে কমিয়া যায়, উপাদান এক উইনিট বাড়াইয়া দিলে উৎপাদন সেই অনুপাতে বাড়ে না। অবশ্য এই যুক্তিটি প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্বটির বিরুদ্ধে যথেষ্ট নয়। কোন উপাদানের ইউনিটগুলি যদি আকারে ছোট হয়, তবে ইহার এক ইউনিট সরাইয়া নিলে অথবা এক ইউনিট বাড়াইয়া দিলে হয়ত উৎপাদন ব্যবস্থা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইবে না। কিন্তু, যদি কোন উপাদান অবিভাজ্য (indivisible) এবং অত্যন্ত বড় হয়, তবে ইহার এক ইউনিট বাড়াইলে অথবা কমাইলে উৎপাদন ব্যবস্থা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়।

পঞ্চমত, এই তত্ত্বে উৎপাদনের উপাদানগুলির বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং কোন উপাদানের সকল ইউনিটগুলিকে একপ্রকার (homogeneous) বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন উপাদানের, যেমন শ্রমের ভিতর বহু শ্রেণী বিভাগ রহিয়াছে, এবং এই শ্রেণীগুলিকে পরস্পরের সহিত তুলনা করা যায় না।

ষষ্ঠত, অনেক ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদনের সাহায্যে উপাদানের দাম নির্ধারিত হয় না। বিশেষ করিয়া শ্রমের ক্ষেত্রে সমাজের অর্থনৈতিক প্রভাব ছাড়া অন্যান্য প্রভাবও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

সপ্তমত, সাধারণতঃ দেখা যায় যেখানেই প্রান্তিক উৎপাদনের বিধি প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেখানেই Constant Returns to Scale এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতা ধরা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবধর্মী তত্ত্ব তৈয়ারী করিবার জন্য এইরূপ অনুমানের কোন সার্থকতা নাই।

উপকরণগুলির যোগান (Supply of Factors) **:** একটি জিনিসের যোগান যেমন উহার উৎপাদন খরচের উপর নির্ভর করে, একটি উপাদানের যোগান সেইরূপ উৎপাদন খরচের উপর নির্ভর করে না। উদাহরণস্বরূপ, শ্রমের যোগানের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রাচীন অর্থবিজ্ঞানীগণ মনে করিতেন যে মজুরি যদি জীবনধারণের জন্য যতটা প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা বেশী হয়, তবে শ্রমিকদের সন্তান সন্ততি বাড়িয়া যাইবে এবং ইহরে ফলে শ্রমিকের যোগান বাড়িয়া যাইবে। আবার জীবনধারণের জন্য যতটা মজুরি প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা মজুরি কম হইলে শ্রমিকদের মৃত্যু সংখ্যা বাড়িবে এবং শ্রমিকের যোগান কমিয়া যাইবে। কিন্তু এই তত্ত্বে শ্রমিকের যোগান সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না।

আবার কোন কোন অর্থবিজ্ঞানী মনে করেন যে উৎপাদনের উপকরণগুলির যোগান উৎপাদনের পিছনে যে কর্মপ্রচেষ্টা, ত্যাগ ও বেদনা (এক কথায় Real cost) থাকে তাহার উপর নির্ভর করে। কিন্তু, এই তত্ত্বটিও ত্রুটিপূর্ণ। কারণ উৎপাদনের উপকরণগুলিকে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, তাহা কোন ত্যাগ বা বেদনার ক্ষতিপূরণ

হিসাবে দেওয়া হয় না ; তাহা দেওয়া হয় সেই উপকরণগুলিকে কাজ করিতে প্রেরণা যোগাইবার জন্য। কোনও উপকরণই ইহার ন্যূনতম দাবি না মিটিলে কাজ করিতে চাহিবে না। সুতরাং যে কোন উপকরণের যোগান দাম (supp'y price) নির্ভর করে উহার বিকল্প কাজের আকর্ষণের (pull of alternatives) উপর। একজন শ্রমিক কোন কাজ করিবার সময় অন্যত্র বিকল্প কাজে যে মজুরি পায় তাহা সেই কাজ না পাইলে কাজ করিতে চাহিবে না। শ্রমিকের যোগান অবশ্য আরও দুইটি উপাদানের উপর নির্ভর করে, সেইগুলি হইতেছে শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান, কর্মদক্ষতা এবং ট্রেড ইউনিয়নের নির্দেশ। মূলধনের যোগান দাম (Supply Price) নির্ভর করে মূলধন ধার করিবার জন্য যে সুদ প্রদান করিতে হয় তাহার উপর এবং জীর্ণ যন্ত্রপাতিগুলির স্থলে নূতন যন্ত্রপাতি বসান অথবা মূলধনের ক্ষয়-ক্ষতি (Depreciation) নিবারণ করিবার জন্য যে খরচ করিতে হয় তাহার উপর। এই ধরণের খরচকে Replacement Cost বলা হয়।

জমির যোগান সমগ্র সমাজের পক্ষে অস্থিতিস্থাপক। কিন্তু একটি বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে জমির যোগান অস্থিতিস্থাপক নয়; কারণ, সেই শিল্পপ্রতিষ্ঠান কোন জমিকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করিতে পারে, কোনও শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছে জমির যোগান ইহার স্থানান্তর খরচের (transfer cost) উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ, কোন জমিতে যদি আমরা একটি বিশেষ জিনিস উৎপাদন করিতে চাই, তবে দেখিতে হইবে, অন্যত্র বিকল্পভাবে জমিটি ব্যবহার করা হইলে জমিটি হইতে আয় কত হইত। যদি বিকল্প আয় হইতে বর্তমান উৎপাদনজনিত আয় বেশী হয়, তবেই জমিটিতে আমরা একটি বিশেষ জিনিস উৎপাদন করিব।

Exercise

1. Critically discuss the assumptions of the Marginal Productivity theory of Distribution, (বন্টনতত্ত্বে প্রান্তিক উৎপাদন বিধির ধারণাগুলির আলোচনা ও সমালোচনা কর।) (১৮৮-১৯২ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the factors which govern the supply of factors.
(উপাদানের যোগান নিয়ন্ত্রণকারী উপাদানগুলি আলোচনা কর।) (১৯১-১৯২ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the Marginal Productivity theory of Distribution and Point out its validity. (বন্টনতত্ত্বে প্রান্তিক উৎপাদন বিধি আলোচনা কর এবং ইহার যৌক্তিকতা দেখাও।) (১৮৫-১৯১ পৃষ্ঠা)

4. Define Marginal Revenue Product distinguishing it from Marginal Physical Product. Show that a firm's profit is not at a maximum unless each factor-price equals its marginal revenue product.
(প্রান্তিক উৎপাদন বিক্রয়জনিত লব্ধ অর্থের সংজ্ঞা প্রদান কর এবং প্রান্তিক উৎপাদনের বাজার-দামের সহিত ইহার পার্থক্য দেখাও। কোন উপাদান-মূল্য যদি ইহার প্রান্তিক উৎপাদন বিক্রয়জনিত লব্ধ অর্থের সমান না হয় তবে কোন ফার্মের মুনাফা যে সর্বাধিক পরিমাণ হয় না তাহা দেখাও। (১৮৫-১৮৯ পৃষ্ঠা)

পঞ্চদশ অধ্যায়

খাজনা
(Rent)

খাজনা তত্ত্ব (Theory of Rent) : সাধারণ অর্থে 'খাজনা' কথাটি আমরা যেভাবে ব্যবহার করি, অর্থশাস্ত্রে 'খাজনা' কথাটি সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। ফ্রান্সের ফিজিওক্র্যাট্‌স্ (Physiocrats) নামে অভিহিত অর্থবিজ্ঞানীগণ মনে করিতেন যে প্রকৃতির বদান্যতার জন্য (liberality of nature) খাজনার সৃষ্টি হয়। রিকার্ডো এই মতবাদের বিরোধিতা করিয়া বলিয়াছিলেন যে প্রকৃতির বদান্যতা নহে, কৃপণতাই (niggardliness of nature) হইল খাজনার প্রকৃত কারণ। রিকার্ডোর (Ricardo) মতে খাজনা হইতেছে জমির আদিম এবং অবিনশ্বর ক্ষমতার মূল্য ("Rent is that portion of the produce of the earth which is paid for the original and indestructible powers of the soil.") কিন্তু এই সংজ্ঞাটি ঠিক সত্য নহে। প্রথমত, 'আদিম ক্ষমতা' কথাটি খুব স্পষ্ট নহে। পতিত জমিতে ভালভাবে জলসেচ এবং সারের ব্যবস্থা করিয়া এবং ভাল ট্র্যাক্টর দিয়া চাষ করিলে স্বভাবতঃই কিছু উৎপাদন হইবে। ইহাকে আমরা 'আদিম ক্ষমতা' বলিতে পারি না। দ্বিতীয়ত, আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে, বিশেষতঃ আণবিক শক্তির যুগে কোন জমিই অবিনশ্বর নহে। একটি হাইড্রোজেন বোমার সাহায্যে জমি নষ্ট করিয়া ফেলা যায়। সুতরাং রিকার্ডো প্রদত্ত সংজ্ঞাটি বর্তমান যুগে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। তবুও আমরা প্রথমে রিকার্ডোর অর্থনৈতিক খাজনা তত্ত্বটি (Theory of Economic Rent) আলোচনা করিব। এই তত্ত্বটি দুই ভাগে আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমে, আমরা দুষ্প্রাপ্যতাজনিত খাজনা (Scarcity Rent) সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ইহার পর আমরা পার্থক্যমূলক খাজনা বা (Differential Rent) সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

দুষ্প্রাপ্যতাজনিত খাজনা (Scarcity Rent) : খাজনা তত্ত্বে জমির দুষ্প্রাপ্যতা একটি বিশেষ ভূমিকা অবলম্বন করে। ধরা যাক গমের জন্য পৃথিবীর বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। যদি তাহা হয়, তবে গমের উৎপাদনে কোন পরিবর্তন হইলে পৃথিবীর বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা আছে বলিয়া দামের কোন পরিবর্তন হইবে না। সুতরাং গমের দাম স্থির আছে ধরিয়া লইয়া উৎপাদনকে অগ্রসর হইতে হইবে। জমির মালিকদের মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকায় কৃষকদের জমির জন্য কোন খাজনা দিতে হইবে না। যেহেতু কৃষকদের খাজনা দিতে হইবে না, সেইজন্য কৃষকগণ তাহাদের খামারের আয়তন বাড়াইতে প্রয়াসী হইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন

জমি হইতে আয় অর্জিত হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত খামারের আয়তন বাড়ানো চলিবে। যখন এমন অবস্থা আসিবে যে বর্ধিত জমি হইতে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যাইতেছে না, তখন কৃষকগণ চাষ করা হইতে বিরত হইবে। অর্থাৎ, যতক্ষণ জমির প্রান্তিক উৎপাদনের নীট বিক্রয়লব্ধ আয় (marginal net revenue product) ইহার দামের বেশী থাকিবে ততক্ষণ কৃষক খামারের আয়তন বাড়াইবে, এবং যখন প্রান্তিক
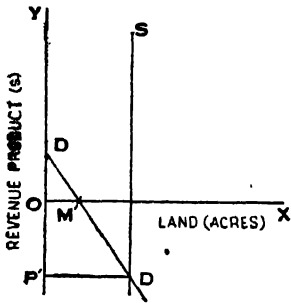
৬৬ নং চিত্র

উৎপাদনের নীট বিক্রয়লব্ধ আয় ইহার দামের সমান হইবে তখন কৃষক খামারের আয়তন বৃদ্ধি করা বন্ধ রাখিবে। তখন কৃষক “extensive margin of cultivation” অথবা চাষের পরিবর্ধিত প্রান্তের উপরে অবস্থিত বলা যায়। ৬৬নং চিত্রে OX হইতেছে জমি এবং DD রেখা হইতেছে চাহিদা রেখা। SD জমিতে উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয়-লব্ধ আয় বুঝাইতেছে। এই চিত্র অনুযায়ী এমন কোন দাম নিরূপিত হইতেছে না যেখানে যোগান চাহিদার সমান হইবে। কৃষক OM' পরিমাণ জমি ব্যবহার করিতেছে এবং কোন খাজনা প্রদান করিতেছে না।

প্রত্যেক কৃষকেরই জমির জন্য চাহিদা থাকে এবং সেই চাহিদা নির্ভর করে জমির প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তির উপর। ৬৭নং ছবিতে OM ' জমিতে চাষ করিবার সময় marginal revenue product কিছুই নাই, এখানে খাজনা হইবে না।
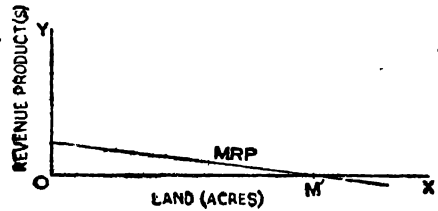
৬৭নং চিত্র

নিম্নের ৬৮নং চিত্রে এই জিনিসটি প্রান্তিক উৎপাদনের বিক্রয়লব্ধ আয় রেখার সাহায্যে বুঝান হইয়াছে। যখন কৃষক OM' পরিমাণ জমি চাষ করিতেছে তখন জমির প্রান্তিক উৎপাদনের বিক্রয়-লব্ধআয় ইহার দামের সমান ; সেই ক্ষেত্রে জমির কোন খাজনা নাই। কিন্তু যদি কৃষক OM" পরিমাণে জমি চাষ করে তবে খাজনা হইতে OP পরিমাণ।
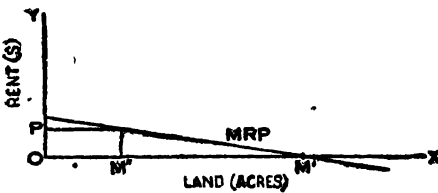
৬৮ নং চিত্র

উপরের বিশ্লেষণ হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে জমির পরিমাণ সীমিত থাকিলে

খাজনা জমির চাহিদার উঠা-নামার সহিত জড়িত থাকে। জমি যখন নির্দিষ্ট তখন যদি জমির জন্য চাহিদা বাড়িয়া যায়, তবে খাজনার পরিমাণও বাড়িয়া যায়। যদি জমির যোগানের স্থিতিস্থাপকতা শূন্য থাকে, তবে খাজনার পরিবর্তন হইলেও চাষের পরিমাণ বাড়ানো যায় না। যদি সব জমি সমান উর্বরা হয়, তবে সব কৃষক সমান খাজনা প্রদান করিবে। তিনটি কারণে খাজনার পরিমাণ বাড়িতে পারে: (১) যদি ফার্মের সংখ্যা বাড়ে এবং ফার্মের উৎপাদিত সামগ্রীর দাম এবং ফার্মের উৎপাদনী শক্তি স্থির থাকে, তবে জমির জন্য চাহিদাবাড়িয়া যাওয়ায় খাজনার পরিমাণ বাড়ে।

(২) যদি ফার্মের উৎপাদিত সামগ্রীর দাম বাড়ে অথচ ফার্মের সংখ্যা এবং ফার্মের প্রান্তিক উৎপাদনের বিক্রয়লব্ধ আয় স্থির থাকে, তবে খাজনার পরিমাণ বাড়ে।

(৩) যদি ফার্মের প্রান্তিক উৎপাদনের বিক্রয়লব্ধ আয় বাড়ে, অথচ ফার্মের সংখ্যা এবং ফার্মের উৎপাদিত সামগ্রীর দাম স্থির থাকে, তবে খাজনার পরিমাণ বাড়ে।

উপরে যে দুষ্প্রাপ্য খাজনা তত্ত্বটি আলোচিত হইল, তাহা দুইটি ধারণার উপর ভিত্তিশীল; যথা, (১) সব জমিই এক ধরণের, অর্থাৎ সমান উর্বরা এবং (২) জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। এখন আমরা দেখিব সব জমির উৎপাদনী শক্তি এক প্রকার না হইলে খাজনার কি অবস্থা হয়।

পার্থক্যমূলক খাজনা (Differential Rent): রিকার্ডোর মতে খাজনা বিভিন্ন জমির উর্বরতার তারতম্যের দরুণ সৃষ্ট হইতে পারে। একই খরচে যদি বিভিন্ন প্রকার জমিতে চাষ করা হয়, তবে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট জমি হইতে বেশী খাজনা পাওয়া যায়; কারণ নিকৃষ্টতর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জমি কিছু উদ্বৃত্ত লাভ করে।

রিকার্ডোর মতে জমির যোগান সর্বদাই সীমাবদ্ধ। শুধু তাহাই নহে, জমিতে শুধু একটি জিনিস উৎপাদিত হয়, এবং ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম (Law of Diminishing Returns) কার্যকর হয়। প্রয়োজনের তুলনায় জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ বলিয়াই খাজনার সৃষ্টি হয়। জমির যোগানের সীমাবদ্ধতা, বিভিন্ন জমির উৎপাদনী শক্তির তারতম্য এবং ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন নিয়মের কার্যকারিতার জন্যই খাজনার সৃষ্টি হয়।

একটি উদাহরণের সাহায্যে ইহা ভালভাবে বুঝান যাইতে পারে। ধরা যাক্, একটি নূতন দেশ আবিষ্কৃত হইল। প্রথমে সেখানকার জনসাধারণ সর্বাপেক্ষা উর্বর জমিগুলিতে অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর জমিগুলিতে কৃষিকাজ আরম্ভ করিবে। জনসংখ্যা ক্রমে যতই বাড়িতে থাকিবে, ততই অপেক্ষাকৃত কম উর্বর জমিগুলিতে অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিগুলিতে কৃষকগণ কৃষিকাজ আরম্ভ করিবে। তারপর জনসংখ্যা যদি আরও বাড়ে, তবে তৃতীয় শ্রেণীর জমিগুলিতেও কৃষিকাজ আরম্ভ হইবে। এইভাবে জনসংখ্যা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর জমিতে কৃষিকাজ চলিতে থাকিলে দেখা যায়, দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি অপেক্ষা প্রথম শ্রেণীর জমিতে এবং তৃতীয় শ্রেণীর জমি অপেক্ষা দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে উৎপাদন বেশী হয়। এই বাড়তি উৎপাদনের মূল্যই

উৎকৃষ্ট জমির মালিকগণ খাজনা বাবদ পাইয়া থাকেন। ধরা যাক, চাষে ৯০ টাকা খরচে প্রথম শ্রেণীর এক বিঘা জমিকে ২০ কুইন্টল পাট হয় এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর এক বিঘা জমিতে ১৫ কুইন্টল পাট হয়। তাহা হইলে প্রথম শ্রেণীর জমিতে কুইন্টল প্রাপ্ত পাটের উৎপাদন খরচ হইতেছে সাড়ে চার টাকা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে কুইন্টল প্রতি পাটের উৎপাদন খরচ হইতেছে ছয় টাকা। বাজারে কুইন্টল প্রতি পাটের দাম অন্ততঃ ছয় টাকা হইবে; কারণ তাহা না হইলে কেহ দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে চাষ করিবে না। বাজার দাম প্রান্তিক বিন্দুতেই (at the point of margin) স্থির হয়। এখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি প্রান্তিক জমি এবং প্রথম শ্রেণীর জমি উপ-প্রান্তিক জমি (intra-marginal land)। দাম প্রান্তিক খরচের সমান হয়, এবং এক্ষেত্রে প্রান্তিক জমির উৎপাদন খরচই প্রান্তিক খরচ। যদি পাটের দাম কুইন্টল প্রতি ছয় টাকা হয়, তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির জন্য জমির মালিক কোন খাজনা পাইবে না। কিন্তু কুইন্টল প্রতি দাম ছয় টাকা হওয়ায় প্রথম শ্রেণীর জমির ২০ কুইন্টল পাট ১২০ টাকায় বিক্রীত হইবে। সেইজন্য প্রথম শ্রেণীর জমির জন্য মালিক ৩০ টাকা (১২০৲ − ৯০৲ = ৩০ টাকা) খাজনা পাইবে। দেখা যাইতেছে, প্রথম শ্রেণীর জমি দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি অপেক্ষা যতটা উৎকৃষ্ট, সেই উৎকৃষ্টতার জন্যই ইহা খাজনা লাভ করে। এইজন্যই বলা হয় খাজনা একটি পার্থক্যমূলক উদ্বৃত্ত ("A differential surplus")। এখানে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জমিটিকেই আমরা বলিতেছি কৃষির প্রান্তিক জমি (Land on the margin of cultivation)। এমনও হইতে পারে, যে জনসংখ্যা বাড়িলে কৃষকগণ একই জমিতে নিবিড়ভাবে কৃষিকাজ (intensive cultivation) করিতে পারে। কিন্তু এই নিবিড় চাষ ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন নিয়মের দ্বারা সীমিত। এই ক্ষেত্রে দেখা যাইবে, প্রথম মাত্রায় যত উৎপাদন হইতেছে, দ্বিতীয় মাত্রায় তত উৎপাদন হইতেছে না। ধরা যাক, প্রথম মাত্রায় প্রদত্ত মূলধনের খরচ হইল ১০ টাকা এবং সেই মাত্রায় জমি হইতে প্রাপ্ত উৎপাদিত সামগ্রীর দাম হইল ২০ টাকা। আবার, দ্বিতীয় মাত্রায় শ্রম ও মূলধনের খরচ যেখানে ১০ টাকা, উৎপাদিত সামগ্রীর দাম সেখানে ১৫ টাকা। সুতরাং প্রথম মাত্রায় কৃষকের উদ্বৃত্ত হইতেছে ১০ টাকা এবং দ্বিতীয় মাত্রায় কৃষকের উদ্বৃত্ত হইতেছে ৫ টাকা। সুতরাং সংশ্লিষ্ট জমিতে দুইটি মাত্রায় উৎপাদন করিলে মোট খাজনার পরিমাণ হইবে ১৫ টাকা=(১০৲ + ৫৲)। এইভাবে উৎপাদন চলিতে থাকিবে, এবং যখন দেখা যাইবে উৎপাদনের বিক্রয়লব্ধ অর্থ ইহার উৎপাদন খরচের সমান, তখন জমি হইতে আর কোন খাজনা পাওয়া যাইবে না। সেই ক্ষেত্রে জমিটি intensive margin of cultivation-এর উপর থাকিবে।

জমির বিকল্প আয় এবং খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক (Transfer earning of land and the relation between Rent and Price) : প্রান্তিক জমির জন্য কোন খাজনা দিতে হয় না। দাম প্রান্তিক জমির উৎপাদন খরচের সমান হয়

বলিয়া দাম খাজনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না। খাজনা নিরূপণ করিতে হইলে প্রথম শ্রেণীর জমির উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ আয় (Returns) হইতে প্রান্তিক জমির মোট খরচ বাদ দিতে হয়। প্রান্তিক জমির উৎপাদন খরচ এক্ষেত্রে শুধু ফসলের দাম নিয়ন্ত্রণ করে, ইহার সহিত খাজনার কোন সম্পর্ক নাই। যদি দাম বাড়িয়া যায়, তবে প্রথম শ্রেণীর জমি প্রান্তিক জমির তুলনায় অধিক উদ্বৃত্ত লাভ করে এবং খাজনা বাড়িয়া যায়। রিকার্ডো বলিয়াছেন, খাজনা বাড়িলে দাম বাড়ে কিন্তু খাজনা বাড়িলে দাম বাড়ে,একথা বলা ঠিক নহে (Rent is price-determined and not price-determining)। খাজনা একটি উদ্বৃত্ত মাত্র, মোট আয় হইতে উৎপাদন খরচ বাদ দিলে এই উদ্বৃত্ত পাওয়া যায়। সেইজন্য আমরা দেখিতে পাই, ফসলের দাম বেশী বলিয়াই খাজনা বেশী, খাজনা বেশী বলিয়া ফসলের দাম বেশী নয় ("Corn is not high because rent is paid but rent is paid because corn is high.")

সমস্ত দেশের দিক হইতে বিবেচনা করিলে যদিও জমির যোগান দাম শূন্য, একটি শিল্পের দিক হইতে বিবেচনা করিলে জমির ন্যূনতম যোগান দাম শূন্য নহে ; ইহার দাম জমির বিকল্প ব্যবহারের সুযোগ ব্যয়ের Opportunity Cost-এর সমান। সুতরাং প্রান্তিক জমির উৎপাদিত সামগ্রীর দাম সেই সুযোগ ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল হইবে।

আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণের মতে জমির বিকল্প আয়ের (Transfer Earning) ভিত্তিতে খাজনাতত্ত্ব আলোচনা করা যাইতে পারে। একটি উদাহরণের সাহায্যে ইহা বুঝান যাইতে পারে। ধরা যাক্, একটি জমিতে ধান এবং পাট উভয়ই উৎপাদন করা যায়। জমির মালিক যদি ধান উৎপাদন করেন তবে আয় হয় ৫০ টাকা, আর যদি তিনি পাট উৎপাদন করেন, তবে আয় হয় ৪০ টাকা। এই ব্যবস্থায় যদি কোন কৃষক পাট উৎপাদন করিবার জন্য এই জমিতে চাষ করিতে চায়, তবে জমির মালিককে ১০ টাকা দিয়া জমিটি চাষের জন্য আনিতে হইবে। কারণ, পাট উৎপাদন না করিয়া ধান উৎপাদন করিলে জমির মালিক আরও ১০ টাকা বেশী পাইতেন। এই ১০ টাকা হইতেছে জমিতে পাট উৎপাদনহেতু জমির মালিকের অতিরিক্ত বিকল্প আয় (Transfer Earning) এবং কৃষকের বিকল্প খরচ (Transfer Cost)। কোন জমিতে একটি ফসল উৎপাদন করিবার সময় বিকল্প আয় হইতে যতটা উদ্বৃত্ত (excess over Transfer Earning) পাওয়া যায়, ততটাই হইতেছে খাজনা। উপরোক্ত উদাহরণে ধান উৎপাদন করিবার সময় বিকল্প আয়ের উপর ১০ টাকা উদ্বৃত্ত পাওয়া যায়, ইহাই হইতেছে জমির মালিকের খাজনা। এই যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে প্রান্তিক জমিকেও খাজনা দিতে হইতে পারে যদি ইহা হইতে প্রাপ্ত আয় বিকল্প আয় অপেক্ষা বেশী হয়; প্রান্তিক

বিকল্প আয়
(Transfer Earning)

জমির ক্ষেত্রে ফসলের যে দাম নির্ধারিত হইবে, তাহার মধ্যে ফার্ম সুযোগ খরচ বা বিকল্প খরচ অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবে। কোন বিশেষ শিল্পের দিক হইতে বিকল্প আয়ের উপর উদ্বৃত্ত কত হইবে তাহা জমির সুযোগ ব্যয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সমস্ত শিল্পের দিক হইতে যাহা খাজনা তাহা ফার্মগুলির উৎপাদন ব্যয়ের একটি অত্যাবশ্যক অংশ। সুতরাং এই ক্ষেত্রে খাজনা দামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

খাজনা তত্ত্বের উপর বিকল্প আয়ের প্রভাব (Rent affected by Transfer Earning): জমির বিকল্প আয়ের তত্ত্বটি খাজনা তত্ত্বকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। রিকার্ডো এবং ম্যালথাস উভয়েই ধরিয়া লইয়াছিলেন যে জমিতে শুধু একটি জিনিসই উৎপাদন করা চলে এবং জমির কোন বিকল্প আয় নাই। তাহা ছাড়া, জমির যোগান সর্বদাই সীমাবদ্ধ। রিকার্ডোর মতে সীমিত যোগান-সম্পন্ন জমিগুলির মধ্যে যখন একই খরচে উপ-প্রান্তিক জমি প্রান্তিক জমি অপেক্ষা কিছু বেশী উৎপাদন করে, তখন ইহা যতটা বেশী উৎপাদন করে তাহাই খাজনা। আবার ম্যালথাসের মতে খাজনার প্রধান কারণ হইল জমির দুষ্প্রাপ্যতা (scarcity of land)। কিন্তু আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীদের মতে প্রান্তিক জমিকেও খাজনা প্রদান করিতে হয় যদি ইহার কোন বিকল্প আয় থাকে। তাঁহারা মনে করেন, সমগ্র দেশের পক্ষে জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ থাকিলেও একটি বিশেষ শিল্পের ক্ষেত্রে জমির যোগান স্থিতিস্থাপক; কারণ এই শিল্পটির কাছে কোন জমির অনেক বিকল্প ব্যবহার আছে। সুতরাং বিকল্প আয়ের সাহায্যে খাজনাতত্ত্বের যে সংস্কার করা হইল এবং খাজনা ও দামের মধ্যে যে সম্পর্কের কথা বলা হইল তাহাতে খাজনাতত্ত্ব আরও বাস্তব এবং বিজ্ঞানসম্মত হইয়াছে। এইভাবে খাজনা নিরূপণ ব্যাখ্যা করিলে বিভিন্ন জমি সমানভাবে উর্বর না হইলেও খাজনার সৃষ্টি হইবে।

খাজনা তত্ত্বের উপর বিকল্প আয়ের প্রভাব

বিভিন্ন ক্ষেত্রে খাজনার সৃষ্টি

সব জমি সমান উর্বর হইলেও অথবা সমান সুবিধা অনুযায়ী অবস্থিত হইলেও খাজনার সৃষ্টি হইতে পারে। উর্বরতা এবং অবস্থানের সুবিধাজনিত কোন পার্থক্য না থাকিলেও দুইটি কারণে খাজনার সৃষ্টি হয়। প্রথম কারণটি হইতেছে জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম (Law of Diminishing Returns) কার্যকর হওয়া। একই জমিতে বার বার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া চাষ করা হইলে উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমিতে আরম্ভ করে এবং উৎপাদন খরচ বাড়িতে থাকে। ধরা যাক, প্রথমে একজন কৃষক কোন জমিতে উৎপাদন করিল ছয় কুইন্টল ধান, দুইজন কৃষক চাষ করিয়া উৎপাদন করিল দশ কুইন্টল ধান; সুতরাং এক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন হইতেছে চার কুইন্টল ধান। দাম প্রান্তিক উৎপাদন খরচের সমান, অর্থাৎ চার মণ ধান উৎপাদন করিবার খরচের সমান হইবে। যদি কৃষকের মজুরি চার কুইন্টল ধানের সমান হয়, তবে দুইজন কৃষকের জন্য খরচ হইবে আট কুইন্টল ধানের মূল্য। অর্থাৎ

ধান হ

দুইজন কৃষকের কাজ হইতে আমরা পাইতেছি দশ কুইণ্টল ধান। সুতরাং এখানে খাজনার পরিমাণ হইতেছে দুই কুইণ্টল ধানের মূল্য। ইহাই এখানে উদ্বৃত্ত আয়।

সমান উর্বর জমি অথবা সমান অবস্থানের সুযোগ প্রাপ্ত জমিতেও যে খাজনা দেখা যায় তাহার আর একটি কারণ হইতেছে জমির বিকল্প ব্যবহার (alternative use) এবং বিকল্প আয়।

রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুযায়ী জমির সীমাবদ্ধ যোগান, ইহার উর্বরতার পার্থক্য এবং বিকল্প ব্যবহারের অভাব, ইত্যাদি হইতেছে খাজনা সৃষ্টি হওয়ার কারণ। আবার ম্যালথাসের মতে জমির দুষ্প্রাপ্যতাই (scarcity) মূলতঃ খাজনা সৃষ্টি হইবার কারণ।

আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীগণ খাজনা নিরূপণের ক্ষেত্রে ইহার চাহিদা ও যোগানের দিকটি চিন্তা করিয়াছেন। জমি ব্যবহার করার জন্য যে মূল্য প্রদান করা হয়, তাহাই খাজনা এবং ইহা নিরূপিত হয় চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক প্রভাবের ফলে। জমির জন্য চাহিদার অর্থ ইহার উৎপাদিত ফসলের জন্য চাহিদা এবং ইহা কতটা ফসল উৎপাদন করিতে পারিবে তাহা নির্ভর করে ইহার প্রান্তিক উৎপাদনীশক্তির উপর। আবার, যদি কোন জমি হইতে বিকল্প আয়ের সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে, তবুও ইহার জন্য চাহিদা বেশী হইতে পারে। আবার যোগানের দিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যায়, সমগ্র দেশের পক্ষে জমির যোগান সীমাবদ্ধ থাকিলেও একটি বিশেষ শিল্পেরক্ষেত্রে জমির যোগান সীমাবদ্ধ নয়; কারণ, ইহার বিকল্প ব্যবহার আছে। দেখা যাইতেছে জমির বিকল্প ব্যবহার ইহার চাহিদা ও যোগান উভয়কেই প্রভাবিত করে। সুতরাং জমির বিকল্প ব্যবহার হইলে যে বিকল্প আয় হয় তাহা হইতে যদি ইহার প্রকৃত আয় বেশী হয়, তবে প্রকৃত আয় যতটুকু বেশী হইবে, অর্থাৎ, যতটুকু উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহাই প্রকৃত খাজনা (Pure Rent)।

খাজনা এবং অর্থনৈতিক উন্নতি (Rent and Economic Progress): খাজনা এবং অর্থনৈতিক উন্নতির মধ্যে আমরা বিভিন্ন ধরণের সম্পর্ক দেখিতে পাই।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি

প্রথমত, যদি দেশে জনসংখ্যা বাড়ে তবে অধিক সংখ্যক জমি এবং নিকৃষ্ট ধরণের জমিতেও চাষ করা হয়। ইহাতে প্রথম শ্রেণীর জমিগুলি নিকৃষ্ট ধরণের জমিগুলির তুলনায় অধিক উদ্বৃত্ত লাভ করে এবং ইহাতে খাজনার পরিমাণ বাড়িয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, যদি দেশে অর্থনৈতিক উন্নতির দরুণ পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়, তবে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে জমির অবস্থানগত সুবিধার (situational advantage) তারতম্য হয়। ইহাতে ভাল অবস্থান আছে এই প্রকার জমিগুলির খারাপ অবস্থান আছে এই প্রকার জমির উপর উদ্বৃত্ত কমিয়া যায়। ইহাতে খাজনা কমিয়া যায়। এক্ষেত্রে মনে রাখা

পরিবহণের উন্নতি

উচিত, বাড়ীর জমির খাজনা নিরূপণ করিবার সময় আমরা বাড়ীর জমির অবস্থান অনুযায়ী ইহার মূল্য স্থির করি। যে সকল জমি অফিস, কলকারখানা প্রভৃতি স্থাপন এবং ব্যবসায়ের প্রয়োজনে আসে, সেইগুলির খাজনা অন্য জমি অপেক্ষা বেশী হয়। অর্থনৈতিক প্রগতির ফলে অনুন্নত অঞ্চলগুলিও উন্নত হইতে থাকে এবং ইহাতে বিভিন্ন জমির অবস্থানগত পার্থক্য ক্রমেই কমিয়া আসিতে থাকে এবং ইহাতে খাজনা কমিয়া যায়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও পরিবহণের উন্নতি হইলে শস্যের আমদানি এবং রপ্তানি প্রভাবিত হয়। যে দেশে শস্য আমদানি বাড়িয়া যায়, সেই দেশের খাজনা কমিয়া যায় এবং যে দেশের শস্য রপ্তানি বাড়িয়া যায়, সেই দেশে খাজনা বাড়িয়া যায়।

তৃতীয়ত, খাজনা কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারে। যদি প্রান্তিক জমির উন্নতি হয়, তবে উপ-প্রান্তিক (intra-marginal land) বা প্রথম শ্রেণীর জমির প্রান্তিক জমির উপর অর্জিত উদ্বৃত্তের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। ইহাতে খাজনার পবিমাণও কমিয়া যাইবে। কিন্তু, কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি যদি শুধু প্রথম শ্রেণীর জমিতে হয়, তবে প্রান্তিক জমির উপর অর্জিত ইহার উদ্বৃত্ত আরও বাড়িয়া যাইবে এবং ইহাতে খাজনার পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। অর্থনৈতিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি হয় এবং অধিক পরিমাণে ভাল যন্ত্রপাতি এবং সার জমিতে নিয়োগ করা সম্ভবপর হয়। ধরা যাক্ অর্থনৈতিক প্রগতির ফলে বেশী জমি না লইয়াও উৎপাদন করা চলে। যদি তাহাই হয়, তবে খাজনার উপর ইহার কিরূপ প্রভাব হইবে তাহা বিবেচনা করা যাইতে পারে। ধরা যাক, জমির মধ্যে মূলধন এবং শ্রমের প্রয়োগ স্থির আছে। এখন যদি অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য জমির উৎপাদনী শক্তি বাড়িয়া যায় তবে ৬৯নং চিত্র অনুযায়ী গড় উৎপাদনী শক্তি রেখা (average productivity curve) এবং প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তি রেখা (marginal productivity curve) আগেকার অনুরূপ রেখাগুলির বাঁ দিকে উপরে উঠিয়া যাইবে। যদি জমির উৎপাদনী শক্তি সর্বত্র সমান ভাবে বাড়ে তবে নূতন উৎপাদন পদ্ধতি অথবা নূতন কাজ উদ্ভাব (innovation) প্রান্তিক জমির ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ কমাইয়া দিবে। খাজনা উপর ইহার প্রভাব বিস্তার করিবে। এই ক্ষেত্রে খাজনার উপর জমি-সঞ্চয়কারী
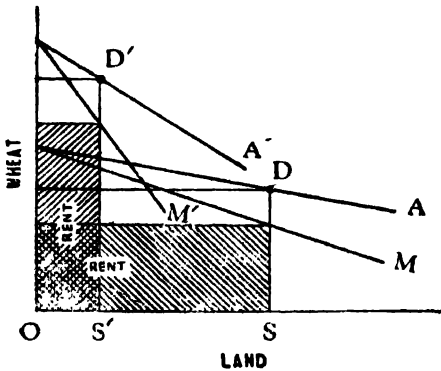
উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি

৬৯ নং চিত্র

সবটাই রাষ্ট্র কর্তৃক কর হিসাবে গ্রহণ করিবার নীতি অবলম্বিত হইলে সমাজে আয়ের বৈষম্য অনেক কমিয়া যায়।

এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যায় যে জমি হইতে আদায়ের সবটাই উদ্বৃত্ত আয় নয়। জমির মালিক অধিক উৎপাদনের জন্য যে মূলধন ও শ্রম বিনিয়োগ করিয়া থাকে, তাহার জন্য ন্যায়তঃ সে কিছু পাইতে পারে। তাহা ছাড়া অনুপার্জিত আয়ের উপর যেমন রাষ্ট্র কর বসাইতে পারে, সেইপ্রকার জমির দাম কমিয়া গেলে যদি মালিকের আয় কমিয়া যায় রাষ্ট্রের সেইজন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত। সমাজতন্ত্রে যাহারা বিশ্বাসী তাঁহারা অবশ্য এই যুক্তি গ্রহণ করেন না। সাধারণভাবে খাজনার উপর কর ধার্য করা সব সময়ে উচিত না হইলেও হঠাৎ দাম কমিয়া যাওয়ার দরুণ যদি জমির মালিকগণের অতিরিক্ত আয় হয়, তবে তাহার উপর কর ধার্য করা যাইতে পারে।

Exercise

1. Discuss how Economic Rent of land is determind, Explain the relation between Rent and price.

[অর্থনৈতিক খাজনা কিভাবে নিরূপিত হয় আলোচনা কর এবং খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর] (১৯৩-১৯৬ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the origin and significance of Rent. Does Rent enter into cost ?

[খাজনার উৎপত্তি এবং তাৎপর্য আলোচনা কর। খাজনা কি খরচের অন্তর্ভুক্ত ?] (১৯৩-১৯৬ পৃষ্ঠা

3, What do you mean by Transfer Earning ? How is Rent affected by Transfer Earning ?

[বিকল্প আয় বলিতে তুমি কি বুঝ ? খাজনা কিভাবে বিকল্প আয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয় ?] (১৯৬-১৯৮ পৃষ্ঠা)

4, How does the Rent of land arise ? Will the be any rent if all plots of lands are equally fertile and equally favourally situated ?

[কিভাবে খাজনার সৃষ্টি হয় ? যদি সব জমি সমান উর্বরা হয় এবং ইহাদের অবস্থানও সমান ভালভাবে হয় তবে কি কোন খাজনার সৃষ্টি হইবে ?] (১৯৩-১৯৯ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the Ricardian theory of Rent, How does it differ from the Modern theory of Rent ?

[রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব আলোচনা কর। আধুনিক খাজনা তত্ত্বের সহিত ইহার পার্থক্য কোথায় ?] (১৯৩-১৮)

6. Rent is generally regarded as a cost. Yet in the Ricardian theory rent is explained as a differntial return. How would you reconcile the two views ?

[সাধারণতঃ খাজনাকে খরচ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তবুও রিকার্ডোর তত্ত্বে খাজনাকে পার্থক্যমূলক আয় হিসাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তুমি এই দুইটি মতবাদের মধ্যে কিভাবে মীমাংসা করিবে ?] (১৯৩-১৯৬ পৃষ্ঠা)

7. Explain the concept of Quasi Rent.

[আধা-খাজনা তত্ত্বটি ব্যাখ্যা কর।] (২০২-২০৩ পৃষ্ঠা)

8. "The rent of land is seen not as a thing by itself but as a leading species of a large genus". Discuss.

[খাজনা কখনও এককভাবে দৃষ্ট হয় না ; ইহা হইতেছে একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত অন্তর্গত প্রধান উপজাতি ।] (২০৩-২০৪ পৃষ্ঠা)

9. Discuss how there can be a rent element in the remuneration of all factors.

[কিভাবে সব উপাদানের আয়ে খাজনার অংশ থাকে তাহা আলোচনা কর] (২০২-২০৪ পৃষ্ঠা)

10. Discuss the social aspect of the theory of Rent.

[খাজনা তত্ত্বের সামাজিক দিক আলোচনা কর ।] (২০৪-২০৫ পৃষ্ঠা)

11. Discuss the relationship between rent and economic progress.

[অর্থনৈতিক উন্নতির মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর ।] (১৯৯-২০১ পৃষ্ঠা)

ষোড়শ অধ্যায় | মজুরি (Wages)

মজুরির সংজ্ঞা, আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরি (Definition of Wages, Money wages and Real wages) : মজুরী হইতেছে উৎপাদনের জন্য শ্রমিক যে কাজ করে তাহার দাম ("value of the service rendered by labour in production"। মজুরি অনেক ক্ষেত্রে কাজের সময় অনুযায়ী প্রদান করা হয় ; ইহাকে সময় মজুরি Time Wages বলা হয়। আবার অনেক সময় কাজ অনুযায়ী মজুরি দেওয়া হয় ; ইহাকে কর্মানুগ মজুরি Piece-Wages বলা হয়।

আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরি (Money Wages and Real wages)

শ্রমিককে তাহার কাজের দাম বাবদ দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক যে মাহিনার টাকা দেওয়া হয় তাহাই আর্থিক মজুরি। অনেক সময় কাজের দাম টাকায় না দিয়া জিনিসপত্র বা কতিপয় প্রকৃত সুবিধার সৃষ্টি ইত্যাদির মাধ্যমে প্রদান করা হয়। শ্রমিক তাহার শ্রমের বিনিময়ে এই সুযোগ-সুবিধাগুলি অথবা জিনিসপত্র অথবা বিভিন্ন ধরণের কাজ (servies) লাভ করে। ইহাই তাহার প্রকৃত মজুরি (Real Wages)। এই জিনিসগুলি এবং সুযোগ-সুবিধাগুলিও শ্রমিক মজুরির অঙ্গ হিসাবেই মনে করে।

শ্রমিক কাজের বিনিময়ে সস্তাদরে খাদ্যশস্য পাইতে পারে, বাসস্থানের সুবিধা পাইতে পারে এবং বিনামূল্যে সমাজবীমার সমুদয় সুবিধা পাইতে পারে। যে কাজে এই সুবিধাগুলি পাওয়া যায়, সেই কাজের জন্য আর্থিক মজুরি কম হইলেও প্রকৃত মজুরির পরিমাণ বেশী হয়। অনেক সময় অস্থায়ী কাজের জন্য হয়ত আর্থিক মজুরি বেশী থাকে ; কিন্তু সেই প্রকার কাজের জন্য প্রকৃত মজুরি অত্যন্ত কম। আবার যদি কোন

কাজ স্থায়ী হয় অথচ সেই কাজের জন্য আর্থিক মজুরি কম হয় তবে সেই কাজের জন্য প্রকৃত মজুরির পরিমাণ বেশী হয়। অনেক সময় কোন কোন কাজে উপ্‌রি পাওনার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে যেমন, একজন লোক সকাল দশটা হইতে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত কোন অফিসে কাজ করিয়া হয়ত সন্ধ্যায় অন্য কোন অফিসে সেই ধরণের কাজ করিবার অনুমতি পাইতে পারে। তখন সেই ক্ষেত্রে আর্থিক মজুরি কম হইলেও শ্রমিক প্রকৃত মজুরি বেশী বলিয়াই মনে করে।

যে সকল কাজে বিপদের বা ঝুঁকির বিশেষ সম্ভাবনা থাকে, সেই কাজগুলিতে সাধারণতঃ আর্থিক মজুরি বেশী হয় এবং প্রকৃত মজুরি কম হয়। যেমন রেলওয়ে ইঞ্জিনের পরিচালকদের মাহিনা অনেক অফিসারের মাহিনা অপেক্ষাও বেশী হয়। কারণ, তাহাদের কাজে বিশেষ ঝুঁকি থাকে। আবার বিনা ভাড়ায় রেলে যাতায়াতের সুবিধা প্রকৃত মজুরির একটি অংশ।

প্রকৃত মজুরির পরিমাণ নিরূপণ করিতে হইলে দেশের মূল্যস্তর জানিতে হইবে। জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া গেলে প্রকৃত মজুরি কমিয়া যায়। প্রকৃত মজুরির সাহায্যে আমরা শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান কিরূপ তাহা জানিতে পারি।

মজুরি নিরূপণের বিভিন্ন পুরাতন তত্ত্ব (Various Classical Theories of Wages): মজুরি নিরূপণ করা সম্বন্ধে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ্ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতবাদের অবতারণা করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থনীতিবিদ্‌গণ মনে করিতেন যে জীবনধারণের উপযোগী (subsistence) যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন হয়, শ্রমিকদের কাজের জন্য সেই পরিমাণ মজুরি দেওয়া উচিত। যদি মজুরি এই পরিমাণ টাকার বেশী হয় তবে হয়ত পূর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক শ্রমিক বিবাহ করিয়া সংসারী হইবে এবং ইহাতে শ্রমিকের যোগান চূড়ান্তভাবে বাড়িয়া যাইবে। যদি শ্রমিকের যোগান বাড়িয়া যায়, তবে মজুরির হার কমিয়া যাইবে। কিন্তু মজুরির হার কমিয়া কখনই জীবনধারণের উপযোগী পারিশ্রমিক অপেক্ষা কম হইতে পারে না; কারণ ইহাতে অনেক লোক না খাইয়া মরিবে। তাহা হইলে আবার শ্রমিকের যোগান কমিয়া যাইবে এবং মজুরির হার বাড়িয়া জীবনধারণের উপযোগী পারিশ্রমিকের সমান হইবে। ইহাকে "Subsistence Theory of Wages" বলে। এই তত্ত্বটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এই তত্ত্বটি শুধু শ্রমের যোগানের উপর গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছে। এই তত্ত্বে শ্রমের চাহিদার কথা বিশেষ ভাবে বিবেচিত হয় নাই। দ্বিতীয়ত, আয় বাড়িলে জনসংখ্যা বাড়ে। এই যুক্তি বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সত্য হয় না। কারণ, আয় বাড়িলে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় এবং ইহাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে। তৃতীয়ত, এই তত্ত্বের সাহায্যে বিভিন্ন শ্রমিকের মধ্যে কেন মজুরির পার্থক্য হয়, তাহা বুঝান যায় না।

জীবনধারণের উপযোগী পারিশ্রমিক

জীবনধারণের উপযোগী মজুরি তত্ত্ব (Subsistence Theory of Wages)

মজুরি তহবিল তত্ত্ব (Wages Found theory)

জন ষ্টুয়ার্ট মিলের (John Stuart Mill) মতে দেশের সমুদয় সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ হইতে একটি অংশ শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার জন্য পৃথক করিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়।[১] ইহাকে মজুরি তহবিল (Wages Fund) বলা হয়। মিল মনে করিয়াছিলেন যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত শ্রমিকের যোগান বাড়ে এবং শ্রমিকের যোগান যদি বাড়িয়া যায় তবে মজুরি তহবিলের অর্থ শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টিত হয় এবং ইহাতে শ্রমিকদের মধ্যে মাথাপিছু মজুরির হার কমিয়া যায়। আবার শ্রমিকের যোগান যদি না বাড়ে এবং মজুরি তহবিলে অর্থের পরিমাণ যদি বাড়িয়া যায়, তবে শ্রমিকের মাথা পিছু মজুরির হারও বাড়িয়া যায়।

এই তত্ত্বটির সমালোচনা

মিল প্রদত্ত মজুরি তহবিল তত্ত্বটির সমালোচনা করিয়া বলা যায় দেশের মোট সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ হইতে একটি মজুরি তহবিল করা যায় এই ধারণাটি ঠিক নহে। উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান হইতে যে আয় হয় সেইগুলির মত মজুরিও জাতীয় আয়ের অংশ। এই আয় একটি প্রবহমান ধারার (Income stream) ন্যায়, ইহাকে একটি তহবিলের পর্যায় ফেলা উচিত নয়। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন শ্রমিকের মধ্যে আমরা যে মজুরির পার্থক্য দেখিতে পাই, তাহা মজুরি তহবিল তত্ত্বটির সাহায্যে বুঝান যায় না। তৃতীয়ত, এই তত্ত্বটি ধরিয়া লয় যে শ্রমিকের জন্য চাহিদা নির্ভর করে শ্রমিকের মজুরি তহবিলে কত টাকা আছে তাহার উপর; কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। শ্রমিকের জন্য কি রকম চাহিদা হইবে তাহা নির্ভর করে শ্রমিকের উৎপাদনী শক্তির উপর। তাহা ছাড়া, শ্রমিকের চাহিদা দেশের ব্যবসায় বিনিয়োগের গতির উপরেও নির্ভর করে। সর্বশেষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত শ্রমিকের যোগান বাড়ে, ইহা ঠিক নহে। শ্রমিকের যোগান অনেকগুলি উপাদানের উপর নির্ভর করে। বিশেষতঃ, বিকল্প কাজের আকর্ষণ শ্রমিকের যোগানকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে।

মজুরী নিরূপণে প্রান্তিক উৎপাদন শক্তি তত্ত্ব (Marginal Productivity Theory of Wages): প্রান্তিক উৎপাদনের তত্ত্ব অনুযায়ী শ্রমিকের মজুরি তাহার প্রান্তিক উৎপাদনের (Marginal Product) মূল্যের সমান। এই তত্ত্ব অনুযায়ী কোন নির্দিষ্ট শ্রমিকের যোগান নির্দিষ্ট থাকে এবং শ্রমিকের জন্য চাহিদার উপর মজুরির হার নির্ভর করে। শ্রমিকের চাহিদা নির্ভর করে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তির (Marginal Productivity) উপর। ধরা যাক, দশজন শ্রমিক কোন জিনিসের ২০ ইউনিট উৎপাদন করে। তারপর একজন অতিরিক্ত শ্রমিককে যদি কাজে নিয়োগ করা হয়, তবে এগার জন শ্রমিক ২২ ইউনিট উৎপাদন করে। এক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন হইতেছে দুই ইউনিট এবং দুই ইউনিটের মূল্যই

প্রান্তিক উৎপাদন শক্তি (Marginal Productivity Theory)

১। "Wages depend.. on the proportion between Fopulation and Capital"—Mill; Principles of Political Economy.

হইবে শ্রমিকের মজুরি। যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের দাম তাহার মজুরি অপেক্ষা বেশী ততক্ষণ পর্যন্ত মালিক অধিক পরিমাণে শ্রমিক নিয়োগ করিতে থাকিবে এবং উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করিবে। যখন শ্রমিকের মজুরি তাহার প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্যের সমান হইবে, তখন উদ্যোক্তা আর শ্রমিক নিয়োগ করিবে না। এই তত্ত্বটি শ্রম ও মূলধনের পূর্ণ সচলতা (perfect mobility) স্বীকার করিয়া লয়। যদি কোন প্রতিষ্ঠান প্রচলিত মজুরি অপেক্ষা বেশী মজুরি দেয়, তবে শ্রমিকগণ তৎক্ষণাৎ যে প্রতিষ্ঠান কম মজুরি দেয় তাহা ছাড়িয়া বেশী মজুরি যে প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যায়, সেই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিবে।

আমরা এই তত্ত্বটির সমালোচনা করিতে পারি। এই তত্ত্বটিতে শ্রমিকের চাহিদার উপর অত্যধিক গুরুত্ব অর্পণ করা হইয়াছে এবং শ্রমিক সরবরাহের দিকটি উপেক্ষা করা হইয়াছে। শ্রমিকের সরবরাহ নির্ভর করে জনসংখ্যা, বিকল্প কাজের মজুরি, জীবনযাত্রার মান এবং শ্রমিক-সংঘের উপর; এইগুলি সম্বন্ধে কোন আলোচনা প্রান্তিক উৎপাদন তত্ত্বে করা হয় নাই। দ্বিতীয়ত, শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন নিরূপণ করা খুব সহজ নহে। কারণ, যে উৎপাদনকে আমরা শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন বলি তাহা শুধু শ্রমিকের দরুণ উৎপাদিত হয় নাই, কিছু মূলধনের জন্য অথবা অন্য কোন উপকরণের জন্য উৎপাদিত হইয়াছে। সুতরাং অন্যান্য উপকরণগুলির উৎপাদনী শক্তি জানা না থাকিলে শ্রমের উৎপাদনী শক্তি নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তৃতীয়ত, এই তত্ত্বটি পূর্ণ প্রতিযোগিতার উপর ভিত্তিশীল। কিন্তু শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা দেখা যায় না; যদি দেখা যাইত, তবে অসংখ্য শ্রমিকের সহিত আমরা অসংখ্য মালিক দেখিতে পাইতাম এবং তাহার ফলে কোনও প্রকার বেকার সমস্যার সৃষ্টি হইত না। শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে মজুরি শুধু প্রান্তিক উৎপাদনের দামেরই সমান হয় না; ইহা প্রান্তিক উৎপাদনের বিক্রয় হইতে লব্ধ আয়েরও (marginal revenue) সমান হয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতা না থাকিলে তাহা হয় না। কিন্তু যখন বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে না, তখন মজুরি শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান হয় বটে, কিন্তু ইহা প্রান্তিক উৎপাদনের দাম অপেক্ষা কম হয়। কারণ, অপূর্ণ বাজারে অথবা একচেটিয়া বাজারে প্রান্তিক আয় অপেক্ষা দাম বেশী থাকে। এই তত্ত্বটি মজুরির হার নিরূপণ সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ তত্ত্ব নয়।

এই তত্ত্বটির সমালোচনা

জীবনযাত্রার মান ও মজুরি (Standard of Living and Wages):

অনেকের মতে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী মজুরির হার নির্ধারিত হয়। এই তত্ত্বেও শ্রমের যোগানের দিকটাই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী নিজের জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার জন্য শ্রমিকের যে পরিমাণ টাকার দরকার তাহাই তাহাকে মজুরি বাবদ দেওয়া হয়। কিন্তু, শ্রমের চাহিদার দিকটা বিবেচিত হয় নাই বলিয়া

জীবনযাত্রার মান তত্ত্ব (Standard of Living Theory)

আমরা এই তত্ত্বটি গ্রহণ করিতে পারি না। আবার জীবনযাত্রার মান পরোক্ষভাবে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তিকে প্রভাবিত করে। জীবন-যাত্রার মান উন্নত হইলে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তি বাড়িয়া যাইতে পারে। ইহাতে শ্রমিকের মজুরি বাড়িয়া যায়। সেইদিক হইতে ইহা পরোক্ষভাবে শ্রমিকের চাহিদাকে প্রভাবিত করে। তাহা ছাড়া, জীবনযাত্রার মান যেমন মজুরিকে প্রভাবিত করে, সেই প্রকার জীবনযাত্রার মানও মজুরি কর্তৃক প্রভাবিত হয়। মজুরি বাড়িলে জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়।

মজুরি নিরূপণের আধুনিক তত্ত্ব : (Modern theory of determining Wages) : উপরি-উক্ত কোন মতবাদের সাহায্যেই আমরা শ্রমিকের মজুরি নিরূপণ করিতে পারি না। পূর্বেই বলা হইয়াছে, মজুরি হইতেছে এক ধরণের দাম ; ইহা মূলত উৎপাদনের জন্য শ্রমিকের যে কাজ তাহার দাম। সুতরাং বিভিন্ন জিনিসের দাম নিরূপণ করিবার সময় আমরা যেমন চাহিদা ও যোগানের দিক বিবেচনা করি, সেই প্রকার মজুরি নির্ধারণেও আমরা শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের যোগান বিবেচনা করিব। শ্রমের চাহিদা নির্ভর করে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তির উপর এবং শ্রমিকের যোগান নির্ভর করে জনসংখ্যা, শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান, বিকল্প কাজ, শ্রমিকের মজুরি এবং শ্রমিক সংঘের উপর। এই উপাদানগুলির মধ্যে শ্রমিক সংঘের প্রভাবই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিক সংঘ (Trade Union) যদি কোন শ্রমিককে কাজে যোগদান করিতে নিষেধ করে, তবে সেই শ্রমিক কাজে যোগদান করে না। শ্রমিক সংঘ মজুরির হার নির্ধারণে একটি বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা অবলম্বন করে। মালিকগণ হয়ত এমন একটি সর্বোচ্চ মজুরী দিতে চাহে (ধরা যাক্ ৩ টাকা) যাহার বেশী আর তাহারা দিতে চাহে না।

শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের যোগান

আবার শ্রমিকগণ হয়ত এমন একটি সর্বনিম্ন মজুরি দাবি করিতে পারে (ধরা যাক্ ৫ টাকা) যাহার কম তাহারা গ্রহণ করিতে চাহে না। তখন উভয় পক্ষের মধ্যে একটি দরকষাকষি (Bargaining) হয় এবং ইহার ফলে উভয়েরই দাবির মাঝামাঝি (ধরা যাক এক্ষেত্রে ৪ টাকা) একটি মজুরির হার নিরূপিত হয়। এই দরাদরি কখনও একজন মালিক বা একজন শ্রমিকের মধ্যে হয় না। ইহা হয় শ্রমিক সংঘ (Trade Union) এবং মালিক সংঘের (Employers' Association) মধ্যে। মালিক সংঘ মালিকগণের প্রতিনিধিত্ব করে এবং শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করে শ্রমিক সংঘ। এই দরকষাকষি সমষ্টিগতভাবে হয় বলিয়া ইহাকে সমষ্টিগত দরকষাকষি বা "Collective Bargaining" বলে। শ্রমিক সংঘ বেশী শক্তিশালী হইলে মজুরি সর্বোচ্চ স্তরে অথবা উহার কাছাকাছি স্থির হয়। শ্রমিকের দিক হইতে মজুরির সর্বোচ্চ সীমা নির্ভর করে শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানের উপর। অপর পক্ষে যদি মালিক সংঘ বেশী শক্তিশালী হয় তবে মজুরি·মালিকগণের দিক হইতে সর্বনিম্ন স্তরে স্থির হইবে।

শ্রমিক সংঘের ভূমিকা (Role of the Trade Union)

শ্রমিকদের দরকষাকষি করিবার ক্ষমতার সীমা (Limits to the bargaining capacity of the Labour Unions) **:** শ্রমিকগণ অনেক সময় ধর্মঘট করিয়া অথবা মালিকগণকে ধর্মঘটের ভয় দেখাইয়া মজুরির হার বাড়াইবার জন্য চেষ্টা করিতে পারে। মালিকগণের সহিত দরকষাকষি করিয়া মজুরির হার নির্ধারণ করিবার সময় শ্রমিকসংঘের ক্ষমতা তিনটি দিক হইতে সীমাবদ্ধ। প্রথমত, যদি মালিকগণের দিক হইতে শ্রমিকের চাহিদা স্থিতিস্থাপক থাকে, অর্থাৎ, যদি মালিকগণ ধর্মঘটী শ্রমিকদের বদলে অন্য শ্রমিক নিযুক্ত করেন, তবে মজুরির হার নাও বাড়িতে পারে। অনেক সময় শ্রমিকগণ বেশী মজুরির দাবি করিলে মালিকগণ শ্রমিকের পরিবর্তে অধিকতর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে পারে; ইহাতে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের সম্ভাবনা থাকে বলিয়া স্বভাবতঃই শ্রমিকগণের দরকষাকষি করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, যদি মালিকগণ ধর্মঘটী শ্রমিকের পরিবর্তে অন্য শ্রমিক অথবা অধিকতর মূলধন ব্যবহার করেন, তবে দেখিতে হইবে অন্য শ্রমিক অথবা মূলধন ব্যবহারের জন্য চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কতটুকু। যখন বাজারে ব্যবসায় বাণিজ্য খুব সক্রিয় বা তেজী হইয়া উঠে, তখন শ্রমিকদের ধর্মঘট সফল হইবার সম্ভাবনা থাকে।

তৃতীয়ত, শ্রমিকগণ যে জিনিসটি উৎপাদন করে, সেই জিনিসটির জন্য ক্রেতাদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাও শ্রমিকদের দরকষাকষি করিবার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। যদি শ্রমিকদের উৎপাদিত জিনিসের জন্য চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়, তবে শ্রমিকগণ ধর্মঘট করিয়া অথবা মালিকদের সহিত দরকষাকষি করিয়াও কোন সুবিধা অর্জন করিতে পারে না। অপরপক্ষে যদি জিনিসটির জন্য চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয় তবে শ্রমিকদের দরকষাকষি করিবার ক্ষমতাও অনেক বাড়িয়া যায়।

শ্রমিক সংঘের কাজ ও প্রয়োজনীয়তা : মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শ্রমিক সংঘের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে শ্রমিক মালিকদের নিকট হইতে যতটা সম্ভব বেশী মজুরি আদায় করিতে চেষ্টা করে।

মজুরি নির্ধারণের সময় শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করা শ্রমিক সংঘের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শ্রমিকদের কল্যাণে শ্রমিক সংঘ অনেক কাজ করিয়া থাকে। যেমন, কর্মচ্যুত শ্রমিকদের জন্য ভাতার (Allowance) ব্যবস্থা করা, শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার (Social security) সুবিধা প্রদান করা অর্থাৎ, অসুস্থ থাকাকালীন সাহায্য করা এবং সর্বোপরি শ্রমিকদের সব রকম স্বার্থ সংরক্ষণ করাও শ্রমিক সংঘের কাজ। শ্রমিকদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হইলে তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্য শ্রমিক সংঘ শ্রমিকদের পক্ষ লইয়া সরকার ও মালিক শ্রেণীর সহিত আলোচনা চালায়। তাহা ছাড়া, যদি প্রয়োজন হয়, তবে চূড়ান্ত ব্যবস্থা হিসাবে শ্রমিক সংঘ শ্রমিকদের ধর্মঘট করিবার জন্য আহ্বান জানায়। যদি যখনও শিল্পবিরোধ (Industrial dispute) বা শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়, তবে বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য শ্রমিক

সংঘ চেষ্টা করিয়া থাকে। শ্রমিকদের স্বার্থ যাহাতে সম্পূর্ণরূপে বজায় থাক সেজন্য এবং শ্রমিকদের অবস্থার একটি সংঘের মাধ্যমে শ্রমিক-সমাজের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী।

বাজারের বিভিন্ন অবস্থায় কর্মসংস্থানের উপর মজুরি বৃদ্ধির প্রভাব (Effects of increased Wages on Employment in different Market Situations): মজুরি নির্ধারণে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শ্রমের যোগান যথেষ্ট পরিমাণে ট্রেড ইউনিয়নের নীতির উপর নির্ভরশীল; ইহার সুযোগ লইয়া ট্রেড ইউনিয়ন শিল্পের মালিকদের সহিত মজুরি বৃদ্ধির জন্য দরকষাকষি করে। যদি দেশে শ্রমিকের সংখ্যা খুব অল্প থাকে এবং শ্রমের চাহিদা খুব বেশী হয় তবে ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে দরকষাকষি করিয়া মজুরি বৃদ্ধি করা সহজ হয় এবং সেক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের হ্রাস হইবে না। কিন্তু মজুরি বৃদ্ধি করিবার একটি সীমা আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রমিকদের বর্ধিত হারে মজুরি দিয়াও কোন শিল্পের পক্ষে উদ্বৃত্ত অর্জন করা সম্ভবপর হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত শিল্পের মালিকের পক্ষে সেই দাবি পূরণ করা সম্ভবপর। কিন্তু যখন শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি তাহাদের উৎপাদনী শক্তিকে অতিক্রম করিয়া যায় তখন মালিকের পক্ষে সেই দাবি পূরণ করা সম্ভব নহে। তখন শ্রমিক সংঘের সিদ্ধান্ত লইতে হইবে যে শ্রমিকগণ বেশী মজুরি চায়, না বেশী কর্মসংস্থান চায়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতায় যখন মজুরির হার উৎপাদনীশক্তি অপেক্ষা বাড়িতে থাকে তখন কর্মসংস্থানের পরিমাণ কমিতে থাকে। নিম্নের চিত্রে দেখান হইয়াছে মজুরির বৃদ্ধি ঘটিলেই শ্রমের নিয়োগও কম হয়। এই চিত্রে DD এবং SS হইতেছে যথাক্রমে বাজারে মোট শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের যোগান রেখা। আমরা দুইটি ফার্ম A এবং B
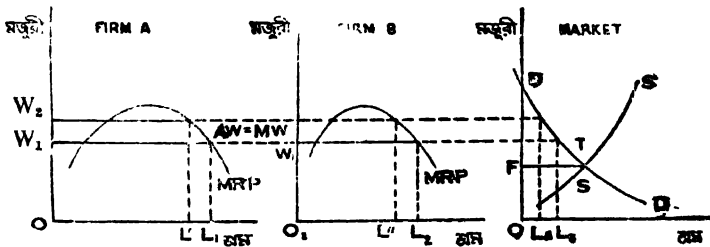
চিত্র নং ৭১

ধরিতেছি। যখন মজুরীর হার OW_1 তখন ফার্ম A, OL_1 পরিমাণ এবং ফার্ম B, O_1L_2 পরিমাণ শ্রমিক নিযুক্ত করিবে। সুতরাং বাজারে OW মজুরি হারে $OL_1 + OL_2 = OL_3$ (বাজারে ইউনিটগুলিকে ছোট করিয়া দেখান হইয়াছে) পরিমাণ শ্রমিক নিযুক্ত করা হইবে। এইভাবে OW_2 মজুরিতে, $OL' + OL'' = OL_4$ পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করা হইবে। দেখা যাইতেছে $OL_4 < OL_3$। সুতরাং বাজারে

শ্রমের চাহিদা রেখা নিম্নগামী। দেখা যাইতেছে DD রেখা নিম্নগামী এবং শ্রমের যোগান রেখা ঊর্দ্ধগামী। এই দুইটি রেখা পরস্পরকে T বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। সুতরাং OF হইবে বাজারের মজুরির হার।

দরকষাকষির মাধ্যমে মজুরির বৃদ্ধি হইলে ইহা কর্মসংস্থানকে কিভাবে প্রভাবিত করিবে তাহা নির্ভর করে বাজারের অবস্থার উপর। আমরা এক্ষেত্রে বাজারে চারিটি অবস্থার বিবেচনা করিতে পারি; (১) জিনিসের বাজারে এবং উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা।—এই প্রকার বাজারে মজুরি শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের দামের (VMP) সমান হইবে। Marginal Revenue Productivity রেখা এই ক্ষেত্রে নিম্নগামী (উপরের ৭২নং চিত্রে দেখানো হইয়াছে)। সুতরাং এই ক্ষেত্রে মজুরি বৃদ্ধির পরিণতি হইবে কর্মসংস্থানের হ্রাস।

(২) জিনিসের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং উপাদানের বাজারে একজন মাত্র ক্রেতা (Monopsony)—এই প্রকার বাজারে শ্রমিক সংঘ কর্তৃক দরকষাকষির মাধ্যমে মজুরির বৃদ্ধি হইলে কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়িবে।

(৩). জিনিসের বাজারে একচেটিয়া কারবার এবং উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা,—এই প্রকার বাজারে প্রান্তিক উৎপাদনের বিক্রয় লব্ধ আয় রেখা (MRP curve) নিম্নগামী। সুতরাং এইক্ষেত্রে মজুরির পরিমাণ বাড়িলে কর্মসংস্থানের পরিমাণ কমিবে।

(৪) জিনিসের বাজারে একচেটিয়া কারবার এবং উপাদানের বাজারে মাত্র একজন ক্রেতা (Monopsony in the Factor Market)—এই প্রকার বাজারে মজুরির পরিমাণ বাড়িলে কর্মসংস্থানের পরিমাণও বাড়িবে।

দেখা যাইতেছে, শ্রমিক সংঘ যদি কোন শিল্পের মালিকের সহিত দরকষাকষি করিয়া মজুরির পরিমাণ বাড়াইতে সমর্থ হয়, তবে কর্মসংস্থানের উপর ইহার কি প্রভাব হইবে, অর্থাৎ কর্মসংস্থানের হ্রাস-বৃদ্ধি জিনিসের বাজার (Product Market) এবং উপাদানের বাজারের (Factor Market) অবস্থার উপর নির্ভর করিবে। উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে মজুরি বৃদ্ধি কর্মসংস্থানের পরিমাণ কমাইয়া দেয়, কিন্তু উপাদানের বাজারে একজন মাত্র ক্রেতা (Monopsonist) থাকিলে মজুরি বৃদ্ধি কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়।

শ্রমের যোগানের উপর মজুরি বৃদ্ধির প্রভাব (Effects of a rise in Wages on Supply of Labour : শ্রমের যোগান অনেকগুলি উপাদানের উপর নির্ভর করে। দীর্ঘকালে শ্রমের যোগান দেশের জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে। ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানীদের মতে বাজারের মজুরির হার নির্ধারিত হয় মানুষের জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন অনুযায়ী (Subsistence Wage) এবং সেইক্ষেত্রে মজুরির হার স্থির থাকে। যদি মজুরির হার স্থির থাকে তবে শ্রমের যোগান রেখা বাঁদিক হইতে ডানদিকে প্রসারিত একটি সরল রেখা

(a horizontal straight line) হইয়া থাকে। নিম্নের চিত্রে OW যদি মজুরির হার হয়, তবে WL হইতেছে শ্রমের দীর্ঘকালীন যোগান রেখা।
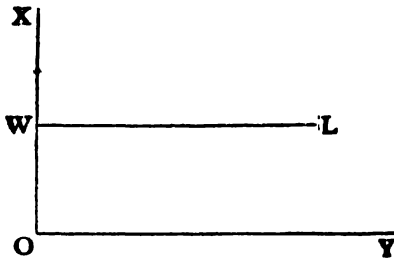
চিত্র নং ৭৩

কিন্তু, এই তত্ত্বটি বর্তমানে গ্রহণ-যোগ্য নহে। দীর্ঘকালে শুধু জনসংখ্যা নহে, অন্যান্য উপাদানের উপরেও শ্রমের যোগান নির্ভরশীল।

শ্রমের যোগান বলিতে শ্রমিকের সংখ্যা বুঝায় না, —শ্রমিকগণ কতক্ষণ কাজ করে, অর্থাৎ কাজের সময়) working time) বুঝায়। সাধারণতঃ দেখা যায়, মজুরি বাড়িতে আরম্ভ করিলে একটি পর্যায় পর্যন্ত শ্রমিকগণ বেশী করিয়া কাজ করিতে উৎসাহিত হয়। কারণ সেক্ষেত্রে বেশী কাজ করিলেই আয় বাড়িয়া যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্রামের বিনিময়ে অর্থাৎ বিশ্রামের পরিবর্তে বেশী কাজ করিয়া আয় বাড়াইবার তাগিদ শ্রমিকদের মনে থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্তই শ্রমের যোগান বাড়িবে। কিন্তু ইহার পর এমন একটি অবস্থা আসিবে যখন শ্রমিকগণ বেশী মজুরি পাইলেও আয় বাড়াইবার জন্য আর উৎসাহিত হয় না। কারণ, তখন আয় যতটা বাড়িয়াছে, তাহাই শ্রমিককে বিশ্রাম গ্রহণ করিতে প্রণোদিত করে—আর কাজ করিতে উৎসাহ প্রদান করে না, ইহাকে মজুরি বৃদ্ধির আয়-প্রভাব (Income Effect) বলা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রথমে যখন মজুরি বৃদ্ধির সহিত বেশী কাজ করিবার উৎসাহ ছিল, তখন বেশী মজুরির প্রত্যাশায়
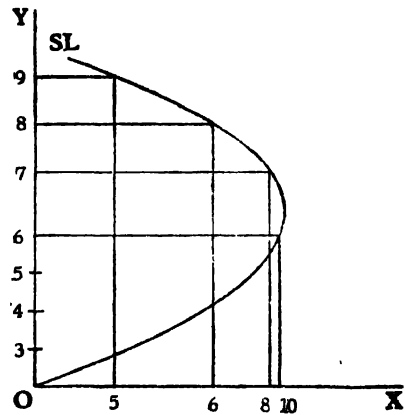
চিত্র নং ৭৪

বিশ্রামের পরিবর্তে বেশী কাজ গ্রহণ করিবার প্রেরণা কার্যকর হইত এবং ইহার ফলে শ্রমের যোগান বাড়িত। এই অবস্থাকে মজুরি বৃদ্ধির প্রতিস্থাপন প্রভাব (Substitution Effect) বলা হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মজুরি বৃদ্ধির প্রতিস্থাপন প্রভাবের ফলে শ্রমের যোগান বাড়ে, এবং আয় প্রভাবের ফলে শ্রমের যোগান কমে। উপরের ৭৪ নং চিত্রে ইহা দেখানো হইয়াছে। এই চিত্রে OY রেখায় মজুরি এবং OX রেখায় শ্রমের যোগান সূচিত হইয়াছে। মজুরি তিন টাকা হইতে ছয় টাকা পর্যন্ত যতক্ষণ বাড়িতেছে ততক্ষণ শ্রমের যোগান

বাড়িতেছে। কিন্তু, যখন মজুরি ছয় টাকার বেশী হইয়া গেল, তখন আর শ্রমের যোগান বাড়িতেছে না; বরং আট টাকা অথবা নয় টাকা মজুরি হওয়া সত্ত্বেও শ্রমের যোগান কমিয়া যাইতেছে।

নিরপেক্ষ রেখার সাহায্যেও ইহা বুঝান যাইতে পারে। সেইক্ষেত্রে পছন্দের সূত্র (Scale of Preference) প্রস্তুত হইবে বিশ্রাম (leisure) এবং মজুরির সম্মিলনে। মনে রাখিতে হইবে বিশ্রামের পরিমাণ সীমিত থাকে; কেননা, কোন অবস্থায়ই বিশ্রামের পরিমাণ সারাদিনে ২৪ ঘণ্টার বেশী হইতে পারে না। ৭৫ নং চিত্রে OY রেখা বিশ্রামের পরিমাণ এবং OX রেখা মজুরি বুঝাইতেছে; এই দুইটির সম্মিলনে কতিপয় নিরপেক্ষ রেখা অঙ্কিত হইয়াছে। K বিন্দু হইতে কতিপয় মূল্য-রেখাও টানা হইয়াছে, এই মূল্য-রেখাগুলি নিরপেক্ষ রেখাগুলির সঙ্গে স্পর্শক হইয়াছে এবং স্পর্শক বিন্দুগুলিকে সংযুক্ত করিয়া যে রেখা অঙ্কন করা হইয়াছে তাহাই শ্রমের যোগান রেখা। এই চিত্রে যখন ১৬ ঘণ্টা বিশ্রাম (অর্থাৎ, ৮ ঘণ্টা কাজ) তখন মজুরি হইতেছে চারটাকা ইহার পর যখন মজুরি হইতেছে, ছয় টাকা তখন বিশ্রামের পরিমাণ ১২ ঘণ্টা (অর্থাৎ, ১২ ঘণ্টা কাজ)। ইহার পর মজুরির পরিমাণ যত বাড়িতেছে, তত বিশ্রামের পরিমাণও বাড়িতেছে, ৭৫নং চিত্রে A হইতে B পর্যন্ত প্রতিস্থাপন প্রভাব (Substitution Effect) এবং B হইতে D পর্যন্ত আয় প্রভাব (Income Effect) কার্যকর হইতেছে।
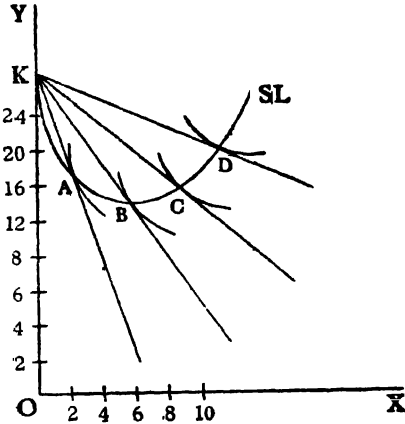
চিত্রনং ৭৫

শ্রমের যোগান ট্রেড ইউনিয়নের নীতির উপর নির্ভর করিতে পারে; অর্থাৎ যদি ট্রেড ইউনিয়ন নিষেধ করে, তবে শ্রমিকগণ কাজে যোগদান নাও করিতে পারে। আবার, বিকল্প কাজের আকর্ষণ কোন শ্রমিককে একটি বিশেষ কাজে যোগদান করা হইতে বিরত করিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে জীবন যাত্রার মান শ্রমিককে বিশেষ একটি কাজে যোগদান করা অথবা না করার ব্যাপারে চালিত করিতে পারে। কিন্তু শ্রমের যোগান মূলতঃ মজুরি বৃদ্ধির আয়-প্রভাব (Income Effect) এবং প্রতিস্থাপন প্রভাবের (Substitution Effect) উপর নির্ভরশীল।

বিভিন্ন কাজে মজুরির তারতম্য (Differences in wages in different occupations): আমরা বিভিন্ন কাজের জন্য মজুরি হারের তারতম্য দেখিতে পাই; মজুরির এই তারতম্য নির্ভর করে কাজের প্রকৃতি, পারিপার্শ্বিকতা এবং

শ্রমিকের কর্মকুশলতার পার্থক্যের উপর। যে সকল শ্রমিক খুব কর্মক্ষম, তাহারা এই কর্মক্ষমতার জন্য আরও কম কর্মক্ষম শ্রমিকদের অপেক্ষা বেশী মজুরি পাইবে। দ্বিতীয়ত, কোন কাজের মধ্যে যদি বিপদের অথবা মারাত্মক রকমের ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই কাজের জন্য শ্রমিকের মজুরি বেশী হয়। যেমন এরোপ্লেনের পাইলটদের বেতন অনেক সরকারী অফিসারের বেতন অপেক্ষা বেশী।

তৃতীয়ত, শিক্ষালাভের খরচ যদি বেশী হয় তবে শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমিকের মজুরিও বেশী হয়। যেমন বিদেশ হইতে যাঁহারা ডাক্তারী পাশ করিয়া আসেন তাঁহারা এদেশে রোগী দেখিবার সময় বেশী ভিজিট লইয়া থাকেন।

চতুর্থত, কাজের সাধারণ আকর্ষণ অনেক সময় মজুরির তারতম্য ঘটায়। একজন সাধারণ শ্রমিক যে মজুরি পায়, তাহা অপেক্ষা একজন মেথর একটু বেশী মজুরি পায়। এই তারতম্যের কারণ হইতেছে এই যে মেথরের কাজের জন্য লোকের আকর্ষণ নাই।

পঞ্চমত, চাকুরী যদি স্থায়ী এবং নিয়মিত হয় তবে মজুরির হার অপেক্ষাকৃত কম হয়। আবার অনিয়ন্ত্রিত এবং অস্থায়ী কাজে মজুরির হার বেশী হয়, কারণ, তাহা হইলে শ্রমিকগণ অস্থায়ী কাজের দিকে আকৃষ্ট হইবে।

ষষ্ঠত, দায়িত্বপূর্ণ কাজে মজুরির হার বেশী হয়। একজন সাধারণ কেরাণী হয়ত কোন অফিসার অপেক্ষা অনেক বেশী পরিশ্রম করে। তবুও অফিসারের বেতন বেশী। ইহার কারণ হইতেছে এই যে অফিসারের কাজ অনেক দায়িত্বপূর্ণ।

সপ্তমত, ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা থাকিলে শ্রমিকরা অল্প বেতনেও অনেক কাজ গ্রহণ করিয়া থাকে।

সর্বশেষে, ভৌগোলিক এবং আঞ্চলিক কারণেও মজুরি-হারের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। কোন অঞ্চলে হয়ত শ্রমের চাহিদা অপেক্ষা যোগান কম, তবে সেই অঞ্চলে মজুরির হার বেশী হইবে। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি শহরে শিল্পোন্নয়ন হইবার ফলে শ্রমের চাহিদা খুব বেশী। কোন শ্রমিক এই দুইটি শহরে কাজ করিলে যে মজুরি পাইবে, গ্রামাঞ্চলে কাজ করিলে সে তাহা অপেক্ষা কম মজুরি পাইবে। কতিপয় বিশেষ কাজ আছে যেগুলির জন্য বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমিকের প্রয়োজন হয়, কারিগরি কর্মকুশলতা না থাকিলে এই কাজের জন্য শ্রমিককে নিযুক্ত করা হয় না। স্বভাবতঃই এই ধরণের কাজের জন্য শ্রমিকদের মজুরি-হার বেশী হয়।

বেশী মজুরি দেওয়ার লাভ অথবা বেশী মজুরি দেওয়ার ফলে ব্যয় সংকোচ (Economy of high Wages): সাধারণভাবে মনে হয় যে মালিক শ্রমিকদের যতই কম মজুরি দিবে, ততই তাহার লাভ হইবে। কিন্তু, ইহা সব সময় ঠিক নয়। অনেক সময় দেখা যায় যে শ্রমিককে বেশী মজুরি দিলে পরিণামে মালিকেরই লাভ। শ্রমিককে কম মজুরি দেওয়া হইল তাহার উপর মালিকের লাভ নির্ভর করে না। মালিকের লাভ নির্ভর করে কত উৎপাদন হইল এবং সেই

অনুপাতে উৎপাদন খরচ কত কমিল তাহার উপর। যখন মোট বিক্রয়-লব্ধ আয় (Total Revenue) মোট খরচ (Total Cost) অপেক্ষা বেশী হইবে তখনই মালিকের লাভ। মালিকগণ যদি শ্রমিকদের বেশী মজুরি দেয়, তবে শ্রমিকদের আয় বাড়িবে, তাহারা ভাল খাওয়া দাওয়া করিতে পারিবে এবং নিজের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারিবে। ইহাতে তাহাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে। জীবনযাত্রার মান উন্নত হইলে শ্রমিকদের উৎপাদনী শক্তিও বাড়িবে। শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা ও উৎপাদনী শক্তি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন বাড়িবে এবং প্রতি ইউনিটে উৎপাদন খরচ কমিয়া যাইবে। সুতরাং ইহাতে পরিণামে মালিকেরই লাভ হইবে। অপরপক্ষে মালিক কম মজুরি দিলে আপাত দৃষ্টিতে উৎপাদন খরচ কম মনে হইলেও পরিণামে শ্রমিকের জীবন ক্রমাগতই অবনত হইবে, উৎপাদনীশক্তি কমিবে এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণও কমিবে। উন্নত দেশগুলিতে শ্রমিকদের মজুরি অনুন্নত দেশগুলি অপেক্ষা অনেক বেশী। সেইজন্য উন্নত দেশগুলিতে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়, কর্মদক্ষতাও বাড়ে। ইহার ফলে উন্নত দেশগুলিতে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে এবং উৎপাদন খরচ কমিয়া যায়।

বেশী মজুরী দিলেই মালিকের ক্ষতি একথা ঠিক নয়

শ্রমিকদের বেশী মজুরি দেওয়ার ফলে মালিকদের আরও দুইটি কারণে লাভ হইতে পারে; প্রথমত, কোন মালিক যদি শ্রমিকের মজুরির হার বাড়াইয়া দেয়, তবে অধিকতর কর্মদক্ষ শ্রমিকগণ সেই মালিকের নিকট কর্মপ্রার্থী হইবে। অন্যান্য উদ্যোক্তাগণ যে মজুরি দেয়, তাহা অপেক্ষা এই মালিক যদি বেশী মজুরি দেয় তবে সর্বাপেক্ষা কর্মনিপুণ শ্রমিকগণ তাহার অধীনে কাজ করিবে, ইহাতেও উৎপাদন বাড়িবে এবং উৎপাদন খরচ কমিবে। দ্বিতীয়ত, শ্রমিকদের মজুরির হার বাড়াইয়া দিলে শ্রমিকদের মনে অসন্তোষের ভাব কম থাকে, ইহাতে ধর্মঘট প্রভৃতির সম্ভাবনা কমিয়া যায়। শিল্প বিরোধের একটি প্রধান ত্রুটি হইতেছে এই যে ইহাতে উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া যায়। শ্রমিকদের বেশী মজুরি দিয়া উদ্যোক্তাগণ উৎপাদন হ্রাসের এই সম্ভাবনা হইতে মুক্ত হইতে পারে।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও মজুরি (Invention and Wages): উৎপাদন ক্ষেত্রে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি অধিকাংশই হইতেছে শ্রমলাঘবকারী (labour-saving) এবং অধিক মূলধন ব্যবহারকারী (capital-consuming) যন্ত্রপাতি। উৎপাদন ব্যবস্থা যতই বড় হইতে থাকে, ততই নূতন নূতন যন্ত্রপাতির আবিষ্কার এবং উৎপাদনে উহাদের প্রবর্তন হয়। যন্ত্রপাতির প্রধান উপকারিতা হইতেছে এই যে এইগুলির সাহায্যে আমরা অল্প সময়ে এবং অল্প খরচে বেশী উৎপাদন করিতে পারি। শুধু তাহাই নহে, উৎকৃষ্ট ধরণের যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করিলে উৎপাদিত সামগ্রীগুলিও উৎকৃষ্ট ধরণের হয়। যন্ত্রের সাহায্যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাজ করা সম্ভব হয়। ইহাতে যে সকল শ্রমিকের সাহায্যে এই নূতন আবিষ্কৃত

যন্ত্রপাতিগুলি ব্যবহার করা হয়, তাহাদের কর্মকুশলতা বাড়িয়া যায় এবং মজুরি বাড়িয়া যায়।

কিন্তু, মজুরির উপর এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের আর একটি প্রভাব আছে। তাহা হইতেছে এই যে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করিলে নূতন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে অনেক শ্রমিককেই কাজ হইতে ছাঁটাই করা হয়। ইহাতে বেকার সমস্যা বাড়িয়া যায়। বেকার সমস্যার সৃষ্টি হইলে সাধারণভাবে শ্রমের যোগান বাড়িয়া যায় এবং সেইজন্য মজুরির হার কমিয়া যায়। কিন্তু, সব রকম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই মজুরির হার কমাইয়া দেয়, এই ধারণা ঠিক নয়। আধুনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সেইগুলিতেও অনেক লোকের কাজের ব্যবস্থা হয়, ইহাতে শ্রমিকের উদ্বৃত্ত যোগান নাও থাকিতে পারে। তাহা ছাড়া, নূতন যন্ত্রপাতির আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন শ্রমিকের কারিগরি কর্মকুশলতা (technical sikll) বাড়িয়া যায়, তাহাদের মজুরির হারও বাড়িয়া যায়। রেলগাড়ী আবিষ্কার হইবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোকের কাজের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং দেশের অর্থনৈতিক জীবনও উন্নত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে যখন উৎপাদন ব্যবস্থা উন্নত হয় এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত হয়, তখন শ্রমিকদেরও জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় এবং ইহাতে তাহাদের মজুরির হারও বাড়িয়া যায়।

অবশ্য একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এমন অনেক আবিষ্কার আছে যেগুলি শ্রমিকদের পরিশ্রম কমাইয়া দেয় অথবা নৈপুণ্য কমাইয়া দেয় (skill-saving)। এই সকল আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বেশী মজুরি সম্পন্ন কর্মনিপুণ শ্রমিকদের জন্য চাহিদা কমিয়া যায়। ফলে, সেই শ্রমিকের মজুরির হার কমিয়া যায়।

যদি কোন কোন শ্রমিক নূতন ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে অসমর্থ হয় এবং তাহারা যদি শুধু দৈহিক পরিশ্রমেই পটু থাকে, তবে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে সেই শ্রমিকদের মজুরির হার কমিয়া যাইতে পারে।

আবার, এমন কতিপয় আবিষ্কার আছে যেগুলি শ্রমের পরিমাণ লাঘব করে না, মূলধনের পরিমাণ লাঘব করে (capital-saving)। এই সকল আবিষ্কারের ফলে বেশী করিয়া শ্রমিকের প্রয়োজন হয় এবং ইহাতে শ্রমিকদের কর্মসংস্থান বাড়ে। ফলে মজুরির হারও বাড়িয়া যায়।

একচেটিয়া বাজার এবং মজুরি (Monopoly and Wages) : একচেটিয়া বাজারে শ্রমিকগণ তাহাদের প্রান্তিক উৎপাদনের দামের সমান মজুরি পায় না। একচেটিয়া বাজারে প্রান্তিক খরচ (marginal cost) এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় (marginal revenue) যতক্ষণ পর্যন্ত সমান না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বিক্রেতা দাম কমাইয়া বেশী করিয়া তাহার উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় করিতে থাকে। প্রান্তিক খরচ যখন প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান হইবে তখন বিক্রেতা ভারসাম্য অর্জন

করিবে এবং তখন সে স্থির করিবে, কতটা জিনিস বাজারে বিক্রয় করিতে হইবে।

কিন্তু, একচেটিয়া বিক্রেতা বাজারে যে দামে তাহার জিনিস বিক্রয় করে তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় অপেক্ষা বেশী। মজুরি দেওয়ার সময় একচেটিয়া বিক্রেতা তাহাদের প্রান্তিক উৎপাদনের দাম অনুযায়ী মজুরি দেয় না। একচেটিয়া বাজারে শ্রমিকদের যে মজুরি দেওয়া হয়, তাহা শ্রমিকদের প্রান্তিক উৎপাদনের বিক্রয়লব্ধ আয়ের (Marginal Revenue Productivity) সমান, দামের সমান নয়। দেখা যাইতেছে, একচেটিয়া বাজারে শ্রমিকগণ তাহাদের ন্যায্য মজুরি হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু, পূর্ণ প্রতিযোগিতায় শ্রমিকগণ তাহাদের ন্যায্য মজুরি পায়। কারণ, পূর্ণ প্রতিযোগিতায় শ্রমিকগণের প্রান্তিক উৎপাদন বিক্রয় করিয়া যে আয় হয়, তাহা ইহার দামের সমান। সুতরাং পূর্ণ প্রতিযোগিতায় শ্রমিকগণ যে মজুরি পায় তাহা তাহাদের প্রান্তিক উৎপাদনেরই দাম। অপরপক্ষে, একচেটিয়া উদ্যোক্তা কখনই বেশী মজুরি দিয়া শ্রমিকদের কাজে নিযুক্ত করে না।

Exercise

1. Discuss the classical theories of Wages.

[মজুরি নিরূপনের পুরাতন তত্ত্বগুলি আলোচনা কর] (২০৭-২০৮ পৃষ্ঠা)

2. Bring out the distinction between Money Wages and Real Wages. What factors are taken into consideration in determining real wages.

[আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরির মধ্যে পার্থক্য দেখাও। প্রকৃত মজুরি নির্ধারণে কি কি উপাদান বিবেচনা করা উচিত ?] (২০৬-২০৭ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the Marginal Productivity theory of Wages.

[মজুরি নিরূপণে প্রান্তিক উপাদানের তত্ত্বটি আলোচনা কর।] (২০৮-২১০ পৃষ্ঠা)

4. Write a short note on "economy of high wages,"

["আর্থিক মজুরির ব্যয় সংকোচের" উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।] (২১৬-২১৭ পৃষ্ঠা)

5. What are the factors that determine the level of wages in a country ?

[কোন দেশের মজুরি নির্ধারণের কি কি উপাদানের দ্বারা হইয়া থাকে ?] (২১০ পৃঃ ; ২০৯-২১০ পৃঃ)

6, Examine the conditions under which a trade union will succeed in raising the wages of a particular group of workers.

[কি কি অবস্থায় একটি শ্রমিক সংঘ একটি বিশেষ দলভুক্ত শ্রমিকদের মজুরি বাড়াইবার কাজে সফল হইবে তাহা পরীক্ষা কর।] (২১০-২১১ পৃষ্ঠা)

7. Discuss the modern theory of determining wages.

[মজুরি নিরূপণের আধুনিক তত্ত্বটি আলোচনা কর।] (২১০-২১১ পৃষ্ঠা)

8. "Union can raise real and money wages in a particular industry but the result will be less employment" Examine the statement with reference to different market situations.

["একটি বিশেষ শিল্পে শ্রমিকসংঘগুলির প্রকৃত এবং আর্থিক মজুরি বাড়াইতে পারে ; কিন্তু ইহার পরিণতি হইবে কর্মসংস্থান হ্রাস।" বিভিন্ন ধরণের বাজারের অবস্থা উল্লেখ করিয়া এই উক্তিটি পরীক্ষা কর।] (২১২-১৩ পৃষ্ঠা)

9. How can you explain why higher wages may eiher increase or decrease the quantity of labour supplied ?

[মজুরি বৃদ্ধি কেন শ্রমের যোগান বাড়াইতে অথবা কমাইতে পারে, তুমি তাহা কিভাবে ব্যাখ্যা করিতে পার ?] (২১৩-২১৫ পৃষ্ঠা)

10, Discuss the nature of the supply curve of labour and show why supply of labour may not increase even if there is an increase in wage rate.

[শ্রমের যোগান রেখার স্বরূপ আলোচনা কর এবং দেখাও কেন মজুরি বৃদ্ধি শ্রমের যোগান নাও বাড়াইতে পারে।] (২১৩-২১৫ পৃষ্ঠা)

11. Discuss the functions and utility of Trade Union.

[শ্রমিকসংঘের ক্রিয়াকলাপ ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।] (২১১-১২ ; ২১০ পৃষ্ঠা)

12. Account for the differences in wages in different occupations.

[বিভিন্ন ধরণের উপজীবিকায় মজুরির পার্থক্য কেন হয় তাহার কারণ বর্ণনা কর।] (২১৫-১৬ পৃষ্ঠা)

13., Is there any relation between wages and standard of living of the workers ? (২০৯-২১০ পৃষ্ঠা)

[শ্রমিক শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান ও মজুরির মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কি ?]

14. Show how (a) invention and (b) the existence of monopoly affect the rate of wages.

[(ক) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং (খ) একচেটিয়ার অস্তিত্ব মজুরির হার কিভাবে পরিবর্তিত করে তাহা দেখ ও।] (২১৭-২১৯ পৃষ্ঠা)

সপ্তদশ অধ্যায়

সুদ
(Interest)

'সুদ' কথাটির বিভিন্ন সংজ্ঞা আমরা দেখিতে পাই। সাধারণ অর্থে যখন কেহ মূলধন অথবা টাকা ধার করে তখন এই ধার বাবদ তাহাকে একটি দাম দিতে হয়, সুদ হইতেছে এই দাম ("Interest is a price paid for loans")। কাহারও নিকট হইতে মূলধন লইয়া তাহা ব্যবহার করিলে যে দাম দিতে হয়, তাহাই সুদ। সুদ বলিতে আমরা মোট সুদ (Gross Interest) এবং নীট সুদ (Net Interest), এই দুই প্রকার সুদ বুঝি। এই দুইটির মধ্যে একটি পার্থক্য আছে।

মোট সুদ ও নীট সুদ (Gross Interest and Net Interest) : টাকা ধার দেওয়ার একটি ঝুঁকি সর্বদাই থাকে। যদি নির্দিষ্ট সময়ে খাতক ধার শোধ না করে অথবা টাকা আদায়ের জন্য যদি মহাজনকে অনেক তাগাদা দিতে হয়, তবে ধার দেওয়ার ব্যাপারে অনেক ঝামেলা থাকে। এই ঝামেলার জন্যই বিশেষতঃ খাতক যদি খুব নির্ভরযোগ্য না হয়, তবেই মহাজন টাকা ধার দেওয়ার পর সুদ একটু বেশী করিয়া ধার্য

করে। এই বেশী সুদ ধার্য করিবার আর একটি উদ্দেশ্য হইল ধারের কারবার বজায় রাখিবার জন্য মহাজনকে যে খরচ করিতে হয় এবং হিসাব রাখিতে হয়, তাহার ব্যবস্থা করা। এই কারণগুলি বর্তমান না থাকিলে শুধু টাকা দেওয়ার জন্যই মহাজন যে সর্বনিম্ন সুদ ধার্য করিত, তাহাই হইতেছে নীট সুদ (Net interest)। টাকা ধার দেওয়ার ব্যাপারে উপরে বর্ণিত ঝামেলা এবং অসুবিধাগুলি থাকার দরুণ মহাজন সর্বনিম্ন সুদ অপেক্ষা বেশী যে সুদ ধার্য করে, তাহাতে মোট সুদ (Gross interest) নিরূপিত হয়। সেইজন্য মোট সুদের হার নীট সুদের হার অপেক্ষা বেশী থাকে।

সুদ হইতেছে একটি দাম; কাহারও নিকট হইতে টাকা বা মূলধন ধার করিলে এই দাম দিতে হয়। কোন জিনিসের দাম যেমন ইহার চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নিরূপিত হয়, সুদও সেই প্রকার টাকা অথবা মূলধনের জন্য চাহিদা এবং ইহার যোগানের দ্বারা নিরূপিত হয়।

সুদ নিরূপণের ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব (Classical theories of determining the Rate of Interest): ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানীদের মতে সুদ হইতেছে সঞ্চয়ের পুরস্কার। সঞ্চয়ের অর্থ হইতেছে ভোগ-নিবৃত্তি (abstinence)। বর্তমানে ভোগের নিবৃত্তি করিয়া ধার প্রদানকারী ভবিষ্যতে ভোগ করিবার জন্য অপেক্ষা করে। এইজন্য সুদের মধ্যে অপেক্ষার (waiting), উপাদান আছে। নিজে ভোগ না করিয়াও ধার প্রদানকারী তাহার সঞ্চিত অর্থ ধার দেয়, এইজন্য সে একটি পুরস্কার পায়। এই পুরস্কার হইতেছে সুদ। এই তত্ত্বটির বিভিন্ন সমালোচনা করা যাইতে পারে।

ভোগ নিবৃত্তি তত্ত্ব (Abstinence theory)

প্রথমত, এই তত্ত্বে সঞ্চয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সঞ্চয় হইতেছে এমন একটি জিনিসের যোগান যাহা লোকে ধার করে। সুতরাং সুদ নিরূপণের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটি শুধু যোগানের উপর গুরুত্ব প্রদান করিয়াছে। কিন্তু, যেহেতু সুদ হইতেছে একটি দাম (ধার লওয়ার জন্য যে দাম দিতে হয়), সেইজন্য সুদ নিরূপিত হইবে চাহিদা ও যোগানের দ্বারা; শুধু যোগানের উপর গুরুত্ব অর্পণ করিয়া সুদ নিরূপণ করা যায় না। দ্বিতীয়ত, কেইন্‌স্ (Keynes) দেখাইয়াছেন, যে এই তত্ত্বটির সাহায্যে আমরা যে সুদ নিরূপণ করি, তাহা একটি অনির্দিষ্ট (indeterminate) সুদ। কারণ সঞ্চয় নির্ভর করে লোকের আয়ের উপর এবং ধারপ্রদানকারীর সঞ্চিত অর্থের জন্য ধারগ্রহণকারীর কি পরিমাণ চাহিদা থাকিবে তাহা নির্ভর করে ধারগ্রহণকারীর বিনিয়োগ-চাহিদার (investment demand) উপর এবং সেই বিনিয়োগ-চাহিদা আবার নির্ভর করে তাহার আয়ের উপর।* সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত আয় নিরূপিত না হইতেছে, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নির্দিষ্ট আয়ের পরিমাণ না জানিতে পারিতেছি ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিকভাবে একটি নির্দিষ্ট সুদ নিরূপণ করা সম্ভবপর নহে।

কোন কোন ক্ল্যাসিক্যাল লেখকদের মতে সুদ নিরূপিত হয় মূলধনের প্রান্তিক

উৎপাদনের দ্বারা। অর্থাৎ, সুদ হইতেছে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের দামের সমান।

প্রান্তিক উৎপাদন তত্ত্ব (Productivity Theory)

মূলধনের উৎপাদনীশক্তি থাকার দরুণ ব্যবসায়ীগণের মূলধনের জন্য চাহিদা আছে। এইজন্য তাহারা মূলধন ধার করিতে চায়। যে ব্যক্তি মূলধন ধার দেয় সে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন শক্তি অনুযায়ী সুদ পাইয়া থাকে। উদ্যোক্তা ব্যবসায়ে কি পরিমাণ মূলধন খাটাইবে তাহা নির্ভর করে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন এবং সুদের উপর। যতক্ষণ পর্যন্ত মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন সুদ অপেক্ষা বেশী থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত উদ্যোক্তা ব্যবসায়ে মূলধন খাটাইতে থাকে। কিন্তু যতই সে মূলধন বিনিয়োগ করিবে, ততই মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশক্তি কমিয়া আসে। অবশেষে যখন মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন সুদের সমান হয়, তখন উদ্যোক্তা মূলধন খাটানো বন্ধ করিয়া দেয়; এইভাবে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন সুদের সমান হয়।

আমরা এই তত্ত্বটির সমালোচনা করিতে পারি। প্রথমত, এই তত্ত্বটি চাহিদার দিকটির উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছে। ব্যবসায়ে কত মূলধন বিনিয়োগ করা হইবে তাহা শুধু মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন শক্তির উপর নির্ভর করে না, তাহা কিছু পরিমাণে নির্ভর করে মূলধনের যোগানের উপর, কিন্তু, এই তত্ত্বে মূলধনের যোগানের দিকটির উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করা হয় নাই।

দ্বিতীয়ত, অধিক মূলধন ব্যবহারে অধিক জিনিস উৎপাদিত হয়, একথা ঠিক। কিন্তু অধিক মূলধন ব্যবহারে অধিক মূল্য উৎপাদিত হয়, এ কথা ঠিক নহে। অধিক পরিমাণ মূলধন ব্যবহার করিলে উৎপাদন এত বাড়িয়া যাইতে পারে যে মূলধনের সাহায্যে উৎপাদিত সামগ্রীর দাম কমিয়া যাইতে পারে এবং বিনিয়োগকারীর লোকসান হইতে পারে। কত মূলধন খাটাইলে কত বেশী জিনিস উৎপাদিত হইবে, তাহা পরিমাপ করা যায় না। আবার মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশক্তি নিরূপণ করাও সহজ নয়। কারণ, মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন শক্তির একটি বর্তমান দিক এবং একটি ভবিষ্যৎ দিক আছে। মূলধনের বর্তমান বিনিয়োগ হইতে ভবিষ্যতে ইহার কত উৎপাদন-শক্তি থাকিবে তাহা নিরূপণ করা সহজ নয়।

তৃতীয়ত, ভবিষ্যতে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের কত মূল্য হইবে তাহা জানিবার জন্য আমাদের ভবিষ্যতে সুদ কত হইবে সেই সম্বন্ধে একটি ধারণা করিয়া লইতে হয়। কিন্তু বর্তমান সুদ সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকিলে ভবিষ্যতের সুদ সম্বন্ধে কোন ধারণা করা সম্ভবপর নয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই তত্ত্বটিতে একই যুক্তির পুনরাবর্তন বা একটি "circular reasoning" হইতেছে।

সুদ নিরূপণে সময়ের পছন্দ তত্ত্ব (Time Preference Theory of Interest): অষ্ট্রিয়ার বিখ্যাত অর্থবিজ্ঞানী বহমবওয়ার্ক (Bohm Bawerk), ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানী ফিসার (Fisher) এবং তাঁহাদের অনুগামীগণ সুদ নিরূপণের

জন্য আরও একটি তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। এই যুক্তি অনুযায়ী সুদের হার নিরূপিত হয় লোকে ভবিষ্যতের তুলনায় বর্তমানের প্রয়োজনের উপর কতকখানি বেশী মূল্য প্রদান করে অথবা পছন্দ করে তাহার সাহায্যে। এই তত্ত্বটিকে Time Preference Theory of Interest বলে। লোকে অনেক সময় ভবিষ্যৎ প্রয়োজন অপেক্ষা বর্তমান প্রয়োজনকেই বড় মনে করে। ভবিষ্যতে ১০০ টাকা পাইবার কোন অনিশ্চয়তা না থাকিলেও সে বর্তমানে ১০০ টাকা ধার গ্রহণ করাকে বড় মনে করে। কিন্তু যদি লোক কাহাকেও টাকা ধার দেয়, তবে বুঝিতে হইবে যে ভবিষ্যৎ অপেক্ষা বর্তমানের প্রয়োজনকে সে বড় মনে করিলেও কিছু প্রাপ্তির আশায় সে টাকা ধার দিতেছে। এই প্রাপ্তিই হইতেছে সুদ। ফিসারের মতে সুদ হইতেছে ভবিষ্যতের তুলনায় বর্তমানকে বেশী পছন্দের হার (rate of time preference)। যে টাকা ধার দেয় সে বর্তমানকে বেশী পছন্দ করে। কিন্তু তাহাকে যদি ধারের টাকা ফেরৎ দেওয়ার সময় কিছু বেশী অর্থ দেওয়া যায় তবে সে বর্তমানকে ছাড়িয়া ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিতে রাজী হইতে পারে। এই অধিক মূল্যই সুদ। এই তত্ত্ব অনুযায়ী বর্তমানের জন্য পছন্দ থাকিবে না—ইহা অসম্ভব, এবং এইজন্য সুদের হারও শূন্য হইতে পারে না।

Time preference theory of insterest

মূলধনের উৎপাদনী শক্তি শুধু বর্তমানেই থাকে তাহা নহে, ভবিষ্যতেও মূলধনের কিছু উৎপাদনী শক্তি থাকে। সেইজন্য কোন মূলধন বর্তমানে বিনিয়োগ করিলে কত লাভ হইবে এবং ভবিষ্যতে বিনিয়োগ করিলে কত লাভ হইবে এবং সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে বিনিয়োগ করিবার মত পারিপার্শ্বিক সুযোগ থাকিবে কিনা তাহার উপরও সময়ের পছন্দ নির্ভরশীল হইতে পারে।

এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে বিভিন্ন লোকের ভবিষ্যৎ অপেক্ষা বর্তমানকে বেশী পছন্দ করার প্রবণতা বিভিন্ন কারণে হইতে পারে। সুতরাং বিভিন্ন ধারের ক্ষেত্রে সুদও বিভিন্ন হইবে। কিন্তু, বাজারে চাহিদা এবং যোগানের দ্বারা যে সুদ নিরূপিত হয়, তাহা এই তত্ত্বটির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই তত্ত্বটিতে মূলধনের যোগানের দিকটির উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ বলা হইয়াছে ধার প্রদানকারী কেন টাকা ধার দেয়। কিন্তু, চাহিদার উপরে কোনও গুরুত্ব এই তত্ত্বে দেওয়া হয় নাই।

সুদ নিরূপণে কেইনসের তত্ত্ব (Keynesian Theory of Interest): লর্ড কেইনস্ ক্লাসিক্যাল এবং নিয়ো-ক্লাসিক্যাল তত্ত্বগুলির সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে সুদ সঞ্চয়ের পুরস্কার নয় এবং সুদ বাড়িলে সঞ্চয় সর্বদা বাড়ে না। কেইনসের মতে টাকার জন্য চাহিদা সকলেরই থাকে। কারণ, টাকার মধ্যেই নিহিত থাকে সাধারণ ক্রয়শক্তি (general purchasing power) যাহার সাহায্যে মানুষ নিজের প্রয়োজন মিটাইতে পারে। সেইজন্য মানুষ সহজে নিজের টাকার উপর অর্থাৎ সাধারণ ক্রয়শক্তির উপর অধিকার হারাইতে চায় না। কিন্তু তবুও কেহ যখন টাকা ধার দেয় তখন বুঝিতে হইবে যে টাকার জন্য নিজের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সে কিছু

প্রাপ্তির আশায় টাকা ধার দিয়াছে। এই অতিরিক্ত প্রাপ্তিই হইতেছে সুদ। কেইনসের ভাষায় "interest is the reward for parting with liquidity for a specific period" অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধার প্রদানকারী যে নগদ টাকার উপর হইতে তাহার কর্তৃত্ব হারাইতেছে, সেইজন্য সে পুরস্কার বাবদ কিছু সুদ পায়। সুতরাং সুদ সঞ্চয়ের পুরস্কার নয়। তাহা ছাড়া, অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদেই অর্থ সঞ্চয় করে, সুদের আশায় নয়। সুতরাং সুদ কোন প্রকারেই সঞ্চয়ের পুরস্কার নয়।

দ্বিতীয়ত, সুদ বাড়িলেই সঞ্চয় বাড়িবে, কেইনস্ এই যুক্তি গ্রহণ করেন না। সুদ বাড়িলে মূলধন সহজলভ্য হয় না। ইহাতে বিনিয়োগ কমিয়া যায়। বিনিয়োগ কমিয়া গেলে জাতীয় আয় কমিয়া যায় এবং জাতীয় আয় কমিয়া গেলে সঞ্চয় কমিয়া যায়। সুতরাং সুদ বাড়িলেই সঞ্চয় বাড়ে না।

লর্ড কেইন্সের মতে সুদ হইতেছে সম্পূর্ণভাবে টাকা-পয়সার ব্যাপার (monetary phenomenon)। তাঁহার মতে সুদ নির্ধারিত হয় টাকার চাহিদা এবং টাকার যোগানের দ্বারা। নগদ টাকার দরকার সকলেরই থাকে। ধার প্রদানকারী নগদ টাকার উপর অধিকার ত্যাগের পুরস্কার হিসাবে সুদ পাইয়া থাকে।

এখন দেখা যাক টাকার চাহিদা এবং যোগান কি কি উপাদানের উপর নির্ভর করে। টাকার চাহিদা, সক্রিয় তহবিলের জন্য টাকার চাহিদা (Demand for holding active balance) এবং নিষ্ক্রিয় তহবিলের জন্য টাকার চাহিদা (Demand for holding idle balance) এই দুই প্রকার হইতে পারে। কেইনস্ টাকার মোট চাহিদাকে নিম্নলিখিতভাবে বুঝাইয়াছেন।

$L = L_1 + L_2$ এখানে 'L' হইতেছে মোট টাকার চাহিদা বা Liquidity Preference; L_1 হইতেছে মোট টাকার উপর চাহিদার সেই অংশ যাহা লোকের আয়ের উপর নির্ভরশীল এবং L_2 হইতেছে মোট টাকার চাহিদার সেই অংশ যাহা ভবিষ্যৎ সুদের হারের উপর নির্ভর করে। সুতরাং মোট টাকার চাহিদা এবং আয় ভবিষ্যৎ সুদের হারের উপর নির্ভরশীল।

নগদ টাকা হাতে রাখিবার চাহিদা প্রধানতঃ তিনটি অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমত, ব্যবসায়ে লেনদেনের জন্য লোকে কিছু টাকা হাতে রাখিতে চায়।

টাকার চাহিদা তিনটি অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করে

ইহাকে লর্ড কেইন্স লেনদেনের অভিপ্রায় (Transactions Motive) বলিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, হঠাৎ কোন আপদ-বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য এবং ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্যও লোক কিছু টাকা হাতে রাখিতে চায়। ইহাকে Precautionary Motive বলে। প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয় ক্ষেত্রেই লোকে কত টাকা হাতে রাখিতে চায়. তাহা লোকের আয়ের উপর নির্ভর করে। আয়ের উপর নির্ভর করিয়া লোকে যে টাকা রাখিতে চায় তাহাকে সক্রিয় তহবিল (active balance

বলে। তৃতীয়ত, লোকে ফাটকা কারবারের জন্য কিছু টাকা হাতে রাখিতে চায়। ইহা নির্ভর করে ভবিষ্যৎ সুদের হারের উপর। সুদ যদি বেশী হয়, তবে এই উদ্দেশ্যে লোকে নগদ টাকা বেশী করিয়া হাতে রাখিতে চায়। সুতরাং, ফাটকা কারবারের জন্য লোকে যে টাকা হাতে রাখিতে চায়, তাহাকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় তহবিল (idle balance)।

উপরে বর্ণিত তিনটি অভিপ্রায়ের বশবর্তী হইয়া লোকে নগদ টাকা হাতে রাখিতে চায়। ইহাকে নগদ টাকার চাহিদা বা Liquidity Preference বলা হয়। বিভিন্ন সুদে লোকে কত টাকা হাতে রাখিতে চায়, ইহার ভিত্তিতে আমরা নগদ টাকার জন্য চাহিদার একটি তালিকা (Liquidity Preference Schedule) প্রস্তুত করিতে পারি।

সুদের হার বেশী হইলে লোকে কম টাকা রাখিতে চায়; তাহারা তখন বেশী করিয়া ধার দিতে রাজী থাকে। আবার সুদের হার কমিয়া গেলে লোকে বেশী টাকা হাতে রাখিতে চাহে এবং তখন কম পরিমাণে ঋণ পাওয়া যায়। ৭৬নং চিত্রে ইহা দেখান হইল।
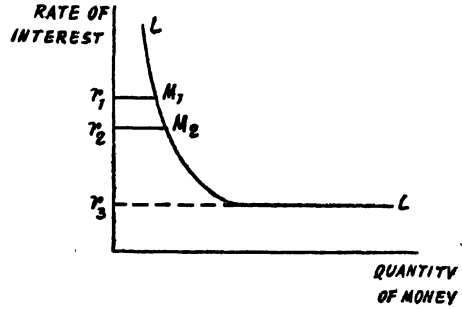
চিত্র নং ৭৬

এই চিত্রে যখন সুদের হার হইতেছে r_1, তখন লোকে r_1M_1 পরিমাণ টাকা হাতে রাখিতে চায়। যখন সুদের হার কমিয়া r_2 হয়, তখন লোকে r_2M_2 পরিমাণ টাকা হাতে রাখিতে চায়। টাকার যোগান নিরূপিত হয় দেশে প্রচলিত মোট টাকার পরিমাণ দ্বারা। সমাজে প্রচলিত টাকা জনসাধারণের হাতে ছড়াইয়া থাকে।

কেইন্‌সের মতে টাকার চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে সুদ নিরূপিত হয়। যদি টাকার যোগান স্থির থাকে অথচ নগদ টাকার জন্য চাহিদা বাড়িয়া যায়, তবে সুদের হার বাড়িয়া যায়। অথবা টাকার চাহিদা যদি স্থির থাকে এবং টাকার যোগান যদি বাড়িয়া যায় তবে সুদের হার কমিয়া যায়। ৭৭নং চিত্রে LL'হইতেছে টাকার চাহিদা রেখা এবং M_0S_0 হইতেছে টাকার যোগান রেখা, সুতরাং r_0 হইতেছে বাজারে সুদের হার। এই চিত্র হইতে বুঝা যাইতেছে যে টাকার যোগান
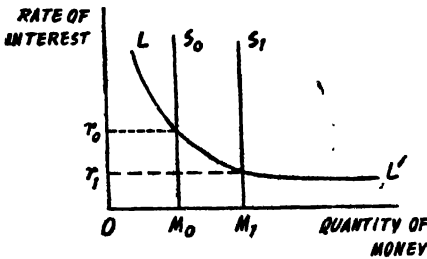
চিত্র নং ৭৭

বৃদ্ধি পাইলে সুদের হার কমে। কিন্তু যদি M_1S_1-এর পরও টাকার যোগান বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে আর সুদের হার নামানো যাইবে না। সুতরাং সুদের হার পরিবর্তিত করিয়া কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার এক নিম্ন সীমা আছে বলিয়া কেইনস্ মনে করেন। (সুদের হার শূন্যে নামিতে পারে না। কেননা, টাকার চাহিদা কখনও শূন্যে নামিতে পারে না।)

কেইন্সের সুদ তত্ত্বটির সমালোচনা (Criticisms of the Keynesian Theory of Interest): কেইনস্ টাকার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য অর্থনৈতিক অবস্থার উপর, যেমন মূলধনের চাহিদা ও যোগান ইত্যাদির উপর কেইনস্ বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করেন নাই। যাঁহাদের মতে সুদ ঋণগ্রহণযোগ্য মূলধনের চাহিদা ও যোগান দ্বারা নিরূপিত হয়, তাঁহাদের সহিত কেইন্সের তত্ত্বটির পার্থক্য শুধু এক জায়গায়; অপরাপর অর্থবিজ্ঞানীগণ টাকা ব্যতীত অন্যান্য সম্পদের চাহিদা ও যোগানের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, আর কেইনস্ শুধু টাকার চাহিদা ও যোগানের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। অধ্যাপক হিক্স দেখাইয়াছেন ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করিলে উভয় তত্ত্বেরই সিদ্ধান্ত এক।[১]

কিন্তু উভয় তত্ত্বেরই সিদ্ধান্ত একপ্রকার হইলেও কেইনস্ দুইটি বিষয় উপেক্ষা করিয়াছেন; তাহা হইতেছে, মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনীশক্তি (productivity) এবং সঞ্চয়ের প্রবণতা (thriftiness or propensity to save)। অধ্যাপক রবার্টসন (Prof Robertson) মনে করেন, কেইনস্ প্রদত্ত সুদের তত্ত্বটির ইহাই প্রধান ত্রুটি। দ্বিতীয়ত, ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বটির (অর্থাৎ সুদ হইতেছে সঞ্চয়ের পুরস্কার) ন্যায় কেইন্সের তত্ত্ব অনুযায়ীও আমরা যে সুদ নিরূপণ করি, তাহাই সঠিক সুদ (determinate interest) নহে। টাকার চাহিদা আয়ের উপর নির্ভরশীল; সামগ্রিকভাবে টাকার যোগান জাতীয় আয়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং প্রথমে আয় নিরূপিত হওয়া দরকার; আয় নিরূপণ না করিয়া আমরা যে টাকার চাহিদা ও যোগান নিরূপণ করি, তাহাতে সঠিক ও নিশ্চিত সুদ (determinate interest) ঠিক হয় না। সুতরাং কেইন্সের তত্ত্ব অনুযায়ী নিরূপিত সুদও অনিশ্চিত।

তৃতীয়ত, সুদ মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের দামের সমান, এই তত্ত্বটির ন্যায় কেইন্সের তত্ত্বটিতেও আমরা একই যুক্তির পুনরাবর্তন বা circular reasoning দেখিতে পাই। ফাটকা কারবারের অভিপ্রায় থাকার দরুণ টাকার জন্য লোকের যে চাহিদা থাকে, তাহা ফাটকা কারবারীদের ভবিষ্যৎ সুদ সম্বন্ধে ধারণার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে; কিন্তু বর্তমান সুদ সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকিলে ভবিষ্যৎ সুদ সম্বন্ধে কোন ধারণা করা সম্ভবপর নয়।[২]

1. "Properly followed up the two approaches lead to exactly the same results". *Hicks.*

2. সেইজন্য এক্ষেত্রে রবার্টসন বলিয়াছেন, "Rate of interest is what it is because it is

সুতরাং দেখা যাইতেছে, কেইনস্ ক্লাসিক্যাল তত্ত্বগুলির যে সমালোচনা করিয়াছিলেন, সেইগুলি তাঁহার নিজের তত্ত্বের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। ক্লাসিক্যাল তত্ত্বটির ন্যায় কেইন্সের তত্ত্বটিও সঠিক এবং নিশ্চিত সুদ নিরূপণ করিতে পারে না, এবং এই তত্ত্বটিতেও আমরা একই কথার পুনরাবর্তন দেখিতে পাই।[১]

চতুর্থত, কেইন্সের তত্ত্বে বাজারে একটি বিশেষ সুদের হারকেই গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বাজারে বহু প্রকারের সিকিউরিটি রহিয়াছে এবং ইহাদের প্রতিটির ক্ষেত্রে সুদের হার বিভিন্ন। পঞ্চমত, কোন কোন অর্থবিজ্ঞানী মনে করেন, সুদ নিরূপণে টাকার চাহিদা ও যোগান খুবই গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু কেইনস্ ফাটকা তহবিলের (Speculative Balance) উপর যতটা গুরুত্ব দিয়াছেন, ততটা গুরুত্ব না দিলেও চলে। সম্প্রতি সুদ নিরূপণে ফাটকা তহবিলের ভূমিকার ক্ষেত্রে অর্থবিজ্ঞানীগণ একমত নহেন। পঞ্চমত, কেইনস স্বল্প মেয়াদী অথবা দীর্ঘ মেয়াদী সুদের কোনটির কথা বলিয়াছেন তাহা পরিষ্কার নহে। সর্বশেষে সুদ যে শুধু টাকার ব্যাপার অথবা সুদ যে শুধু টাকা ছাড়া অন্যান্য সম্পদের চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে না, তাহা নহে। অধ্যাপক হান্সেন (Prof. Hansen) দেখাইয়াছেন, সুদ মূলতঃ চারিটি উপাদানের উপর নির্ভর করে; (১) টাকার চাহিদা, (২) মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তি, (৩) টাকার যোগান এবং (৪) মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ অথবা বিকল্পভাবে ভোগের প্রবণতা। ইহার মধ্যে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তি এবং টাকার চাহিদা সুদ নিরূপণে চাহিদার দিকটিকে প্রভাবিত করে এবং টাকার যোগান ও মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ টাকার যোগানের দিকটিকে প্রভাবিত করে সুতরাং, শুধু কেইন্সের তত্ত্বটি সুদ নিরূপণের দিক হইতে চিন্তা করিলে অসম্পূর্ণ (incomplete) হইবে।

সুদ নিরূপণে ঋণ গ্রহণযোগ্য পুঁজিতত্ত্ব (Loanable Fund Theory of determination of the Interest Rate): আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীদের মতে অনেকেই, যথা, রবার্টসন এবং হিক্স, মনে করেন যে, সুদ নিরূপিত হয় ঋণগ্রহণযোগ্য পুঁজির জন্য চাহিদা ও যোগানের দ্বারা।

অধ্যাপক রবার্টসনের মতে ঋণগ্রহণযোগ্য পুঁজি (Loanable Fund) গঠিত হয় নিম্নলিখিত উপাদান কর্তৃক—(১) মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ [এখানে মনে রাখিতে হইবে, রবার্টসনের মতে সঞ্চয় বলিতে বুঝায় পূর্বে অর্জিত আয় হইতে বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয়িত অর্থ বাদ দিয়া যাহা থাকে তাহা] (২) ব্যাংকগুলি প্রদত্ত অতিরিক্ত ঋণ (additional bank loans) (৩) আগেকার জমানো টাকা যাহা বর্তমানে ধার

---

expected to become other than it is. If it is not expected to become other than it is, there is nothing left to tell us what it is and why it is."

1. সেইজন্য অধ্যাপক হিক্স্ (Prof. Hicks) বলিয়াছেন—"Keynes left his theory of interest hanging by its own bootstraps."

দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে (dishoarding) এবং (৪) আগেই বিনিয়োগের জন্য নির্দিষ্ট ছিল এই রকম টাকা যাহা বর্তমানে বিনিয়োগ না করিয়া ধার দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে (disentanglings)।

ঋণগ্রহণযোগ্য পুঁজির যোগান অনেকগুলি উপাদানের উপর নির্ভর করে। তন্মধ্যে প্রধান উৎস হইল সঞ্চয়। তবে সব সঞ্চয়ই যে ঋণগ্রহণযোগ্য পুঁজি হিসাবে বিবেচিত হয়, তাহা নহে। ব্যক্তিগত সঞ্চয়, সরকারের দিক হইতে সঞ্চয় এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কিংবা শিল্পগুলির সঞ্চয়, প্রভৃতির মধ্যে যাহা ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য ধার দেওয়া যায় তাহাই ঋণগ্রহণযোগ্য পুঁজির অন্তর্ভুক্ত। ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অথবা জনসাধারণকে যে ঋণ প্রদান করিয়া থাকে, তাহাও ঋণগ্রহণযোগ্য পুঁজির অন্তর্ভুক্ত হয়। মোট সঞ্চয় হইতে জনসাধারণ যে টাকা সর্বদা হাতে রাখিয়া দিতে চায় (Hoarding) তাহা বাদ দিলে এবং তাহার সহিত ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট ক্রেডিট যোগ করিলে ঋণ দেওয়ার মত পুঁজির যোগান নিরূপিত হয়। অর্থাৎ,

$S-H+\triangle M=S_L$ এখানে S হইতেছে মোট সঞ্চয় (Gross Savings), H হইতেছে জনসাধারণের হাতে যে টাকা রাখিয়া দেওয়া হয় তাহা (Hoarding) $\triangle M$ হইতেছে ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট ক্রডিট, এবং S_L হইতেছে ঋণগ্রহণযোগ্য পুঁজির যোগান।

ঋণগ্রহণযোগ্য পুঁজির চাহিদা (Demand for Loanable funds) নিম্নলিখিত উপাদানগুলির উপর নির্ভরশীল, (১) বিনিয়োগের জন্য পুঁজির চাহিদা, (২) সরকারের দিক হইতে পুঁজির চাহিদা, (৩) ক্রেতাদের দিক হইতে পুঁজির চাহিদা এবং (৪) ফাটকা কারবারীদের পুঁজির চাহিদা। এক কথায় পুঁজির জন্য বেসরকারী এবং সরকারী উভয় দিক হইতেই চাহিদা থাকিতে পারে। আমরা ইহা নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করিতে পারি: $I+L_G=D_L$ এখানে, I হইতেছে ঋণগ্রহণযোগ্য পুঁজির জন্য বেসরকারী এবং ব্যক্তিগত চাহিদা (Private Investment demand), এবং L_G হইতেছে সরকারে দিক হইতে পুঁজির চাহিদা (Government demand for loans), D_L হইতেছে ঋণগ্রহণযোগ্য পুঁজির জন্য মোট চাহিদা।
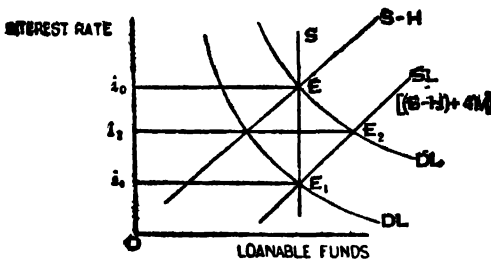
চিত্র নং ৭৮

৭৮নং চিত্র অনুযায়ী E_2 বিন্দুতে ঋণগ্রহণযোগ্য পুঁজির যোগান ইহার চাহিদার সমান হইয়াছে (অর্থাৎ $S_L = D_L$)। তখন সুদের হার হইতেছে i_2। কিন্তু E বিন্দুতে সঞ্চয় রেখা (S curve) S—H রেখাকে ছেদ করিয়াছে। অর্থাৎ এই বিন্দুতে জনসাধারণ টাকা হাতে রাখিয়া দিতে না চাহিয়া বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করিতে চায়। অধ্যাপক একলে (Prof.Ackley) মনে করেন যে (৫) স্থাণু

ভারসাম্যের (Static Equilibrium) ক্ষেত্রে Hoarding এবং ব্যাংক-সৃষ্ট ক্রেডিটের পরিমাণ শূন্য হইবে। অধ্যাপক একলের মতে চিরাচরিত ঋণগ্রহণযোগ্য পুঁজির তত্ত্বটি অনেক সময় ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে। কারণ আয়, সঞ্চয়, বিনিয়োগ প্রভৃতি হইতেছে কতিপয় প্রবহমান উপাদান (flow concepts) ; কিন্তু Hoarding কিংবা Dishoarding হইতেছে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের উপাদান (stock concepts)। স্থতরাং এই দুই উপাদানকে একত্রিত করিয়া যে তত্ত্বটি আলোচিত হইতেছে, ইহা অনেক ক্ষেত্রেই অস্পষ্টতার সৃষ্টি করিতে পারে।[১]

ঋণগ্রহণযোগ্য পুঁজির জন্য চাহিদা কত হইবে তাহা নির্ভর করে ঐ পুঁজি বা মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশক্তির উপর এবং তাহা বিনিয়োগের কাজে কতটা লাভজনকভাবে খাটানো যাইতে পারে তাহার উপর। ঋণগ্রহণযোগ্য পুঁজির চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতা সৃষ্টি হইলে ভারসাম্য অর্জিত হয় এবং তখন স্থদ নিরূপিত হয়। যদি ঋণগ্রহণযোগ্য পুঁজির জন্য চাহিদা ইহার যোগান অপেক্ষা বেশী হয়, তবে স্থদ বেশী হয় এবং যদি ইহার যোগান ইহার চাহিদা অপেক্ষা বেশী হয় তবে স্থদ কম হয়।

আমরা এই তত্ত্বটির সমালোচনা করিতে পারি। এই তত্ত্বটি একটি সঠিক ও নিশ্চিত স্থদ (determinate interest) নিরূপণ করিতে পারে না। কারণ, ঋণের কতটা প্রয়োজন তাহা যে ব্যক্তি ধার করে তাহার আয়ের উপর নির্ভর করে। আবার যে পুঁজি হইতে ধার দেওয়া হয় তাহাও আয়ের উপর নির্ভর করে ; কারণ, সঞ্চয় আয়ের উপর নির্ভরশীল। স্থতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত আয় নিরূপিত না হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত যে স্থদ নিরূপিত হইতেছে, তাহা নিশ্চিত স্থদ নয়।

এই তত্ত্বটির সমালোচনা

দ্বিতীয়ত, এই তত্ত্বে টাকার জন্য চাহিদার কথা উল্লেখ করা হয় নাই এবং টাকার চাহিদা যে কারণগুলির উপর নির্ভর করে সেইগুলি বিবেচিত হয় নাই। স্থতরাং এই তত্ত্বটিও অসম্পূর্ণ।

স্থদের হার কি কখনও শূন্যে নামিতে পারে ?ঃ স্থদের হার কখনও শূন্যে নামিতে পারে কিনা সেই বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে চাহিদা ও যোগান এই দুই দিক হইতেই বিষয়টি বিবেচনা করিতে হইবে। প্রথমত, অর্থনৈতিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নিত্য নূতন চাহিদার সৃষ্টি হয়। এই চাহিদা যাহাতে মিটিতে পারে সেইজন্য মানুষকে সবসময়েই নূতন জিনিসপত্র উৎপাদন করিতে হয়, ইহার ফলে মূলধনের চাহিদা সব সময়েই থাকিবে। যেহেতু সবসময়েই মূলধনের জন্য কিছু না কিছু চাহিদা থাকে, সেইজন্য স্থদের হার কখনই শূন্যে নামিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, কেইনস্ তাঁহার "Liquidity Preference" তত্ত্বে দেখাইয়াছেন যে মানুষের টাকার

১। সেইজন্য একলে (Ackley) বলেন—"The Loanable Funds theory should be treated as a disequilibrium theory."

চাহিদা কখনও শূন্যে নামিতে পারে না। ইহাকে "Liquidity Trap" বলা হয়। সুতরাং সুদের হার কখনও শূন্যে নামিতে পারে না। তৃতীয়ত, যোগানের দিক হইতে বিবেচনা করিয়াও বলা যায়, এমন অবস্থা কখনই আসিবে না যখন মানুষ বিনা সুদে তাহার সঞ্চিত মূলধনের একটি অংশ অপরকে ধার দিয়া বসিবে। যদি সুদের হার কিছুই না থাকে, তবে মানুষ টাকা ধার না দিয়া নিজেই সব টাকা জমাইয়া রাখিবে। সুদ পাওয়া যায় বলিয়াই মানুষ টাকা ধার দেয়। সুতরাং সুদের হার কখনই শূন্যে নামিতে পারে না।

সুদ প্রদান করার যৌক্তিকতা (Justification for the payment of interest): সুদ নেওয়া উচিত অথবা অনুচিত, এই সম্বন্ধে অতি প্রাচীনকাল হইতেই অর্থবিজ্ঞানীগণ আলোচনা করিয়াছেন। এরিস্টটল সুদ গ্রহণ করাকে 'স্বাভাবিক' বলিয়া কখনই মনে করিতে পারেন নাই। এরিস্টটলের পর অনেকেই এই ধারণা পোষণ করিতেন যে, টাকা ধার দিলে সুদ গ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ যে ব্যক্তি টাকা ধার দিয়াছে, তাহার ক্ষমতা আছে বলিয়াই সে টাকা ধার দিতেছে। টাকা ধার দেওয়ার জন্য তাহাকে বিশেষ ক্ষতি স্বীকার অথবা ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় না।

কার্ল মার্ক্স (Karl Marx) সুদ গ্রহণ করার নীতিটির তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে পুঁজিপতিগণ সমাজের সমুদয় অর্থনৈতিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করেন, পুঁজিপতিদের নিকট হইতে যাহারা ঋণ গ্রহণ করে, তাহারা আবার শ্রমিক নিয়োগ করিয়া সেই ঋণ উৎপাদনের কাজে লাগাইয়া প্রচুর লাভ করে এবং শ্রমিকদের উদ্বৃত্ত মূল্য (surplus value) আত্মসাৎ করিয়া তাহারা পুঁজিপতিদের সুদ প্রদান করিয়া থাকে। মার্ক্সের মতে সুদ গ্রহণ করাও পরোক্ষভাবে শ্রমিকদের শোষণ বাড়াইয়া দেয়।

কিন্তু, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ধার দেওয়ার জন্য সুদ গ্রহণের একটি যৌক্তিকতা আছে। ধার দেওয়ার জন্য সুদ পাইবার কোন সম্ভাবনা না থাকিলে পুঁজিপতিগণ ধার প্রদান করিতে উৎসাহিত হয় না। সাধারণতঃ, সুদ বেশী হইলে সঞ্চয় বেশী হয়। সুদ কম হইলে বিনিয়োগের খরচ কমিয়া যায় এবং বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়া যায়।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও সুদের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের সবগুলি উপাদানের উপরই সামাজিক মালিকানা স্বীকৃত। কিন্তু সমাজ-তন্ত্রেও দুইভাবে সুদের অস্তিত্ব দেখা যায়। প্রথমত, যে ক্ষেত্রে মূলধন নিয়োগ করিলে সর্বাপেক্ষা অধিক আয় সৃষ্টি হয়, সেই ক্ষেত্রেই মূলধন বিনিয়োগ করা হয়। ইহাকেই মূলধনের ব্যবহারজনিত আয় বা সুদ বলা যাইতে পারে। অনেক সময় ভবিষ্যতে লাভ হইবে এই আশায় বর্তমানে শ্রমিকদের আয়ের অংশ একটু কমাইয়া দেওয়া হয়। কারণ শ্রমিকদের এই আয় কমিয়া যাওয়াটাই সুদ। কিন্তু, ধনতান্ত্রিক সমাজে যেমন

পুঁজিপতি সুদ হিসাবে অর্জিত অর্থ নিজেই গ্রহণ করে, সমাজতন্ত্রে তাহা হয় না। সেইক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে মূলধন বিনিয়োগ হইতে যাহা আয় হয় তাহাই সুদ এবং তাহা সমাজের জন্যই রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যবহৃত হয়।

সুদের হারের তারতম্য (Differences in Rates of Interest): সবরকম ঋণের জন্য সুদের হার সমান থাকে না। প্রথমত, যদি যোগানের তুলনায় মূলধনের চাহিদা বাড়িয়া যায় তবে লোকে বেশী সুদ দিয়াও মূলধন ধার করিলে চাহে এবং মহাজনও বেশী সুদে মূলধন ধার দেয়।

দ্বিতীয়ত, টাকা ধার দেওয়ার ঝুঁকির উপরেও সুদের হারের তারতম্য নির্ভর করে। খাতক যদি দূরে থাকে এবং খুব নির্ভরযোগ্য না হয়, তবে স্বভাবতঃই সুদের হার কিছু বেশী হয়। আবার, খাতকের আর্থিক অবস্থা যদি ভাল না থাকে এবং নিয়মিত টাকা শোধ করিবার ক্ষমতা না থাকে, তখনও সুদের হার বেশী হয়। কারণ, সেক্ষেত্রে মহাজন জানে যে সহজে টাকা ফেরৎ পাওয়া যাইবে না। খাতকের নিকট হইতে টাকা আদায় করার কাজে যদি ঝামেলার সম্ভাবনা থাকে, তবে সুদের হারও বেশী হয়। অনেক সময় কোন জিনিস বন্ধক রাখিয়া খাতক টাকা ধার করে। যে জিনিস বন্ধক রাখা হয়, তাহার মূল্যের উপরও সুদের হারের তারতম্য নির্ভর করে। যদি কেহ সোনার গহনা অথবা সরকারী ঋণপত্র জামানত রাখিয়া টাকা ধার করে, তবে মহাজন তাহার জন্য সুদের হার কিছু কম ধার্য করে। খাতক যদি বাজারের কোন সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান হয় তবে সেক্ষেত্রে অনেক সময় সুদের হার কিছু কম হয়। সর্বশেষে, স্বল্প-মেয়াদী ঋণ এবং দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণের জন্যও সুদের হারের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। সাধারণতঃ দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণের জন্য সুদের হার বেশী হয়। দীর্ঘকালে যখন মহাজন টাকা ধার দেয়, তখন তাহাকে অনেক দিনের জন্য টাকা হাতছাড়া করিতে হয়। ইহাতে নগদ টাকার জন্য তাহার পছন্দকে অনেক পরিমাণে ত্যাগ করিয়াই সে খাতককে টাকা ধার দেয়। কিন্তু, সর্বদাই যে দীর্ঘকালীন ঋণের জন্য সুদের হার বেশী হয়, তাহা নহে! প্রকৃতপক্ষে সুদের হার কত বেশী হইবে তাহা অনেক পরিমাণে ঋণগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের বা ব্যক্তির উপরেও নির্ভর করে। আবার, ঋণ প্রদান করিবার সময় মহাজন যে সিকিউরিটি পায় তাহা যদি এমন হয় যে বাজারে সে ইচ্ছা করিলেই এই সিকিউরিটি বিক্রয় করিতে পারিবে অথবা ইহার বিপক্ষে সে নিজেও ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে তবে সে অল্প সুদেও টাকা ধার দিতে পারে। স্বল্প মেয়াদী ঋণের জন্য সাধারণতঃ সুদের হার অল্প হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষে অথবা প্রতিষ্ঠান বিশেষে অল্পমেয়াদী ঋণের জন্য দেয় সুদও বেশী হইতে পারে।

অল্পমেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের জন্য সুদের তারতম্য

মূলধন-সামগ্রীর নীট উৎপাদনীশক্তি এবং বিনিয়োগ-প্রকল্প নির্বাচনে সুদের ভূমিকা (Net Productivity of a capital good and the role of the Rate of Interest in the selection of investment projects):

মূলধন-সামগ্রীর নীট উৎপাদনীশক্তি কত তাহা পরিমাপ করিতে হইলে প্রথমেই আমাদের দেখিতে হইবে মূলধন সামগ্রীটি ব্যবহার করিলে তাহা হইতে কতটা বেশী উৎপাদন বা আয় হইবে, এবং এই বাড়তি উৎপাদন পাইবার জন্য মূলধন সামগ্রীটি ব্যবহার করিতে কত খরচ হইবে ও মূলধন সামগ্রীটির ক্ষয়-ক্ষতি (depreciation) বাবদ কত খরচ হইবে। মোট আয় অথবা উৎপাদন (Gross Revenue or output) হইতে এই মোট খরচ বাদ দিলে যাহা নীট উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহাই সেই মূলধন সামগ্রীর নীট উৎপাদিকা শক্তি (Net productivity of a capital good)।

সুদ নিরূপণে যখন মূলধনের যোগান ও চাহিদার ভূমিকা বিবেচিত হয়, তখন কোন মূলধন সামগ্রীর জন্য চাহিদা ইহার নীট উৎপাদনীশক্তির উপর ভিত্তিশীল থাকে। যদি মূলধন-সামগ্রীর যোগানের অনুপাতে চাহিদা বেশী হয়, তবে সেই সামগ্রীটি ধার করিবার জন্য সুদও বেশী দিতে হয়।

কোন বিনিয়োগ প্রকল্প গৃহীত হওয়া উচিত কিনা সেই সম্পর্কে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ খরচ ও উপকারের নীতি (cost-benefit principle) প্রযুক্ত হয়। কোন বিনিয়োগ প্রকল্পে যে মূলধন ব্যবহৃত হইবে তাহার যোগান কত হইবে তাহা ইহার যোগান-দামের (supply-price) উপর নির্ভরশীল। এই যোগান-দাম মূলতঃ সুদের হারের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, সুদের হার যদি বেশী হয়, তবে মূলধন সংগ্রহ করিবার খরচ বেশী হইবে। সুদ বেশী হওয়ার অর্থ হইতেছে ধার করার খরচ (cost of borrowing) বৃদ্ধি। যদি সুদের হার বেশী হয়, তবে মূলধন সহজলভ্য হয় না এবং সেইক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের সরবরাহ কম হইতে পারে। স্বভাবতঃই যে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সহজলভ্য নয় অথবা যে মূলধন ধার করিতে খরচ বেশী হয়, সেই বিনিয়োগ-প্রকল্প নাও নির্বাচিত হইতে পারে।

কিন্তু, বিনিয়োগ-প্রকল্পের নির্বাচন শুধু বিনিয়োগ খরচের (cost of investment) উপরেই নির্ভর করে না। বিনিয়োগ হইতে কতটা লাভ পাওয়া যাইতে পারে সেই আশার উপরেও (expectation of profits or anticipated yields from investment of capital assets) বিনিয়োগ নির্ভরশীল হয়। লর্ড কেইনস্‌ও দেখাইয়াছেন যে বিনিয়োগ-ক্রিয়া (Investment Function) দুইটি উপাদানের উপর নির্ভরশীল ; ইহার মধ্যে একটি হইতেছে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা (Marginal Efficiency of Capital) এবং অপরটি হইতেছে সুদের হার (Rate of Interest)। এই দুইটি উপাদানের মধ্যে সুদের হার অপেক্ষা মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা বেশী কার্যকর হয়—এবং ইহা মূলতঃ নির্ভর করে মূলধন বিনিয়োগ করিলে কতটা লাভের সৃষ্টি হইতে পারে তাহার উপর। তাহা ছাড়া, বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি নিবারণের জন্য খরচও (Replacement cost) মূলধনের

যোগান-দামকে প্রভাবিত করে। সুতরাং শুধু সুদই যে কোন বিনিয়োগ প্রকল্প নির্বাচনের প্রধান উপাদান তাহা নহে।

বিনিয়োগের সুদ-স্থিতিস্থাপকতা (interest-elasticity of investment) সম্পর্কে অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। অধ্যাপক রবার্টসন প্রমুখ অর্থবিজ্ঞানীদের মতে সুদের হার কমিয়া গেলে বিনিয়োগ বাড়ে এবং সুদের হার বাড়িয়া গেলে বিনিয়োগ কমিয়া যায়। কিন্তু, কেইন্সীয় মতবাদে ইহা স্বীকৃত হয় না। হিক্স, স্যামুয়েলসন প্রমুখ অর্থবিজ্ঞানীগণ মনে করেন, বিনিয়োগ মূলতঃ মাল্টিপ্লায়ার এবং একসেলারেটরের (accelerator) পারস্পরিক ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। সুদের হার বিশেষ একটি বিনিয়োগকে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রভাবিত করিতে পারিলেও সামগ্রিকভাবে বিনিয়োগ নীতি ভবিষ্যৎ লাভের আশার উপর নির্ভরশীল।

Exercise

1. Account for the differences in rates of interest for different kinds of loans. Discuss brifly the Keynesian theory of interest.

[বিভিন্ন প্রকার ঋণের জন্য সুদের হারের তারতম্য হয় কেন? কেইনসের সুদ তত্ত্বটির সংক্ষেপে আলোচনা কর।] (২৩১ পৃষ্ঠা ; ২২৩- ২২৭ পৃষ্ঠা)

2. Define interest. Distinguish between gross interest and net interest. Is interest a price?

[সুদের সংজ্ঞা প্রদান কর। স্থূল সুদ ও নীট সুদের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। সুদকে কি মূল্য বলা যায়?] (২২০-২২১ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the classical theories of the determination of interest.

[সুদ নিরূপণে ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বগুলি আলোচনা কর।] (২২১-২২২ পৃষ্ঠা)

4. Write a note on the Time Preferenee Theory of Interest.

[সুদ নিরূপণে সময়ের পছন্দ তত্ত্বের উপর একটি টীকা লিখ।] (২২২-২২৩ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the statement that the rate of interest is determined by demand for money and supply of money.

[সুদের হার টাকার চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নিরূপিত হয়,—এই উক্তিটি আলোচনা কর।] (২২৩-২২৭ পৃষ্ঠা)

6. Explain the relationship, if any, between liquidity preference and the rate of interest.

[নগদ টাকা হাতে রাখিবার চাহিদা এবং সুদের হারের মধ্যে যদি কোন সম্পর্ক থাকে তবে তাহা ব্যাখ্যা কর।] (২২৩-২২৭ পৃষ্ঠা)

7. Can the rate of interest ever become zero?

[সুদের হার কি কখনও শূন্যে নামিতে পারে?] (২২৯-২৩০ পৃষ্ঠা)

8. Examine the economie justification for the payment of interest on Capital.

[মূলধনের উপর সুদ প্রদানের অর্থ নৈতিক যুক্তি ব্যাখ্যা কর।] (২৩০-২৩১ পৃষ্ঠা)

9. Discuss the Loanable Funds Theory for the determination of the rate of interest. [সুদের হার নিরূপণে ঋণ গ্রহণযোগ্য পুঁজিতত্ত্ব আলোচনা কর।] (২২৭-২৯ পৃষ্ঠা)

10. **Explain why interest should be paid.**

[সুদ প্রদান করা উচিত কেন তাহা ব্যাখ্যা কর।] (২০০-২০১ পৃষ্ঠা)

11. **"Rate of interest is a purely monetary phenomenon." Examine the statement.**

[সুদের হার প্রকৃতপক্ষে একটি টাকার ব্যাপার",]—উক্তিটি পরীক্ষা কর। (২২৩-২২৭ পৃষ্ঠা

12. **Define net productivity of a capital good and explain how the rate of interest helps in the selection of investment projects.**

[মূলধন সামগ্রীর নীট উৎপাদন শক্তির সংজ্ঞা প্রদান কর, এবং বিনিয়োগ প্রকল্পের নির্বাচনে সুদের হার কি ভাবে সাহায্য করে তাহা ব্যাখ্যা কর।] (১৩১-২৩৩ পৃষ্ঠা)

অষ্টাদশ অধ্যায় | লাভ (Profit)

লাভের সংজ্ঞা (Definition of Profit): উৎপাদনের অন্যতম উপকরণ হইতেছে সংগঠন (Organisation) এবং এই সংগঠনের কাজ করিবার দায়িত্ব হইতেছে উদ্যোক্তার (Entrepreneur)। উদ্যোক্তা সুষ্ঠুভাবে উৎপাদনের জন্য যে পরিশ্রম করে তাহার পুরস্কার হইতেছে লাভ। উদ্যোক্তা ভূমি, শ্রমিক এবং মূলধনের সাহায্যে এবং নিজের কর্মকুশলতা ও সংগঠন শক্তি অনুযায়ী উৎপাদন করে। উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয়ের ফলে প্রাপ্ত অর্থ হইতে উদ্যোক্তা ভূমির জন্য ইহার মালিককে খাজনা, শ্রমের জন্য শ্রমিককে মজুরি এবং মূলধনের জন্য ইহার মালিককে সুদ প্রদান করে। যাহার যাহা পাওনা তাহা সব কিছু মিটাইয়া দিয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তবে সেই উদ্বৃত্ত উদ্যোক্তার লাভ। লাভের একটি সহজ সংজ্ঞা হইতেছে এই যে উহা মোট খরচ অপেক্ষা মোট বিক্রয়লব্ধ আয় যত বেশী সেই পরিমাণে সমান।

লাভ=মোট বিক্রয়লব্ধ আয় (Total Revenue) − মোট খরচ (Total cost)

কিন্তু এইভাবে লাভের সংজ্ঞা দিলে অনেক কিছুই বলা হয় না। প্রকৃতপক্ষে লাভের সংজ্ঞা প্রদান করিবার জন্য প্রচেষ্টা অনেক হইয়াছে। সেইজন্য এই বিষয়ে অনেক তত্ত্বেরও অবতারণা হইয়াছে। 'লাভ' সম্বন্ধে অনেক সংজ্ঞা অর্থবিজ্ঞানীগণ দিয়াছেন। কোন কোন অর্থবিজ্ঞানীর মতে 'লাভ' হইতেছে উদ্যোগের পুরস্কার

(reward of enterprise), কাহারও মতে লাভের সৃষ্টি হয় উদ্যোক্তার ঝুঁকি বহন করিবার ক্ষমতা (risk-bearing capacity), হইতে কাহারও মতে লাভের সৃষ্টি হয় বাজারে একচেটিয়ামূলক ব্যবসায়ের উপাদান হইতে ; আবার কাহারও মতে লাভের সৃষ্টি হয় গতিশীল সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং উৎপাদন পদ্ধতির প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হইতে। সুতরাং 'লাভ' সম্বন্ধে একটি একক সংজ্ঞা দেওয়া খুব কঠিন। আমরা শুধু এইটুকু বলিতে পারি, লাভ মোট খরচ অপেক্ষা মোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের বাড়তি অংশ, এবং তাহা হইতেছে উদ্যোক্তার ঝুঁকি বহনের ক্ষমতা, সংগঠনী শক্তি, গতিশীল সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো ও উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন, একচেটিয়া বাজার ইত্যাদি কোন একটি অথবা একাধিক উপাদানের দরুণ।

লাভের পরিমাণ দুইভাবে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে,—একটি হইতেছে স্থূল লাভ (gross profit) এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে নীট লাভ (net profit)। মোট লাভের পরিমাণ হইতেই নীট লাভের পরিমাণ বাহির করিতে হয়।

স্থূল লাভ এবং নীট লাভ (Gross Profit and Net Profit) : উৎপাদন হইতে মোট যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহা যদি উৎপাদকের মোট খরচ অপেক্ষা বেশী হয়, তবে মোট খরচ হইতে এই টাকার পরিমাণ যত বেশী তাহাই অর্থশাস্ত্রে স্থূল লাভ (Gross Profit) হিসাবে পরিগণিত হয়। এই স্থূল লাভ হইতে উদ্যোক্তা সরকারকে কর প্রদান, ব্যবসায়ের রিজার্ভ ফাণ্ডের জন্য কিছু টাকা সংরক্ষণ এবং শিল্পের বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি নিবারণের জন্য কিছু টাকা সংরক্ষণ করার পর যে টাকা তাহার হাতে থাকে, তাহাই তাহার নীট লাভ (Net Profit)।

অন্যান্য উপাদানের আয়ের সহিত লাভের পার্থক্য (Differences between Profit and other factor-incomes) : লাভের প্রকৃতিতে অন্যান্য উপাদানের আয়ের সহিত কতিপয় পার্থক্য দেখা যায়। প্রথমত, লাভ অন্যান্য উপাদানের আয়ের ন্যায় পূর্ব-নির্ধারিত নয়। শ্রমিকের মজুরি অথবা মূলধনের জন্য সুদ পূর্ব-নির্ধারিত থাকে। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য উপাদানের আয় কখনও শূন্যে নামিতে পারে না। আমরা এই কথা বলিতে পারি না যে শ্রমিকের শ্রমের জন্য মজুরি থাকিবে না। অথবা মূলধনের মালিক তাহার মূলধন ধার দিলে সুদ পাইবে না। কিন্তু লাভের ক্ষেত্রে আমরা এমন অবস্থাও দেখিতে পাই যেখানে উদ্যোক্তা লাভ তো করিতেই পারে না, বরং তাহার অনেক লোকসান হয়।

তৃতীয়ত, অন্যান্য উপাদানের আয় খুব ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু লাভের পরিমাণ হঠাৎ বেশী পরিমাণে পরিবর্তিত হইতে পারে। দামের পরিবর্তনের সহিত অন্যান্য উপাদানের আয় মোটামুটি স্থির থাকিলেও অথবা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইলেও লাভের পরিমাণ মোটামুটি স্থির থাকে না। ("Profit fluctuates more than any other kind of income···Profit responds immediately to a change in price ; other incomes are adjusted more slowly and less

violently"). জাতীয় আয়ের বণ্টন করিবার সময় অন্যান্য উপাদানের (জমি, শ্রম ও মূলধন) প্রাপ্য দিয়া যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহাই লাভ।

লাভের উপাদান (Elements of Profit): লাভের অনেক উপাদান আছে এবং এই বিভিন্ন উপাদানের উপর বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ্ অনেক তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। উদ্যোক্তাকে লাভের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করিতে হয় ইহাকে অনেক সময় উদ্যোগের পুরস্কার (Reward of enterprise) বলা হয়।

উদ্যোগের পুরস্কার

দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়ে সব সময়েই কিছু ঝুঁকির (Risk সম্ভাবনা আছে। ভবিষ্যতে চাহিদার কিরূপ উঠানামা হইবে সেই সম্বন্ধে কিছু ধারণা করিয়া ব্যবসায় বিনিয়োগ করিতে হয়। এই ঝুঁকির মধ্যে আবার কতিপয় ঝুঁকি আছে যেগুলির বিরুদ্ধে আগেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর। যেমন, মোটর গাড়ী বীমা (Motor Insurance) অথবা কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের বিরুদ্ধে বীমা (Fire Insurance) করা সম্ভবপর। যে সকল ঝুঁকির বিরুদ্ধে আগেই বীমা করা যায় না, সেই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বেশী থাকিলে ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করিবার সাহস থাকা চাই। সব উদ্যোক্তার ঝুঁকি বহন করিবার ক্ষমতা (Risk-bearing capacity) সমান নহে। ঝুঁকি বহন করিবার পুরস্কার উদ্যোক্তার লাভের একটি অঙ্গ। ব্যবসায়ে এই অনিশ্চয়তা অথবা ঝুঁকিই লাভের উৎস। যদি লাভের সম্ভাবনা না থাকিত, তবে কোন উদ্যোক্তাই ঝুঁকির ভার বহন করিতে রাজী হইত না।

ঝুঁকি বহনের পুরস্কার

তৃতীয়ত, উদ্যোক্তার যদি বাজারে একচেটিয়া অধিকার (Monopoly power) থাকে, তবে সে জিনিসের দাম তাহার উৎপাদনের খরচ অপেক্ষা অনেক বেশী ধার্য করিতে পারে। কোন কোন উদ্যোক্তা কতিপয় বিশেষ জিনিসের পেটেন্ট একান্ত নিজস্ব রাখিতে পারে। সেইক্ষেত্রে তাহারা বাজারে একচেটিয়া কারবারের সুবিধা ভোগ করে এবং অতিরিক্ত লাভ করে। এই ধরণের লাভকে বলা হয় একচেটিয়া কারবারের লাভ বা অতিরিক্ত মুনাফা (Monopoly Profit or Excess Profit)।

বাজারে একচেটিয়া অধিকারের ফলে উদ্যোক্তাদের লাভ

চতুর্থত, বাজারে যদি একচেটিয়া কারবারের পরিবর্তে বিক্রেতাদের মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে তবে বিক্রেতাগণ উৎপাদনে স্বাভাবিক লাভ (Normal Profit) করে। এই লাভের পরিমাণ উৎপাদনের খরচের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। পঞ্চমত, অনেক সময় কতিপয় অভাবনীয় কারণে যেমন হঠাৎ যুদ্ধ আরম্ভ হইলে) জিনিসপত্রের দাম হঠাৎ বাড়িয়া যাইতে পারে। তাহাতে উৎপাদকগণ কিছু লাভ করিতে পারে। ইহাকে যুদ্ধকালীন মুনাফা (War-time profit) বা "Windfall Profit" বলে।

অভাবনীয় কারণ

ষষ্ঠত, গতিশীল (Dynamic) সমাজে উৎপাদন পদ্ধতির প্রতিনিয়ত পরিবর্তন

হইতেছে। উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং ব্যবসায়ে বিনিয়োগের কাঠামোর পরিবর্তন হইলে অনেক সময় উৎপাদক কিছু মুনাফা অর্জন করে। আমেরিকার বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ জে. বি. ক্লার্ক (J. B. Clark) দেখাইয়াছিলেন যে স্থাণু সমাজে (Stationary Society) জনসংখ্যা, উৎপাদন পদ্ধতি ইত্যাদির কোন পরিবর্তন হয় না বলিয়া উৎপাদন লাভ দেখা যায় না ; যে মুহূর্তে সমাজে অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন আরম্ভ হয় সেই সময়ে লাভের সূচনা হয়। কখনও কখনও নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের (innovations) ফলে লাভের হার বাড়িয়া যাইতে পারে। বিশেষতঃ যে উদ্যোক্তা সকলের আগে কোন নূতন যন্ত্রপাতির প্রবর্তন করিতে পারে, সে সর্বাপেক্ষা বেশী লাভ করে।

সমাজের পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক কাঠামো

উপরে লাভের যে সকল উপাদান আলোচিত হইল, সেইগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায়, লাভের কোন নির্দিষ্ট কারণ বা উপাদান নাই, অনেকগুলি উপাদানের বা কারণের ফলে লাভের সৃষ্টি হইতে পারে। যখন উৎপাদনে লাভের সৃষ্টি হয়, তখন সেই লাভের কারণ শুধু একটি নহে, অনেকগুলি উপাদান হইতে পারে ; ইহা ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা, সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন, উদ্যোক্তার পরিশ্রম, ইত্যাদি অনেকগুলি উপাদান হইতে পারে।

স্বাভাবিক লাভ (Normal Profit) : স্বাভাবিক লাভ বলিতে আমরা বুঝি সেই লাভ যাহা না পাইলে উদ্যোক্তা কোন কিছুই উৎপাদন করিত না, যাহা উদ্যোক্তাকে ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিতে অথবা উৎপাদন করিতে প্রণোদিত করে অথবা যাহা উদ্যোক্তা স্বভাবতঃই পাইবার আশা রাখে। বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা না থাকিলে, অর্থাৎ যদি বাজারে কিছু পরিমাণ একচেটিয়া কারবার থাকে, তবে উদ্যোক্তা অস্বাভাবিক লাভ (abnormal profit) বা অতিরিক্ত লাভ (excess profit) অর্জন করিতে পারে। কিন্তু পূর্ণ প্রতিযোগিতায় (যখন বাজারে অসংখ্য উদ্যোক্তা থাকে) প্রত্যেক উদ্যোক্তাই দীর্ঘ সময়ে স্বাভাবিক লাভ অর্জন করে। যখন দাম গড় উৎপাদন খরচের সমান হয়, তখন কিছুটা লাভ সেই উৎপাদন খরচের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে ; ইহাকেই স্বাভাবিক লাভ বলে। উপরের চিত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘ সময়ে একটি ফার্ম কি অবস্থায় স্বাভাবিক লাভ অর্জন করে, তাহা দেখান হইল।
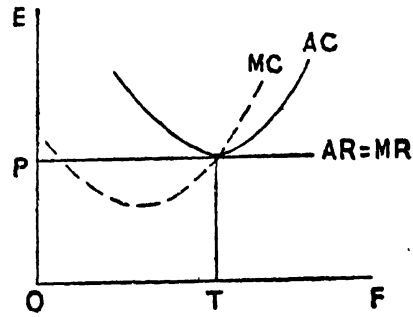
চিত্র নং ৭৯

এই চিত্রে যেখানে দাম নিরূপিত হইয়াছে OP, সেখানে দাম সর্বনিম্ন গড়

খরচ (minimum average cost) এবং প্রান্তিক খরচের (marginal cost) সমান। এই গড় খরচের মধ্যেই কিছু পরিমাণ লাভ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই লাভটুকু না পাইলে উদ্যোক্তা কোন কিছুই উৎপাদন করিতে উৎসাহী হইত না।

পুর্ণ প্রতিযোগিতায় অসংখ্য বিক্রেতা থাকে বলিয়া এবং যে কোন নূতন বিক্রেতাই স্বাধীনভাবে বাজারে প্রবেশ করিতে পারে বলিয়া তাহাদের মধ্যে দারুণ প্রতিযোগিতা হয়, এবং এই প্রতিযোগিতার ফলেই দাম চূড়ান্তভাবে সর্বনিম্ন গড় খরচের সমান হয়। তাহা ছাড়া, পুর্ণ প্রতিযোগিতায় কোন বিক্রেতার পক্ষেই দীর্ঘ সময়ে অতিরিক্ত লাভ অর্জন করা সম্ভবপর নয়। কারণ, সব বিক্রেতাই এক ধরণের জিনিস বিক্রয় করে এবং সব ক্রেতারই চাহিদা পুর্ণ স্থিতিস্থাপক। এই অবস্থায় কোন বিক্রেতার পক্ষেই দীর্ঘকালেও গড় খরচের অতিরিক্ত দাম চাহিয়া বসা সম্ভবপর হয় না। সেইজন্য সব বিক্রেতা গড় খরচের মধ্যেই কিছু পরিমাণে লাভ ধরিয়া লয়; এই লাভটুকু-না ধরিলে তাহাদের কোন জিনিস উৎপাদন করিবার কোনই সার্থকতা থাকিবে না। এই লাভই হইতেছে স্বাভাবিক লাভ (normal profit)।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে লাভ (Profits under a Socialistic Regime): সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমুদয় শিল্প-বাণিজ্য, সম্পত্তি, উৎপাদনের উপাদান প্রভৃতির উপর সামাজিক মালিকানা (social ownership) থাকে। যে সমস্ত দেশে ব্যক্তিগত মালিকানা (private ownership) থাকে, সেই দেশগুলিতে উদ্যোক্তাগণ ব্যবসায়-বাণিজ্যে লাভ অর্জন করিবার চেষ্টা করে। ব্যবসায়ে লাভবান না হইলে কোন উদ্যোক্তাই পরিণামে কিন্তু উৎপাদন করিবে না। লাভ অর্জন করিবার আশায় উৎপাদকগণ ব্যক্তিগত মালিকানায় উৎপাদন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখে। কিন্তু সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত মালিকানার স্থলে সমাজিক মালিকানা বা রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া রাষ্ট্রই সেখানে সমস্ত ব্যবসায়, শিল্প, বাণিজ্য অথবা উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। সুতরাং ব্যবসায়ে লাভ হইলে তাহা রাষ্ট্রীয় তহবিলে বা সামাজিক তহবিলে জমা হয়। আবার ব্যবসায়ে ক্ষতি হইলে সেই লোকসানের ফলভোগ রাষ্ট্রের সমস্ত অধিবাসীই করে। ব্যক্তিগত উদ্যোগের দরুণ যে লাভ, তাহা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দেখা যায় না। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যবসায়-বাণিজ্যে যে লাভ হয়, তাহা কোন ব্যক্তিবিশেষের পকেটে যায় না, তাহা জমা হয় সরকারের তহবিলে; কোন শিল্প বা ব্যবসায় হইতে কত লাভ হইবে, তাহা সরকার নিজেই প্রয়োজন অনুযায়ী ঠিক করিতে পারেন। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারকেই ঠিক করিতে হয় কোন্ দ্রব্য উৎপাদন করিলে এবং কোন্ উৎপাদন পদ্ধতি অবলম্বন করিলে সমাজের পক্ষে সর্বাধিক লাভ হইবে।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে যে কারণের জন্য উদ্যোক্তাদের লাভ হয়, সেই কারণগুলির অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও দেখা যায়। রাষ্ট্রীয় পরিচালনার ক্ষেত্রে লাভের ব্যাপারে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা কিছু কমিবে সন্দেহ নাই এবং বাজারে উদ্যোক্তাগণ যে

একচেটিয়া ব্যবসায় করিয়া বসিবে তাহাও বন্ধ হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই; তবুও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও কিছু পরিমাণে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা থাকে, এবং রাষ্ট্রও সেখানে একচেটিয়ামূলক ব্যবস্থার সৃষ্টি করিতে পারে। রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের মধ্যেও লোকসানের ঝুঁকি অথবা লাভের সম্ভাবনা থাকে। এইজন্য যাহা কিছু লাভ লোকসান হয় তাহা সবই সমগ্র সমাজের স্বার্থের সহিত জড়িত থাকে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে কিছু লাভ অর্জন করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয়। কারণ, সেই লাভের টাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে রাষ্ট্র অগ্রসর হইতে পারে। তবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কতখানি লাভের প্রয়োজন এবং তাহা কিভাবে অর্জন করিতে হইবে, তাহাও রাষ্ট্রই ঠিক করে। রাষ্ট্রের পক্ষে এই কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ (a determinate Planning Authority) থাকে।

লাভ নিরূপণের বিভিন্ন তত্ত্ব Different theories regarding determination of Profit): শুধু একটি বিশেষ তত্ত্ব বা মতবাদের সাহায্যে ব্যবসায়ে লাভ নিরূপণ করা যায় না। লাভ অনেকগুলি কারণের উপর নির্ভর করে। সেইজন্য লাভ নিরূপণেরও অনেক তত্ত্ব আছে। আমরা এই তত্ত্বগুলি এখানে আলোচনা করিতেছি।

লাভ নিরূপণে খাজনা তত্ত্ব Rent theory of Profit): এই তত্ত্বটি প্রথম প্রচলন করেন ওয়াকার (Walker)। তাঁহার মতে খাজনা যেভাবে নিরূপিত হয়, লাভও সেইভাবে নিরূপিত হয়। লাভ হইতেছে যোগ্যতার খাজনা ("rent of ability")। ওয়াকার মনে করেন, জমির উর্বরতা যেমন একপ্রকার নয় এবং প্রান্তিক জমির যেরূপ কোন খাজনা নাই, সেই প্রকার উদ্যোক্তাদেরও পরিচালন যোগ্যতা একপ্রকার নয় এবং সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পরিচালকেরও ব্যবসায়ে কোন লাভ অর্জিত হয় না। যে জমির সর্বাপেক্ষা বেশী উর্বরতা, সেই জমির যেমন সর্বাধিক খাজনা হয়, অনুরূপভাবে যে উদ্যোক্তার সর্বাধিক যোগ্যতা, সেই উদ্যোক্তারও সেই প্রকার সর্বাধিক লাভ অর্জিত হয়। ওয়াকারের মতে স্বাভাবিক পরিচালনার আয়কে কোন মতেই লাভ বলা যায় না। স্বাভাবিক পরিচালনার আয়ের অতিরিক্ত আয় হইতেছে লাভ।

লাভ যোগ্যতার খাজনা

কিন্তু, আমরা এই তত্ত্বটির সমালোচনা করিতে পারি। প্রথমত, জমির ক্ষেত্রে উৎপাদিত জিনিসের দাম মোট উৎপাদন ব্যয়ের সমান হইবে এবং ইহাতে জমির মালিকের কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু, ব্যবসায়ে অনেক উদ্যোক্তার লোকসান হইতে পারে, এবং লাভ মোটেই নাও হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, জমির যোগান যতখানি অস্থিতিস্থাপক, সেই তুলনায় পরিচালকের যোগান অনেক বেশী স্থিতিস্থাপক। ব্যবসায়ে ক্রমাগত লাভ হইতে থাকিলে অনেক নূতন লোক উদ্যোক্তা হইবে। তৃতীয়ত, খাজনা দামের অংশ নহে; কিন্তু বাজারে

সমালোচনা

দীর্ঘকালীন দামে লাভের পরিমাণ দামের মধ্যে ধরিয়া লওয়া হয়। কারণ, এই লাভটুকু না পাইলে উদ্যোক্তাগণ ব্যবসায় ছাড়িয়া দিবে। সর্বশেষে, এই তত্ত্বে দেখানো হইয়াছে কেন উদ্যোক্তাদের লাভের পার্থক্য হয়। কিন্তু, কিভাবে লাভ স্থির হয়, লাভের পিছনে ঝুঁকি বহন কাজের কতখানি অবদান অথবা দেশের পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক কাঠামো লাভের জন্য কতখানি দায়ী, সেই বিষয়ে এই তত্ত্বটি কিছুই বলে না। সুতরাং লাভ নিরূপণের তত্ত্ব হিসাবে ইহা অসম্পূর্ণ।

লাভ সংক্রান্ত মজুরি তত্ত্ব (Wage theory of Profit): অধ্যাপক টাউসিগের (Prof. Taussig) মতে লাভ হইতেছে উদ্যোক্তার কাজের মজুরি। ব্যবসায়ে লাভ অর্জন করিতে হইলে উদ্যোক্তার কতিপয় গুণ থাকা প্রয়োজন; এই গুণ ও যোগ্যতা না থাকিলে উদ্যোক্তা কোন লাভ অর্জন করিতে পারে না। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকেরও অনুরূপ গুণ ও যোগ্যতা থাকা দরকার। উদ্যোক্তাকেও শ্রমিকের ন্যায় পরিশ্রম করিতে হয়। অবশ্য উদ্যোক্তাকে যে পারশ্রম করিতে হয় তাহা মানসিক, শারীরিক নয়। আইনজীবী ও চিকিৎসকের আয়ও মজুরির পর্যায়ে পড়ে। সুতরাং টাউসিগের মতে উদ্যোক্তার লাভকে মজুরী বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, শ্রমিকের যেমন দক্ষতা অনুযায়ী স্তরভেদ আছে, পরিচালকদের মধ্যেও সেই প্রকার দক্ষতার ভিত্তিতে স্তরের তারতম্য করা যায। কাজেই শ্রমিকের মজুরি যে নীতিতে স্থির হয়, পরিচালকের বা উদ্যোক্তার লাভও সেই নীতি অনুযায়ী নিরূপিত হয়।

মুনাফা উদ্যোক্তার কাজের মজুরি

এই তত্ত্বটিও কিভাবে লাভ নির্ধারিত হয়, তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারে নাই। প্রথমত, এই তত্ত্বটি একথা স্বীকার করে নাই যে ঝুঁকি বহনই উদ্যোক্তার প্রধান কাজ এবং ঝুঁকি বহনের কাজের পুরস্কারস্বরূপ সে লাভ অর্জন করে।

দ্বিতীয়ত, যে কোন কাজের জন্য শ্রমিকের মজুরি সর্বদা নিশ্চিত। কিন্তু, যে কোন ব্যবসায়েই উদ্যোক্তার লাভ সর্বদা নিশ্চিত নয়। তৃতীয়ত, অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন জিনিসের দাম পরিবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই লাভের পরিবর্তন হয়। কিন্তু, দামের পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ কোন প্রভাব মজুরির উপর নাই। শুধু দীর্ঘকালে শ্রমিকগণ এইজন্য বেশী মজুরি দাবি করিতে পারে। কিন্তু, স্বল্পকালেও লাভের উপর দামের পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। সর্বশেষে, লাভের পরিমাণ আকস্মিকভাবে বাড়িয়া যাইতে পারে অথবা কমিয়া যাইতে পারে; কিন্তু মজুরি আকস্মিকভাবে বাড়িয়া যাওয়া বা কমিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা সাধারণতঃ কম। সুতরাং দেখা যাইতেছে লাভকে মজুরির সঙ্গে একপর্যায়ভুক্ত করা ঠিক নয়। উদ্যোক্তা যাহা কিছু করে, তাহা নিজের জন্যই করে—প্রয়োজন হইলে সে ঝুঁকি বহনও করে। কিন্তু শ্রমিকের কাজ বিক্রয়যোগ্য। এখানে উদ্যোক্তার কাজ এবং শ্রমিকের কাজের মধ্যে আমরা মৌলিক পার্থক্য দেখিতে পাই। সুতরাং লাভকে কখনই মজুরি বলা ঠিক নয়।

সমালোচনা

লাভ সংক্রান্ত ঝুঁকি বহন তত্ত্ব (Risk-taking theory of Profit) : উৎপাদন ব্যবস্থায় ঝুঁকি থাকাটা যে লাভের অন্যতম একটি কারণ, সেই বিষয়ে অধিকাংশ অর্থবিজ্ঞানীই একমত। উদ্যোক্তার যতগুলি কাজ আছে তাহার মধ্যে অন্যতম প্রধান কাজ হইল ঝুঁকি বহন করা। উৎপাদনের ক্ষেত্রে অথবা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কম-বেশী ঝুঁকি থাকিবেই। কারণ ভবিষ্যতে ক্রেতাদের কিরূপ চাহিদা হইবে এবং তাহা অনুযায়ী ভবিষ্যতে একটি জিনিসের দাম কত বেশী হইবে, সেই বিষয়ে আগেই আন্দাজ করিয়া উদ্যোক্তাকে কাজে অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু এমনিতে ঝুঁকি বহন করা অপ্রীতিকর ও কষ্টকর। বিশেষতঃ, লাভের আশা না থাকিলে কোন উদ্যোক্তাই ঝুঁকি বহন করিতে চায় না। উদ্যোক্তাগণ ঝুঁকি বহন করিতে পারে বলিয়াই ব্যবসায়ে লাভ অর্জন করিতে পারে। এইজন্যই বলা হয় লাভ হইতেছে ঝুঁকি বহনের পুরস্কার। ব্যবসায়ে ঝুঁকি আছে বলিয়াই উদ্যোক্তার যোগান অনেক ক্ষেত্রে অস্থিতিস্থাপক হয়। ঝুঁকির ভার বহন করিয়াও যে সকল উদ্যোক্তা ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকে, তাহারাই লাভ অর্জন করে।

সমালোচনা

লাভের মধ্যে একটি বড় অংশ ঝুঁকি বহন, সেই বিষয়ে অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ খুবই কম। কিন্তু সেইজন্য লাভ হইতেছে শুধু ঝুঁকি বহনের পুরস্কার, একথা বলা ঠিক নয়। কতিপয় ঝুঁকি আছে যেগুলি আগেই জানা যায় এবং সময় থাকিতে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া সেই ঝুঁকির পরিমাণ কমাইয়া লওয়া যায় ; যেমন, মোটর দুর্ঘটনা অথবা আগুন লাগার ঝুঁকি অথবা প্রাণনাশের ঝুঁকি প্রভৃতির বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য অনেকে বীমা (insurance) করে। এই বীমার সাহায্যে ঝুঁকি বহন করার মূল্য স্থির করা যায়। কিন্তু কতিপয় ঝুঁকি আছে যেগুলি অজ্ঞাত, সেই ঝুঁকি বহনের দরুণ লাভের সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক নাইট (Prof. Knight) এই যুক্তির সমর্থক। কার্ভার (Carver) বলেন, উদ্যোক্তাগণ ঝুঁকি বহন করে বলিয়া লাভ পায় না। দক্ষ উদ্যোক্তাগণ ঝুঁকি কমাইয়া দেয় বলিয়া বেশী লাভ পায়, কাজেই লাভ ঝুঁকি বহন করিবার পুরস্কার নয়, ঝুঁকি বহন না করিবার পুরস্কার।

সর্বশেষে, অপূর্ণ প্রতিযোগিতা, আকস্মিক কারণ, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন অথবা নূতন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের জন্যও লাভের সৃষ্টি হইতে পারে। সেইগুলির সহিত ঝুঁকি বহন কাজের কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং, লাভের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে ঝুঁকি বহন অন্যতম উপাদন হইলেও, ইহাই যে একমাত্র উপাদান, এই ধারণার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

লাভ সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা বহন তত্ত্ব (Uncertainty-bearing Theory of Profit) : কোন কোন আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীর মতে লাভ হইতেছে অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার। কোন পুরস্কারের আশা না থাকিলে কোন উদ্যোক্তাই অনিশ্চয়তার ভার বহন করিতে রাজী হয় না। এই অনিশ্চয়তা এবং ঝুঁকি এক জিনিস নয়।

অধ্যাপক নাইট (Prof. Knight) অনিশ্চয়তা এবং ঝুঁকির মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। সব রকম ঝুঁকিতে অনিশ্চয়তা নাই। কতিপয় ঝুঁকি আছে যেগুলি পরিসংখ্যানের নিয়মের ভিত্তিতে (Statistical Law of Probability) পূর্ব হইতে আন্দাজ করা যায়, যেমন, মৃত্যু। এই ঝুঁকি পূর্ব হইতেই আন্দাজ করা যায় এবং এইজন্য একটি মূল্যও (premium) ধার্য করা যায়। কিন্তু এই ঝুঁকিতে কোন অনিশ্চয়তা নাই। কিন্তু, ব্যবসায়ে আরও কতিপয় ঝুঁকি আছে যেগুলি পূর্ব হইতেই জানা যায় না। সেই ঝুঁকিগুলির মধ্যে অনিশ্চয়তা বহন করার যে পুরস্কার তারই লাভ।

সমালোচনা

অনিশ্চয়তা বহন লাভের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু, ইহাই লাভের একমাত্র কারণ নয়। অনিশ্চয়তা বহন করা ছাড়াও উদ্যোক্তার অন্যান্য কাজ আছে, যেমন নূতন আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি অথবা নূতন উদ্ভাবিত উৎপাদন পদ্ধতি চালু করা। উদ্যোক্তার এই কাজগুলিও তাহার লাভের জন্য দায়ী। দ্বিতীয়ত, অনিশ্চয়তা বহন অনেক পরিমাণে মানসিক অনুভূতির উপর নির্ভর করে। ইহাকে উৎপাদনের পৃথক উপাদান বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তৃতীয়ত, অনিশ্চয়তার পরিমাপ করা সম্ভব নয় এবং অনিশ্চয়তার ভার বহন করা কোন উদ্যোক্তার একক দায়িত্ব নয়। শ্রমিক, মূলধনের মালিক এবং জমির মালিক, সকলেই কম-বেশী অনিশ্চয়তার ভার বহন করে। সুতরাং, লাভ অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার, এই মতবাদ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

লাভ সংক্রান্ত গতিশীলতার তত্ত্ব (Dynamic Theory of Profit): আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ অর্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক জে. বি. ক্লার্ক (Prof. J B. Clark) এই তত্ত্বের অবতারণা করেন। অধ্যাপক ক্লার্কের মতে একমাত্র গতিশীল সমাজেই (dynamic society) লাভের সৃষ্টি হয়। গতিহীন সমাজে (stationary or static society) লাভের সৃষ্টি হয় না। গতিশীল সমাজ বলিতে বুঝায় এমন একটি সমাজ-ব্যবস্থা যেখানে জনসংখ্যা, মূলধন, জনসাধারণের রুচি, চাহিদা ও পছন্দের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন হয়। গতিহীন সমাজে ইহা হয় না বলিয়াই চাহিদা ও যোগান স্থিতাবস্থায় থাকে। গতিশীল সমাজে চাহিদা ও যোগানের মৌলিক পরিবর্তন হয় এবং এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লাভেরও সৃষ্টি এবং পরিবর্তন হয়। গতিহীন সমাজে কোন লাভের সৃষ্টি হয় না। ক্লার্কের মতে উদ্যোক্তা হইতেছে সেই ব্যক্তি যে পরিবর্তনশীল শ্রম, মূলধন প্রভৃতি উপাদানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে পারে। উদ্যোক্তা গতিশীল ব্যবস্থাকে টিকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে এবং নূতন নূতন উদ্ভাবন প্রচেষ্টার (innovation) সাহায্যে লাভের সৃষ্টি করে।

লাভের উপর নূতন উদ্ভাবন প্রচেষ্টার প্রভাব

এক্ষেত্রে ক্লার্কের সঙ্গে আরও একজন অর্থবিজ্ঞানী একমত, তাঁহার নাম অধ্যাপক স্যুমপিটার (Prof. Schumpeter) নূতন উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন বা Innovation বলিতে স্যুমপিটার মনে করেন,…"the setting up of a new production

2. What are Profits? Discuss the relationship between profits and risk-taking.

['লাভ' কাহাকে বলে ? ঝুঁকি বহন এবং লাভের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।]

(২৩৪-৩৫ পৃষ্ঠা ; ২৪১-৪২ পৃষ্ঠা)

3. Define profit. How does profit differ from other sources of income?

[লাভের সংজ্ঞা প্রদান কর। আয়ের অন্যান্য উৎসের সঙ্গে লাভের পার্থক্য কোথায় ?]

(২৩৭-৩৬ পৃষ্ঠা)

4. What are the different elements of profit? [লাভের বিভিন্ন উৎপাদন কি কি ?]

(২৩৬-২৩৭ পৃষ্ঠা)

5. Write notes on: (a) Uncertainty-bearing theory of profits, (b) Rent theory of profit, (c) Wage theory of profit, and (d) Dynamic theory of profit.

[টীকা লিখ: (ক) লাভ সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা বহন তত্ত্ব, (খ) লাভ সংক্রান্ত খাজনা তত্ত্ব, (গ) লাভ সংক্রান্ত মজুরি তত্ত্ব এবং (ঘ) লাভ সংক্রান্ত গতিশীলতার তত্ত্ব।] (২৩৯-২৪৩ পৃষ্ঠা)

6. Can there be any profit in a socialist regime.

[সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন লাভ থাকিতে পারে কি ?] (২৩৮-২৩৯ পৃষ্ঠা)

7. Profit is not simply a fourth factor return like wages, interest or rent, profit is a part or these factor returns.—Explain. (২৪৩-২৪৫ পৃষ্ঠা)

[মজুরি, সুদ অথবা খাজনার ন্যায় লাভ একটি চতুর্থ উপাদান আয় নহে লাভ এই আয়গুলির একটি অংশ"—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।]

8. How would you calculate profit in (a) one-man business and (b) Joint stock Company?

Are profits Justifiable?

[(ক) এক মালিকী ব্যবসায় এবং (খ) যৌথ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে তুমি কি ভাবে লাভের হিসাব করিবে ? লাভ কি সর্বদা যুক্তিসঙ্গত ?] (২৪৫-২৪৬ পৃষ্ঠা)

ঊনবিংশ অধ্যায়

বিভিন্ন ধরণের মুদ্রা—মুদ্রামান—আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থা

(Different Types of Money—Monetary Standards—International Monetary Institutions)

টাকার সংজ্ঞা (Definition of Money): টাকার কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নাই, তবে টাকার বিভিন্ন কাজ বিশ্লেষণ করিলে আমরা ইহার একটি সংজ্ঞা তৈয়ার করিতে পারি। অনেকে বলেন, টাকা বলিতে বুঝায় টাকা যাহা করে তাহাই ("Money is what money does.")। কিন্তু এই কথাটি আরও বিশ্লেষণ

করা দরকার। টাকা হইতেছে একটি সম্পদ যাহা সকলেই গ্রহণ করে এবং যাহার সাহায্যে আমরা জিনিসপত্র কেনা-বেচা, ঋণ প্রদান ও পরিশোধের হিসাব-নিকাশ, ব্যবসায়ের লেনদেন, ইত্যাদি সবই করিতে পারি। টাকার সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যায়ঃ "যে বস্তু বিনিময় কাজ বা দেনা-পাওনা মিটাইবার মাধ্যম হিসাবে সর্বজনগ্রাহ্য, এবং সেই সঙ্গে মূল্যের পরিমাণ ও সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কাজ করে, সেই বস্তুকে টাকা বলা যাইতে পারে ;"[১]

টাকার কাজ (Functions of Money): টাকার কাজ সম্বন্ধে ইংরাজীতে একটি ছড়া আছে—

"Money is a matter of functions four,
A medium, a measure, a standard and a store."

টাকার মুখ্য কাজ চারিটি ; অবশ্য এই চারিটি ছাড়াও টাকার অন্যান্য কাজ আছে।

প্রথমত, টাকা হইতেছে দ্রব্য-বিনিময়ের মাধ্যম (Medium of Exchange)। আমরা টাকার সাহায্যে দ্রব্য-বিনিময়ের অসুবিধাগুলি দূর করিতে পারি। যেমন, আমার যদি কোন জিনিসের প্রয়োজন হয়, তাহা আমি টাকার সাহায্যে কিনিতে পারি। বিক্রেতাও টাকার বিনিময়ে নিজের জিনিসটি হাতছাড়া করিতে পারে, এবং এইজন্য তাহাকে অন্য কোন জিনিসের সহিত সংশ্লিষ্ট জিনিসটি বিনিময় করিবার জন্য ব্যস্ত হইতে হয় না। টাকা সর্বদাই সকলে গ্রহণ করে। এইজন্য টাকার সাহায্যে কোন জিনিসের বিনিময় করিতে মোটেই অসুবিধা হয় না। যাহার একটি ঘোড়া আছে, সে ইহার বিনিময়ে একটি গরু লইতে অস্বীকৃত হইতে পারে ; কিন্তু ইহার বিনিময়ে তাহার টাকা লইতে কোন আপত্তি থাকে না।

দ্বিতীয়ত, টাকার সাহায্যে কোন জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা বলিতে পারি, পাইলট কলম অপেক্ষা পার্কার কলমের মূল্য বেশী। কারণ, পাইলট কলম কিনিবার জন্য যত টাকা খরচ করিতে হয় পার্কার কলম কিনিবার জন্য তাহা অপেক্ষা বেশী টাকা খরচ করিতে হয়। সুতরাং টাকা হইতেছে কোন জিনিসের মূল্যের মাপকাঠি (measure of value)।

তৃতীয়ত, টাকা স্থগিত পাওনার মান (Standard of deferred payments) হিসাবে কাজ করে। ধরা যাক্, একজন লোক ১৯৫৬ সালে ১০০ টাকা ধার করিয়াছে এবং ১৯৫৯ সালে ইহা শোধ দিতেছে। সুদ বাদ দিলে বর্তমানে ১০০ টাকা দিলেই ধার শোধ হইয়া যায়। কিন্তু, ধরা যাক্, পাওনাদার দাবি করিল যে ১৯৫০ সালের এবং ১৯৫৯ সালের টাকার মান এক নহে, অথবা ১৯৫০ সালের ১০০ টাকা ১৯৫৯ সালের ১২৫ টাকার সমান, এবং সেইজন্য দেনাদারকে ১২৫ টাকা শোধ দিতে হইবে

১। "......Money can be defined as *anything* that is *generally acceptable* as a means of exchange (i. e. as a means of settling debts) and at the same time acts as a measure and as a store of value." (Crowther—An Outline of Money)

এবং ইহার উপর সুদের হিসাব হইবে। বাস্তবে যদি ইহা সত্য হয় তবুও ব্যবসায়ের লেনদেনে ইহা স্বীকৃত হইবে না। কারণ, টাকা ভবিষ্যতের লেনদেনের মান হিসাবে কাজ করে। অর্থাৎ, দেনাদার টাকা ধার করিবার সময় যত টাকা ধার করিয়াছিল, দেনা শোধ দিবার সময় তত টাকাই আসল হিসাবে শোধ দিবে। সুতরাং টাকাকড়ি শুধু মূল্যেরই পরিমাপ করে না, ঋণেরও পরিমাপ করে; টাকা স্থগিত পাওনার মান হিসাবে কাজ করে বলিয়াই দেশে মূলধন বাজার (capital market) গড়িয়া উঠে।

চতুর্থত, টাকা সঞ্চিত মূল্যের ভাণ্ডার (Store of value) হিসাবেও কাজ করে। কেহ যদি টাকা সঞ্চয় করিতে চায়, তবে সে ইহা টাকার মাধ্যমেই করে। ভবিষ্যতের সংস্থান করিবার জন্য, ব্যবসায়জনিত লেনদেন করিবার জন্য অথবা ফাটকা কারবার করিবার জন্য লোকে টাকা জমাইতে চায়। ইহার প্রধান কারণ হইতেছে টাকার সর্বজনগ্রাহ্যতা বা নগদ অবস্থা (liquidity)। এইজন্য জনসাধারণ সবসময় টাকা হাতে রাখিতে চায়; ইহাকে আমরা নগদ টাকার চাহিদা বা Liquidity Preference বলিতে পারি।

উপরি-উক্ত কাজগুলি ছাড়াও টাকার আরও কাজ আছে। টাকা দেশের সম্পদ-বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। টাকার বিনিয়োগ হইলেই দেশের আর্থিক অবস্থা উন্নত হয়। যেদিন হইতে দ্রব্য-বিনিময় প্রথার (Barter System) স্থানে টাকার সাহায্যে বিনিময়ের নিয়ম চালু হইয়াছে; সেইদিন হইতেই সমাজের শ্রীবৃদ্ধি। অর্থনৈতিক জীবন প্রকৃতপক্ষে সেদিন হইতেই উন্নত হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং শ্রমবিভাগের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টাও সেইদিন হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। টাকা খুব সহজেই একস্থান হইতে অন্যত্র সরাইয়া লওয়া যায়, এবং হিসাবপত্র সংরক্ষণের মাধ্যমে টাকার সাহায্যে খুব সহজেই ব্যবসায়ের লেনদেন করা যায়। সুতরাং, বিনিময়-কাজ এখন খুব সহজ হইয়া গিয়াছে।

বিভিন্ন ধরণের টাকা (Different Types of Money): টাকার অনেক রূপ আছে। প্রথমত, যে টাকা সরকার কর্তৃক টাকা হিসাবে বিবেচিত হয়, অর্থাৎ, দেশের আইন অনুযায়ী যে টাকা সকলেরই গ্রহণযোগ্য, সেই টাকাকে বিহিত টাকা (Legal tender) বলে। বিহিত টাকা আবার দুই প্রকার হইতে পারে; যথা, সসীম বিহিত টাকা (Limited legal tender) এবং অসীম বিহিত টাকা (Unlimited legal tender)। অনেক সময় কোন মুদ্রা নির্দিষ্ট পরিমাণে বিহিত টাকা বলিয়া বিবেচিত হয়। যদি এই পরিমাণের বেশী মুদ্রা কেহ গ্রহণ করিতে না চায়, তবে ইহা বে-আইনী হইবে না। ইংলণ্ডে চল্লিশটি শিলিং পর্যন্ত একজনকে একসঙ্গে প্রদান করা যাইতে পারে। যদি কেহ একসঙ্গে ৪২টি শিলিং কোন লোককে দিতে চায়, এবং গ্রহীতা যদি তাহা গ্রহণ করিতে না চায়, তবে তাহা বে-আইনী হইবে না। সেই ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণে শিলিং পাউণ্ডে পরিণত করিয়া লেনদেন করিতে হইবে।

অনেক সময় টাকাকড়ি প্রামাণিক টাকা (Standard Money) এবং নিদর্শন টাকা (Token Money), এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। প্রামাণিক টাকাই দেশের প্রধান বিনিময় মান। এই মুদ্রায় সব হিসাব করা হয়। ভারতের টাকা, ইংলণ্ডের পাউণ্ড, আমেরিকার ডলার ইত্যাদি প্রামাণিক টাকার উদাহরণ। প্রামাণিক টাকা সাধারণতঃ সোনা অথবা রূপায় নির্মিত। ইহার লিখিত মূল্য (Face value) ধাতব মূল্যের সমান হয়। অর্থাৎ, ইহা গলাইয়া সোনা অথবা রূপা হিসাবে বিক্রয় করিলে আমরা ইহার লিখিত মূল্য অনুযায়ী সোনা অথবা রূপা পাইব। নিদর্শন টাকায় লিখিত মূল্য অপেক্ষা ধাতব মূল্য কম হয়। অর্থাৎ, এই টাকা গলাইয়া যে ধাতু পাওয়া যায়, তাহার দাম টাকার দাম অপেক্ষা কম। সরকারী আদেশেই লোকে এই টাকা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় বলিয়া ইহাকে অনেক সময় আদিষ্ট টাকা (Fiat Money) বলা হয়।

আবার টাকা কাগজী টাকা (Paper money) এবং ধাতব টাকা (Metallic Money) এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। সরকার যে টাকা প্রচলন করে, তাহা যখন সোনা বা রূপায় পরিবর্তনযোগ্য হয়, তখন সেই টাকাকে আমরা বলি পরিবর্তনযোগ্য কাগজী টাকা (Convertible Paper Currency) এবং যদি ইহা সোনা অথবা রূপায় পরিবর্তনযোগ্য না হয়, তবে ইহাকে অপরিবর্তনযোগ্য কাগজী টাকা (Inconvertible Paper Currency) বলে। কাগজী টাকা যখন সংরক্ষিত ধাতুর পরিমাণ হয়, তখন ইহাকে প্রতিভূ টাকা (Representative Money) বলা হয়। যখন কোন বিশেষ টাকাকড়ি দিয়া শুধু হিসাবের কাজ হয়, তখন ইহাকে হিসাব-নিকাশের টাকা (Money of Account) বলে, এবং যখন হিসাব-নিকাশ ব্যতীত অন্যান্য কাজের জন্য কোন টাকাকড়ি ব্যবহার করা হয়, তখন ইহাকে সঠিক বা প্রকৃত টাকাকড়ি (Actual Money) বলা হয়। যখন বাজারমূল্যের স্থিরতা (stability) বজায় রাখিবার জন্য সরকার কাগজী টাকার প্রচলন করে, তখন ইহাকে পরিচালিত টাকা (Managed Money) বলে।

মুদ্রামান (Monetary Standards): যখন কোন দেশে টাকার প্রতি এককের দাম কত হইবে, তাহা কোন ধাতু অথবা কোন জিনিসের মাপে স্থির করিয়া দেওয়া হয় তখন সেই ধাতু অথবা জিনিসকে মুদ্রামান বলে। যেমন—স্বর্ণমান (Gold Standard), রৌপ্যমান (Silver Standard) দ্বিধাতুমান (Bimetallism), এবং কাগজী মুদ্রা (Paper Currency Standard) ইত্যাদি। যদি কোন দেশের টাকাকড়ি একটি নির্দিষ্ট ধাতুর তৈয়ারী হয়, তবে ইহাকে এক-ধাতুমান (Monometallic Standard or Single Standard) বলা হয়। টাকাকড়ি যদি শুধু সোনা দিয়া তৈয়ারী করা হয়, তবে ইহাকে স্বর্ণমান (Gold Standard) বলে, আর যদি ইহা রূপা দিয়া তৈয়ারী হয়, তবে ইহাকে রৌপ্যমান (Silver Standard) বলে। দেশে স্বর্ণমান চালু থাকিলে প্রচলিত সোনার টাকা থাকিতে

পারে, অথবা কাগজী টাকা থাকিতে পারে যদি সেই কাগজী টাকার হিসাবে সোনার মূল্য স্থির থাকে এবং জনসাধারণ সেই দামে অবাধে সোনা কেনাবেচা করিতে পারে। আন্তর্জাতিক স্বর্ণমানে দেশ হইতে সোনা বাহিরে যাওয়া অথবা বিদেশ হইতে দেশে সোনা আসার কোন বাধা থাকে না। যদি দেশে সোনা এবং রূপা উভয় ধাতুর টাকাই প্রচলিত থাকে তবে ইহাকে দ্বিধাতুমান (Bimetallism) বলে। সেই ক্ষেত্রে দুইটি ধাতু দিয়া তৈয়ারী উভয় মুদ্রাই অসীম বিহিত টাকা (Unlimited Legal Standard) হইবে এবং উভয় টাকার মূল্যই ইহাদের ধাতব মূল্যের সমান হইবে। বর্তমানে কোন দেশেই আমরা এই মুদ্রাব্যবস্থা দেখিতে পাই না, একশত বৎসর আগে অনেক দেশে এই মুদ্রাব্যবস্থা চালু ছিল। যখন একদেশের মুদ্রামান অন্যদেশের মুদ্রামানের পরিমাণের সহিত আইনের মাধ্যমে যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়, তখন ইহাকে বিনিময়মান (Exchange Standard) বলা হয়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত একটি ভারতীয় টাকা ব্রিটিশ মুদ্রার এক শিলিং ছয় পেন্সের সমান, ছিল এই পরিমাপে আমাদের দেশে কাগজী মুদ্রাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ইহাকে বলা হয় স্টার্লিং বিনিময়মান (Sterling Exchange Standard)। যখন কাগজী টাকার পিছনে সম্পূর্ণভাবে সোনা এবং বৈদেশিক মুদ্রা উভয়েরই রিজার্ভ রাখা হয় এবং সেই টাকার মূল্যের পরিমাপে অথবা রিজার্ভে সংরক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাপে সোনার মূল্য স্থির রাখা হয়, তখন ইহাকে স্বর্ণ-বিনিময় মান (Gold Exchange Standard) বলা হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর অনেকগুলি জাতি একটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলনে মিলিত হইয়া আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (International Monetary Fund) গঠন করে; এই প্রতিষ্ঠানের একটি বিশেষ কাজ হইল ইহার সদস্য দেশগুলির মুদ্রামানের পরস্পর বিনিময় হারের স্থিরতা (stability) বজায় রাখিবার জন্য স্বর্ণের সহিত প্রত্যেক দেশের মুদ্রার বিনিময়-মূল্য (par value) নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া।

দ্বিধাতুমান (Bimetallism)—দ্বিধাতুমানের প্রথম বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, ইহাতে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় ধাতুই অসীম বিহিত মুদ্রা (Unlimited legal tender) হিসাবে পাশাপাশি প্রচলিত থাকে। দ্বিতীয়ত, এই দুইটি বিহিত মুদ্রার পারস্পরিক বিনিময়-হার সরকার স্থির করিয়া দেন; ইহাকে টাঁকশালের বিনিময়-হার (Mint ratio exchange) বলা হয়। তৃতীয়ত, এই ব্যবস্থায় সরকার স্বর্ণ অথবা রৌপ্য পিণ্ডের পরিবর্তে নির্দিষ্ট হারে এই দুইটি ধাতু মুদ্রার যে কোনটি দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে। চতুর্থত, স্বর্ণ ও রৌপ্যের একই সঙ্গে অবাধ মুদ্রাঙ্কনের (Free coinage) ব্যবস্থা থাকে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম দেখা যায়। অনেক সময় দুইটি ধাতব মুদ্রা পাশাপাশি প্রচলিত থাকিলেও শুধু একটি ধাতুরই অবাধ মুদ্রাঙ্কন ব্যবস্থা থাকে; অন্য ধাতুটির

থাকে না। এই ব্যবস্থাকে বিকলাঙ্গ দ্বিধাতুমান (Limping Bimetallism) বলে।

১৮০৩ সালে ফ্রান্সে দ্বিধাতুমান প্রবর্তিত হয়। পরবর্তীকালে ইউরোপের কয়েকটি দেশে এই মুদ্রাব্যবস্থা চালু হইলেও নূতন নূতন স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হওয়ার পর দুই ধাতুর টাঁকশালের বিনিময়-হার ও বাজার-দামের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। ইহার ফলে গ্রেশামের নিয়ম কার্যকর হয় এবং দ্বিধাতুমান অকেজো হইয়া পড়ে।

দ্বিধাতুমানের পক্ষে যুক্তি

দ্বিধাতুমানের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইতেছে এই যে এই ব্যবস্থায় মুদ্রার মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং সরকারকে শুধু একটিমাত্র ধাতুর উপর নির্ভর করিতে হয় না। দ্বিতীয়ত, সরকার অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষে ধাতুর জমা (Metallic reserve) সংরক্ষণ করা সহজসাধ্য হয়। কারণ, এই ক্ষেত্রে শুধু একটি ধাতু বেশী করিয়া জমা রাখিবার পরিবর্তে দুইটি ধাতু কিছু কিছু করিয়া জমা রাখা চলে। তৃতীয়ত, দ্বিধাতুমান প্রচলিত থাকিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেন আরও সহজসাধ্য হয়। কারণ এই মুদ্রাব্যবস্থায় স্বর্ণমান অনুসরণকারী এবং রৌপ্যমান অনুসরণকারী দেশগুলির মধ্যে বিনিময়-হার স্থির থাকে। সর্বশেষে, এই যুক্তিও দেখানো যাইতে পারে যে দ্বিধাতুমান না থাকিলে রৌপ্য উৎপাদনকারী দেশগুলির বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। কারণ সবদেশের সরকারই যদি স্বর্ণমানের উপর নির্ভর করে, তবে রৌপ্যের চাহিদা খুবই কমিয়া যাইবে।

দ্বিধাতুমানের বিপক্ষে যুক্তি

দ্বিধাতুমানের বিপক্ষে প্রধান যুক্তি হইতেছে এই যে দুইটি মুদ্রার পক্ষে পরস্পর বিনিময়-হার বজায় রাখা শুধু কষ্টসাধ্য নহে, প্রায় অসম্ভব বলিলেও চলে। এই সমালোচনার উত্তরে বলা যায় যে যদি সব দেশই এক সঙ্গে দ্বিধাতুমান গ্রহণ করে, তবে এই অসুবিধা এড়ানো সম্ভবপর। কিন্তু, বাস্তবে ইহা সম্ভবপর হয় না। তবে যদি কয়েকটি দেশও এই মুদ্রাব্যবস্থা গ্রহণ করে, তবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে বিনিময়-হার স্থির থাকিতে পারে। ফিশার (Fisher) আন্তর্জাতিক দ্বিধাতুমানকে দুইটি মদ্যপের হাত ধরাধরি করিয়া হাঁটিবার সহিত তুলনা করিয়াছেন। দুইটি মদ্যপ একাকী চলিলে যতটা টলে, পরস্পর হাতধরাধরি করিয়া চলিলে সাধারণতঃ ততটা টলে না। সেইরূপ আন্তর্জাতিক দ্বিধাতুমানে বিমিময়-হার কিছু পরিমাণে স্থির থাকে, সম্পূর্ণ পরিমাণে স্থির থাকে না। দ্বিতীয়ত, কাগজী মুদ্রা প্রচলিত হওয়ায় ধাতুমুদ্রার স্বল্পতার সম্ভাবনা অনেকটা তিরোহিত হইয়াছে এবং সেইজন্য দ্বিধাতুমানের প্রয়োজনীয়তাও অনেক কমিয়া গিয়াছে। তৃতীয়ত, দ্বিধাতুমান বজায় না রাখিলেও যে আন্তর্জাতিক বিনিময় হার স্থির রাখা যায়, ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত কারণে দ্বিধাতুমান সব দেশেই পরিত্যক্ত হইয়াছে।

স্বর্ণমানের বিভিন্ন রূপ (Degrees of Gold Standard): স্বর্ণমান বলিতে আমরা বুঝি স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন, অথবা এমন কাগজী মুদ্রার প্রচলন যাহার বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অথবা মুদ্রাকর্তৃপক্ষের নিকট হইতে নির্দিষ্ট হারে সমপরিমাণ মূল্যের স্বর্ণ পাওয়া যায়। যখন দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকে, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি নির্দিষ্ট দামে স্বর্ণ কেনাবেচা করে, এবং স্বর্ণের আমদানি-রপ্তানির উপর কোন বাধানিষেধ আরোপ করে না, যাহাতে অর্থের বিনিময়-হারে (exchange rate) বজায় থাকে।

বিশুদ্ধ স্বর্ণমান

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে প্রকৃত স্বর্ণমান (Pure Gold Standard) প্রচলিত ছিল। এই প্রকৃত স্বর্ণমানের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে; (১) দেশে নির্দিষ্ট ওজনের স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত থাকিত, (২) অন্যান্য ধাতব মুদ্রা অথবা কাগজী মুদ্রাকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করা যাইত, (৩) স্বর্ণের বিনিময়ে অন্যান্য মুদ্রা দিতে মুদ্রাকর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকিত, এবং (২) স্বর্ণের আমদানি-রপ্তানির উপর কোন বাধানিষেধ আরোপ করা হইত না।

স্বর্ণপিণ্ডমান

প্রথম মহাযুদ্ধের পর স্বর্ণপিণ্ডমান (Gold Bullion Standard) প্রচলিত হয়। এই মুদ্রাব্যবস্থায় কোন স্বর্ণমুদ্রা থাকিত না; দেশে সমুদয় নোট এবং অন্যান্য যে সমস্ত ধাতুর মুদ্রা প্রচলিত থাকিত সেইগুলির বিনিময়ে সরকার অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বর্ণপিণ্ড বিক্রয় করিত।

স্বর্ণমানের অন্যান্য রূপ

এই ব্যবস্থায় দেশের বিহিত মুদ্রা বলিতে কাগজী নোটকেই বুঝাইত। এই কাগজী নোটের মূল্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের ভিত্তিতে ধার্য করা হইত। তাহা ছাড়া এই ব্যবস্থায়ও স্বর্ণের আমদানি-রপ্তানির উপর কোন বাধানিষেধ আরোপ করা হইত না। স্বর্ণমানের আর একটি রূপ হইতেছে স্বর্ণবিনিময়মান (Gold Exchange Standard)। এই ব্যবস্থায় স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত থাকে না; তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে নির্দিষ্ট হারে যে দেশে স্বর্ণমান চালু আছে সেই দেশের মুদ্রা বিক্রয় করে। স্বর্ণমানের আর একটি বিশেষ রূপ হইতেছে স্বর্ণ রিজার্ভমান (Gold Reserve Standard)।

স্বর্ণমানের বৈশিষ্ট্য (Features of Gold Standard)—স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে দেশের মোট টাকার পরিমাণ স্বর্ণের মোট যোগানের উপর নির্ভর করে। যখন স্বর্ণের পরিমাণ বাড়িয়া যায়, তখন টাকার যোগান বাড়িয়া যায়, এবং যখন স্বর্ণের পরিমাণ কমিয়া যায় তখন টাকার যোগানও কমিয়া যায়। স্বর্ণমানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার স্বয়ংক্রিয়তা। যখনই দেশে স্বর্ণের আগমন হয়, তখনই মুদ্রার পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাড়ে এবং যখনই দেশ হইতে স্বর্ণের নির্গমন হয় তখনই মুদ্রার পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কমিয়া যায়। স্বর্ণমান চালু রাখিতে হইলে এই নিয়ম পালন করা হয়। অর্থাৎ, স্বর্ণের নির্গমন

হইবার সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রাসংকোচন এবং স্বর্ণের আগমন হইবার সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রার সম্প্রসারণ করিতে হয়। কোন দেশের বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত (Balance of trade) যদি অনুকূল (favourable) হয়, তবে স্বর্ণের আগমন হয় এবং বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত যদি প্রতিকূল (unfavourable) হয়, তবে স্বর্ণের নির্গমন হয়।

স্বর্ণমান বজায় রাখিতে হইলে সরকারের অর্থনৈতিক নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হয় বৈদেশিক বাণিজ্যে ইহার মুদ্রার সহিত অন্যান্য দেশের মুদ্রার বিনিময়-হারের (rate of exchange) ভারসাম্য (equilibrium) বজায় রাখা। যদি স্বর্ণমানের মূল নিয়মটি সব দেশই মানিয়া চলে, অর্থাৎ সব দেশই যদি দেশের মূল্যস্তরের উপর মুদ্রাসৃষ্টি অথবা মুদ্রাসংকোচনের কি প্রতিক্রিয়া হইল তাহা বিবেচনা না করিয়া স্বর্ণ আগমনের সহিত নূতন মুদ্রা সৃষ্টি এবং নির্গমনের সহিত মুদ্রা-সংকোচন করে, তবে আপনা হইতেই বিভিন্ন দেশের মুদ্রা-বিনিময়-হারের মধ্যে ভারসাম্য আসিবে। কিন্তু এইজন্য দেশে মুদ্রাস্ফীতি থাকিলেও স্বর্ণ আগমনের সহিত সরকারকে মুদ্রার পরিমাণ আরও বাড়াইতে হইবে, অথবা দেশে মুদ্রাসংকোচন বজায় থাকা সত্ত্বেও স্বর্ণ-নির্গমনের সহিত সরকারকে আবার মুদ্রাসংকোচন করিতে হইবে। ইহাই হইতেছে স্বর্ণমানের নিয়ম ("Rule of the Gold Standard")। স্বর্ণমান বজায় রাখিতে হইলে দেশের উপর মুদ্রা-সৃষ্টি অথবা মুদ্রাসংকোচনের কি প্রভাব হইবে তাহা বিবেচনা না করিয়াই অথবা দেশের উৎপাদনব্যবস্থা এবং কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার কথা বিবেচনা না করিয়াই স্বর্ণমানের নিয়ম পালন করিয়া যাইতে হইবে। এইজন্য ক্রাউথার (Crowther) বলিয়াছেন "The Gold Standard is a jealous God. It will work, provided it is given exclusive devotion."

স্বর্ণমানের আরও একটি নিয়ম হইতেছে এই যে স্বর্ণের আমদানি ও রপ্তানির উপর কোন বাধানিষেধ থাকিবে না। অর্থাৎ, বৈদেশিক দেনাপাওনা মিটাইবার জন্য প্রয়োজনীয় আমদানি অথবা রপ্তানির উপর বাধানিষেধ থাকিবে না।

স্বর্ণমানের সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and Demerits of Gold Standard): স্বর্ণমানের কতিপয় বিশেষ সুবিধা আছে। প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই, কোন দেশে স্বর্ণমান বজায় থাকিলে মুদ্রাব্যবস্থার উপর জনসাধারণের এবং অন্যান্য দেশের প্রগাঢ় আস্থা থাকে। কারণ, স্বর্ণ একটি অতি মূল্যবান ধাতু এবং ইহা সকলেই গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকে।

স্বর্ণমানের সুবিধা

দ্বিতীয়ত, স্বর্ণমান চালু থাকিলে মুদ্রার বৈদেশিক হার স্থির থাকে। যদি সাময়িকভাবে এই ভারসাম্য নষ্ট হইয়া যায়, তবে স্বর্ণমানের নিয়ম কার্যকরী হওয়ার ফলে আপনা হইতেই সেই ভারসাম্য ফিরিয়া আসিবে।

তৃতীয়ত, স্বর্ণমান চালু থাকিলে রাজনৈতিক অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া সরকার নূতন মুদ্রা সৃষ্টি করিতে পারেন না। ইহাতে মুদ্রাস্ফীতির

সম্ভাবনা কমিয়া যায়। সরকার যখনই মুদ্রা সৃষ্টি করিবে, বুঝিতে হইবে তখনই স্বর্ণের রিজার্ভ বাড়িয়া গিয়াছে।

চতুর্থত, স্বর্ণমান আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সুবিধাজনক। সব দেশেই যদি স্বর্ণমান চালু থাকে, তবে আন্তর্জাতিক লেনদেন সহজে স্বর্ণের মাধ্যমে মিটানো যায়। ইহাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রসারিত হয়।

সর্বশেষে, যদিও স্বর্ণমানের সাহায্যে বৈদেশিক বিনিময়-হার এবং আভ্যন্তরীণ মূল্য উভয়কেই বজায় রাখা যায় না, তবুও ইহা ঠিক যে, স্বর্ণমানে টাকাকড়ির পরিমাণ স্বর্ণের পরিমাণের দ্বারা নির্ধারিত হয় বলিয়া এই ব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতির বিশেষ আশঙ্কা থাকে না।

স্বর্ণমানের প্রধান অসুবিধা হইতেছে এই যে ইহাতে খরচ অত্যন্ত বেশী। কাগজী নোট ছাপাইয়াও স্বর্ণমানের সুবিধাগুলি চেষ্টা করিলেও পাওয়া যাইতে পারে। স্বর্ণমান বজায় রাখিবার জন্য অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রা তৈয়ার করিবার জন্য সরকারকে যে খরচ করিতে হয়, তাহা ইচ্ছা করিলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অথবা কাগজী নোটের বিপক্ষে সম্পূর্ণ পরিমাণে স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিবার জন্য খরচ করা যাইতে পারিত। দ্বিতীয়ত, স্বর্ণমানের নিয়ম সবসময়েই মুদ্রাকর্তৃপক্ষের পালন করা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে এইজন্যই স্বর্ণমানের পতন হইয়াছে। সক্রিয়ভাবে স্বর্ণমাণ বজায় রাখিতে গেলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ইহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া অনেক সময়েই দেখা যায়। ধরা যাক্, কোন দেশের সাধারণ ভোগসামগ্রীগুলির দাম অত্যন্ত বেশী, কিন্তু যেহেতু সেই দেশের রপ্তানি বাড়িয়া গেল এবং স্বর্ণের আগমন হইল, সেইজন্য মুদ্রাকর্তৃপক্ষকে মুদ্রার পরিমাণ আরও বাড়াইতে হইবে। ইহাতে মুদ্রাস্ফীতি আরও বেশী হইবে এবং জিনিসপত্রের দাম আরও বাড়িয়া যাইবে। মুদ্রাস্ফীতির সমুদয় কুফল তখন দেশে দেখা যাইবে। অনুরূপভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্যে মন্দা (depression) দেখা দিলে যদি স্বর্ণমান বজায় রাখিবার জন্য দেশ হইতে স্বর্ণের নির্গমনহেতু আরও মুদ্রাসংকোচন করিতে হয় তবে মন্দা আরও তীব্র হইবে। এই সকল কারণে মুদ্রাকর্তৃপক্ষকে স্বর্ণমানের নিয়ম বজায় রাখিতে যাইয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিরত হইতে হইয়াছে।

স্বর্ণমানের অসুবিধা

তৃতীয়ত, স্বর্ণমান চালু রাখিতে হইলে সরকারকে আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরকে উপেক্ষা করিয়াও মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়-হারের স্থিরতা বজায় রাখার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিতে হয়।

চতুর্থ, যদি দেশে কোন সময়ে আমদানির পরিমাণ বাড়িয়া যায়, তবে দেশ হইতে স্বর্ণ বিদেশে চলিয়া যায়। তখন স্বর্ণমানের নিয়ম পালন করিবার জন্য মুদ্রাসংকোচন করিতে হয়, কিন্তু যদি সেই সময়ে দেশে বিনিয়োগের পরিমাণ এমনিতেই কম থাকে, তবে বেকার-সমস্যা আরও তীব্র হয়।

পঞ্চমত, স্বর্ণমান মূল্যস্তর স্থির নাও রাখিতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে

কালিফোর্নিয়ায় নূতন নূতন স্বর্ণখনি আবিষ্কারের ফলে স্বর্ণের উৎপাদন অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল এবং ইহাতে মূল্যস্তর অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছিল। সর্বশেষে, স্বর্ণমান একটি ব্যয়বহুল মুদ্রাব্যবস্থা। কাগজী মুদ্রা যেখানে টাকাকড়ির সবরকমের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে পারে, সেখানে স্বর্ণের ন্যায় মূল্যবান ধাতুকে মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করা ইহার অপচয় মাত্র।

স্বর্ণমানের এই সমস্ত অসুবিধার জন্যই আধুনিক লেখকগণ ইহার পুনঃপ্রবর্তনের বিরোধিতা করেন। বর্তমানে কোন দেশে স্বর্ণমান চালু নাই। কিন্তু আন্তর্জাতিক লেনদেনে এখনও স্বর্ণের একটি বিশেষ স্থান আছে। এইজন্য আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারকে (International Monetary Fund) একটি নির্দিষ্ট স্বর্ণনীতি অনুসরণ করিতে হয়। আমরা বলিতে পারি, স্বর্ণমান সিংহাসনচ্যুত হইয়াছে বটে, কিন্তু মুদ্রা হিসাবে স্বর্ণের গুরুত্ব কমে নাই। ("Gold has been dethroned and not demonetised.")

স্বর্ণমানের পতনের কারণ (Causes of the breakdown of Gold Standard)—১৯৩১ সালে ইংলণ্ড সর্বপ্রথম স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে। বিভিন্ন দেশে স্বর্ণমান পরিত্যক্ত হইবার প্রধান কারণ হইতেছে এই যে, বিভিন্ন দেশের পক্ষে স্বর্ণমানের নিয়মগুলি পালন করা সম্ভবপর হয় নাই। স্বর্ণমান বজায় রাখিতে হইলে আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরের স্থিরতা অপেক্ষাও মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়-হারের স্থিরতা বজায় রাখার উপর অধিকতর গুরুত্ব দিতে হয়। কিন্তু, ১৯২৯-৩০ সালে যখন বিভিন্ন দেশে ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয় তখন সব দেশই আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরের স্থিরতা বজায় রাখার উপর অধিকতর গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়। তখন স্বর্ণের আগমন-নির্গমনের প্রভাব হইতে আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরকে মুক্ত রাখিবার জন্য সব দেশ চেষ্টা করিতে থাকে। দ্বিতীয়ত, এই সময়ে বিভিন্ন দেশ স্বর্ণের আগমন-নির্গমনের উপর বাধানিষেধ আরোপ করিতে আরম্ভ করে। ইংলণ্ড এই বিষয়ে অগ্রণী হয়। আমেরিকার স্বর্ণ-আগমনের প্রভাব হইতে আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরকে মুক্ত রাখিবার জন্য বিদেশ হইতে আগত স্বর্ণকে মুদ্রাসৃষ্টির কাজে ব্যবহার না করিয়া ফেলিয়া রাখা (sterilised) হয়। এই সময় ফ্রান্স ইহার মুদ্রার মূল্য কমাইয়া দেয়, ইহাতে ফ্রান্সের প্রচুর রপ্তানি হইতে থাকে এবং সেই দেশে স্বর্ণের প্রবেশ হইতে থাকে। ফ্রান্স এই স্বর্ণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে মজুত করিয়া রাখে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও আমদানির উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া এবং রপ্তানি বাড়াইয়া স্বর্ণ মজুত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। ইংলণ্ডের আমদানি এই সময়ে বিশেষ বাড়িয়া যায় এবং ইহাতে ইংলণ্ডের স্বর্ণের রিজার্ভ কমিয়া যায়।

তৃতীয়ত, এই সময়ে বিভিন্ন অধমর্ণ দেশ হইতে ক্রমাগত স্বর্ণ বাহিরে চলিয়া যাইতে আরম্ভ করে। অথচ, দেশের ভিতরে ব্যবসায়ে মন্দার বিপক্ষে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই অবস্থায় সব দেশের সরকারই উৎপাদন বাড়াইবার জন্য এবং দেশকে ব্যবসায়ের মন্দা হইতে রক্ষা করিবার জন্য যত্নবান হন।

ইহাতে স্বর্ণমানের নিয়ম পালন করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই এবং স্বর্ণমানেরও পতন ঘটে।

সর্বশেষে, পৃথিবীতে স্বর্ণের মোট যোগান সীমাবদ্ধ। এই অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ স্বর্ণ মজুত করিয়া রাখায় কোন কোন দেশের পক্ষে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও স্বর্ণমানের নিয়ম পালন করা সম্ভবপর হয় নাই।

আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের মুদ্রা-বিনিময় হারের স্থিরতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভূমিকা

স্বর্ণমানের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনা নাই। ইংলণ্ড ব্যবসায়-বাণিজ্যে ইহার অনুগামীদের লইয়া স্টার্লিং অঞ্চল এবং আমেরিকা ব্যবসায়-বাণিজ্যে ইহার অনুগামীদের লইয়া ডলার অঞ্চল গঠন করিয়াছে। সুতরাং ইহাতে স্বর্ণমানের পুনঃপ্রচলনের সম্ভাবনা নাই। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (International Monetary Fund) বিভিন্ন রাষ্ট্রের মুদ্রার মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়হারের স্থিরতা বজায় রাখিবার জন্য প্রত্যেক দেশের মুদ্রার সহিত স্বর্ণ এবং মার্কিন ডলারের বিনিময় হার নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। ইহাতে আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের পক্ষে একটি সুনির্দিষ্ট স্বর্ণনীতি (Gold Policy) অনুসরণ করা সম্ভবপর হইয়াছে। দেখা যাইতেছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মুদ্রা হিসাবে স্বর্ণের গুরুত্বকে এখনও অস্বীকার করা হয় নাই ; শুধু স্বর্ণমান পরিত্যক্ত হইয়াছে। ("Gold has been dethroned and not demonetised.")

কাগজী টাকার সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of the Paper Currency Standard or Managed Money)—আধুনিককালে কাগজী টাকাই সব দেশে প্রচলিত। অবশ্য ধাতব মুদ্রা যে প্রচলিত নয়, তাহা নহে। ধাতব মুদ্রার পাশাপাশি আমরা কাগজী টাকা দেখিতে পাই এবং যত দিন যাইতেছে, কাগজী টাকা অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন করিতেছে। ইহার কারণ হইতেছে এই যে, ভাল টাকার সবগুলি লক্ষণ কাগজী টাকায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে সহজে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া যায়। বড় বড় লেনদেন করার পক্ষেও ইহা সুবিধাজনক। কাগজী টাকা প্রচলিত হইলে ধাতব টাকাকড়ি গণনা করিবার ঝামেলা ও সময়ের অপচয় হইতে রেহাই পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, ধাতব টাকা তৈয়ার করিতে সরকারের যত খরচ হয়, কাগজী টাকা তৈয়ার করিতে তাহা অপেক্ষা অনেক কম টাকা খরচ হয়। তৃতীয়ত, ধাতব টাকা প্রচলিত থাকিলে দেশে কোন নির্দিষ্ট ধাতু যে পরিমাণে আছে, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে টাকা তৈয়ার করা সম্ভবপর নয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করিবার সময় প্রচুর টাকার প্রয়োজন হয়। কাগজী টাকার সাহায্যে সেই অর্থের সংস্থান করা যাইতে পারে। ইহাতে কাগজী মুদ্রামান পরিচালনা করা সহজসাধ্য হয় এবং এই মুদ্রা স্থিতিস্থাপক হয়। চতুর্থত, কাগজী মুদ্রা-ব্যবস্থা স্বর্ণমানের ন্যায় ব্যয়বহুল নহে এবং এই ব্যবস্থা দেশের আর্থিক নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

বিভিন্ন দেশের বাজেট অথবা অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় যখনই আর্থিক ঘাটতি হইয়াছে, তখনই সেই আর্থিক ঘাটতি দূর করার জন্য নূতন কাগজী টাকার সাহায্য লওয়া হইয়াছে। কাগজী টাকার সাহায্যে দেশের মুদ্রা-ব্যবস্থাকে স্থিতিস্থাপক (elastic) করা চলে। অর্থাৎ, যখনই দেশে টাকার প্রয়োজন হইবে, তখনই টাকা সরবরাহ করা সম্ভবপর।

কিন্তু, এই ব্যবস্থার কতিপয় ত্রুটিও আছে। প্রথমত, ধাতব টাকার মূল্যের যেমন একটি নিশ্চয়তা (certainty) অথবা স্থিরতা (stability) আছে, কাগজী টাকার তাহা নাই। হঠাৎ যদি কাগজী টাকা বেশী ছাপানো হইয়া যায়, তবে ইহার মূল্য কমিয়া যায়। কিন্তু, ধাতব টাকা যত খুশি তত সৃষ্টি করা যায় না। টাকার মূল্য কমিয়া যাইবার অর্থ হইল, আগে ১ টাকায় কোন জিনিস যত পরিমাণে কেনা যাইত, টাকার মূল্য কমিয়া গেলে ১ টাকায় তাহা অপেক্ষা কম জিনিস কেনা যাইবে ; অর্থাৎ জিনিসের দাম বাড়িয়া যাইবে। এই অবস্থাকেই মুদ্রাস্ফীতি বলে। কাগজী টাকার ব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা প্রবল থাকে। এইজন্যই এই ব্যবস্থায় টাকার মূল্যের স্থিরতা থাকে না। টাকার মূল্যের যদি স্থিরতা না থাকে, তবে দেশের সাধারণ মানুষকে অনেক দুর্গতির সম্মুখীন হইতে হয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হইয়া যায়। দ্বিতীয়ত, কাগজী টাকা ব্যবস্থার আর একটি ত্রুটি হইতেছে এই যে, ইহা বিদেশে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য নাও হইতে পারে। কিন্তু সোনার টাকা লইতে কোনও বিদেশী রাষ্ট্র আপত্তি করিবে না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এইজন্য কাগজী টাকার গুরুত্ব কম। তৃতীয়ত, দেশে কাগজী টাকা প্রচলিত থাকিলে সরকার অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাংক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য গঠনের জন্য মুদ্রাব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে, ইহার বিরুদ্ধে সহজে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় না। সর্বশেষে, বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা চলিতে থাকিলে কাগজী টাকার বহির্মূল্য কমিয়া যাইবার (devaluation) সম্ভাবনা থাকে বলিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতে পারে এবং দেশের ভিতর জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যাইতে পারে।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (International Monetary Fund) : দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর সমস্ত জাতি অনুভব করে যে পৃথিবীর সুখ-শান্তি এবং সমৃদ্ধি পরস্পরের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। ক্রমে ব্রিটেন এবং আমেরিকা নিজেদের পরিকল্পনাগুলি পৃথিবীর সামনে উপস্থাপিত করেন। ১৯৪৩ সালে এপ্রিল মাসে এই পরিকল্পনাগুলি প্রকাশিত হয় এবং ১৯৪৪ সালের Bretton Woods-এ এইগুলি আলোচিত হয় এবং এই আলোচনার ফলে ১৯৪৭ সালে মার্চ মাসে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, সংক্ষেপে I. M. F., প্রতিষ্ঠিত হইয়া কাজ আরম্ভ করে। এই অর্থভাণ্ডারের সদস্যরা রাষ্ট্রসংঘের সদস্যগণের অন্যতম ; কিন্তু ইহা রাষ্ট্রসংঘের কোন সংস্থা নহে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সদস্যদের জন্য দেয় নির্দিষ্ট 'কোটা' (quota)

আছে। সদস্যদের যুদ্ধপূর্বকালীন মজুত সোনা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপর ভিত্তি করিয়া প্রাথমিকভাবে যে চাঁদা দেওয়া হইয়াছিল তাহার পরিমাণ ছিল, ৮৮০০ মিলিয়ন ডলার। পূর্বে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের মোট সম্পদ ছিল ১৬,০০০ মিলিয়ন ডলার; ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইহা বাড়াইয়া করা হয় ২১,০০০ মিলিয়ন ডলার। শতকরা কোটার ২৫ ভাগ অথবা ১০ ভাগ সরকারী মজুত সোনা বা ডলারে দিতে হইবে। অবশিষ্ট অংশ সদস্যদের নিজস্ব মুদ্রায় পরিশোধ করিতে হইবে।

কয়েকটি দেশের কোটা নিম্নরূপ—

আমেরিকা	...	৫১৬০	মিলিয়ন ডলার
ব্রিটেন	...	১৩০০	"
পশ্চিম জার্মানী	...	১২০০	"
কানাডা	...	৫৫০	"
চীন (জাতীয়তাবাদী)	...	৫৫০	"
হল্যাণ্ড	...	৪১২·৫	"
ফ্রান্স	...	৯৮৫	"
ভারত	...	৯৪০	"

অবশ্য এই কোটা যে সর্বদাই স্থির থাকে তাহা নহে, ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন দেশের জন্য কোটার পরিবর্তন হইয়া থাকে।

কোন দেশের কোটা নির্ধারিত হইবার সময় নিম্নলিখিত জিনিসগুলি বিবেচিত হইয়া থাকে; (ক) সংশ্লিষ্ট দেশের জাতীয় আয়, (খ) সংশ্লিষ্ট দেশের মজুত সোনা অথবা ডলারের পরিমাণ, (গ) সংশ্লিষ্ট দেশের লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য হীনতার তীব্রতা এবং (ঘ) বিশ্ব-অর্থনীতিতে সেই দেশের স্থান। রাষ্ট্রসঙ্ঘের যে কোন সদস্যই আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সদস্য হইতে পারে। রাশিয়া, পোলাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং কিউবা আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সদস্যপদ পরিত্যাগ করিয়াছে।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের উদ্দেশ্য (Purposes of the I. M .F. Charter): আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের মূল উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ:—

(১) একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার সম্প্রসারণ করা ;(২) আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের বৃদ্ধি করিয়া সমস্ত সদস্য-দেশের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা; (৩) বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষেত্রে স্থিরতা আনয়ন করা, শান্তিপূর্ণভাবে বিনিময়ের ব্যবস্থা করা, এবং প্রতিযোগিতামূলক মুদ্রামূল্য-হ্রাস রহিত করা; (৪) বিভিন্ন সদস্য-রাষ্ট্রের মধ্যে চলতি হিসাবের খাতে বহুমুখী লেনদেন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা (Multilateral system of payments in respect of current transaction) এবং বৈদেশিক মুদ্রা সম্পর্কে সমুদয় বাধানিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ (Exchange Control) দূর করা; (৫) সদস্য-রাষ্ট্রগুলিকে তাহাদের আন্তর্জাতিক

লেনদেনে যদি স্থায়ী ঘাটতি দেখা দেয় তবে তাহা দূর করিবার জন্য এই ভাণ্ডার স্বল্পকালীন অর্থপ্রদান করে। ইহার ফলে এই সকল রাষ্ট্র এমন উপায় গ্রহণ করিবে না যাহাতে জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংকট দেখা দিতে পারে।

এই সকল উদ্দেশ্যগুলিকে কার্যকর করিবার জন্য আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার "কোটা"-প্রথা, দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা অথবা বৈদেশিক মুদ্রার মানের মূল্যের পরিবর্তনসাধন প্রভৃতি উপায় গ্রহণ করে। ইহার পরিচালন-ব্যবস্থা একটি পরিচালক সমিতির উপর ন্যস্ত। সমিতির সদস্য ১২ জনের বেশী হইবে না।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের ঋণদান-নীতি (Lending Policy of the I.M.F.) ; কোন একটি দেশ অপর দেশের মুদ্রা ক্রয় করিতে পারে। এই ক্ষেত্রে ক্রয়েচ্ছু দেশের প্রয়োজনীয়তা দেখাইতে হইবে এবং যে দেশের মুদ্রা সে ক্রয় করিতে চাহে, তাহা যেন নিয়ন্ত্রিত (rationed) মুদ্রা না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই অর্থভাণ্ডারের অর্থকে শুধু স্বল্পকালীন ঋণরূপেই ব্যবহার করা যাইবে। যেসব দেশ ক্রীত বৈদেশিক মুদ্রা পরিশোধ করিতে পারিবে না, এই সংস্থা তাহাদের কোন মুদ্রা বিক্রয় করিতে পারিবে না। অধুনা এই সংস্থা ঋণদান নীতিগুলিকে আরও নমনীয় করিয়াছে। যদি কোন সদস্য-রাষ্ট্র অর্থভাণ্ডারের সহিত পূর্বেই বৈদেশিক মুদ্রা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া রাখে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সেই দেশ সমস্যাগুলি পুনর্বার আলোচনা না করিয়াই ঐ মুদ্রা পাইবে। এই সকল ব্যবস্থাগুলিকে Standby arrangements বলা হয়। অর্থভাণ্ডার প্রয়োজনবোধে কোন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের মূলগত ভারসাম্যের অভাব দূর করিবার জন্য নিজেই অগ্রসর হইয়া সদস্য-রাষ্ট্রগুলিকে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক হয়।

১৯৬৯ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (Special Drawing Rights) অথবা বৈদেশিক মুদ্রা তুলিবার বিশেষ অধিকারের ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। ১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারী এই ব্যবস্থা অনুযায়ী সর্বপ্রথম ৩.৫ মিলিয়ন ডলার বণ্টনের কর্মসূচী প্রবর্তিত হয়। এই ব্যবস্থায় যে সকল সদস্য-রাষ্ট্রের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের অবস্থা উন্নত হইবে তাহারা একটি বিশেষ তহবিলে (Special Drawing Fund) বৈদেশিক মুদ্রার নির্দিষ্ট অংশ জমা রাখিবে ; অপরদিকে যখনই কোন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সংকট তীব্র হইবে তখনই সেই দেশ কোটা'র অতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রা এই তহবিল হইতে তুলিবার অধিকার পাইবে। ভারত ইতিমধ্যেই এই সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে। আবার সম্প্রতি ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের আস্থা কিছু উন্নত হওয়ায়, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ভারতকে এই তহবিলে কিছু বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখিবার আহ্বান জানাইয়াছে।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার এবং বৈদেশিক বিনিময়হারের পরিবর্তন (I.M.F. and change in the par value of a currency)— আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের অন্যতম উদ্দেশ্য হইতেছে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময়হারের স্থায়িত্ব

(exchange rate stability) বজায় রাখা এবং সেই সঙ্গে বিনিময়-হার যাহাতে একেবারে অপরিবর্তনীয় (rigid) না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখা। অর্থাৎ ইহাতে একদিকে স্বর্ণমানের সুবিধা পাওয়া যায় এবং অপরদিকে স্বর্ণমানের অসুবিধা দূর হয়। অনুরূপভাবে অনিয়ন্ত্রিত কাগজী মুদ্রামানের অসুবিধা দূর হয়। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের বিভিন্ন সদস্যদের প্রত্যেক দেশের মুদ্রার বিনিময়হার স্বর্ণে ধার্য করা হইয়াছে; ইহাকে সেই দেশের মুদ্রার par value বলে। স্বর্ণের আকারে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময়হার নির্দিষ্ট থাকিলে প্রত্যেক দেশের সহিত অন্যান্য দেশের মুদ্রার বিনিময়-হারও স্থির থাকে। তবে সীমাবদ্ধভাবে ঐ দেশের মুদ্রার বিনিময়হার কমানো যায়। প্রথমে অর্থভাণ্ডারের অনুমতি না লইয়াই এবং শুধু অর্থভাণ্ডারকে জানাইয়াই কোন দেশ মুদ্রা-বিনিময় হারের শতকরা ১০ ভাগ পর্যন্ত কমাইতে পারে। ইহার পর সেই বিনিময়-হারের আরও শতকরা ১০ ভাগ কমানো যায়; তবে সেই ক্ষেত্রে অর্থভাণ্ডারের সম্মতির প্রয়োজন, এবং অর্থভাণ্ডারকেও সেইক্ষেত্রে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ইহার সম্মতি অথবা অসম্মতি সংশ্লিষ্ট দেশকে জানাইতে হয়। যদি মুদ্রা-বিনিময় হারের পরিবর্তন শতকরা ২০ ভাগের বেশী হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সম্মতি একান্ত আবশ্যক এবং কতদিনের মধ্যে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারকে ইহার সম্মতি দিতে হইবে, তাহার সময় স্থির করিয়া দেওয়া হয় নাই। যদি কোন দেশের পক্ষে মুদ্রা-বিনিময় হার কমাইবার প্রয়াস অন্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতামূলক মুদ্রা-বিনিময়-হারের পরিবর্তন (competitive depreciation) বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অর্থগুভাার সম্মতি প্রদান করে না। শুধু যখন দেখা যায় যে কোন দেশে বৈদেশিক দেনাপাওনার হিসাবে ভারসাম্যের মৌলিক অভাবের (Fundamental Disequilibrium) সৃষ্টি হইয়াছে তখন অর্থভাণ্ডার মুদ্রার বিনিময়-হার কমাইবার অনুমতি প্রদান করে। ভারসম্যের মৌলিক অভাব বলিতে কি বুঝায় আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের চুক্তির কোন ধারায় ইহার উল্লেখ করা হয় নাই। তবে সাধারণ অর্থে যখন কোন দেশের বহির্বাণিজ্যের দেনাপাওনার হিসাবে মৌলিক ঘাটতির সৃষ্টি হয়, তখনই ইহাকে ভারসাম্যের মৌলিক অভাব বলিয়া বিবেচনা করা হয়[১]। মুদ্রার বিনিময়-হার কমিয়া গেলে সংশ্লিষ্ট দেশে রপ্তানি বাড়িয়া যায় এবং আমদানি কমিয়া যায়; ইহাতে সেই দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা উন্নত হয়। এইভাবে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার পরোক্ষভাবে বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যকে উন্নত করিতে সাহায্য করে।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার এবং স্বর্ণমান (I. M. F. and Gold Standard): অর্থভাণ্ডারের কাজে স্বর্ণের ভূমিকা অতীব প্রয়োজনীয়। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি

১। মৌলিক ভারসাম্যহীনতার আলোচনা ৩৭২-৩৭৩ পৃষ্ঠায় করা হইয়াছে।

করিয়াছে। কেইন্‌সের মতে অর্থভাণ্ডার স্বর্ণমানের ঠিক বিপরীত। অপরপক্ষে আমেরিকার কোন কোন অর্থবিজ্ঞানীর মতে অর্থভাণ্ডারের প্রবর্তন বলিতে বুঝা যায় স্বর্ণমানের পুনঃপ্রবর্তন। কিন্তু স্বর্ণমানের আসল উদ্দেশ্য স্থায়ী পরিবর্তনহার বজায় রাখা। কিন্তু অর্থভাণ্ডারের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল স্বর্ণের মাধ্যমে বিনিময়ের হারে পরিবর্তনসাধন করা। এই পরিবর্তন তখনই করা যাইবে যখন কোন দেশে চিরন্তন ঘাটতি (Fundamental Disequilibrium) দেখা দিবে। এই পরিবর্তিত অবস্থার পর স্বর্ণের প্রয়োজনীয়তা পূর্বাপেক্ষা বহুলাংশে কমিয়া গেলেও অর্থভাণ্ডারের নিকট ইহার গুরুত্ব কমে নাই। ইহার কতকগুলি বিশেষ কাজ নিম্নরূপ :—

(১) প্রত্যেক দেশের মুদ্রার মান স্বর্ণের মাধ্যমে প্রকাশিত হইবে; (২) স্বর্ণ অর্থভাণ্ডারের উদ্দেশ্য পূরণ করিতে বিশেষ সাহায্য করে, এবং যখনই বাণিজ্যের লেনদেনে সাময়িক ঘাটতি দেখা দেয়, তখন স্বর্ণের মাধ্যমে তাহা পরিশোধ করা হয়; (৩) যে সকল দেশের স্বর্ণ উৎপাদন সর্বাপেক্ষা বেশী সেইগুলি অথবা স্বর্ণ মজুত আছে এমন সব দেশ আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সদস্য হইয়াছে। স্বর্ণের প্রয়োজনীয়তা যদি না থাকিত তাহা হইলে হয়ত এই সকল দেশ সদস্য হইত না, ইহা ছাড়া, স্বর্ণমান ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের মধ্যে বহু মিলও আছে। স্বর্ণের মাধ্যমেই কোন দেশের বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়হার আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার স্থির করিয়া থাকে।

আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক অথবা বিশ্ব ব্যাংক (International Bank for Reconstruction and Development, or the World Bank) **:**

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের আওতায় যে সকল কার্যাবলী পড়ে না সেই কাজগুলি সম্পাদন করিবার জন্য বিশ্বব্যাংকের সৃষ্টি করা হয়। এই ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ হইল ১০০০০ মিলিয়ন ডলার এবং প্রয়োজনমত এই মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ব্যাংকের প্রত্যেকটি শেয়ারের মূল্য হইল ১০০০০ ডলার। সদস্যগণকে প্রত্যেক শেয়ারের শতকরা দুইভাগ স্বর্ণ অথবা ডলার দিতে হয় এবং আঠারো ভাগ দেশীয় মুদ্রায় দিতে হয়। অবশিষ্ট আশি ভাগ প্রয়োজনমত আদায় করা হয়। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের প্রত্যেক সদস্য এই বিশ্বব্যাংকেরও সদস্য এবং আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের ন্যায় এক্ষেত্রেও বিভিন্ন সদস্য-রাষ্ট্রের 'কোটা' (Quota) স্থির আছে। ইহার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'কোটা' এক-তৃতীয়াংশের উপর এবং যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও ভারতের 'কোটা' হইল যথাক্রমে ১,০০০ মিলিয়ন ডলার, ৪৫০ মিলিয়ন ডলার এবং ৪০০ মিলিয়ন ডলার। বিশ্বব্যাংকের বিভিন্ন কাজ কয়েকজন কার্যকরী পরিচালক (Executive Directors) পরিচালনা করিয়া থাকেন।

বিশ্বব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য হইল যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলি ও অনুন্নত দেশগুলিকে

অর্থসাহায্য করা। এই ব্যাংক বিভিন্ন দেশের সরকারী ও বে-সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে টাকা ধার দেয়। বে-সরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির ধার পাইতে হইলে সেই দেশের সরকারকে ধারের জন্য জামিন থাকিতে হয়।

ঋণদান-নীতি

ঋণদান সম্পর্কে বিশ্বব্যাংক কয়েকটি নীতি অনুসরণ করে। প্রথমত, কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ পরিকল্পনার জন্য ঋণ দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, ঋণ দিবার পূর্বে ব্যাংকের বিশেষজ্ঞগণ পরিকল্পনার অর্থনৈতিক সাফল্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে খুঁটিনাটি অনুসন্ধান করে এবং যে দেশ ঋণ গ্রহণ করিতে চায়, সেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে। তৃতীয়ত, কোন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানকে ঋণ গ্রহণ করিতে হইলে ঐ দেশের সরকারের নিকট হইতে গ্যারাণ্টি লইতে হয়।

১৯৪৭ সালের মে মাস হইতে বিশ্বব্যাংকের কাজ আরম্ভ হয়। ১৯৪৭ সাল হইতে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক ৪৫টি দেশে মোট ৩,১০৭ মিলিয়ন ডলার ঋণ দান করিয়াছে। এই সকল ঋণের মেয়াদ সাধারণতঃ ১৫ বৎসর হইতে ২০ বৎসর এবং সুদের হার শতকরা $২\frac{১}{২}$% হইতে $৫\frac{১}{২}$%। ভারতবর্ষ বিশ্বব্যাংক হইতে প্রচুর সাহায্য লইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বব্যাংকের প্রচেষ্টায় Aid India Club স্থাপিত হইয়াছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনই এই ব্যাংকের প্রধান কাজ। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সাহায্যের পরিমাণ তেমন নয়। উপরন্তু যেহেতু ব্যাংকের সমস্ত অর্থ আমেরিকায় তুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, সেই হেতু অনেকে মনে করেন যে আমেরিকার অতিরিক্ত পণ্য বিনিয়োগ করিবার ইহা একটি প্রকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। কিন্তু বহু অর্থবিজ্ঞানীর মতে যদি ব্যাংকের উদ্দেশ্যগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের অবস্থিতির কোন প্রয়োজনই থাকে না।

প্রথমে বিশ্বব্যাংক যদিও বিভিন্ন দেশ অথবা বিভিন্ন দেশের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে টাকা ঋণ দিত, তবুও ইহা Equity Capital বা শুধু নূতন শিল্প গঠনের জন্য অর্থ প্রদান করিত না; বিশ্বব্যাংকের এই গলদটি দূর করিবার জন্য ১৯৫৬ সালের ২০শে জুলাই তারিখে বিশ্বব্যাংকের সহকারী সংস্থা হিসাবে আন্তর্জাতিক অর্থ প্রতিষ্ঠান (International Finance Corporation) গঠিত হয়। এই সংস্থার আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ৭৪,৩৬৬ মিলিয়ন ডলার। সরকারী গ্যারাণ্টি-ছাড়াও বিভিন্ন দেশের বেসরকারী শিল্পকে এই প্রতিষ্ঠান Equity Capital ধার দিয়া থাকে। কিন্তু, তবুও অনুন্নত দেশগুলির আর্থিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান এই প্রতিষ্ঠানটি না করিতে পারায় ১৯৬০ সালের শেষে ১০০০ মিলিয়ন ডলার লইয়া আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (International Development Association) বিশ্বব্যাংকের সহযোগী সংস্থা হিসাবে কাজ আরম্ভ করিয়াছে।

Exercise

1. What is Gold Standard? What are its merits and demerits? What are the causes of the break-down of Gold Standard? [স্বর্ণমান কাহাকে বলে? ইহার সুবিধা ও অসুবিধা কি কি? স্বর্ণমানের পতনের কারণ কি কি?] (২৫৩-৫৭ পৃষ্ঠা)

2. Explain briefly the main functions of the International Monetary Fund.
[আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের উদ্দেশ্য ও প্রধান কাজগুলি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।]

3. What are the main functions of the International Bank for Reconstruction and Development?
[আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংকের প্রধান কাজ কি কি?] (২৬২-২৬৩ পৃষ্ঠা)

4. What do you mean by Bimetallism? What are the merits and demerits of Bimetallism?
[দ্বি-ধাতুমান বলিতে তুমি কি বুঝ? দ্বি-ধাতুমানের সুবিধা ও অসুবিধা কি কি?
(২৫১-২৫২ পৃষ্ঠা)

5. What are the different types ef Money? Discuss the functions of Money. What are the merits and demerits of Paper Money?
[বিভিন্ন ধরনের কি কি টাকা আছে? টাকার ক্রিয়াকলাপ আলোচনা কর, কাগজী টাকার সুবিধা ও অসুবিধা কি কি? (২৪৭-২৫০ পৃষ্ঠা ; ২৫৭-২৫৮ পৃষ্ঠা)

6. Indicate the advantages and disadvantages of the Gold standard.

[স্বর্ণমানের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি দেখাও।] (২৫৪-২৫৬ পৃষ্ঠা)

বিংশ অধ্যায়

ব্যাংক ও ক্রেডিট ব্যবস্থা
(The Banking and Credit System)

সাধারণতঃ ব্যাংক বলিতে ঠিক কি বুঝা যায় তাহা বলা কঠিন। যদি কোন প্রতিষ্ঠান অর্থ ধার দেয়, অথবা ক্রেডিট প্রদান করে, এবং জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করে তাহাকে ব্যাংক বলে। কেহ কেহ ব্যাংককে বলিয়া থাকেন ক্রেডিটের উৎপাদক এবং বিনিময়ের যোগাযোগ সাধক। এককথায় বলা যায় ব্যাংক হইতেছে অর্থের অথবা ক্রেডিটের ব্যবসায়ী (a dealer in money or dealer in credit)।

কোনও এক ব্যক্তির অথবা প্রতিষ্ঠানের ক্রেডিট আছে—এই কথার অর্থ হইতেছে এই যে এই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সততা এবং আর্থিক সচ্ছলতার প্রতি লোকের বিশ্বাস আছে। কোন ক্রয়-বিক্রয় ক্রেডিট অথবা অর্থের মাধ্যমে হইতে পারে। অর্থের মাধ্যমে ক্রীত হইলেই নগদ অর্থ প্রদান করিতে হয়। ক্রেডিট লেনদেনে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে অর্থ প্রদান করিতে হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে একটি বিশেষ পত্রে ক্রেডিট লেন-দেনের শর্তাবলী লিখিত হইয়া থাকে।

ক্রেডিট (Credit) **:** অর্থশাস্ত্রে 'ক্রেডিট' বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি ভবিষ্যতে টাকা দিবার অঙ্গীকারের বিনিময়ে জিনিসপত্রের কেনাবেচা : ক্রেডিট কারবার নগদ কারবারের বিপরীত। নগদ কারবারে জিনিসপত্র কেনাবেচার সঙ্গে সঙ্গে টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু, ক্রেডিট কারবারে দেনাপাওনা নগদ টাকায় মিটাইয়া দেওয়া হয় না, ক্রেতা কিছুদিন বাদে বিক্রেতাকে জিনিসপত্র বিক্রয়ের টাকা মিটাইয়া দিবে এই মর্মে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিপত্রকে ঋণপত্রও বলা হয়।

ক্রেডিট কারবারের ক্রেতা ও বিক্রেতার পরস্পরের উপর আস্থাবান থাকা উচিত। সুতরাং ক্রেডিট কারবারে দুইটি বিশেষ উপাদান চোখে পড়ে ; একটি হইতেছে একটি লেনদেনের বিপক্ষে নগদ টাকা প্রদান করিবার জন্য সময়ের ব্যবধান, অপরটি হইতেছে ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের সম্পর্ক।

ঋণপত্র (Credit Instruments) **:** ক্রেডিট কারবারের ক্রেতা ভবিষ্যতে বিক্রেতাকে নগদ টাকা দিবে—এই মর্মে যে প্রতিজ্ঞাপত্র করে, তাহাকে ঋণপত্র বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, কাগজী মুদ্রা, চেক এবং ব্যবসায়ী হুণ্ডি (Bill of Exchange) প্রভৃতি ঋণপত্রের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বৈদেশিক বাণিজ্য ঋণপত্রের মাধ্যমে চলিতে থাকিলে অধিক পরিমাণে স্বর্ণ-মুদ্রার প্রয়োজন হয় না। বড় বড় লেনদেনের ব্যাপারে যদি উভয়পক্ষের মধ্যে ঋণপত্রের মাধ্যমে ব্যবসায়ের কাজ সম্পাদিত হয়, তবে যে পক্ষের কিছু টাকা নীট্ পাওনা থাকিবে, শুধু সেই পক্ষ কিছু পরিমাণে স্বর্ণমুদ্রা পাইবে। ইহাতে অধিক পরিমাণে স্বর্ণমুদ্রার ব্যবস্থা রাখিবার ঝামেলা হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় স্বর্ণমুদ্রার মাধ্যমে টাকাপয়সা পাঠানো খুবই অসুবিধাজনক এবং ব্যয়বহুল।

সর্বশেষে, স্বর্ণমুদ্রা তৈয়ার করিতে যে পরিমাণ খরচ হয় ঋণপত্র তৈয়ার করিতে তাহা অপেক্ষা অনেক কম খরচ হয়। উপরন্তু, স্বর্ণমুদ্রার মাধ্যমে লেনদেন করিবার একটি বিশেষ অসুবিধা আছে যাহা ঋণপত্রের মাধ্যমে লেনদেন করিবার সময় অনুভূত হয় না। তাহা হইতেছে, স্বর্ণমুদ্রা লেনদেনে ব্যবহৃত হইতে থাকিলে দেশে যে পরিমাণে এই ধাতু আছে, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে টাকা তৈয়ার করা সম্ভবপর নয় ; কিন্তু জাতির প্রয়োজনে অধিক মুদ্রার প্রয়োজন হইলে সেই প্রয়োজন ঋণপত্রের মাধ্যমে মিটানো সম্ভবপর।

হুণ্ডি (Bill of Exchange) **:** হুণ্ডি হইতেছে একপ্রকার ঋণপত্র। বড় বড় খরিদ্দারগণ যখন জিনিসপত্র কিনে, তখন তাহারা প্রায়ই জিনিসপত্রের নগদ দাম না দিয়া ইহাদের উপর একটি ঋণপত্র দেয়। এই ঋণপত্রে লেখা থাকে যে, জিনিসপত্র বিক্রয় বাবদ টাকা পত্রবাহককে কিংবা অন্য কোন ব্যক্তিকে দেওয়া হউক—এই প্রকার ঋণপত্রকে বিল বা হুণ্ডি বলে। যদি ক্রেতা এবং বিক্রেতা একই দেশের অধিবাসী হয়, তবে এই ঋণপত্রকে দেশীয় বিল বা হুণ্ডি বলে; আর যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা দুই দেশের অধিবাসী হয়. তবে সেই ঋনপত্রকে বৈদেশিক হুণ্ডি বলা হয়। বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হুণ্ডি পাঠাইবার পর, ক্রেতা যখন এই ঋণপত্র গ্রহণ করে, তখন সেই নির্দিষ্ট টাকার জন্য ক্রেতা দায়ী থাকে।

বৈদেশিক বাণিজ্যে বড বড় লেনদেন করার পক্ষে হুণ্ডি খুবই প্রয়োজনীয়। এক দেশ হইতে অন্য দেশে হুণ্ডির মাধ্যমে লেনদেন করিলে খরচ খুবই কম হয়। ইহাতে নগদ টাকা পাঠাইবার প্রয়োজন হয় না; স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার করিবারও প্রয়োজন হয় না।

হুণ্ডির বাজারদর হুণ্ডির মোট চাহিদা এবং যোগানের দ্বারা নিরূপিত হয়। ব্যবসায়ী হুণ্ডির চাহিদা থাকে তাহাদেরই যাহাদের বিদেশে টাকা পাঠাইবার প্রয়োজন হয়। আবার যাহারা বিদেশে জিনিস বিক্রয় করিয়াছে তাহারা ক্রেতাদের উপর হুণ্ডি কাটে এবং ইহার বিনিময়ে নগদ টাকা চায়। এইভাবে হুণ্ডির চাহিদা ও যোগানের সৃষ্টি হয়, এবং ইহাদের মধ্যে যখন ভারসাম্য (equilibrium) হয়, তখন হুণ্ডির বাজার-দর নির্ধারিত হয়।

চেক (Cheque) **:** ব্যাংকে টাকা জমা রাখিলে ব্যাংক আমানতকারীকে একখানি চেকবই দেয়। আমানতকারী যদি নিজের আমানত হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নিজে অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রদান করিবার জন্য ব্যাংককে একটি লিখিত নির্দেশ দেয়, তখন সেই নির্দেশপত্রকে চেক বলা হয়। এই লিখিত নির্দেশপত্র দেওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট চেকবই থাকে। চেক হইতেছে এক ধরনের ঋণপত্র; সুতরাং চেকের মাধ্যমে লেনদেন করিতে হইলে যে ব্যক্তি চেক প্রদান করিবে এবং যে ব্যক্তি চেক গ্রহণ করিবে, তাহাদের উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের সম্পর্ক থাকা চাই।

চেককে আমরা টাকা বলিয়া গণ্য করিতে পারি না যদিও টাকা এবং চেকের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে। প্রথমত, টাকা সকলেই গ্রহণ করে; কিন্তু চেক সকলেই গ্রহণ করিতে পারে না। যাহার নামে চেক দেওয়া হয়, শুধু সেই ব্যক্তিই চেক গ্রহণ করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, টাকার অনেকবার হাতবদল হইতে পারে; কিন্তু, একখানি চেকের খুব কমই হাতবদল হয়। তৃতীয়ত, কাহাকেও টাকা প্রদান করিলে দেনা-পাওনার শেষ হয়। কিন্তু, চেক প্রদান করিলে দেনা-পাওনার শেষ হয় না; যতক্ষণ পর্যন্ত চেকটি ব্যাংকে ভাঙানো না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত দেনা-পাওনার শেষ হয় না।

চেকের মাধ্যমে লেনদেনের অনেক সুবিধা আছে। চেকের মাধ্যমে লেনদেন করিলে অধিক পরিমাণে ধাতব মুদ্রার ব্যবহার হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

চেকের মাধ্যমে লেনদেন চলিলে সাধারণতঃ প্রত্যেক ব্যাংক সর্বদাই ইহার আমানতকারীর হিসাবে জমা রাখিবার জন্য অন্যান্য ব্যাংকের উপর কাটা চেক পায়। দিনের শেষে ব্যাংকগুলি এই সমস্ত চেক ক্লিয়ারিং হাউসে (Clearing House) পাঠাইয়া দেয়। এই প্রতিষ্ঠান প্রত্যেক ব্যাংকেরই অপর ব্যাংকের নিকট নীট দেনা অথবা পাওনার পরিমাণ স্থির করে। এইভাবে অবশিষ্ট নীট দেনা-পাওনা নগদ টাকার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এইভাবে চেকের সহায়তায় কোন রকম নগদ টাকা অথবা ধাতব মুদ্রা ব্যবহার না করিয়াই অনেক লেনদেন করা হয়।

ক্লিয়ারিং হাউস (Clearing House): 'ক্লিয়ারিং হাউস' হইতেছে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির মিলিত একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের মারফৎ বিভিন্ন ব্যাংকের প্রতিনিধিগণ একত্র হইয়া তাহাদের পরস্পরের চেক, ড্রাফ্‌ট ইত্যাদির জন্য দেনা-পাওনা সহজেই মিটাইতে পারে। একই অঞ্চলে ব্যবসায় করে এই রকম বিভিন্ন ব্যাংক পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত প্রত্যেকেই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। ক্লিয়ারিং হাউসের মাধ্যমে নগদ লেনদেন ছাড়াই একটি ব্যাংক অপর ব্যাংকের সহিত তাহার দেনা-পাওনা মিটাইতে পারে। একটি উদাহরণের সাহায্যে ইহা বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাক, ইউনাইটেড ব্যাক স্টেট ব্যাংকের উপর চেক নিজের আমানত-কারীদের নিকট হইতে জমা পাইয়াছে। এইভাবে স্টেট ব্যাংকও ইউনাইটেড ব্যাংকের চেক ইহার নিজের আমানতকারীদের নিকট হইতে জমা পাইয়াছে। এখানে একদিক হইতে ইউনাইটেড ব্যাংক স্টেট ব্যাংকের নিকট পাওনাদার এবং অপর দিক হইতে স্টেট ব্যাংক ইউনাইটেড ব্যাংকের নিকট পাওনাদার। প্রত্যেক ব্যাংককেই যদি লোক পাঠাইয়া অন্যান্য ব্যাংকের নিকট হইতে চেক অথবা ড্রাফ্‌ট আদায় করিতে হয়, তবে অযথা সময়ের অপচয় হয় এবং ইহাতে অনেক অসুবিধা ও বিপদের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যদি ক্লিয়ারিং হাউসে উভয় ব্যাংক মিলিত হয় এবং পরস্পরের দেনা-পাওনার পার্থক্য পরীক্ষা করিয়া দেখে, এবং যে ব্যাংক নীট পাওনাদার সেই ব্যাংক যদি অপর ব্যাংক হইতে তাহার (দেনার পরিমাণ বাদ দিয়া) পাওনা লইয়া যায়, তবে কোন অসুবিধারই সৃষ্টি হয় না। ক্লিয়ারিং হাউস লেনদেনের এই সুবিধা করিয়া দেয়। প্রত্যেক দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি করিয়া ক্লিয়ারিং হাউস রাখে এবং অন্যান্য বাণিজ্যমূলক ব্যাংকগুলি ইহার সদস্য হয়। প্রত্যেক ব্যাংকের নামেই ক্লিয়ারিং হাউসে একটি হিসাব (account) খুলিতে হয়। প্রত্যেক ব্যাংকেরই অন্যান্য ব্যাংকের সহিত দেনা-পাওনার হিসাব সেই হিসাব-বইয়ে লেখা থাকে। বিভিন্ন ব্যাংকের প্রতিনিধিগণ একত্র হইয়া

সেই হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখে এবং যাহার যাহা নীট পাওনা হয়, তাহা নিজের নিজের হিসাব-বইয়ে জমা করিয়া লয়। এইভাবে একটি বিরাট লেনদেনের অসুবিধা ক্লিয়ারিং হাউসের মাধ্যমে দূর করা যায়।

আধুনিক কালে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ক্লিয়ারিং হাউসের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোন ব্যাংককেই নগদ টাকার লেনদেন করিতে হয় না। বিভিন্ন ব্যাংককে শুধু তাহাদের দেনা-পাওনার হিসাব ক্লিয়ারিং হাউসে তাহাদের যে হিসাব আছে, তাহাতে লিখিয়া লইতে হয় অথবা অদলবদল করিয়া হিসাব মিলাইতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক অথবা ক্লিয়ারিং হাউসের নিকট সংরক্ষিত তহবিলের জমা পাওনা ও দেনা অনুযায়ী বাড়াইয়া অথবা কমাইয়া প্রত্যেক ব্যাংক নিজের হিসাব ঠিক রাখে। ক্লিয়ারিং হাউসের সুবিধা থাকায় আধুনিক কালে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাংক মারফৎ লেনদেন করিবার উৎসাহ (banking habits) ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে।

ব্যাংকের প্রকারভেদ (Types of Banks):

১। **সেভিংস ব্যাংক** (Savings Banks)—স্বল্প আয়ের লোকজন তাহাদের স্বল্প আয় হইতে কিছু পরিমাণ অর্থ ভবিষ্যতের জন্য যাহাতে সঞ্চয় করিতে পারে এইজন্য এই ব্যাংকগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। এই ব্যাংকগুলি জনসাধারণকে অল্প সঞ্চয় করিতে উৎসাহ প্রদান করে। জনসাধারণকে একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ দিবার প্রতিশ্রুতিতে ইহারা টাকা ধার লইয়া থাকে। ভারতে পোস্ট-অফিসের সহিত সংশ্লিষ্ট যে ব্যাংক আছে তাহা শুধু টাকা জমা লইয়া থাকে, টাকা ধার দেয় না।

২। **কেন্দ্রীয় ব্যাংক** (Central Banks)—আজকাল দেশীয় ব্যাংকের গুরুত্ব সর্বত্র স্বীকৃত. এবং এই কেন্দ্রীয় ব্যাংকই হইল একটি দেশের সমগ্র ব্যাংক-ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল ও নিয়ামক। দেশের সমগ্র অর্থের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক মূল্যস্তরের স্থিতাবস্থা রক্ষা করিতে চেষ্টা করে।

৩। **কৃষি ব্যাংক** (Agricultural Banks)—কৃষি ব্যাংকগুলি প্রধানতঃ কৃষিক্ষেত্রে ঋণদান করিয়া সহায়তা করে। সাধারণতঃ কৃষিক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণের প্রয়োজন হয়। কৃষিকাজে সাময়িক কালের জন্য কতকগুলি চল্‌তি খরচের প্রয়োজন হয়, যথা বীজক্রয়, সারক্রয়, শ্রমিকদের দৈনিক পারিশ্রমিক দেওয়া ইত্যাদি। এই প্রকার খরচ সংকুলান করিবার জন্য কৃষকদের ঋণগ্রহণের প্রয়োজন হয়। এই ঋণ সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিক্ষেত্রে সমবায় ব্যাংকের (Co-operative Bank) সৃষ্টি হইয়াছে। এই ব্যাংকগুলি স্বল্পমেয়াদে অল্প সুদে কৃষকদের ঋণদান করিয়া থাকে ; কৃষিক্ষেত্রের স্থায়ী উন্নতিসাধন করিতে হইলে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের একান্ত প্রয়োজন। যথা, নূতন জমি ক্রয়, সেচব্যবস্থা প্রবর্তন করা, নূতন যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যাদি কাজের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণের প্রয়োজন। সমবায় ব্যাংকগুলির মূলধনের পরিমাণ স্বল্প বলিয়া তাহাদের পক্ষে একসঙ্গে অধিক মূলধন বা দীর্ঘমেয়াদী

ঋণদান করা সম্ভবপর হয় না। এই উদ্দেশ্যে কৃষিক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানের জন্য জমিবন্ধকী ব্যাংক (Land Mortgage Bank) সৃষ্টি হইয়াছে।

৪। **বিদেশী মুদ্রা-বিনিময় ব্যাংক** (Foreign Exchange Banks)—যে সকল ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যে টাকা লেনদেন করে, তাহাদের বিনিময়-ব্যাংক বলা হয়। যাহারা বিদেশ হইতে পণ্য আমদানি করে বা বিদেশে পণ্য রপ্তানি করে, তাহাদের বিলে 'বাট্টা' লইয়া টাকা দেওয়া হইল বিনিময় ব্যাংকের প্রধান কাজ। এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যাংকের অনুরূপ এই ব্যাংকগুলিও লোকের টাকা আমানত রাখে এবং লোককে টাকা ধার দেয়।

৫। **শিল্পসহায়ক ব্যাংক** (Industrial Banks)—শিল্প পরিচালনা ক্ষেত্রে সাধারণতঃ স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী—উভয়বিধ ঋণ সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে শিল্প-সহায়ক ব্যাংকের সৃষ্টি হয়। কোন কোন দেশে এই জাতীয় ব্যাংকগুলিকে উন্নয়ন-ব্যাংক (Development Banks) বলা হয়। ভারতে শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক (Industrial Development Bank of India), শিল্প ঋণ সরবরাহ সংস্থা, শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ সংস্থা, প্রভৃতিকে উন্নয়ন-ব্যাংক বলা হয়।

৬। **বাণিজ্যিক ব্যাংক** (Commercial Banks)—এই জাতীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ হইল আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্যে স্বল্পমেয়াদী ঋণদান করিয়া সাহায্য করা। এতদ্ব্যতীত ইহারা লোকের টাকা আমানত রাখা, টাকা ধার দেওয়া বা হুণ্ডির বিনিময়ে অগ্রিম টাকা দেওয়ার কাজ করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ (Functions of a Commercial Bank)—সাধারণতঃ ব্যাংক বলিতে বাণিজ্যিক (commercial) ব্যাংককেই বুঝায়। এই জাতীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ হইতেছে জনসাধারণের নিকট হইতে টাকা জমা রাখা এবং সেই জমার জন্য সুদ প্রদান করা।

দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি জনসাধারণ এবং ব্যবসায়--প্রতিষ্ঠানকে টাকা ধার দেয়। ধার দেওয়া ব্যাংকের একটি ব্যবসায় এবং এইজন্য ইহা সুদ পায়। তাহা ছাড়া টাকা ধার দেওয়ার মাধ্যমে ব্যাংক নূতন আমানতের সৃষ্টি করে। দীর্ঘদিনের কারবারের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, আমানতকারীগণ সব টাকা একসঙ্গে তুলিয়া লয় না। সেইজন্য ব্যাংক সব টাকা জমা না রাখিয়া কিছু টাকা নিজের উদ্যোগে বিনিয়োগ করে অথবা বিভিন্ন ব্যক্তি বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে। এখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে, সর্বদা আমানতকারীদের বিশ্বাসভাজন হইয়া থাকাই ব্যাংকিং ব্যবসায়ে সাফল্যের ভিত্তি। এইজন্য বাণিজ্যিক ব্যাংককে এমন নগদ টাকা হাতে রাখিতে হয় যেন কোন আমানতকারী টাকা তুলিতে আসিয়া ব্যাংকের হাতে টাকা নাই বলিয়া ফিরিয়া না যায়। অথচ ব্যাংকিং ব্যবসায়ে লাভের দিক হইতে চিন্তা করিলে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিজের হাতে সব টাকা না রাখিয়া কিছু টাকা বিনিয়োগ করা উচিত। সুতরাং

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজে আমরা দুইটি নীতির সমন্বয় দেখিতে পাই ; একটি হইতেছে 'Principle of Liquidity' এবং অপরটি হইতেছে 'Principle of Profitability'। ব্যাংকে তিনপ্রকার আমানত দেখা যায়, যথা, চলতি আমানত (Current Account Deposits) সঞ্চয়ী আমানত (Savings Deposits) এবং স্থায়ী আমানত (Fixed Deposits)। তৃতীয়তঃ, অনেক ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য অথবা কৃষি-উন্নয়নের জন্য টাকা ধার দেয়। আমাদের দেশে স্টেট ব্যাংক(State Bank) এবং অন্যান্য ব্যাংক শিল্পোন্নয়ন এবং কৃষির উন্নয়নের জন্য টাকা ধার দেয়।

চতুর্থত, বাট্টা দিয়া হুণ্ডি কিনিয়া লওয়া এবং বৈদেশিক হুণ্ডি অথবা মুদ্রা বিক্রয় করাও ব্যাংকের মারফৎ বৈদেশিক মুদ্রার কেনাবেচা করিতে পারেন।

পঞ্চমত, ব্যাংক নিজের মক্কেলের জন্য অনেক প্রয়োজনীয় কাজ করে। অলংকার, গোপনীয় দলিল প্রভৃতি যাবতীয় মূল্যবান সামগ্রী ব্যাংকের নিকট গচ্ছিত রাখা যায়। তাহা ছাড়া, শেয়ার কেনাবেচা সম্বন্ধে মক্কেলগণ ব্যাংকের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংক নিজের মক্কেলের পক্ষে অছি (Trustee) হিসাবে কাজ করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক-ব্যবসায়ের নীতি অথবা সম্পদ-বিনিয়োগ পরিচালনার তত্ত্ব (Principles of Commercial Banking or Theories of Asset Management) :

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যবসায় তিনটি মূলনীতির উপর ভিত্তিশীল : (১) মুনাফা অর্জন করা, (২) জনসাধারণের আমানত নিরাপদে বিনিয়োগ করা এবং (৩) সম্পদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের নগদ টাকায় পরিবর্তনযোগ্যতা (liquidity) বজায় রাখা। এই নীতিগুলির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ব্যাংককে এমনভাবে অর্থ বিনিয়োগ করিতে হয় যেন আমানতকারীর দাবি মিটানো যায় এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট লাভ থাকে। আমানতকারী অর্থ ফেরত চাহিলে ব্যাংক তাহা ফেরত দিতে বাধ্য ; আমানতকারীর দাবি মিটাইতে পারিবার উপর ব্যাংকের সুনাম এবং স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। সেজন্য ব্যাংক সর্বদাই চেষ্টা করে বিনিয়োগকে যথাসম্ভব নিরাপদে রাখিতে। কিন্তু নিরাপদ বিনিয়োগ (safe investment) এবং সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন (Profit maximisation), এই দুইটি নীতি পরস্পর বিরোধী। সেজন্য ব্যাংকের পক্ষে প্রধান প্রয়োজন এমন কোন বিনিয়োগ নীতি অনুসরণ করা যাহার ফলে আমানতকারীর আমানতেরও নিরাপত্তা সুরক্ষিত থাকিবে, আবার বিনিয়োগের মূল উদ্দেশ্যও (অর্থাৎ মুনাফা অর্জন করা) সার্থক হইবে। এজন্য ব্যাংকের প্রথম কাজ হইতেছে দাদনের সময় নির্ধারণ করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাংকগুলি স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রদান করা পছন্দ করে। ব্যাংক সেই জাতীয় ঋণ প্রদান করা পছন্দ করে যেগুলির মেয়াদ খুবই অল্প এবং যেগুলি নিজ হইতেই নগদ টাকায়

রূপান্তরিত হইয়া থাকে (Self-liquidating loans)। নগদ টাকায় ব্যাংকের সব সম্পদ বজায় রাখা সম্ভব নহে বলিয়াই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি যতটা সম্ভব নগদ টাকা হাতে রাখিয়া অল্প সময়ের জন্য কিছু টাকা মক্কেলদের ঋণ হিসাবে দিয়া থাকে। ইহাকে স্বল্পকালীন নোটিশে সংগ্রহযোগ্য অর্থ (money at call, or short notice) বলা হয়।

যখন কোন ব্যাংক এমনভাবে ইহার সম্পদ বণ্টন করে যে অল্পকাল পরেই কোন ঋণ পরিশোধ করা হইবে অথবা ইহা পরিশোধ হইয়া যাইবার পর সংশ্লিষ্ট সম্পদ নিজ হইতেই নগদ টাকায় রূপান্তরিত হইবে, তখন ব্যাংকের অনুসৃত নীতিকে বলা হয় আসল বিল নীতি (Real Bills Doctrine) অথবা স্বয়ং পরিশোধের নীতি (Theory of Self-liquidity)। এই নীতির অসুবিধাগুলি হইতেছে,—প্রথমত, ইহাতে বিনিয়োগের সময় খুবই অল্প এবং স্বাভাবিকভাবেই ইহাতে মুনাফার পরিমাণ অল্প হয়। দ্বিতীয়ত, পুরাতন বিলের মেয়াদ শেষ হইলে যদি কোন ব্যাংক এই নীতি অনুযায়ী কাহারও নিকট হইতে নূতন বিল গ্রহণ করিতে (বিকল্পভাবে নূতন ঋণ প্রদান করিতে) অস্বীকৃত হয়, তবে সম্ভাব্য দেনাদার উৎপাদন অথবা ব্যবসায় হ্রাস করিতে বাধ্য হয়। তৃতীয়ত, এই স্বল্পকালীন ঋণগুলি পুনরায় প্রদান করা যায় (renewable); কিন্তু, ব্যাংক যদি কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা ফার্মের ক্ষেত্রে ঋণটিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে না চায়, তবে বাজারে ইহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হইতে পারে। অথচ ব্যাংক যে শুধু এই ধরণের ঋণ প্রদান করিয়াই নিজের ব্যবসায় চালাইবে তাহা নহে।

অনেক ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংক তাহার বিভিন্ন সম্পদ অন্য ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানের নিকট সন্তোষজনক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে, অথবা অন্য ব্যাংকের নিকট সাময়িক-ভাবে সম্পদ হস্তান্তরিত করিতে পারে। সেক্ষেত্রে আমানতকারী দাবি করিলে তাহাদের আমানত ফেরত দিবার ক্ষমতা ব্যাংকের আছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। এই নীতিকে বলা হয় সম্পদ হস্তান্তরের নীতি (Shiftability Theory)। কিন্তু যদি এই সম্পদ হস্তান্তরের ফলে ব্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, তবে ব্যাংকের পক্ষে এই নীতি অনুসরণ করা সম্ভব নয়। স্বল্পকালীন সম্পদের ঝুঁকি কম অথচ ক্রেতা বেশী। অপরদিকে দীর্ঘকালীন সম্পদের ঝুঁকি বেশী অথচ ক্রেতা কম তবুও দীর্ঘকালীন সরকারী সিকিউরিটিকে বাণিজ্যিক ব্যাংক নগদ সম্পদ হিসাবেই গণ্য করে; কারণ এইগুলি হস্তান্তর করিয়া ব্যাংক যে কোন সময়েই নগদ টাকা পাইতে পারে। এই নীতিটি হয়ত কোন একটি বিশেষ ব্যাংকের পক্ষে অনুসরণ করা সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু সামগ্রিকভাবে ব্যাংক ব্যবস্থার নগদ সম্পদের অবস্থা এবং একটি বিশেষ ব্যাংকের নগদ সম্পদের অবস্থা এক জিনিস নয়। একটি ব্যাংক যদি সম্পদ হস্তান্তরের মাধ্যমে লাভবান হয়, স্বাভাবিকভাবেই অপর কোন ব্যাংক ইহার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সেজন্য এই নীতি বর্তমানে খুব বেশী জনপ্রিয় হয় নাই।

বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চুক্তি অনুযায়ী মেয়াদী ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা (Term Loan) খুব জনপ্রিয় হইয়াছে। মধ্যকালীন এবং দীর্ঘকালীন ঋণের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আমেরিকার ব্যাংকগুলি এই জাতীয় ঋণ প্রদান করিয়া থাকে। সাধারণত, এই জাতীয় ঋণের মেয়াদ এক বৎসর হইতে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত হয়। ঋণ গ্রহণকারী ঋণের টাকা কিভাবে ব্যবহার করিবে তাহা এই চুক্তিবদ্ধ ঋণ দ্বারা নির্দিষ্ট করা হইয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি, প্রয়োজনীয় মজুত সামগ্রী, জমিজমা, ঘরবাড়ী, প্রভৃতি বন্ধক রাখিয়াও এই জাতীয় ঋণ দেওয়া হয়। যদি ঋণ-গ্রহীতা চুক্তি অনুযায়ী ঋণের টাকা ব্যবহার না করে তবে এই প্রকার ঋণ নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার আগেই পরিশোধ্য হইয়া উঠিতে পারে। চুক্তিবদ্ধ ঋণ পরিশোধ করা হয় ঋণ-গ্রহীতার প্রত্যাশিত আয় হইতে।

ব্যাংকের নগদ সম্পদ বজায় রাখার আরও একটি নীতি আছে ;—ইহাকে বলা হয় প্রত্যাশিত আয় নগদ টাকায় রাখিবার নীতি (Anticipated Income Theory of liquidity)। এই নীতিটিও ক্রেতার স্থায়ী পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ঋণ-গ্রহীতার প্রত্যাশিত আয় হইতে এই ঋণ পরিশোধ করা হয়, পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া নহে। প্রত্যাশিত আয়-নীতিটিকে অন্য দুটি নীতি হইতে আলাদাভাবে বিবেচনা করা হয়। সম্পদ হস্তান্তর করার নীতি অনুযায়ী ঋণ-গ্রহীতার ঋণ কোন একটি ব্যাংকে পরিশোধ করা হইলে ইহার ফলে অন্য কোন ব্যাংকে ইহার বিস্তৃতি ঘটে। চুক্তিবদ্ধ মেয়াদী ঋণও একটি বিশেষ চুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু প্রত্যাশিত আয় নগদ টাকায় রাখিবার নীতি অনুযায়ী প্রত্যাশিত আয় হইতে ঋণ পরিশোধ করিতে হয়।

বাণিজ্যমূলক ব্যাংক কর্তৃক ক্রেডিট সৃষ্টি (Creation of Credit by Commercial Banks) : বাণিজ্যমূলক ব্যাংকগুলি সাধারণতঃ দুইটি উপায়ে আমানত সৃষ্টি করিয়া থাকে। প্রথমত, আমরা আমাদের সঞ্চিত অর্থ ব্যাংকে জমা রাখি। ইহা হইতেছে প্রকৃত আমানত (actual deposits)। দ্বিতীয়ত, মক্কেলদের টাকা ধার দিয়াও ব্যাংক আমানত সৃষ্টি করিতে পারে। মিঃ হার্টলে উইদারস (Mr. Hartlay Withers) মনে করেন, ব্যাংকে প্রতিটি ঋণই একটি আমানতের সৃষ্টি করে ("every loan creates a deposit")। একটি উদাহরণের সাহায্যে ইহা বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাক্, একটি লোক কোন ব্যাংক হইতে ১০০০ টাকা ধার করিল। ব্যাংক লোকটিকে সম্পূর্ণ নগদ টাকা প্রদান করে না। ব্যাংক ঐ টাকা লোকটির নামে ব্যাংকের হিসাবে আমানত দেখায়। এই লোকটি যদি কোন চেকের (cheque) সাহায্যে অন্য কোন লোককে কিছু টাকা প্রদান করে, তখন ব্যাংক প্রথম ব্যক্তির হিসাব হইতে চেক অনুযায়ী টাকা সরাইয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির হিসাবে জমা রাখে। সবই কাগজপত্রে হইয়া যায়, নগদ টাকার লেনদেন হয় না। যেহেতু লোকটি সম্পূর্ণ টাকা একসঙ্গে ব্যাংক হইতে তুলিয়া লয় না, সেইজন্য

ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। অনুরূপভাবে ব্যাংক যদি অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বা অন্য কোন লোকের নিকট হইতে ঋণপত্র কিনে, তবে সেই লেনদেনও নগদ টাকায় হয় না। ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাংকের হিসাবে পাওনার ঘরে সেই টাকা জমা দেখায়। ইহাতে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ বাড়িয়া যায়।

আবার যদি ব্যাংক কোন লোকের নিকট হইতে ১০০ টাকার একটি চেক গ্রহণ করে, তবে ব্যাংক নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী হিসাব করিয়া ইহার শতকরা দশভাগ নগদ টাকায় রাখিয়া অবশিষ্ট ৯০ টাকা হইতে আর একজনকে ঋণ প্রদান করিতে পারে এবং এইভাবে ইহার মোট আমানতের পরিমাণ বাড়াইতে পারে।

ডক্টর ওয়াল্টার লিফ (Dr. Walter Leaf) এই যুক্তি স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে ব্যাংক ঋণ দিয়া আমানত সৃষ্টি করে না। সকল আমানতকারী একসঙ্গে সব টাকা ব্যাংক হইতে তোলে না বলিয়াই ব্যাংক সেই টাকা হইতে অন্য লোককে ঋণ দিতে পারে। একটিমাত্র ব্যাংককে এককভাবে বিবেচনা করিলে এই যুক্তির যথেষ্ট সারবত্তা আছে। কিন্তু, সামগ্রিকভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায়, ঋণগ্রহণকারী যদি ঋণের সম্পূর্ণ টাকা ব্যাংক হইতে তুলিয়া খরচ করিয়া ফেলে, তবুও সেই টাকাটা আমানতের আকারে অন্য কোন ব্যাংকে আমানত হিসাবে জমা হইবে।

এই ব্যবস্থার কতিপয় সীমা আছে। প্রথমত, প্রত্যেক ব্যাংককেই কিছু পরিমাণ নগদ টাকা সর্বদা হাতে রাখিয়া দিতে হয়। কারণ, আমানতকারী যে কোন সময়েই টাকা তুলিতে চাহিতে পারে। দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়ের লেনদেনে ব্যবসায়ীগণ যদি নগদ টাকার লেনদেন করিতে অভ্যস্ত হয় এবং চেক (cheque) প্রভৃতির সাহায্যে লেনদেন করিতে না চায়, তবে ব্যাংকের এইভাবে আমানত সৃষ্টি করিবার প্রচেষ্টা সফল হয় না। তৃতীয়ত, প্রত্যেক ব্যাংককেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট কিছু অর্থ রিজার্ভ রাখিতে হয় এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ নগদ টাকার রিজার্ভে রাখিতে হয়। যেমন ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে ইহাদের মোট সম্পদের শতকরা ৩০ ভাগ নগদ টাকার রিজার্ভে রাখিতে হয়। ইহাকে liquidity ratio বলা হয়।ইহাতে ব্যাংকের ঋণ প্রদান করিবার ক্ষমতা কিছু কমিয়া যায় এবং সেই অনুযায়ী আমানতের সৃষ্টিও কম হয়। চতুর্থত, ঋণগ্রহণকারী যদি ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ লইয়া সব টাকাটাই নিজের হাতে নগদ অবস্থায় রাখিতে চায় এবং ইহা ব্যাংকে জমা না দেয়, তবে ব্যাংক এই ঋণ হইতে আমানত সৃষ্টি করিবার সুযোগ পায় না। পঞ্চমত, কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি খোলাবাজারের নীতি (open market operations) অবলম্বন করিয়া বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ কমাইয়া দেয়, তবে বাণিজ্যমূলক ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা সংকুচিত হয়। সর্বশেষে ঋণগ্রহীতার সংখ্যা এবং তাহাদের ঋণগ্রহণের

ইচ্ছার দ্বারাও ঋণসৃষ্টির পরিমাণ সীমিত হয়। কিন্তু, আমানত সৃষ্টি করিবার ব্যাপারেও বাণিজ্যিক ব্যাংক মূলতঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক নীতির উপর নির্ভরশীল। উন্নত ধরণের ব্যাংকিং ব্যবসায়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে যেভাবে চালাইতে চায়, সেইগুলিও ঠিক সেইভাবে চলে। এইজন্য লর্ড কেইনস্ বলিয়াছেন, "The Central Bank is the conductor of the whole banking orchestra."

ব্যাংক-ব্যবস্থার উপকারিতা (Utility of the Banking System). আধুনিককালে ব্যাংক-ব্যবস্থার উপকারিতা অপরিসীম। ব্যাংকে টাকা সঞ্চিত রাখিয়া জনসাধারণ নিজেদের সঞ্চয়ের নিরাপত্তা বিধান করে। পূর্বে চোর ডাকাতের উৎপীড়নে অনেক ক্ষেত্রেই জনগণ টাকা সঞ্চয় করিতে পারিত না। ব্যাংক যে শুধু সঞ্চিত টাকা নিরাপদে রাখে তাহাই নহে, জনসাধারণকে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়াইতেও ব্যাংক প্রণোদিত করে। যে দেশে ব্যাংক-ব্যবসায় খুব ভাল, সেই দেশের জনসাধারণের সঞ্চয়ের স্পৃহাও (will to save) খুব বেশী। ব্যাংক প্রয়োজনের সময় ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাগণকে টাকা ধার দিয়া দেশের শিল্প-কাঠামোর ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে। দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যের পরিমাণও ইহাতে বাড়িয়া যায়। দূরদেশে টাকা আদান-প্রদান এবং ব্যবসায়ী লেনদেনের সমস্যার সহজ সমাধান ব্যাংক-ব্যবস্থার মাধ্যমে হইয়া যায়। চেকের প্রচলন যত বেশী হয়, মানুষের নগদ টাকা প্রদান, পরিশ্রম এবং সময় তত বেশী বাঁচে। ব্যাংকের ক্রিয়াকলাপ আলোচনা করিলে দেখা যায়, ব্যাংক ইহার মক্কেলগণের কত উপকারে আসে। যে দেশে ব্যাংক-ব্যবস্থা ভালভাবে গড়িয়া উঠে নাই, সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হইতে বাধ্য। সঞ্চয়ের সৃষ্টি হয় ব্যাংকের মাধ্যমে, সঞ্চয়ের বিনিয়োগও ব্যাংকের মাধ্যমেই হয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহেও ব্যাংকের একটি সক্রিয় ভূমিকা আছে। সরকারের সিকিউরিটি অথবা বণ্ড ক্রয় করিয়া ব্যাংক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকারের পক্ষে প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। আমাদের দেশের অনুন্নত অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্যতম কারণ হইতেছে অনুন্নত ব্যাংক-ব্যবস্থা। দেশে যখন বাণিজ্য-চক্রের দরুণ জিনিসপত্রের দাম উঠানামা করে এবং যখন দেশের অর্থনৈতিক স্থিতি নষ্ট হইয়া যায়, তখন ব্যাংকের দাদন-নীতি অথবা বিনিয়োগ-নীতিকে নমনীয় (flexible) করিয়া সরকার দেশে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা (economic stability) আনিবার চেষ্টা করে। তাহা ছাড়া, দেশের শিল্পোন্নয়ন এবং কৃষি-উন্নয়নের জন্য যে মোট টাকার প্রয়োজন, তাহার একটি বড় অংশ আসে দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা হইতে। আমানতকারীগণ যাহাতে স্বচ্ছন্দে বিদেশে টাকা পাঠাইতে অথবা লেনদেন করিতে পারে, সেইজন্য আধুনিক ব্যাংকগুলি বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন-সংক্রান্ত ব্যবসাও করে; সুতরাং দেখা যাইতেছে, আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ (Functions of a Central Bank): প্রথমত, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ হইতেছে মুদ্রা প্রচলন করা। প্রায় প্রত্যেক দেশেই মুদ্রা প্রচলন করা এবং মুদ্রা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতেই থাকে।

দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ব্যাংকার (Banker of the Banks) হিসাবে কাজ করে। অর্থাৎ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে নিজেদের চলতি আমানতের এবং স্থায়ী আমানতের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখিতে হয়।

তৃতীয়ত, সরকারের ব্যাংক (Government's Banker) হিসাবেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাজ করিয়া থাকে। সরকারের টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা থাকে। সরকারের প্রয়োজনের সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ধার দেয়। এই টাকা ধার দেওয়ার অর্থ হইতেছে নূতন নোট ছাপানো। সরকারের ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়াকলাপের (Debt Services) ভার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতেই থাকে।

চতুর্থত, দেশীয় মুদ্রার সহিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়-হার বজায় রাখিয়া মুদ্রাব্যবস্থায় এবং বৈদেশিক বাণিজ্য-ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা বজায় রাখার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে থাকে।

পঞ্চমত, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট যদি কোন বাণিজ্যিক-ব্যাংক টাকা ধার চায় তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাহা দেয়। এইজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে শেষ পর্যায়ের কর্জদাতা (Lender of the last resort) বলা হয়।

ষষ্ঠত, বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির পরস্পরের মধ্যে যে লেনদেন হয় সেইগুলির হিসাব-নিকাশ (Clearing) করিবার দায়িত্বও কেন্দ্রীয় ব্যাংক গ্রহণ করে। তখন ইহাকে ক্লিয়ারিং হাউস (Clearing House) বলে।

সপ্তমত, ব্যাংকের প্রধান এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইতেছে ঋণ নিয়ন্ত্রণ (control of credit) করা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি (Credit Control Policy of the Central Bank): দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার স্থিতিসাধন (Stabilization) করা এবং জিনিসপত্রের দাম যেন খুব বেশী উঠানামা না করে সে ব্যবস্থা করার দায়িত্ব হইতেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের। ঋণ ব্যবস্থাকে (credit system) নিয়ন্ত্রণ না করিতে পারিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষে এই দায়িত্ব গ্রহণ করা অসম্ভব। বাণিজ্যচক্রের জন্য দেশের জিনিসপত্রের দাম উঠানামা করে এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থারও পরিবর্তন হয়। দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এই চক্রাকার আবর্তন বন্ধ করার দায়িত্ব হইতেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের, এবং মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক (১) ইহার সুদের

কেন এবং কিভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে

হারের হ্রাস-বৃদ্ধি (Bank rate changes) করে (২) খোলা-বাজারে সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় (Open market operations) করে, (৩) বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানত কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখিবার অনুপাতের হ্রাস-বৃদ্ধি (Variable reserve ratio) করে অথবা (৪) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে কোন বিশেষ ঋণ প্রদান সম্পর্কে নির্দেশ অথবা উপদেশ প্রদান করে। এখানে বর্ণিত প্রথম তিনটি উপায়কে বলা হয় Quantitative methods of credit control এবং চতুর্থ উপায়টিকে বলা হয় Qualitative method of credit control, এই ব্যবস্থাগুলি কার্যকরী না হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্বাচনমূলক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ নীতি (Selective method of credit control) উপায়টি অবলম্বন করে। এই নীতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে এই মর্মে নিদেশ দেয় যেন (১) কোন একটি বিশেষ ঋণ দেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক যেন একটি নির্দিষ্ট শতকরা অংশ ঋণের বিপক্ষে প্রান্তিক রিজার্ভ (margin requirement) হিসাবে দাবি করে, (২) কোন নির্দিষ্ট জিনিস বন্ধকের বিপক্ষে যেন মক্কেলকে ঋণ প্রদান না করে, অথবা (৩) কোন কোন জিনিসের বিপক্ষে যেন ঋণ প্রদানের মাত্রা সীমিত রাখে। টাকার পরিমাণ যখন হঠাৎ বাড়িয়া যায়, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইহা কমাইবার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির টাকা ধার দেওয়া বন্ধ করিবার জন্য সুদের হার বাড়াইয়া দেয়, জনসাধারণও ব্যাংকের নিকট সিকিউরিটি বিক্রয় করিয়া তাহাদের হাতের বাড়তি টাকা নিজের হাতে লইয়া আসে এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি ইহার নিকট নিজেদের আমানতের যে পরিমাণ অংশ জমা রাখে, তাহা বাড়াইয়া দেয়। অনুরূপভাবে টাকার পরিমাণ কমিয়া গেলে তাহা বাড়াইবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার কমাইয়া দেয়, সিকিউরিটি বিক্রয় বন্ধ করিয়া সিকিউরিটি ক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া দেয় যাহাতে জনসাধারণ ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির হাতে অধিক টাকা আসে এবং ব্যাংকগুলির আমানতের যে পরিমাণ অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখিতে হয় তাহা কমাইয়া দেয়।

তাহা ছাড়া, শুধু মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধকল্পে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি প্রদত্ত বিশেষ কতিপয় ঋণের উপর (যেমন ফাটকা কারবারের জন্য ঋণ) বাধা-নিষেধ আরোপ করিতে পারে, অথবা কতিপয় বিশেষ জিনিস বন্ধক রাখিয়া ঋণ প্রদান না করিবার জন্য ইহা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারে। এই ব্যবস্থাকে নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি (Selective method of credit control) বলা হয়। এই ব্যবস্থা শুধু ঋণ প্রদান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অবলম্বিত হয়। ঋণ প্রদান বাড়াইবার জন্য এই ব্যবস্থা কোন কাজে আসে না। ক্রেডিট রেশনিং অর্থাৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণকে কতটা ঋণ দিবে অথবা কাহাকে ঋণ দিবে তাহা স্থির করিয়া দেওয়া, বাণিজ্যিক ব্যাংক যাহাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণনীতি অনুযায়ী কাজ করে, সেইজন্য নৈতিক চাপ (Moral Suasion) দেওয়া, এবং প্রয়োজন হইলে বাণিজ্যিক

ব্যাংকগুলির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা (direct action) অবলম্বন করা,—এই উপায়গুলির সাহায্যেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ-সম্প্রসারণ নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। উপরে যে ব্যবস্থাগুলি আলোচিত হইল, সেইগুলির প্রত্যেকটিরই কিছু না কিছু সীমা আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, ব্যাংক রেট যেভাবে বাড়িবে বা কমিবে, বাজারের সুদের হার যে সেইভাবেই বাড়িবে অথবা কমিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই ; অথবা ব্যাংক রেট বাড়িয়া গেলেও বিনিয়োগের পরিমাণ না কমিতে পারে। কারণ বিনিয়োগের পরিমাণ মূলতঃ নির্ভর করে মুনাফার প্রত্যাশার উপর। আবার যখন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য খোলা বাজারে সিকিউরিটি বিক্রয় করার নীতি (Open Market Sales Policy) অবলম্বন করে, তখন যদি কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক শেষ পর্যায়ের কর্জদাতা হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে ঋণপ্রার্থী হয়. তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেই বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ দিতে বাধ্য হয় এবং খোলাবাজারে সিকিউরিটি বিক্রয় করার নীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আবার খোলাবাজারে সিকিউরিটি ক্রয় করিয়া যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা করে তখন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির অর্থের পরিমাণ বাড়িলেই যে ঋণের পরিমাণ বাড়িবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। যখন খোলাবাজারে সিকিউরিটি বিক্রয় করার নীতি অবলম্বিত হয়, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উচিত ব্যাংক রেট বাড়ানো। ইহা ছাড়াও, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির আমানত রিজার্ভের অনুপাত বাড়াইয়া অথবা কমাইয়া যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ অথবা ঋণ পরিবর্ধন করিতে পারে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। আবার সব বাণিজ্যিক ব্যাংক এই পদ্ধতির দ্বারা সমানভাবে প্রভাবিত হয় না।

সর্বশেষে উপরিউক্ত কাজগুলি ছাড়াও কোন কোন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কতিপয় বিশেষ কাজ থাকে। যেমন, ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের একটি কৃষি ঋণদান বিভাগ আছে।

মুদ্রা সম্পর্কিত নীতির বিভিন্ন উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ (Different views about the different objectives of Monetary Policy) : আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির মুদ্রাসম্পর্কিত নীতিগুলির বিভিন্ন উদ্দেশ্য থাকে। তবে এই উদ্দেশ্যগুলি পরিবর্তনশীল বলিয়া অনেকে মনে করেন. টাকার যোগান দেশের চাহিদা ও প্রয়োজনের সহিত স্বাভাবিকভাবেই যুক্ত থাকে। সুতরাং টাকার যোগান নিয়ন্ত্রণ করিবার বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই। কিন্তু, বাণিজ্যচক্রের পরিপ্রেক্ষিতে এই যুক্তিটি গ্রহণ করা যায় না। দ্বিতীয়ত, স্বর্ণমানে টাকার যোগান স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণের (automatic regulation) অধীন। মুদ্রানীতি সম্পর্কে তৃতীয় মতবাদ হইতেছে এই যে অর্থের প্রধান কাজ ইহার বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা, মূল্যমান নির্দেশ করা এবং বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করা। চতুর্থ মতবাদ হইতেছে এই যে টাকার যোগানকে কখনই অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রাখা উচিত নয়।

জিনিসপত্রের দামের পরিবর্তন যাহাতে কমিয়া যায় এবং যাহাতে একটি স্থায়ী মূল্যস্তর বজায় রাখা যাইতে পারে ও কর্মনিয়োগের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে সেইভাবে মুদ্রানীতি পরিচালনা করা উচিত।

স্বর্ণমানে মুদ্রা সম্পর্কিত নীতির উদ্দেশ্য ছিল দেশের মুদ্রার সহিত বৈদেশিক বিনিময় হারের স্থায়িত্ব বজায় রাখা; এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য স্বর্ণমানে দেশের অভ্যন্তরের মূল্যস্তরের স্থায়িত্বকে উপেক্ষা করা হইত। স্বর্ণের আগমন ও নির্গমনের স্বয়ংক্রিয়তা ছিল স্বর্ণমানের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে অপর একটি তত্ত্ব হইতেছে বাণিজ্যিক ঋণতত্ত্ব (Commercial Loan Theory)। এই তত্ত্ব অনুযায়ী টাকার যোগান জিনিস-পত্রের যোগানের উপর নির্ভরশীল। এই তত্ত্বে বাণিজ্যিক কাগজগুলির ডিসকাউন্ট (Discounting) এবং পুনঃ ডিসকাউন্টের (Rediscounting) দ্বারা যোগান নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।

মুদ্রা সম্পর্কিত নীতির যতগুলি উদ্দেশ্য আছে, সেইগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গ্রহণ-যোগ উদ্দেশ্য হইতেছে মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা অর্জন করা ও ইহা বজায় রাখার উদ্দেশ্য। ১৯২৯ সালে বিশ্বব্যাপী যে মন্দা সৃষ্টি হয়, তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এই নীতি গৃহীত হয়। বাণিজ্যচক্রের নিয়ম অনুযায়ী যাহাতে চূড়ান্ত সমৃদ্ধি অথবা চূড়ান্ত মন্দা দেশের অর্থব্যবস্থার ক্ষতিসাধন না করিতে পারে সেইজন্য এই নীতির উদ্দেশ্য হইতেছে দাম যাহাতে খুব কম না হয় অথবা খুব বেশী না হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখা। মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতা থাকিলে উন্নত দেশগুলির পক্ষে যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়নের উচ্চ হার বজায় রাখা সম্ভবপর হয়, অনুন্নত দেশগুলির পক্ষেও সেই প্রকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করিবার কর্মসূচী অনুসরণ করা সম্ভবপর হয়। তবে এই নীতির বিরুদ্ধে বলা যায় যে কোন মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখিতে হইলে, সেই সম্পর্কে সকলে একমত নাও হইতে পারেন। এই মূল্যস্তর খুচরা, সামগ্রিক অথবা গড় মূল্যস্তর হইবে কিনা সেই বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। তাহা ছাড়া, মূল্যস্তরের উঠানামা কিছু পরিমাণে না থাকিলে বিনিয়োগকারীগণ বিনিয়োগের কাজে উৎসাহিত হয় না। মূল্যস্তর বাড়িতে আরম্ভ করিলেই ব্যবসায়ীগণের লাভের আশা বাড়িয়া যায় এবং তখনই বিনিয়োগের পরিমাণও বাড়িয়া যায়।

আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে উন্নয়মান (Developing) দেশগুলিতে মুদ্রা সম্পর্কিত নীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। তাঁহারা মনে করেন যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জিত হইলেই মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতা আসিবে। আবার কোন কোন অর্থবিজ্ঞানী মনে করেন যে আগে মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা এবং পরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন, এইভাবে মুদ্রা সম্পর্কিত নীতির উদ্দেশ্য পরিচালিত হওয়া উচিত। এই দুইটি মতবাদের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্কের

অবকাশ আছে। তবে ইহা ঠিক, মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুত অর্জন করা, এই দুইটি মুদ্রা সম্পর্কিত নীতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিবিধ নীতি অনুসরণ করিয়া থাকে। একটি হইতেছে নিয়ন্ত্রণমূলক মুদ্রানীতি (Restrictive or Regulatory Monetary Policy), অপরটি হইতেছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক মুদ্রানীতি (Promotional Monetary Policy)। প্রথম নীতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা (Price Stability) বা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখিবার চেষ্টা করে। দ্বিতীয় নীতি অনুযায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান করিবার নিমিত্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা সৃষ্টির ব্যবস্থা অধিকতর কার্যকরী করে এবং শিল্প, কৃষি, রপ্তানি প্রভৃতি খাতে অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করে। অনগ্রসর এবং উন্নতিকামী দেশগুলির ব্যাংক ব্যবস্থায় এই দ্বিবিধ নীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। উন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে উন্নয়নের উচ্চ হার বজায় রাখিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে একটি সুষ্ঠু মুদ্রানীতি অনুসরণ করিতে হয়।

অধ্যাপক হায়েকের (Prof. Hayek) মতে মুদ্রানীতির মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত অর্থের নিরপেক্ষতা (neutrality) বজায় রাখা অর্থাৎ, অর্থব্যবস্থা এইরূপ হওয়া উচিত যে টাকার দ্বারা যেন জনসাধারণের আসল ব্যয় (real expenditure), ভোগের প্রবণতা (Propensity to consume) এবং উৎপাদনী শক্তি প্রভাবিত না হয়। এই নীতিকে নিরপেক্ষ মুদ্রানীতি (Neutral Monetary Policy) বলা হয়।

মুদ্রানীতির অপর একটি উদ্দেশ্য হইতেছে পূর্ণ কর্মসংস্থান অর্জন করা এবং ইহা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা। কেইনসীয় অর্থনীতিতে এই উদ্দেশ্য সার্থক করিতে হইলে মুদ্রা-নীতির সহিত ফিস্‌ক্যাল নীতির (Fiscal Policy) সংযোজন করা উচিত।

নোট প্রচলন নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি (Different methods of the regulation of note issue): নোট প্রচলনের কি নীতি হওয়া উচিত, এই বিষয়ে ইংলণ্ডের দুইটি বিশেষ মতবাদ উনবিংশ শতাব্দীতে দেখা গিয়াছিল। কারেন্সী নীতির সমর্থকগণ (Currency School) বলিতেন যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে পরিমাণ নোট বাজারে চালু করিবে, তাহার সমপরিমাণ মূল্যের ধাতু রিজার্ভ রাখা উচিত। সুতরাং জনসাধারণ নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাগজী টাকা বা নোটের পরিবর্তে মূল্যবান ধাতু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে লইতে পারিবে। এইভাবে দেশের মুদ্রাব্যবস্থার উৎকর্ষ সম্বন্ধেও জনসাধারণের বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ব্যাংকিং মতবাদের সমর্থকগণের (Banking School) মতে কাগজী নোটের সমপরিমাণ মূল্যের ধাতু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ রাখার প্রয়োজন নাই। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর যদি জনসাধারণের বিশ্বাস থাকে,

কারেন্সী মতবাদ এবং ব্যাংকিং মতবাদ

তবে তাহারা কাগজী টাকা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবে, একসঙ্গে সকলে নোটের বদলে মূল্যবান ধাতু চাহিবে না। সুতরাং নোটের সমপরিমাণ মূল্যের ধাতু না রাখিয়া আংশিক রিজার্ভ রাখিলেই চলে।

কারেন্সী মতবাদ অনুযায়ী নোট প্রচলন করিলে এই পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়বহুল হইয়া পড়ে। কারণ, এই অবস্থায় নোটের সমপরিমাণ মূল্যের ধাতু সংগ্রহ করিতে হয়। অপরদিকে ব্যাংকিং মতবাদে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে এই অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় না। কিন্তু ব্যাংকিং মতবাদে একটি বিশেষ অসুবিধা আছে। তাহা হইতেছে, নোটের সমপরিমাণ মূল্যের ধাতু রিজার্ভ রাখার ব্যবস্থা না থাকিলে যে কোন সময়ে মুদ্রাস্ফীতি কিংবা মুদ্রা সংকোচনের সৃষ্টি হইতে পারে।

আধুনিক মুদ্রাব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নিম্নলিখিত নোট-প্রচলন নীতির কথা উল্লেখ করিতে পারি।

প্রথমত, নির্দিষ্ট ফিডিউসারী সীমা (Fixed Fiduciary System) নোট প্রচলনের একটি পদ্ধতি হিসাবে বিবেচিত হইয়া থাকে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কর্তৃপক্ষ (Monetary Authorities) অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে নোট কোন মূল্যবান ধাতুর রিজার্ভ ব্যতীতই চালু করিতে পারে। এই সীমাকে স্থির ফিডিউসারী সীমা বলা হইয়া থাকে। এই সীমার উপরে নোট প্রচলন করিতে হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সমপরিমাণ মূল্যের স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিতে হয়। এই ব্যবস্থার একটি সুবিধা হইতেছে এই যে ইহাতে টাকার উপর জনসাধারণের আস্থা বাড়ে। কিন্তু এই ব্যবস্থার ত্রুটি হইতেছে এই যে নির্দিষ্ট ফিডিউসারী সীমা অতিক্রান্ত হইলে প্রয়োজনের সময়েও নোট-প্রচলন ইচ্ছা অনুযায়ী বাড়ানো যাইবে না। কারণ সেইক্ষেত্রে সমপরিমাণ মূল্যের স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিতে হয়। এই দিক হইতে বিবেচনা করিয়া এই পদ্ধতি অবলম্বন করিলে কারেন্সী ব্যবস্থা অনমনীয় ও কঠোর (rigid) হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া, নির্দিষ্ট ফিডিউসারী সীমা অতিক্রান্ত হইলে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হইয়া পড়ে।

নির্দিষ্ট ফিডিউসারী সীমা

দ্বিতীয়ত, আইনসভা আইন করিয়া নোট প্রচলনের সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে। ইহার অতিরিক্ত নোট প্রচলন করিতে হইলে পার্লামেণ্টের অনুমতি লইতে হয় এবং এই সর্বোচ্চ সীমার অতিরিক্ত নোট ছাপাইতে হইলে সমপরিমাণ মূল্যের স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিতে হয়। সাধারণতঃ, এই সর্বোচ্চ সীমা দেশে প্রচলিত নোট অপেক্ষা অনেক বেশী হয়। এই পদ্ধতিটি প্রথম পদ্ধতিটির অনুরূপ। ইহার একটি সুবিধা হইতেছে এই যে ইহাতে অযথা মূল্যবান ধাতু রিজার্ভ রাখিয়া দিতে হয় না। যদি নোট প্রচলনের সর্বোচ্চ সীমা খুব উপরে থাকে, তবে এই পদ্ধতি খুবই স্থিতিস্থাপক। কিন্তু যদি নোট প্রচলনের

সর্বোচ্চ ফিডিউসারী সীমা

সর্বোচ্চ সীমা নীচুতে থাকে, তবে এই পদ্ধতির স্থিতিস্থাপকতা কমিয়া যায় এবং ইহা প্রথম পদ্ধতির অনুরূপ হয়।

তৃতীয়ত, কোন কোন দেশে (যেমন কিছুকাল পূর্বে ভারতে ছিল) আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতি (Proportional Reserve System) অনুযায়ী নোট প্রচলন করা হইয়া থাকে। এই ব্যবস্থায় যত টাকার নোট চালু করা হয়, তাহার শতকরা একটি অংশের সমপরিমাণ মূল্যের স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিতে হয়। ১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া আইন অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাংক যত নোট প্রচলন করিত, তাহার শতকরা ৪০ ভাগ পরিমাণ মূল্যের স্বর্ণ এবং বৈদেশিক সিকিউরিটি রিজার্ভ রাখিতে হইত এবং এই রিজার্ভের মধ্যে স্বর্ণের পরিমাণ অন্ততঃ ৪০ কোটি টাকা থাকিত।

আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতি

অনেকের মতে এই পদ্ধতিরও একটি প্রধান ত্রুটি হইতেছে এই যে ইহাতে অকারণ বহু স্বর্ণ রিজার্ভের মধ্যে আটক থাকে। যেহেতু কোন দেশেই আর স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত নাই সেইজন্য অযথা বহু স্বর্ণ আটক করিয়া রাখিবার পক্ষে কোন যুক্তিসংগত কারণ নাই।

সর্বশেষে, কোন কোন দেশে (যেমন বর্তমান ভারতবর্ষে করা হইয়াছে) মুদ্রা কর্তৃপক্ষ কিছু পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা এবং স্বর্ণ আইনতঃ রিজার্ভ রাখিতে বাধ্য থাকিবে। এই রিজার্ভ রাখিয়া মুদ্রা কর্তৃপক্ষ যত খুশী নোট প্রচলন করিতে পারিবে। এই ব্যবস্থায় সর্বনিম্ন রিজার্ভ যদি খুব নীচুতে থাকে, তবে মুদ্রাব্যবস্থা খুবই স্থিতিস্থাপক হয়। ভারতবর্ষে মুদ্রা কর্তৃপক্ষকে মোট ২০০ কোটি টাকা রিজার্ভ রাখিতে হয় এবং ইহার মধ্যে ১১৫ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ এবং অবশিষ্ট ৮৫ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ অথবা বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখিতে হয়। এই ব্যবস্থাকে সর্বনিম্ন রিজার্ভ (Minimum Reserve System) বলা হয়।

সর্বনিম্ন রিজার্ভ পদ্ধতি

এখন প্রশ্ন হইতেছে, নোট প্রচলনের নীতিগুলির মধ্যে কোন্‌টি সর্বোৎকৃষ্ট। কারেন্সী ব্যবস্থাকে কম ব্যয়-বহুল, নমনীয় এবং স্থিতিস্থাপক হইতে হয়। বর্তমানে স্বর্ণ রিজার্ভ করিয়া রাখার খুব প্রয়োজনীয়তা নাই একথা ঠিক; আবার, ইহাও ঠিক যে আধুনিক কালে মুদ্রা কর্তৃপক্ষের কিছু না কিছু রিজার্ভ রাখা উচিত। নোটের বিপক্ষে কিছু সোনা না থাকিলে সাধারণ লোক নোটের উপর বিশ্বাস হারাইতে পারে। এইজন্য কিছু না কিছু স্বর্ণও রিজার্ভ রাখিয়া দেওয়া উচিত। সর্বদিক হইতে বিবেচনা করিলে সর্বনিম্ন রিজার্ভ পদ্ধতি (যাহা বর্তমানে ভারতে গৃহীত হইয়াছে) গ্রহণ করা উচিত, তবে ইহার দুইটি বিশেষ সর্ত থাকা উচিত। একটি হইতেছে সর্বনিম্ন রিজার্ভের পরিমাণ খুব উঁচুতে থাকিতে পারিবে না এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে যদি মুদ্রাস্ফীতি হয়, তবে তাহা প্রতিরোধ করিবার মত উপযুক্ত ক্ষমতা মুদ্রা কর্তৃপক্ষকে গ্রহণ করিতে হইবে।

উপসংহার

কেন্দ্রীয় ব্যয় কর্তৃক ঋণ-নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি
(Different Methods of Credit Control by a Central Bank)

ব্যাংক রেট (Bank Rate) : ব্যাংক রেট হইতেছে সেই রেট যাহা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রথম শ্রেণীর বিল ভাঙ্গাইয়া থাকে অথবা যাহা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক উৎকৃষ্ট ধরণের সিকিউরিটির বিপক্ষে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে ঋণ দিয়া থাকে। ব্যাংক রেটের কার্যকারিতা সম্বন্ধে তিনটি মতবাদ প্রচলিত আছে। প্রথমত, ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানীদের মতে ব্যাংক রেটের প্রধান কাজ ছিল স্বর্ণের গমনাগমন পরিচালনা করা। দ্বিতীয়ত, অধ্যাপক হট্রের মতে ব্যাংক রেট বিনিয়োগের খরচকে প্রভাবিত করিয়া দেশের আর্থিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে। তৃতীয়ত, কেইন্সের মতে ব্যাংক রেট দীর্ঘকালীন সুদের উপর প্রভাব বিস্তার. করে। স্বর্ণমান বর্তমানে প্রচলিত নাই বলিয়া ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানীদের মতবাদ বর্তমানে গৃহীত হয় না। হট্রের মতে ব্যাংক রেটের প্রভাব বিনিয়োগের খরচ (cost factor) হিসাবে দেখা উচিত ; কিন্তু কেইন্সের মতে ইহা একটি মূলধনী উপাদান (capitalisation factor)।

দেশের বিনিয়োগ-ব্যবস্থা সব সময়েই যে সুদের হারের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লয় তাহা নহে। বিনিয়োগের সুদ-স্থিতিস্থাপকতা (interest-elasticity of investment) আছে কিনা সেই সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে। সুদের হার কমিলেই যে বিনিয়োগ বাড়িবে তাহা নহে। কারণ বিনিয়োগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ে লাভের আশার উপর নির্ভর করে। সুদের হার বাড়িলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সুদের হার বাড়িয়া গেলে যদিও বিনিয়োগের খরচ (cost of investment) বাড়িয়া যায়, তবুও বিনিয়োগের পরিমাণ যে কমিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। যদি বিনিয়োগে লাভের আশা কমিয়া যায়, তবেই বিনিয়োগের পরিমাণ কমিবে। অধ্যাপক রবার্টসন মনে করেন, বিনিয়োগ বহুলাংশে সুদের হারের উপর নির্ভরশীল। অপরপক্ষে কেইন্স মনে করেন, বিনিয়োগ সুদের হার অপেক্ষাও মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার (Marginal Efficiency of Capital) উপর বেশী নির্ভরশীল।

ব্যাংক রেটের কার্যকারিতা কতিপয় শর্তের উপর নির্ভর করে। ব্যাংক রেট নীতি সফল হইতে হইলে দেশে একটি বিস্তৃত সিকিউরিটি বাজার থাকা দরকার। তাহা ছাড়া, এই নীতির সাফল্যের জন্য ব্যাংক রেট এবং অন্যান্য বাজার-সুদের হারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখা দরকার। ব্যাংক রেট নীতির সাফল্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু ব্যাংক রেট নীতির সাফল্যের জন্য ব্যাংকের নগদ টাকার রিজার্ভের অনুপাত যতদূর সম্ভব স্থিতিশীল (stable) থাকা দরকার। সর্বশেষে, ব্যাংক রেট নীতির সাফল্যের জন্য দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নমনীয়তা (flexibility) বজায় থাকা দরকার। অনগ্রসর

টাকার বাজারে এই শর্তগুলি পূরণ হয় না বলিয়া ব্যাংক রেট নীতি এই অনগ্রসর দেশগুলিতে অনেকক্ষেত্রেই সফল হয় না।

সম্প্রতি কোন কোন দেশে ব্যাংক নহে এইরূপ কতিপয় আর্থিক সংস্থা (non-banking financial intermediaries) গড়িয়া উঠায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রা-নিয়ন্ত্রণ নীতির কার্যকারিতা অনেকাংশে ব্যাহত হইতেছে। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই এই জাতীয় সংস্থাগুলি জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করে এবং জনসাধারণকে ঋণ প্রদান করে। ব্যাংক রেটের উঠানামা অনেকক্ষেত্রে এই জাতীয় সংস্থাগুলি ব্যাংকের ন্যায় ব্যবসায় চালাইয়া থাকে। ব্যবসায়ের অনিশ্চয়তার উপর ব্যাংক রেট পরিবর্তনের ফল বিশেষভাবে নির্ভরশীল। পরিবর্তনশীল উৎপাদন-ব্যবস্থার ক্ষয়-ক্ষতির হার (rate of depreciation) বাড়িয়া যাওয়ায় অনেকক্ষেত্রে উৎপাদকগণ দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ ব্যবস্থা পছন্দ করেন না; ইহার ফলে ব্যাংক রেট পরিবর্তনের প্রভাব কিছু পরিমাণে সীমিত হয়। তাহা ছাড়া, ব্যাংক রেট নীতির সাফল্য বহুলাংশে খোলাবাজারে সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়ের নীতির সহিত জড়িত। বর্তমান-কালে বিভিন্ন ধরণের ঋণের জন্য বিভিন্ন ধরণের সুদের হার (different rates) ধার্য করার প্রবণতা কোন কোন দেশে দেখা যায়।

খোলা বাজারে সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়ের নীতি (Open Market Operations): মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনবোধে খোলা বাজারে সিকিউরিটি বিক্রয় অথবা সিকিউরিটি ক্রয় করিতে পারে। যখন দেশে মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং মুদ্রাস্ফীতির আশংকা বর্তমান থাকে তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও জনসাধারণের নিকট সিকিউরিটি বিক্রয় করে এবং এই বিক্রয়ের মাধ্যমে জনসাধারণের উদ্বৃত্ত টাকা ইহা নিজের কাছে লইয়া আসে। জনসাধারণ যাহাতে এই সিকিউরিটি কিনিতে প্রণোদিত হয়, সেইজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক তখন সুদের হার বাড়াইয়া দেয়। অপর পক্ষে খোলা বাজার হইতে সিকিউরিটি ক্রয় করিবার সময় ব্যাংকের সুদের হার কমাইয়া দেওয়া হয়। এইজন্য বলা হয়, ব্যাংক রেট নীতি হইতেছে খোলা বাজারে সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়ের নীতির পরিপূরক। অপরপক্ষে, যখন দেশে মুদ্রার পরিমাণ কমিয়া যায় এবং জনসাধারণের হাতে টাকার পরিমাণ কম থাকে, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজারে সিকিউরিটি ক্রয় করে। এইভাবে সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক বাজারের স্থিতিশীলতা রক্ষা করে।

খোলা বাজারে এইভাবে সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় করার নীতির সাফল্য কতিপয় শর্তের উপর নির্ভর করে। প্রথমত, এই নীতির সাফল্যের জন্য একটি বিস্তৃত এবং সুগঠিত সিকিউরিটির বাজার থাকা দরকার। দ্বিতীয়ত, এই নীতির সাফল্যের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির আপেক্ষিক স্থায়ী রিজার্ভের অনুপাত বজায় রাখা দরকার। তৃতীয়ত, এই নীতি তখনই সফল হইবে যখন সরকারী ঋণের পরিমাণ কম হইবে।

যদি সরকারী ঋণের পরিমাণ বেশী হয়, তবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির হাতে অধিক পরিমাণে সরকারী সিকিউরিটি থাকিবে। এই অবস্থায় যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির কাছে সিকিউরিটি বিক্রয় করে, তবুও দেশে মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হইবে না। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি তখন সরকারী সিকিউরিটির বিপক্ষে জনসাধারণকে ঋণ দিতে আরম্ভ করিবে। চতুর্থত, এই নীতিকে সফল করিতে হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে প্রচুর পরিমাণে বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটি থাকা প্রয়োজন।

যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য অবাধ বাজারে সিকিউরিটি বিক্রয় করার নীতি অবলম্বন করে তখন যদি কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক শেষ পর্যায়ের কর্জদাতা হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে ঋণ প্রার্থী হয়, তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেই বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ দিতে বাধ্য হয় এবং অবাধ বাজারে সিকিউরিটি বিক্রয় করার নীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

অনগ্রসর টাকার বাজারে এই শর্তগুলি সম্পূর্ণভাবে পূরণ হয় না বলিয়া এই নীতি সেই অবস্থায় বেশী পরিমাণে কার্যকর হয় না। অনুন্নত দেশগুলিতে বিল-বাজার (Bill Market) এবং সিকিউরিটি বাজার (Security Market) বিশেষ উন্নত নহে এবং বাণিজ্যমূলক ব্যাংকগুলির পক্ষেও নগদ টাকা অথবা সম্পদের একটি স্থায়ী রিজার্ভের অনুপাত বজায় রাখা সম্ভব নয়। সেইজন্য এই দেশগুলিতে খোলা বাজারে সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়ের নীতি বিশেষ সফল হয় নাই।

পরিবর্তনীয় রিজার্ভের অনুপাত বজায় রাখার পদ্ধতি ও ইহার তাৎপর্য
(Mechanism of the Variable Reserve Ratio and its significance.)

কোন কোন অবস্থায় ব্যাংক রেট নীতি এবং খোলা বাজারে সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়ের নীতি অবশ্যই কাযকরী হইতে পারে। যে সকল ব্যাংকের অতিরিক্ত মজুত তহবিল থাকে তাহারা সহজেই ব্যাংক রেটের পরিবর্তন অথবা খোলা বাজারে সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়ের নীতির চাপ সহ্য করিতে পারে। তাহা ছাড়া, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে সরকারী ঋণের পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ায় ইহাদের কার্যকারিতা কমিয়া যায়। অনগ্রসর দেশের সিকিউরিটি বাজারের আকৃতি ব্যাপক না হওয়ায় এই জাতীয় ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলির কার্যকারিতা বিশেষভাবে সীমিত থাকে। এইজন্য ১৯৩০ সাল হইতে বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য নূতন নীতির অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতে থাকে। ইহার ফলে যে পদ্ধতিটি গ্রহণ করা হইল তাহা পরিবর্তনীয় রিজার্ভ অনুপাত (Variable Reserve Ratio) নামে পরিচিত। কেইন্‌স তাঁহার "A Treatise on Money" বইয়ে সর্বপ্রথম এই নীতিটি আলোচনা করেন এবং আমেরিকা সর্বপ্রথম এই নীতিটি গ্রহণ করে এবং ইহার সাফল্য দেখিয়া বর্তমানে বহু কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই নীতির মাধ্যমে ইহাদের ঋণ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং কার্যাবলী পরিচালনা করিয়া থাকে।

যে সকল দেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি আইন অনুযায়ী নিজেদের মজুত অর্থের

একটি বিশেষ অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমা রাখিতে বাধ্য হয়, সেই সকল দেশে পরিবর্তনীয় রিজার্ভ অনুপাত ঋণ-নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি হিসাবে গৃহীত হইয়া থাকে। এই নিম্নতম রিজার্ভের সহিত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির আমানতের একটি বিশেষ সম্পর্ক থাকে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক আইন দ্বারা নির্দিষ্ট এই রিজার্ভের পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা লাভ করে।

যদি রিজার্ভের অনুপাত বাড়ানো হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট মজুত তহবিলের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে যাহাতে তাহাদের সাময়িক আমানতের পরিমাণ বজায় থাকে। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির যেসব সম্পদ (assets) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমা থাকে, তাহা হইতে তাহাদের কোন আয় হয় না বলিয়া তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট আরও অর্থ জমা রাখিবার পরিবর্তে আমানতের পরিমাণ হ্রাস করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাহারা আমানতকারীদের আমানত উঠাইবার জন্য অনুরোধ করে না, সেজন্য তাহারা ঋণদানের পরিমাণ হ্রাস করিয়া থাকে। সুতরাং রিজার্ভের অনুপাত বাড়াইবার অর্থ হইল বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ঋণের যোগানের হ্রাস পাওয়া। অনুরূপভাবে যখন ন্যূনতম রিজার্ভের পরিমাণ কমানো হয়, তখন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি ঋণের যোগান বাড়াইয়া থাকে। এইরূপে দেখা যায় যে পরিবর্তনীয় রিজার্ভ একটি প্রত্যক্ষ পদ্ধতি যাহার সাহায্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ঋণদান নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

রিজার্ভের অনুপাত হ্রাস-বৃদ্ধি করার পদ্ধতির সর্বাপেক্ষা বড় গুণ হইল এই যে, ইহা একটি প্রত্যক্ষ পদ্ধতি এবং ইহার সাফল্য শর্তাধীন নহে। ব্যাংক রেট অথবা খোলা বাজারে সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়ের নীতি কার্যকরী না হইলে সাফল্যের সহিত এই পদ্ধতি নিয়োগ করা যাইতে পারে। ইহার সাফল্য ব্যাংক রেট এবং অন্যান্য সুদের হারের উপর নির্ভরশীল নহে। সরকারী ঋণের উপরেও ইহার কার্যকারিতা নির্ভর করে না। সুতরাং উন্নত এবং অনুন্নত দেশে যেখানে সরকারী ঋণের পরিমাণ বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে সেইসব দেশেও ইহার ব্যবহার করা সম্ভব। যদি প্রচুর পরিমাণে বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে খোলা বাজারে সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়ের নীতি কার্যকরী হইতে পারে না। কিন্তু পরিবর্তনীয় রিজার্ভ অনুপাতের সহিত এইরূপ অবস্থার কোন সম্পর্ক নাই।

এইসব গুণাবলীর জন্য অধ্যাপক সেয়ার্স (Prof. Sayers) এবং অন্যান্য অর্থবিজ্ঞানীগণ (যেমন ডক্টর এস. এন. সেন) অনুন্নত দেশে এই পদ্ধতি গ্রহণের সুপারিশ করিয়াছেন।

সমালোচনা ঃ ব্যাংকগুলির রিজার্ভের অনুপাত পরিবর্তন করার বিরুদ্ধে কতকগুলি সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমত, এই পদ্ধতির দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাংকের অতিরিক্ত মজুত তহবিল রাখার চেষ্টা রোধ করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে অনুন্নত দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি যে পরিবর্তনীয় মজুত তহবিল

এবং বৈদেশিক উদ্বৃত্ত রাখিয়া থাকে ইহার ফলে তাহার কার্যকারিতা বিশেষভাবে সীমিত হয়। ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি লণ্ডন অথবা অন্যান্য বিশেষ স্থানে বিরাট পরিমাণে উদ্বৃত্ত অর্থ রাখিয়া থাকে এবং দেশেও তাহারা স্থায়ী রিজার্ভ রাখে না। যখন এই ব্যবস্থা কঠোরভাবে কার্যকর হয় তখন তাহারা এই সকল বিদেশস্থিত অর্থ আমদানি করে এবং অন্য সময়ে সামান্য পরিমাণ অর্থ রাখিয়া অবশিষ্ট অর্থ আবার বিদেশে পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু, ডক্টর এস. এন. সেনের মতে এইরূপ বিদেশে সংরক্ষিত অর্থ পরিবর্তনীয় রিজার্ভের অনুপাত রাখার প্রভাব সীমিত করিতে পারে না। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি লণ্ডনে তাহাদের সম্পদ (asset) রাখিতে পারে, কিন্তু ঐ সম্পদের বিক্রয়ের ফলে তাহারা আর পূর্বাবস্থা বজায় রাখিতে পারে না। এইরূপে যদি তাহাদের নগদ অর্থের পরিমাণ কমিয়া যায়, তাহা হইলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণনীতির উপর পরিবর্তনীয় রিজার্ভ অনুপাত পদ্ধতির প্রভাব দেখা দিবে।

দ্বিতীয়ত, পরিবর্তনীয় রিজার্ভের অনুপাতকে বলা হয় স্বেচ্ছাচারী এবং অনমনীয় পদ্ধতি। বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রয়োজনীয় রিজার্ভে সামান্য পরিবর্তন আনিলে ইহার ফলে ঋণের পরিমাণ বিরাট হইয়া দেখা দিতে পারে। ইহা অনমনীয়, কারণ, স্থানীয় প্রয়োজন ইহার দ্বারা মিটানো সম্ভব নয়। যেসব ব্যাংকের অতিরিক্ত মজুত অর্থ আছে তাহারা এই পরিবর্তনীয় রিজার্ভের দ্বারা একেবারেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, অপরপক্ষে ক্ষুদ্র ব্যাংকের নিকট ইহা প্রায় মৃত্যুতুল্য হইতে পারে। তৃতীয়ত, পরিবর্তনীয় রিজার্ভের অনুপাত সিকিউরিটির বাজারে হঠাৎ আঘাত হানিতে পারে।

এই সমালোচনাগুলি অবশ্যই মূল্যবান। কিন্তু ইহাদের দোষ সংশোধনের অতীত নয়। সেয়ার্সের (Sayers) মতে বিভিন্ন ব্যাংকের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রিজার্ভ নির্ধারণ করিয়া এই বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করা সম্ভব।

হুইটিলসের (Whittlesey) মতে এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে খোলা বাজারে সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়ের নীতি এবং পরিবর্তনীয় রিজার্ভের সমন্বয় করা উচিত। তাহার মতে প্রয়োজনীয় রিজার্ভ বৃদ্ধির সহিত খোলা বাজারে সিকিউরিটি ক্রয়-নীতি গ্রহণ করিতে হইবে, বিক্রয়-নীতি নয়। আপাতদৃষ্টিতে ইহারা হয়ত পরস্পরবিরোধী ফল আনিতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে ইহাদের প্রভাব সম্পূরক। রিজার্ভ বৃদ্ধি পাইলে বাজারে সংকোচনশীল প্রভাব দেখা দিবে, সঙ্গে সঙ্গে যদি খোলা বাজারে সিকিউরিটি ক্রয়-নীতি গ্রহণ করা হয়, তাহা ঠিক নির্বাচন করিতেছে কিনা সেইদিকেও নজর রাখিতে হয়। এককথায় বলা যায়, দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অবশ্যই দেখিবে যেন সামাজিক কল্যাণকর ক্ষেত্রের পরিবর্তে ক্ষতিজনক এবং অকল্যাণকর ক্ষেত্রে এই সকল ঋণ চলিয়া না যায়। পরিমাণমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি যাহা পরিমাণের দিকে নজর রাখে, তাহার দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হয় না।

বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে নূতন ঋণ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে তাহা নির্বাচিত ঋণ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলিয়া পরিচিত।

নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Selective Methods of Credit Control): নির্বাচিত ঋণ-পদ্ধতি বলিতে বুঝায় যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের বিশেষ কোন ক্ষেত্রের উপর ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য চাপ দেয়, এবং ইহার দ্বারা সমগ্র ঋণের পরিমাণের কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ হয় না। যে বিশেষ ক্ষেত্রগুলিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করিতে চায়, শুধু সেই ক্ষেত্রেই এই নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি কার্যকর হয় এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের উপর এই চাপ যাহাতে না পড়ে সেই দিকে দৃষ্টি রাখা হয়। পরিমাণমূলক (Quantitative) এবং নির্বাচনমূলক (Selective) ঋণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পার্থক্য আছে। নির্বাচিত ঋণ-পদ্ধতি শুধু দেশের মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ, অপরপক্ষে পরিমাণগত পদ্ধতি সমগ্র ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। নির্বাচিত এবং গুণগত পদ্ধতির (Qualitative) মধ্যে পার্থক্য করা দুরূহ। বস্তুতঃ কয়েকজন অর্থবিজ্ঞানী এই পার্থক্য পছন্দ করেন না ; তাঁহারা নির্বাচিত এবং গুণগত পদ্ধতিকে এক করিয়া দেখেন। কিন্তু যাঁহারা ইহাদের পার্থক্য করেন, তাঁহারা একটি বিশেষ দিক দেখাইয়া থাকেন যে, গুণগত পদ্ধতি শুধু ঋণ-দাদনকারীদেরই নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু নির্বাচিত পদ্ধতি ঋণদাতা, এবং ঋণগ্রহীতা উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করে।

নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি দুই প্রকারের—(১) প্রান্তিক প্রয়োজন পরিচালনা (Regulation of Margin Requirements) এবং (২) ভোগকারীর ঋণ পরিচালনা (Regulation of Consumers' Credit)। আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের পরিচালকগণ প্রথমে এই দুইটি পদ্ধতি প্রচলন করেন এবং পরে অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই সকল পদ্ধতি গ্রহণ করে।

প্রান্তিক প্রয়োজন পরিচালনা বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। যে সকল ঋণগ্রহণকারী বিশেষ বিশেষ সিকিউরিটির পরিবর্তে ঋণ গ্রহণ করে, তাহাদের ক্ষেত্রে "প্রান্তিক প্রয়োজন" পরিবর্তনের দ্বারা এই কাজ সাধিত হয়। 'প্রান্ত' অর্থে বুঝা যায় সিকিউরিটির মূল্যের একটি অংশ যাহা তাহারা ঋণ করে। উদাহরণস্বরূপ দেখানো যায়, ১০০০০ টাকার সিকিউরিটির পরিবর্তে যদি ৯০০০ টাকা ঋণ করা হয়, তাহা হইলে প্রান্ত হইল ১০০০ টাকা অথবা সিকিউরিটির মূল্যের ১০%। কেন্দ্রীয় ব্যাংক আদেশ জারী করিয়া এই প্রান্তকে ১০% হইতে ৫০% করিতে পারে। এই ক্ষেত্রে ১০০০০ টাকার সিকিউরিটির পরিবর্তে ৫০০০ টাকা দেওয়া হয়। এইরূপে অন্যান্য ক্ষেত্রে ঋণের উপর প্রভাব বিস্তার না করিয়া এবং 'নিরাপদ' ঋণগ্রহণকারীদের ঋণের অসুবিধা না করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই প্রান্তিক প্রয়োজন বজায় রাখার ব্যবস্থা চালু করিয়া বিশেষ বিশেষ ঋণ গ্রহণকারীদের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

আমেরিকায় সর্বপ্রথম এই পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। ১৯৩৪ সালের Securities Exchange Act-এর বলে ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের পরিচালকমণ্ডলী সিকিউরিটির প্রান্ত নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা লাভ করেন। Regulation U-এর

দ্বারা দেয় ক্ষমতা শুধু বাণিজ্যিক ব্যাংকের উপরেই প্রযোজ্য নয়; সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জের দালাল (brokers), কারবারী (dealers) এবং সদস্যগণও ইহার আওতায় পড়ে।

যদিও স্টক মার্কেট ফাট্‌কাকারবারীদের নিকট ঋণের স্রোত প্রতিরোধ করিবার জন্য এই পদ্ধতি সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয়, তথাপি অন্যান্য ক্ষেত্রেও সাফল্যজনক ভাবে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যাইতে পারে। স্টক মার্কেটের ঋণের সহিত দীর্ঘ-দিনের পরিচয় থাকার দরুণ নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি ফাট্‌কাকারবার বন্ধ করিতে সক্ষম হয়। অনিয়ন্ত্রিত ফাট্‌কাকারবার অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার পক্ষে ক্ষতিকর। সেজন্য এই পদ্ধতির দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্টক মার্কেটের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির দ্বিতীয় রূপ হইল, ভোগকারীর ঋণ-পরিচালনা। আধুনিক অর্থনীতিতে স্থায়ী ভোগ-সামগ্রীর উৎপাদন ব্যবস্থা অর্থনৈতিক কার্যাবলীর স্তর অনেকাংশে নির্ধারণ করিয়া থাকে। অর্থনীতিতে এই ক্ষেত্রের কার্যাবলী ভোগকারীর ঋণের পরিমাণের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সমগ্র ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ন্যূনতম down payment অথবা কিস্তির সংখ্যা নির্ধারণ করিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ৩০০ টাকা মূল্যের একখানি ইলেকট্রিক পাখা কিনিবার সময় হয়ত ১০০ টাকা দিতে হইবে। অবশিষ্ট ২০০ টাকা দশটি কিস্তির দ্বারা পরিশোধ করিতে হইবে। এইরূপ সন্তোষজনক ব্যবস্থায় বহু ক্রেতাই হয়তো এই বিক্রেতার নিকট হইতে পাখা ক্রয় করিবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আদেশের ফলে যদি down payment ১০০ টাকা হইতে ২০০ টাকা করা হয় এবং অবশিষ্ট ১০০ টাকা ৫০ টাকার দুইটি কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হয়, তাহা হইলে ক্রেতার সংখ্যা স্বভাবতঃই কমিবে। ফলে চাহিদা হ্রাস পাওয়ার দরুণ পাখার উৎপাদক উৎপাদন কমাইবে। এই হ্রাস-প্রাপ্ত উৎপাদন মূলধনী সামগ্রীর উৎপাদন এবং ভোগ-সামগ্রীর উৎপাদন কমাইয়া দিবে। এইভাবে ক্ষেত্র বিশেষে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে।

ব্রিটেন ও আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মধ্যে তুলনা: ব্রিটেনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম ব্যাংক অফ ইংলণ্ড (Bank of England) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বলা হয় Federal Reserve System। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় ব্যাংক নাই; Federal Reserve System-ই কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে কাজ করে। ব্রিটেনে ব্যাংকিং ব্যবস্থা এককেন্দ্রিক এবং আমেরিকায় ব্যাংকিং ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয়। এই দুইটি দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে যে, পার্থক্য আছে, তাহা ব্যাংকিং ব্যবস্থার মধ্যেও বিশেষ লক্ষ্যনীয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১২টি কেন্দ্রীয় ব্যাংক আছে। এইগুলিকে একত্রে Federal Reserve System বলা হয়।

ব্যাংক অফ ইংলণ্ডের দুইটি বিভাগ আছে,—যথা, নোট প্রচলন বিভাগ (Issue Department) এবং ব্যাংকিং বিভাগ (Banking Department); নোট প্রচলন বিভাগের কাজ হইল নোট প্রচলন করা। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অপরাপর কাজ ব্যাংকিং বিভাগ কর্তৃক সম্পন্ন হয়। এই বিভাগ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির সহিত যোগাযোগ রাখে, ব্যাংক রেট স্থির রাখে এবং মুদ্রার বাজারকে নিয়ন্ত্রিত করে। ইংলণ্ডে ব্যাংক রেট পদ্ধতি যতটা কার্যকর, আমেরিকায় ইহা ততটা কার্যকর নয়। ইংলণ্ডে ব্যাংক রেটকে penal rate বলা হয়। অর্থাৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট টাকা ধার করে তখন যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি হয় বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ দেওয়ার নীতি নিয়ন্ত্রিত করা, তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক (অর্থাৎ, ব্যাংক অফ ইংলণ্ড) সুদের হার বাড়াইয়া দেয়। কিন্তু আমেরিকায় ব্যাংক রেট নীতি বিশেষ কার্যকরী হয় না। ইংলণ্ডে বাজারের সুদের হার (market rate) ব্যাংক রেটের অনুগামী ; কিন্তু আমেরিকায় ব্যাংক রেট বাজারের সুদের হারের অনুগামী। অর্থাৎ, ইংলণ্ডে ব্যাংক রেট বাড়িয়া গেলে বাজারের সুদের হার বাড়িয়া যায়, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাজারের সুদের হার বাড়িলে ব্যাংক রেট বাড়ে। আমেরিকায় ব্যাংক রেট সর্বদাই বাজারের সুদের হার হইতে কম থাকে। এইজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুদের হারকে *concessional rate* বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খোলা বাজারে সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়ের নীতি (Open Market Operations) বিশেষ কার্যকরী হয়। কিন্তু ইংলণ্ডে এই নীতি ততটা কার্যকরী হয় না। আবার আমেরিকায় *Variable Reserve Ratio* এবং *Selective Credit Control* এই দুইটি নীতি খুবই কার্যকরী হয়।

ইংলণ্ডে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি সরাসরি ব্যাংক অফ্ ইংলণ্ডের নিকট টাকা ধার চাহে না ; টাকার প্রয়োজন হইলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি *discount house*-গুলির নিকট টাকা চাহে এবং *discount house*-গুলি ব্যাংক অফ্ ইংলণ্ডের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া আনিয়া বাণিজ্যিক ব্যাংককে টাকা ধার দেয়। লণ্ডনের ডিসকাউন্ট বাজার হইতেছে ব্যাংক অফ ইংলণ্ড এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির মধ্যবর্তী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রকার কোন ডিসকাউন্ট বাজার নাই। যখনই ইংলণ্ডে ব্যাংকরেট বাড়ানো হয়, তখনই ডিসকাউন্ট হাউসগুলি বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট বর্ধিত সুদ দাবি করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিও তখন সুদের হার বাড়াইয়া থাকে। অপরপক্ষে আমেরিকায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে টাকা ধার করিতে পারে। আমেরিকায় কোন discount house নাই।

Exercise

1. Discuss the functions of a Central Bank with special reference to its methods of credit control.

[মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতির বিশেষ উল্লেখপূর্বক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ক্রিয়াকলাপ আলোচনা কর।] (২৭৫-২৭৭ পৃষ্ঠা)

2. Write a short note on Central Bank.

[কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।] (২৭৫-২৭৭ পৃষ্ঠা)

3. Examine critically the different methods of credit control by a Central Bank. [একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণদান নীতি নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি পরীক্ষা কর।] (২৭৫-২৭৭ পৃষ্ঠা)

4. Write a short note on the methods used by a Central Bank for the control of the banking system.

[ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ্ধতির উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।] (২৪৫-২৭৭ পৃষ্ঠা ; ২৮২-২৮৮ পৃষ্ঠা)

5. How far do the commercial banks create deposits ?

[বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি কতটুকু আমানত সৃষ্টি করিয়া থাকে ?] (২৭২-২৭৪ পৃষ্ঠা)

6. Can banks create credit ? If so, how and to what extent ?

[ব্যাংকগুলি কি ক্রেডিট সৃষ্টি করিতে পারে ? যদি পারে, কতটা পারে ?] (২৭২-২৭৪ পৃষ্ঠা)

7. Write notes on : (a) Bank Rate Policy, (b) Open Market Operations, (c) Variable Reserve Ratio, (d) Selective Methods of credit control.

[টীকা লিখ : (ক) ব্যাংক রেট নীতি, (খ) খোলাবাজারে সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়, (গ) পরিবর্তনীয় রিজার্ভ-অনুপাত, (ঘ) নির্বাচনমূলক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি।] (২৮২-২৮৮ পৃষ্ঠা)

8. Discuss the various objectives of Monetary Policy.

[মুদ্রা নীতির বিভিন্ন উদ্দেশ্য আলোচনা কর।] (২৭৫-২৭৯ পৃষ্ঠা)

9. Discuss the functions performed by a modern bank. Describe the services rendered to a country by its banking system. [একটি আধুনিক ব্যাংকের ক্রিয়াকলাপ আলোচনা কর। কোন দেশে ব্যাংকিং ব্যবস্থা কি উপকার করিয়া থাকে বর্ণনা কর।] (২৭৯-২৭০ পৃষ্ঠা ; ২৭৪ পৃষ্ঠা)

10. Write a note on the functions of a Clearing House.

[ক্লিয়ারিং হাউসের ক্রিয়াকলাপের উপর একটি টীকা লিখ।] (২৬৭-২৬৮ পৃষ্ঠা)

11. Discuss the different methods of the regulation of note iseue.

[নোট প্রচলন ও নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি আলোচনা কর।] (২৭৯-২৮১ পৃষ্ঠা)

12. Compare the British and the American Central Banking systems.

[ব্রিটিশ এবং আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থা তুলনা কর। (২৮৮-২৮৯ পৃষ্ঠা)

13. "The London Discount Market is an intermediary between the Bank of England and the joint-stock banks." Discuss.

["লণ্ডন ডিসকাউন্ট বাজার হইতেছে ব্যাংক অব ইংলণ্ড এবং যৌথ ব্যাংকগুলির মধ্যবর্তী"—উক্তি কি আলোচনা কর।] (২৮৯ পৃষ্ঠা)

14. Write a note on the principles of commercial banking.

[বাণিজ্যিক ব্যাংকব্যবসায়ের নীতির উপর একটি টীকা লিখ] (২৭০-২৭২ পৃষ্ঠা)

একবিংশ অধ্যায়

টাকাকড়ির মূল্য, মুদ্রাস্ফীতি এবং মুদ্রাসম্পর্কিত নীতি

(Value of Money, Inflation and Monetary Policy)

টাকার গোড়ার কথা এবং ইহার যোগানের উৎস আলোচনার পর টাকার মূল্য ও ইহার মূল্য নির্ধারণের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। টাকার প্রকৃতি আলোচনা করিতে যাইয়া আমেরিকার অর্থনীতিবিদ্ Walker বলিয়াছিলেন "Money is what Money does." অর্থাৎ, অর্থের মূল্য বলিতে বুঝায় অর্থের ক্রয়ক্ষমতা, অর্থের বিনিময়ে কত পরিমাণে বিভিন্ন জিনিস ক্রয় করা যায়। যদি সমস্ত মূল্যের গড় বাহির করা না যায়, তাহা হইলে সাধারণভাবে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা নির্ধারণ করা যায় না।

টাকাকড়িব মূল্য বলিতে ইহার ক্রয়-ক্ষমতা বুঝায়

টাকাকড়ির দুই প্রকার মূল্য—আভ্যন্তরীণ বা দেশীয় মূল্য (Internal value), এবং বহির্দেশীয় মূল্য (External value)। দেশীয় মূল্য বলিতে বুঝা যায় কিছু নির্দিষ্ট অর্থের পরিবর্তে দেশীয় উৎপাদিত দ্রব্য কত ক্রয় করিতে পারা যায়; বৈদেশিক মুদ্রার তুলনায় যখন ক্রয়ক্ষমতা প্রকাশিত হয়, তখন অর্থের বহির্দেশীয় মূল্যের মান স্থির করা হয়।

টাকাকড়িব দুই প্রকার মূল্য: আভ্যন্তরীণ এবং বহির্দেশীয়

আর্থিক তত্ত্বের প্রথমাবস্থায় মূল্যের ভাণ্ডার (store of value) হিসাবে টাকার কার্যাবলীর প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হয় নাই; টাকার অন্যান্য কার্যাবলীর প্রতিই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। Marshall এবং Kemmerer এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন। মূল্যের ভাণ্ডার (Store of Value) হিসাবে টাকাকড়ির কার্যাবলীর প্রতি Mises এবং Fisher গুরুত্ব দিয়াছেন। বস্তুত Keynes-এর পূর্ব পর্যন্ত টাকার কাজের সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ কেহই করেন নাই।

অর্থের মূল্য (Value of Money): একটি টাকার বিনিময়ে আমরা যে পরিমাণ জিনিস পাই, তাহাই টাকার মূল্য সূচিত করে। যদি এক টাকায় অনেক জিনিস কেনা যায়, তবে টাকার মূল্য বাড়িয়া যায় এবং যদি এক টাকায় বেশী জিনিস কেনা যায়, তখন জিনিসপত্রের দাম কম থাকে। আবার যখন এক টাকায় কম জিনিস কেনা যায়, তখন জিনিসপত্রের দাম বেশী থাকে। সুতরাং টাকার মূল্য কম হইলে মূল্যস্তর (Price level) খুব উঁচু থাকে এবং

টাকার মূল্য বেশী হইলে মূল্যস্তর নীচু থাকে। আমরা প্রথমে দেখিব কিভাবে টাকার মূল্যের পরিবর্তন পরিমাপ করা যায়।

টাকার মূল্য-পরিবর্তন পরিমাপ করিবার উপায় (Methods of measuring the changes in the Value of Money)—বিভিন্ন জিনিসের দামের যতটা পরিবর্তন হয় তাহাই টাকাকড়ির মূল্যের পরিবর্তন বুঝায়। কিন্তু বিভিন্ন জিনিসের দামের পরিবর্তন একই সঙ্গে হয় না। কোন জিনিসের দাম যখন বাড়ে, তখন হয়ত অন্য একটি জিনিসের দাম কমিয়া যাইতে পারে; অথবা কোন জিনিসের দাম হয়ত বেশী বাড়িতে পারে, আবার অন্য কোন জিনিসের দাম হয়ত কম বাড়িতে পারে। কেননা টাকাকড়ির মূল্য কতটা বাড়িল অথবা কতটা কমিল তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে বিভিন্ন জিনিসের একটি গড় (average) দাম বাহির করা প্রয়োজন। এই গড দামকে জিনিসপত্রের সাধারণ মূল্যস্তর (General Price Level) বলা হয়। ইহা ছাড়া কতিপয় জিনিসের আলাদা মূল্যস্তর আছে। যেমন, খাদ্যশস্যের মূল্যস্তর, পাইকারী জিনিসের মূল্যস্তর, খুচরা জিনিসের মূল্যস্তর প্রভৃতি। জিনিসপত্রের দামের পরিবর্তন হইলে, অর্থাৎ, সাধারণ মূল্যস্তরের পরিবর্তন হইলে টাকার মূল্যের পরিবর্তন হয়। যদি জিনিসপত্রের গড দাম বাড়িয়া যায়, তবে টাকার মূল্য কমে এবং জিনিসপত্রের গড দাম যদি কমিয়া যায়, তবে টাকার মূল্য বাড়িয়া যায়। সুতরাং আমাদের দেখা উচিত, জিনিসপত্রের গড দাম কি হারে উঠানামা করে, তাহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারিব, টাকার মূল্য কি হারে উঠানামা করে।

মূল্যস্তর

সূচক-সংখ্যা পদ্ধতি

মূল্য-স্তরের উঠানামার পরিমাণ পরিমাপ করা যায় সূচক-সংখ্যা (Index Number) দ্বারা। একটি বিশেষ বৎসরের মূল্যস্তরের সহিত অপর কোন বৎসরের মূল্যস্তরের তুলনা করিবার জন্য দুইটি বৎসরের মূল্যস্তরের সূচক-সংখ্যা আমাদের জানিতে হয়। সূচক-সংখ্যা তৈয়ার করিতে হইলে প্রথমে একটি বিশেষ বৎসরকে ভিত্তি (Base) হিসাবে ধরিতে হয়। বৎসরটি এমন হইতে হইবে যেন ইহার অর্থনৈতিক দিক হইতে গুরুত্ব থাকে। যেমন ১৯৩৯ সাল, (যে বৎসরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় ইহার অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে) অথবা ১৯৫১ সাল (যে বৎসরে ভারতে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা আরম্ভ হয়) ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, কতিপয় সামগ্রী বাছাই করিতে হইবে যেগুলি সর্বদাই জনসাধারণ কেনাবেচা করে। কারণ এই জিনিসগুলি সকলেই ব্যবহার করে বলিয়া এইগুলির ভিত্তিতে যে সূচক-সংখ্যা প্রস্তুত হয়, তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। তৃতীয়ত, সূচক-সংখ্যা প্রণয়নের পরবর্তী পর্যায় হইল আপেক্ষিক দাম (Relative Price) নিরূপণ করা। যদি প্রথম বৎসরে চাউলের বাজার-দাম হয় কুইণ্টল প্রতি ১০০ টাকা, এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরে যদি দাম

ভিত্তি-বৎসর

জিনিসপত্রের নির্বাচন

হয় কুইন্টল প্রতি যথাক্রমে ১৫০, ২০০ ও ৩০০ টাকা, তবে ভিত্তি-বৎসরের দাম ১০০ ধরিয়া লইলে দ্বিতীয় বৎসরের দামের সূচক হইবে ১৫০। এই সংখ্যাকে আপেক্ষিক দাম বলা হয়। অনুরূপভাবে আমরা যে কোন বৎসরের জন্য চাউলের আপেক্ষিক দাম নির্ধারণ করিতে পারি। আমরা এখানে ১৯৫১ সালের মূল্যস্তরকে ভিত্তি করিয়া ১৯৫৯ সালের মূল্যস্তরের একটি কাল্পনিক হিসাবের সূচক-সংখ্যা তৈয়ার করিব। ধরা যাক, আমরা চারিটি একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস বাছিয়া লইলাম : যেমন, চাউল, ডাইল, দুধ এবং চিনি। ধরা যাক, ১৯৫১ সালে চাউলের দাম ছিল প্রতি কুইন্টল ২০ টাকা, ডাইলের দাম ছিল প্রতি কুইন্টল ২৫ টাকা, দুধের দাম ছিল প্রতি কুইন্টল ৫০ টাকা, এবং চিনির দাম ছিল প্রতি কুইন্টল ২৫ টাকা। এখন সূচক-সংখ্যা নিম্নোক্ত উপায়ে তৈয়ার করা যায়—

আপেক্ষিক দাম ও ইহার গড়

১৯৫১ সাল				ক্রয়ের পরিমাণ	মোট অর্থব্যয়ের পরিমাণ
চাউল	প্রতি	কুইন্টল	২০ টাকা	৫ কুইন্টল	২০ × ৫ = ১০০
ডাইল	”	”	২৫ টাকা	৪ ”	২৫ × ৪ = ১০০
দুধ	”	”	৫০ টাকা		৫০ × ২ = ১০০
চিনি	”	”	২৫ টাকা		২৫ × ৪ = ১০০
					মোট ৪ টাকা

যোগফল ৪০০-কে চার দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল হয় ১০০। ১৯৫১ সালের, অর্থাৎ, ভিত্তি বৎসরের (Base year) সূচক-সংখ্যা হইল ১০০। এখন ১৯৫৯ সালে মূল্যস্তর কিভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিব। ধরা যাক, আমরা ১৯৫৯ সালেও চাউল, ডাইল, দুধ ও চিনি একই পরিমাণ কিনিতেছি ; অথচ ইহাদের দামের পরিবর্তন হইয়াছে।

১৯৫৯ সালে				মোট অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ
চাউল	প্রতি	কুইন্টল	২৫ টাকা	২৫ × ৫ = ১২৫
ডাইল	প্রতি	”	৩০ টাকা	৩০ × ৪ = ১২০
দুধ	প্রতি	”	৬৪ টাকা	৬৪ × ২ = ১২৮
চিনি	প্রতি	”	৩০ টাকা	৩০ × ৪ = ১২০
				মোট ৪৯৩ টাকা

যোগফল ৪৯৩-কে চার দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল হয় ১২৩$\frac{১}{৪}$। অর্থাৎ, ১৯৫৯ সালে ১৯৫১ সালের তুলনায় মূল্যস্তর শতকরা ২৩$\frac{১}{৪}$ ভাগ বাড়িয়াছে।

পরিসংখ্যানবিদ্‌গণ দুইটি পদ্ধতিতে সূচক-সংখ্যা প্রস্তুত করেন। একটি হইতেছে Laspeyres Price Index এবং অপরটি হইতেছে Paasche Price Index পদ্ধতি। প্রথম পদ্ধতিটি অনুযায়ী ভিত্তি বৎসরের উপর আপেক্ষিক গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিটি অনুযায়ী বর্তমান সময়ের উপর আপেক্ষিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

Laspeyres সূচক-সংখ্যা-পদ্ধতি হইতেছে $L = \frac{\Sigma q_0 P_n}{\Sigma q_0 P_0} \times 100$

এবং Paasche সূচক-সংখ্যা-পদ্ধতি হইতেছে $P = \frac{\Sigma q_n P_n}{\Sigma q_n P_0} \times 100$

এখানে P_n এবং q_n হইতেছে যথাক্রমে বর্তমান সময়ের দাম এবং পরিমাণ P_0 এবং q_0 হইতেছে ভিত্তি-বৎসরের দাম এবং পরিমাণ। 'L' হইতেছে Laspeyres সূচক-সংখ্যা এবং 'P' হইতেছে Paasche সূচক-সংখ্যা।

Σ চিহ্নটি সামগ্রিকতার চিহ্ন; অর্থাৎ সবকিছুর যোগচিহ্ন। সূচক সংখ্যা শুধু যে দামের ক্ষেত্রেই প্রস্তুত করা হয় তাহা নহে, ইহা উৎপাদনস্তর অথবা জীবন-যাত্রার মান অনুসন্ধান করিবার জন্যও প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ সূচক সংখ্যা (Weighted Index Number)—উপরে যে পদ্ধতিতে সূচক সংখ্যা প্রস্তুত করা হইল, ইহার প্রধান ত্রুটি হইতেছে এই যে, ইহাতে সকল জিনিসকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু, সব জিনিসের গুরুত্ব সমান নয়। চাউলের উপযোগিতা ডাইলের উপযোগিতা হইতে বেশী। কাজেই চাউল ও ডাইলের দামের পরিবর্তন ক্রেতার জীবনযাত্রার মানের উপর সমান প্রভাব বিস্তার করিবে না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য আমাদের উচিত গুরুত্বপ্রদত্ত সূচক-সংখ্যা (weighted index number) নিরূপণ করা। বিভিন্ন জিনিসের উপযোগিতার পার্থক্য অনুযায়ী সেইগুলির উপর গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে। ধরা যাক, চাউলের গুরুত্ব ডাইলের তুলনায় পাঁচ বেশী। এই ক্ষেত্রে চাউলের দামকে ৫ দিয়া গুণ করিয়া এবং ডাইলের দামকে ১ দিয়া গুণ করিয়া হিসাব করিতে হইবে। সাধারণতঃ ক্রেতাগণ খরচের কত অংশ কোন্ কোন্ জিনিস কেনার জন্য খরচ করে তাহার ভিত্তিতে বিভিন্ন জিনিসের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এই পদ্ধতিতে যে সূচক-সংখ্যা প্রস্তুত করা হয়, তাহাকেই গুরুত্বপ্রদত্ত সূচক সংখ্যা (Weighted Index Number) বলে।

নিম্নের উদাহরণে গুরুত্বমূলক সূচক-সংখ্যা কিভাবে গঠিত হয় দেখানো হইল :

জিনিসপত্র	গুরুত্ববিহীন		গুরুত্ব	গুরুত্বপ্রদত্ত	
	সাল ১৯৫১	১৯৫৯		১৯৫১	১৯৫৯
চাউল	১০০	১২৫	৫	৫০০	৫৭৫
ডাইল	১০০	১২০	১	১০০	১২০
দুগ্ধ	১০০	১২৮	৩	৩০০	৩৮৪
চিনি	১০০	১২০	১	১০০	১২০
মোট	৪০০	৪৯৩	১০	১০০০	১১৯৯
গড়	১০০	১২৩¼	—	১০০	১১৯

দেখা যাইতেছে গুরুত্ববিহীন গড়সূক-সংখ্যা যেখানে ১২৩$\frac{১}{২}$, গুরুত্বপ্রদত্ত গড় সূচক সংখ্যা হইতেছে ১১৯।

সূচক সংখ্যা গঠনে অসুবিধা (Difficulties in the Construction of Index Number) : সূচক-সংখ্যা প্রস্তুত করার বাস্তব (practical) অসুবিধাগুলি হইতেছে ইহার ভিত্তি-বৎসর (base year) ঠিক করা, কোন্ কোন্ জিনিস সূচক-সংখ্যায় ধরিতে হইবে সেইগুলি নির্বাচন করা, বিভিন্ন জিনিসের গুরুত্ব পরিমাপ করা এবং জিনিসগুলির খুচরা অথবা পাইকারী কোন্ দাম ধরা হইবে তাহা নির্বাচন করা।

ভিত্তি-বৎসর নির্ণয় করা কঠিন

প্রথমত, এমন একটি বৎসরকে ভিত্তি-বৎসর ধরা হয় যাহার অর্থনৈতিক তাৎপর্য আছে ; যেমন, ১৯৩৯ সাল (যে বৎসরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল) অথবা ভারতের ক্ষেত্রে ১৯৫১ সাল (যে বৎসর প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছিল) ইত্যাদি। বাস্তবক্ষেত্রে সর্বদা একটি আদর্শ বৎসরকে ভিত্তি হিসাবে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

জিনিসের নির্বাচন করা কঠিন

দ্বিতীয়ত, এমন কতিপয় জিনিস বাছাই করিতে হয় যেগুলি সমাজের অধিকাংশ লোকই ব্যবহার করে। তাহা না হইলে সূচক-সংখ্যা শুধু সমাজের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান ব্যাখ্যা করিবে। কিন্তু ইহা করা খুব সহজ নয়। তাছাড়া এইরূপ একটি সর্বাত্মক সূচক সংখ্যা বাস্তবে কতটা উপযোগী সে সম্বন্ধেও চিন্তার অবকাশ আছে। এইজন্য বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সূচক-সংখ্যা প্রস্তুত করা হয়।

গুরুত্ব-প্রদত্ত সূচক-সংখ্যা স্থিত করার অসুবিধা

তৃতীয়ত, বিভিন্ন জিনিসের গুরুত্ব পরিমাপ করিয়া গুরুত্ব-প্রদত্ত সূচক সংখ্যা (weighted index number) প্রস্তুত করিতে হয় এবং তাহা করার ব্যাপারে যথেষ্ট অসুবিধা আছে।

দাম সংগ্রহ করার অসুবিধা আছে

চতুর্থত, অধিকাংশ সূচক সংখ্যা জিনিসপত্রের পাইকারী দামের ভিত্তিতে নিরূপিত হয়। কিন্তু, জনগণ বেশী সময়েই খুচরা দামে জিনিসপত্র কিনে। তাহাদের নিকট খুচরা দামই প্রকৃত দাম ; কিন্তু, খুচরা দামে সূচক সংখ্যা প্রস্তুত করা খুবই কঠিন। কারণ, খুচরা দাম সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা খুবই কঠিন।

গড়-নির্ণয়ের অসুবিধা

পঞ্চমত, সূচক সংখ্যা গঠনের ব্যাপারে আর একটি অসুবিধা হইতেছে গড়নির্ণয়-সংক্রান্ত পূর্বে যে দুইটি উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে সেইগুলিতে আমরা গাণিতিক (arithmetic) গড় ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু ইহার পরিবর্তে অন্য গড়ও ব্যবহার করা যাইতে পারে। যেমন, কোন কোন ক্ষেত্রে জ্যামিতিক গড় নির্ণয় করা যাইতে পারে।*

---

* জ্যামিতিক গড় নিম্নলিখিতভাবে বাহির করা হয় ৮, ২৭, ৬৪ এই তিনটি সংখ্যার জ্যামিতিক গড় হইল $\sqrt[৩]{৮\times২৭\times৬৪}=\sqrt[৩]{২^৩\times৩^৩\times৪^৩}$ $=২\times৩\times৪=২৪$।

এই অসুবিধাগুলি ছাড়াও সূচক সংখ্যা প্রস্তুত করার কয়েকটি তত্ত্বগত (theoretical) অসুবিধা আছে। বিভিন্ন ব্যক্তির আয়, রুচি, অভ্যাস, পছন্দ ও পরিবেশ বিভিন্ন প্রকারের হয়। যেমন চাউলের দাম বাড়িলে বাঙালীর যতটা অসুবিধা হয়, পাঞ্জাবীর ততটা হয় না। ইহাতে বিভিন্ন জিনিসের জন্য তাহাদের সমান চাহিদা থাকে না। সুতরাং প্রতিনিধিমূলক সূচক-সংখ্যা (Representative Index Number) প্রস্তুত করা খুবই কঠিন। সেইজন্য জীবনধারণের মান নিরূপণ করিতে হইলে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের জন্য বিভিন্ন সূচক সংখ্যা প্রস্তুত করিতে হয়। তাহা ছাড়া, সময়ের পার্থক্যের ফলে বিভিন্ন জিনিসের ব্যবহারের পরিবর্তন হইতে পারে।

প্রতিনিধিমূলক সূচক প্রস্তুত করা কঠিন

এইরূপ ক্ষেত্রে টাকার সাধারণ ক্রয়-ক্ষমতার পরিবর্তনের পরিমাপ করা অসম্ভব। দীর্ঘকালে জিনিসপত্রের গুরুত্বের প্রভৃত পরিবর্তন হইতে পারে। দীর্ঘকালীন দাম পরিবর্তনের পরিমাপ করিবার জন্য অধ্যাপক মার্শাল Chain Index Number প্রস্তুত করিবার কথা বলিযাছিলেন। যেমন, ১৯০১ সালের সূচক-সংখ্যার সহিত ১৯০৫ সালের সূচক-সংখ্যার এবং ১৯০৫ সালের সূচক-সংখ্যার সহিত ১৯১০ সালের সূচক সংখ্যার তুলনা করিতে হইবে, ১৯১০ সালের সহিত ১৯১৫ সালের, ১৯১৫ সালের সহিত ১৯২০ সালের, এইভাবে দীর্ঘ সময়ে ইহার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন স্বল্পকালীন সূচক সংখ্যার ভিত্তিতে টাকার মূল্যের পরিবর্তনের পরিমাপ করিতে হইবে। কিন্তু এই ধরণের সূচক-সংখ্যাও দোষমুক্ত নয়। কারণ এক বৎসর হইতে অন্য বৎসরে জিনিসপত্রের গুরুত্ব এবং চাহিদা একরূপ না থাকিতে পারে।

সময়ের পার্থক্যের ফলে অসুবিধা

সূচক-সংখ্যা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে এই অসুবিধাগুলি বিবেচনা করিয়া বলা যায় স্বল্পকালীন সূচক সংখ্যায় টাকার মূল্যের যে পরিবর্তন হয়, তাহা মোটামুটি ভাবে সঠিক পরিমাপ করিতে পারে। তবে নিখুঁত পরিমাপ করা কখনই সম্ভবপর নয়। কিন্তু, দীর্ঘকালের সূচক সংখ্যার বিশেষ গুরুত্ব নাই। কারণ ইহাতে টাকার মূল্যের যে পরিবর্তন হয়, তাহার সঠিক পরিমাপ করা সম্ভবপর হয় না।

সূচক সংখ্যার উপযোগিতা (Usefulness of Index Numbers): সূচক-সংখ্যার একটি বিশেষ উপযোগিতা হইতেছে, ইহার সাহায্যে দেশের উৎপাদন, আয়, মূল্যস্তর প্রভৃতির পরিবর্তন পরিমাপ করা যায়। এবং এই পরিমাপের ভিত্তিতে দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা সহজ হয়। যে কোন প্রকার উন্নয়ন প্রকল্পের কাজে হাত দিলেই উৎপাদন-লক্ষ্য অনুযায়ী কতটা উৎপাদন বাড়িয়াছে অথবা কতটা আয় বাড়িয়াছে, তাহার পরিমাপ করার প্রয়োজন হয়, সেই সঙ্গে বিবেচনা করিতে হয় দেশের মূল্যস্তর কতটা বাড়িয়াছে এবং তাহা উৎপাদন-বৃদ্ধিকে প্রতিহত করিতেছে কিনা। সূচক-সংখ্যা প্রস্তুত করিয়া দেশের অর্থনৈতিক জীবনের

অর্থনৈতিক জীবনের পরিবর্তন সম্পর্কে ইহা আলোকপাত করে

পরিবর্তন সম্বন্ধে এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান পরিবর্তন সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভবপর। এই কাজ প্রতিক্ষেত্রেই, অর্থাৎ, মূল্যস্তরের পরিবর্তন পরিমাপ করার ক্ষেত্রে, উৎপাদন অথবা আয় পরিবর্তন পরিমাপ করাব ক্ষেত্রে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিবর্তন পরিমাপ করার ক্ষেত্রে সূচক-সংখ্যা প্রস্তুত করার প্রয়োজন হয়। পবিসংখ্যান শাস্ত্রেও (Statistics) এইজন্য সূচক-সংখ্যা প্রস্তুত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার কবিয়াছে। শ্রমিকগণ যখন মজুরি বাড়াইতে অথবা দুর্মূল্য ভাতা বাড়াইতে চায় তখন সূচক সংখ্যার ভিত্তিতেই ইহা নিরূপিত হয়।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উপযোগিতা

অর্থের মূল্য নির্ধারণ (Determination of the Value of Money,—Quantity Theory of Money): অন্যান্য জিনিসের মূল্যের ন্যায় টাকার মূল্যও টাকার চাহিদা এবং যোগানের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু টাকার চাহিদাব কারণ সম্পর্কে ক্লাসিক্যাল এবং অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। আমাদের জিনিস কিনিবার সময় টাকার দরকাব হয়। ক্ল্যাসিক্যাল লেখকদের মতে দেশে কোন নির্দিষ্ট সময়ে টাকার চাহিদা কত পরিমাণ, তাহা দেশের মোট কেনাবেচার পরিমাণ হইতে আমরা বুঝিতে পারি। কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিক্রয় কবিবাব মত জিনিসের পরিমাণ স্থির থাকে, সুতরাং ঐ সময়ের জন্য টাকার চাহিদাও স্থির থাকে। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানীগণ শুধু লেনদেনের ভিত্তিতে টাকাব চাহিদা স্থির করিতেন। অন্যান্য কারণেও যে লোকের টাকার চাহিদা থাকিতে পারে সেই সম্পর্কে তাঁহারা বিশেষ আলোচনা কবেন নাই। জিনিসপত্র কেনাকাটা করার জন্য টাকা হাতে রাখাব অভিপ্রায় (transactions motive for holding money) বলা হয়। টাকার চাহিদা স্থির থাকাকালে যদি টাকার পবিমাণ বাড়িয়া যায়, তবেই জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যাইবে অথবা টাকাব মূল্য কমিয়া যাইবে। আবার টাকার চাহিদা স্থির থাকাকালে যদি টাকাব পবিমাণ কমিয়া যায়, তবেই জিনিসপত্রের দাম কমিয়া যাইবে অথবা টাকাব মূল্য বাড়িয়া যাইবে।

ক্ল্যাসিক্যাল অর্থ-বিজ্ঞানীগণ শুধু লেন-দেনের ভিত্তিতে টাকার চাহিদা স্থির করিতেন

টাকার যোগান বলিতে আমরা বুঝি দেশের প্রচলিত বা চালু টাকার মোট পরিমাণ। টাকার যোগানের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা হইতেছে টাকার প্রচলন-বেগ (Velocity of Circulation)। ধরা যাক, আমি একটি টাকা দিয়া একটি বই কিনিলাম। বই-বিক্রেতা সেই টাকাটি পাইয়া একটি মাছ কিনিল। মাছওয়ালা আবার সেই টাকাটি লইয়া একটি কাপড় কিনিল। এইভাবে একই টাকার সাহায্যে দিনে তিনবার জিনিসপত্রের কেনাবেচা হইল। এখানে টাকার প্রচলন-বেগ হইতেছে তিনগুণ। অর্থাৎ, একই টাকা দিনে যতবার লোকের হাত বদলায়, তাহাই ইহার প্রচলন-বেগ। টাকার যোগান বলিতে আমরা শুধু টাকার

টাকার যোগান
টাকার প্রচলনবেগ

পরিমাণই বুঝি না, ইহার প্রচলনবেগও বুঝি। সুতরাং, টাকার মোট যোগান হইতেছে, টাকার পরিমাণ ও টাকার প্রচলন-বেগ। কোন নির্দিষ্ট সময়ে যদি বিক্রীত সামগ্রীর পরিমাণ, অর্থাৎ কেনাবেচার পরিমাণ (volume of transactions) স্থির থাকে, অর্থাৎ ঐ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরিমাণতত্ত্বের স্থূল ব্যাখ্যা (Crude Quantity Theory) অনুযায়ী বলা যায়, মূল্যস্তর টাকাকড়ির সমানুপাতিক ("The price level is directly proportional to the amount of money in existence.")। পরিমাণতত্ত্বের স্থূল ব্যাখ্যা অনুযায়ী $M=KP$ অথবা $P=\frac{1}{K}. M$. এখানে M হইতেছে টাকাকড়ি, P হইতেছে সাধারণ মূল্যস্তর এবং K স্থির সমানুপাতিকতা (Constant Proprotionality) বুঝাইতেছে। অর্থাৎ টাকার পরিমাণ এবং জিনিসপত্রের দামের মধ্যে যে একটি স্থির সমানুপাতিক সম্পর্ক আছে, তাহাই K দ্বারা সূচিত হইয়াছে। পরিমাণতত্ত্বের এই স্থূল ব্যাখ্যা দুইটি অনুসিদ্ধান্তের উপর ভিত্তিশীল ; যথা, (১) জিনিসপত্রের দাম মোট ব্যয়ের সমানুপাতিক থাকে (Prices of goods are directly proportional to total spending) এবং (২) মোটব্যয় প্রচলিত টাকাকড়ির সমানুপাতিক থাকে (Total spending is directly proportional to the total quantity of money.) এই অনুসিদ্ধান্ত দুইটির কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়। জিনিসপত্রের পরিমাণ (output) সর্বদা স্থির থাকিবে এবং টাকাকড়ির প্রচলন-বেগ (velocity of circulation of money) সর্বদা স্থির থাকিবে, এই দুইটি অনুমান কখনই গ্রহণযোগ্য নহে। টাকাকড়ির প্রচলনবেগ যখনই পরিবর্তিত হইবে তখন মোটব্যয় প্রচলিত টাকাকড়ির সমানুপাতিক থাকিবে না। জিনিসপত্রের পরিমাণও স্থির থাকে না বলিয়া সেইগুলির দাম মোট ব্যয়ের সমানুপাতিক নাও হইতে পারে। তবে এই ব্যাখ্যা হইতে প্রতীয়মান হয়, সাধারণ মূল্যস্তর তিনটি জিনিসের উপর নির্ভরশীল। যথা, (১) টাকাকড়ির পরিমাণ (The Quantity of Money), (২) টাকাকড়ির প্রচলনবেগ (The Velocity of Circulation of Money) এবং (৩) টাকাকড়ির দ্বারা ক্রয়-বিক্রয়ের মোট পরিমাণ বা লেনদেনের সমষ্টি (The Volume of Trade)। অধ্যাপক ফিসার এইগুলির ভিত্তিতেই টাকার পরিমাণতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

পরিমাণতত্ত্বের স্থূল ব্যাখ্যায় জিনিসপত্রের পরিমাণ ও টাকাকড়ির প্রচলনবেগ স্থির থাকে; টাকার পরিমাণ বাড়িলেও সমান হারে দাম বাড়ে

ফিসারের বিনিময়-সমীকরণ (Fisher's Equation of Exchange): **অধ্যাপক ফিসার অর্থের পরিমাণতত্ত্ব আলোচনাকালে একটি বিনিময় সমীকরণ দিয়াছেন। এই সমীকরণ অনুযায়ী যদি টাকার চাহিদা স্থির থাকে, তবে মূল্যস্তর নিম্নোক্ত সমীকরণের সাহায্যে নির্ধারণ করা যায়।**

$$P=\frac{MV}{T}$$ অর্থাৎ, মূল্যস্তর $=\frac{\text{টাকার পরিমাণ}\times\text{টাকার প্রচলন-বেগ}}{\text{বিক্রীত সামগ্রীর পরিমাণ}}$।

এখানে 'P' হইতেছে মূল্যস্তর, 'M' হইতেছে বাজারে চালু মুদ্রার পরিমাণ, 'V' হইতেছে বাজারে চালু মুদ্রার প্রচলন-বেগ, এবং 'T' হইতেছে বাজারে বিক্রীত সামগ্রীর পরিমাণ। এই সমীকরণে 'T' এবং 'V' অর্থাৎ মোট বিক্রীত সামগ্রীর পরিমাণ এবং টাকার প্রচলন-বেগ, এই দুইটি উপাদানকে স্থির ধরা হইয়াছে। এখন যদি টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া হয়, মূল্যস্তরও সেই অনুপাতে বাড়িয়া যাইবে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে বিক্রীত জিনিসগুলির মোটমূল্য বা PT ঐ সময়ে মোট টাকাকড়ির ব্যয়ের পরিমাণ বা MV-র সমান হইবে।

কিন্তু, বাজারে চালু টাকা ছাড়াও লোকে ঋণপত্র (Credit Instrument) এবং ব্যাংক-টাকার সাহায্যে (Bank Money) জিনিসপত্র কেনাবেচা করে।

সমীকরণটির পুনর্বিন্যাস

আবার এই ঋণপত্রগুলিও লোকের হাত বদলায়, অর্থাৎ ইহাদেরও প্রচলন-বেগ আছে। সুতরাং টাকার মোট যোগান বলিতে শুধু বাজারে চালু টাকা হিসাব করিলেই চলিবে না, ব্যাংকের সৃষ্ট টাকাও ধরিতে হইবে। সেইজন্য অধ্যাপক ফিসার (Prof. Fisher) পূর্বোক্ত সমীকরণটির পুনর্বিন্যাস করিযাছেন ; যেমন,

$$P=\frac{MV+M'V'}{T}$$

এখানে M' বলিতে বুঝায় ব্যাংকের টাকা এবং V' বলিতে বুঝায় ইহার প্রচলন-বেগ। অবশ্য এই প্রচলন-বেগকেও স্থির বলিয়া ধরা হইয়াছে। সুতরাং টাকার মোট যোগান বলিতে এখানে বাজারে চালু টাকা ও ব্যাংক-সৃষ্ট টাকা এবং ইহাদের উভয়েরই প্রচলন-বেগ ধরা হইয়াছে। মূল্যস্তর টাকার মোট যোগানের উঠানামার সহিত পরিবর্তিত হয়। টাকার চাহিদা একটি নির্দিষ্ট সময়ে স্থির থাকিলে যদি টাকার মোট যোগান বাড়িয়া যায়, তবে মূল্যস্তরও বাড়িয়া যাইবে ; আর যদি টাকার মোট যোগান কমিয়া যায়, তবে মূল্যস্তরও কমিয়া যাইবে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী P অথবা মূল্যস্তর নির্ভর করে M, V এবং T, এই তিনটি উপাদানের উপর। যদি V এবং T অপরিবর্তিত থাকে এবং M দ্বিগুণ হয়, তবে P-ও দ্বিগুণ হইবে। অপরপক্ষে যদি T দ্বিগুণ হয় এবং সেই সঙ্গে M ও V-র কোন পরিবর্তন না হয়, তাহা হইলে P বাড়িয়া যায়। ইহাই অর্থের পরিমাণতত্ত্ব (Quantity Theory of Money) হিসাবে পরিচিত। এই তত্ত্বটির দুইটি মৌলিক যুক্তি আছে। একটি হইতেছে, টাকা ও মূল্যস্তরের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে, অর্থাৎ, টাকার পরিমাণ বাড়িয়া গেলে মূল্যস্তর বাড়িয়া যায় এবং টাকার পরিমাণ কমিয়া গেলে মূল্যস্তর কমিয়া যায়। দ্বিতীয়টি হইতেছে এই যে, টাকার মূল্যস্তরের মধ্যে শুধু প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নয়, ইহাদের মধ্যে একটি আনুপাতিক সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ, যে হারে টাকার

পরিমাণ বড়িয়া যাইবে, সেই হারে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যাইবে এবং যে হারে টাকার পরিমাণ কমিয়া যাইবে, সেই হারে জিনিসপত্রের দাম কমিয়া যাইবে।

টাকার পরিমাণ বাড়িলেই জিনিসপত্রের দাম কেন বাড়ে, তাহা আমরা নিম্নলিখিত ভাবে বুঝাইতে পারি—

টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি

↓

লোকের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি

↓

বিভিন্ন জিনিসের জন্য লোকের চাহিদা বৃদ্ধি

↓

মূল্যবৃদ্ধি
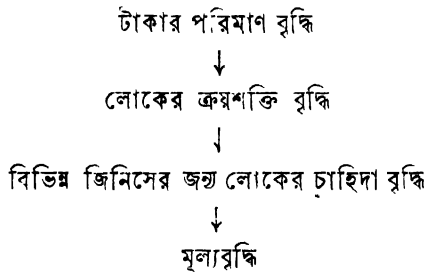
(যদি চাহিদা অনুযায়ী জিনিসপত্রের উৎপাদন না বাড়ে)

অর্থের পরিমাণতত্ত্ব অনুযায়ী টাকার পরিমাণ বাড়িলে ভোগসামগ্রীর জন্য চাহিদা বাড়িতে পারে। কিন্তু, মোট বিক্রীত সামগ্রীর পরিমাণ (উপরোক্ত পরিমাণে 'T') স্থির থাকে বলিয়া উৎপাদন স্থির থাকে, এবং সেইজন্য চাহিদা বাড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্রের দামও বাড়িয়া যায়, অর্থাৎ টাকার মূল্য কমিয়া যায়।

যুদ্ধের সময় টাকার সৃষ্টি বেশী হয় এবং বিভিন্ন জিনিসের জন্য সামগ্রিকভাবে চাহিদাও বাড়িয়া যায়। অথচ, যুদ্ধের সময় উৎপাদন বিশেষ বাড়ে না; কারণ, সেই সময়ে শ্রমিকের অভাব হয়। ইহাতে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যায়।

পূর্ণনিয়োগে এই তত্ত্ব কার্যকর হয়

যখন দেশে পূর্ণনিয়োগ থাকে তখন এই তত্ত্ব বিশেষভাবে কার্যকর হয়। যতক্ষণ পূর্ণনিয়োগ না থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত হয়ত টাকার পরিমাণ বাড়িলে জিনিসপত্রের উৎপাদন বাড়িতে পারে (অবশ্য যদি বর্ধিত টাকার সাহায্যে দেশের অব্যবহৃত সম্পদ অথবা উপাদানগুলিকে কাজে লাগানো হয়)। উৎপাদন বাড়িতে বাড়িতে হয়ত নিয়োগের সর্বোচ্চ সীমায় (Full Employment Ceiling) আসিতে পারে। তখনও যদি টাকার পরিমাণ বাড়িতে থাকে, তবে ইহা জিনিসপত্রের উৎপাদন আর না বাড়াইয়া সমান অনুপাতে দাম বাড়াইয়া দিবে।

ফিসারের অর্থের পরিমাণ-তত্ত্বের সমালোচনা (Criticisms of the Quantity Theory of Money)—অর্থের পরিমাণতত্ত্বটি কতিপয় ভুল ধারণার (wrong assumptions) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত, টাকার চাহিদা শুধু জিনিসপত্রের কেনাবেচার পরিমাণের সাহায্যে বুঝা যায় না। বিনিয়োগের কাজের জন্য টাকার দরকার হইতে পারে; বিশেষতঃ ব্যবসায়ীরা অনেক ক্ষেত্রে ফাট্‌কা-

কারবার করে। সেইজন্য তাহাদের কিছু-না-কিছু টাকার চাহিদা সর্বদাই থাকে। অধ্যাপক ফিসার এই দিকটি মোটেই বিবেচনা করেন নাই।

এই তত্ত্বে টাকার চাহিদার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নহে

দ্বিতীয়ত, 'সাধারণ মূল্যস্তর' বলিতে অধ্যাপক ফিসার কি বুঝাইতে চাহেন, তাহাও পরিষ্কার হয় নাই। কারণ ভোগ সামগ্রীর (Consumption goods) মূল্যস্তর এবং মূলধন-সামগ্রীর (Capital goods) মূল্যস্তর কতিপয় বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করে। সুতরাং এই দুইটি মূল্যস্তর বিভিন্ন উপায়ে নির্ধারণ করা উচিত। একসঙ্গে গড়মূল্যস্তর বলিতে ভোগ-সামগ্রীর মূল্যস্তর অথবা মূলধন-সামগ্রীর মূল্যস্তর বুঝায়, তাহা পরিষ্কার হয় না।

সাধারণ মূল্যস্তরের ব্যাখ্যাও সম্পূর্ণ নহে

তৃতীয়ত, এই তত্ত্বে টাকার প্রচলন-বেগ এবং বিক্রীত সামগ্রীর পরিমাণ সর্বদা স্থির থাকে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এই যুক্তিটি ভুল। কারণ, টাকার প্রচলন-বেগ এমন কতিপয় উপাদানের উপর নির্ভর করে, যাহার কোনটিই স্থির থাকে না—যেমন, আয়, ব্যাংকের সুদের হার, লোকের সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও লাভের আশায় টাকা খরচ করিবার ইচ্ছা ইত্যাদি। সুতরাং টাকার প্রচলন-বেগ কখনই স্থির থাকিতে পারে না। তাহা ছাড়া বিক্রীত সামগ্রীর মোট পরিমাণও কখনই স্থির থাকে না। গতিশীল পৃথিবীতে উৎপাদন কখনই স্থির থাকে না। দেশের অনেক সম্পদ অব্যবহৃত থাকিতে পারে, এবং টাকার পরিমাণ বাড়িলেই সেই অব্যবহৃত সম্পদগুলির সদ্ব্যবহার করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। সেই ক্ষেত্রে মোট বিক্রীত সামগ্রীর পরিমাণ স্থির থাকিতে পারে না।

টাকার প্রচলন-বেগ ও বিক্রীত সামগ্রীর পরিমাণ স্থির থাকে না

চতুর্থত, এই সমীকরণটি মূল্যস্তরের নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে না; এই সমীকরণ এইটুকুই শুধু বলে যে, টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়িলে জিনিসপত্রের দাম বাড়িবে এবং টাকাকড়ির পরিমাণ কমিলে জিনিসপত্রের দাম কমিবে, কিন্তু এই মূল্য-পরিবর্তন যে কিভাবে হইবে অথবা কোন্ পথ ধরিয়া আসিবে তাহা ফিসার ব্যাখ্যা করেন নাই।

পঞ্চমত, অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি যে শুধু কতিপয় ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাই নহে। ইহার অন্যতম ত্রুটি হইতেছে এই যে, লোকের আয়ের যে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণে একটি ভূমিকা আছে, তাহা এই তত্ত্বে স্বীকার করা হয় নাই। লোকের আয় বাড়িলেই চাহিদা বাড়ে এবং তাহাতে জিনিসের দাম বাড়ে। আবার টাকার পরিমাণ বাড়িলে যে আয় বাড়ে, তাহা নহে।

আয়ের ভূমিকা অবহেলিত

ষষ্ঠত, ফিসারের তত্ত্বটি জিনিসপত্রের দাম এবং বিনিয়োগের পরিমাণ সর্বদা টাকার উপর নির্ভর করে, ইহা ধরিয়া লইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জিনিসপত্রের দাম এবং বিনিয়োগ টাকা ব্যতীত অন্যান্য কতিপয় উপাদানের উপর নির্ভর করে

উৎপাদনের উপকরণগুলির দক্ষতা, উৎপাদনের আয় এবং মূলধনের পরিমাণ, উৎপাদনে লাভের আশা, ক্রেতার চাহিদা প্রভৃতি কারণের উপরেও বিনিয়োগ এবং জিনিসপত্রের দাম নির্ভর করে। ১৯৩০ সালে যখন বিভিন্ন দেশে ব্যবসায়ে মন্দা depression) তীব্র আকার ধারণ করে, তখন অনেক দেশ টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া ও উৎপাদন এবং বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইতে পারে নাই।

জিনিসপত্রের দাম যে টাকা ছাড়াও অন্যান্য উপাদানের উপর নির্ভরশীল তাহা এই তত্ত্বে উপেক্ষিত হইয়াছে

সপ্তমত, ফিসার প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি বাণিজ্যচক্রের কারণ ব্যাখ্যা করিতে পারে না। বাণিজ্যচক্রে (trade cycle) আমরা দেখিতে পাই, উন্নতির শীর্ষে (boom) উঠিয়া যখন দামস্তর নীচের দিকে যাইতে থাকে (recession), তখন টাকার পরিমাণ সমান অনুপাতে কমে না। আবার ব্যবসায়ে মন্দার (depression) পর টাকার পরিমাণ যে অনুপাতে বাড়ানো হয়, জিনিসপত্রের দাম এবং উৎপাদন সেই অনুপাতে বাড়ে না। কারণ মন্দার পর উৎপাদন বাড়িবে কিনা তাহা নির্ভর করে উৎপাদন হইতে উৎপাদকদের ভবিষ্যৎ লাভের আশার উপর। উৎপাদন কতটা বাড়ানো যাইতে পারে সেই সম্পর্কে উৎপাদকদের সিদ্ধান্ত মূলতঃ ভবিষ্যৎ লাভের আশার উপর নির্ভরশীল। সর্বাপেক্ষা বড় কথা হইল, ক্রেতাদের কার্যকর চাহিদা (effective demand) কিভাবে উঠানামা করিতেছে। উন্নতির শীর্ষে কার্যকর চাহিদা খুব বেশী থাকে এবং মন্দার সময় চাহিদার ঘাটতি থাকে। এই কার্যকর চাহিদার উঠানামা টাকার পরিমাণ তত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ ইহা নির্ভর করে আয়ের (income) উপর, টাকার পরিমাণের উপর নহে।

এই তত্ত্বটি বাণিজ্যচক্রের কারণ বিশ্লেষণ করিতে পারে না

ফিসারের সমীকরণটিকে আমরা একটি "Truism" বলিতে পারি; অর্থাৎ, যে টাকা আমরা দিতে পারি (MV), সেই টাকাই আমরা প্রকৃতপক্ষে প্রদান করি (PT)। প্রকৃতপক্ষে যে টাকা দেশে প্রচলিত সেই টাকা দিয়াই দেশে লেনদেন হয়; সুতরাং ঠিকভাবে সংজ্ঞা প্রদান করিলে 'MV' এবং 'PT' একই জিনিস বুঝায়। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে বিক্রীত জিনিসগুলির মোট মূল্য বা PT ঐ সময়ে সেই জিনিসগুলির উপর মোট ব্যয়ের পরিমাণ বা MV-র সমান হইবে। এইজন্য ফিসারের সমীকরণটিকে নিছক একটি identity বলা যাইতে পারে।

ফিসারের প্রদত্ত তত্ত্বটি ততক্ষণই সত্য যতক্ষণ দেশে পূর্ণনিয়োগ (Full Employment) থাকিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণনিয়োগের প্রভাব থাকিবে ততক্ষণ টাকার পরিমাণ বাড়িলে জনগণের সক্রিয় চাহিদা (effective demand) বাড়িবে; ইহাতে উৎপাদন বাড়িবে এবং জিনিসপত্রের দাম বেশী বাড়িবে না। যখন দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান এবং মুদ্রাস্ফীতি থাকে, তখন ফিসারের অর্থের পরিমাণতত্ত্বটি কার্যকর হয়। আধুনিককালে আমরা দেখিতে পাই, টাকার পরিমাণ টাকার মূল্য নিরূপণ করে, এই যুক্তিটি পরিত্যক্ত

পূর্ণনিয়োগে এই তত্ত্বটি কার্যকর হয়

হইয়াছে ; বরং, এখন এই ধারণারই সৃষ্টি হইয়াছে, টাকার পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে নির্ভর করে টাকার মূল্যের উপর।

ফিসার-প্রদত্ত অর্থের পরিমাণতত্ত্বটির আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, দেশে পূর্ণনিয়োগ থাকিলেই তাঁহার তত্ত্বটি কার্যকর হয় ; ইহা ছাড়া মুদ্রাস্ফীতির সময়েও টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া দিলে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যায়।

কখন এই তত্ত্বটি সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়

দেশে জিনিসপত্রের দামের কেন পরিবর্তন হয়, তাহা আমরা সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণের দ্বারা বুঝাইতে পারি। সাধারণতঃ বিনিয়োগের পরিমাণ যদি সঞ্চয়ের পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হয়, তবে জিনিসপত্রের দাম কমিতে থাকে দামের স্থিতিশীলতা (Stability) বজায় থাকে তখনই যখন সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে ভারসাম্য (Equilibrium) থাকে। সঞ্চয়-বিনিয়োগ-তত্ত্বের সাহায্যে আমরা টাকার প্রচলন বেগ (Velocity of Circulation এবং জিনিসপত্রের ক্রয়ের পরিমাণ (Volume of Transaction) সম্বন্ধেও বিভিন্ন তথ্য জানিতে পারি।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তত্ত্বের সাহায্যে জিনিসপত্রের দামের পরিবর্তন বুঝানো যায়

সঞ্চয়-বিনিয়োগের তত্ত্বের সাহায্যে ভারসাম্য পর্যায়ে জাতীয় আয় নিরূপিত হয়। অর্থাৎ, যখন সঞ্চয়-রেখা বিনিয়োগ-রেখাকে ছেদ করে, সেই বিন্দুতে ভারসাম্যের পর্যায়ে জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়। যখন বিনিয়োগের পরিমাণ সঞ্চয় অপেক্ষা বেশী হয়, তখন জাতীয় আয় বাড়ে এবং ইহার ফলে জনসাধারণের ক্রয়শক্তি ও কার্যকর চাহিদা বাড়ে। সুতরাং তখন দামও বাড়িয়া যায়। আবার যখন সঞ্চয় অপেক্ষা বিনিয়োগের পরিমাণ কম হয়, তখন জাতীয় আয় কমে এবং ইহার ফলে চাহিদাও কমে। সুতরাং তখন দামও কমিয়া যায়।

কেমব্রিজের ক্যাশ-ব্যালান্স তত্ত্ব (Cambridge Cash-Balance Approach): কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদ্‌রা অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব সম্পর্কে নিজেদের একটি তত্ত্ব প্রচলন করিয়াছেন। তাঁহারা অর্থের প্রবাহ (Flow of Money) সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহশীল না হইয়া অর্থের মজুত পরিমাণ (Stock of Money) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই অর্থের কিছু পরিমাণ নিজের কাছে রাখে ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ক্রয় করিবার জন্য অথবা হঠাৎ বিপদের জন্য। সমাজের ব্যক্তিগত অর্থের পরিমাণ যোগ করিলে বুঝা যায় যে ঐ সমাজে কত পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন যাহার সমষ্টি সমাজের লোকেরা নিজেদের কাছে রাখিতে চায়। তাঁহাদের সমীকরণটিকে অতি সহজে প্রকাশ করা যায়।

$$M = KPT.$$

K অর্থে বুঝা যায়, একটি বিশেষ সময়ে কত পরিমাণ অর্থ লোকেরা নিজেদের নিকট রাখিতে চায়। K হইতেছে আয়ের হার যাহা লোকেরা Cash-balance

হিসাবে নিজেদের নিকট রাখিতে চায়, অর্থাৎ $K\left(=\frac{1}{V}\right)$কে স্থির বলিয়া ধরা হইয়াছে, এবং যেহেতু K অপরিবর্তনীয়, সেইহেতু M-এর বৃদ্ধি হইলে P ঠিক সেইরূপেই বৃদ্ধি পাইবে; অবশ্য T-কে স্থির রাখিতে হইবে। এখানে T হইতেছে কোন দেশের বাৎসরিক প্রকৃত আয় (real income), P হইতেছে উৎপাদিত প্রকৃত সম্পদের (real wealth) গড় দাম। KPT হইতেছে টাকাকড়ির সামগ্রিক চাহিদা। যেহেতু টাকার চাহিদা ও যোগান সমান, সেজন্য $M=KPT$; সুতরাং গড়দাম হইবে $P=\frac{M}{KT.}$ লোকের আয় এবং তাহাদের Cash-balance-এর সম্বন্ধ K নির্ধারণ করে. এবং PT অর্থে শুধু সামগ্রিক আর্থিক লেনদেনই বুঝায় না, উপরন্তু জাতীয় আয় Y বুঝায়। বাণিজ্য-চক্রের পরিবর্তনের আলোচনায় এই সম্পর্কের গুরুত্ব খুবই বেশী।

ফিসারের সমীকরণে দেখা যায় $PT=MV$ অর্থাৎ $M/P=T/V$, কেমব্রিজ সমীকরণে $M/P=K$. সুতরাং $K=\frac{T}{V}$, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে কেমব্রিজের 'K' অর্থের লেনদেনের প্রচলন-বেগের অর্থই সূচিত করে।

ফিসারের সমীকরণের বিরুদ্ধে যে সকল সমালোচনা করা হইয়াছে কেমব্রিজের সমীকরণের বিরুদ্ধে সেই সমালোচনার অধিকাংশ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অর্থের মূল্য নির্ধারণের জন্য এই দুইটি তত্ত্বের কোনটিই সম্পূর্ণ নয়। তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, টাকাকড়ি সংক্রান্ত তত্ত্বগত ব্যাখ্যার বিবর্তনে কেমব্রিজ সমীকরণ ফিসারের সমীকরণ অপেক্ষাও অধিক সহায়তা করিয়াছে। ফিসারের সমীকরণে শুধু লেনদেন করার জন্যই টাকার প্রয়োজন। কিন্তু কেমব্রিজ সমীকরণে দেখানো হইয়াছে যে লোকে ইচ্ছা করিলে কিছু টাকা নিজের হাতে cash-balance হিসাবে রাখিয়া দিতে পারে। ঐ যুক্তিটিই পরবর্তীকালের Liquidity Preference Theory বা নগদ টাকা হাতে রাখার অভিপ্রায় সম্পর্কিত তত্ত্বের মূল ভিত্তি। তবে ফিসারের সমীকরণে যেমন টাকার চাহিদার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নয়, কেমব্রিজ সমীকরণেও সেই প্রকার টাকার চাহিদার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নয়। কোন তত্ত্বেই ফাটকা কারবার করিবার জন্য যে ব্যবসায়ীগণ নিজেদের হাতে কিছু টাকা রাখিতে চাহিতে পারে (Speculative demand for holding money) তাহা ব্যাখ্যা করা হয় নাই।

ফিসারের সমীকরণ এবং কেমব্রিজ সমীকরণের মধ্যে তুলনা

মুদ্রাস্ফীতি—ইহার কারণ বিশ্লেষণ ও প্রকারভেদ (Inflation—Its Causes and Various Types): মুদ্রাস্ফীতি বা ইনফ্লেসন বলিতে লোকে সাধারণতঃ জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি মনে করে। কিন্তু তবু জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া

গেলেই মুদ্রাস্ফীতি বা ইনফ্লেসন বলা চলে না। জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও যদি দেশের উৎপাদন বাড়িয়া যায় এবং অধিক পরিমাণে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়, তবে ইহাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা যায় না। অনেক সময় মূলধনের পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া যাইতে পারে এবং ইহাতে জিনিসের দাম বাড়িতে পারে। এই অবস্থাকেও মুদ্রাস্ফীতি বলা চলে না। আবার অনেক সময় এমন হয় যে, শ্রমিকদের উৎপাদনীশক্তি (Productivity) বাড়িয়া গিয়াছে এবং উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। এক্ষেত্রে উৎপাদন-খরচ কম হওয়া সত্ত্বেও যদি মূল্য কমিয়া না যায় এবং অপরিবর্তিত থাকে, তবে এই অবস্থাকে আমরা মুদ্রাস্ফীতি বলিতে পারি। এই ধরনের মুদ্রাস্ফীতি মুনাফাস্ফীতির (Profit Inflation) রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে। অধ্যাপক পিগুর (Prof. Pigou) মতে আয়-সৃষ্টিকারী কাজের তুলনায় টাকার দিক দিয়া আয় বাড়িলেই মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক পিগুর (Pigou) ভাষায় "Inflation exists when money income is expanding more than in proportion to income-earning activity." আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীদের মতে মুদ্রাস্ফীতি দুই রকম হইতে পারে; যথা চাহিদাগত (demand pull) মুদ্রাস্ফীতি এবং খরচগত (cost push) মুদ্রাস্ফীতি। সাধারণতঃ সামগ্রিকভাবে যোগান অপেক্ষা চাহিদা বেশী হইলে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়। উৎপাদন খরচ বেশী হইয়া গেলে কোন জিনিসের যোগান কমিয়া যাইতে পারে এবং ইহার দাম বাড়িয়া যাইতে পারে। যোগান অপেক্ষা চাহিদা বেশী হইলেও জিনিসপত্রে দাম বাড়িয়া যায়।

যদি দেশে উৎপাদন বাড়াইবার মত সম্ভাবনা থাকে এবং সেক্ষেত্রে মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া যায়, তবে বর্ধিত মুদ্রা উৎপাদন-বৃদ্ধির কাজে ব্যবহৃত হইবে এবং যাহারা বেকার বসিয়া আছে, তাহাদের কাজের ব্যবস্থা থাকিবে। উৎপাদন ক্রমাগত বাড়িয়া যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণনিয়োগ (Full Employment) অবস্থা অর্থাৎ সকলেরই কাজের ব্যবস্থা হইতে পারে এইরকম অবস্থা আনয়ন না করিতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইহাকে মুদ্রাস্ফীতি বলিতে পারি না। যখন দেশে পূর্ণ-নিয়োগের ব্যবস্থা হইবে তখন যদি মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া যায়, তবে বর্ধিত মুদ্রা আর উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হইবে না, ইহা শুধু জিনিসপত্রের দাম বাড়াইয়া দিবে এবং মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করিবে। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে এইভাবেই সাধারণতঃ মুদ্রাস্ফীতি হয়। লর্ড কেইন্‌সের মতে পূর্ণনিয়োগের আগে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হইতে পারে যদি বর্ধিত মুদ্রার সবটাই উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত না হয় এবং যদি উৎপাদন বৃদ্ধির হার অপেক্ষা ভোগকারীদের ভোগের প্রবণতা আরও বেশী বাড়িয়া যায় তবে ইহাকে Semi-inflation বলা যায়। পূর্ণনিয়োগের অবস্থায় যখন মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধিই মূল্যবৃদ্ধির কারণ ঘটে, তখন ইহাকে মুদ্রার বর্ধিত পরিমাণ হেতু মুদ্রাস্ফীতি (Money-inflation) বলা হয়। বর্ধিত মুদ্রা লোকের ক্রয়শক্তি

বাড়াইয়া দেয়। ক্রয়শক্তি বাড়িয়া গেলে জিনিসপত্রের জন্য চাহিদা বাড়ে। অথচ চাহিদা বাড়িয়া গেলেও উৎপাদন বাড়ে না। সেইজন্যই মূল্যবৃদ্ধি ঘটে এবং মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়। অনেক সময় বাজেটে ঘাটতি করিয়া উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা চলে। বাজেটে ঘাটতি দূর করিবার জন্য সরকার কোন কোন সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে টাকা ধার করে। ইহাতে নূতন টাকার সৃষ্টি হয়। এই নূতন টাকার সৃষ্টি হইলে যদি দেখা যায়, সামগ্রিকভাবে চাহিদা জিনিসপত্রের যোগান অপেক্ষা অনেক বেশী, তবে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যায়। এইভাবে যে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয় তাহাকে ঘাটতি-বাজেট প্রণোদিত মুদ্রাস্ফীতি (Deficit-induced Inflation) বলা হয়।

কেইন্‌স তাঁহার "A Treatise on Money" নামক গ্রন্থে চার রকম মুদ্রাস্ফীতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—(১) জিনিসরূপে মুদ্রাস্ফীতি (Commodity Inflation) অর্থাৎ, ভোগসামগ্রীর দাম যদি ইহার উৎপাদন খরচের তুলনায় অধিক হারে বাড়ে; (২) মূলধন সামগ্রীরূপে মুদ্রাস্ফীতি (Capital Inflation) অর্থাৎ যদি বিনিয়োগের খরচ সঞ্চয় অপেক্ষা বেশী হয়; (৩) মুনাফাস্ফীতি (Profit Inflation) এবং (৪) আয়-স্ফীতি (Income Inflation) অর্থাৎ উৎপাদিত জিনিসের জন্য উপাদানগুলির পারিশ্রমিকের হার যদি আগেকার তুলনায় বাড়িয়া যায়।

প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি, আংশিক মুদ্রাস্ফীতি, খোলা মুদ্রাস্ফীতি এবং চাপা মুদ্রাস্ফীতি (Pure Inflation, Partial Inflation, Open Inflation and Suppressed Inflation) :

Pure Inflation বা প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি তখনই হয় যখন পূর্ণনিয়োগের (full employment) পর্যায় অতিক্রান্ত হইবার পর মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধিহেতু জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যায়। যতক্ষণ পূর্ণনিয়োগ অর্জিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত টাকার পরিমাণ বাড়িলে উৎপাদন বাড়ে; দাম বাড়ে না। কিন্তু পূর্ণনিয়োগ অর্জিত হইয়া গেলে টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যায়। আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীগণের মতে মুদ্রাস্ফীতি তখনই হয় যখন সামগ্রিক চাহিদা (aggregate demand) সমাজের সামগ্রিক যোগান (aggregate supply) অপেক্ষা বেশী। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানীগণ মনে করিতেন, দেশে স্বর্ণের আগমন হইলে যে মুদ্রার সম্প্রসারণ হয়, তাহা হইতেই জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যায়। কিন্তু বর্তমান অর্থবিজ্ঞানীদের মতে চাহিদা-জনিত (demand-pull) এবং খরচ-জনিত (cost-push) প্রভাবের ফলে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়।

Partial Inflation বা আংশিক মুদ্রাস্ফীতি—অনেক সময় দেখা যায় উৎপাদনের কতিপয় উপাদানের যোগান হয়ত কম, এবং সেইজন্য হয়ত সেই উপাদানগুলি অন্যান্য উপাদান (যেগুলির যোগান বেশী) অপেক্ষা তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণভাবে কর্মে নিযুক্ত হয়।

সেই ক্ষেত্রে স্বল্পযোগানসম্পন্ন উপাদানগুলির দ্বারা উৎপাদিত জিনিসের যোগান বাড়ানো যায় না, যদিও লোকের আয় বাড়িয়া যাইবার জন্য সেই জিনিসগুলির চাহিদা বেশী হয়। ইহার ফলে সেই জিনিসগুলির দাম বাড়িবে এবং যদি সেই জিনিসগুলি বাজারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়, তবে এই দাম-বৃদ্ধি অন্যান্য জিনিসের দামকেও প্রভাবিত করিবে। ইহাতে পূর্ণ-নিয়োগের পর্যায় না আসিলেও মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হইতে পারে। ইহাকে আংশিক মুদ্রাস্ফীতি বা Partial Inflation বলা হয়।

Open Inflation বা খোলা মুদ্রাস্ফীতি—যখন আর্থিক আয়ের বৃদ্ধি হওয়ার দরুন এবং ইহার ফলে জনসাধারণের চাহিদা বাড়িয়া যাইবার দরুন জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যায়, তখন ইহাকে খোলা মুদ্রাস্ফীতি বা Open Inflation বলা হয়। যদি এই দাম-বৃদ্ধিকে প্রতিরোধ করা না যায়, তবে এই খোলা মুদ্রাস্ফীতিই পরে Galloping Inflation-এ পরিণত হয়।

চাপা মুদ্রাস্ফীতি (Suppressed or Repressed Inflation)— অনেক সময় সরকার জিনিসপত্রের মূল্য-বৃদ্ধি প্রতিরোধ করিবার জন্য মূল্য-নিয়ন্ত্রণনীতি অথবা ক্রয়-নিয়ন্ত্রণ নীতির প্রবর্তন করেন। ইহাতে সাময়িকভাবে দাম কমিয়া যায় বটে, কিন্তু ইহাতে ক্রেতার চাহিদা নষ্ট হয় না। প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য ক্রেতার চাহিদা পুঞ্জীভূত (pent-up) হইতে থাকে এবং সুযোগ পাইলেই ইহার বিস্ফোরণ হয়। এই অবস্থাকে চাপা মুদ্রাস্ফীতি বা Suppressed inflation বলা হয়, এই ব্যবস্থায় ক্রেতার সংশ্লিষ্ট জিনিসটির কিনিবার পরিমাণ কমিতে পারে, বিকল্প জিনিস কিনিবার ঝোঁক হইতে পারে অথবা সংশ্লিষ্ট জিনিসটি ক্রয় করা বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু যে মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণ-প্রথা প্রত্যাহার করা হয়, সেই মুহূর্তেই চাপা মুদ্রাস্ফীতি—খোলা মুদ্রাস্ফীতির রূপ পরিগ্রহ করে। নিয়ন্ত্রণ-প্রথা চালু করা হইলে লোকের হাতে যে বাড়তি ক্রয়শক্তি থাকে তাহা নগদ টাকা অথবা ব্যাংক আমানতের মধ্যে জমা থাকে। মুদ্রাস্ফীতির পিছনে যে বাড়তি ক্রয়শক্তি কাজ করে, তাহা তখন নিশ্চল থাকে না।

চাহিদার বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি এবং খরচের বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (Demand-Pull Inflation and Cost-Push Inflation)—মুদ্রাস্ফীতির কারণ হিসাবে চাহিদার বৃদ্ধি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, খরচের বৃদ্ধিও অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ। ক্রেতার আয় বাড়িয়া গেলে ক্রয়শক্তি বাড়ে। ক্রয়শক্তি বাড়িলেই কার্যকর চাহিদা (effective demand) বাড়ে। যদি চাহিদা বাড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও জিনিসপত্রের যোগান না বাড়ে, তবে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয় , ইহার ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যায়। চাহিদার বৃদ্ধিজনিত জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যাওয়াকে চাহিদার বৃদ্ধিহেতু মুদ্রাস্ফীতি বা Demand-pull Inflation বলা হয়। চাহিদার বৃদ্ধি হেতু মুদ্রাস্ফীতি যুদ্ধের সময় দেখা যায়। যুদ্ধের ব্যয়নির্বাহ করিবার জন্য দেশে মুদ্রার প্রচলন ও সরবরাহ বাড়িয়া যায়। ইহাতে জনসাধারণের হাতে অধিক মুদ্রা আসে এবং

তাহাদের ক্রয়শক্তি বাড়িয়া যায়। কিন্তু ক্রয়শক্তি বাড়িয়া যাইবার ফলে চাহিদার যে বৃদ্ধি হয় তাহা পূরণ করিবার মত যোগান বাড়ে না। যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থা এমনভাবে ঢালিয়া সাজানো হয় যে, উৎপাদকগণ বেশী করিয়া ভোগ-সামগ্রী উৎপাদন করিবার পরিবর্তে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনে নিজেদের সম্পদ নিয়োজিত করে। ইহার ফলে একদিকে যখন ভোগ-সামগ্রীর জন্য চাহিদা বাড়ে, অপরদিকে তখন সেই অনুপাতে যোগান বাড়ে না। যুদ্ধ না চলিলেও স্বাভাবিক সময়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে যে, সামগ্রিক যোগান অপেক্ষা সামগ্রিক চাহিদা অনেক বেশী; তখন এই অতিরিক্ত চাহিদা (excess demand) মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করে।

যদি উৎপাদন-খরচ বাড়িয়া যাইবার দরুন জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যায় এবং এইভাবে দেশে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়, তবে ইহাকে খরচের বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বা Cost-Push Inflation বলে। যদি শ্রমিকদের মজুরি-হার হঠাৎ বাড়িয়া যায়, অথচ সেই অনুপাতে শ্রমিকদের উৎপাদনী-শক্তি না বাড়ে, তবে জিনিসপত্রের মোট উৎপাদন খরচ বাড়িয়া যায় এবং উৎপাদকগণ জিনিসপত্রের দাম বাড়াইয়া এই বাড়তি উৎপাদন-খরচ তুলিয়া আনিবার চেষ্টা করে। যদি কোন জিনিস উৎপাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে হয়, এবং যদি সেইগুলি আমদানি করার খরচ বাড়িয়া যায়, তবে সেই জিনিস উৎপাদন করিবার মোট খরচ বাড়িয়া যাইবে। এই বাড়তি খরচ যদি জিনিসটির বিক্রয়-দামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তবে খরচের বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হইবে।

কোন কোন ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতির পিছনে চাহিদা-বৃদ্ধি এবং খরচ-বৃদ্ধি উভয়ই যৌথভাবে কারণ হিসাবে কাজ করিতে পারে। এই অবস্থাকে মিশ্র চাহিদা-খরচ মুদ্রাস্ফীতি (Mixed Demand-Cost Inflation) বলা হয়। একটি উদাহরণ হইতে ইহা পরিষ্কার হইবে। ধরা যাক, শ্রমিকগণ মজুরি বৃদ্ধির জন্য দাবি করিল এবং শ্রমিক অসন্তোষ এড়াইবার জন্য মালিকগণও মজুরি হার বাড়াইল। ইহার ফলে দুইভাবে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হইতে পারে। প্রথমত, মজুরির হার বাড়িয়া যাইবার ফলে শ্রমিকদের আর্থিক আয় (money income) বাড়িয়া যাইবে,—ইহার ফলে তাহাদের ক্রয়শক্তি বাড়িয়া যাইবে, ক্রয়শক্তি বাড়িয়া যাইবার ফলে ভোগ-সামগ্রীর জন্য শ্রমিকদের চাহিদা বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু তখন যদি চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন না বাড়ে, তবে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হইবে। এই মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হইবে চাহিদা-বৃদ্ধির প্রভাবে (demand-pull influence)। আবার মজুরি বাড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও যদি শ্রমিকদের উৎপাদনী-শক্তি না বাড়ে, তবে উৎপাদকদের অথবা মালিকদের মোট খরচের (costs) পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। অথচ সেই উৎপাদন এমনভাবে বাড়িবে না যাহাতে এই বাড়তি খরচটুকু পূরণ

করিয়া লওয়া যায়। তখন উৎপাদকগণ বাধ্য হইয়াই জিনিসপত্রের দাম বাড়াইয়া দিবে যাহাতে এই বাড়তি খরচের জন্য তাহাদের ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়। দেখা যাইতেছে এখানে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হইবার প্রধান কারণ হইতেছে খরচ বৃদ্ধির প্রভাব (cost-push influence)। চাহিদা যেমন একদিকে জিনিসের দামকে উপরে টানিয়া নেয়, অপরদিকে সেই প্রকার খরচের ধাক্কায় উৎপাদক দাম বাড়াইয়া দেয়। উপরে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির যে উদাহরণটি দেওয়া হইল, তাহাতে দেখা যায় চাহিদা-বৃদ্ধির প্রভাব এবং খরচ-বৃদ্ধির প্রভাব যুগপৎ একই সঙ্গে কার্যকর হইতে পারে। তখনই আমরা চাহিদা বৃদ্ধি এবং খরচ বৃদ্ধি যৌথপ্রভাব দেখিতে পাই।

মুদ্রার বহির্মূল্য হ্রাস (devaluation) হইলে যে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয় তাহাতেও এই দুইটি প্রভাবের যৌথ ক্রিয়া দেখা যায়। একদিকে রপ্তানি বৃদ্ধিহেতু দেশের আয় বাড়ে, জনসাধারণের চাহিদা বাড়ে এবং জিনিসের দাম বাড়ে, অপরদিকে আমদানি খরচের বৃদ্ধি হেতু জিনিসের দাম বাড়ে। উভয় কারণের যৌথ প্রভাবে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হইতে পারে।

ব্যয়াধিক্যের অথবা মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক : ভারসাম্যের পর্যায়ে যখন জাতীয় আয় নিরূপিত হয় তখন আমরা জানি জাতীয় আয় হইতেছে মোট ভোগ-ব্যয় এবং বিনিয়োগ-ব্যয়ের সমষ্টির ($Y=C+I$) সমান। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির সময়ে বর্ধিত মুদ্রার দরুণ ভোগ-ব্যয় এবং বিনিয়োগ-ব্যয় যে হারে বাড়ে, বাস্তবে উৎপাদন সেই হারে বাড়ে না। ইহার ফলে ভোগের প্রবণতা এবং বিনিয়োগ প্রবণতা এমন হারে বাড়ে যে, ইহা উৎপাদন বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশী, সুতরাং তখন জাতীয় আয়েরও একটি নূতন ভারসাম্য পর্যায় (equilibrium level of income) দেখা যায়। জাতীয় আয়ের পূর্বতন ভারসাম্য বিন্দু হইতে নূতন ভারসাম্যের বিন্দু পর্যন্ত যে দূরত্ব তাহা মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক নির্দেশ করে। মুদ্রাস্ফীতির চাপ পরিমাপ করিবার উদ্দেশ্যে মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক নিরূপণ করা হয়। যুদ্ধের পূর্বে যে জিনিসপত্র বাজারে পাওয়া যায় এবং সেইগুলি ক্রয় করিতে যে টাকার প্রয়োজন,—যুদ্ধের পরেও যদি সেই পরিমাণ জিনিসপত্র বাজারে পাওয়া যায় অথচ সেইগুলি ক্রয় করিতে যদি অনেক বেশী টাকার প্রয়োজন হয়, তবে যুদ্ধপূর্বকালের তুলনায় যুদ্ধের পরবর্তীকালে যে বাড়তি ব্যয় হয় অথবা যে বাড়তি অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয়, তাহাই মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক (Inflationary Gap) সূচিত করে। লর্ড কেইন্‌স তাঁহার *"How to Pay for the War"* গ্রন্থে এইভাবেই 'মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক' বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। নিম্নের চিত্রে আমরা 'মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক' সম্বন্ধে কেইন্‌সের বিশ্লেষণ দেখাইতে পারি।

এই চিত্রে OY_0 হইতেছে ভারসাম্য পর্যায়ে জাতীয় আয়। ৪৫° ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি করিয়াছে যে রেখা, সেই রেখার সঙ্গে ভোগ-বিনিয়োগ-রেখা (C+I curve) E বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে ; সুতরাং OY_0 হইতেছে ভারসাম্য পর্যায়ের জাতীয় আয়।

কিন্তু জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় ভোগ-ব্যয় এবং বিনিয়োগ-ব্যয় উভয়ই বাড়িয়া গিয়াছে এবং তাহা C+I′ রেখা দ্বারা সূচিত হইয়াছে। ইহার ফলে E_1 হইতেছে একটি নূতন ভারসাম্যের বিন্দু এবং অধিক ব্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে OY_1 হইতেছে নূতন ভারসাম্য পর্যায়ে জাতীয় আয়। এই চিত্রে E হইতে E′ পর্যন্ত দূরত্বকেই মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক বলা যায়। নিম্নের চিত্রে বিকল্পভাবে ব্যয়াধিক্যের ফাঁক দেখানো যাইতে পারে। পূর্ণনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় জাতীয় আয় অথবা জাতীয় উৎপাদনের মূল্যকে যদি ভারসাম্যের পর্যায়ে থাকিতে হয়, তবে ঐ আয়ের স্তরে সমাজের
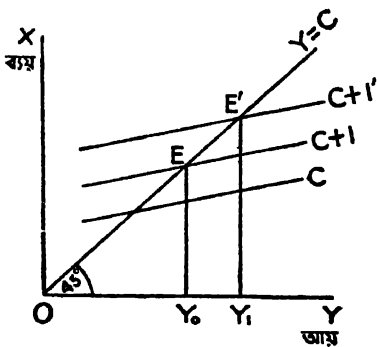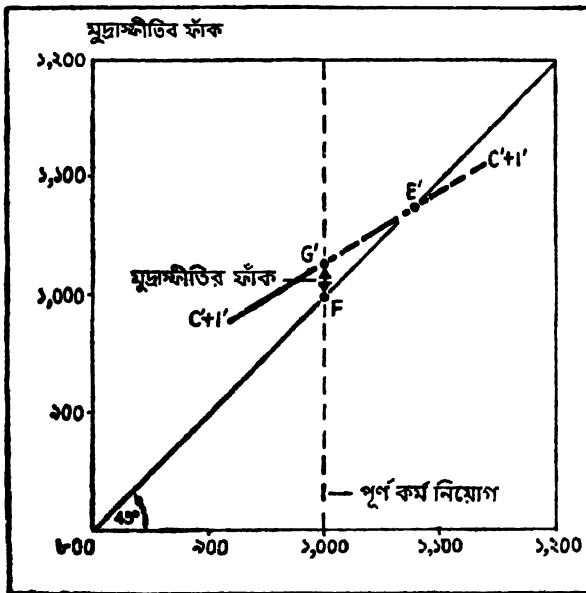
চিত্র নং

চিত্র নং ৮১

পরিকল্পিত সঞ্চয় এবং বিনিয়োগকে (Planned Saving and Investment) পরস্পরের সমান হইতে হয়। যখন দেখা যায় পূর্ণনিয়োগের আয়ের স্তরে পরিকল্পিত সঞ্চয় অপেক্ষা বিনিয়োগের পরিমাণ বেশী, তখন পরিকল্পিত সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে যে ব্যবধান থাকে তাহাই হইতেছে ব্যয়াধিক্যের ফাঁক অথবা মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক। ধরা যাক, পূর্ণনিয়োগের আয়ের স্তর হইল ১০০০ কোটি টাকা। এখন যদি এই আয় ও

সমাজের পরিকল্পিত সঞ্চয় হয় ৩০০০ কোটি টাকা এবং বিনিয়োগ হয় ৭০০ কোটি টাকা, তবে বুঝিতে হইবে ব্যয়াধিক্যের ফাঁক রহিয়া গিয়াছে ৪০০ কোটি টাকার। পূর্বপৃষ্ঠার ৮১নং চিত্রে F বিন্দুতে পুর্ণনিয়োগের স্তরে আয় নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু E′ বিন্দুতে যে আয়-স্তর দেখানো হইয়াছে তাহাতে GF পরিমাণ বাড়তি ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয়ের প্রয়োজন। সুতরাং G হইতে F বিন্দু পর্যন্ত অথবা E′ হইতে F বিন্দুর দূরত্ব মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক বুঝাইতেছে।

মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক সম্পর্কে কোন কোন অর্থবিজ্ঞানী একটু অন্য ধরনের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

ওয়ারবার্টন (Warburton) নামে একজন অর্থবিজ্ঞানীর মতে দেশের মোট মুদ্রার পরিমাণ হইতে মোট মুদ্রার ব্যয়ের পরিমাণ বাদ দিলে যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তবে তাহাই মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক সূচিত করে। তাঁহার মতে মুদ্রার মোট ব্যয় হইতে পারে নিম্নলিখিত উপায়ে , যথা, (১) ভোগজনিত ব্যয়, (২) বিনিয়োগ-ব্যয়, (৩) কর-প্রদান, (৪) ঋণ-পরিশোধ, (৫) অন্যান্য খাতে অর্থপ্রদান, যেমন প্রিমিয়াম প্রদান, সাহায্য প্রদান প্রভৃতি।

অধ্যাপক পিগু মনে করেন, যদি সামগ্রিকভাবে আর্থিক চাহিদা (aggregate money demand), সামগ্রিক আর্থিক খরচ (aggregate money cost) অপেক্ষা বেশী হয় তবেই জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যায় এবং সেক্ষেত্রে বাড়তি অর্থব্যয়ই মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক সূচিত করে। ধরা যাক, যে হারে উৎপাদন বাড়িতেছে, তাহা অপেক্ষা বেশী হারে শ্রমিকদের মজুরি বাড়িতেছে, তাহা হইলে সামগ্রিক ভাবে উৎপাদকদের আর্থিক খরচ বাড়িয়া যাইবে, এবং এই বাড়তি খরচ হেতু জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যাইবে ও ক্রেতারা বেশী খরচ করিতে বাধ্য হইবে। ইহার ফলে মোট আর্থিক চাহিদা বাড়িবে। সামগ্রিক আর্থিক চাহিদা মোট আর্থিক খরচ হইতে যতটা বেশী হইবে ততটাই হইতেছে মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক।

সুইডিস অর্থবিজ্ঞানীগণ মনে করেন জিনিসপত্রের অথবা উপাদানের বাজারে যদি জনসাধারণের ক্রয় করিবার মত প্রযোজনীয় যোগান না থাকে, অথবা যদি জিনিস অথবা উপাদানের পরিকল্পিত বিক্রয় (planned sale) কিংবা কাম্য বিক্রয় (optimum sale) অপেক্ষা পরিকল্পিত ক্রয়ের (planned purchase) অথবা কাম্য ক্রয়ের (optimum purchase) পরিমাণ বেশী হয়, তবে বিক্রয় অপেক্ষা ক্রয়ের যতটা উদ্বৃত্ত থাকে ততটাই মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক সূচিত করে।

মুদ্রাসংকোচন (Deflation): যখন লোকের সক্রিয় চাহিদা (effective demand) কমিয়া যায়, তখন মুদ্রার সংকোচন হয়, জিনিসপত্রের দাম কমিয়া যায়, উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার প্রচেষ্টা কমিয়া যায় এবং কর্মসংস্থানের অভাব দেখা যায়। এই অবস্থাকে মুদ্রাসংকোচন বা Deflation বলা হয়। মুদ্রাস্ফীতি বা Inflation সাধারণতঃ ক্রেতা এবং নির্দিষ্ট উপার্জনকারীদের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত না হইলেও

মুদ্রাসংকোচন অপেক্ষা ভাল। মুদ্রাসংকোচনের প্রধান কুফল হইতেছে এই যে, ইহাতে লোকের সক্রিয় চাহিদা, আয়, ভোগের প্রবণতা এবং কাজের সুযোগ-সুবিধা সবই কমিয়া যায়। দেশে একদিকে হয় কম উৎপাদন এবং অপরদিকে হয় খুব নিম্ন মূল্যস্তর (Low Price-level)। তাহা ছাড়া, বেকার-সমস্যা এই সময়ে চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। দেশের সামগ্রিক স্বার্থের দিক হইতে বিবেচনা করিলে মুদ্রাসংকোচন খুবই অবাঞ্ছনীয়। অপরপক্ষে মুদ্রাস্ফীতির যতই ত্রুটি থাকুক না কেন, ইহা তুলনামূলক ভাবে মুদ্রাসংকোচন অপেক্ষা ভাল। কারণ, মুদ্রাস্ফীতির ফলে যদিও জিনিসপত্রের দাম খুব বাড়িয়া যায়, তবুও দেশে উৎপাদন, জাতীয় আয় এবং কর্মসংস্থান বাড়ে। দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিক হইতে চিন্তা করিলে সাধারণ পর্যায়ের মুদ্রাস্ফীতি খারাপ নহে। কেইন্‌সের মতে যেসব অর্থনীতিতে বেকার-অবস্থা খুবই প্রবল, সেগুলিতে মূল্যস্তরের মৃদু বৃদ্ধিই আথিক নীতির দিক দিয়া হওয়া উচিত। এইজন্য আমরা বলিতে পারি যে, মুদ্রাস্ফীতি ন্যায়সঙ্গত না হইলেও মুদ্রাসংকোচন অপেক্ষা ভাল।

মুদ্রা-সংকোচন কাহাকে বলে? মুদ্রাসংকোচন এবং মুদ্রাস্ফীতির তুলনা

ব্যয়সংকোচের ফাঁক (Deflationary Gap)**:** বাণিজ্যচক্রের সমৃদ্ধির সময়ে উৎপাদন বাড়িয়া যায় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে ইহা পূর্ণ কর্মসংস্থানের উচ্চ সীমায় (Full Employment Ceiling) পৌঁছিতে পারে। এমন হইতে পারে, সমৃদ্ধির পর যখন অধোগতি (down-turn) আরম্ভ হয়, তখন জনসাধারণের আয় অথবা সক্রিয় চাহিদা হঠাৎ কমিয়া যাইতে পারে। কিন্তু যে হারে চাহিদা কমিয়া যায়, সেই হারে উৎপাদনের পরিমাণ নাও কমিতে পারে। অর্থাৎ, উৎপাদনের যোগানের অনুপাতে জনসাধারণের ক্রয়শক্তি এবং আয়ের ঘাটতি থাকিতে পারে। সেইক্ষেত্রে ক্রয়শক্তির অনুপাতে উৎপাদিত সামগ্রীর যোগান যত বেশী থাকে, ততটাই হইতেছে মুদ্রাসংকোচনের ফাঁক অথবা ব্যয়-সংকোচের ঘাটতি। প্রকৃতপক্ষে মুদ্রাসংকোচন না হইলেও ব্যয়সংকোচন হইতে পারে। ব্যয়সংকোচের কারণ হইতেছে আয়ের ঘাটতি। কিন্তু আয়ের ঘাটতি হইলেও আগেকার বিনিয়োগের ফলস্বরূপ ক্রয়যোগ্য সামগ্রীর যোগান বাজারে বেশী থাকিতে পারে,—সেই অবস্থাকেই আমরা ব্যয়-সংকোচের ফাঁক বলিতে পারি।

পরবর্তী পৃষ্ঠার ৮২নং চিত্রের সাহায্যে আমরা মুদ্রাসংকোচনের ফাঁক বা ব্যয় সংকোচনের ফাঁক (Deflationary Gap) বুঝাইতে পারি। এই চিত্র অনুযায়ী ধরা যাক জাতীয় আয় হইতেছে ১০০০ কোটি টাকা। অথচ সেই টাকার অধিক অংশ বিনিয়োগে ব্যবহৃত না হইয়া শুধু সঞ্চিত হইতেছে এবং ইহাতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে ঘাটতির অথবা সংকোচনের সৃষ্টি হইয়াছে। যে পরিমাণ ব্যয় হইতেছে তাহাতে পূর্ণনিয়োগের স্তরে থাকা সম্ভব হইতেছে না। GF পরিমাণ ব্যয়ের ঘাটতি থাকিয়া যাইতেছে। এই চিত্রে GF পরিমাণ হইতেছে ব্যয়সংকোচনে ফাঁক
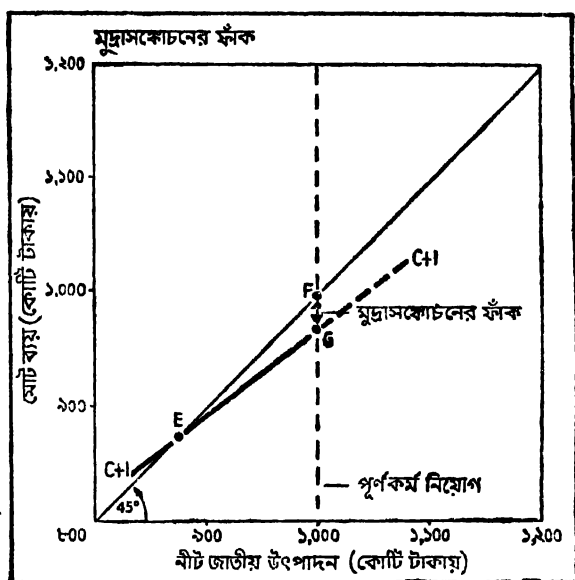
চিত্র নং ৮২

মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল (Effects of Inflation and rising Price-level): আমরা দেখিয়াছি মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হইলে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে এবং মুদ্রাসংকোচনের সৃষ্টি হইলে জিনিসপত্রের দাম কমে। এখন আমরা মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল বিবেচনা করিব।

মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব আমরা দেখিতে পাই দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর। জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যায় বলিয়া ব্যবসায়ীগণ খুব লাভবান হয়। ইহাতে তাহাদের উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িলে বেকার লোকদেরও কাজের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এই সুবিধার অন্য একটি দিক আছে। উৎপাদন বাড়িতে বাড়িতে এমন একটি অবস্থায় আসিতে পারে যখন অতি-উৎপাদন (over-production) হইয়া যাইবে; তখন হঠাৎ জিনিসপত্রের দাম কমিয়া যাইবে, এবং কিছু পরিমাণ লোক বেকার হইয়া পড়িবে। এইভাবেই মুদ্রাস্ফীতির পর মুদ্রাসংকোচন সৃষ্টি হয়। সুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধি যদি পরিকল্পিত উপায়ে হয়, তবে সাধারণ মুদ্রাস্ফীতি (moderate inflation) দেশের উৎপাদন-বৃদ্ধির সহায়ক হয়।

উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব

মুদ্রাস্ফীতির দরুণ ব্যবসায়ীগণ খুব লাভবান হইলেও যাহাদের আয় নির্দিষ্ট

তাহারা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ মুদ্রাস্ফীতির সময় জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যায় অথচ তাহাদের আয় বাড়ে না। পূর্বের মত জিনিসপত্র কেনা তাহাদের পক্ষে আর সম্ভব হয় না। শিক্ষক, কেরানী, সরকারী চাকুরিয়া প্রভৃতি নির্দিষ্ট আয় উপার্জনকারীগণ মুদ্রাস্ফীতির ফলে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। মুদ্রাস্ফীতির আর একটি প্রভাব আমরা দেখিতে পাই পাওনাদার ও দেনাদারের সম্পর্কের উপর। ধরা যাক, একজন লোক মহাজনের নিকট হইতে এমন সময় ১০০ টাকা ধার করিল যখন ইহার মূল্য বেশী, অর্থাৎ তখন জিনিসপত্রেব দাম কম হওয়ায় ১০০ টাকায় অনেক জিনিস কেনা সম্ভবপর। কিন্তু যখন টাকাটা পাওনাদারকে ফেরত দেওয়া হইতেছে তখন ইহার মূল্য কম; অর্থাৎ তখন জিনিসপত্রের দাম বেশী হওয়ায় ১০০ টাকায় কম জিনিস কেনা সম্ভবপর। সুতরাং এই ক্ষেত্রে মহাজন ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। অপরকে টাকা ধার দেওয়ার সময় যদি মুদ্রাস্ফীতি থাকে এবং টাকা ফেরত পাওয়ার সময় যদি মুদ্রাসংকোচন থাকে, তবে মহাজন লাভবান হয় এবং দেনাদার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেখা যাইতেছে, মুদ্রাস্ফীতি দেনাদার এবং পাওনাদারের মধ্যে সম্পর্কের পরিবর্তন করে।

সাধারণ মুদ্রাস্ফীতি উৎপাদন বাড়াইবার পক্ষে সহায়ক হয়

মুদ্রাস্ফীতির সময়ে ব্যবসায়ীগণেব লাভ হয়, নির্দিষ্ট আয় উপার্জনকাবীদের ক্ষতি হয়

মুদ্রাস্ফীতি বৈদেশিক বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে। কোন দেশে যদি রপ্তানিকৃত দ্রব্যগুলির দাম বাড়িয়া যায় এবং তথাপি যদি বিদেশে এইগুলির খুব চাহিদা থাকে, তবে বৈদেশিক বাণিজ্য-ব্যালান্স উন্নত হইবে। কিন্তু জিনিসের দাম বাড়িয়া যাইবার দরুণ যদি বৈদেশিক চাহিদা কমিয়া যায়, তবে বাণিজ্য-ব্যালান্স উন্নত হইবে না। আবার জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যাইবার জন্য যদি বিদেশ হইতে বিকল্প সামগ্রী আমদানি করিয়া অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা করা হয়, তবে হয়ত বৈদেশিক বাণিজ্য-ব্যালান্সে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু এইজন্য যে বাণিজ্য-ব্যালান্স প্রতিকূল হইবেই তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। দেখিতে হইবে দেশীয় জিনিসের তুলনায় বিদেশী জিনিস অপেক্ষাকৃত সস্তা কিনা। তবেই দেশীয় জিনিসের দাম বাড়িলে বিদেশী জিনিসের আমদানি বাড়িবে।

মুদ্রাস্ফীতি বৈদেশিক বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে

যে দেশে মুদ্রাস্ফীতির দরুণ জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া গিয়াছে, সেই দেশের রপ্তানিযোগ্য জিনিসগুলির জন্য যদি বিদেশীদের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক (inelastic) থাকে, তবে, মুদ্রাস্ফীতি সেই দেশের রপ্তানি-উদ্বৃত্ত (export surplus) বা রপ্তানি হইতে আয় বাড়াইয়া দিবে। কিন্তু, যদি সেই দেশের রপ্তানি-সামগ্রীগুলির জন্য বিদেশীদের চাহিদা স্থিতিস্থাপক (elastic) থাকে এবং যদি বিদেশীরা বেশী দাম দিয়া জিনিসগুলি কিনিতে না চায়, তবে মুদ্রাস্ফীতি সেই দেশের রপ্তানি-উদ্বৃত্ত কমাইয়া দিবে।

মুদ্রাস্ফীতির প্রতিকার (Remedies of Inflation) : মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করিবার জন্য এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে যাহাতে জনসাধারণের ব্যয়ের স্পৃহা কমিয়া যায়। কারণ, চাহিদা কমিয়া গেলেই জিনিসপত্রের দাম কমিয়া যাইবে। বিনিয়োগের পরিমাণ যাহাতে আর না বাড়ে সেইজন্য জনগণের ব্যয়ের স্পৃহা বা ভোগের প্রবণতা (Propensity to consume) কমাইলে চলিবে না, বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা যাহাতে সহজলভ্য না হয়, সেই ব্যবস্থাও করিতে হইবে। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করিবার জন্য সরকার সাধারণতঃ, যে ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করেন সেইগুলিকে আমরা তিনভাগে বিভক্ত করিতে পারি। যথা,—সরকারের আয়-ব্যয় সম্পর্কিত ব্যবস্থা (Fiscal measures), দেশের মুদ্রা-প্রচলন সম্পর্কিত ব্যবস্থা (Monetary measures) এবং মুদ্রা-প্রচলনের সঙ্গে জড়িত নয় এমন ব্যবস্থা (Non-monetary measures)।

মুদ্রাস্ফীতির প্রতিরোধের জন্য সরকারের আয়-ব্যয়নীতি (Fiscal Policy for controlling Inflation)—মুদ্রাস্ফীতির প্রতিরোধকল্পে সরকার সর্বদাই চেষ্টা করে এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতে যাহাতে অতিরিক্ত বিনিয়োগ এবং অতিরিক্ত খরচ উভয়ই কমিয়া যায়। কারণ, জনগণের সক্রিয় চাহিদা এবং ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগ-প্রবণতা (inducement to invest) কমিয়া গেলে জিনিসপত্রের দামও কমিয়া আসে। এইজন্য সরকার দেশে নূতন কর স্থাপন করিতে পারে, বর্তমান কর প্রদানের হার বাড়াইয়া দিতে পারে, দেশরক্ষা ব্যতীত অন্যান্য খরচের পরিমাণ কমাইয়া দিতে পারে এবং জনসাধারণ, শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যমূলক ব্যাংকগুলি হইতে ঋণগ্রহণ করিয়া ব্যবসায়ে সেই টাকা খাটানো বন্ধ করিতে পারে।

করবৃদ্ধি এবং ব্যয়সংকোচ

মুদ্রাস্ফীতির সময় সাধারণতঃ প্রগতিশীল করগুলির (Progressive Taxes) হার বাড়াইয়া দেওয়া হয়। আয়কর, ব্যয়কর, অতিরিক্ত মুনাফা কর প্রভৃতি মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে বিশেষ কার্যকর হয়। অধ্যাপক কলিন ক্লার্ক মনে করেন, জাতীয় আয়ের ২৫ ভাগের বেশী যদি কর ধার্য করা হয়, তবে উৎপাদকদের উৎপাদন বাড়াইবার অনুপ্রেরণা (incentives) নষ্ট হইয়া যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করার পরিবর্তে ইহা নূতন করিয়া মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করে। তখন শ্রমিকরাও বেশী মজুরি দাবি করে এবং মালিকরাও শ্রমিকদের মজুরি বাড়াইয়া দেয় এবং বাড়তি উৎপাদন-ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য জিনিসপত্রের দাম বাড়াইয়া দেয়। ইহাতে মুদ্রাস্ফীতি সম্প্রসারিত হয়। কিন্তু কলিন ক্লার্কের এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, করধার্যের সীমা সম্পর্কে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। জাতীয় আয়ের শতকরা ২৫ ভাগের কমের উপরেও যদি কর ধার্য করা হয়, তবু মুদ্রাস্ফীতি হইতে পারে, আবার ইহার বেশী ধার্য করা হইলেও মুদ্রাস্ফীতি নাও হইতে পারে। তাহা ছাড়া সরকারের উদ্যোগে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের (Compulsory Saving) নীতি চালু

বাধ্যতামূলক সঞ্চয়

হইলে মুদ্রাস্ফীতির সময় জনগণকে তাহাদের বেতন বা মজুরি হইতে যে টাকা সঞ্চয় করিতে বাধ্য করা হইবে সেই টাকা দেশে মুদ্রাসংকোচনের সময় তাহাদের ফেরত দিলে সুফল লাভ হইবে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটেনে এবং এমন কি আমাদের দেশেও সাময়িকভাবে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের নীতি প্রবর্তিত হইয়াছিল। কিছুদিন পূর্বে ভারতেও বাধ্যতামূলক আমানত নীতি (Compulsory Deposit Scheme) এবং বার্ষিক সঞ্চয় পরিকল্পনা (Annuity Deposit Scheme) চালু ছিল। বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের ফলে ভোগের প্রবণতাকে দমিত করা হয়, যাহাতে ইহা ব্যয়াধিক্যের ফাঁক না ঘটাইতে পারে। অনেক সময় সরকার মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করার জন্য Deferred Pay System বা পরে অর্থপ্রদান কিংবা বেতনের কিছু অংশ প্রদান করার নীতি অবলম্বন করেন। সাধারণতঃ, মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা প্রশমিত হইলে এই জাতীয় অর্থপ্রদান করা হয়। যে সমস্ত সরকারী ঋণ মুদ্রাস্ফীতির সময়ে সরকারের পরিশোধ করার কথা, অথবা যেগুলির উপর সুদ দেওয়ার কথা, সরকার সেই ঋণগুলির ক্ষেত্রে টাকা পরিশোধ করার অথবা সুদ দেওয়ার সময়ের মেয়াদ বাড়াইয়া দিতে পারে। ইহাকে Debt Management Policy বলা হয়। অনেকের মতে দেশে মুদ্রাস্ফীতি হইলে বৈদেশিক মুদ্রার তুলনায় সেই দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার বাড়াইয়া (Overvaluation) আমদানি খরচ কমানো যাইতে পারে এবং দেশের জিনিসপত্রের দামও কমানো যাইতে পারে। কিন্তু, এই যুক্তি সব সময়ে গ্রহণ করা চলে না। কারণ, ইহাতে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতির সৃষ্টি হয়।

মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধকল্পে মুদ্রা-নিয়ন্ত্রণ নীতি (Monetary Policy for controlling Inflation)—মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। বিভিন্ন ব্যাংক যাহাতে বেশী ধার না দেয়, সেইজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার (Bank Rate) বাড়াইতে পারে। সুদের

ব্যাংক রেট বৃদ্ধি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক সিকিউরিটি বিক্রয়

হার বাড়িয়া গেলে জনসাধারণ যে শুধু কম টাকা ধার করিবে তাহা নয়, এই সুযোগে জনসাধারণ সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা করিবে। অনেক সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য বাণিজ্যমূলক ব্যাংক এবং জনসাধারণের নিকট সিকিউরিটি বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত টাকা আটক করিয়া রাখে। ইহাকে ব্যাংকের "Open Market Sales Policy" বলে।

তাহা ছাড়া, বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Banks) কেন্দ্রীয় ব্যাংকে তাহাদের আমানতের যে রিজার্ভ সর্বদা জমা রাখে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতির সময় তাহা বাড়াইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে প্রত্যেক বাণিজ্যমূলক ব্যাংককে ইহার মোট নগদ রিজার্ভের শতকরা ৩০ ভাগ মজুত (Liquidity ratio) [illegible]

নগদ রিজার্ভের হার এইভাবে বাড়াইয়া দিলে ব্যাংকগুলি জনসাধারণকে এবং ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলিকে বেশী ঋণ দিতে পারে না; ইহাতে বিনিয়োগের পরিমাণ কমিয়া যাইতে পারে। এই ব্যবস্থার নাম "Variable Reserve Ratio"। মুদ্রাস্ফীতির প্রতিরোধ-কল্পে আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ইহার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। শুধু তাহাই নহে, কোন বিশেষ ধরনের ঋণ অথবা কোন বিশেষ জিনিস বন্ধকের বিপক্ষে বাণিজ্যমূলক ব্যাংকগুলি যাহাতে ঋণ প্রদান না করে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেইজন্য ইহাদের আগেই নির্দেশ প্রদান করিয়া রাখিতে পারে। এই ধরনের নৈতিক প্রণোদনকে "Qualitative Credit Control Method" বলে। আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অনেক সময় দেখা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন ব্যাংক রেট্ বাড়াইয়া অথবা সিকিউরিটি বাড়াইয়া কিছুতেই মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করিতে পারে না, তখন ইহা বাণিজ্যমূলক ব্যাংকগুলি প্রদত্ত বিশেষ ধরনের ঋণের উপর বাধানিষেধ আরোপ করে অথবা বিশেষ কতিপয় জিনিসের (যেমন, খাদ্য অথবা অন্যান্য অত্যাবশ্যক ভোগসামগ্রী) বিপক্ষে তাহাদের ঋণ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিতে পারে। এই ব্যবস্থাকে Selective Method of Credit Control" বলা হয়। সরকার অনেক ক্ষেত্রে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ-প্রথা চালু করিয়াই অর্থাৎ সর্বোচ্চ অথবা সর্বনিম্ন দাম বাঁধিয়া দিয়া মুদ্রাস্ফীতি প্রতক্ষ্যভাবে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিতে পারে। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে এককভাবে মুদ্রা-নিয়ন্ত্রণ নীতি কখনই মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করিতে পারে না। কারণ ব্যাংক রেট বাড়াইলেই অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি কর্তৃক মুদ্রানিয়ন্ত্রণের অন্যান্য পদ্ধতিগুলি প্রবর্তিত হইলেই যে সেইগুলি সর্বদা কার্যকর হইবে তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। কারণ এইগুলির কার্যকারিতা টাকার বাজারের প্রকৃতির (Nature of the Money Market) উপর এবং টাকার বাজার ও মূলধন বাজারের উপর (Capital Market) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। আইন প্রণয়ন করিয়া বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং প্রথার প্রচলন, উৎপাদনের মাত্রা নির্ধারণ এবং ফাটকা বাজার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে সরকার মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা অনেকটা কমাইতে পারে।

মুদ্রানিয়ন্ত্রণের অন্যান্য পদ্ধতি

উপসংহার: মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করার জন্য মুদ্রা-নিয়ন্ত্রণ নীতি (Monetary Policy) এবং সরকারের আয়-ব্যয় নীতির (Fiscal Policy) সংমিশ্রণ অথবা যৌথ প্রয়োগ প্রয়োজন। সরকারের ঋণদান নীতি ও ঋণ পরিশোধের নীতি, কর-নীতি প্রভৃতি তখনই সফল হয় যখন এই উদ্দেশ্যগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকও মুদ্রা-নিয়ন্ত্রণ-নীতিকে নমনীয় (flexible) করে।

মুদ্রা-সম্পর্কিত নীতি (Monetary Policy): আধুনিক রাষ্ট্রে অর্থব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও তাহাদের কার্যাবলী সম্যকরূপে বুঝা যাইবে না, যদি না মুদ্রা-সম্পর্কিত নীতির উদ্দেশ্যাবলীর পূর্ণ আলোচনা হয়। এই সকল উদ্দেশ্যগুলি

পরিবর্তনশীল। বর্তমানে অর্থনৈতিক কাঠামোর যেসব কার্যাবলী দেখা যায় তাহাদের সূচনা বহু আগেই হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যাবলীকে যদি ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া বিচার করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে কোন কোন ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে আলাদাভাবে কোনও মুদ্রা-সম্পর্কিত নীতিরও কোন দরকার নাই। কারণ অর্থের যোগান দেশের চাহিদা এবং প্রয়োজনের সহিত স্বাভাবিকভাবেই যুক্ত হইবে। ইহার জন্য বিশেষ কোন পরিচালন ব্যবস্থার দরকার নাই। দ্বিতীয়ত, অর্থের যোগান স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণাধীন, এইক্ষেত্রে স্বর্ণমান এবং বাণিজ্যিক ঋণ-নীতি (Commercial Loan Theory) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় মতবাদে দেখা যায় যে অর্থের মূল কাজই হইল নিরপেক্ষতা রক্ষা করা, মূল্যমান নির্দেশ করা এবং বিনিময়ের মাধ্যম রূপে কাজ করা। চতুর্থ মতবাদ হইল এই যে অর্থ পরিচালন স্বয়ংক্রিয় নহে এবং শুধু আর্থিক ব্যবস্থার সাহায্যে স্থায়ী মূল্যস্তর লাভ করা যায় না। ইহার আসল উদ্দেশ্য হইল একটি স্থায়ী মূল্যস্তর ও উচ্চ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। স্বয়ংক্রিয় বিনিময় এবং মূল্য-ব্যবস্থার প্রতি প্রাচীন অর্থবিজ্ঞানীগণ যে আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই আস্থা দেখান নাই। আধুনিক রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধানে আর্থিক এবং সরকারী রাজস্ব-নীতিই একমাত্র সহায়ক।

মুদ্রা-সম্পর্কিত নীতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ

স্বর্ণমানে মুদ্রানীতি (Gold Flow Mechanism and Monetary Policy): স্বর্ণমান বলিতে আমরা বুঝি স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন, অথবা এমন কাগজী মুদ্রার প্রচলন, যাহার বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অথবা মুদ্রা-কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে নির্দিষ্ট হারে সমপরিমাণ মূল্যের স্বর্ণ পাওয়া যায়। যখন দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকে, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি নির্দিষ্ট দামে স্বর্ণ কেনাবেচা করে এবং স্বর্ণের আমদানি ও রপ্তানির উপর কোন বাধানিষেধ আরোপ করে না, ইহাতে মুদ্রার বিনিময়-হারে (exchange rate) স্থিরতা বজায় থাকে। স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে দেশের মোট টাকার পরিমাণ স্বর্ণের মোট যোগানের উপর নির্ভর করে। যখন স্বর্ণের পরিমাণ বাড়িয়া যায়, তখন টাকার যোগানও বাড়িয়া যায়, এবং যখন স্বর্ণের পরিমাণ কমিয়া যায়, তখন টাকার যোগানও কমিয়া যায়। স্বর্ণমানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার স্বয়ংক্রিয়তা। যখনই দেশে স্বর্ণের আগমন হয়, তখনই মুদ্রার পরিমাণ স্বয়ংক্রিয় ভাবে বাড়ে এবং যখন দেশ হইতে স্বর্ণের নির্গমন হয় তখনই মুদ্রার পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কমিয়া যায়। স্বর্ণমান চালু রাখিতে হইলে এই নিয়ম পালন করিতে হয়। অর্থাৎ, স্বর্ণের নির্গমন হইবার সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রাসংকোচন এবং স্বর্ণের আগমন হইবার সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রার সম্প্রসারণ করিতে হয়।

বাণিজ্যিক ঋণ-নীতি (The Commercial Loan Theory): স্বর্ণমানে যেরূপ অর্থের যোগান স্বর্ণের যোগানের উপর নির্ভরশীল, সেইরূপ বাণিজ্যিক ঋণ-তত্ত্বে অর্থের যোগান দ্রব্যের যোগানের উপর নির্ভরশীল, কারণ অর্থের পরিবর্তেই দ্রব্য পাওয়া

যায়। যে সকল দ্রব্য স্বল্পকালীন ঋণ লইয়া প্রস্তুত করা হয়, তাহার পরিমাণ প্রায় সামগ্রিক বাণিজ্যের বা ব্যবসায় পরিমাণের সমান, ইহাই আদর্শ অর্থের যোগান। এই নীতিতে Say এবং Mill-এর মতবাদের আংশিক প্রভাব দেখা যায়। বাণিজ্যিক কাগজগুলির ডিস্কাউন্ট এবং পুনঃ-ডিস্কাউন্ট দ্বারা এই অর্থের যোগান হইয়া থাকে।

মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা (Price Stabilization as an objective of Monetary Policy): মুদ্রা-সম্পর্কিত নীতির লক্ষ্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় লক্ষ্য হইল মূল্যস্তরের স্থিরতা বজায় রাখা। যদি অর্থের সাহায্যেই মূল্য নির্ধারণ করিতে হয়, তাহা হইলে অর্থের একটি স্থায়ী পরিমাপ থাকা দরকার, যেমন দূরত্ব মাপিতে গেলে গজ, মাইল ইত্যাদি স্থায়ী পরিমাপের দরকার হয়। মুদ্রাস্ফীতি এবং মুদ্রা সংকোচনের নিদারুণ প্রভাবই একটি স্থায়ী অর্থ-মূল্যের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু আমরা জানি যে, দামস্তরে মৃদু বৃদ্ধি (a slowly rising price level) এবং দামস্তরে মৃদু পতন (a slowly falling price level) স্থায়ী মূল্যস্তরের ন্যায়ই দরকারী। কেইন্‌সের মতে যেসব অর্থনীতিতে বেকারত্ব প্রবল, সেইস্থানে স্থায়ী দামস্তর অপেক্ষা দামস্তরে মৃদু বৃদ্ধিই আর্থিক নীতি হওয়া উচিত। অপরপক্ষে, উন্নতিশীল অর্থনীতিতে দামস্তরে মৃদু পতন হইবে আদর্শ নীতি। কারণ ইহার ফলে সমাজের সকল সম্প্রদায়ই অর্থনৈতিক উন্নতির সুবিধা ভোগ করিতে পারে। তবুও বলা যায় যে, মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতার প্রতি সকলের আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। কারণ মূল্যস্তরের পরিবর্তনের ফলে যে সংকট দেখা যায়, তাহাই এই নীতি-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করাইয়া দেয়।

মূল্যস্তরের স্থিরতা বজায় রাখিবার নীতিটির বিরুদ্ধে তিনটি সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমত, এই নীতিটির অসারতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছে, কোন্ মূল্যস্তর স্থায়ী করা হইবে? খুচরা, সামগ্রিক, অথবা গড় মূল্যস্তর? একটি বিশেষ সূচকসংখ্যা অনুযায়ী মূল্যস্তর স্থায়ী করা হয়, সাধারণ মূল্য অপেক্ষা পরস্পর সম্বন্ধীয় মূল্যই দেশের অর্থনীতির উপর অধিক প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং মুদ্রাসম্পর্কিত নীতির উদ্দেশ্য হইল এই সম্বন্ধযুক্ত মূল্যস্তরকে স্থায়ী করা। দ্বিতীয়ত, দামস্তর স্থির থাকিলে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না, কারণ ইহাতে মুনাফার পরিমাণ কমিয়া যায়। তৃতীয়ত, ভোগকারীদের চাহিদানুসারে মূল্যস্তরের পরিবর্তন হয়। এইরূপ পরিবর্তনশীল মূল্যস্তরকে স্থায়ী করার অর্থ হইতেছে ভোগকারীদিগের পছন্দে হস্তক্ষেপ, ইহা কোন নীতিরই উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

মূল্যস্তরের স্থিরতা বজায় রাখার নীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা

নিরপেক্ষ মুদ্রাসম্পর্কিত নীতি (Neutral Monetary Policy): অধ্যাপক হায়েকের মতে মুদ্রানীতির মূল উদ্দেশ্য হইবে অর্থের নিরপেক্ষতা, অর্থাৎ অর্থব্যবস্থা এরূপ হওয়া উচিত যে, অর্থের দ্বারা যেন অর্থনৈতিক শক্তিগুলি অর্থাৎ

উৎপাদন দক্ষতা এবং পদ্ধতি, আসল ব্যয় অথবা ভোগকারীর পছন্দ-প্রভাবিত না হয়। এইসব লোকদিগের মতে অর্থ শুধু নিষ্ক্রিয় বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করিবে। উৎপাদন, বিনিয়োগের পরিমাণ প্রভৃতিতে পরিবর্তন আসিলে অর্থের পরিমাণে আপনা-আপনিই পরিবর্তন আসিবে,—আর্থিক নীতির ইহাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। উৎপাদন ক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে অর্থাৎ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িলে মূল্য কমিবে এবং উৎপাদনী ক্ষমতা কমিলে মূল্যবৃদ্ধি পাইবে। আর্থিক কর্তৃপক্ষ এইভাবে নীতি পরিচালন করিলে অর্থের নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে পারিবে।

মূল্যস্তরের হ্রাস-বৃদ্ধি যদি দেশের উৎপাদন ক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত সংযোজিত হয়, তাহা হইলে দ্রব্যস্তরের পারস্পরিক বিনিময়-হার অপরিবর্তিত থাকিয়া যায়। অধ্যাপক হ্যান্সেন এই মতবাদটিকে কঠোরভাবে সমালোচনা করিয়াছেন।

পূর্ণনিয়োগ ও সর্বোচ্চ উৎপাদন (Full employment and maximum output): কেইন্সের মতানুসারে সমাজে যদি ঠিকভাবে ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে পূর্ণনিয়োগ অর্জিত হয় এবং ইহার ফলে সর্বোচ্চ উৎপাদন সম্ভব হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত দেশে অব্যবহৃত সম্পদ থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া সেই অব্যবহৃত সম্পদগুলির যথোপযুক্ত ব্যবহার করিয়া উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভবপর। এই উদ্দেশ্যে সরকার নূতন টাকার সৃষ্টি করিতে পারে।

লর্ড কেইন্সের মতে শুধু আর্থিক বা মুদ্রাসম্পর্কিত নীতির সাহায্যে দেশে পূর্ণনিয়োগের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নহে, বরং তাঁহার মতে রাজস্ব-নীতি বা Fiscal Policy এই ক্ষেত্রে অধিকতর ফলপ্রদ হয়। কিন্তু গোল্ডেনউইজার* (Goldenweiser) মনে করেন, আর্থিক বা মুদ্রাসম্পর্কিত নীতির সহিত কর্মসংস্থানের এমন কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই যে, পূর্ণকর্মসংস্থান অর্জনই মুদ্রাসম্পর্কিত নীতির একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে। আর্থিক নীতির শুধু একটিমাত্র উদ্দেশ্য নাই; ইহার সাধারণ উদ্দেশ্য হইতেছে মুদ্রার পরিমাণ, প্রাপ্তি এবং ব্যয়নিয়ন্ত্রণ করিয়া অর্থনৈতিক অবস্থার স্থিতি-সাধন করা এবং কল্যাণের সৃষ্টি করা।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic Growth): আধুনিককালে মুদ্রা-সম্পর্কিত নীতির একটি উদ্দেশ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাহা

* "The relationship between monetary policies and employment is not sufficiently direct to make full employment a feasible guide for current credit policy. No simple guide can be adopted as an adequate basis for monetary policy. The broad objective may be stated to be to contribute through the regulation of the volume, availability and cost of money to the maintenance of stable economic conditions and a rising level of economic well-being." —*Goldenweiser; Monetary Management.*

হইতেছে, উন্নত দেশের ক্ষেত্রে মুদ্রাসম্পর্কিত নীতি এমনভাবে অনুসৃত হওয়া উচিত যাহাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উচ্চহার (High rate of growth) বজায় থাকে এবং অনগ্রসর দেশের ক্ষেত্রে যেন অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি উচ্চহার অর্জিত হয়। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দুইটি বিশেষ ভূমিকা আছে। একটি হইতেছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার দ্রুত বৃদ্ধি করার জন্য কৃষি, শিল্প, রপ্তানি-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযুক্ত অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া। ইহাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের Promotional Role বলা হয়। অপরটি হইতেছে দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা (economic stability) বজায় রাখিবার জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক নীতি অবলম্বন করা। ইহাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের Regulatory Role বলা হয়।

Exercise

1. What do you mean by the value of money ? Why does the value of money fluctuate ? (অর্থের মূল্য বলিতে কি বুঝ ? অর্থের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ কি ?) (২৯১-২৯২ পৃষ্ঠা ; ২৯৭-৩০০ পৃষ্ঠা)

2. Write a short note on Inflation.
(মুদ্রাস্ফীতির উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।) (৩০৪--৩০৭ পৃষ্ঠা)

3. How can we measure changes in the value of money ? Point out the difficulties of such measurement.
[আমরা টাকার মূল্যের পরিবর্তন কিভাবে পরিমাপ করিতে পারি ? এই জাতীয় পরিমাপের অসুবিধাগুলি দেখাও।] (২৯২-২৯৬ পৃষ্ঠা)

4. Write short notes on Supperssed Inflation and Open Inflation.

(টাকা মুদ্রাস্ফীতি এবং খোলা মুদ্রাস্ফীতির উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।) (৩০৬-৩০৭ পৃষ্ঠা)

5. Write a short note on Index Number.
(সূচক সংখ্যার উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।)

6. Write short note on Inflation, Pure and Repressed.

(প্রকৃত এবং চাপা মুদ্রাস্ফীতিব উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।) (৩০৬-৩০৭ পৃষ্ঠা)

7. Critically discuss the Quantity Theory of Money.
[অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি আলোচনা কর এবং ইহার সমালোচনা কর।] (২৯৭-৩০৮ পৃষ্ঠা)

8. Explain the nature of Inflation. What are its effects ? How can Inflation be controlled ?
[মুদ্রাস্ফীতির স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ইহার কি কি প্রভাব ? মুদ্রাস্ফীতি কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায় ?] (৩০৪-৩০৫ পৃষ্ঠা ; ৩০৭-৩০৯ পৃষ্ঠা ; ৩১৩-৩১৭ পৃষ্ঠা

9. Discuss the objectives of Monetary Policy.
[মুদ্রা সম্পর্কিত নীতির উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা কর।] (৩১৯-৩২১ পৃষ্ঠা)

10. **Distinguish between Demand-full Inflation and Cost-Push Inflation. How Can inflation be controlled by Fiscal Policy and Monetary Policy !**
[চাহিদা-জনিত মুদ্রাস্ফীতি এবং খরচ-জনিত মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে পার্থক্য দেখাও। সরকারের আয়-ব্যয় নীতি এবং মুদ্রাসম্পর্কিত নীতি দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় ?
(৩০৭-৩০৯ পৃষ্ঠা ; ৩১৫-৩১৭ পৃষ্ঠা)

11. **Write short notes on :**
(a) **Cambridge Cost-balance,** (b) **Inflationary Gap,** (c) **Deflationary Gap.**
[সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :—(ক) কেমব্রিজের অর্থ-পরিমাণ সমীকরণ, (খ) মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক, (গ) মুদ্রাসংকোচনের ফাঁক।] (৩০৩-৩০৪ পৃষ্ঠা ; ৩০৯-৩১১ পৃষ্ঠা ; ৩১২-৩১৩ পৃষ্ঠা)

দ্বাবিংশ অধ্যায় | আয় ও নিয়োগ তত্ত্ব (The Theory of Income and Employment)

নিয়োগ এবং জাতীয় আয়ের পরিমাণ কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জীবনযাত্রার মানের পর্যায় সূচিত করে। জাতীয় আয় বাড়িয়া গেলে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়। অনুরূপভাবে জাতীয় আয় কমিয়া গেলে দেশ ক্রমশঃই অর্থনৈতিক অবনতির পথে অগ্রসর হয়। জাতীয় আয় এবং নিয়োগ একই পথে চালিত হয়। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানীগণও নিয়োগ সম্পর্কে একটি তত্ত্ব দিয়াছিলেন। কিন্তু কেইন্‌স প্রমুখ অর্থবিজ্ঞানীগণের মতে ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব সামগ্রিকভাবে দেশের আয় ও নিয়োগের কোন ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারে না।

আধুনিক আয় এবং নিয়োগ তত্ত্বটি লর্ড কেইন্‌স্ তাঁহার *"General Theory of Employment, Interest and Money"* বইয়ে আলোচনা করিয়াছেন।

নিয়োগ সম্পর্কে ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব (Classical Theory of Employment) **:** ফরাসী অর্থবিজ্ঞানী জে. বি. স্তে (J. B. Say) প্রচার করিয়াছিলেন যে, কোন জিনিসের যোগান স্বাভাবিকভাবেই ইহার চাহিদার সৃষ্টি করে ("Supply creates its own demand."); অর্থাৎ সমাজে মোট যোগান সর্বদাই মোট চাহিদার সমান থাকে। সুতরাং যোগান ও চাহিদা পরস্পর সমান হইবেই। আবার যোগান যদি চাহিদার সমান হয় তবে আর কর্মনিয়োগের অভাব থাকে না। সেইজন্যই জে. বি. স্তে এবং তাঁহার অনুগামী অন্যান্য সমসাময়িক অর্থবিজ্ঞানীগণ মনে করিতেন যে, দেশে সর্বদাই পূর্ণ কর্মনিয়োগ বা "Full Employment" বজায় থাকে। তাঁহাদের মধ্যে সাধারণ অতি-উৎপাদন (General Production) অথবা

বেকার অবস্থার সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। তাঁহাদের মতে যদি কখনও কর্মনিয়োগের অভাব থাকে, তবে তাহা একান্তই সাময়িক অথবা দুর্ঘটনাজনিত (Frictional Unemployment) এবং ইচ্ছাকৃত বেকার অবস্থা (Voluntary Unemployment) বলিয়া ধরিতে হইবে। চাহিদার পরিবর্তন, শ্রমের গতিশীলতার অভাব, শিল্প-কাঠামোর পরিবর্তন প্রভৃতির জন্য সংঘাতজনিত বেকার অবস্থা দেখা যায়। যাহারা প্রচলিত মজুরি কিংবা তাহা হইতে কম মজুরি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক তাহাদের ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত বেকার অবস্থার সৃষ্টি হয়।

ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে সংঘাতজনিত ও ইচ্ছাকৃত বেকার অবস্থা

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে যোগান নিজ হইতেই ইহার চাহিদার সৃষ্টি করে। ইহার ফলে সামগ্রিক চাহিদা এবং সামগ্রিক যোগান পরস্পরের সমান হয়। যখন উৎপাদনের উপাদান নিয়োগ করা হয় তখন একদিকে যেমন উৎপাদন হয়, অপরদিকে সেই প্রকার উৎপাদনের উপাদানকে যে-মূল্য দেওয়া হয়, তাহা দ্বারা চাহিদারও সৃষ্টি হয়। বাজারে যাহাই উৎপাদিত হয় তাহা বিক্রয় করিতে কোন অসুবিধা হয় না; কারণ কোন জিনিস উৎপাদিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার জন্য চাহিদার সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে বলা যায়, লোকে যাহাই আয় করে তাহা এমনভাবে ব্যয়িত হয় যে উৎপাদনের সব উপাদানই নিয়োজিত হইয়া থাকে। অবশ্য লোকে যাহা আয় করে তাহার সবটাই যদি ব্যয়িত না হয়, তবে কিছু সঞ্চয়ের সৃষ্টি হইতে পারে এবং তাহাতে চাহিদার ঘাটতি দেখা দিতে পারে, এই যুক্তির বিরুদ্ধে ক্ল্যাসিক্যাল লেখকগণ বলেন, সঞ্চয়ের ফলে ব্যয় কিংবা নিয়োগের কোন বিঘ্ন ঘটে না। কারণ যাহা সঞ্চয় হয় তাহা বিনিয়োগ-দ্রব্য ক্রয়ের জন্য খরচ করা হয়। সুদের হারের পরিবর্তনের মাধ্যমে সেই সঞ্চয় (Saving) এবং বিনিয়োগের (Investment) সমতা রক্ষিত হয়। যদি সঞ্চয় বেশী হয়, তবে সুদের হার কমিবে এবং তাহাই আবার পরবর্তী স্তরে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইবে এবং সঞ্চয়ের পরিমাণ কমাইবে যতক্ষণ পর্যন্ত সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ পরস্পরের সমান না হয়।

নিয়োগতত্ত্বে সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগানের ভূমিকা

ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব অনুযায়ী কত লোকের জন্য নিয়োগের ব্যবস্থা হইবে তাহাও সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগানের সমতার দ্বারা স্থির হয়। নিম্নের চিত্রে ইহা দেখানো হইল।

যখন নিয়োগের পরিমাণ OP হইতে কম তখন সামগ্রিক চাহিদা-রেখা (AD) সামগ্রিক যোগান-রেখার (AS) বাঁদিকে থাকে। ইহার ফলে সামগ্রিক চাহিদা-মূল্য সামগ্রিক যোগান-মূল্য অপেক্ষা বেশী থাকে এবং নিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। আবার যখন নিয়োগের পরিমাণ OP অপেক্ষা বেশী হয়, তখন সামগ্রিক চাহিদা রেখা সামগ্রিক যোগান রেখার ডানদিকে থাকে। এবং ইহার ফলে পুনরায় নিয়োগের

পরিমাণ কমিতে থাকিবে এবং কমিয়া OP পরিমাণে দাঁড়াইবে। যদি সামগ্রিক চাহিদা রেখা AD″ দ্বারা সূচিত হয়, তবে নিয়োগের পরিমাণ হইবে OP′। দেখা যাইতেছে সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগান নিজেদের মধ্যে নিয়োগের পরিমাণ স্থির করে।
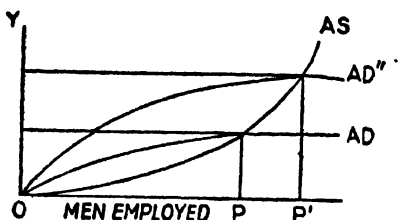
চিত্র নং ৮৩

পূর্ণ প্রতিযোগিতায় মজুরির হার এমন একটা স্তরে নিরূপিত হয় যেখানে শ্রমের যোগান ও চাহিদা পরস্পরের সমান হয়। এইভাবে নিরূপিত মজুরির হারে সব শ্রমিকেরই নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। তখন যত শ্রমিক কাজ করিতে চায় তাহাদের সকলকে নিয়োগ করা উৎপাদকের দিক হইতে লাভজনক। অধ্যাপক পিগু (Pigou) ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।*

পূর্ণ প্রতিযোগিতায় মজুরি নিরূপণ এবং নিয়োগের উপর ইহার প্রভাব

ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে মজুরির হারের পরিবর্তনশীলতার (flexibility in the rate of wages) সাহায্যে সকল শ্রমিকের নিয়োগ এবং সুদের হারের পরিবর্তনশীলতার (flexibility in the rate of interest) মাধ্যমে সঞ্চয় ও বিনিয়োগে সমতা রক্ষা করিয়া সমুদয় সম্পদ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে যে বেকার অবস্থার সৃষ্টি হয় না তাহা নহে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে সংঘাতজনিত বেকার অবস্থা এবং ইচ্ছাকৃত বেকার অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু ইহা ছাড়াও বহুলোক কর্মহীন জীবনযাপন করিতে পারে; ইহার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানীগণ বলেন যে, সংস্কারের দিক হইতে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ, শ্রমিকসংঘগুলি কর্তৃক অনুসৃত কার্যাবলী (যথা যৌথ দরকষাকষি), মজুরি আইন, প্রভৃতি পূর্ণপ্রতিযোগিতার ভারসাম্য স্থাপনকারী পদ্ধতি (equilibrating mechanism under perfect competition) কার্যকর হয় না। যদি যৌথ দরকষাকষি (collective bargaining) এবং সর্বনিম্ন মজুরি আইন (Minimum Wages Act) না থাকিত, তবে প্রতিযোগিতার চাপে মজুরির হার কমিত এবং শিল্পপতিদের পক্ষেও অধিক লোক নিয়োগ করা সম্ভবপর হইত। সাধারণভাবে মজুরির হার কমাইলেই নিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়া যায় ইহাই ক্ল্যাসিক্যাল লেখকগণের যুক্তি। শ্রমিকগণ বেশী মজুরি দাবি করে বলিয়াই বেকার অবস্থার সৃষ্টি হয়।

মজুরির হার এবং নিয়োগের মধ্যে সম্পর্ক ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব অনুযায়ী মজুরির হার কম হইলে নিয়োগ বাড়ে

* "With perfectly free competition······there will always be at work strong tendency for wage rate to be so related that everybody is employed" *Pigou,—Theory of Unemployment.*

ক্ল্যাসিক্যাল লেখকদের এই যুক্তির সারবত্তা সম্বন্ধে বহুদিন যাবৎ সন্দেহ পোষণ করা হইলেও কেইন্‌স-ই সর্বপ্রথম এই যুক্তির প্রতিবাদ করেন। প্রকৃত মজুরির হার (real wage rate) কমিয়া গেলে শ্রমিকরা কাজ করিতে রাজী থাকে না, এই যুক্তি কেইন্‌স গ্রহণ করেন না। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেখা যায় যে, যদি প্রকৃত মজুরি কমিয়া যায় তবুও শ্রমিকরা কাজ গ্রহণ করিতে অরাজী থাকে না; কিন্তু ইহাও ঠিক যে শ্রমিকরা আর্থিক মজুরির হার কমিয়া গেলে (a cut in money wage rate) আপত্তি করিয়া থাকে। কেইন্‌স ইহাকে টাকার মায়া (money illusion) আখ্যা দিয়াছেন। কেইন্‌সের মতে সামগ্রিকভাবে আর্থিক মজুরির হার কমাইয়া বেকার সমস্যার সমাধান করা সম্ভবপর না হওয়াই স্বাভাবিক। আর্থিক মজুরির হার কমিয়া গেলে জিনিসপত্রের জন্য সামগ্রিক চাহিদার ঘাটতি (deficiency in demand) দেখা যায়। কেইন্‌স বিশ্বাস করেন, নিয়োগ মূলতঃ সমাজের সামগ্রিক কার্যকর চাহিদার (aggregate effective demand) উপর নির্ভরশীল। যদি সমাজের ব্যয় বেশী হয়, তবে বুঝিতে হইবে সামগ্রিক কার্যকর চাহিদার পরিমাণ বাড়িয়াছে; তখন স্বভাবতঃই উৎপাদন বাড়িবে এবং সেই সঙ্গে নিয়োগের সুযোগও বাড়িবে। মোট ব্যয়ের অপর্যাপ্তি বা ঘাটতির (deficiency) জন্যই বেকার অবস্থার সৃষ্টি হয়। চাহিদার ঘাটতি হওয়ার অর্থ হইতেছে, আয় যে হারে বাড়ে, ভোগ-ব্যয় (consumption expenditure) সেই হারে বাড়ে না। এই ব্যয়ের ঘাটতি দূর করা যাইতে পারে অধিক বিনিয়োগ ব্যয়ের (investment expenditure) দ্বারা। কিন্তু বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ-ব্যয় ব্যবসায়ীদের লাভ-ক্ষতির ধারণা বা আশার উপর (Expectations of Profit) নির্ভরশীল। বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িলে নিয়োগের পরিমাণ বাড়ে এবং বিনিয়োগের পরিমাণ কমিলে নিয়োগের পরিমাণ কমে। মজুরি-হার হ্রাস করিলে নিয়োগের পরিমাণ আদৌ বাড়িবে কিনা তাহা নির্ভর করে ভোগ-ব্যয় এবং বিনিয়োগ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইহার কি প্রভাব তাহার উপর। যদি বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ব্যয় বাড়াইয়া নিয়োগ বাড়াইবার জন্য আগ্রহ না দেখা যায়, তবে কেইন্‌সের মতে সরকারকে এই ক্ষেত্রে অগ্রণী হইতে হইবে। এই ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষতিপূরণমূলক আয়-ব্যয় নীতি (Compensatory Fiscal Policy) বিশেষ ভূমিকা অবলম্বন করে।

কেইন্‌স কর্তৃক এই যুক্তি অস্বীকার

আর্থিক মজুরির মায়া

নিয়োগের আধুনিক তত্ত্ব (Modern Theory of Employment): নিয়োগের আধুনিক তত্ত্ব কেইন্‌সীয় অর্থশাস্ত্রের (Keyensian Economics) উপর ভিত্তিশীল। কেইন্‌সের মতে সাধারণতঃ কোন দেশেই আমরা পূর্ণ নিয়োগ (full employment) দেখিতে পাই না। সব দেশেরই অর্থনৈতিক নীতি এইরকম হওয়া উচিত যেন ইহার সাহায্যে পূর্ণ নিয়োগ অর্জন করা যায় এবং তাহা বজায় রাখা যায়। কেইন্‌সের মতে নিয়োগ নির্ভর করে সমাজের সামগ্রিক কার্যকর চাহিদার

(aggregate effective demand) উপর। জাতীয় আয় বাড়িয়া যাওয়ার অর্থই হইতেছে কার্যকর চাহিদা বাড়িয়া যাওয়া। ক্রেতাদের আয় বাড়িলে ক্রয়শক্তি বাড়ে এবং সেইজন্য চাহিদাও বাড়ে। কার্যকর চাহিদা বাড়িলে উৎপাদন ও বিনিয়োগ বাড়ে এবং ইহার ফলে নিয়োগের সৃষ্টি হয় অথবা নিয়োগের সুযোগ বাড়িয়া যায়। যখন কার্যকর চাহিদার ঘাটতি (deficiency in effective demand) দেখা যায়, তখন দেশে বেকার অবস্থার তীব্রতা বাড়ে এবং মন্দার সৃষ্টি হয়। কার্যকর চাহিদা বাড়িলে ইহা বর্ধিত ভোগ-ব্যয় এবং বিনিয়োগ-ব্যয়ের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। নিযোগের আধুনিক তত্ত্ব বুঝাইতে হইলে ভোগপ্রবণতা (Propensity to Consume or Consumption Function) এবং বিনিয়োগকাজেব (Investment Function) ব্যাখ্যা প্রদান করিতে হইবে এবং ইহার কারণসমূহ আলোচনা করিতে হইবে। নিম্নলিখিত তালিকায় কেইন্‌স-প্রদত্ত নিয়োগ-তত্ত্বটি দেখানো হইয়াছে এবং পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে নিয়োগ তত্ত্বের উপাদানগুলির বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।
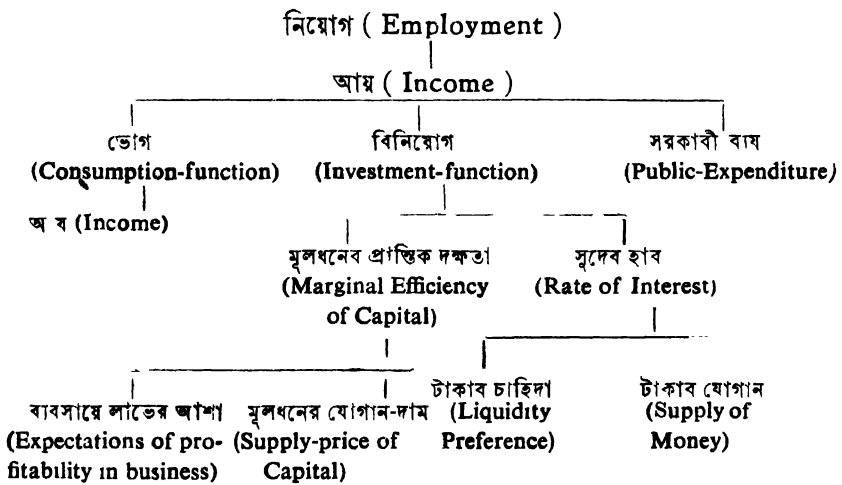
কেইনসের মতে কর্মনিয়োগ নির্ভর করে আয়ের উপর। আয় নির্ভর করে ভোগ ও বিনিয়োগের উপর। ভোগের প্রবণতা (Propensity to consume) প্রধানতঃ নির্ভর করে আয়ের উপর। যদি আয় কমে, তবে ভোগের প্রবণতা বেশী থাকে। প্রথমে আয় বাড়িয়া গেলে ভোগের প্রবণতাও খুব বাড়িয়া যায়। কিন্তু অবশেষে যখন আয় খুব বাড়িতে থাকে, তখন ভোগের প্রবণতা ধীরে ধীরে কমিয়া আসে এবং

ভোগের প্রবণতা

সঞ্চয়ের ইচ্ছা ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে। সঞ্চয়ের ইচ্ছা বেশী হইলে ভোগের প্রবণতা কমিয়া যায়। ব্যাংক যদি সুদের হার

বাড়াইয়া দেয়, তবে জনসাধারণ বেশী করিয়া টাকা জমাইতে উৎসাহিত হয়; সুতরাং ইহার ফলে আপেক্ষিকভাবে ভোগের পরিমাণ কমিয়া যায়।

বিনিয়োগের পরিমাণ মূলতঃ নির্ভর করে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার (Marginal Efficiency of Capital) উপর। যখন বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা (investment opportunities) থাকে ও ব্যবসায়ে লাভের আশা থাকে এবং মূলধনের যোগান-দাম (Supply Price of Capital) অর্থাৎ পুরাতন যন্ত্রপাতির পরিবর্তে নূতন যন্ত্রপাতি বসাইবার খরচ (Replacement Cost) এবং সুদ (Interest). কম থাকে. তখন Marginal Efficiency of Capital অথবা মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা বেশী হয়। ইহার ফলে বিনিয়োগ বাড়িয়া যায়। আবার ব্যাংকের সুদের হার একাধারে অল্প এবং স্থির থাকিলে (low and stable rate of interest) বিনিয়োগের জন্য মূলধন সহজেই ধার করা যায় এবং ইহাতে বিনিয়োগের পরিমাণ কিছু বাড়িয়া যায়। তবে বিনিয়োগের পরিমাণ সুদের হার অপেক্ষা মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার উপর বেশী নির্ভরশীল।

সুদের হার

কেইন্সের মতে সুদের হার নির্ভর করে টাকার চাহিদা (liquidity preference) এবং টাকার যোগানের উপর। টাকার চাহিদা পুনরায় জনসাধারণের তিনটি ইচ্ছার (motives) উপর নির্ভর করে; যথা, (১) লেনদেন করিবার ইচ্ছা (Transactions motive) (২) ভবিষ্যৎ সংস্থান সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করিবার ইচ্ছা (Precautionary motive) এবং (৩) ফাট্‌কা-কারবার করিবার ইচ্ছা (Speculative motive)।

কেইন্সের মতে ভারসাম্য অনুযায়ী আয় (Equilibrium level of income) নির্ধারিত হয় ভোগের প্রবণতা (Propensity to consume) এবং বিনিয়োগ স্পৃহার (Inducement to invest) দ্বারা। যখন মোট জাতীয় আয় সমাজের মোট ভোগ-জনিত খরচ (Consumption expenditure) এবং মোট বিনিয়োগ-জনিত খরচের (Investment expenditure) যোগফলের সমান হয়, তখনই সেই আয়ে ভারসাম্য অর্জিত হইয়াছে বলা যায়।

ভোগের প্রবণতা (Propensity to Consume or Consumption Function): ভোগের প্রবণতা বলিতে আমরা আয় এবং ভোগের মধ্যে একটি সম্পর্ক বুঝি। আয় বাড়িলেই প্রাথমিক পর্যায়ে ভোগ বাড়ে। কিছু পরিমাণে আয় বাড়িয়া গেলে সেই অনুপাতে ভোগ কতটা বাড়িয়া যায় তাহাই একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। অল্প পরিমাণে আয় বাড়িয়া যাওয়া এবং সেই অনুযায়ী ভোগ বাড়িয়া যাওয়ার অনুপাতই হইতেছে ভোগের প্রান্তিক প্রবণতা বা Marginal Propensity to consume. সাধারণতঃ দেখা যায়, প্রথমত, অল্প পরিমাণে আয় বাড়িলে সেই অনুপাতে ভোগের প্রবণতা খুব বেশী থাকে। তারপর যত আয় বাড়িতে থাকে তত ভোগের প্রবণতা কমিতে থাকে। অতঃপর একটি স্তরে দেখা যায়, যত আয় হইতেছে, ঠিক সেই

পরিমাণেই ভোগ হইয়াছে। অবশেষে আর আয় বাড়িতে থাকিলে ভোগের প্রবণতা না বাড়িয়া সঞ্চয়ের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে।*

নিম্নের চিত্রের সাহায্যে তাহা বুঝানো যাইতে পারে :—

এই চিত্রে ৪৫° ডিগ্রি কোণে যে রেখাটি টানা হইয়াছে (Y=C) তাহাকে আমরা "Zero-saving line" বলিতে পারি। অর্থাৎ, সম্পূর্ণ আয় খরচ হইয়া গিয়াছে, ইহাই এই রেখাটি বুঝাইতেছে ; সুতরাং সম্পূর্ণ আয় খরচ হইয়া গেলে সঞ্চয় করিবার মত আর কিছুই থাকে না। OY রেখা দ্বারা আয় এবং OC রেখা দ্বারা ভোগজনিত খরচ বুঝাইতেছে। 'C' রেখাটি ভোগের প্রবণতা বুঝাইতেছে ; ইহাকে আমরা ভোগ-ব্যয় রেখা বা "consumption curve" বলিতে পারি। প্রথমে দেখা
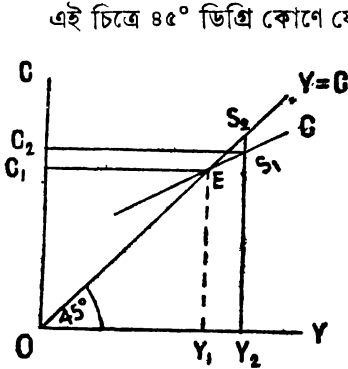
চিত্র নং ৮৪

যাইতেছে, যতক্ষণ আয় বাড়িয়া OY_1 না হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আয় অপেক্ষা ভোগের প্রবণতা বেশী। যখন আয়ের পরিমাণ হইতেছে oy_1 তখন সম্পূর্ণ আয় খরচ হইয়া যাইতেছে : E বিন্দু ইহাই নির্দেশ করিতেছে। আয় যদি আরও বাড়িতে থাকে, তবে ভোগের প্রবণতা আর সেই পরিমাণে বাড়িবে না, তখন ক্রমশঃ সঞ্চয় বাড়িবে। যখন আয় হইতেছে OY_2, তখন সঞ্চয়ের পরিমাণ হইতেছে S_1S_2।

গড় ভোগপ্রবণতা

ভোগপ্রবণতার বৈশিষ্ট্য আলোচনাকালে গড় ভোগপ্রবণতা (average propensity to consume) এবং প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার (marginal propensity to consume) মধ্যে পার্থক্য মনে রাখিতে হইবে। গড় ভোগপ্রবণতা বলিতে মোট আয়ের মধ্যে মোট ভোগ-ব্যয়ের অনুপাত (ratio of total consumption to total income) বুঝায়।

সংক্ষেপে, গড় ভোগপ্রবণতা $=\frac{\text{মোট ব্যয়}}{\text{মোট আয়}}$।

কোন দেশের জাতীয় আয় যদি হয় ৫০০০০ কোটি টাকা এবং সমগ্র জনসমষ্টির ভোগ-ব্যয় যদি হয় ৪০০০০ কোটি টাকা, তবে সেই অবস্থায় গড় ভোগপ্রবণতা হইবে—

* লর্ড কেইন্‌স ভোগ-ব্যয়ের একটি মূল মনস্তাত্ত্বিক নিয়ম নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন: **"The fundamental psychological law, upon which we are entitled to depend with confidence both *a priori* from our knowledge of human nature and from the detailed facts of experience is that men are disposed, as a rule and on the average, to increase their consumption as their income increases, but not by as much as the increase in their income. (*Keynes*—General Theory, P. 96.)**

$\frac{\text{৪০০০০ কোটি টাকা}}{\text{৫০০০০ কোটি টাকা}}$ অর্থাৎ, $\frac{৪}{৫}$ অথবা শতকরা ৮০ ভাগ।

সামগ্রিক ভোগ-ব্যয় মোট আয় হইতে কম হইলেই বলা হয় যে গড় ভোগপ্রবণতা এককের কম (less than unity); যখন ভোগ-ব্যয় মোট আয়ের সমান হয়, তখন গড় ভোগপ্রবণতা এককের সমান (equal to unity)। আবার যদি ভোগ-ব্যয় মোট আয় অপেক্ষা বেশী হয়, তবে ভোগপ্রবণতা এককের বেশী (greater than unity) হয়। অতিরিক্ত একক আয়ের ফলে লোকে যে পরিমাণ অতিরিক্ত ভোগ-ব্যয় করে তাহার অনুপাতকে (consumption induced by a given increment in income) প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (marginal propensity to consume) বলা হয়। যদি Y দ্বারা আয় সূচিত হয় এবং C দ্বারা ভোগ-ব্যয় সূচিত হয় তবে $\frac{dc}{dy}$ হইতেছে ভোগের প্রান্তিক প্রবণতা। উপরের উদাহরণ অনুযায়ী যদি জাতীয় আয়ের পরিমাণ ৫০০০০ কোটি টাকা হইতে বাড়িয়া ৬০,০০০ কোটি টাকা হয় তখন যদি বাড়তি ১০,০০০ কোটি টাকার মধ্যে ৫,০০০ কোটি টাকার ভোগ-ব্যয় হয় তবে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা হইতেছে $\frac{\text{৫০০০ কোটি টাকা}}{\text{১০,০০০ কোটি টাকা}} = \frac{১}{২}$, অর্থাৎ শতকরা ৫০ ভাগ। যখন

প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা

অতিরিক্ত আয় অপেক্ষা অতিরিক্ত ভোগ-ব্যয় কম হয়, তখন ভোগের প্রান্তিক প্রবণতা এককের কম হয়। যখন অতিরিক্ত ভোগ-ব্যয় অতিরিক্ত আয়ের সমান হয়, তখন ভোগের প্রান্তিক প্রবণতা এককের (equal to unity) সমান হয়। আবার যদি এমন হইত অতিরিক্ত আয় অপেক্ষাও অতিরিক্ত ভোগ-ব্যয়ের পরিমাণ বেশী, তখন ভোগের প্রান্তিক প্রবণতা একক অপেক্ষা বেশী হইত; কিন্তু তাহা সচরাচর দেখা যায় না। যখন অতিরিক্ত আয়ের কিছুই খরচ হয় না এবং সবটাই সঞ্চিত হয়, তখন ভোগের প্রান্তিক প্রবণতা হইতেছে শূন্য (Zero)।

যখন কোন দেশের আয় খুব অল্প থাকে তখন আয়ের সবটাই সাধারণতঃ ভোগ্য সামগ্রীর উপর ব্যয়। এই অবস্থায় গড় ভোগপ্রবণতা এককের সমান (equal to unity) সমান হয়। এমন কি খুব অল্প আয়ে গড় ভোগপ্রবণতা একক অপেক্ষাও বেশী হইতে পারে; সেক্ষেত্রে জনসাধারণ আগেকার সঞ্চিত অর্থ হইতে ভোগ্য সামগ্রীর উপর ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়। দেশের আয় একটি নিম্নতম স্তরের উপরে উঠিয়া গেলে সবটাই ভোগ্য সামগ্রীর উপর ব্যয়িত হয় না, তখন গড় ভোগপ্রবণতা এককের কম (less than unity) হয়। আয়ের পরিমাণ বাড়িতে থাকিলে আয় এবং ভোগ-ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য বাড়িতে থাকে এবং সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। উপরের ৮৪নং চিত্রে ইহা দেখানো হইয়াছে। ৮৪নং চিত্রে E বিন্দুর

গড় ভোগপ্রবণতার প্রকৃতি

ডানদিকে S_1 S_2 বিন্দু দুইটির মধ্যে যে দূরত্ব দেখা যাইতেছে তাহা সঞ্চয়ের পরিমাণ সূচিত করে।

প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা সাধারণতঃ এককের কম (less than unity) হয়। অর্থাৎ আয়ের পরিমাণ যতটা বাড়ে, ভোগ-ব্যয় ততটা বাড়ে না। বরং কেইন্‌সের মতে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা আয়বৃদ্ধির সহিত ক্রমহ্রাসমান হয়। প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা বলিতে অতিরিক্ত ব্যয়ের মধ্যে অনুপাত বুঝায়; অনুরূপভাবে প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা (Marginal Propensity to save) হইতেছে আয় এবং অতিরিক্ত সঞ্চয়ের মধ্যে অনুপাত।

প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার প্রকৃতি

ভোগপ্রবণতা নিরূপণকারী উপাদানসমূহ (Factors governing Consumption Function)—কেইন্‌স তাঁহার ভোগ-ব্যয় সম্পর্কিত আলোচনা স্বল্পকালের পরিপ্রেক্ষিতে (Short-run Consumption Function) করিয়াছেন। ভোগ-ব্যয় কি কি উপাদানের উপর নির্ভরশীল তাহা ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া কেইন্‌স দুই ধরনের উপাদানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই উপাদানগুলির মধ্যে কয়েকটি মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সামাজিক রীতিনীতি ও প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নির্ভরশীল (Subjective Factors), এবং অপর কয়েকটি সরকারী নীতি অথবা দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কতিপয় বাহ্যিক শক্তির প্রভাবের উপর নির্ভরশীল (Objective Factors)। কিন্তু স্বল্পকালে এই উভয়বিধ উপাদান স্থির থাকে ধরিয়া লইয়া বলা যায় যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ভোগ-ব্যয় আয়ের উপর নির্ভরশীল। ভোগ-ব্যয়ের জন্য প্রথমোক্ত উপাদানগুলির মধ্যে কেইন্‌স আটটি অভিপ্রায়ের (eight motives) কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই অভিপ্রায়গুলি ভবিষ্যতের সম্ভাব্য খরচগুলি নির্বাহ করিবার জন্য মানুষকে সঞ্চয়ের প্রেরণা দেয়। ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য পূর্বেই ব্যবস্থা করিয়া রাখা, সুদের মাধ্যমে ভবিষ্যতে বাড়তি আয়ের সুবিধা ভোগ করিবার জন্য টাকা সরাইয়া রাখা, ভবিষ্যতে বাড়তি আয় অর্জন করিবার আকাঙ্ক্ষা, ভবিষ্যতে স্বাধীনভাবে কোন কাজ করিবার জন্য আর্থিক ক্ষমতার ব্যবস্থা পূর্বেই করিয়া রাখা, ফাটকা কারবার করার ইচ্ছা, ভবিষ্যতে দান করিবার ইচ্ছা প্রভৃতি নানাবিধ অভিপ্রায় হইতেই মানুষ অর্থ সঞ্চয় করিতে চায়। আয়ের যতটা অংশ এই কারণগুলির জন্য সঞ্চিত হইবে, ভোগ-ব্যয়ের পরিমাণও ততটা কমিবে। ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলির সঞ্চয়প্রবণতার জন্য কেইন্‌স চারিটি অভিপ্রায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যথা, (১) ব্যবসায়-উদ্যোগ করার অভিপ্রায় (the motive of enterprise), (২) ব্যবসায়িক প্রয়োজনে নগদ টাকার রিজার্ভ রাখার অভিপ্রায় (the motive of liquidity), (৩) ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান রাখার অভিপ্রায় এবং (৪) আর্থিক

ভোগ-ব্যয় কি কি উপাদানের উপর নির্ভরশীল? স্বল্পকালীন ভোগ-ব্যয়ের ব্যাখ্যা

ভোগকারীর মানসিক গঠন ভোগ-ব্যয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে

সংস্থান রাখার যৌক্তিকতা অনুযায়ী সঞ্চয়ের অভিপ্রায় (the motive of financial prudence) ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে কেইন্‌স ভোগ-ব্যয়ের স্বল্পকালীন পরিবর্তনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। স্বল্পকালে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর কতিপয় বাহ্যিক শক্তির (external forces) প্রভাব থাকিতে পারে। অর্থাৎ শুধু মানুষের আচরণ অথবা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই নহে, দেশের অর্থনৈতিক নীতির বিভিন্ন দিক ভোগ-ব্যয়কে প্রভাবিত করিতে পারে। এই উপাদানগুলিকে উদ্দেশ্যমূলক উপাদান (Objective Factors) বলা হয়। ভোগ-ব্যয়ের উপর প্রভাববিস্তারকারী এই উদ্দেশ্যমূলক উপাদানগুলি হইতেছে, (১) মজুরির স্তর পরিবর্তন (change in the wage level), (২) ব্যবসায়ি ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব করার পদ্ধতির পরিবর্তন (changes in accounting practice with respect to depreciation), (৩) ভোগ-ব্যয়ের উপর অভাবনীয় লাভ অথবা ক্ষতির প্রভাব (windfall gains or losses), (৪) সরকারের আয়-ব্যয় নীতির প্রভাব (changes in fiscal policy), (৫) লাভের আশার পরিবর্তন (changes in expectations) এবং ভোগ-ব্যয়ের উপর ইহার প্রভাব, (৬) ক্রেতার মোট ধনসম্পদের পরিমাণের (total wealth position of the consumer) পরিবর্তন ও সুদের হারের পরিবর্তন এবং ভোগব্যয়ের উপর ইহার প্রভাব।

ভোগ-ব্যয়ের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উদ্দেশ্যমূলক উপাদান-সমূহ

আয়ের বণ্টন সরকারের আয়-ব্যয় নীতির উপর নির্ভরশীল। ইহা মজুরির স্তরের উপরেও নির্ভরশীল। আয়ের বণ্টন ক্রেতার ভোগপ্রবণতাকে এবং সঞ্চয়-প্রবণতাকে প্রভাবিত করে। ব্যাংকের সুদের হারের পরিবর্তন, কর-ব্যবস্থার পরিবর্তন, সামাজিক নিরাপত্তার (Social Security) ব্যবস্থা, প্রভৃতি সরকারী নীতি ভোগপ্রবণতাকে প্রভাবিত করে।

দীর্ঘকালীন ভোগপ্রবণতা (Long-run Consumption Function) : দীর্ঘকাল ভোগপ্রবণতা কিভাবে চালিত হয় সে সম্বন্ধে বিভিন্ন অর্থবিজ্ঞানীর মধ্যে বিতর্কের অবকাশ আছে। অধ্যাপক সাইমন কুজনেৎস (Simon Kuznets) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৬৯-১৯৩৮ সালের মধ্যে আয় এবং ভোগ-ব্যয়ের যে পরিবর্তন হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া (১৯২৯ সালের মূল্যস্তরের ভিত্তিতে) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আয় এবং ভোগ-ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক কখনই স্থির থাকে না। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে আয় এবং ভোগ-ব্যয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক কুজনেৎসের বিশ্লেষণে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তাহার যৌক্তিকতা গ্রহণযোগ্য মনে হয় নাই। অধ্যাপক আর্থার স্মিথিজ (Arthur Smithies) মনে করেন, মূলতঃ, আয় এবং ভোগ-ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক কোন

দীর্ঘকালীন ভোগ-প্রবণতা কিভাবে চালিত হয়

সময়েই সমানুপাতিক নয়। কুজনেৎসের হিসাবে দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন জাতীয় আয় ধীরে ধীরে বাড়িতেছিল তখন দীর্ঘকালীন ভোগ-ব্যয়ও ধীরে ধীরে বাড়িতেছিল। ইহার কারণ বর্ণনা করিতে যাইয়া অধ্যাপক স্মিথিজ বলেন যে, ১৮৬৯-১৯৩৮ সালের মধ্যে আমেরিকার অধিবাসীগণ গ্রামাঞ্চল হইতে শহরাঞ্চলে অধিক পরিমাণে চলিয়া আসায় এই সময়ে সামগ্রিক ভোগ-ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। অধ্যাপক একলি (Ackley) মনে করেন, এই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের বয়স-বণ্টনেরও (age distribution) পরিবর্তন হয় এবং ইহাও সামগ্রিকভাবে দীর্ঘকালীন ভোগ-ব্যয়কে প্রভাবিত করে। কিন্তু অধ্যাপক ডুসেনবেরী (Duesenberry) উপরোক্ত যুক্তি দুইটি, অর্থাৎ অধ্যাপক স্মিথিজ এবং অধ্যাপক একলির যুক্তি গ্রহণ করেন না। তাঁহার মতে আয় এবং ভোগপ্রবণতার সম্পর্ক সমানুপাতিক, অর্থাৎ, দীর্ঘকালীন আয় বাড়িলে ভোগ-ব্যয় বাড়ে এবং আয় কমিলে ভোগ-ব্যয় কমে, যদি আয় এবং ভোগপ্রবণতার সম্পর্ক সমানুপাতিক না হয়, তবে আয় ও ভোগের মধ্যে একটি স্বল্পকালীন ব্যবধানের (income-consumption lag) সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক ফ্রিডম্যানও (Friedman) দীর্ঘকালে আয় এবং ভোগ-ব্যয়ের সমানুপাতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ; তবে তিনি আয় এবং ভোগ-ব্যয় উভয়কেই স্থায়ী (Permanent) এবং সাময়িক (Transitory)—এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

বিনিয়োগ-ব্যয় (Investment Expenditures or Investment Function) ঃ বিনিয়োগ বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। কেইন্‌স অবশ্য তাঁহার বইয়ে বিনিয়োগের প্রকার-ভেদ করেন নাই। কিন্তু, বিনিয়োগ বলিতে তিনি নীট বিনিয়োগ (net investment) বুঝাইয়াছেন। কেইন্‌সীয় অর্থনীতিতে বিনিয়োগ পরিকল্পিত অথবা ইচ্ছাকৃত (planned or intended investment) এবং অপরিকল্পিত অথবা অনিচ্ছাকৃত (unplanned or unintended) হইতে পারে।

বিনিয়োগের বিভিন্ন অর্থ

যদি স্থায়ী মূলধন বৃদ্ধি কিংবা নির্মিত মালমজুত বৃদ্ধি স্বেচ্ছাকৃত ভাবে করা হয়, তবে সেই বিনিয়োগকে পরিকল্পিত বা ইচ্ছাকৃত বিনিয়োগ বলা যাইতে পারে। আবার, যদি বিক্রয়ের পরিমাণ কমিয়া যাওয়ার ফলে অবিক্রীত জিনিসপত্র জমিয়া যায়, তবে সেই ক্ষেত্রে বিনিয়োগকে অপরিকল্পিত বা অনিচ্ছাকৃত আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। কেইন্‌সের পর অধ্যাপক হিক্‌স (Prof. Hicks) তাঁহার বাণিজ্যচক্রের তত্ত্বে দুই প্রকার বিনিয়োগের ভূমিকা দেখাইয়াছেন, যথা স্বয়ংসৃষ্ট বিনিয়োগ (autonomous investment) এবং প্রণোদিত বিনিয়োগ (induced investment)। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নূতন কিছু উদ্ভাবন (innovation) কলাকৌশলের পরিবর্তন (change in technology) প্রভৃতির প্রভাবে যে বিনিয়োগ হয়, তাহাকে 'স্বয়ংসৃষ্ট বিনিয়োগ' বলা যাইতে

পারে। কিন্তু আয় বাড়িয়া যাইবার দরুণ অথবা বিনিয়োগে লাভের আশা বাড়িয়া যাইবার দরুণ যদি বিনিয়োগকারী তাহার বিনিয়োগ বাড়াইতে উৎসাহিত হয়, তবে সেই বিনিয়োগকে 'প্রণোদিত বিনিয়োগ' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

বিনিয়োগের যে ব্যাখ্যাই করা হউক না কেন, মনে রাখিতে হইবে যে, নূতন প্রকৃত মূলধন সৃষ্টি (creation of real capital) করা হইলেই তাহাকে বিনিয়োগ বলা যায়। শেয়ারপত্র, জমি, বস্তু প্রভৃতি একজন লোকের হাত হইতে অপর একজন লোকের হাতে যাইতে পারে; কিন্তু, ইহাতে নূতন প্রকৃত মূলধনের সৃষ্টি হয় না। কেইন্‌সের মতে বিনিয়োগ নির্ভর করে দুইটি উপাদানের উপর; যথা, মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা (marginal efficiency of capital) এবং সুদের প্রচলিত হারের (ruling rate of interest) উপর। মূলধনের যোগান-দাম (supply price) অপেক্ষা মূলধনের বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্তির আশা (anticipated returns or prospective yield from the investment of capital) যদি বেশী হয়, তবে বিনিয়োগের পরিমাণ বেশী হয়। মূলধনের যোগান-দাম নির্ভর করে মূলধনের "replacement cost" এবং সুদের হারের উপর। তাহা ছাড়া, এমনিতেও বিনিয়োগের পরিমাণ কিছু পরিমাণে সুদের হারের উপরেও নির্ভর করে। বেশী হইলে মূলধন ধার করিবার খরচ বেশী হয় এবং ইহাতে বিনিয়োগের পরিমাণ কমিয়া যায়। অপর দিকে সুদের হার কমিয়া গেলে সহজে মূলধন ধার পাওয়া যায় এবং ইহাতে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। যদি সুদের হার স্থির থাকে, তবে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা বাড়িয়া গেলেই বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। অপরপক্ষে যদি মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা স্থির থাকে, অথচ সুদের হার বাড়িয়া যায়, তবে বিনিয়োগের পরিমাণ কম হয়। মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা অনেক পরিমাণে দীর্ঘকালীন লাভের আশার (long-run expectations of profit) উপর নির্ভর করে।

বিনিয়োগ নির্ধারণ-কারী উপাদানসমূহ

মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা (Marginal Efficiency of Capital): কেইন্‌স তাঁহার "*General Theory of Employment, Interest and Money*" বইয়ে বিনিয়োগের কারণ হিসাবে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। মূলধনের দক্ষতা (efficiency) বলিতে কোন মূলধন-সম্পদের (capital asset) আয় অর্জন করার ক্ষমতাকে বুঝায়; মূলধন-সম্পদেরও একটি নিজস্ব ব্যয় আছে, সেই ব্যয় মিটাইয়া যে নীট আয় থাকে, তাহা হইতেছে সেই মূলধন সম্পদের আয়-অর্জনের ক্ষমতা। তাহা হইলে একক মূলধন-সম্পদ অথবা প্রান্তিক একক মূলধন-সম্পদ হইতে ইহার ব্যয় মিটাইয়া যে উচ্চতম আয়ের হার আশা করা হয়, তাহাই হইল কোন নির্দিষ্ট ধরনের মূলধন-সম্পদের প্রান্তিক দক্ষতা (Marginal efficiency

মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা কাহাকে বলে

of capital)।* আরও সোজা করিয়া বলা যায়, কোন মূলধন-সম্পদের ব্যয় হইতে যে শতকরা নীট আয় বা লাভ আশা করা হইয়া থাকে, তাহাই হইতেছে মূলধনের প্রান্তিক ক্ষমতা। একটি উদাহরণের সাহায্যে ইহা বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাক, একটি বাড়ী ৪০,০০০ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করিয়া যদি ভাড়া দেওয়া যায়, তবে ইহা হইতে প্রতি বৎসর ২৪০০ টাকা ভাড়া পাওয়া যাইতে পারে ; আরও ধরা যাক্, প্রতি বৎসর বাড়ীটির ক্ষয়-ক্ষতি অথবা পুনঃ-সংস্থাপন খরচ (depreciation or replacement cost) হইল ৪০০ টাকা। তাহা হইলে বাড়ী হইতে নীট আয়ের পরিমাণ ২০০০ টাকা (২৪০০ টাকা—৪০০ টাকা) হইবে। এইভাবে ৪০,০০০ টাকা বিনিয়োগ হইতে প্রতি বৎসর যদি ২০০০ টাকা আয় হয়, তবে বিনিয়োগ হইতে সম্ভাব্য আয়ের পরিমাণ হইবে শতকরা ৫ ভাগ। এখন বাজারে যদি সুদের হার হয় শতকরা ৩ টাকা তবে ৪০,০০০ টাকা ধার করিয়া বিনিয়োগ করা হইলেও নূতন বাড়ী নির্মাণ করা লাভজনক হইবে। এইভাবে যে পর্যন্ত নূতন বাড়ী নির্মাণ করা হইতে লাভের পরিমাণ ইহার মোট সুদ অপেক্ষা বেশী থাকিতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই বিনিয়োগ করা লাভজনক হইবে, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না বিনিয়োগের প্রান্তিক দক্ষতার হার ইহার সুদের হারের সমান হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িতে থাকিবে। উপরের উদাহরণ অনুযায়ী যদি বিনিয়োগের নীট সম্ভাব্য আয়ের হারের মধ্যে শতকরা ৫ ভাগ হারই সর্বোচ্চ হার হয়, তবে উহাই হইবে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার সাধারণ হার (marginal efficiency of capital in general)।

যদি অন্যান্য অবস্থার পরিবর্তন না হয় (other things remaining constant) তবে বিনিয়োগ যত বাড়িতে থাকে তত মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা ক্রমহ্রাসমান হয়। ইহার দুইটি কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমত, বিনিয়োগের পরিমাণ যত বাড়ানো হইবে, মূলধনের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ আয় ততই কমিতে থাকিবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যত বেশী বাড়ী নির্মাণ করা হইবে, তত বেশী বাড়ী-ভাড়াও কমিতে থাকিবে। দ্বিতীয়ত, যত বেশী মূলধন-সম্পদ সৃষ্ট হইতে থাকিবে, তত মূলধন-সম্পদের উৎপাদন-ব্যয় বাড়িতে থাকিবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যতবেশী বাড়ী নির্মিত হইবে, বাড়ী নির্মাণ করিবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় উপকরণের জন্য চাহিদা তত বাড়িতে থাকিবে এবং ইহাতে ইহাদের দাম বাড়িয়া যাইবে। ইহার ফলে মূলধন-সম্পদের উৎপাদন-ব্যয়

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা ক্রমহ্রাসমান হয়?

---

* কেইন্‌স্ নিম্নলিখিতভাবে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন : "Marginal efficiency of capital is equal to that rate of discount which would make the present value of the series of annuities given by the returns expected from the capital asset during its life just equal to its supply price."

বাড়িতে থাকিবে। সেইজন্যই বিনিয়োগ বাড়িয়া গেলে মূলধনের প্রান্তিক-দক্ষতা কমিয়া যায়। বিনিয়োগের পরিমাণ সুদের হারের উপরেও নির্ভরশীল। যদি ভবিষ্যৎ আয় সম্পর্কে উৎপাদকের আশা অপরিবর্তিত থাকে, তবে বিভিন্ন সুদের হারে কত বিনিয়োগ হইবে তাহা নির্ধারণ করা যায় এবং এইভাবে একটি বিনিয়োগ চাহিদা-সূচী (Investment demand schedule) প্রণয়ন করা যায়। নিম্নের চিত্রে তাহা দেখানো হইয়াছে।

বিনিয়োগের উপর সুদের হারের প্রভাব

এই চিত্রে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা MEC রেখা দ্বারা সূচিত হইতেছে। যদি মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা অপরিবর্তিত থাকে, তবে Or_1 সুদে বিনিয়োগের পরিমাণ হইবে OI_1 এবং Or_2 সুদে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়া হইবে OI_2. দেখা যাইতেছে, মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা অপরিবর্তিত থাকিলে সুদের হারের পরিবর্তনের উপর বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভরশীল। বিনিয়োগ-চাহিদা Or_2 সুদের সময় r_2 হইতে অঙ্কিত রেখা দ্বারা সূচিত হইয়াছে। আবার Or_1 সুদে বিনিয়োগ-চাহিদা-রেখা (investment demand curve) মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা-রেখাকে এমন একটি বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে যাহাতে বিনিয়োগের পরিমাণ হয় OI_1; কিন্তু Or_2 সুদে বিনিয়োগ - চাহিদা - রেখা মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা-রেখাকে এমন এক বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে যে বিনিয়োগের পরিমাণ OI_2 হইয়াছে।
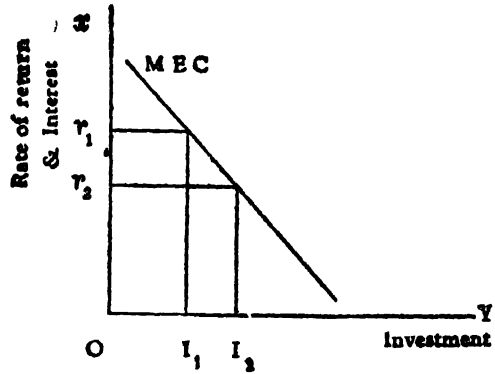
চিত্র নং ৮৫

বিনিয়োগ কি সুদ-স্থিতিস্থাপক ? (Is investment interest-elastic ?)

বিনিয়োগ সুদ-স্থিতিস্থাপক কিনা এই বিষয়ে অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছে। উপরের আলোচনা হইতে এবং উপরে প্রদত্ত চিত্রটি হইতে আমরা দেখিতে পাই, যদি মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার কোন পরিবর্তন না হয়, তবে বিনিয়োগ সুদের হারের পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হয়। অর্থাৎ, সুদ বাড়িয়া গেলে বিনিয়োগের পরিমাণ কমে এবং সুদ কমিয়া গেলে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। যদি সুদের সামান্য পরিবর্তন হইলেই বিনিয়োগের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়, তবে বিনিয়োগকে সুদ-স্থিতিস্থাপক (interest-elastic) বলা যাইতে পারে। সুদের হার পরিবর্তিত

বিনিয়োগের সুদ-স্থিতিস্থাপকতা লইয়া বিতর্ক

হইলে বিনিয়োগের কতটুকু পরিবর্তন হইবে তাহা মূলধনের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু সুদের হারের পরিবর্তন করিয়া বিনিয়োগকে বাস্তবে কতটা পরিবর্তিত করা যাইতে পারে সেই সম্পর্কে বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং তাহা নিম্নে আলোচিত হইল।

কেইন্‌স তাঁহার "*Treatise on Money*" বইয়ে বলিয়াছিলেন যে সুদের হারের পরিবর্তন সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের ভারসাম্য নষ্ট করিতে পারে। কিন্তু পরবর্তীকালে কেইন্‌স তাঁহার "*General Theory of Employment, Interest and Money*" বইয়ে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিনিয়োগ মূলতঃ মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার উপর নির্ভরশীল, সুদের হারের উপর নহে, সুদের হার বিনিয়োগের নির্ধারক হিসাবে তখনই গুরুত্বপুর্ণ হয় যখন মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা স্থির থাকে, কিন্তু মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা স্থির না থাকাই স্বাভাবিক।

কেইন্‌সের চিন্তাধারায় পরিবর্তন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে Patman Committee-র নিকট সাক্ষ্য প্রদানকালে তিনজন অর্থবিজ্ঞানী বিনিয়োগের সুদ-স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কে তিনটি বিভিন্ন অভিমত দিয়াছেন। অধ্যাপক ফ্রিডম্যানের (Friedman) মতে সামগ্রিক ব্যয় এবং সামগ্রিক সঞ্চয় সুদের হারের পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু অধ্যাপক স্যামুয়েলসন (Samuelson) ব্যয় এবং সঞ্চয়ের সুদ-স্থিতিস্থাপকতার গুরুত্ব সম্পর্কে সন্দিহান। অধ্যাপক আর. ভি. রুজা (R. V. Roosa) মনে করেন, সুদের হার বাড়িয়া গেলে মূলধনের খরচ বাড়িয়া যাওয়া অপেক্ষা মূলধনের সরবরাহ অধিক পরিমাণে প্রভাবিত হয়, কিন্তু এই বিষয়ে অধিকাংশ অর্থবিজ্ঞানীই একমত হইয়াছেন যে, সুদের হার যদি অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যায় তবে শুধু সেইক্ষেত্রেই বিনিয়োগ-ব্যয় প্রতিহত হইতে পারে। কতিপয় বিনিয়োগ আছে, যেমন, গৃহ-নির্মাণ প্রভৃতি ঋণের সহজলভ্যতার (easy availability of credit) উপর নির্ভরশীল। সেইগুলির ক্ষেত্রে সুদের হার কমিয়া গেলে বিনিয়োগ বাড়িয়া যাইতে পারে এবং সুদের হার বাড়িয়া গেলে বিনিয়োগ কমিয়া যাইতে পারে। কিন্তু, বিনিয়োগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ে লাভের আশার উপর নির্ভর করে। সুদের হার বাড়িলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়াই স্বাভাবিক, সুদের হার বাড়িয়া গেলে যদিও বিনিয়োগের খরচ (cost of investment) বাড়িয়া যায়, তবুও বিনিয়োগের পরিমাণ যে কমিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। যদি বিনিয়োগে লাভের আশা কমিয়া যায় এবং বিনিয়োগ হইতে যে আয় অর্জিত হইবে তাহা যদি ঋণের জন্য যে সুদ দিতে হইবে তাহা অপেক্ষা বেশী না হয়, তবে বিনিয়োগের পরিমাণ কমিবে। কিন্তু, অধ্যাপক রবার্টসন মনে করেন, বিনিয়োগ বহুলাংশে সুদের হারের উপর নির্ভরশীল। অধ্যাপক

অর্থবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন মতামত

মূলধনের সহজলভ্যতা এবং বিনিয়োগের খরচ সুদের হারের উপর নির্ভরশীল

লুৎস্ (Lutz)* বিনিয়োগের উপর সুদের হারের কি প্রভাব হইতে পারে তাহা বিবেচনা করিয়া নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন : (১) স্বল্পকালীন সুদ মালমজুত বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিনিয়োগকে বিশেষ প্রভাবিত করে না, (২) জিনিসপত্র নির্মাণকারী শিল্পগুলিতে (manufacturing industries) বিনিয়োগ-সিদ্ধান্ত সাধারণতঃ দীর্ঘকালীন সুদের দ্বারা প্রভাবিত হয় না; (৩) কোন কোন ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন সুদের হার বিনিয়োগ-সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করিতে পারে; যেমন, জনস্বার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট (Public Utility Services) বিনিয়োগ, রেলপথনির্মাণ, গৃহনির্মাণ, প্রভৃতি। (৪) সুদের হারের পরিবর্তন ঋণদান সংস্থাগুলির ঋণ প্রদান করিবার আগ্রহকে প্রভাবিত করিতে পারে। কিন্তু, ইবারসোল (Ebersole) মনে করেন, উদ্যোক্তাগণ বিনিয়োগ করিবেন কি করিবেন না, এই বিষয়ে সুদের হার খুব কদাচিৎই একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক শক্তি হিসাবে কাজ করিয়াছে।

বিনিয়োগের উপর সুদের হারের প্রভাব সম্পর্কে লুৎসের অভিমত

সম্প্রতি অনেক দেশে মুদ্রাসম্পর্কিত নীতি (Monetary Policy) পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রগতিতে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হিসাবে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে শুধু সুদের হারের পরিবর্তন করিয়াই বিনিয়োগকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। তবে ইহা দেখা গিয়াছে মুদ্রাস্ফীতির সময়ে বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রিত করার জন্য সুদের হার বাড়াইয়া দেওয়া যতটা কার্যকর হয়, মন্দার পর বিনিয়োগ বাড়াইয়া দেওয়ার জন্য সুদের হার কমাইয়া দেওয়া ততটা কার্যকর হয় না। কারণ বিনিয়োগের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া যতটা সহজ, বিনিয়োগ বাড়াইয়া দেওয়া ততটা সহজ নয়। বিনিয়োগ বাড়াইতে হইলে লাভের নিশ্চয়তা থাকা চাই। কিন্তু বিনিয়োগ কমাইতে হইলে অনেক ক্ষেত্রেই মূলধনের সরবরাহ কমাইয়া দেওয়া অথবা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উৎপাদন-খরচ বাড়াইয়া দেওয়া কিছুটা কার্যকর হয়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে সুদের হার কমাইয়া দিলে সাময়িক-ভাবে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যাইতে পারে,—ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং সুদের হারের পরিবর্তনের ফলে বিনিয়োগ কতটা প্রভাবিত হইবে তাহা অবস্থার উপর নির্ভর করে।

সুদের হার পরিবর্তন করিয়া বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করা যতটা সহজ, বিনিয়োগ বাড়াইয়া দেওয়া তত সহজ নয়

ভারসাম্যের পর্যায়ে আয় নিরূপণ (Determination of the Equilibrium Level of Income) **:** কেইন্‌সের মতে ভারসাম্যের পর্যায়ে আয়

---

* *Lutz—"The Structure of Interest Rates"*—**Quarterly Journal of Economics, 1940—41** (২) অধ্যাপক সেয়ার্স তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধে ***"Rate of Interest as a weapon of Economic Policy"*** **(*Oxford Studies in Price Mechanism*) এই বিষয়ে বিশদ** আলোচন **করিয়াছেন।**

নির্ধারিত হয় দুইটি উপাদানের সাহায্যে; একটি হইতেছে ভোগের প্রবণতা (Propensity to consume) এবং অপরটি হইতেছে বিনিয়োগের স্পৃহা (Inducement to invest)। কেইন্‌সের ভাষায় "The decisions to consume and the decisions to invest between them determine incomes." ভোগ এবং বিনিয়োগ সম্পূর্ণ আলাদা কারণের উপর নির্ভরশীল। কেইনসের মতে দেশের মোট আয় দেশের মোট ব্যয়ের সমান। মোট ব্যয় দুই প্রকারের হইতে পারে ; ভোগ-সম্পর্কিত ব্যয় (consumption expenditure) এবং বিনিয়োগজনিত ব্যয় (investment expenditure)। এই দুই প্রকার ব্যয়ের সমষ্টিকেই কেইন্‌স জাতীয় আয় আখ্যা দিয়াছেন। ভারসাম্যের পর্যায়ে জাতীয় আয় দুইভাবে দেখানো যায়। যখনই ভারসাম্যের পর্যায়ে জাতীয় আয় নিরূপিত হয় তখন সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের ভারসাম্য অর্জিত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, যে বিন্দুতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ভারসাম্য অর্জিত হয় সেই বিন্দুতেই জাতীয় আয় ভারসাম্যের পর্যায়ে নিরূপিত হয়। কিন্তু সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ একই কারণের উপর নির্ভর করে না। সঞ্চয় মূলতঃ আয়ের উপর নির্ভরশীল। তাহা ছাড়া, সুদের হার এবং অন্যান্য কতিপয় কারণেও সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রভাবিত হইতে পারে। বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা (Marginal Efficiency of Capital) এবং সুদের হারের উপর। সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ সম্পূর্ণ আলাদা কারণের উপর নির্ভরশীল হইলেও যখন ইহারা পরস্পরের সমান হয়, তখনই ভারসাম্যের পর্যায়ে আয় নিরূপিত হয়।

চিত্র নং ৮৭

পার্শ্বের চিত্রের ভারসাম্য পর্যায়ে আয় নিরূপণ দেখানো হইয়াছে। চিত্রটির প্রথম অংশে OY অক্ষ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বুঝাইতেছে এবং OX অক্ষ আয় বুঝাইতেছে। E বিন্দুতে সঞ্চয়-রেখা এবং বিনিয়োগ-রেখা পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে এবং সেই বিন্দুতে ভারসাম্য পর্যায়ে আয় নির্ধারিত হইয়াছে। চিত্রটির নিম্ন অংশ OX রেখা দ্বারা আয় এবং OY রেখা দ্বারা বিনিয়োগ এবং ভোগ বুঝাইতেছে। CC রেখা ভোগ বুঝাইতেছে। CC রেখা এবং 'C+I' রেখার মধ্যে যে দূরত্ব তাহা বিনিয়োগের পরিমাণ বুঝাইতেছে। মোট ভোগ এবং বিনিয়োগের পরিমাণ সূচিত হইতেছে 'C+I' রেখা দ্বারা ৪৫° ডিগ্রি কোণ অনুযায়ী যে রেখাটি উপরের চিত্রে
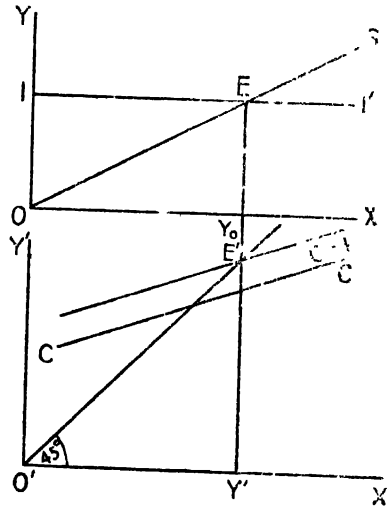
আঁকা হইয়াছে তাহাতে যাহা আয় তাহাই ব্যয় হইয়া যাইতেছে বলিয়া ইহাকে zoro saving রেখা বলা হইতেছে। এই রেখার সহিত 'C+I' রেখাটি E বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে এবং এখানেই আয়ের ভারসাম্য অর্জিত হইয়াছে। উপরের চিত্রে OY° হইতেছে ভারসাম্য পর্যায়ের আয় (Equilibrium Level of Income).

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ভারসাম্য (Saving-Investment Equilibrium) :
সামগ্রিকভাবে আয় নির্ভর করে ভোগ এবং বিনিয়োগের পরিমাণের উপর। কেইন্‌সের মতে ভোগের প্রবণতা ও বিনিয়োগের প্রবণতার উপরেই আয় নির্ভর করে। অনুরূপভাবে আয় যুক্তভাবে সঞ্চয়ের প্রবণতা এবং বিনিয়োগের প্রবণতা দ্বারাও নিরূপিত হয়। সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের সংজ্ঞার দিক হইতে চিন্তা করিলে এই দুইটি সর্বদাই সমান হইবে। লর্ড কেইন্‌স ইহাকে পরিসংখ্যানমূলক সমতা (Statistical equality) আখ্যা দিয়াছেন।

এই যুক্তি অনুযায়ী আয় (Income)=ভোগ (Consumption)+বিনিয়োগ (Investment)

সঞ্চয় (Saving)=আয় (Income)−ভোগ (Consumption)

বিনিয়োগ (Investment)=আয় (Income)−ভোগ (Consumption)

সুতরাং, বিনিয়োগ=সঞ্চয়।

সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের এই সমতা (equality) এবং ইহাদের ভারসাম্য (equilibrium) যে এক জিনিস নয়, সমালোচকগণ অনেকক্ষেত্রেই তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন ; এইজন্যই সঞ্চয় ও বিনিয়োগের এই সমতা অনেকক্ষেত্রে ভুল ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে।* যদিও সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের পরিমাণ পরস্পরের সমান, তবুও সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ একই উপাদানের উপর নির্ভরশীল নয়। সঞ্চয় মূলতঃ আয়ের উপর নির্ভর করে ; বিনিয়োগ মূলতঃ নির্ভর করে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা (Marginal Efficiency of Capital) এবং সুদের হারের উপর।

অপরিকল্পিত সঞ্চয় এবং অপরিকল্পিত বিনিয়োগ পরস্পরের সমান নাও হইতে পারে। কিন্তু, কতিপয় শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে এমন একটি অবস্থা আসিতে পারে যখন সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের ভারসাম্য অর্জিত হইবে। কেইন্‌স সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের ভারসাম্য আলোচনা করার সময় দুইটি যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। একটি যুক্তি অনুযায়ী সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের সংজ্ঞা এমনভাবে প্রদত্ত হইয়াছে যে, সংজ্ঞা অনুযায়ী ইহারা সর্বদাই পরস্পরের সমান। কিন্তু

---

* অধ্যাপক হ্যান্সেনের (Hansen) ভাষায়, "This equality of savings and investment has often been a source of confusion. This confusion has been due to the inability of the critics to realise that while investment and savings are always equal, they are not always in equilibrium."

কেইন্‌সের অধিকতর গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হইতেছে এই সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে দুইটি পরস্পর ছেদকারী অর্থনৈতিক ক্রিয়ার তালিকা (intersecting schedules of economic behaviour) হিসাবে কল্পনা করিতে হইবে এবং ইহাদের পারস্পরিক ছেদ-বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জিত হইবে* এইজন্য সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের দুইটি তালিকা (schedules) তৈয়ার করিয়া ইহাদের ভারসাম্য বুঝানো যাইতে পারে। দামের পরিবর্তনের ভিতর দিয়াই যেমন চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য অর্জিত হয়, সেইরূপ আয়ের পরিবর্তনের ভিতর দিয়া সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ভারসাম্য অর্জিত হয়। নিম্নের চিত্রে ইহা দেখান হইল :—

এই চিত্রে vertical axisটি সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বুঝাইতেছে এবং horizontal axisটি আয় বুঝাইতেছে। নীচের দিক হইতে সঞ্চয়-রেখাটি (S) বিনিযোগ
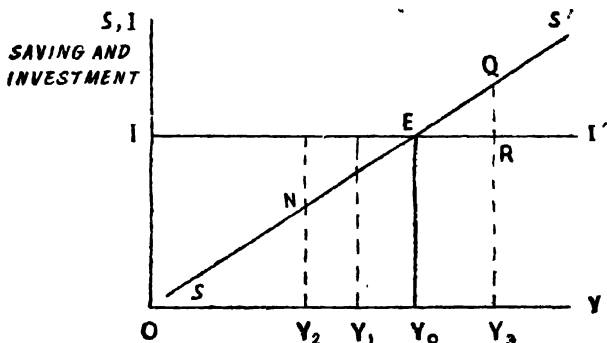
চিত্র নং ৮৮

রেখাকে (I লাইন) E বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে এবং এখানেই আমরা সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ভারসাম্য দেখিতে পাই। যখন আয়ের পরিমাণ OY_2, তখন সঞ্চয় হইতে বিনিয়োগের পরিমাণ বেশী। ইহাতে একদিকে আয় আরও বাড়িতেছে, সঞ্চয়ের পরিমাণও অপরদিকে বাড়িতেছে। এইভাবে E বিন্দুতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ভারসাম্য অর্জিত হইয়াছে। পুনরায় আয় বাড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে (যেমন, OY_3 আয়ে) সঞ্চয়ের পরিমাণ বিনিয়োগের পরিমাণ হইতে বেশী হইতেছে। বিনিয়োগের পরিমাণ কম হওয়ায় আয়ের পরিমাণ আবার কমিতে থাকিবে এবং অবশেষে E বিন্দুতে পুনরায় সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের ভারসাম্য অর্জিত হইবে এবং ভারসাম্য পর্যায়ের আয় হইবে OY.

* অধ্যাপক ক্লেইন্ (Prof. Klein) বলেন, "There are two Keyneses on the matter of the savings-investment equation. One Keynes maintains the equality of saving and investment in terms of definitions of observable economic quantities with no refutable hypothesis behind the equation. The better side of Keynes' dual personality states the saving-investment relation in terms of intersecting schedules of economic behaviour, which determine an equilibrium position.'

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের এইভাবে ভারসাম্য অর্জিত হইবার পথে কতিপয় সময়ের ফাঁক (time lags) থাকিতে পারে। যেমন, আয় বাড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সঞ্চয়ের পরিমাণ সমান হারে নাও বাড়িতে পারে। দেখা যাইতেছে বিনিয়োগের হ্রাস-বৃদ্ধির উপরেই আয়ের পরিবর্তন নির্ভর করে। সঞ্চয়ের পরিবর্তন আয়ের পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল। আয়ের পরিবর্তনের ফলেই সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ভারসাম্য অর্জিত হয়। সেইজন্য কেইন্‌সের মতে সঞ্চয় হইতেছে অবশিষ্টাংশ মাত্র। ("Saving is a residual"—*Keynes*)। অধ্যাপক রবার্টসনের মতেও সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ভারসাম্য আয়ের পরিবর্তনের মাধ্যমে হয়। তবে তাঁহার মতে সঞ্চয় হইতেছে আগেকার অর্জিত আয় হইতে বর্তমানের খরচ বাদ দিলে যাহা থাকে তাহার সমান (···yesterday's income minus today's consumption).

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ভারসাম্য তত্ত্বটি মূল্য পরিবর্তনের কারণ নির্দেশ করিতে পারে। যদি বিনিয়োগের পরিমাণ সঞ্চয়ের পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হয়, তবে মূল্যস্তরের বৃদ্ধি দেখা যায়। যদি সঞ্চয়ের পরিমাণ বিনিয়োগের পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হয়, তবে মূল্যস্তরের অবনতি দেখা যায়। যখন সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ভারসাম্য বজায় থাকে, তখন মূল্যস্তরের স্থিরতা দেখা যায়। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ভারসাম্য তত্ত্বটির সাহায্যে আমরা অনেক জিনিস বুঝাইতে পারি যাহা অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটির (Quantity Theory of Money) মাধ্যমে বুঝানো যায় না। শুধু মূল্যস্তরের হ্রাসবৃদ্ধিই নহে টাকার প্রচলনবেগও (velocity of circulation of money এই তত্ত্বের সাহায্যে বুঝানো যায়। যদি বিনিয়োগের পরিমাণ বেশী হয়, তবে টাকার প্রচলনবেগও বেশী থাকে এবং যদি সঞ্চয়ের পরিমাণ কম হয়, তবে টাকার প্রচলনবেগ অনেক কমিয়া যায়।

বিনিয়োগ এবং গুণক (Investment and Multiplier): কেইন্‌সের নিয়োগ তত্ত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইতেছে গুণক তত্ত্ব (Theory of Multiplier)। নিয়োগ তত্ত্বে দেখা যায়, বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইলে জাতীয় আয় বাড়ে, এবং শুধু তাহাই নহে, বিনিয়োগ যতটা বৃদ্ধি পায় জাতীয় আয় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী বৃদ্ধি পায়। জাতীয় আয়ের উপর বিনিয়োগের এই প্রভাবকে বলা হয় গুণক তত্ত্ব (Multiplier Theory)।

বি. কাহাকে বলে ?

নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগ বাড়িলে সেই অনুপাতে জাতীয় আয় যতগুণ বাড়ে তাহাই হইতেছে গুণক (multiplier)। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ বাড়িলে যদি ১৮০০ কোটি টাকা জাতীয় আয় বাড়ে, তবে গুণক হইতেছে ৬। অর্থাৎ, বিনিয়োগ বাড়াইয়া দেওয়ার ফলে জাতীয় আয় ছয়গুণ বাড়িয়াছে।

গুণকের ব্যাখ্যা খুঁজিতে হইলে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার ভিত্তিতে ইহার কারণ খুঁজিতে হইবে। ধরা যাক, কোন একটি ক্ষেত্রে যেমন রাস্তাঘাট নির্মাণে বিনিয়োগ

হইল ১০ কোটি টাকা, ইহার ফলে রাস্তানির্মাণে যাহারা নিযুক্ত হইবে অথবা যে সকল উপাদান রাস্তাঘাট নির্মাণে নিয়োগ করা হইবে তাহাদের আয় বাড়িবে। সমাজের মোট আয় প্রাথমিকভাবে ১০ কোটি টাকা বাড়িবে। কিন্তু যে সকল লোক এই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কর্মে নিযুক্ত হইয়াছে তাহাদের প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা $\frac{৪}{৫}$ ধরা যাক। তাহা হইলে ঐ ১০ কোটি টাকা হইতে ৮ কোটি টাকা ভোগ-ব্যয় হইবে। তখন ভোগ-সামগ্রী উৎপাদনকারীদের আয় বাড়িবে ৮ কোটি টাকা। তাহাদের প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা যদি $\frac{৪}{৫}$ হয়, তবে সেই ৮ কোটি টাকার মধ্যে ৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ভোগ-ব্যয় হইবে। আবার যাহাদের এই ৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা আয় হইল তাহাদের প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা যদি $\frac{৪}{৫}$ হয়, তবে তৃতীয় পর্যায়ে ভোগ-ব্যয়ের পরিমাণ হইবে ৫ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। এইভাবে আয় অর্জন এবং তাহা হইতে ব্যয় যদি চলিতে থাকে, তবে আয়-বৃদ্ধি ও ব্যয়-বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ কমিতে থাকিবে; কারণ, প্রতিটি পর্যায়েই অতিরিক্ত আয়ের $\frac{১}{৫}$ ভাগ সঞ্চিত হইবে। এখন প্রতিটি পর্যায়ের আয়বৃদ্ধি যোগ করিলে মোট বৃদ্ধি দাঁড়ায় ১০ কোটি টাকা + ৮ কোটি টাকা + ৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা + ৫ কোটি ১২ লক্ষ টাকা + ... = ২৯ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা।

গুণকের উদাহরণ

প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার ভূমিকা

উপরে যে উদাহরণ দেওয়া হইল, তাহাতে জাতীয় আয়ের পরিমাণ ২৯ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বাড়িয়া থামিয়া যায় নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত এই বিনিয়োগের দরুণ সমাজের কোন শ্রেণীর আয় বাড়িতে থাকিবে এবং তাহাদের প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা $\frac{৪}{৫}$ থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই হারে আয় বাড়িতে থাকিবে। আয়ের বৃদ্ধি তখন আসিয়া থামিবে যখন অতিরিক্ত আয় হইতে $\frac{৪}{৫}$ ভাগ ব্যয়িত হইবে না। অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা স্থির (stable) থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই হারে আয় বাড়িতে থাকিবে। এখন প্রশ্ন হইতেছে কিভাবে এই গুণক নির্ধারণ করা যায়। প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার উপর গুণক নির্ভরশীল বলিয়া আমরা বলিতে পারি গুণক হইতেছে প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতার বিপরীতের সমান (reciprocal of the marginal propensity to save)। যদি প্রান্তিক সঞ্চয়প্রবণতা $\frac{১}{৫}$ হয়, তবে গুণক হইবে ৫। প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা অধিক হইলে অথবা প্রান্তিক সঞ্চয়প্রবণতা কম হইলে গুণক বেশী হইবে। সংক্ষেপে এই সূত্রটিকে আমরা নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারি।

গুণক প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতার বিপরীতের সমান

$$\text{আয়ের পরিবর্তন} = \frac{১}{\text{প্রান্তিক সঞ্চয়প্রবণতা}} \times \text{বিনিয়োগের পরিবর্তন}$$

$$= \frac{১}{১ - \text{প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা}} \times \text{বিনিয়োগের পরিবর্তন}$$

অথবা, গুণক হইতেছে = $\frac{১}{\text{প্রান্তিক সঞ্চয়প্রবণতা}}$ ।

নিম্নলিখিত উপায়ে multiplier হিসাব করা যায়। ধরা যাক্‌, y = আয়, i = বিনিয়োগ, s = সঞ্চয়ের প্রবণতা, c = ভোগ, $\frac{dc}{dy}$ = ভোগের প্রান্তিক প্রবণতা, $\frac{di}{dy}$ = বিনিয়োগের প্রবণতা, k = multiplier. এই উপাদানগুলি ধরিয়া লইয়া আমরা বলিতে পারি $K = \frac{dy}{di}$ অর্থাৎ, বিনিয়োগ বাড়াইলে সেই অনুপাতে যে আয় বৃদ্ধি ঘটে, তাহাই multiplier, আয়ের বৃদ্ধি হইতে ভোগের প্রবণতা বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই হইতেছে সঞ্চয়ের প্রবণতা। অর্থাৎ, $s = 1 - \frac{dc}{dy}$. কিন্তু আয়ের বৃদ্ধি হইতে ভোগের প্রবণতা বাদ দিলে তাহাকে বিনিয়োগের প্রবণতা বলা যাইতে পারে, অর্থাৎ $s = 1 - \frac{dc}{dy} = \frac{di}{dy}$ সুতরাং যদি $s = \frac{di}{dy}$ হয়, তবে $\frac{1}{s} = \frac{dy}{di}$; অর্থাৎ $\frac{1}{s} = K$. অথবা multiplier হইতেছে $\frac{1}{s}$. সুতরাং আয়ের পরিবর্তন হইতেছে, $\delta Y = \frac{1}{s} . \Delta Y$ এখানে $\frac{1}{s}$ গুণক বুঝাইতেছে এবং ΔY বিনিয়োগের পরিবর্তন বুঝাইতেছে।

সঞ্চয়-বৃদ্ধি গুণকের কার্যকারিতা নষ্ট করে

যদি প্রান্তিক সঞ্চয়ের প্রবণতা স্থির না থাকিত অথবা ভোগের প্রবণতা কমিয়া যাইত তবে গুণক কার্যকর হইত না। যাহা বিনিয়োগ হইতেছে তাহাতে জাতীয় আয় বাড়িবে না যদি প্রান্তিক সঞ্চয়প্রবণতা বাড়িয়া যায় অথবা প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা কমিয়া যায়। নিম্নের চিত্রে ইহা দেখানো হইয়াছে।

বি...রর কার্যকারিতার টীকা

গুণক বা মাল্টিপ্লায়ার তত্ত্বটি কার্যকর হইবার প্রধান শর্ত হইতেছে, লোকের প্রান্তিক ভোগ-ব্যয়ের স্থিরতা (stability of the marginal propensity to consume)। লর্ড কেইন্‌স মনে করেন, প্রথমে আয় বাড়িলে সাময়িকভাবে ভোগের প্রবণতা উঠানামা করিতে পারে কিন্তু চূড়ান্তভাবে ভোগ-ব্যয়ের স্থিরতা দেখা যায়। গুণক কার্যকর হই...ার আর একটি শর্ত হইতেছে ভবিষ্যৎ চাহিদার গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে উৎপাদনকারীর সম্পূর্ণ দূরদৃষ্টি (perfect foresight) থাকা চাই। সবশেষে, যে সকল ছিদ্র থাকার দরুণ গুণক কার্যকর হয় না, যেমন, লোকের সঞ্চয়ের আধিক্য, অধিক পরিমাণে সরকারী করপ্রদানে বাধ্য হওয়া, আমদানির জন্য বিদেশে অর্থপ্রদান, এবং আয়প্রাপ্তি ও সেই প্রাপ্ত অর্থ খরচ করিবার মধ্যে সময়ের ব্যবধান (Income-

Expenditure lag),—প্রভৃতি উপাদানের অনুপস্থিতি হইতেছে গুণক কার্যকর হইবার গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

সরকারী আয়-ব্যয় নীতিতে আমরা গুণকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখিতে পাই। করের হার বাড়াইয়া দেওয়া হইলে গুণকের কার্যকারিতা নষ্ট হয়। কারণ যে টাকা সরকার কর ধার্য করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে গ্রহণ করেন, তাহা জনসাধারণ ভোগ-সামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় করিতে পারিত এবং সেই ক্ষেত্রে গুণক কার্যকর হইত। করবৃদ্ধির ফলেই গুণকের কার্যকারিতা নষ্ট হইয়াছে। অপর পক্ষে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়া গেলে গুণক কার্যকর হয়। কেননা সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ যখন বাড়ে তখন দেশে টাকার প্রচলন-বেগ (velocity of circulation) বাড়িয়া যায় এবং ক্রেতাদেরও ক্রয়শক্তি বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে ভোগ-ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ে এবং গুণক কার্যকর হয়। নিম্নের চিত্রে ইহা দেখানো হইয়াছে।
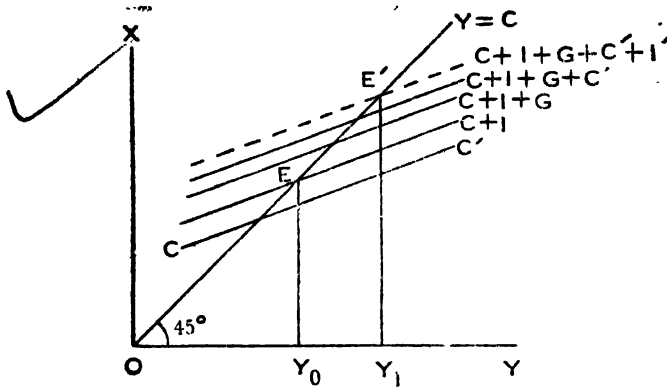
চিত্র নং ৮৯

E বিন্দুতে ভারসাম্য পর্যায়ে আয় নিরূপিত হইতেছে এবং OY_0 হইতেছে ভারসাম্য পর্যায়ের আয় (equilibrium level of income)। ধরা যাক্ এখন কিছু পরিমাণ সরকারী ব্যয় হইতেছে এবং 'C+I' রেখা ও 'C+I+G' রেখার মধ্যে যে দূরত্ব তাহা সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ বুঝাইতেছে। এই সরকারী ব্যয়ের ফলে ভোগপ্রবণতা আরও বাড়িয়া যাইতেছে; তাহা সূচিত হইতেছে 'C+I+G' রেখা এবং 'C+I+G+C′' রেখার দূরত্বের দ্বারা। ভোগের প্রবণতা বাড়িয়া যাওয়ায় বিনিয়োগের পরিমাণ আরও বাড়িয়া যাইতেছে এবং তাহা সূচিত হইতেছে 'C+I+G+C′' রেখা এবং C+I+G+C′+I′' রেখার দূরত্বের দ্বারা। ইহাতে আয়ের পরিমাণ OY_0 হইতে OY_1 পর্যন্ত বাড়িয়া যাইতেছে। উপরের চিত্রে দেখা যাইতেছে, যে পরিমাণ সরকারী ব্যয় বাড়িয়াছে, জাতীয় আয় তাহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণে বাড়িয়াছে। ইহার দ্বারাই গুণকের কার্যকারিতা সূচিত হইয়াছে।

আমরা ধরিয়া লই যে, গতিবৃদ্ধির প্রভাব বর্তমানে অনুপস্থিত. তবে যতটা বিনিয়োগ বাড়িবে তাহার গুণক অনুযায়ী জাতীয় আয় বাড়িবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে যদি ভোগের প্রান্তিক প্রবণতা হয়, ইহার পূর্বে যাহা জাতীয় আয় ছিল তাহার ½ ভাগ এবং যদি গতিবৃদ্ধির প্রভাব একক (unity) হয়. তবে শুধু গুণকের প্রভাব হইতে যে আয় পাওয়া যায় আমরা শুধু সেই পর্যায়েই আয়ের বৃদ্ধি দেখিতে পাই। যদি তৃতীয় পর্যায়ে ভোগের প্রান্তিক প্রবণতা এবং গতিবৃদ্ধির প্রভাব, উভয়ই বেশী হয়, তাহা হইলে বর্ধিত জাতীয় আয়ের পরিবর্তন আরও বেশী চোখে পড়িবে। এইভাবে গুণকের প্রভাব এবং গতিবৃদ্ধির প্রভাব যতই বাড়িতে থাকিবে, জাতীয় আয়ও ততই বাড়িয়া যাইবে। নিম্নের তালিকায় ইহা দেখানো হইয়াছে।

সময় (Period)	স্বয়ংসৃষ্ট বিনিয়োগ (Autonomous Investment)	প্রণোদিত ভোগ ব্যয় (Induced Consumption)	প্রণোদিত বিনিয়োগ (Induced Investment)	মোট বিনিয়োগ (Total Investment)	আয় (টাকায়) (Income in Rupees)
১	১০০	—	—	১০০	১০০
২	১০০	৫০	১০০	২০০	২৫০
৩	১০০	১২৫	১৫০	২৫০	৩৭৫
৪	১০০	১৮৭·৫০	১২৫	২২৫	৪১২·৫০

যখন প্রথম সময়ে স্বয়ংসৃষ্ট বিনিয়োগ ১০০ হইতেছে তখন আয়ও হইতেছে ১০০ টাকা। এই সময়ের মধ্যে গুণকের প্রভাব এবং গতিবৃদ্ধির প্রভাব ধরা হয় নাই। কিন্তু যে ১০০ টাকা আয় হইল তাহার ½ অংশ, অর্থাৎ, ৫০ টাকা দ্বিতীয় সময়ে ভোগে ব্যয়িত হইবে (কারণ ভোগের প্রান্তিক প্রবণতা হইতেছে আয়ের ½ অংশ)।

ইহার ফলে প্রণোদিত বিনিয়োগ হইবে ১০০, কারণ গতিবৃদ্ধির প্রভাব এখানে একক (unity) ধরা হইয়াছে। ইহাতে মোট বিনিয়োগ হইবে ২০০=(১০০+১০০) টাকার এবং জাতীয় আয় (Y=1+C) দাঁড়াইবে ২৫০ (=২০০+৫০) টাকায়। তৃতীয় সময়ে ভোগ-ব্যয়ের পরিমাণ হইবে ১২৫ টাকা (২৫০ টাকার ½ ভাগ) এবং প্রণোদিত বিনিয়োগ ১০০ টাকা হইতে বাড়িয়া হইবে ১৫০ টাকা। কারণ, আগেকার সময়ে ভোগ-ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৫০ টাকা এবং একক গতিবৃদ্ধির প্রভাবে প্রণোদিত বিনিয়োগ ৫০ টাকা বাড়িয়াছে)। ইহাতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হইবে ২৫০ টাকা (=১০০+১৫০) এবং জাতীয় আয়ের পরিমাণ হইবে ৩৭৫ টাকা (=২৫০+১২৫) চতুর্থ সময়ে পুনরায় ভোগ-ব্যয় হইবে ১৮৭·৫০ টাকা (৩৭৫ টাকার ½ ভাগ) এবং প্রণোদিত বিনিয়োগের পরিমাণ হইবে ১২৫ টাকা। ইহাতে মোট বিনিয়োগ হইবে ২২৫ টাকার সমান (=১০০+১২৫), এবং জাতীয় আয় বাড়িয়া হইবে ৪১২·৫০ টাকা। উপরের তালিকা হইতেই গুণক এবং গতি-বৃদ্ধির যৌথ প্রভাব প্রতীয়মান হয়।

Exercise

1. Discuss the Keynesian theory of Multiplier and point out its limitations.
[কেইনসীয় গুনক তত্ত্বটি আলোচনা কর এবং ইহার সীমাবদ্ধতা দেখাও।] (৩৪২-৩৪৭ পৃষ্ঠা)

2. Describe the factors that determine the level of employment of a country.
[কোন দেশের নিয়োগ স্তর নিরূপণকারী উপাদানগুলি বর্ণনা কর।] (৩২৫-৩২৭ পৃষ্ঠা)

3. Write a note on the Acceleration Principle.
[বিনিয়োগের গতিবৃদ্ধির নীতির উপর একটি টীকা লিখ।] (৩৪৭-৩৪৯ পৃষ্ঠা)

4. Explain the process of interaction of the multiplier and acceleration effects.
[গুণক এবং গতিবৃদ্ধি নীতির প্রভাবের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।] (৩৪৯-৩৫১ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the factors governing the consumption function of the People.
[জনসাধারণের ভোগ-জনিত ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী উপাদানগুলি আলোচনা কর।] (৩২৭-৩৩১ পৃষ্ঠা)

6. Examine how far the level of investment can be influenced by changes in the rate of interest.
[সুদের হারের পরিবর্তনের দ্বারা বিনিয়োগের স্তর কতটা প্রভাবিত হইতে পারে তাহা ব্যাখ্যা কর।] (৩৩৬-৩৩৮ পৃষ্ঠা)

7. How is the equilibrium level of income determined ?
[ভারসাম্য পর্যায়ের আয় কিভাবে নির্ধারিত হয় ?] (৩৩৮-৩৪১ পৃষ্ঠা)

8. "Savings and investment are always equal"—Examine the statement.
["সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সর্বদা সমান",—উক্তিটি পরীক্ষা কর।] (৩৩৯-৩৪২ পৃষ্ঠা)

9. Discuss the Keynesian theory of Investment Function.
[কেইনসীয় বিনিয়োগ-তত্ত্ব আলোচনা কর।] (৩৩২-৩৩৫ পৃষ্ঠা)

10. Comment on the statement that the fundamental psychological law ..is .. that men are disposed, as a rule and on the average, to increase consumption as their income increases but not by as much as the increase in their income.
[নিম্নলিখিত উক্তিটির উপর মন্তব্য কর—"মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক নিয়মটি হইতেছে এই যে আয় বাড়িলে মানুষ নিয়মমাফিক এবং গড়ে ভোগ-ব্যয় বাড়াইয়া থাকে, তবে ইহা যে হারে আয় বাড়ে সেই হারে নহে"।] (৩২৭-৩৩০ পৃষ্ঠা)

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

বেকার-সমস্যা
(The Problem of Unemployment)

সম্পূর্ণভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশে যেমন সোভিয়েত রাশিয়ায়, সরকার পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হইতে দেন না। কিন্তু, আধুনিক বিশ্বে, বিশেষত, ধনতান্ত্রিক, আধা-ধনতান্ত্রিক, এবং অনগ্রসর দেশগুলিতে

আমরা বেকার-সমস্যার তীব্রতা দেখিতে পাই। 'বেকার' বলিতে সাধারণ অর্থে আমরা বুঝি এমন লোক যাহার কোন কাজ নাই। কিন্তু কাজ না থাকিলেই যে কেহ বেকার হইবে তাহা নহে। অনেকে ইচ্ছা করিয়া হয়ত কোন কাজ করে না। এই ধরনের বেকারঅবস্থাকে স্বেচ্ছামূলক বেকারত্ব (voluntary unemployment) বলে। অনেক ক্ষেত্রে বহুদিন যাবৎ কাজ না করিবার ফলে কেহ কাজ করিবার মনোবৃত্তি হারাইয়া ফেলিতে পারে। কাজ করিবার প্রয়োজন হয় না, যেমন বহু স্ত্রীলোক আছেন যাঁহারা বাহিরে কাজ করেন না অথবা যাহাদের বাহিরে কাজ করার প্রয়োজন হয় না। তাঁহারা সকলেই স্বেচ্ছাকৃত বেকার। প্রকৃত বেকার হইতেছে এমন লোক যাহার কাজ করিবার প্রয়োজন এবং ইচ্ছা দুই-ই আছে, অথচ কোন কাজই সে পায় না। প্রচলিত মজুরির হারে কাজ করিতে ইচ্ছুক অথচ কোন কাজই কেহ পায় না এই ধরনের বেকার অবস্থাকে অনিচ্ছাকৃত বেকার-অবস্থা (involuntary unemployment) বলে। ক্লাসিকাল অর্থ-বিজ্ঞানিগণ জে. বি. সে. (J B. Say) এবং তাঁহার অনুগামীদের মতে পূর্ণ নিয়োগ বা Full Employment সর্বদাই বজায় থাকে। একটি বিশেষ শিল্পে সাময়িকভাবে বেকার-অবস্থার সৃষ্টি হইলেও সাধারণভাবে সমগ্র দেশে বেকার-অবস্থার সৃষ্টি হয় না।

স্বেচ্ছাকৃত বেকার

অনিচ্ছাকৃত বেকার

অনিচ্ছাকৃত বেকারত্বের বিভিন্ন রূপ আছে

বেকার-সমস্যা হইতেছে অনুন্নত দেশগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উন্নত দেশগুলিতেও বেকার সমস্যা থাকিতে পারে। কিন্তু অনগ্রসর দেশগুলিতে এই সমস্যা যত তীব্র, উন্নত দেশগুলিতে ইহা তত তীব্র নহে। বেকার-সমস্যার গুরুত্বও খুব বেশী। বেকার-সমস্যার সমাধান করিতে না পারিলে বেকার লোকদের কর্মক্ষমতা কমিয়া যায়, দেশে অসন্তোষের সৃষ্টি হয় এবং ইহার ফলে সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সংকটের সম্মুখীন হইতে পারে।

অনগ্রসর দেশে বেকার-সমস্যা তীব্র

বিভিন্ন ধরণের বেকার অবস্থা এবং ইহার প্রতিকার (Different Types of Unemployment and its Remedies) : অধিকাংশ অনুন্নত দেশেই কৃষকদের সমস্ত বৎসর কাজ করিতে হয় না, যেমন কৃষিক্ষেত্র হইতে ফসল উঠাইবার আগে কৃষি-শ্রমিকগণের বৎসরে প্রায় তিনমাস কোন কাজ থাকে না, কারণ সেই সময়ে কৃষি-উৎপাদনের জন্য মাঠে কাজ করিতে হয় না। এই ধরণের বেকার অবস্থাকে মরশুমী বা ঋতুগত বেকার-অবস্থা (Seasonal Unemployment) বলা হয়। শৈলাবাসগুলিতে শীতকালে যাত্রীদের ভীড় হয় না; তখন সেই অঞ্চলের লোকদের বেকার অবস্থার সৃষ্টি হয়। শীতকালে আইসক্রীম বিক্রেতাদেরও কাজের অভাব থাকে। আবার ছুটির সময় দ্রষ্টব্য স্থানগুলিতে যাত্রীদের ভীড় হয়, তখন সেই সময়ে ঐ অঞ্চলগুলির

মরশুমী বা ঋতুগত বেকারত্ব

লোকদের কাজের সুযোগ বাড়ে। মরশুমী বেকার অবস্থার প্রতিকারের জন্য উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া কৃষকদের জন্য পরিপূরক কাজের (subsidiary occupation) ব্যবস্থা করা উচিত। এমনভাবে বিভিন্ন শিল্পের পুনর্গঠন করিতে হইবে যেন একটি শিল্পে কাজ শেষ হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিকগণ অন্য শিল্পে কাজ পায়। এই উদ্দেশ্যে গ্রামের কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে এমনভাবে উন্নত করা যাইতে পারে। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে এমনভাবে উন্নত করা যাইতে পারে যাহাতে কৃষকগণ অবসরসময়ে নিজেদের এই শিল্পগুলির উৎপাদনবৃদ্ধির কাজে ব্যাপৃত রাখিতে পারে। যখন কৃষকদের মাঠে কোন কাজ থাকে না তখন জেলাবোর্ড রাস্তাঘাট নির্মাণ, অথবা এই জাতীয় অন্য কোন কাজে উদ্বৃত্ত কৃষি শ্রমিকদের নিযুক্ত করিতে পারে।

সংগঠনজনিত বেকার-অবস্থা মরশুমী বা ঋতুগত বেকার অবস্থার প্রতিকার

অনেকক্ষেত্রে আমরা সংগঠনজনিত বেকারঅবস্থা (Structural Unemployment) দেখিতে পাই। সংগঠনজনিত বেকারত্ব দুইটি কারণে সৃষ্টি হইতে পারে, (১) চাহিদার স্থায়ী পরিবর্তন (Permanent change in demand), এবং (২) শিল্পের কলাকৌশলের উন্নয়ন (Technical Progress) চাহিদার পরিবর্তন হইলে উৎপাদন-কাঠামোরও পরিবর্তন হয়। তাঁতের কাপড়ের চাহিদার স্থলে যদি মিলের কাপড়ের চাহিদা বাড়ে, তবে তাঁতশিল্পের শ্রমিকগণ বেকার হইবে। আবার সাধারণ কাপড়ের শার্টের বদলে যদি টেরিলিন এবং নাইলনের শার্টের জন্য স্থায়ী চাহিদার সৃষ্টি হয়, তবে প্রথম শ্রেণীর শিল্প বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং সেখানে বেকারঅবস্থার সৃষ্টি হইবে। বিদেশী প্রতিযোগিতার ফলে দেশের শিল্প-কাঠামোর পরিবর্তন হইতে পারে অথবা বিদেশের চাহিদা কমিয়া গেলে দেশের শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। বিভিন্ন শিল্পে আধুনিক যন্ত্রপাতি বেশী করিয়া প্রবর্তন করিলে অনেক শ্রমিক ছাঁটাই করিবার প্রয়োজন হয়। শিল্পের কলাকৌশলের উন্নয়নের ফলে আধুনিকীকরণের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে বেকার-সমস্যার সৃষ্টি হয়। শ্রম-সঞ্চয়ী (labour-saving) এবং মূলধন-প্রধান (capital-intensive) উৎপাদন পদ্ধতি প্রচলনের ফলে অনেকে বেকার হইয়া যাইতে পারে। ইহাকে কলাকৌশলজনিত পরিবর্তনের ফলে বেকারঅবস্থা (Technological Unemployment) অথবা কাঠামোজনিত (Structural Unemployment) বেকার-অবস্থা বলে। সংগঠনজনিত বেকারঅবস্থা কিংবা কলাকৌশলের পরিবর্তনজনিত বেকার-অবস্থার প্রতিকারের জন্য উৎপাদন সামগ্রীর জন্য যাহাতে নূতন চাহিদার সৃষ্টি হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। যদি চাহিদা বাড়ে তবে উৎপাদনের পরিবর্তনও বাড়িবে এবং ইহাতে নূতন লোকের কাজের ব্যবস্থা হইতে পারে। বেকার-সমস্যা তীব্র হইলে আধুনিক শিল্প ব্যবস্থায় যতদূর

সংগঠনজনিত বেকারত্ব

কলাকৌশলের পরিবর্তনজনিত বেকারত্বের প্রতিকার

সম্ভব শ্রম-প্রধান উৎপাদন-পদ্ধতি (labour-intensive method of production) অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু এজন্য উন্নতধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। সেজন্য নূতন যন্ত্রপাতি প্রবর্তনের মাধ্যমে যে সকল শ্রমিক ছাঁটাই হয়, তাহারা যাহাতে নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কাজ পায় সেই অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে, এবং সেই অবস্থার সৃষ্টি তখনই হইবে যখন নূতন নূতন চাহিদার সৃষ্টি হইবে এবং উৎপাদন-বৃদ্ধির সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হইবে। এইভাবে যন্ত্রপাতিজনিত এবং কাঠামোজনিত বেকার-সমস্যার (Technological and Structural Unemployment) সমাধান করা যাইতে পারে। বাজারে শ্রমের চাহিদা ও যোগানের সমতা আনয়ন করিবার জন্য অধিকসংখ্যক কর্মবিনিময়-সংস্থা (Employment Exchanges) স্থাপন করিয়া উহার মারফত বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিক নিয়োগ করা যাইতে পারে।

সংঘাতজনিত বেকারঅবস্থার (Frictional Unemployment) সৃষ্টি অনেকগুলি কারণে হইতে পারে। চাহিদার স্থায়িত্বের অভাব হইলে, অথবা চাহিদার সাময়িক পরিবর্তনের জন্য শ্রমিকরা কিছু সময়ের জন্য বেকার হইয়া যাইতে পারে। সিমেন্টের অভাব হইলে রাজমিস্ত্রীরা বেকার হইয়া যাইতে পারে। কাজের সংগঠনে ত্রুটি থাকিলে অথবা যন্ত্রপাতি বিকল হইলেও শ্রমিকরা বেকার হইয়া যাইতে পারে। কোন চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলে নূতন চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত কন্ট্রাক্টারগণ বেকার থাকিতে পারে। অনেক সময় হয়ত শ্রমিকগণ নিয়োগের সম্ভাবনা অথবা সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, অথবা শ্রমিকদের গতিশীলতার অভাব থাকে (অর্থাৎ, একস্থান ছাড়িয়া শ্রমিকরা অন্যত্র যাইতে চাহে না,) তখনও বেকার-অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। উল্লিখিত সবগুলি কারণেই যে বেকার-অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহাকে সংঘাতজনিত বেকার-অবস্থা (Frictional Unemployment) বলা হয়।

সংঘাতমূলকবেকারত্বের প্রতিকার

সংঘাতজনিত বেকার-অবস্থার প্রতিবিধান করার জন্য এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত যাহাতে শ্রমের গতিশীলতা বাড়ে। নিয়োগ-সংস্থা বা কর্মবিনিময়-সংস্থার (Employment Exchanges) মাধ্যমে শ্রমিকদের চাকরির সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দিলে এবং শ্রমিকদের গতিশীলতা বাড়াইবার জন্য কারিগরী শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা করিলে এই বেকারঅবস্থা প্রশমিত হয়।

প্রচ্ছন্ন বেকার-অবস্থা

অনুন্নত দেশগুলিতে আমরা একটি বিশেষ ধরনের বেকার-অবস্থা দেখিতে পাই; ইহাকে প্রচ্ছন্ন বেকার-অবস্থা (Disguised unemployment) বলে। প্রচ্ছন্ন বেকার-অবস্থা সাধারণতঃ গ্রামাঞ্চলে দেখা যায়। ধরা যাক্, একটি খামারে কতিপয় শ্রমিক কাজ করে। যদি এমন কখনও দেখা যায়, সেই খামার হইতে দুইজন বা একজন শ্রমিককে সরাইয়া আনিলেও এবং মূলধনে

কাঠামো ও শ্রমিকের দক্ষতা অপরিবর্তিত থাকিলেও সেই খামারের উৎপাদন মোটেই কমিতেছে না, তবে বুঝিতে হইবে যে খামারের উৎপাদন-বৃদ্ধিতে উক্ত দুইজন বা একজন শ্রমিকের মোটেই কোন ভূমিকা নাই। এইজন্য অধ্যাপিকা জোয়ান রবিন্‌সন ইহাকে প্রচ্ছন্ন বেকার-অবস্থা (Disguised (Unemployment) বলিয়াছেন।

বাণিজ্যচক্রজনিত বেকার-অবস্থা (Cyclical Unemployment): আমরা দেখিতে পাই, যখন মন্দার সৃষ্টি হয় তখন আয় এবং ক্রয়ক্ষমতার ঘাটতি থাকায় ক্রেতাদের কার্যকর চাহিদার ঘাটতি (deficiency in effective demand) দেখা যায়। কার্যকর চাহিদার ঘাটতি থাকায় উৎপাদনকারী কিংবা বিনিয়োগকারী উৎপাদন অথবা বিনিয়োগ বাড়াইবার প্রেরণা পায় না। দেশের অর্থনৈতিক সম্পদ তখন অব্যবহৃত থাকিয়া যায়। তখন জাতীয় আয় এবং নিয়োগ কমিয়া যায়। কারণ, ব্যবসায়ের লাভের আশা কম থাকায় বিনিয়োগকারীর কাছে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা (Marginal Efficiency of Capital) কমিয়া যায়, এবং আয়ের স্তর কম থাকায় ভোগ-ব্যয়ের পরিমাণও (consumption expenditures) কমিয়া যায়। গুণকতত্ত্ব তখন কার্যকর হয় না। দেখা যাইতেছে, বাণিজ্যচক্রজনিত বেকার-অবস্থা হইতেছে প্রকৃতপক্ষে কার্যকর চাহিদার ঘাটতি-জনিত বেকারঅবস্থা।

কার্যকর চাহিদার ঘাটতি এবং ভোগ-ব্যয়ের পরিমাণ কম

বাণিজ্যচক্রজনিত বেকার-অবস্থার (Cyclical Unemployment) প্রতিবিধানের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে এমন একটি আর্থিক নীতি (monetary policy) অনুসরণ করিতে হয় যাহাতে বিনিয়োগযোগ্য মূলধন ব্যাংকগুলির নিকট হইতে সহজে পাওয়া যায়। সরকারের দিক হইতেও তখন বিনিয়োগ বাড়াইবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়। সরকার কর-কাঠামোর সংস্কার করিয়া এবং বাজেট-ঘাটতির সৃষ্টি করিয়া ও অধিক বিনিয়োগমূলক খরচ (investment outlay) করিয়া দেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিতে পারে। যদিও সব অর্থবিজ্ঞানী এই বিষয়ে একমত যে, পূর্ণনিয়োগ (full employment) আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, তবুও পূর্ণনিয়োগের পর্যায়ে পৌছানো এবং তাহা বজায় রাখা সহজ নয়।

প্রচ্ছন্ন বেকার-অবস্থা দূর করার জন্য গ্রামাঞ্চলের সমুদয় নিহিত সঞ্চয় (Potential savings) একত্রিত করিয়া তাহা বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা দরকার। কৃষিক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত শ্রমিককে গ্রামীণ শিল্প এবং কুটিরশিল্পের কাজে নিযুক্ত করিয়াও প্রচ্ছন্ন বেকার-সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা যাইতে পারে।

প্রচ্ছন্ন বেকার-সমস্যার প্রতিকার

অনেক শিল্পে সাময়িকভাবে বেকারঅবস্থার সৃষ্টি হয়। ইহাকে সাময়িক বেকারঅবস্থা

(casual unemployment) বলে। যদি সাময়িকভাবে কোন শিল্পের উৎপাদিত সামগ্রীর জন্য চাহিদা কমিয়া যায়, তবে উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান উভয়ই সাময়িক-ভাবে কমিয়া যাইতে পারে।

বেকার সমস্যার সমাধানকল্পে অথবা পূর্ণ নিয়োগের পথে দেশকে লইয়া যাইবার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা (Measures for tackling the unemployment problem and for leading the country towords Full Employment): পূর্ণনিয়োগ অর্জন করা সরকারের অর্থনৈতিক নীতির উন্নত অন্যতম উদ্দেশ্য। দেশগুলি চেষ্টা করে দেশের সমুদয় সম্পদ ও উপকরণের সদ্ব্যবহার করিয়া দেশ হইতে অনিচ্ছাকৃত বেকার অবস্থা দূর করিতে। এই নীতিকে পূর্ণনিয়োগ নীতি (Full Employment Policy) বলা যাইতে পারে। কিভাবে বেকারঅবস্থা দূর করিয়া পূর্ণনিয়োগ করা যায় এবং মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা কমাইয়া দেশের অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব বজায় রাখা যায়, তাহাই হইতেছে বর্তমানকালের বিভিন্ন সরকারের অর্থনৈতিক নীতির মূল সমস্যা। অবশ্য অনগ্রসর দেশের ক্ষেত্রে অর্থ-নৈতিক নীতির উদ্দেশ্যকে আরও একটু ব্যাপক করা হয়। কারণ, পূর্ণনিয়োগ অর্জন করা অপেক্ষাও অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করা অনগ্রসর দেশগুলির পক্ষে বেশী জরুরী। সঙ্গে সঙ্গে বেকার অবস্থা দূর করিয়া পূর্ণনিয়োগ বজায় রাখার জন্য যে নীতি অবলম্বন করেন তাহা কিরূপ হওয়া উচিত। যখন বেকারঅবস্থা দূর করিতে হইবে তখন বিনিয়োগ বাড়াইবার জন্য ব্যাংকের ঋণ সহজলভ্য করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংক-রেট কমাইয়া দেয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ঋণ-প্রদানের ক্ষমতা ও জনসাধারণের ক্রয়শক্তি বাড়াইবার জন্য খোলাবাজারে সিকিউরিটি ক্রয় করে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ভোগ-ব্যয় ও বিনিয়োগ-ব্যয় বাড়াইয়া দিবার জন্য নির্বাচনমূলক মুদ্রানিয়ন্ত্রণ-নীতি প্রত্যাহার করে এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির মোট আমানতের কত অংশ নগদ রিজার্ভ রাখিতে হইবে সেই সম্পর্কে কড়াকড়ি হ্রাস করে, যাহাতে ব্যাংকগুলি বেশী করিয়া বিনিয়োগের জন্য ঋণ প্রদান করিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিলে দেশে বিনিয়োগ-বৃদ্ধির পরিবেশ সৃষ্টি হয়, উৎপাদকদেরও বিনিয়োগ-স্পৃহা বাড়ে এবং তাহারা উৎপাদন বাড়াইতে অনুপ্রাণিত হয়। ইহাতে বেকার অবস্থার প্রতিবিধান হয় এবং ক্রমশঃ পূর্ণনিয়োগের পথে অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা অগ্রসর হয়। সুদের হার কমাইয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে "সুলভ টাকা-কড়ির" নীতি (Cheap Money Policy) অনুসরণ করে, তাহা সরকারের আয়-ব্যয় নীতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই নিরূপিত করিতে হয়। সরকার বেকারত্ব দূর করিবার জন্য করের হার কমাইয়া দেন, নূতন কর ধার্য করা হইতে বিরত থাকেন,

পূর্ণনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সরকারকে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়

বেকার অবস্থা দূর করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ব্যবস্থা অবলম্বন

১। এই প্রসঙ্গে বর্তমানে বইয়ের ৪৪২-৪৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ক্ষেত্রবিশেষে কর প্রদান করা হইতে তাহাদের রেহাই দেওয়া, (২) ধনী ব্যক্তিদের উপর অধিক কর ধার্য করিয়া সেই কর হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব গরীবদের কল্যাণের জন্য ব্যয় করা, যাহাতে ধনীদের হাত হইতে ক্রয়শক্তি গরীবদের হাতে যায়, এবং (৩) সাধারণ কল্যাণমূলক ব্যবস্থাদির (welfare measures) মাধ্যমে গরীবদের অবস্থার উন্নতি করা।

আয় এবং ধনের পুনর্বণ্টনের ফলে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্রয়শক্তি বাড়িতে পারে এবং ইহা দেশের মূলধন-সৃষ্টির (capital formation) কাজে সহায়ক হইতে পারে। তাহাতে নিয়োগের সম্প্রসারণ হয়।

Exercise

1. What are the different types of unemployment? Suggest remedial measures to mitigate unemployment. (C. U. B. Com. 1968)

[বিভিন্ন ধরণের বেকার অবস্থা কি কি? বেকার সমস্যার সমাধানকল্পে বিভিন্ন ব্যবস্থার সুপারিশ কর।] (৩৫১-৩৫২(৩) পৃষ্ঠা)

2. What are the different types of unemployment? Discuss some of the principal measures that a Government may adopt for the relief of unemployment. (C. U. B. Com 1962)

[বিভিন্ন ধরণের বেকার অবস্থা কি কি? বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য সরকার কর্তৃক অবলম্বনযোগ্য কয়েকটি প্রধান প্রধান ব্যবস্থা আলোচনা কর।] (৩৫১-৩৫২ ৬) পৃষ্ঠা)

3. Write a note on the measures that may be adopted by a Government for achieving full employment. (৩৫২(৩)-৩৫২(৬))

[পূর্ণ নিয়োগ অর্জন করার জন্য সরকার যে ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিতে পারেন, সেগুলির উপর টীকা লিখ।]

চতুর্বিংশ অধ্যায়

বাণিজ্যচক্র
(Trade Cycle)

বাণিজ্যচক্র এবং ইহার বিভিন্ন স্তর (Meaning of a trade cycle and its different phases): ধনতান্ত্রিক দেশগুলির উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে শিল্প-বাণিজ্যে উত্থান-পতন। যদি একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিতভাবে শিল্প-বাণিজ্যের উত্থান-পতন হয়, তবে ইহাকে বাণিজ্যচক্র (trade or business cycle) বলে। শিল্প-বাণিজ্যের গতি কখনও উন্নত হয়, আবার কখনও

অবনত হয়। যখন শিল্প-বাণিজ্যের গতি ক্রমেই উন্নত হইতে থাকে, তখন আমরা দেখিতে পাই উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয়, চাহিদা, জিনিসপত্রের দাম সবই বাড়ে। এইভাবে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি যখন চরম পরিণতি লাভ করে তখনই ইহাকে আমরা বলি সমৃদ্ধি (boom or prosperity)। যতক্ষণ শিল্প ব্যবসায়ের চরম উন্নতি না হইতেছে, অথচ ইহা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে ততক্ষণ আমরা বলি সংকটমুক্তি (recovery) অথবা উন্নতি। দেশের শিল্পব্যবস্থা যখন উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, তখন দেখা যায় চাহিদার তুলনায় শ্রমিকদের যোগান কম হয়। আবার কোন কোন সময়ে আমরা শিল্প-বাণিজ্যের অধোগতি (recession) দেখিতে পাই। যখন অধোগতি আরম্ভ হয়, তখন কর্মসংস্থান, আয় এবং চাহিদা ক্রমশঃ কমিতে থাকে। সমৃদ্ধির সময়ে যদি উৎপাদন অতিরিক্ত ভাবে বাড়িয়া যায় তবে অধোগতির সময় আমরা চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত উৎপাদন দেখিতে পাই। জিনিসপত্রের দামও এই সময় কমিতে থাকে। শিল্প-বাণিজ্যের অধোগতি যখন চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে তখন শিল্প-বাণিজ্যে মন্দা (depression) দেখিতে পাই। এই মন্দা যদি স্থায়ী হয় তবেই সংকটের (crisis or stagnation) সৃষ্টি হয়।

বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন রূপ

বাণিজ্যচক্রের মোট চারিটি স্তর আছে; যথা, মন্দা বা সংকট, উন্নয়ন, সমৃদ্ধি এবং অধোগতি। ব্যবসায়ে যখন মন্দা বা সংকট দেখা যায়, তখন চাহিদার তুলনায় শ্রমিকের যোগান বেশী থাকে এবং অর্থনৈতিক সম্পদগুলির সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। ইহার ফলে বেকার সমস্যার (unemployment problem) সৃষ্টি হয়। শিল্পে বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধার অভাবই (lack of investment opportunities) বেকার সমস্যার মূল কারণ। সংকটের সময় বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা কম থাকার কারণ হইতেছে এই যে এই সময়ে ব্যবসায়ে লাভের সম্ভাবনা খুব কম থাকে, এবং জনসাধারণের সক্রিয় চাহিদাও (effective demand) খুব কম থাকে। চাহিদা কম থাকার কারণ হইতেছে কম আয়, এবং কম আয় হইবার কারণ হইতেছে কম বিনিয়োগ। সংকটের আগে যখন সমৃদ্ধি থাকে, তখন যদি উৎপাদন খুব বেশী হইয়া থাকে, তবে সংকটের আকারও খুব তীব্র হয়। কারণ, সেই সময়ে বাজারে চাহিদার তুলনায় উৎপাদিত সামগ্রীর যোগান বেশী হইয়া যায় এবং দামও কমিয়া যায়। ইহাতে ব্যবসায়ে লাভের আশা কম থাকে; ইহার ফলে নূতন বিনিয়োগ কম হয়। ব্যবসায়ীদের হাতে এই সময় অবিক্রীত সামগ্রী মজুত হইতে থাকে।

বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন স্তরের বৈশিষ্ট্য

সংকট (Crisis)

সংকটের শেষ অবস্থায় মুদ্রা সম্প্রসারণের ফলেই হোক অথবা রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার ফলেই হোক, বাজারে ধীরে ধীরে চাহিদার সৃষ্টি হইতে থাকে এবং শিল্প-ব্যবসায়ে লাভের আশা বাড়িয়া যাইবার দরুণ বিনিয়োগও ধীরে ধীরে বাড়িতে আরম্ভ করে।

ইহাতে লোকের আয় ক্রমে বাড়িতে আরম্ভ করে, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয় এবং জিনিসপত্রের দামও ক্রমশঃ বাড়িতে আরম্ভ করে। এই স্তরকে আমরা বলি সংকটমুক্তি (Recovery) অথবা উন্নতি। এই পর্যায়ে শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতি আরম্ভ হয়।

উন্নতি অথবা সংকট-মুক্তি (Recovery)

শিল্প-ব্যবসায়ে উন্নতি চরম পরিণতি লাভ করে সমৃদ্ধির মধ্যে। এই সময়ে আয়, সক্রিয় চাহিদা, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, জিনিসপত্রের দাম সবই বেশী থাকে। ব্যবসায়ীদেরও শিল্প-বাণিজ্যে লাভের পরিমাণ বাড়িতে আরম্ভ করে। যে হারে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে, তাহার তুলনায় লাভের হার অনেক বেশী থাকে। ব্যাংকের নিকট হইতে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণও এই সময় বাড়িয়া যায়, ইহার ফলে, শেয়ার বাজারও এই সময়ে খুব সক্রিয় থাকে। শিল্প-বাণিজ্য যখন সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে উপনীত হয়, তখন সাময়িক ভাবে দেশে পূর্ণ নিয়োগ (Full Employment) দেখা যাইতে পারে।

সমৃদ্ধি (Prosperity or Boom)

সমৃদ্ধির মধ্যে অধোগতির বীজ নিহিত থাকে। মুনাফা অর্জনের আশা যখন কমিয়া আসে, তখন বিনিয়োগও কমিতে আরম্ভ করে। ব্যাংকগুলিও তখন ঋণ প্রদান করা কমাইয়া দেয়। জনগণের আয় এবং চাহিদা কমিতে আরম্ভ করে। এই অবস্থার পরিণতি স্বরূপ জিনিসপত্রের দাম কমিয়া যায় এবং বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়।

অধোগতি (Recession)

নিম্নের চিত্রে বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন স্তর দেখানো হইয়াছে।

এই চিত্র প্রথমে বাণিজ্যচক্রের উর্দ্ধগতি (upswing) দেখানো হইয়াছে, ক্রমে ইহা সমৃদ্ধির (Boom) স্তরে পৌঁছিতেছে। ইহার পর অধোগতি (downswing) সুরু হইয়াছে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মন্দার (Depression) অবস্থা দেখানো হইয়াছে। মন্দা কাটিয়া গেলে আবার অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন অথবা উর্দ্ধগতি (Revival or upswing) সুরু হইয়াছে।
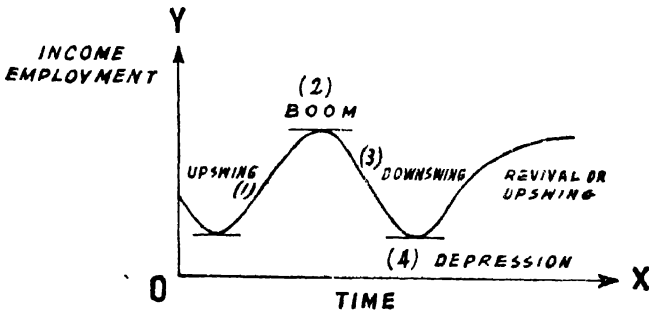
চিত্র নং ৯০

বাণিজ্যচক্রের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য : বাণিজ্যচক্রের গতি বিশ্লেষণ করিলে আমরা

দেখিতে পাই, সমৃদ্ধির মধ্যেই অধোগতির বীজ নিহিত থাকে এবং সংকটের মধ্যেই উন্নতির বীজ নিহিত থাকে। উত্থান এবং পতনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান সাধারণতঃ ৭ হইতে ১০ বৎসর হয়। নয় অথবা দশ বৎসর পর পর যখন শিল্প-ব্যবসায়ে উত্থান-পতন দেখা যায়, তখন ইহাকে Juglar Cycle বলা হয়। অনেক সময় দীর্ঘকালীন (৫০ হইতে ৬০ বৎসরের মধ্যে) বাণিজ্যচক্র দেখা যায়; ইহাকে কণ্ড্রাতিয়েফ চক্র (Kondratieff Cycle) বলা হয়। বৃটেনে শিল্প-বিপ্লবের জন্য ১৭৮৯-১৮১৭ সালের মধ্যে আমরা শিল্প-ব্যবসায়ে যে উত্থান-পতন লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহাকে Kondratieff Cycle বলা যাইতে পারে।

বাণিজ্যচক্রে সময়ের ব্যবধান

বাণিজ্যচক্রে সবরকম শিল্প-বাণিজ্যের একসঙ্গে উত্থান-পতন হয়। যখন ব্যবসায়ে মন্দা দেখা যায়, তখন প্রায় সব শিল্পেরই কম-বেশী খারাপ অবস্থা দেখা যায়। তাহা ছাড়া; অনেক ক্ষেত্রে বাণিজ্যচক্রের আন্তর্জাতিক বিস্তৃতি (international spread) দেখা যায়। কোন দেশে যদি জিনিসপত্রের দাম খুব বাড়িয়া যায়, তবে সেই দেশ হইতে জিনিসপত্র আমদানি করে এইরকম দেশগুলিতেও এই মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হইবে। ভারতবর্ষ আমেরিকা হইতে অনেক জিনিস আমদানি করে। আজ যদি আমেরিকায় আমাদের আমদানি-যোগ্য জিনিসগুলির দাম বাড়িয়া যায়, তবে সেই জিনিসগুলি আমাদের দেশেও বেশী দামে বিক্রয় করিতে হইবে।

বাণিজ্যচক্রের আন্তর্জাতিক প্রভাব

বিভিন্ন বাণিজ্যচক্র মোটামুটি একপ্রকার হইলেও প্রত্যেক বাণিজ্যচক্রেরই নিজস্ব কতিপয় বৈশিষ্ট্য থাকে। কোন বাণিজ্যচক্র কেন হইয়াছে তাহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না। অনেক সময় অতি-উৎপাদনের জন্য অবস্থা খারাপ হইতে পারে; আবার অনেক সময় বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধার অভাবের জন্যও অবস্থা খারাপ হইবে। অথচ উভয় ক্ষেত্রেই জিনিসপত্রের দাম কম থাকে এবং বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক পিগুর (Prof. Pigou) ভাষায় "All the recorded cycles are members of the same family but among them there are no twins."

প্রত্যেক বাণিজ্যচক্রেরই আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকে

বাণিজ্যচক্র একসঙ্গে সব শিল্প-ব্যবসায়ে আরম্ভ হইলেও কতিপয় শিল্পের উপর, যেমন মূলধনী শিল্পে (capital goods industries), বাণিজ্যচক্রের প্রভাব তীব্রভাবে অনুভূত হয়।

বাণিজ্যচক্রের কারণ সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব (Different theories of the causes of business fluctuations): বাণিজ্যচক্রের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব আছে। বিভিন্ন অর্থবিজ্ঞানী বাণিজ্যচক্রের কারণ বিশ্লেষণ করিবার সময় বিভিন্ন দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কোন কোন অর্থবিজ্ঞানীর মতে সাধারণ অতি-উৎপাদন (general over-production), কাহারও মতে সৌরকলঙ্ক হেতু

আবহাওয়ার পরিবর্তন, কাহারও মতে সঞ্চয়ের আধিক্য (over-saving); কাহারও মতে অতি-বিনিয়োগ (over-investment), কাহারও মতে মুদ্রার সম্প্রসারণ ও সংকোচন, কাহারও মতে নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক অথবা কারিগরী উদ্ভাবন (innovation), এবং কাহারও মতে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার (Marginal Efficiency of Capital) পরিবর্তন হইতেছে বাণিজ্যচক্রের কারণ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্যচক্রের কারণ নির্দেশ করিবার সময় আমরা শুধুমাত্র একটি তত্ত্বের উপর নির্ভর করিতে পারি না। এখনও পর্যন্ত অর্থবিজ্ঞানীগণ বাণিজ্য-চক্রের কারণ সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। উপরে যে কারণগুলির কথা উল্লেখ করা হইল সেগুলির মধ্যে কতিপয় কারণ আছে যেগুলি অনেক সময়েই শিল্প-বাণিজ্যের পরিবর্তন ঘটাইতে পারে। কিন্তু, সেইগুলির কোনটিকেই আমরা একক কারণ বলিয়া মনে করিতে পারি না। তবে সাধারণতঃ মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা (Marginal Efficiency of Capital), ব্যাংক-ক্রেডিটের যোগান (supply of bank credit), বিনিয়োগ স্পৃহা (inducement to invest), উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতি এবং জনগণের আয় ও সক্রিয় চাহিদা (effective demand) যখন একসঙ্গে অথবা আলাদাভাবে বাড়িতে আরম্ভ করে তখন শিল্প-ব্যবসায়ে উন্নতির সূচনা হয়। এই উন্নতি চরম পরিণতি লাভ করে সমৃদ্ধিতে তখনই যখন উপরে উল্লিখিত উপাদানগুলি সবই বাড়িয়া যায় এবং সেই সঙ্গে ব্যবসায়ীদের মুনাফার আশা এবং বিনিয়োগ বাড়িয়া যায়। অপরপক্ষে যখন আমরা এই উপাদানগুলির অধোগতি দেখি, তখন ব্যবসায় বাণিজ্যেও অধোগতি আরম্ভ হয়। যখন ব্যবসায়-বাণিজ্যে সংকটের সৃষ্টি হয় তখন উপরে বর্ণিত উপাদানগুলি বিশেষ কার্যকর থাকে না।

বাণিজ্যচক্রের কারণ

এখন আমরা বাণিজ্যচক্রের কারণ সম্বন্ধে অর্থবিজ্ঞানীদের প্রদত্ত তত্ত্বগুলি আলোচনা করিতে পারি।

সাধারণ অতি-উৎপাদন তত্ত্ব (General Over-ProdubtionTheory): কোন কোন ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানীর মতে সাধারণ অতি-উৎপাদনই বাণিজ্যচক্রের কারণ। কিন্তু অত্যুৎপাদন কাহাকে বলে এই বিষয়ে অর্থবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। ব্যবসায় বাণিজ্যে মন্দা (depression) দেখা দিলে আমরা দেখিতে পাই সমৃদ্ধির (prosperity) আমলে উৎপাদিত অনেক জিনিস অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া থাকে; কাহারও কাহারও মতে ইহাই অত্যুৎপাদন। কিন্তু, চিন্তা করিলে দেখা যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের চাহিদা অথবা অভাব থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত অত্যুৎপাদন হইতে পারে না। বাজারে সক্রিয় চাহিদার অভাব (deficiency of effective demand) থাকার জন্যই জিনিসপত্র অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া থাকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী অর্থবিজ্ঞানী জে. বি. স্নে (J. B. Say) বলিয়াছিলেন যে দেশে সর্বদাই পূর্ণনিয়োগ অথবা full employment থাকে। কারণ, কোন জিনিসের যোগান নিজেই ইহার জন্য চাহিদার সৃষ্টি করিতে পারে ("Supply

creates its own demand")। সুতরাং সাধারণভাবে অতি-উৎপাদন (general over-production) হওয়া কখনই সম্ভব নয়। তবে তাঁহার মতে একটি বিশেষ শিল্পের ক্ষেত্রে অথবা বিশেষ জিনিসের ক্ষেত্রে অতি-উৎপাদন হইতে পারে।

সাধারণ অত্যুৎপাদন কথাটির অর্থ হইতেছে সব জিনিসেরই উৎপাদন চাহিদার তুলনায় বেশী। বাস্তব জগতে আমরা এই প্রকার অত্যুৎপাদন দেখিতে পাই না। দ্বিতীয়ত, যতদিন মানুষের অভাব থাকিবে, ততদিন মানুষের চাহিদাও থাকিবে, সুতরাং মানুষের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও অত্যুৎপাদন কল্পনা করা কঠিন। লর্ড কেইনসের মতে আর্থিক চাহিদা (money demand) অনেক ক্ষেত্রে খুব কম থাকিতে পারে। সেক্ষেত্রে চাহিদার তুলনায় যোগান কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে বেশী হইতে পারে। কিন্তু, এই অবস্থাটি বাণিজ্যচক্রের কারণ নয়, ইহা বাণিজ্যচক্রের পরিণতি।

বাণিজ্য চক্রের আবহাওয়া তত্ত্ব (Climatic Theory of Trade Cycle): অধ্যাপক জিভন্স (Prof. Jevons) মনে করিতেন, প্রতি দশ-এগার বৎসর অন্তর যখন সৌরকলঙ্ক দেখা দেয় তখন সূর্যের উত্তাপ বিকিরণ কমিয়া যায় বলিয়া কৃষি উৎপাদন প্রভাবিত হয়। ইহাতে কৃষকদের জিনিস কিনিবার ক্ষমতা কমিয়া যায় এবং তাহা শিল্প ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। ইহার ফলে ব্যবসায়ে মন্দা দেখা যায়।

বাণিজ্যচক্রের কারণ হিসাবে আমরা এই তত্ত্বটি গ্রহণ করিতে পারি না। কৃষিক্ষেত্রের সহিত শিল্পক্ষেত্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু, আধুনিক শিল্পোন্নত দেশগুলিতে জাতীয় আয়ের একটি ক্ষুদ্র অংশ কৃষিক্ষেত্র হইতে আসে। দ্বিতীয়ত, ব্যবসায় সমৃদ্ধির সময়ে ভোগ সামগ্রীর উৎপাদন অপেক্ষা মূলধন-সামগ্রীর উৎপাদন কেন বেশী হয়, তাহা এই তত্ত্বের সাহায্যে বুঝানো যায় না। তৃতীয়ত, বাণিজ্যচক্রের উপর আধুনিক মুদ্রাব্যবস্থার প্রভাব সম্বন্ধেও কোন কিছুই এই তত্ত্বে আলোচিত হয় নাই। সুতরাং এই তত্ত্বটির সাহায্যে বাণিজ্যচক্রের কারণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

সঞ্চয়াধিক্য অথবা কম ভোগ-তত্ত্ব (Over-saving or Under-consumption Theory): হবসনের (Hobson) মতে অতিরিক্ত সঞ্চয়ই বাণিজ্যচক্রের মূল কারণ। যখন মালিকশ্রেণীর সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যায়, তখন তাহাদের ভোগের স্পৃহা কমিয়া যায়। ইহাতে ব্যবসায়ে মন্দার সৃষ্টি হয়। এই তত্ত্বটিও আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, এই তত্ত্বটি শুধু মন্দার কারণ বিশ্লেষণ করে। শুধু তাহাই নহে, মন্দার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাও এই তত্ত্বে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, এই তত্ত্বটি ধরিয়া লয় যে যত পরিমাণ সঞ্চয় হইয়াছে, সেই পরিমাণে বিনিয়োগ কম হইয়াছে, অর্থাৎ, সঞ্চিত অর্থ, সম্পূর্ণভাবে বিনিয়োগ করা হয়। কিন্তু, ইহা ঠিক নয়। তৃতীয়ত, এই তত্ত্ব গ্রহণ করিলে স্বীকার করিতে হয় যে আগে ভোগসামগ্রীর দাম কমিবে এবং পরে মূলধন-সামগ্রীর দাম কমিবে। কিন্তু বাস্তব জগতে আগে মূলধন সামগ্রীর

দাম কমে এবং পরে ভোগ-সামগ্রীর দাম কমে। সুতরাং, বাণিজ্যচক্রের কারণ হিসাবে এই তত্ত্বটি গ্রহণযোগ্য নয়।

অতি-বিনিয়োগ তত্ত্ব (Over-investment Theory) : অষ্ট্রিয়ান অর্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক হায়েক (Prof. Hayek) এই তত্ত্বটির অবতারণা করেন। তাঁহার মতে স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবার দরুণ বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং ইহাই বাণিজ্যচক্রের কারণ। বাস্তব জগতে বাজারে যে সুদ (interest) নিরূপিত হয়, সেই সুদ সঞ্চয় (saving) ও বিনিয়োগের (investment) পরস্পরের ভারসাম্য (equilibrium) অর্জনকারী সুদ অপেক্ষা কম হয়। ইহাতে মূলধন সামগ্রীর উৎপাদনে বিনিয়োগ যে পরিমাণ বাড়ে, ভোগ-সামগ্রী উৎপাদনে সেই পরিমাণ বাড়ে না। দ্বিতীয়ত, বাস্তবে যে হারে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ে, বিনিয়োগের পরিমাণ তাহা অপেক্ষা বেশী বাড়ে, ফলে অনেক সময় অতি বিনিয়োগের (over-investment) সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই তত্ত্বটি কেন বিনিয়োগের পরিমাণ বেশী হয়, তাহার কারণ বুঝাইতে পারে না। তাহা ছাড়া, বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ের (phases) ব্যাখ্যা এই তত্ত্বটি করিতে পারে না।

এই তত্ত্বটির ত্রুটি

মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব (Psychological Theory) : অধ্যাপক পিগু (Prof. Pigou) মনে করেন, লাভ-লোকসান সম্বন্ধে আশা-নিরাশার ভাবই শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থার পরিবর্তনের কারণ। ব্যবসায়ে যখন উন্নতির সম্ভাবনা এবং লাভের আশা বেশী থাকে, তখন উৎপাদকগণ বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইতে আরম্ভ করে, ইহাতে দেশের শিল্প-ব্যবসায় সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু যখন দেখা যায়, আশানুরূপ লাভ অর্জন করা সম্ভবপর হইতেছে না এবং বিক্রয়ের পরিমাণ আশানুরূপ বাড়িতেছে না, তখন ধীরে ধীরে লোকসানের আশংকা অথবা ব্যবসায়ে নিরাশার ভাব দেখা যায় এবং শিল্প-বাণিজ্যে অধোগতি আরম্ভ হয়।

ব্যবসায়ে লাভ সম্বন্ধে আশা-নিরাশার ভাব যে বিনিয়োগ নির্ধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কিন্তু, ব্যবসায়ে মন্দার পর কেন উন্নতি আরম্ভ হয়, অর্থাৎ লাভ সম্বন্ধে নিরাশার পর আবার কেন আশা সঞ্চারিত হয়, তাহা তত্ত্বটি বুঝাইতে পারে না। তাহা ছাড়া, বাণিজ্যচক্রের কারণ বিশ্লেষণ করিলে আমরা মুদ্রাসম্পর্কিত (monetary) এবং মুদ্রার সহিত সম্পর্কহীন (non-monetary) অনেক কারণ দেখিতে পাই। অধ্যাপক পিগু (Prof. Pigou) এই তত্ত্বে সেই কারণগুলি উপেক্ষা করিয়াছেন।

এই তত্ত্বটির ত্রুটি

মুদ্রা-সম্পর্কিত তত্ত্ব (Monetary Theory) : অধ্যাপক হট্রের (Prof. Hawtrey) মতে বাণিজ্যচক্র হইতেছে মূলতঃ টাকার ব্যাপার ("monetary Pheno menon")। যখন ব্যাংক মারফৎ দেশে টাকার এবং ক্রেডিটের যোগান বাড়িতে আরম্ভ করে, তখন ব্যবসায়ীগণ (dealers) বিনিয়োগের জন্য অধিক পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করে এবং উৎপাদকগণকে (producers) আরও অধিক পরিমাণে

উৎপাদন করিবার জন্য নির্দেশ দেন। এই সময়ে টাকার যোগান বাড়িয়া যাওয়ায় ক্রেতাদের আয় এবং খরচ ("consumer's income and consumer's outlay") বাড়িয়া যায়, অর্থাৎ, টাকার দিক হইতে চিন্তা করিলে ক্রেতাদের সক্রিয় চাহিদা ("effective demand or demand for goods in terms of money") বাড়িয়া যায়। এই অবস্থার পরিণতিস্বরূপ দেশে উৎপাদন বাড়ে এবং সমৃদ্ধির সূচনা হয়। সমৃদ্ধির পর অধোগতি আরম্ভ হয় তখনই যখন টাকার যোগান কমিতে আরম্ভ করে। যখন টাকার যোগান বাড়ে, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার (bank rate) কমাইয়া দেয় এবং বাজার হইতে সিকিউরিটি ক্রয় করে (open market purchase of securities)। টাকার যোগান কখন বাড়িবে এবং কখন কমিবে তাহা নির্ভর করে দেশে স্বর্ণের মোট রিজার্ভের পরিমাণের উপর। হট্রের তত্ত্বটি দেশে স্বর্ণমান বজায় আছে, এই জাতীয় ধারণার উপর ভিত্তিশীল। অধোগতির সময় ব্যবসায়ীগণও উৎপাদককে উৎপাদন বাড়াইবার জন্য নির্দেশ দেয় না, ক্রেতাদেরও আয়, ভোগ, এবং সক্রিয় চাহিদা কমিয়া আসে। আবার যখন টাকার যোগান বাড়িতে আরম্ভ করে, তখন সংকটমুক্ত হইয়া উন্নতির সূচনা হয়।

বাণিজ্যচক্রের ব্যাখ্যায় এই তত্ত্বটির কিছু তাৎপর্য আছে, এই তত্ত্বটির প্রধান ত্রুটি হইতেছে এই যে ইহা বাণিজ্যচক্রের কারণ বিশ্লেষণের জন্য মুদ্রা প্রচলনের উপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করে। কিন্তু, আর্থিক কারণ ছাড়াও বাণিজ্যচক্রের আরও অনেক কারণ আছে, যেগুলি এই তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে কেন নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধান তাহার সন্তোষজনক ব্যাখ্যাও এই তত্ত্বে পাওয়া যায় না। এই তত্ত্বটি ততক্ষণই বিবেচিত হইতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত দেশে স্বর্ণমান (Gold Standard) প্রচলিত থাকে। মন্দার পর উন্নতির সূচনা কিভাবে হয়, তাহার সঠিক ব্যাখ্যা এই তত্ত্বে পাওয়া যায় না। কেইন্‌সের মতে ব্যবসায়ে মন্দার পর বিনিয়োগ বাড়িবে কিনা তাহা নির্ভর করে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার (Marginal Efficiency of Capital) উপর, সুদের হারের উপর নয়। কিন্তু, হট্রে (Hawtrey) বিনিয়োগের নিয়ামক হিসাবে সুদের হারের উপর বেশী গুরুত্ব দিয়াছেন।

এই তত্ত্বটির ত্রুটি

নূতন উদ্ভাবন তত্ত্ব (Innovation Theory): এই তত্ত্বটি প্রচার করেন অধ্যাপক স্যুমপিটার (Prof. Schumpeter)। এই তত্ত্ব অনুযায়ী নূতন উদ্ভাবন অর্থাৎ নূতন জিনিস, নূতন উৎপাদন পদ্ধতি, নূতন বাজারের সৃষ্টি, উৎপাদন কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন, ইত্যাদির ফলে ব্যাংক ক্রেডিট, মূলধন, চাহিদা এবং বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ে এবং এইভাবে শিল্প-ব্যবসায়ে সমৃদ্ধির সূচনা হয়। কিন্তু, উৎপাদন বাড়িবার পর এমন একটি সময় আসে যখন উৎপন্ন ভোগ-সামগ্রীর দাম কমিতে থাকে এবং অপেক্ষাকৃত পুরাতন জিনিসের চাহিদা কমিয়া যায় (কারণ, লোকে তখন আরও নূতন জিনিস কিনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে)। এইভাবে শিল্প-ব্যবসায়ে উত্থান-

পতনের সূচনা হয়। এই তত্ত্বটিতেও বাণিজ্যচক্রের অন্যতম কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে, কিন্তু বাণিজ্যচক্রের সমুদয় কারণ বিশ্লেষিত হয় নাই। দ্বিতীয়ত, একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর বাণিজ্যচক্র কেন দেখা যায়, তাহা এই তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করিতে পারে না।

এই তত্ত্বটির ত্রুটি

বাণিজ্যচক্র সম্পর্কে কেইন্‌সের তত্ত্ব (Keynesian theory of Trade Cyele): কেইন্‌সের মতে বাণিজ্যচক্রের প্রধান কারণ হইতেছে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার (Marginal Efficiency of Capital) পরিবর্তন। দেশের মোট কর্মসংস্থান নির্ভর করে মোট আয়ের উপর। মোট আয় নির্ভর করে ভোগ প্রবণতা এবং বিনিয়োগের উপর। বিনিয়োগ নির্ভর করে সুদের হার এবং বিশেষভাবে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার উপর। যখন মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা বাড়িয়া যায় অর্থাৎ, মূলধন বিনিয়োগে লাভের আশা বাড়িয়া যায়, তখন বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ে। ইহাতে আয় এবং কর্মসংস্থান বাড়ে, জনগণের ভোগ এবং সক্রিয় চাহিদা (effective demand) বাড়ে এবং অবশেষে. বিনিয়োগ আরও বাড়ে। এইভাবেই সমৃদ্ধির সৃষ্টি হয়। সমৃদ্ধির চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত হইবার পর দুইটি কারণে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা কমিতে আরম্ভ করে এবং ইহার ফলে বিনিয়োগের পরিমাণ কমিতে আরম্ভ করে। কারণ দুইটি হইতেছে, (১) নূতন মূলধন সামগ্রী উৎপাদনের খরচ বাড়িয়া যায় এবং (২) উৎপাদিত সামগ্রীর পরিমাণ এত বেশী বাড়িয়া যায় যে বিনিয়োগের লাভের আশা কমিতে আরম্ভ করে। তখন যে হারে আয় বাড়ে, সেই হারে ভোগ বাড়ে না, সঞ্চয় (saving) বাড়িতে আরম্ভ করে। সমৃদ্ধির স্তরে ফাটকা কারবারীগণ অধিক টাকা নিজের হাতে রাখিতে চায় বলিয়া ব্যাংকগুলিও সুদের হার বাড়াইয়া দেয়। সুতরাং বিনিয়োগ বৃদ্ধির আর কোনও সুযোগ থাকে না। এইভাবে শিল্প-বাণিজ্যে অধোগতি (recession) আরম্ভ হয়। ইহার পরিণতি হয় ব্যবসায়ে মন্দা (depression) এবং অবশেষে সংকট (crisis)। সংকট অবস্থা কিছুকাল কাটিবার পর আবার কোন না কোন কারণে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা বাড়িতে আরম্ভ করে (সাধারণতঃ কারণগুলি হইতেছে মজুত মালের ঘাটতি, নূতন উৎপাদন কৌশলের আবিষ্কার, প্রভৃতি) এবং ইহাতে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িতে আরম্ভ করে। একবার বিনিয়োগের বৃদ্ধি আরম্ভ হইলে দেশের শিল্প-বাণিজ্য পুনরায় সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয়।

কেইনসের তত্ত্বটির মূল ভিত্তি হইতেছে তাঁহার "Multiplier" তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে বিনিয়োগ বাড়িলে আয় বাড়ে, আয় বাড়িলে ভোগ বাড়ে, ভোগ বাড়িলে বিনিয়োগ বাড়ে, বিনিয়োগ বাড়িলে আয় বাড়ে পুনরায় আয় বাড়িবার দরুণ ভোগ বাড়ে। পুনরায় ভোগ বাড়িবার দরুণ বিনিয়োগ এবং আয় বাড়ে, এইভাবে প্রাথমিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং চূড়ান্ত আয় বৃদ্ধির মধ্যে যে আনুপাতিক সম্পর্ক তাহাই হইতেছে "Multipler"। অধ্যাপক গুডউইন (Prof. Goodwin

মাল্টিপ্লায়ার (Multiplier theory)

এবং অধ্যাপক হ্যাবারলার (Prof. Haberler) এই তত্ত্বের সমালোচনা করিয়া বলেন, আয় বাড়িলেই সঙ্গে সঙ্গে ভোগ সমান অনুপাতে নাও বাড়িতে পারে ; এবং ভোগ বাড়িলেই সমান অনুপাতে বিনিয়োগ নাও বাড়িতে পারে কারণ ইহাদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান (timelag) থাকিতে পারে এবং ক্রেতাদের ভোগের প্রবণতা (propensity to consume) সর্বদাই স্বাভাবিক (normal) নাও থাকিতে পারে।

হিক্‌সের বাণিজ্যচক্র তত্ত্ব (Hicksian Theory of Trade Cycle): অধ্যাপক হিকস (Prof. Hicks) কেইনসের তত্ত্বটি গ্রহণ করেন না। অধ্যাপক হিক্‌সের মতে মোট বিনিয়োগকে দুইভাগে বিভক্ত করা চলে। একটি হইতেছে স্বয়ংসৃষ্ট বিনিয়োগ (autonomous investment), যেমন জনসংখ্যা বাড়িলেই আপনা হইতে কিছু না কিছু বিনিয়োগ বাড়ে এবং অপরটি হইতেছে প্রণোদিত বিনিয়োগ (induced investment), যেমন আয় বাড়িলে অথবা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ হইলে একটি চাহিদা হইতে অপর চাহিদার (derived demand) সৃষ্টি হইতে পারে এবং ইহার ফলে বিনিয়োগের গতিবৃদ্ধি (acceleration) হইতে পারে। এই বর্ধিত বিনিয়োগ-বেগের সহিত 'multiplier'-এর সমন্বয় হইলে বিনিয়োগ বাড়াইবার জন্য উৎপাদক প্রণোদিত হন। অধ্যাপক হিকসের মতে বিশেষ করিয়া প্রণোদিত বিনিয়োগের পরিবর্তন হইলে বাণিজ্যচক্রের সৃষ্টি হয়।

অধ্যাপক হিক্‌সের যুক্তি

স্বয়ংসৃষ্ট বিনিয়োগ বাড়িবার ফলে একশ্রেণীর লোকের আয় বাড়ে এবং তাঁহারা সেই বাড়তি আয় বিনিয়োগ করিবার জন্য প্রণোদিত হন। বিনিয়োগ বাড়িলে মাল্টিপ্লায়ারের কার্যকারিতা হেতু জাতীয় আয় বাড়ে এবং সেই সঙ্গে বিনিয়োগের গতিবৃদ্ধি হয়। অর্থাৎ ভোগ-সামগ্রীর জন্য চাহিদা বাড়িলেই মূলধন সামগ্রীর জন্য চাহিদা বাড়ে। ইহার ফলে গতিবৃদ্ধির নীতি (Acceleration Principle) কার্যকর হয়। মাল্টিপ্লায়ার এবং একসেলারেশন নীতির যৌথ ক্রিয়ায় বিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িতে থাকে এবং চূড়ান্তভাবে বিনিয়োগ পূর্ণ কর্ম-সংস্থানের সীমায় বা একটি উচ্চতম সীমায় (Full Employment ceiling) উপনীত হয়। এই অবস্থা চিরকাল থাকিতে পারে না। মাল্টি-প্লায়ারের ফাঁক (leakage) দেখা দিলে এবং যে সকল উপাদানের উপর বিনিয়োগের বেগ নির্ভর করে সেগুলির কার্যকারিতা কমিলে বিনিয়োগও
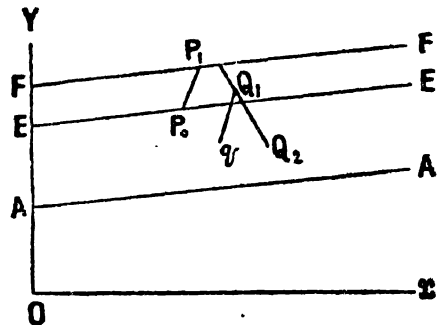
চিত্র নং ৯১

ক্রমশঃ কমিতে থাকে। কিন্তু সামগ্রিক বিনিয়োগ (Gross investment) কখনই শূন্যে নামিতে পারে না। উপরের চিত্রে হিক্সের তত্ত্বটি দেখানো হইয়াছে।

উপরের চিত্রে AA রেখা স্বয়ং-সৃষ্ট বিনিয়োগের (Autonomous investmant) পরিমাণ নির্দেশ করে। ইহা ক্রমশঃ উপরে উঠিতে থাকে, কারণ এইরূপ বিনিয়োগ প্রায় একই হারে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। EE রেখা দ্বারা প্রণোদিত বিনিয়োগ বুঝা হইয়াছে। AA এবং EE রেখার মধ্যবর্তী দূরত্ব মাল্টিপ্লায়ার ও এক্সেলারেশনের মিলিত ক্রিয়া বুঝাইতেছে। P_0P_1 রেখা উৎপাদন বৃদ্ধি নির্দেশ করে। উৎপাদন পূর্ণ কর্মসংস্থানের শেষ সীমায় না পৌছান পযন্ত উৎপাদন বাড়িতে থাকে। FF রেখাটি পূর্ণ কর্মসংস্থানের শেষ পর্যায় নির্দেশ করে। সামগ্রিক উৎপাদন এই সীমায় (ceiling) আসিয়া থামে। প্রণোদিত এবং স্বয়ং-সৃষ্ট বিনিয়োগের ফল হইতেছে এই সামগ্রিক উৎপাদন। P_1-এর পর আর প্রণোদিত বিনিয়োগ হয় না। যদি মাল্টিপ্লায়ারের ফাঁক (leakage) সৃষ্ট হয় তবে বিনিয়োগ কমিতে থাকে। শেষ পর্যায়ে মন্দা আসিয়া পড়ে। উৎপাদন কমিবার ফলে যদি আর বিনিয়োগ না হয় (disinvestment) তাহা হইলে উৎপাদন Q_1 হইতে q-তে আসিবে। কিন্তু যেহেতু ইহা সম্ভবপর নয়, Q_1P_2-তেই মন্দা দেখা দেয়।

বাণিজ্য-চক্র প্রতিরোধের উপায় (Measures for controlling trade cycle): বাণিজ্য-চক্র নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় যেগুলিকে বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া (cyclically adjusted) লওয়া যাইতে পারে। সমৃদ্ধির সময় এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে যেন বিনিয়োগ, জিনিসপত্রের দাম এবং ব্যবসায়ীদের ফাটকা ব্যবসায় আর না বাড়ে অথচ জনগণের আয় যেন হঠাৎ কমিয়া যায়। আবার, ব্যবসায়ে মন্দার সময় এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে যেন উৎপাদক আরও উৎপাদন করিতে উৎসাহিত হয়, ব্যবসায় ধীরে ধীরে বাড়ে, জিনিসপত্রের দামও কিছু বাড়িতে আরম্ভ করে এবং জনগণের আয় ও সক্রিয় চাহিদা (effective demand) বাড়িতে আরম্ভ করে। এই ব্যবস্থাগুলিকে বাণিজ্যচক্র-বিরোধী ব্যবস্থা (counter-cyclical or contra-cyclical measures) বলে। এইগুলি তিন প্রকারের হইতে পারে; যথা, আর্থিক নীতি (Monetary Policy), সরকারের আয়-ব্যয় অথবা বিনিয়োগ সম্পর্কিত নীতি (Fiscal Policy) এবং অর্থের সহিত সম্পর্ক নাই, এই প্রকার নীতি (Non-monetary Policy)।

বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণের তিন প্রকার নীতি

বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধের আর্থিক নীতি (Monetary measures for controlling trade cycle): বাণিজ্য-চক্র যাহাতে তীব্র আকার ধারণ না করে সেই ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট আর্থিক নীতির প্রয়োজন। যখন বিনিয়োগ ক্রমেই বাড়িতে থাকে এবং শিল্প-বাণিজ্য সমৃদ্ধির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে

তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি আর্থিক নীতি (monetary policy) অনুসরণ করিতে হয়। এই নীতি অনুযায়ী ব্যাংকের সুদের হার বাড়াইয়া দেওয়া হয় যাহাতে ফাটকা ব্যবসায়ীগণ অতিরিক্তভাবে বিনিয়োগ বাড়াইবার জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ সহজে বাণিজ্যমূলক ব্যাংকগুলির নিকট হইতে না পায়। এই সময়ে জনসাধারণের এবং বাণিজ্যমূলক ব্যাংকগুলির হাতে প্রচুর টাকা থাকে বলিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজারে সিকিউরিটি বিক্রয় (open market sale of securities) করিয়া বাণিজ্যমূলক ব্যাংক এবং জনগণের ক্রয়শক্তি কমাইবার চেষ্টা করে।

তাহা ছাড়া, বাণিজ্যমূলক ব্যাংকগুলি তাহাদের আমানতের যে অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ রাখে অথবা আমানতের যে অংশ নগদ টাকায় নিজের কাছে রিজার্ভ (cash reserve) রাখে, সেই রিজার্ভের অনুপাতও (raising the reserve ratio) বাড়াইয়া দেওয়া হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যমূলক ব্যাংকগুলিকে কোনও বিশেষ ঋণ না দেওয়ার জন্য অথবা কতিপয় নির্দিষ্ট জিনিসের বিপক্ষে ঋণ প্রদান না করার জন্য নির্দেশ দিতে পারে। এই ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিলে সমৃদ্ধির সময়ে বিনিয়োগ কমিয়া যায়। অনুরূপভাবে মন্দার সময় যাহাতে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ে সেইজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে (১) সুদের হার কমাইয়া দিতে হয়, (২) খোলা বাজারে বিভিন্ন ব্যাংক এবং জনসাধারণের নিকট হইতে সিকিউরিটি ক্রয় (open market purchase of securities) করিতে হয় যাহাতে তাহাদের ক্রয়শক্তি বাড়ে, (৩) বিভিন্ন ব্যবসায়ী অথবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে বাণিজ্যমূলক ব্যাংকগুলির উপর হইতে সমুদয় বাধা-নিষেধ প্রত্যাহার করিতে হয় এবং (৪) বাণিজ্যমূলক ব্যাংকগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ইহাদের আমানতের যে রিজার্ভ রাখে, অথবা নিজেদের হাতে মোট আমানতের যে অংশ নগদ টাকায় নিজের কাছে রিজার্ভ রাখে, তাহার অনুপাত (lowering the reserve ratio) কমাইয়া দিতে হয়। এইভাবে একটি সুনির্দিষ্ট আর্থিক নীতি অনুসরণ করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যবসায়ে সমৃদ্ধি এবং মন্দা উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করে।

বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধে অন্যান্য ব্যবস্থা : সরকারের আয়-ব্যয় নীতি (Fiscal Policy) এবং মুদ্রা সম্পর্কিত নীতি (Monetary Policy) ছাড়াও বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধ করিবার জন্য অপর একটি নীতি আছে যাহা দেশের অর্থের প্রচলন অথবা সরকারী বিনিয়োগের সহিত জড়িত নয়। এই নীতি অনুযায়ী যখন সমৃদ্ধির সময় জিনিসপত্রের দাম এবং জনগণের সক্রিয় চাহিদা খুব বাড়িয়া যায়, তখন রেশনিং প্রথা এবং মূল্যনিয়ন্ত্রণ নীতি প্রচলন করা উচিত। আবার ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিলে রেশনিং প্রথা এবং মূল্য-নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রত্যাহার করা উচিত। রেশনিং প্রথা চালু করিয়া সাময়িকভাবে চাহিদা এবং যোগান নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

অর্থের সহিত সম্পর্কহীন নীতি (Non-monetary Policy)

Exercise

1. Discuss how fiscal policy may be used for the control of cyclical fluctuations.

[সরকারের আয়-ব্যয় নীতি কিভাবে বাণিজ্যচক্র জনিত পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে আলোচনা কর।] (৪৪০-৪৪৬ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the monetary theory of trade cycle

[বাণিজ্যচক্রের মুদ্রা সম্পর্কিত তত্ত্ব আলোচনা কর।] [৩৫২(১২)-৩৫২(১৯) পৃষ্ঠা]

3. Discuss the Hicksian theory of trade cycle.

[হিক্সের বাণিজ্যচক্র সম্পর্কিত তত্ত্ব আলোচনা কর।] [৩৫২ (১৫)-৩৫২(১৬) পৃষ্ঠা]

4. Discuss the Keynesian theory of trade cycle.

[কেইনসের বাণিজ্যচক্র সম্পর্কিত তত্ত্ব আলোচনা কর।] [৩৫২(১৪)-৩৫২(১৫) পৃষ্ঠা]

5. What is a trade cycle? What are its features?

[বাণিজ্যচক্র কাহাকে বলে? ইহার কি কি বৈশিষ্ট্য?] [৩৫২(৬)-৩৫২(৯) পৃষ্ঠা]

6. Explain the phases of a trade cycle.

[বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন স্তর ব্যাখ্যা কর।] [৩৫২ (৬)-৩৫২(৮) পৃষ্ঠা]

———

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
(Theory of International Trade)

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (Domestic Trade and International Trade) : আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ভিত্তি হইতেছে আভ্যন্তরীণ শ্রম-বিভাগ (Division of Labour) এবং বিশেষীকরণ (Specialisation) ; অনুরূপভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেব ভিত্তি হইতেছে আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাগ এবং আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণ। কিন্তু তবুও এই দুই প্রকার বাণিজ্যের মধ্যে কতিপয় মৌলিক পার্থক্য আছে।

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের তুলনায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে শ্রম ও মূলধনের গতিশীলতা অপেক্ষাকৃত কম

প্রথমত, আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে শ্রম ও মূলধনের গতিশীলতা যত বেশী, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তাহা ততটা নয়। আঞ্চলিক বাণিজ্যেও (Regional Trade) ইহা বিশেষভাবে প্রতিভাত হয়। একই দেশের ভিতর বিভিন্ন অঞ্চলে আমরা মজুরির পার্থক্য এবং মূলধনের উপর প্রতিদান-হারের (Rate of return on Capital) পার্থক্য দেখিতে পাই। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এই পার্থক্য অনেক বেশী দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অথবা ব্রিটেনে শ্রমিকদের মজুরির হারে বেশী বলিয়াই যে ভারত হইতে সেই দেশগুলিতে প্রচুর শ্রমিক চলিয়া যাইবে তাহা নহে। শ্রমেব এই গতিশীলতার পথে প্রধান বাধাগুলি হইতেছে ভাষার পার্থক্য, রীতি-নীতির পার্থক্য, পাবিবারিক বন্ধন, সরকারী বিধি-নিষেধ, অর্থনৈতিক কাঠামোর পার্থক্য প্রভৃতি। তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে শ্রম অপেক্ষা মূলধনের গতিশীলতা আপেক্ষিকভাবে বেশী। বিশেষত, বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায় এবং উন্নত দেশগুলি নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থে অনগ্রসর দেশগুলিতে মূলধন-বিনিয়োগে উৎসাহী হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মূলধনের গতিশীলতা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং শ্রম-দক্ষতার পার্থক্য বেশী

দ্বিতীয়ত, একই দেশের ভিতর প্রাকৃতিক পরিবেশ, জমির উর্বরতা, খনিজ সম্পদের সরবরাহ, শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা প্রভৃতির যতটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে এই সকল বিষয়ে পার্থক্য অনেক বেশী। অবশ্য পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে (যেমন—ফ্রান্স, জার্মানী, ব্রিটেন) অথবা পূর্ব ইউরোপ কিংবা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশের পার্থক্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। কিন্তু ঐ দেশগুলির সহিত ভারত অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনা করিলেই দেখা যায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশ, খনিজ সম্পদ, জমির উর্বরতা, শ্রমিকের দক্ষতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পার্থক্য কত বেশী। বিভিন্ন দেশে জীবনযাত্রার মানও এক পর্যায়ে থাকে না, এবং স্বাভাবিকভাবেই ইহা শ্রমিকদের কর্মশক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এই পার্থক্যগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, দুই দেশের মধ্যে তুলনামূলক খরচকে (Comparative Cost) ইহা প্রভাবিত করে।

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে নিয়ন্ত্রণ খুব কম, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় থাকে

তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ (শিল্প সংরক্ষণ অথবা বাণিজ্য শুল্ক আরোপ প্রভৃতির মাধ্যমে) দেখিতে পাই; বিশেষত, কোন দেশে বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্কট দেখা দিলে এই নিয়ন্ত্রণ কঠোরভাবে কার্যকর হইতেও দেখা যায়। অবাধ বাণিজ্য (Free Trade) আজকাল বিরল। কিন্তু, আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। একটি দেশের ভিতর অথবা দেশেব ভিতর একটি অঞ্চলে বাণিজ্যের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয় না। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও যে নিয়ন্ত্রণ থাকে না তাহা নহে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, ভারতবর্ষে খাদ্যশস্যের ব্যাপারে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় আছে; কারণ বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্য চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ আছে।

মুদ্রা বিনিময়ের সমস্যা

সর্বশেষ, বিভিন্ন দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা এক প্রকার নয়। সেজন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হইতেছে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হইবার পূর্বে দুই দেশের মুদ্রার মধ্যে বিনিময় হার নির্ধারণ কবা এবং সেই হারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেনা-পাওনা মিটাইবার জন্য এক দেশের মুদ্রা অপর দেশের মুদ্রায় পরিবর্তিত করিতে হয়। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে এই সমস্যা দেখা যায় না।

অনেকক্ষেত্রে ভৌগোলিক সীমার (Geographical frontier) পবিবর্তন হওয়ায় আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য; অথচ দেশ বিভাগের পূর্বে সামগ্রিকভাবে ইহা ছিল আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাহাকে বলে?

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি (Basis of International Trade): যখন একাধিক দেশের মধ্যে পণ্য বিনিময় হয় তখনই ইহাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা হয়। বর্তমান পৃথিবীতে কোন দেশ অন্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। অর্থ নৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করিয়াছে এই রকম দেশ আমরা দেখিতে পাই না। অন্ততঃ নিজের দেশের উদ্বৃত্ত সামগ্রী অন্য দেশে রপ্তানি করিবার জন্যও চেষ্টা করিতে হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সৃষ্টি হয় তখনই যখন একটি দেশ অপর দেশে নিজের কিছু জিনিস রপ্তানি করে অথবা অন্য দেশ হইতে নিজের প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস আমদানি করে। সুতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সমস্যা মূলতঃ আমদানি-রপ্তানির সমস্যা।

বিভিন্ন দেশে উৎপাদনের উপাদানগুলি সমান পরিমাণে পাওয়া যায় না, ইহাদের উৎপাদনী শক্তিও বিভিন্ন দেশে সমান নয়। সেইজন্য কোন দেশ একটি বিশেষ সামগ্রী উৎপাদনে নৈপুণ্য অর্জন করে। যেমন অষ্ট্রেলিয়া পশম উৎপাদনে এবং ভারতবর্ষ পাট উৎপাদনে বিশেষ বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া যদি পাট উৎপাদন করিতে চায় এবং ভারতবর্ষ যদি পশম উৎপাদন করিতে চায় তবে খরচ অত্যন্ত বেশী হইবে এবং সেইক্ষেত্রে ইহা কোন দেশের পক্ষেই লাভজনক হইবে না। তাহা অপেক্ষা যদি অষ্ট্রেলিয়া পশম এবং ভারতবর্ষ পাট উৎপাদন করিতে থাকে এবং অষ্ট্রেলিয়া ভারতের নিকট পশম রপ্তানি করে এবং ভারতের নিকট হইতে পাট আমদানি করে, তবে ইহা উভয় দেশের পক্ষেই লাভজনক হইবে। সুতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূলভিত্তি হইতেছে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ (International Division of Labour)।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি

যে দেশ যে জিনিস ভালভাবে এবং সস্তায় তৈয়ার করিতে পারে, সেই দেশ শুধু সেই জিনিসই নিজের এবং অন্যান্য দেশের জন্য তৈয়ার করিবে। যে জিনিস কোন দেশ নিজে ভালভাবে এবং সস্তায় উৎপাদন করিতে পারে না, সেই জিনিসটি সেই দেশ এমন এক দেশ হইতে আমদানি করিবে যেখানে ইহা সস্তায় পাওয়া যায়। ইহাতে সব দেশের পক্ষেই সুবিধা হয়। কোন দেশ তাহা হইলে নিজের উদ্বৃত্ত সামগ্রী লইয়া বিশেষ সমস্যায় পড়িবে না। যে অঞ্চলে কোন জিনিস উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি পাইতে তুলনামূলক সুবিধা থাকে, এবং যে অঞ্চল সেই জিনিস উৎপাদনে বিশেষ কর্মক্ষম সেই অঞ্চল সেই বিশেষ জিনিসটি উৎপাদনে পারদর্শী হইবে। সব অঞ্চলেই সব জিনিস উৎপাদনে সমান সুবিধা থাকে না। ভারতবর্ষ পাট উৎপাদনে বিশেষ সুবিধা ভোগ করে, আবার অষ্ট্রেলিয়া পশম উৎপাদনে বিশেষ আপেক্ষিক সুবিধা ভোগ করে। কিন্তু ভারতবর্ষ পশম উৎপাদনে পারদর্শী নয়, অষ্ট্রেলিয়াও পাট উৎপাদন করিতে পারে না। আবার ভারতের মধ্যেই উত্তরপ্রদেশ চিনি উৎপাদনে, বোম্বাই কাপড় উৎপাদনে এবং পশ্চিমবঙ্গ পাট উৎপাদনে তুলনামূলক সুবিধা ভোগ করে।

আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাগে তুলনামূলক সুবিধার (Comparative Advantage) বিশেষ গুরুত্ব আছে। তুলনামূলক সুবিধা হইতেই আমরা তুলনামূলক খরচের নিয়মটি (Law of Comparative Cost) বুঝিতে পারি। তুলনামূলক খরচের নিয়মের ভিত্তিতেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালিত হয়।

ইংলণ্ড চেষ্টা করিলে নিজেই মাখন তৈয়ার করিতে পারে ; অথচ অন্য দেশ হইতে, মাখন আমদানি করিয়া ইংলণ্ড যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করে। ইহার কারণ হইতেছে এই যে মাখন তৈয়ার করিবার সুবিধা এবং আমদানি করিবার খরচ বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে ইহাতে কিছু ক্ষতি নাই। কারণ, মাখন তৈয়ার করিতে যাহা খরচ হইবে, সেই তুলনায় আমদানি করিবার খরচ বেশী নহে। অপর পক্ষে এই জিনিসটি আমদানি করিবার খরচ বহন করিয়াও যদি যন্ত্রপাতি রপ্তানি করা যায়, তবে

মোটের উপর আয়ের পরিমাণ বেশী হইবে। সুতরাং, মাখন অন্য দেশ হইতে আমদানি করিয়া নিজের দেশে রপ্তানিযোগ্য জিনিসগুলির উৎপাদনে মনোযোগী হইলেই ইংলণ্ডের পক্ষে তুলনামূলকভাবে খরচ কম পড়ে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য লাভজনক হয়। ইহাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তুলনামূলক সুবিধার নিয়ম (Law of Comparative Advantage) বলিয়া পরিচিত। প্রত্যেক দেশই কোন কোন জিনিস উৎপাদনে এই প্রকার তুলনামূলক সুবিধা ভোগ করে। ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়ায় যন্ত্রপাতি রপ্তানি করিয়া অষ্ট্রেলিয়া হইতে মাখন আমদানি করিলে এবং অষ্ট্রেলিয়া ইংলণ্ড হইতে যন্ত্রপাতি আমদানি করিয়া ইংলণ্ডে মাখন রপ্তানি করিলে উভয় দেশই লাভবান হইবে। এই নীতিই হইতেছে, তুলনামূলক খরচের নীতি (Law of Comparative Cost), এবং এই নীতির ভিত্তিতেই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি।

তুলনামূলক খরচের নিয়ম (Law of Comparative Cost): বিভিন্ন দেশের মধ্যে কোন জিনিসের উৎপাদন খরচের তুলনামূলক পার্থক্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি; যে দেশ যে জিনিস ভালভাবে এবং সস্তায় তৈয়ার করিতে পার, সেই দেশ শুধু সেই জিনিসই নিজের জন্য এবং অন্যান্য দেশের জন্য উৎপাদন করিবে। যে জিনিস কোন দেশ নিজে ভালভাবে এবং সস্তায় তৈয়ার করিতে পারে না, সেই জিনিসটি সেই দেশ এমন এক দেশ হইতে আমদানি করিবে যেখানে ইহা সস্তায় পাওয়া যায়। ইহাতে সব দেশের পক্ষেই সুবিধা হয়। কোন দেশ তাহা হইলে নিজের উদ্বৃত্ত সামগ্রী লইয়া বিশেষ সমস্যায় পড়িবে না। যে অঞ্চলে কোন জিনিস উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি পাইতে তুলনামূলক সুবিধা থাকে এবং যে অঞ্চল সেই জিনিস উৎপাদনে বিশেষ কর্মক্ষম, সেই অঞ্চল সেই বিশেষ জিনিসটি উৎপাদনে পারদর্শী হইবে। সব অঞ্চলেরই সব জিনিস উৎপাদনের সমান সুবিধা থাকে না। ভারতবর্ষ পাট উৎপাদনে বিশেষ সুবিধা ভোগ করে, আবার অষ্ট্রেলিয়া পশম উৎপাদনে বিশেষ তুলনামূলক সুবিধা ভোগ করে। কিন্তু ভারতবর্ষ পশম উৎপাদনে পারদর্শী নয়, অষ্ট্রেলিয়াও পাট উৎপাদন করিতে পারে না। আবার ভারতবর্ষের মধ্যেই উত্তরপ্রদেশ চিনি উৎপাদনে, বোম্বাই কাপড় উৎপাদনে এবং পশ্চিমবঙ্গ পাট উৎপাদনে তুলনামূলক সুবিধা ভোগ করে।

আঞ্চলিক তুলনামূলক পার্থক্য

আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাগে তুলনামূলক সুবিধার (comparative advantage) বিশেষ গুরুত্ব আছে। তুলনামূলক সুবিধা হইতেই আমরা তুলনামূলক খরচের নিয়মটি (Law of Comparative Cost) বুঝিতে পারি। তুলনামূলক খরচের নিয়মের ভিত্তিতেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালিত হয়। এই নীতি অনুযায়ী যে দেশ যে সকল জিনিস উৎপাদনে দক্ষতা অর্জন করে সেই দেশ সেই জিনিসগুলির উৎপাদন বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব প্রদান করে। দেশের যতটা প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা সেই জিনিসগুলি বেশী উৎপাদন করিয়া তাহারা অতিরিক্ত উৎপাদিত অংশ বিদেশে রপ্তানি করে এবং বিদেশ

হইতে অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস আমদানি করে। আমরা একটি উদাহরণের সাহায্যে ইহা বুঝাইতে পারি।

ধরা যাক্, ভারতবর্ষে ৪ ইউনিট শ্রমের ফলে ৫০ কুইন্টল ধান এবং ৫০ কুইন্টল পাট উৎপাদন হয়। অনুরূপভাবে পাকিস্তানে ৫ ইউনিট শ্রমের ফলে ৩০ কুইন্টল ধান এবং ৬০ কুইন্টল পাট উৎপাদন হয়। ভারতবর্ষে পাট এবং ধানের বিনিময় হার হইতেছে ১ : ১, এবং পাকিস্তানে বিনিময় হার হইতেছে ২ : ১। ভারতবর্ষে এক কুইন্টল ধানের বিনিময়ে এক কুইন্টল পাট পাওয়া যায় এবং পাকিস্তানে এক কুইন্টল ধানের বিনিময়ে দুই কুইন্টল পাট পাওয়া যায়। এই দুইটি জিনিস উৎপাদনে উভয় দেশের মধ্যে উৎপাদন খরচের অনুপাতে পার্থক্য থাকার দরুণ এই দুইটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হইবে। ভারতবর্ষ যদি ধান উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করে এবং বেশী করিয়া ধান উৎপাদন করিয়া তাহা পাকিস্তানের পাটের সহিত বিনিময় করে, এবং পাকিস্তান যদি বেশী করিয়া পাট উৎপাদন করিয়া অধিক পরিমাণে তাহা ভারতবর্ষের ধানের সহিত বিনিময় করে, তবে উভয় দেশই লাভবান হইবে।

বিনিময় হার কত হইবে তাহা নির্ভর করে এক দেশের জিনিসের জন্য অপর দেশের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। ধান ও পাট উৎপাদনে এই দুই দেশের মধ্যে উৎপাদন খরচের পার্থক্য আছে। আবার, এই দুইটি দেশের দুইটি জিনিস উৎপাদন খরচের অনুপাতে চরম পার্থক্য (absolute difference) থাকিতে পারে। সেইক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্ভবপর। একটি উদাহরণের সাহায্যে ইহা বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাক্, ভারতবর্ষে ৫ ইউনিট শ্রমের ফলে ৫০ কুইন্টল ধান এবং ২৫ কুইন্টল পাট উৎপাদিত হয় এবং পাকিস্তানে ৫ ইউনিট শ্রমের ফলে ৩০ কুইন্টল ধান এবং ৬০ কুইন্টল পাট উৎপাদিত হয়। এক্ষেত্রে উৎপাদন খরচের অনুপাতে চরম পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পারে। ভারতবর্ষের ধান উৎপাদনে দক্ষতা পাট উৎপাদনে দক্ষতার তুলনায় বেশী। সুতরাং ভারতবর্ষ যদি ধান উৎপাদনে এবং পাকিস্তান যদি পাট উৎপাদনে অধিক গুরুত্ব দেয় তবে ইহা উভয় দেশের পক্ষেই লাভজনক হইবে।

উভয় দেশের মধ্যে যদি তুলনামূলক খরচ সমান হয়, তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্ভব হইবে না। উপরে যে উদাহরণ দেওয়া হইল তাহা অনুযায়ী এক্ষেত্রে ভারতবর্ষের বেশী করিয়া ধান উৎপাদনের এবং পাকিস্তানের বেশী করিয়া পাট উৎপাদনের বিশেষীকরণ (Specialisation) করা সম্ভব নহে। কারণ, ইহাতে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে যখন উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় খরচ অনেক বাড়িয়া যাইবে এবং ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটি (Law of Diminishing Returns) কার্যকর হইবে।

সমালোচনা : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ক্লাসিক্যাল্ তুলনামূলক উৎপাদন খরচের নীতিটির বিরুদ্ধে প্রথম সমালোচনা হইতেছে এই যে ইহা মূল্যের শ্রমতত্ত্বের (Labour

theory of value) উপর ভিত্তিশীল। কিন্তু, আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীগণ মূল্যের শ্রমতত্ত্বের ভিত্তি ছাড়াও, শুধু উভয় দেশের বিভিন্ন জিনিস উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন পরিমাণ প্রান্তিক উৎপাদন খরচের মাধ্যমে এই তত্ত্বটি বুঝাইয়া থাকেন।

দ্বিতীয়ত, ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানীগণ এই তত্ত্বটি বুঝাইবার সময় ধরিয়া লইতেন যে উৎপাদনের উপাদানগুলির পরিমাণ স্থির থাকিবে। অথচ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের ফলে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার কাঠামো পরিবর্তিত হয় এবং সেইজন্য উৎপাদনের উপাদানগুলির পরিমাণও স্থির থাকে না। কিন্তু, আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের মতে উৎপাদনের উপাদানগুলির পরিমাণ পরিবর্তিত হইলেও তুলনামূলক উৎপাদন খরচের নীতি বুঝানো যাইতে পারে এবং সেইক্ষেত্রে উৎপাদনের উপাদানগুলির পরিমাণ পরিবর্তিত হওয়ার দরুণ খরচের যে পরিবর্তন হইবে তাহা তুলনামূলক উৎপাদনের প্রান্তিক খরচের মধ্যে প্রতিভাত হইবে।

তৃতীয়ত, ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানীগণ এই তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করিবার সময় দুই দেশের মধ্যে জিনিসপত্র আমদানি-রপ্তানি জনিত পরিবহণ খরচ হিসাবের মধ্যে ধরেন নাই। কিন্তু, আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের মতে দুই দেশের মধ্যে জিনিসপত্র আদান-প্রদানের পরিবহণ খরচ হিসাবের মধ্যে ধরিলেও তুলনামূলক খরচের নীতিটি বুঝান যায়।

সর্বশেষে, ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানীগণ মনে করিতেন যে তুলনামূলক উৎপাদন খরচের নীতিটি দুইটি দেশ ও দুই জিনিসের ক্ষেত্রে সীমিত। কিন্তু, তুলনামূলক উৎপাদন খরচের নীতিটি শুধু দুইটি দেশ এবং দুইটি জিনিসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নহে; প্রত্যেক দেশই বিভিন্ন ধরণের জিনিস উৎপাদন করে। ইহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ জিনিস উৎপাদনে স্বাভাবিক সুবিধা আছে এবং কোন্ কোন্ জিনিস উৎপাদনে স্বাভাবিক সুবিধা নাই সেইভাবে জিনিসগুলিকে ভাগ করিতে হইবে। যে জিনিসগুলি উৎপাদন করিতে খরচ অপেক্ষাকৃত কম হয় সেইগুলি বিদেশে রপ্তানি করিবার জন্য উৎপাদন করিতে হইবে এবং যে জিনিসগুলি উৎপাদন করিতে খরচ অপেক্ষাকৃত বেশী সেইগুলি বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইবে। আবার, কোন দেশ অপর বৈদেশিক দেশগুলিকে একটি দেশ হিসাবে কল্পনা করিয়া তুলনামূলক উৎপাদন খরচের নীতি প্রসারিত করিতে পারে।

সুতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি হিসাবে তুলনামূলক খরচের নীতিটির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা (Merits of International Trade): আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি প্রধান সুবিধা হইতেছে এই যে কোন দেশ তাহার যে সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিজের দেশে উৎপাদন করিতে পারে না সেই দেশ সেই সামগ্রীগুলি বিদেশ হইতে আমদানি করিতে পারে এবং নিজের দেশে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত সামগ্রীগুলি বিদেশে রপ্তানি করিতে পারে। ইহাতে কোন দেশকেই বিভিন্ন জিনিসের উৎপাদনে ঘাটতি অথবা উদ্বৃত্ত হইবার ফলে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয় না।

দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে সর্বনিম্ন দামে বিদেশ হইতে জিনিসপত্র কেনা যায়। ভারতে ইচ্ছা করিলেই মাখন তৈয়ারীর ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু তবুও ভারত অষ্ট্রেলিয়া হইতে মাখন আমদানি করে। ইহার কারণ হইতেছে এই যে অষ্ট্রেলিয়া হইতে মাখন অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে আমদানি করা যায়; ভারতে তৈয়ারী মাখনের খরচ বেশী হইবে বলিয়া দাম এত সস্তা হইবে না।

তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দেশ কতিপয় বিশেষ জিনিস উৎপাদনে পারদর্শিতা এবং বিশিষ্টতা অর্জন করে এবং উৎপাদন খরচ অনেক কমিয়া যায়। নিজের যোগ্যতা অনুযায়ীই প্রত্যেক দেশ বিভিন্ন জিনিস উৎপাদন করিয়া থাকে; এক কথায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের সমুদয় সুবিধা পাওয়া যায়। সর্বশেষে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার পথ সুগম করে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে প্রাপ্ত লাভ পরিমাপ করার উপায় (Methods of estimating gains form International Trade): বিভিন্ন দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে যে সুবিধা পায়, তাহা নিম্নলিখিতভাবে পরিমাপ করা যায়।

প্রথমত, বাণিজ্য হারের (Terms of Trade) সাহায্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের পরিমাণ পরিমাপ করা যায়। বাণিজ্য হার বলিতে বুঝায় আমদানি ও রপ্তানির মূল্যের অনুপাত। বাণিজ্য হার যদি দেশের অনুকূলে থাকে তবে দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভবান হয়। ধরা যাক্, ভারতবর্ষে ধান ও পাটের বিনিময় হার ১ : ১, এবং পাকিস্তানের বিনিময় হার ১ : ২; ভারতবর্ষ ১ ইউনিট ধান বিনিময় করিয়া পাকিস্তান হইতে কতটা পাট (এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দুই ইউনিট পাওয়া যাইবে) পাইবে, তাহার উপর ভারতবর্ষের লাভের পরিমাণ নির্ভর করে। যদি বাণিজ্য হার ভারতের অনুকূলে থাকে তবে এই দেশ এক ইউনিট ধানের বিনিময়ে সর্বোচ্চ পরিমাণ পাট পাইবে এবং যদি বাণিজ্য হার ভারতের প্রতিকূলে থাকে তবে এই দেশ এক ইউনিট ধানের বিনিময়ে কম পরিমাণ পাট পাইবে। বাণিজ্য হার অনুকূল থাকিলে দেশের আয়, উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান বাড়িয়া যায়।

বাণিজ্য হারের তারতম্য

দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যে দেশ যে জিনিস উৎপাদনে বিশেষ দক্ষ, সেই দেশে সেই জিনিসের উৎপাদন খরচ কমিয়া যায়। সুতরাং একই জিনিস উৎপাদনে বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদন খরচের পার্থক্য তুলনা করিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের পরিমাণ পরিমাপ করা যায়।

উৎপাদন খরচের তারতম্য

তৃতীয়ত, দুই দেশের জিনিসের জন্য দুইটি দেশেরই পারস্পরিক চাহিদার (reciprocal demand) তীব্রতার উপর ইহাদের বাণিজ্য হার নির্ভর করে।

ভারতবর্ষের উৎপাদিত জিনিসের জন্য পাকিস্তানের চাহিদা যদি পাকিস্তানের উৎপাদিত জিনিসের জন্য ভারতবর্ষের চাহিদা অপেক্ষা তীব্রতর হয়, তবে বাণিজ্য হার ভারতবর্ষের পক্ষে অনুকূল হইবে এবং পাকিস্তানের পক্ষে প্রতিকূল হইবে। পারস্পরিক চাহিদা নির্ভর করে বিদেশী জিনিসের জন্য দেশীয় চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (elasticity of home demand) এবং দেশীয় জিনিসের জন্য বিদেশীদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার (elasticity of foreign demand) উপর।

পারস্পরিক চাহিদা

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে যে লাভ হয় তাহা পরিমাপ করা যায় কিনা সেই বিষয়ে ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। অধ্যাপক মার্শালের ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্বটির সাহায্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের পরিমাণ পরিমাপ করা যায়। কোন জিনিষের জন্য যে দাম দিতে ক্রেতারা প্রস্তুত থাকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে সেই জিনিসের দাম যদি প্রকৃতপক্ষে আরও কম হয়, তবে ক্রেতারা যে উদ্বৃত্ত পাইবে তাহাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ।

ভোগোদ্বৃত্ত (Consumer's Surplus)

এমন অনেকগুলি জিনিস আছে যেমন, মদ, যেগুলি আমদানি করিলে ব্যবসায়ীদের লাভ হইলেও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক হইতে পারে। এখানে বাস্তব ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ পরিমাপযোগ্য নয়। কিন্তু, ইহা সত্ত্বেও বলা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সর্বদাই লাভজনক।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ লর্ড কেইনস্ প্রদত্ত আয় এবং কর্মসংস্থান তত্ত্ব (Theory of Income and Employment) প্রয়োগ করিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে যে লাভ হয় তাহা পরিমাপ করার চেষ্টা করেন। রপ্তানি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আয় এবং বিনিয়োগ বাড়ে। ইহাতে গুণক (Multiplier) এবং গতিবৃদ্ধির তত্ত্ব (Acceleration Principle) কার্যকর হয় এবং ভোগ-সামগ্রী ও মূলধন সামগ্রীর জন্য চাহিদা বাড়িয়া যায়। ভোগের জন্য চাহিদা বাড়িলে আমদানির পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। দেশের আমদানি বাড়িলে রপ্তানিকারী দেশের আয় বাড়িয়া যাইবে এবং সেই দেশের উৎপাদন স্তর এবং কর্মসংস্থান বাড়িয়া যাইবে। ইহাকে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক (Foreign Trade Multiplier) তত্ত্ব বলে। এই তত্ত্বের সাহায্যে আমরা জানিতে পারি একটি দেশের আমদানি ইহার রপ্তানির পরিমাণকে কতটা প্রভাবিত করিয়া তুলে। আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের মতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে কতটা লাভ হইবে তাহা বৈদেশিক বাণিজ্যের মাল্টিপ্লায়ারের (গুণকের) কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে।

আধুনিক তত্ত্ব

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং বহু দ্রব্য (International Trade and many commodities) : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি আলোচনা করিবার সময়

আমরা কতকগুলি অনুসিদ্ধান্ত ধরিয়া লইয়াছি। একটি অনুসিদ্ধান্ত হইতেছে এই যে তুলনামূলক খরচের নিয়ম দুইটি দেশ এবং দুইটি জিনিসের ক্ষেত্রে কার্যকর হইবে। এখন এই দুইটি দেশ ও দুইটি জিনিস অনুসিদ্ধান্তটিকে না ধরিয়াও যদি আমরা বহু জিনিসের ভিত্তিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলেও এই নিয়মটি অবশ্যই কার্যকর হইবে।

এ পর্যন্ত আমরা ধান এবং কাপড় এই দুইটি জিনিসের ভিত্তিতে বৈদেশিক বাণিজ্য আলোচনা করিয়াছি। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিভিন্ন স্তরে বহু প্রকার জিনিস দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া বিনিময়ের সুবিধাও অনেক। একটি দেশ কি কি জিনিস আমদানি বা রপ্তানি করিবে তাহা আপেক্ষিক উৎপাদন ব্যয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চাহিদার উপর নির্ভর করে। হ্যাবারলারের মতে যখন দুইটি দেশে একই খরচে বহু জিনিস উৎপাদন করিতে পারা যায়, তখন ঐ উৎপাদিত জিনিসগুলিকে আপেক্ষিক সুবিধা বা ব্যয়ের পরিবর্তনানুসারে আমরা সাজাইতে পারি। ইউরোপ এবং আমেরিকার মধ্যে আপেক্ষিক সুবিধানুসারে নিম্নলিখিত জিনিসগুলিকে সাজান যাইতে পারে—যেমন, মোটরগাড়ী, ফ্লাস্ক, ঘড়ি, রেডিও, গম এবং পশম।

আমেরিকায় গম উৎপাদনের খরচ সর্বাপেক্ষা কম এবং ইউরোপে ঘড়ি উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা সর্বাপেক্ষা বেশী, রেডিওর এত আপেক্ষিক সুবিধা নাই। বৈদেশিক বাণিজ্য আরম্ভ হইলে আমেরিকা গম ও ইউরোপ ঘড়ি উৎপাদন করিবে। কিন্তু বিশেষ প্রশ্ন হইতেছে অন্যান্য জিনিসের মধ্যে কোন্ কোন্ দেশ কোন্ কোন্ জিনিস উৎপাদন করিবে? এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া খুব কঠিন নয়। রপ্তানি নির্ভর করিবে ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের জন্য আন্তর্জাতিক চাহিদার তুলনামূলক তারতম্যের (comparative strength of international demand) ও বাণিজ্য হারের (terms of trade) উপর। একটি দেশ যতই সুবিধাজনক বাণিজ্য হারে বাণিজ্য করিতে পারিবে, ঠিক সেই পরিমাণ জিনিস রপ্তানি করিয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য আমদানি করিবে। বাণিজ্য হার (terms of trade) যতই প্রতিকূল হইবে, ততই ঐ দেশ বিভিন্ন জিনিস রপ্তানি করিবে। যেমন, আমেরিকায় উৎপন্ন গম এবং মোটরগাড়ীর আন্তর্জাতিক চাহিদা যদি বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে বাণিজ্য শর্ত আমেরিকার অনুকূলে যাইবে; আমেরিকা তখন শুধু গম এবং মোটরগাড়ী উৎপাদনে সমস্ত শক্তি নিয়োগের চেষ্টা করিবে এবং অন্যান্য জিনিস উৎপাদন করা বন্ধ করিয়া দিবে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং বহু দেশ (International trade and many countries): এখন বহু দেশের ক্ষেত্রে তুলনামূলক খরচের নিয়ম কতটা প্রয়োগ করা যায় তাহা আলোচনা করা যাক। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শুধু দ্বিমুখী (bilateral)

নয়, ইহা বহুমুখী (multilateral) হইতে পারে। অর্থাৎ পৃথিবীতে বহু দেশই বহু দেশের সহিত বাণিজ্য করিয়া থাকে। কিন্তু বহু দেশ সম্পর্কিত সমস্যাটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশেষ জটিলতার সৃষ্টি করিতে পারে না। তুলনামূলক সুবিধার ভিত্তিতেই দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য চলিয়া থাকে। বহু দেশের ক্ষেত্রে একটি দেশকে একদিকে রাখিয়া অপর দেশগুলিকে পৃথিবীর অবশিষ্টাংশ হিসাবে একত্রিত করিয়া ধরা হয়।* বহু দেশের সহিত বাণিজ্য চলা কালেও তুলনামূলক খরচের নীতি প্রয়োগ করা যায়।

দ্বিমুখী বৈদেশিক বাণিজ্যে একটি দেশের রপ্তানি মূল্য (export prices) অপর দেশ হইতে আমদানি মূল্যের (import prices) সমান হইলে বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্য আসিতে পারে। কিন্তু বহুমুখী বাণিজ্যে দেখা যায় যে একটি দেশের আমদানি-রপ্তানির মূল্য অপর সকল দেশের আমদানি-রপ্তানির মূল্যের সমান নাও হইতে পারে। ইহাতে সাময়িকভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্য নষ্ট হইয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু বৈদেশিক সাহায্য এবং ঋণ গ্রহণের ফলে সেই ভারসাম্য পুনরায় অর্জন করা যায়। ইহা ছাড়া, একটি বিশেষ দেশের আমদানি-রপ্তানির মূল্যে অবশ্যই সমতা আসিবে ("Imports are paid by exports")। এক দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের ঘাটতি অপর দেশের সঙ্গে বাণিজ্য উদ্বৃত্তের দ্বারা পূরণ করা যায়। এই প্রকার বহুমুখী বাণিজ্যে সব দেশই তুলনামূলক সুবিধার (comparative advantage) দ্বারা পরিচালিত হইবে। একটি উদাহরণের সাহায্যে এই তত্ত্বটি বুঝান যাইতে পারে।

ইউরোপের সঙ্গে অপ্রত্যক্ষ বাণিজ্য (invisible trade) আমেরিকার পক্ষে খুবই লাভজনক। আমেরিকা ইউরোপের নিকট প্রচুর জিনিস বিক্রয় করে এবং খুবই কম জিনিস ক্রয় করে; কিন্তু আমেরিকা পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে কাঁচামাল ও রবার ক্রয় করে। তাহারা আবার আমেরিকার নিকট হইতে কিছু ক্রয় করে না, কিন্তু
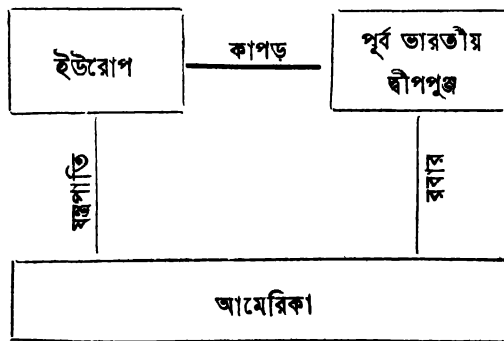
* As far as any one country is concerned, all the other nations with whom she trades can be lumped together into one group as the rest of the world.

—*Samuelson.* Economics,—An Introductory Analysis.

ইউরোপের নিকট হইতে কাপড় এবং অন্যান্য জিনিস ক্রয় করিয়া থাকে। উপরের চিত্রে তাহাই দেখানো হইয়াছে। কোন্ কোন্ দিকে রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে, তাহা রেখার সাহায্যে দেখানো হইয়াছে। যদি প্রত্যেক দেশই দ্বিমুখী বাণিজ্য চুক্তি করে, তাহা হইলে তুলনামূলক খরচের নীতির কার্যকারিতা নষ্ট হইতেছে না।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, স্থির উৎপাদন ব্যয় এবং বিকল্প ব্যয় (International Trade, Constant Cost and Opportunity Cost): ক্লাসিক্যাল তুলনামূলক খরচের তত্ত্বটি (Theory of Comparative Cost) স্থির উৎপাদন-ব্যয়ের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। ধরা যাক্, ভারত ও ব্রহ্মদেশ যথাক্রমে গম ও চাল বিক্রয় করিতেছে এবং স্থির উৎপাদন ব্যয়ের ভিত্তিতেই এই উৎপাদনের কাজ চলিতেছে। যদি ব্রহ্মদেশ চাল উৎপাদনে সব উপকরণ নিয়োগ করে তবে ইহা ৮ ইউনিট চাল উৎপাদন করিতে পারে। বিকল্পভাবে যদি এই দেশ গম উৎপাদন করে, তবে সব উপকরণ নিয়োগ করিয়া ৫ ইউনিট গম উৎপাদন করিতে পারে।

নিম্নের চিত্রটিতে দেখা যাইতেছে, ব্রহ্মদেশ যদি শুধু চাল উৎপাদন করে তবে ইহা ৮ ইউনিট উৎপাদন করিতে পারে এবং যদি শুধু গম উৎপাদন করে তবে৫ ইউনিট উৎপাদন করিতে পারে। ৫ হইতে ৮ পর্যন্ত যে রেখাটি সংযোজিত হইয়াছে তাহা অনুযায়ী গমের বিনিময়ে যতটা চাল উৎপাদিত হইতে পারে তাহা স্থির খরচের
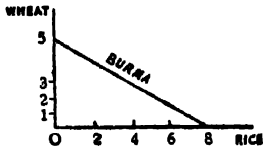
চিত্র নং ৯৬

দেখানো ভিত্তিতে হইয়াছে। এই রেখাটিকে বিকল্প খরচ-রেখা বা সুযোগ-খরচ রেখা (Opportunity Cost Curve) বলা হয়। ব্রহ্মদেশের ভিতরেই চাল এবং গম

চিত্র নং ৯৭

চিত্র নং ৯৮
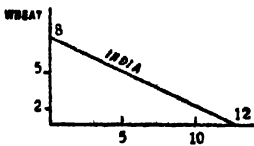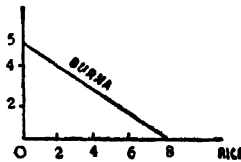
উৎপাদন করিবার ক্ষেত্রে খরচের অনুপাত এবং এই বিকল্প খরচ-রেখা একই। এখানে উল্লেখযোগ্য বিকল্প-খরচ রেখাটিকে Transformation Curve-ও বলা হয়। ধরা যাক ভারতবর্ষ সব উপকরণ নিয়োগ করিয়া ১২ ইউনিট চাল অথবা ৮ ইউনিট গম উৎপাদন করিতে পারে এবং তাহাও ৯৭ নম্বর এবং ৯৮

নম্বর চিত্র দুইটিতে দেখানো হইল। সুতরাং ব্রহ্মদেশের পক্ষে গম ও চালের উৎপাদন খরচের অনুপাত যেখানে হইতেছে ৫ : ৮; ভারতের ক্ষেত্রে তাহা হইতেছে ৮ : ১২। কিন্তু উভয় দেশের উৎপাদন খরচের অনুপাত তুলনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে চাল উৎপাদনে ব্রহ্মদেশ এবং গম উৎপাদনে ভারত তুলনামূলক সুবিধা ভোগ করিতেছে। তাহাও ৯৯ নম্বর চিত্রে দেখানো হইল।

চিত্র নং ৯৯
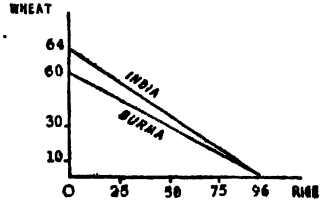
এই চিত্র হইতে বুঝা যাইতেছে যে একই পরিমাণ চাল উৎপাদনের (৯৬ ইউনিট) বিপক্ষে ভারত ব্রহ্মদেশ অপেক্ষা অধিক পরিমাণ গম উৎপাদন করিতে পারে। অর্থাৎ ব্রহ্মদেশ যেখানে উৎপাদন করিতেছে ৯৬ ইউনিট চাল এবং ৬০ ইউনিট গম, ভারত সেখানে উৎপাদন করিতেছে ৯৬ ইউনিট চাল এবং ৬৪ ইউনিট গম। ইহার ফলে উভয় দেশের মধ্যে এমন একটি বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হইবে যেখানে উভয় দেশই লাভবান হইবে। ১০০ নম্বর চিত্রে তাহা দেখানো হইয়াছে। বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হইবার পর উভয় দেশের মধ্যে গম ও চাউল উৎপাদনের অনুপাত হইতেছে ৬২:৯৬। উক্ত চিত্রে ব্রহ্মদেশ DK পরিমাণ চাল রপ্তানি করিতেছে এবং ইহার বিপক্ষে গম আমদানি করিবে। D বিন্দু হইতে যে রেখাটি উপরের দিকে উঠিয়াছে তাহা গম আমদানির পরিমাণ বুঝাইতেছে।
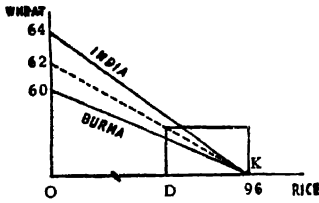
চিত্র নং ১০০

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং ক্রমবর্ধমান ব্যয় (International trade and Increasing Costs): উৎপাদন ব্যয় স্থির আছে এই ধারণা গ্রহণ না করিয়া দুই দেশে এবং দুইটি জিনিস অনুসিদ্ধান্তে আমরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে এখন আলোচনা করিব। প্রত্যেক দেশের একটি ব্যয়-রেখা নির্ধারণ করা সম্ভবপর নয়। আমেরিকার ইউরোপ অপেক্ষা খাদ্য উৎপাদনের বিশেষ সুবিধা আছে; তথাপি একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আমেরিকার খাদ্য প্রস্তুত হইবার পর অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন করিবার খরচ ইউরোপের খাদ্য উৎপাদন করিবার খরচ অপেক্ষা বেশী হইবে। এই ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান ব্যয় অথবা ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটি কার্যকর হইবে। আমেরিকায় প্রতিযোগিতার দরুণ যদি খাদ্যদ্রব্যের আপেক্ষিক মূল্য কাপড়ের আপেক্ষিক মূল্য হইতেও কম হয়, তাহা হইলে ইউরোপের সামান্য একটু উর্বর জমিতে খাদ্য উৎপাদনের মূল্য কম হইতে পারে। আবার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ভারসাম্যে পৌঁছিবার

পরেও আমেরিকায় হয়ত খুব কম খরচে কাপড় উৎপাদন হইতে পারে। ইহার পরেও যদি আমেরিকা কাপড় উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করে তাহা হইলে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাইবে এবং আমেরিকার ক্ষতি হইবে। সেই ক্ষেত্রে পুনরায় ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের নিয়মটি কার্যকর হইবে। ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের দরুণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের রূপ কি হইতে পারে তাহা এইভাবে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে :—

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দেশ সেই সব জিনিস উৎপাদনে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিবে যেগুলির উৎপাদনে তাহাদের সম্পূর্ণ সুবিধা আছে। সেই দেশগুলি এই প্রকার উৎপাদিত জিনিস কিছু পরিমাণে রপ্তানি করিবে অপর দেশের অতিরিক্ত রপ্তানির বিনিময়ে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ব্যয়েব দরুণ এই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিশেষী-করণ সম্ভব হয় না। উভয় দেশেই দুই প্রকার জিনিস কিছু পরিমাণে প্রস্তুত হইবে। এমন কি বলা যায়, যে জিনিসগুলি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশেষ স্থান পায় না সেইগুলিও কম উৎপাদন ব্যয়ে উৎপাদিত হইয়া প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবে। সুতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ব্যয় থাকে বলিয়াই বিশেষীকরণ সম্পূর্ণতা লাভ করে না।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও ক্রমহ্রাসমান ব্যয় (International Trade and Decreasing Costs) : বৃহদায়তন উৎপাদনেব ফলে যতই উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে ততই উৎপাদন খবচ কমিয়া আসে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ইহাও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আপেক্ষিক সুবিধাব তাবতম্য এবং ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল কারণ। কোন জিনিসের ব্যাপক বাজার থাকিলে বৃহদায়তন উৎপাদন লাভজনক হয়। যদি দুইটি দেশের তুলনামূলক ব্যয়ের অনুপাতে কোন পার্থক্য নাও থাকে, তাহা হইলেও যে যে জিনিস যে যে দেশ ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ে উৎপাদন করিতে পারিবে, সেই সব দেশে সেই সেই জিনিস উৎপাদিত হইবে। সম্পূর্ণ বিশেষীকরণের ফলে পৃথিবীর উৎপাদন বাড়িয়া যাইবে।

ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের দরুণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি বিশেষ দিক হইতেছে এই যে ইহার ফলে পূর্ণ প্রতিযোগিতা না থাকিয়া অপূর্ণ প্রতিযোগিতা অথবা একচেটিয়া কারবার দেখা দিতে পারে। বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় বাধা দান করিয়া দেশীয় শুল্ক এই এক-চেটিয়া কারবারকে সফল করিতে পারে। বৈদেশিক বাণিজ্য যদি বাধামুক্ত হয় তাহা হইলে সরকার কার্যকরীভাবে একচেটিয়া কারবারে বাধা দিতে পারে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিকল্প খরচ তত্ত্বের প্রয়োগ (Application of the Theory of Opportunity Cost to International Trade :) তুলনামূলক খরচের নিয়ম (Principle of Comparative Cost) সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়া দেখানো হইয়াছে যে ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানীগণ শ্রম খরচের (Labour Cost) ভিত্তিতে এই তত্ত্বটি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অধুনাতনঃ

টাউসিগ (Prof. Taussig) এবং অধ্যাপক ভাইনার (Prof. Viner) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে "Real Cost" তত্ত্বের প্রয়োগ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক ভাইনারের ভাষায় এইক্ষেত্রে "প্রকৃত খরচ" বা Real Cost বলিতে বুঝায় "all subjective costs directly associated with production" কিন্তু আধুনিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের আধুনিক বিশ্লেষণে "প্রকৃত খরচের" তত্ত্বটি বিশেষ স্থান পায় নাই।

অধ্যাপক হ্যাবারলার (Prof. Haberler) বিকল্প খরচ বা Opportunity Cost তত্ত্বের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রত্যেক দেশে বিভিন্ন উপাদানের দামের অনুপাত শুধু অর্থের মাধ্যমে পরিমাপক উৎপাদন খবচই বুঝায় না, ইহা সামাজিক সুযোগ ব্যয়ের (Social Opportunity Cost) পরিচায়ক। একটি জিনিসের পরিপ্রেক্ষিতে যখন আরেকটি জিনিসের খরচ হিসাব করা হয়, অর্থাৎ, যখন একটি জিনিস পাইতে হইলে অপর একটি জিনিস কতটা ত্যাগ করিতে হইবে তাহা হিসাব করা হয় তখনই সেই খরচকে বিকল্প খরচ (Opportunity Cost) বলা হয়। উপাদানগুলি কাজে নিযুক্ত আছে ধরিয়া লইলে এবং উৎপাদন কাঠামো ও শ্রমিকদের কারিগরী জ্ঞান অপরিবর্তিত আছে ধরিয়া লইলে একটি জিনিসের উৎপাদন তখনই বাড়ানো সম্ভবপর যখন সঙ্গে সঙ্গে বিকল্প একটি জিনিসের উৎপাদন কমানো হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি ব্যাখ্যা করিবার জন্য এই তত্ত্বটিকে প্রয়োগ করা হয়। নিম্নলিখিত উদাহরণের সাহায্যে ইহা বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাক, পাকিস্থানে পাট এবং ধানের দাম ও উৎপাদন-খরচ যথাক্রমে প্রতি ইউনিটে ৪ টাকা এবং ২ টাকা; অর্থাৎ, এক ইউনিট পাটের বিকল্প খরচ হইতেছে দুই ইউনিট ধানের সমান। এইভাবে অর্থের মাধ্যমে বিকল্প খরচ বুঝান যাইতে পারে। এখন বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা ধরিয়া লইলে পাট ও ধান উভয়েরই দাম যথাক্রমে ইহাদের প্রান্তিক উৎপাদনের দামের সমান। কোন উপাদানের সাহায্যে যদি এখন এক ইউনিট ধান উৎপাদন করিতে হয় তবে ২ টাকার পরিমাণ পাটের উৎপাদন ত্যাগ করিতে হইবে। অথবা অন্যভাবে বলিতে গেলে এক ইউনিট অতিরিক্ত পাট উৎপাদন করিতে হইলে দুই ইউনিট ধানের উৎপাদন ত্যাগ করিতে হইবে। ধরা যাক, ভারতে অনুরূপভাবে পাটের এক ইউনিট উৎপাদনের বিকল্পে তিন ইউনিট ধান উৎপাদন করা যাইতে পারে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানে পাট এবং ধানের উৎপাদন খরচের অনুপাত এবং বিকল্প খরচ আলাদা। সুতরাং এই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে। দুই দেশের বাণিজ্য হার (Terms of Trade) যে বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করিবে সেই বিন্দুতে এই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক নির্ধারিত হইবে এবং তাহা নির্ভর করে এই দুই দেশের পরস্পরের উৎপাদিত জিনিসের জন্য পারস্পরিক চাহিদা।

বিকল্প খরচের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই ব্যাখ্যা শ্রম-খরচের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী গ্রহণ-

যোগ্য। কারণ এই তত্ত্বে উৎপাদনের ক্ষেত্রে একাধিক উপাদানের ভূমিকা এবং এই উপাদানগুলির বিভিন্ন ধরনের সমাবেশ বিবেচনা করিয়া আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়।

বৈদেশিক বাণিজ্য এবং উপাদান-অনুপাত (International Trade and Factor Proportions): তুলনামূলক ব্যয়ের পার্থক্য যদি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল ভিত্তি হয়, তাহা হইলে স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে এই পার্থক্য কেন হয়? বিশিষ্ট অর্থবিজ্ঞানী হেক্‌শার (Heckscher) এবং বার্টিল ওলিন (Bertil Ohlin) এই প্রশ্নের জবাব দিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন জিনিস উৎপাদনে ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের প্রয়োজন হয় এবং প্রত্যেক দেশের উপাদানের গুণও বিভিন্ন। শ্রম এবং মূলধনের অনুপাতে জমির উর্বরতার দরুণ যদি প্রচুর গম উৎপাদন করা যায়, তাহা হইলে যে সকল দেশে সেই প্রকার জমি পাওয়া যায়, সেই সকল দেশে সস্তায় গম উৎপাদন হইবে। এই কারণে অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, আর্জেন্টিনা গম রপ্তানি করে; অপরপক্ষে, যদি কাপড় উৎপাদনে মূলধন ও জমির অনুপাতে বেশী শ্রমের দরকার হয় তাহা হইলে যে সকল দেশে প্রচুর পরিমাণে শ্রমিক আছে বা পাওয়া যায়, তাহারা বস্ত্র উৎপাদন করিবে, যেমন, ইংলণ্ড, জাপান এবং ভারতবর্ষ।

ইহা মনে রাখা দরকার যে উপাদান-অনুপাত অর্থে ঠিক কি বুঝায়, তাহা নির্দেশ করা কঠিন। যে সব ক্ষেত্রে মূলধন সহজলভ্য নয়, সেই সব ক্ষেত্রে শ্রম-প্রধান (Labour-intensive) উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগ বেশী দেখা যায়। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প মূলধন-প্রধান (Capital-intensive) এবং কুটির শিল্প শ্রম-প্রধান, কিন্তু সামগ্রিক উৎপাদনে এমন অনেক জিনিস দেখা যায়, যাহা উৎপাদন করিতে হইলে একটি উপাদানের পরিবর্তে অপর একটি উপাদান ব্যবহার করা চলে। যতক্ষণ আমরা কোন জিনিসের উপাদান-পরিবর্তনতা (substitutability of a factor) আছে কিনা এবং ইহা সহজ-লভ্য কিনা জানিতে পারি ততক্ষণ পর্যন্ত ইহা মূলধন-প্রধান কিনা অথবা শ্রম-প্রধান কিনা তাহা জানিতে পারি না। উপাদান সহজলভ্য, এই ধারণার অর্থ হইতেছে এই যে প্রত্যেক দেশের উৎপাদন সম্ভাবনা সমান। উপরন্তু এই সিদ্ধান্তের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ইহারা একই শ্রেণীর নয় (Homogeneous), এবং ইহারা অপ্রতিযোগী শ্রেণীর (Non-competing Groups)। ইহা স্বভাবতঃ দেখা যায় যে কোনও একটি বিশেষ উপাদান হয়ত শুধু একই দেশে পাওয়া যায় এবং অপর দেশে তাহা পাওয়া যায় না।

এই সব অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ ধনবিজ্ঞানীগণ ব্যাপক অর্থে ওলিনের তুলনামূলক সুবিধাকে বৈদেশিক বাণিজ্যের ভিত্তি বলিয়া মনে করেন। যে দেশে (যেমন আমেরিকা) মূলধন বেশী, সেই দেশ মূলধন-প্রধান জিনিস রপ্তানি করে। আবার যে দেশে শ্রমিক বেশী, সেই দেশ শ্রম-প্রধান জিনিস আমেরিকার নিকট বিক্রয় করে। কিন্তু অধ্যাপক লিওন্টিয়েফ দেখাইয়াছেন যে আমেরিকার রপ্তানি মূলতঃ

শ্রম-প্রধান এবং আমদানি মূলধন-প্রধান। ইহাকে (Leontief Paradox) বলা হয়। কিন্তু লিওনটিয়েফের যুক্তির বিরুদ্ধে বহু সমালোচনা করা হইতেছে। ইহার ফলে ওলিনের যে নীতি তাহার মূল বক্তব্য বিশেষভাবে পুনরায় পরীক্ষিত হইতেছে।

উপাদান-মূল্যের সমতা (Equalisation of Factor Prices): বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল ভিত্তি হইতেছে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আপেক্ষিক উৎপাদন খরচের পার্থক্য; আমদানি-রপ্তানির খরচ বাদ দিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত এই পার্থক্য দূর না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বৈদেশিক বাণিজ্য চলে। বস্তুতঃ যাতায়াতের খরচ বাদ দিলে বৈদেশিক বাণিজ্যই উপাদান-মূল্যের সমতা আনিয়া থাকে।

যে সব উপাদান প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় সেই উপাদানগুলি কর্তৃক উৎপাদিত জিনিস যখন রপ্তানি হইতে থাকে, তখন তাহাদের চাহিদা বাড়ে। ফলে তাহাদের প্রাচুর্য কমিয়া আসে। যখন দুষ্প্রাপ্য উপাদান দ্বারা প্রস্তুত জিনিস আমদানি করা হয়, তখন দেশীয় বাজারে এই সব উপাদানের যোগান ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। রপ্তানির ফলে সস্তা এবং সহজলভ্য উপাদানের মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আমদানির ফলে দামী এবং দুষ্প্রাপ্য উপাদানের আয় কমিয়া যায়।

কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে যখন উপাদান-মূল্য-সমতা পরিপূর্ণরূপে লাভ করা যায়, তখনই এই উপাদান-মূল্য-সমতা নীতিটি কার্যকর হয়। কিন্তু ইহার মূল ধারণাগুলি বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ—যেমন উপাদান হইতে জিনিসের সংখ্যা বেশী হওয়া উচিত, লোকের রুচির সমতা থাকা উচিত, উৎপাদন পদ্ধতি সহজ থাকা উচিত; উপাদান-পরিবর্তন্তা সীমাবদ্ধ থাকা উচিত, এই অনুসিদ্ধান্তগুলি ধরিয়া লইবার ফলে উপাদান-মূল্য-সমতা সম্ভবপর। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক জিনিস উৎপাদন করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে সুলভ উপাদানের দাম বাড়িয়া যায় এবং দুর্লভ উপাদানের দাম কমিয়া যায়। যেখানে বৈদেশিক বাণিজ্য এই উপাদান প্রাচুর্যের উপর নির্ভরশীল, সেখানে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দিক হইতে উপাদান মূল্যের উপর বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতিক্রিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাণিজ্য ব্যালান্স এবং লেনদেন ব্যালান্স (Balance of Trade and Balance of Accounts or Balance of Payments): কোন দেশের রপ্তানির মোট পরিমাণ হইতে আমদানির মোট পরিমাণ বাদ দিলে যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহাকেই বাণিজ্য ব্যালান্স (Balance to Trade) বলে। বাণিজ্য ব্যালান্স তখনই অনুকূল (Favourable) হয় যখন রপ্তানির পরিমাণ আমদানির পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হয়। আবার আমদানির পরিমাণ রপ্তানির পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হইলে বাণিজ্য ব্যালান্সকে প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যালান্স (Unfavourable Balance of Trade) বলে। বাণিজ্য ব্যালান্স অনুকূল হইলে সরকারের রপ্তানি হইতে আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। আবার বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল হইলে দেশ হইতে টাকা বাহিরে চলিয়া যায়।

যে সকল সামগ্রী দুই দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি হয় সেইগুলির তালিকাকে বাণিজ্যের প্রত্যক্ষ তালিকা (visible items of trade) বলে। কিন্তু আমদানি-রপ্তানি ছাড়াও দুইটি দেশের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের দেনা-পাওনা থাকিতে পারে। যেমন বিদেশী বীমা কোম্পানী, বিদেশী ব্যাংক এবং বিদেশী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি আমাদের দেশ হইতে নিজেদের দেশে টাকা পয়সা পাঠাইয়া থাকে ; আবার যদি তাহারা আমাদের দেশে দেনা করিয়া থাকে তবে সেইজন্য তাহারা সুদ ও আসল প্রদান করিবে। তাহা ছাড়াও, অনেক সময় আমাদের দেশ হইতে কেহ উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ গমন করিলে আমরা বিদেশে শিক্ষার্থীর খরচের জন্য টাকা পাঠাই এবং বিদেশীগণ যদি আমাদের দেশে বেড়াইতে আসে তবে তাহাদের খরচ বাবদ কিছু টাকা আমাদের দেশে আসে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, জিনিসপত্র আমদানি-রপ্তানি ছাড়াও দুইটি দেশের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের দেনা-পাওনা থাকে, এইগুলির তালিকাকে বাণিজ্যের অপ্রত্যক্ষ তালিকা (invisible items of trade) বলে।

বাণিজ্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তালিকা ছাড়াও দুই দেশের মধ্যে মূলধনের আনাগোনা (capital movements) হইতে পারে। যেমন যুদ্ধের পর বিজিত দেশ বিজয়ী দেশকে ক্ষতিপূরণ দিতে পারে অথবা কোন দেশ নিজের দেশ হইতে অপর দেশে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য বাবদ টাকা পাঠাইতে পারে। বাণিজ্যের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ তালিকার জন্য কিছু টাকা লেনদেন, এবং মূলধনের আনাগোনা, ইত্যাদির মিলিত হিসাবকে লেনদেনের ব্যালান্স (Balance of Payments) বলা হয়।

আমদানি ও রপ্তানির সমতা (Equality of Exports and Imports) : ক্ল্যাসিক্যাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে আমদানি রপ্তানির ভারসাম্য নষ্ট হইয়া গেলে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে (automatic process) আবার ভারসাম্য ফিরিয়া আসে। ক্লাসিক্যাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে যে দেশে রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি বেশী হয় সেই দেশ হইতে স্বর্ণ বিদেশে চলিয়া যায়। সুতরাং সেই দেশে অর্থের পরিমাণ হ্রাস পাইবে এবং জিনিসপত্রের দাম কমিতে আরম্ভ করিবে। জিনিসপত্রের দাম কমিতে আরম্ভ করিলে বিদেশীরা অধিক পরিমাণে সেই দেশ হইতে জিনিসপত্র লইতে আরম্ভ করিবে এবং ইহার ফলে সেই দেশের রপ্তানি বাড়িতে আরম্ভ করিবে এবং আমদানি কিছু পরিমাণে কমিতে থাকিবে। রপ্তানি পুনরায় বাড়িলে স্বর্ণেরও পুনরাগমন হইবে এবং লেনদেন ব্যালান্সে পুনরায় ভারসাম্য ফিরিয়া আসিবে। অনুরূপভাবে যদি কোন দেশে আমদানি হইতে রপ্তানির পরিমাণ বেশী হয় তবে সেই দেশে স্বর্ণের রিজার্ভ বাড়িয়া যাইবে, অর্থের পরিমাণ বাড়িবে, জিনিসপত্রের দাম বাড়িবে এবং ইহার ফলে রপ্তানি কমিবে ও আমদানি কিছু পরিমাণে বাড়িবে। এইভাবে স্বর্ণের রিজার্ভ কিছু পরিমাণে কমিবে এবং অবশেষে লেনদেন ব্যালান্সে পুনরায় ভারসাম্য ফিরিয়া আসিবে। এইজন্যই বলা হয়, আমদানির মূল্য শোধ করা হয় রপ্তানির সাহায্যে (exports pay for imports)।

ক্ল্যাসিক্যাল যুক্তি

আমদানি-রপ্তানির এই সমতা বজায় থাকে স্বর্ণমানের স্বয়ংক্রিয় নিয়মের সাহায্যে। আমরা ক্লাসিক্যাল যুক্তিটির এই সমালোচনা করিতে পারি যে অর্থের পরিমাণ কমিলেই দাম কমিবে কিনা তাহার নিশ্চয়তা নাই। ক্ল্যাসিক্যাল যুক্তিটি অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের (Quantity Theory of Money) উপর ভিত্তিশীল।

আধুনিক মতবাদ

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের মতে দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত না থাকিলেও এবং দেশে স্বর্ণের আনাগোনা ছাড়াও লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য বজায় থাকিতে পারে। তাঁহাদের মতে রপ্তানির বৃদ্ধি ঘটিলে আয়, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের যে পরিবর্তন ঘটে, তাহাই আবার আমদানি-রপ্তানির সমতা ফিরাইয়া আনে। কোন দেশের রপ্তানি যদি আমদানি অপেক্ষা বেশী হয়, তবে সেই দেশে আয় এবং রপ্তানির জিনিস উৎপাদনকারী শিল্পগুলির উন্নতি হয়। ইহাতে কর্মসংস্থানও বাড়িয়া যায়। আয় এবং কর্মসংস্থানের বৃদ্ধির ফলে ভোগ সামগ্রীর চাহিদাও বাড়িয়া যাইবে এবং ইহাতে কিছু পরিমাণে আমদানিও বাড়িয়া যাইবে। আবার চাহিদা বৃদ্ধির জন্য দেশে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যাইবার জন্য এবং দেশের অধিবাসীদের নিজেদের তৈয়ারী জিনিস ভোগ করিবার ইচ্ছা বাড়িয়া যাইবার জন্য রপ্তানির পরিমাণও কিছু কমিয়া যাইবে। অনুরূপভাবে কোন দেশের আমদানি যদি রপ্তানি অপেক্ষা বেশী হয়, তবে সেই দেশে আয় কমিয়া যায় এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির বিনিয়োগ কমিয়া যায়। আভ্যন্তরীণ উৎপাদন কমিয়া যাইবার দরুণ জনসাধারণের সামগ্রিক চাহিদা কমিয়া যায়। ইহাতে আমদানির পরিমাণ কমিয়া যায়। এইভাবে অনুকূল অথবা প্রতিকূল অবস্থা স্বয়ংক্রিয় ভাবেই লেনদেনের ভারসাম্য অবস্থা ফিরাইয়া লেনদেন ব্যালান্সে আনে। কিন্তু, এইভাবে যে সর্বদাই স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেনদেনে ভারসাম্যহীনতা দূর হইয়া যাইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কোন দেশের আমদানি কতটা কমিবে তাহা বিদেশের জিনিসের জন্য সেই দেশের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (elasticity of home demand) এবং বিদেশের যোগানের স্থিতিস্থাপকতার (elasticity of foreign supply) উপর নির্ভর করে। আবার কোন দেশের রপ্তানি কতটা কমিবে অথবা বাড়িবে তাহা সেই দেশের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা (elasticity of home supply) এবং সেই দেশের জিনিসের জন্য বিদেশের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার (elasticity of foreign demand) উপর নির্ভর করে।

আমদানি-রপ্তানি পার্থক্য দূর করার উপায় (Methods of correcting the difference between the exports and imports) : রপ্তানির এবং আমদানি মধ্যে পার্থক্য থাকিলে সেই পার্থক্য দূর করিবার বিভিন্ন উপায় আছে। আমদানি যদি রপ্তানি অপেক্ষা বেশী হয় তবে আমদানি নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুসরণ করিয়া আমদানির পরিমাণ কমানো যাইতে পারে। তাহা ছাড়া,

আমদানির বিকল্প জিনিস যাহাতে দেশে বেশী করিয়া উৎপাদিত হয় তাহার উপর গুরুত্ব আরোপ করা যাইতে পারে। অপরপক্ষে রপ্তানি বাড়াইবাব জন্যও বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে। রপ্তানিযোগ্য সামগ্রী যাহাতে অল্প উৎপাদন খরচে দেশে অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হয় তাহার ব্যবস্থা কবিতে হইবে। দেশের বাহিরে রপ্তানির সম্প্রসারণের জন্য এবং রপ্তানিযোগ্য সামগ্রীগুলির জন্য বিদেশে চাহিদা যাতে বাড়ে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কবা দবকার। এজন্য প্রধান প্রয়োজন রপ্তানিযোগ্য জিনিসগুলির গুণগত উৎকর্ষ বাড়ানো। রপ্তানির পরিমাণ ও মূল্য বাড়াইবার জন্য এবং আমদানিব পবিমাণ ও মূল্য কমাইবার জন্য অনেকক্ষেত্রে মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার কমাইবার (Devaluation of Currency) সুপাবিশ করা হয়। কিন্তু সেই ব্যবস্থা কতদূর সফল হইবে তাহা নির্ভর কবে দেশেব জিনিসের জন্য বিদেশীদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এবং রপ্তানি যোগ্য জিনিসেব যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। যদি এই স্থিতিস্থাপকতা এক হইতে বেশী greater than unity থাকে, তবেই মুদ্রাব বহির্মূল্য হ্রাস কার্যকর হয়। ইহাকে মার্শাল-লার্ণার শর্ত (Marshall-Lerner Condition) বলা হয়।

লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্যের অভাব (Balance of Payments Disequilibrium): যখন কোন দেশের বৈদেশিক লেনদেনে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্যেব অভাব দেখা যায় তখন অপব দেশের মুদ্রার সহিত সংশ্লিষ্ট দেশের মুদ্রা বিনিময় হারেও ভারসাম্যেব অভাব দেখা যায়। যদি বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য চক্রের গতি-প্রকৃতি বিভিন্ন ধরণের হয়, অর্থাৎ যদি বিভিন্ন দেশে মুদ্রাস্ফীতি অথবা মন্দার তীব্রতা বিভিন্ন হয়, তবে সেই কারণে বাণিজ্যে লিপ্ত দেশগুলিব লেনদেন ব্যালান্সে যে ভাবসাম্যের অভাব দেখা যায় ইহাকে বাণিজ্য-চক্রজনিত ভারসাম্যহীনতা (Cyclical Disequilibrium) বলা হয়। আবার কোন দেশ যখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি স্তর হইতে অপর একটি স্তরে উন্নীত হয় তখন উৎপাদন কাঠামোয় দীর্ঘকালীন পরিবর্তন হইতে পারে এবং ইহার ফলে মূলধন আনাগোনায (Capital Mevements) পরিবর্তন হইতে পারে। এইজন্য লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্যের অভাব (Secular Disturbances to Balance of Payments) পরিলক্ষিত হইতে পারে। যদি কোন দেশের উপাদান মূল্য (Factor Prices) বৈদেশিক বাণিজ্যে নিয়োজিত উপাদানগুলির সববরাহ (Factor endowments) ঠিকভাবে প্রকাশিত না করে তবে কাঠামোগত ভারসাম্যবিহীনতার (Structural Disequilibrium) সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে যদি কোন দেশের জাতীয় আয়ের পরিবর্তন হয় এবং ইহা সেই কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্সে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সৃষ্টি করে তবে আমরা আয়ের পরিবর্তনহেতু লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্যেব অভাব (Income Disequilibrium) দেখা যায়। তাহা ছাড়া আমরা দেখিতে পাই লেনদেন ব্যালান্সে মৌলিক ভারসাম্যহীনতা

(Fundamental Disequilibrium)। নিম্নের চিত্রে লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্যহীনতা দেখানো হইয়াছে।

যখন বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা অপেক্ষা যোগান বেশী থাকে, তখন লেনদেন ব্যালান্সে উদ্বৃত্ত দেখা যায়। যখন r_2 হইতেছে মুদ্রা বিনিময়-হার, তখন চাহিদা অপেক্ষা যোগান বেশী; আবার যখন r_1 হইতেছে মুদ্রা বিনিময় হার, তখন বৈদেশিক মুদ্রার যোগান অপেক্ষা চাহিদা বেশী। যখন চাহিদা ও যোগান সমান হইতেছে তখন মুদ্রার বিনিময়-হার r বিন্দুতে স্থির হইতেছে এবং ইহাই ভারসাম্যের বিন্দু।
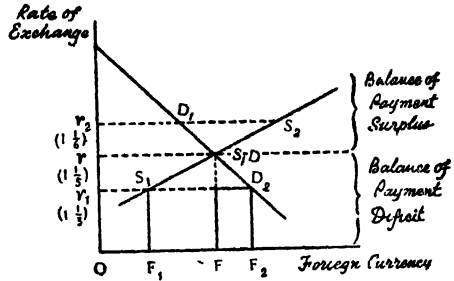
চিত্র নং—১০১

মৌলিক ভারসাম্যহীনতা (Fundamental Disequilibrium): মৌলিক ভারসাম্যহীনতা কাহাকে বলে সেই বিষয়ে অর্থবিজ্ঞানীগণ এখনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারেন নাই। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের (I. M. F.) চুক্তিতে বলা হইয়াছে যে মৌলিক ভারসাম্যহীনতা দেখা না দিলে কোন সদস্য দেশ ইহার মুদ্রার par value কমাইতে পারিবে না; এখন মুদ্রার par value হ্রাস মৌলিক ভারসাম্যহীনতা দূর করার উপায় হিসাবে প্রয়োগ করা হইবে। অধ্যাপক হ্যাবারলারের (Prof. Haberler) মতে মৌলিক ভারসাম্যহীনতার সংজ্ঞা প্রদান করিবার জন্য একটি নির্দিষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন লক্ষণ হইতেছে আন্তর্জাতিক লেনদেনে ঘাটতি (a deficit in the balance of payments)। কিন্তু অধ্যাপক হ্যান্সেনের মতে এই লক্ষণটি সন্তোষজনক নহে। তাঁহার মতে আন্তর্জাতিক লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি হওয়ার অর্থ এই নয় যে মুদ্রাবিনিময় হার ভারসাম্যের অবস্থা হইতে দূরে সরিয়া আসিয়াছে; উৎপাদন কাঠামোর সামঞ্জস্যের অভাবও অনেক ক্ষেত্রে লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতির সৃষ্টি করিতে পারে। র‍্যাগনার নার্কসি (Ragnar Nurkse) অধ্যাপক হ্যান্সেনের সঙ্গে এই বিষয়ে একমত। তিনিও মনে করেন যে যদি লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি ভারসাম্যের অভাবের কারণ হিসাবে চিহ্নিত হয়, তবে ১৯২৫-৩০ সালে ইংলণ্ডের পাউণ্ডের মূল্য বাড়িয়াছিল বলিয়া মনে করিবার কোন যৌক্তিকতা থাকে না। কোন দেশের মৌলিক ভারসাম্যহীনতা বিবেচনা করিবার সময় দেশের কর্মহীনতার স্তর (level of unemployment) এবং বিদেশের কর্মহীনতার স্তরের তুলনায় ইহার গুরুত্ব বিবেচনা করিতে হইবে। সাধারণভাবে বলিতে গেলে কোন দেশ মৌলিক

ভারসাম্যহীনতা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে কিনা বুঝিতে হইলে নিম্নলিখিত চারিটি উপাদান বিবেচনা করিতে হইবে।

(১) স্বর্ণের অস্বাভাবিক আনাগোনা অথবা স্বল্পকালীন মূলধন আছে কিনা (The presence of abnormal gold movements or abnormal short-term capital movement) (২) কতদিন যাবৎ সংশ্লিষ্ট দেশে লেনদেন ব্যালান্সে ঘাট্তি হইতেছে। (The length of time the country has been suffering from an imbalance in its current account) (৩) লেনদেন ব্যালান্সে ঘাট্তির চাপে সংশিষ্ট দেশ কি পরিমাণে আমদানির উপব অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ ধার্য করিতে বাধ্য হইয়াছে (the extent to which the country has been forced by the pressure on its balance of payments to take recourse to additional restrictions on imports) এবং (৪) দেশে কর্মনিয়োগের স্তর এবং লেনদেন ব্যালান্সে ঘাট্তির দরুণ কর্মনিয়োগ কতটা কমিয়াছে। (The level of employment and the extent to which the fall in employment has been due to the pressure on its balance of payments)। মৌলিক ভারসাম্যহীনতার সাধাবণ লক্ষণ হইতেছে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের (I. M. F.) অন্তর্ভুক্ত কোন একটি সদস্য দেশেব আন্তর্জাতিক বিআর্ভে দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের অভাব (sustained imbalance in the member country's current international account)।

লেনদেন ব্যালান্সের অসমতা দূর করিবার উপায় (Methods for correcting an adverse Balance of Payments): প্রথমত, যদি দীর্ঘকাল ধরিয়া কোন দেশের আমদানি সেই দেশেব রপ্তানি অপেক্ষা বেশী থাকে তবে লেনদেন ব্যালান্সে অসমতাব সৃষ্টি হয়। এই অসমতা দূব করিবার প্রধান উপায় হইতেছে আমদানির পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া এবং রপ্তানির পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা। আমদানির পরিমাণ যাহাতে কমান যাইতে পারে সেইজন্য দেশে আমদানিযোগ্য জিনিসের উৎপাদন বাড়াইবাব চেষ্টা কবা উচিত। অনুরূপভাবে রপ্তানির পরিমাণ যাহাতে বাড়ানো যাইতে পারে সেইজন্য রপ্তানিযোগ্য জিনিসের উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করা উচিত।

দ্বিতীয়ত, রপ্তানির পরিমাণ বাড়াইবার জন্য বিক্রয় ব্যবস্থা উন্নত করা উচিত, বপ্তানিযোগ্য জিনিসগুলির গুণগত উৎকর্ষ বাড়াইবার চেষ্টা করা উচিত এবং বিদেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করা উচিত। দেশের মধ্যে আমদানি নিয়ন্ত্রণ (Import restriction) এবং রপ্তানি উন্নয়ন (Export promotion) নীতি যাহাতে কার্যকরী হয় সেই চেষ্টাও করা উচিত এই উদ্দেশ্যে কতিপয় দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণ (Protection) প্রদান করা যাইতে পারে এবং রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের (State Trading) প্রবর্তন করা যাইতে পারে।

তৃতীয়ত, রপ্তানির পরিমাণ বাড়াইবার জন্য বৈদেশিক মুদ্রার হিসাবে দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হার কমানো যাইতে (Devaluation) পারে। ইহাতে রপ্তানি বাড়িবে এবং আমদানি কমিবে; কিন্তু মুদ্রামানের বৈদেশিক মূল্য হ্রাসের দরুণ রপ্তানি কতটা বাড়িবে তাহা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দেশের রপ্তানিযোগ্য জিনিসের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা (elasticity of home supply) এবং বিদেশীগণের সেই জিনিসের জন্য চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার (elasticity of foreign demand) উপর। অপরদিকে আমদানি কতটা কমিবে তাহা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দেশের আমদানিযোগ্য জিনিসের জন্য চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (elasticity of home demand) এবং বিদেশীদের সেই জিনিসের যোগানের স্থিতিস্থাপকতার (elasticity of foreign supply) উপর। যদি এই স্থিতিস্থাপকতা এক হইতে বেশী (greater than unity) হয়, তবেই মুদ্রার বহির্মূল্য হ্রাস কার্যকর হয়। ইহাকে মার্শাল-লার্ণার শর্ত (Marshall-Lerner condition) বলা হয়। কিন্তু এখানে মনে রাখিতে হইবে মুদ্রামানের বৈদেশিক মূল্য হ্রাসের আরও একটি দিক আছে; তাহা হইতেছে এই যে ইহার ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ সাধারণ মূল্যস্তর (general price level) বাড়িয়া যায়।

শিল্পসংরক্ষণ নীতির পক্ষে যুক্তি (Arguments in favour of the policy of protection): শিল্পসংরক্ষণের পক্ষে যে সকল যুক্তি দেওয়া হইয়া থাকে সেইগুলির প্রয়োজনীয়তা তখনই অনুভূত হয় যখন অবাধ বাণিজ্যের (free trade) বিভিন্ন ত্রুটি আমাদের চোখে ধরা পড়ে। শিল্প সংরক্ষণের অভাবে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য স্বাধীনভাবে চলে; তখন ইহাকে অবাধ বাণিজ্য বলে।

অবাধ বাণিজ্যের প্রধান অসুবিধা হইতেছে এই যে বিদেশী জিনিসের সহিত দেশীয় জিনিসের প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। এইজন্য এই প্রতিযোগিতার হাত হইতে দেশীয় শিল্পগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য সরকারকে বিদেশী জিনিসের আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করিয়া দেশীয় জিনিসকে সংরক্ষণ প্রদান করিতে হয়। অনেক সময় বৈদেশিক ব্যবসায়ীদের ডাম্পিং (Dumping) অর্থাৎ নিজের দেশের বাজারে চড়া দামে জিনিস বিক্রয় করিয়া বিদেশের বাজারে কম দামে বিক্রয় করার নীতি প্রতিরোধের জন্য শিল্প সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। তাহা ছাড়া, দেশীয় শিল্পগুলিকে উন্নত করিবার জন্যও অনেক সময় শিল্প সংরক্ষণের পক্ষে আমরা যুক্তি প্রদান করিতে পারি।

শিল্প সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি

প্রথমত, শিশু শিল্প সংরক্ষণ যুক্তির (Infant industry argument) ভিত্তিতে অনেক সময় শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ প্রদান করা হয়। এই যুক্তির অর্থ হইতেছে এই যে অনেক শিল্প আছে যেগুলি প্রাথমিক অবস্থায় রাষ্ট্রীয় সাহায্য ব্যতীত উন্নত হইতে পারে না। যদি এই শিল্পগুলি প্রাথমিক অবস্থায় সংরক্ষিত না হয়, তবে এইগুলি বিদেশী শিল্পগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে না। এজন্যই এই শিল্পগুলিকে শৈশব অবস্থায় লালন-পালন

করা উচিত, কিশোর অবস্থায় সংরক্ষণ প্রদান করা উচিত এবং পরিণত বয়সে সংরক্ষণ হইতে মুক্ত করা উচিত ("Nurse the baby, protect the child and free the adults.")।

দ্বিতীয়ত, শিল্প-সংরক্ষণ নীতি চালু হইলে আমদানির পরিমাণ কমিয়া রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। ইহাতে দেশের প্রচুর লাভ হয়। সংরক্ষণের পক্ষে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত যুক্তি (Balance of Trade argument) তখনই খুব গুরুত্বপূর্ণ হয় যখন দেশে দীর্ঘদিন ধরিয়া বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল (unfavourable) থাকে। দেশের টাকা দেশেই রাখিয়া দিবার নীতিকে ("keeping money at home") ভিত্তি করিয়াও বিভিন্ন শিল্পকে সংরক্ষণ প্রদান করা হয়। এই যুক্তি সর্বদাই যুক্তিসঙ্গত নয়। যেমন ধরা যাক্, হয়ত এমন কতিপয় বিদেশী জিনিস আছে যেগুলির আমাদের চাহিদা খুব বেশী। এই জিনিসগুলির আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করা হইলে যে আমাদের আমদানির পরিমাণ কমিয়া যাইবে তাহা নহে; বরং আমাদের তখন বেশী দাম দিয়া জিনিসগুলি কিনিতে হইবে। সংরক্ষণের পক্ষে আরও একটি যুক্তি হইতেছে, দেশীয় বাজার সৃষ্টি করা (Home market argument)। এই যুক্তি অনুযায়ী আমদানি নিয়ন্ত্রণ করিয়া আমদানিযোগ্য জিনিসগুলি যাহাতে দেশেই উৎপাদিত হয়, সেই ব্যবস্থা করা উচিত।

তৃতীয়ত, অবাধ বাণিজ্য নীতি অবলম্বিত হইলেই যে আঞ্চলিক শ্রমবিভাগের সব সুফল পাওয়া যায় তাহা নহে। অবাধ বাণিজ্যের ফলে সব দেশই যে উৎপাদনের উপাদানগুলি সর্বাপেক্ষা উপযোগী ক্ষেত্রে নিয়োগ করিতে পারিবে অথবা সেইগুলির প্রকৃত সদ্ব্যবহার করিতে পারিবে তাহা নহে।

চতুর্থত, জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতার (National self-sufficiency) যুক্তি অনুযায়ী অনেক ক্ষেত্রে দেশীয় শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ প্রদান করা হয়। কিন্তু এই নীতি হয়ত কতিপয় শিল্পের ক্ষেত্রে গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু সব শিল্পের ক্ষেত্রে এই যুক্তি প্রয়োগ করা যায় না। কারণ ইহাতে দেশকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিভিন্ন সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

পঞ্চমত, শিল্প ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আনয়ন (Diversification of industries) করা উচিত—এই যুক্তির ভিত্তিতে অনেক ক্ষেত্রে শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ প্রদান করা হয়। এই নীতিও সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। কারণ তাহাতে দেশকে আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাগের সুবিধাগুলি হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

ষষ্ঠত, প্রতিরক্ষামূলক শিল্পগুলিকে (defence industry) সর্বদাই সংরক্ষণ প্রদান করা উচিত। বেকার সমস্যার সমাধানের (Employment argument) জন্যও দেশের বিভিন্ন শিল্পকে সরকারের সংরক্ষণ প্রদান করা উচিত। যদি সরকারের সাহায্যে কতিপয় শিল্প নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারে, যদি এই শিল্পগুলিতে নূতন

কর্মসংস্থান সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা থাকে এবং দেশের একটি বিরাট অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের একটি পন্থা খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তবে এই শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ প্রদান করা সরকারের উচিত।

শিল্প সংরক্ষণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Protection as a means of economic development) অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প-সংরক্ষণের একটি বিরাট অবদান আছে। শিল্প-সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করিবার অন্যতম উপায় হইতেছে আমদানি শুল্ক ধার্য করা। আমদানি শুল্ক ধার্য করিবার ফলে সরকার যে অতিরিক্ত রাজস্ব পাইয়া থাকে তাহা দেশের উন্নয়ন কর্মসূচীর অর্থসংস্থানের কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে। অর্থ নৈতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থান করিবার উৎস হিসাবে শিল্প-সংরক্ষণ নীতিকে কাজে লাগানো যাইতে পারে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়। সেই বৈদেশিক মুদ্রার সংস্থান হইতে পারে শিল্প-সংরক্ষণ নীতির মাধ্যমে। আরেকটি উপায়ে শিল্প-সংরক্ষণ নীতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক হইতে পারে। শিল্প-সংরক্ষণ নীতির ফলে আমদানির বিকল্প জিনিসগুলির উৎপাদন বাড়ে এবং যে সকল শিল্প সংরক্ষণ প্রাপ্ত হয় সেইগুলির উৎপাদন বাড়ে এবং তাহার ফলে কর্মসংস্থানেরও সম্প্রসারণ হয়। দেশেব অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে ইহা বিশেষ সহায়ক। শিল্প সংরক্ষণের ফলে দেশের রপ্তানি শিল্পের যে উন্নতি হয় তাহাও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক হয়।

সর্বশেষে, শ্রমিকদের মজুরির হার উচ্চে রাখিবার জন্যেও অনেকে শিল্প-সংরক্ষণ সমর্থন করেন। তাঁহাদের মতে যদি অবাধ বাণিজ্য প্রচলিত থাকে, তবে যে দেশে মজুরির হার কম সেই দেশে উৎপাদন খরচ কম হইবে এবং সেই দেশ উচ্চ মজুরির হার সম্পন্ন দেশগুলিকে প্রতিযোগিতায় হারাইয়া দিবে। সুতরাং উচ্চ মজুরির হার বজায় বাখিবার জন্য শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ প্রদান করা উচিত। কিন্তু এই যুক্তিটি ঠিক নয়। কারণ, মজুরির হার কম হইলেই উৎপাদন খরচ কম হয় না।

শিল্প সংরক্ষণের বিপক্ষে যুক্তি (Arguments against Protection) : শিল্প-সংরক্ষণের বিপক্ষেও কতিপয় যুক্তি আছে। প্রথমত, শিল্প-সংরক্ষণের ফলে আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাগ বাধাপ্রাপ্ত হয়। কারণ, বিভিন্ন দেশে উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণগুলিকে নিজের দক্ষতা অনুযায়ী উৎপাদনে নিয়োগ করা সব সময় সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়ত, শিল্প-সংরক্ষণের ফলে জিনিসপত্রের উৎপাদন খরচ এবং দাম বাড়িয়া যায়। তৃতীয়ত, আমদানি শুল্ক যদি খুব বাড়াইয়া দেওয়া হয় তবে আমদানির পরিমাণ কমিয়া যায় এবং তখন এই খাতে সরকারের আয় কমিয়া যায়। চতুর্থত, শিশু-শিল্প সংরক্ষণের যুক্তিটি চিরকাল চলিতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে কোন কোন শিল্প শৈশব অবস্থার সমুদয় বিপত্তি কাটাইয়াও সরকারের নিকট হইতে সংরক্ষণ দাবি করে। ইহার ফলে সাধারণ ক্রেতাদের খুব অসুবিধা হয়। কারণ, তাহাতে বেশী দাম দিয়া জিনিস

শিল্প সংরক্ষণের বিপক্ষে যুক্তি

কিনিতে হয়। পঞ্চমত, সরকার ক্রমাগত যদি একটি শিল্প-সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করিতে থাকে তবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থ নৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র অনেক কমিয়া যায়। তাহা ছাড়া, বৈদেশিক প্রতিযোগিতা কমিয়া যাওয়ায় ব্যবসায়ীগণও অনেক সময় উৎপাদনের উৎকর্ষ বাড়াইবার দিকে মনোনিবেশ করে না। সর্বশেষে, অনেক ক্ষেত্রে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা বন্ধ হইয়া গেলে দেশীয় শিল্পগুলি একজোট হইয়া একচেটিয়া সংঘ (monopolistic combination) প্রতিষ্ঠা করিয়া জিনিস পত্রের বাড়াইয়া দেয়। ইহাতে সাধারণ ক্রেতাদের অসুবিধা হয়।

অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (Arguments for and against Free Trade): প্রথমত, বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় জিনিস আমদানিতে যদি কোন প্রকার বাধা নিষেধ না থাকে, তবে ইহাকে অবাধ বাণিজ্য বা "Free Trade" বলা হয়। এই ব্যবস্থায় বিদেশ হইতে আমদানিকৃত জিনিসগুলির উপর শুল্ক ধার্য করা হয় না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তুলনামূলক খরচের নিয়মটি অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থায় বিশেষ কার্যকর হয়। ইহাই অবাধ বাণিজ্যেব প্রধান সুবিধা, সুতরাং আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ নীতির সব সুফল অবাধ বাণিজ্যে পাওয়া যাইতে পারে। অবাধ বাণিজ্যে চলিতে থাকিলে আন্তর্জাতিক বিশেষীকবণ (international specialisation) সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়। ইহার ফলে যে দেশ যে জিনিস উৎপাদনে বিশেষ পারদর্শী সেই দেশ সেই জিনিস উৎপাদন করে। ইহাতে দেশের আর্থিক উন্নতি দেখা দেয় এবং জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়। দ্বিতীয়ত, অবাধ বাণিজ্যের ফলে উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণগুলির প্রকৃত আয় বাড়িয়া যায়। বিশেষীকবণের (specialisation) ফলে উপাদানগুলি উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে পারে। অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে আরও একটি যুক্তি হইতেছে এই যে ইহাতে জিনিসপত্রেব দাম কমিয়া যায়; কাবণ, অবাধ প্রতিযোগিতায় অল্প খরচে বিভিন্ন জিনিসেব উৎপাদন খরচ কিছু কম হয়। তাহা ছাড়া, উৎপাদনের উপকবণগুলি অবাধ বাণিজ্যেব ফলে বিশিষ্টতা অর্জন করে বলিয়া ইহাদের আয়েব পবিমাণ বাড়িয়া যায় এবং উৎপাদনও অনেক বাড়িয়া যায়।

অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে যুক্তি

কিন্তু অবাধ বাণিজ্যের প্রধান অসুবিধা হইতেছে এই যে বিদেশী জিনিসের সহিত দেশীয় জিনিসের প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। এইজন্য এই প্রতিযোগিতার ফলে দেশীয় ক্ষুদ্র শিল্পগুলি অনেক সময়েই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমানভাবে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন হয় নাই। অবাধ বাণিজ্যের ফলে উন্নত দেশগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় অনুন্নত দেশগুলি দাঁড়াইতে পারে না। সুতরাং অবাধ বাণিজ্যের ফলে অনগ্রসর দেশগুলির স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়।

বাণিজ্য হার (Terms of Trade) রিকার্ডোর মতে তুলনামূলক ব্যয়ই নির্ধারণ করে কোন্ কোন্ দ্রব্য আমদানি এবং রপ্তানি করা হইবে। কোন্ মূল্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রচলিত হইবে তাহা নির্দেশ করেন জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার পারস্পরিক চাহিদা (reciprocal demand) তত্ত্বে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল ভিত্তি হইতেছে তুলনামূলক ব্যয়ের পার্থক্য। কোন দেশে কোন জিনিসের উৎপাদন খরচ যদি কম হয়, তাহা হইলে সেই দেশ সেই জিনিস বেশী করিয়া উৎপাদন করিয়া রপ্তানি করিবে; যে জিনিস তৈয়ার করিতে উৎপাদন খরচ বেশী পড়িবে, ইহা তাহা উৎপাদন না করিয়া সেই জিনিস বিদেশ হইতে আমদানি করিবে। এই আমদানি সেই দেশ রপ্তানির বিনিময়েই করিবে এবং যে হার দেশটি এই আমদানি রপ্তানি করিতে পারিবে, সেই হারের অনুপাতকেই বলা হয় বাণিজ্য-হার। বাণিজ্য-হারে তুলনামূলক ব্যয়ের পার্থক্য যে কোন বিন্দুতে নির্ধারিত হইতে পারে। নিজ দেশের উৎপাদিত দ্রব্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কি বিনিময় মূল্য পাইতে পারে তাহাই এই বাণিজ্য-হার সূচিত করে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের পারস্পরিক চাহিদা বাণিজ্য-হার নির্ধারণ করে। অন্য দেশের জিনিসের জন্য নিজ দেশের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এবং নিজ দেশের জিনিসের জন্য অন্য দেশের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা—এই দুই প্রকারের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর বাণিজ্য হার নির্ভর করে।

যদি একটি সমীকরণের সাহায্যে বাণিজ্য হারকে প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে সেই সমীকরণের রূপ নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশিত হইবে:

$$\text{বাণিজ্য হার} = \frac{\text{আমদানির মোট মূল্য}}{\text{রপ্তানির মোট মূল্য}}$$

$$= \frac{\text{প্রতি ইউনিট আমদানির দাম} \times \text{আমদানির পরিমাণ}}{\text{প্রতি ইউনিট রপ্তানির দাম} \times \text{রপ্তানির পরিমাণ}}$$

আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ সমান হইলে

$$= \frac{\text{আমদানির দাম}}{\text{রপ্তানির দাম}}$$

Exercise

1. Explain the basis of International trade. [আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি ব্যাখ্যা কর।] (৩৫৪-৩৫৬ পৃঃ)

2. Discuss critically the theory of Comparative Cost in International Trade. Can the theory be extended to more than two countries and two commodities? [আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তুলনামূলক খরচের নীতিটি ব্যাখ্যা কর। এই তত্ত্বটি কি দুইটির বেশী জিনিসের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করা চলে? (৩৫৬-২৫৮; ৩৬০-৩৬৩ পৃঃ)

3. Show how the Comparative Cost of producing different

commodities in different countries determine specialisation and trade. [বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জিনিস উৎপাদন করিবার ক্ষেত্রে খরচের তুলনামূলক পার্থক্য কিভাবে আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণ ও বাণিজ্য নিরূপণ করে দেখাও।] (৩৬০-৩৬৩ পৃঃ)

4. Do you think that the Law of Comparative Cost will be scrapped when it will be applied to more than two commodities and more than two countries ? [তুমি কি মনে কর দুইটিব বেশী দেশ এবং দুইটির বেশী জিনিসের ক্ষেত্রে তুলনামূলক খরচের নিয়মটি প্রযুক্ত হইবে না ?]

5. Examine the operation of International trade under Diminishing Returns and Increasing Returns. [ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন এবং ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কিভাবে হইয়া থাকে তাহা পরীক্ষা কর।] (৩৬৪-৩৬৫ পৃঃ)

6. Examine the importance of factor proportious in international trade. Do the factor prices tend to equalise in international trade ? Give reasons for your answer. [আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিভিন্ন উপাদানের অনুপাত পরীক্ষা কর। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কি উপাদান-গুলির মূল্যের সমতা বজায় থাকে ? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি পরীক্ষা কর।] (৩৬৭-৩৬৮ পৃঃ)

7. Analysis the nature of gains fron International Trade. [আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে উদ্ভূত লাভের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।] ৩৫৮-৩৬০ পৃঃ)

8. Distinguish between Balance of Trade and Balance of Payments. [বাণিজ্য ব্যালান্স এবং লেনদেন ব্যালান্সের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।]

9. "Our imports are paid for by our exports." Elucidate the statement. [আমরা রপ্তানির সাহায্যে আমদানির জন্য অর্থপ্রদান করি,-এই উক্তিটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর। (৩৬৯-৩৭০ পৃঃ)

10. How can a country correct (1) its balance of payments deficits and (2) difference between exports and imports ? [একটি দেশ কিভাবে ইহার (ক) লেনদেন ব্যালান্সের অসমতা এবং (খ) রপ্তানি ও আমদানির মধ্যে পার্থক্য দূর করিতে পারে ?] (ক) ৩৭০-৩৭১ পৃঃ গৃঃ, (খ) ৩৭৩-৩৭৪ পৃঃ)

11. Examine the validity of the different arguments that have been advanced in favour of the policy of protectron.

[শিল্প সংরক্ষণের পক্ষে যে সকল যুক্তি দেওয়া হইয়া থাকে সেইগুলির যৌক্তিকতা পরীক্ষা কর।] (৩৭৪-৩৭৭ পৃঃ)

12. Do you advocate Free Trade? Give reasons for your answer. [তুমি কি অবাধ বাণিজ্য সমর্থন কর? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও।] (৩৭৭ পৃঃ)

13. Write a note on Terms of Trade. [বাণিজ্য হারের উপর একটি টীকা লিখ।] (৩৭৭-৩৭৮ পৃঃ)

14. What are the merits of international trade? How would you estimate the gains from international trade? [আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা কি কি? আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে প্রাপ্ত লাভ তুমি কিভাবে পরিমাণ করিবে ?] (৩৫৮-৩৬৯ পৃঃ) .

15. What are the different types of Balance of Payments Disequilibrium? Write a note on "Fundamental Disequilibrium. [লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতির বিভিন্ন রূপ কি কি? "মৌলিক ভারসাম্য-হীনতা"র উপর একটি টীকা লিখ।] (৩৬১-৩৭৩ পৃঃ)

16. Compare international trade with domestic trade. Explain how international trade arises. [আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের তুলনা কর। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্ভব কিরূপে হয় ব্যাখ্যা কর।] (৩৫৩-৩৫৬ পৃঃ)

17. Show how the theory of opportunity cost is applied to international trade. [আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিকল্প খরচের তত্ত্বটি কিভাবে প্রযুক্ত হয় দেখাও।] (৩৬৩-৩৬৪ ; ৩৬৫-৩৬৭ পৃঃ)

18. "Trade between two countries takes place not on account of equal difference in costs but on account of comparative difference in costs. Explain and illnstrate.

[দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য খরচের সমান পার্থক্যের জন্য সৃষ্ট হয় না; খরচের তুলনামূলক পার্থক্যের ফলে সৃষ্ট হয়—"উক্তিটি ব্যাখ্যা কর এবং উদাহরণ দাও।"

ষড়বিংশ অধ্যায়

বৈদেশিক বিনিময়

(Foreign Exchange)

স্বর্ণমান ও বৈদেশিক বিনিময় হার (Foregin Exchange Rate uuder Gold Standard) : দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে টাঁকশালের হারকে (Mint Par) কেন্দ্র করিয়া বৈদেশিক বিনিময়হার উঠানামা করে ; টাঁকশাল হার বলিতে আমরা বুঝি, মুদ্রা কর্তৃপক্ষ (monetary authorities) অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নির্দিষ্ট দেশের প্রচলিত মুদ্রা এবং স্বর্ণের মধ্যে পরিমাণ সম্পর্ক। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, ভারতীয় ১৮ টাকায় যে পরিমাণ স্বর্ণ আছে অথবা এই টাকার বিনিময়ে মুদ্রা কর্তৃপক্ষ যে পরিমাণ স্বর্ণ দিতে বাধ্য, ইংলণ্ডে এক পাউণ্ডে সেই পরিমাণ স্বর্ণ আছে। তবে উভয় দেশের মধ্যে মুদ্রা বিনিময় হার হইবে, ১ পাউণ্ড=১৮ টাকা। দেশে স্বর্ণমান বজায় থাকিলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যখন এইভাবে মুদ্রা বিনিময় হয়, তখন ইহাকে বলা হয় মুদ্রাবিনিময়ের সমহার (mint par of exchange)।

বাস্তবজগতে আমরা, মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার এবং টাঁকশালের হারের মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাই। মুদ্রা বিনিময় হারের দুইটি সীমা আছে ; একটি হইতেছে স্বর্ণ আমদানি বিন্দু (Gold Import Poiut) এবং অপরটি হইতেছে স্বর্ণ রপ্তানি বিন্দু (Gold Export Point)। একদেশ যদি অন্য দেশে স্বর্ণ প্রেরণ করিতে চায়, তবে ইহাকে তাহার জন্য খরচ বহন করিতে হয়। এই খরচই স্বর্ণ আমদানি বিন্দু এবং স্বর্ণ রপ্তানি বিন্দু স্থির করে। ধরা যাক্, ইংলণ্ড হইতে ভারতে স্বর্ণ পাঠাইবার খরচ হইতেছে ৪০ নয়া পয়সা ভারতে লেনদেন ব্যালান্স যদি অনুকূল থাকে তবে টাকা ও পাউণ্ডের বিনিময় হার হইবে ১৭·৬০ নয়া পয়সা=১ পাউণ্ড। আবার যদি ভারতের লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল হয় তবে এক্ষেত্রে টাকা ও পাউণ্ডের বিনিময় হার হইবে ১৮·৪০ নয়া পয়সা=১ পাউণ্ড ; এই দুইটি সীমাকে যথাক্রমে স্বর্ণ আমদানি বিন্দু (Gold Import Point) এবং স্বর্ণ রপ্তানি বিন্দু (Gold Export Poiut) বলা হইয়া থাকে। উভয় দেশেই যদি স্বর্ণমান থাকে তবে বৈদেশিক বিনিময় হার টাঁকশাল হারকে কেন্দ্র করিয়া এই দুইটি সীমার মধ্যে উঠানামা করিতে পারে। এই উঠানামার কথা বাদ দিলে স্বর্ণমানে বৈদেশিক বিনিময় হার সাধারণতঃ স্থির থাকে।

স্বর্ণে রূপান্তরের অযোগ্য কাগজী মুদ্রামান এবং বিনিময় হার (Inconvertible Paper Currency and the Foreign Exchange Rate) : যদি উভয় দেশেই কাগজী মুদ্রামান প্রচলিত থাকে এবং তাহা যদি স্বর্ণে রূপান্তরযোগ্য না হয়, তবে এই দুই দেশের মধ্যে বিনিময় হার উঠানামা করার নির্দিষ্ট কোন সীমা নাই। তবে আধুনিক কালে রাষ্ট্র অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিদেশী মুদ্রার সঙ্গে দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হার ঠিক করিয়া দেয়। যদি বিনিময় হার এই সীমা

অতিক্রম করে তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দিষ্ট হারে বিদেশী মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করে এবং ইহার ফলে বিনিময় হার বিশেষ উঠানামা করিতে পারে না; কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক কতটা এইভাবে বিনিময় হারের পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে তাহা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তহবিলে সঞ্চিত বিদেশী মুদ্রার পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

কাগজী মুদ্রামানে বিনিময় হার নিরূপণ (Determination of the Rate of Exchange between two inconvertible Paper Currencies) রূপান্তরের অযোগ্য কাগজী মুদ্রামানে বৈদেশিক বিনিময় হারের উঠানামার মধ্যে স্বর্ণ আমদানি বিন্দু ও স্বর্ণ রপ্তানি বিন্দুর ন্যায় কোন সীমা নাই। তবে সাধারণতঃ রাষ্ট্র অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশীয় মুদ্রার সহিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার ঠিক করিয়া দেয়, এবং যদি উভয় দেশের মুদ্রা বিনিময় হার এই নির্দিষ্ট হারের সীমা পার হইয়াও উঠানামা করে তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজন অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রার কেনাবেচা আরম্ভ করিয়া বিনিময় হারের উঠানামা বন্ধ করিবার চেষ্টা করে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে কিভাবে মুদ্রা বিনিময় হার নিরূপিত হয়। বিনিময় হার নিরূপণের দুইটি তত্ত্ব আমরা এখানে আলোচনা করিব। সেইগুলি হইতেছে, লেনদেন ব্যালান্স তত্ত্ব (Balance of Payments Theory) এবং ক্রয়ক্ষমতার সমতা তত্ত্ব (Purchasing Power Parity Theory)।

ক্রয়ক্ষমতার সমতা তত্ত্ব (Purchasing Power Parity Theory): দুই দেশের ক্রয়ক্ষমতার সমতা অনুযায়ী বৈদেশিক বিনিময় হার নিরূপণ করার প্রথম চেষ্টা করেন গুস্তাভ্ ক্যাসেল (Gustav Cassel)। তাঁহার মতে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার সেই দেশগুলির মুদ্রার আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতা বা দামস্তরের অনুপাত অনুযায়ী নিরূপিত হয়। তাঁহার মতে দুই দেশের মুদ্রার বিনিময় হার এমনভাবে নিরূপিত হইবে যে ইহাদের আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার অনুপাত সর্বদা সমান হইবে। ধরা যাক্ ১ টাকা দিয়া ভারতে কোন জিনিসের এক ইউনিট কেনা যায় এবং ইংলণ্ডে সেই এক ইউনিট কিনিতে ১ শিলিং লাগে। এক্ষেত্রে ভারতীয় মুদ্রা এবং ইংলণ্ডের মুদ্রার বিনিময় হার হইতেছে ১ টাকা = ১ শিলিং।[১]

ক্রয় ক্ষমতার সমতা নিম্নলিখিত সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যাইতে পারে,

$$\frac{\text{১ পাউণ্ড}}{\text{১ টাকা}} = \frac{\text{পাউণ্ডের ক্রয় ক্ষমতা}}{\text{টাকার ক্রয় ক্ষমতা}}$$

ক্যাসেলের মতে আভ্যন্তরীণ দামস্তরের পরিবর্তন হইলে অর্থাৎ মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা পরিবর্তিত হইলে বিনিময় হারেরও পরিবর্তন হয়। যদি দেশের আভ্যন্তরীণ দামস্তর বাড়িয়া যায় অথবা মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা কমিয়া যায় তবে বিনিময় হার বিরুদ্ধে যাইবে এবং

---

1. "The rate of exchange between two currencies must stand essentially as the quotient of the internal purchasing powers of these currencies."

—Gustav Cassel,

জিনিসপত্রের দাম কমিলে অথবা মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়া গেলে বিনিময়হার অনুকূল থাকিবে। যেহেতু আভ্যন্তরীণ দামস্তর সর্বদাই পরিবর্তনশীল, বিনিময়হারও সেইজন্য সর্বদা পরিবর্তনশীল। তবে বিনিময় হার এমনভাবে পরিবর্তিত হইবে যে দুই দেশের মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার অনুপাত সমান থাকিবে।

ক্যাসেলের তত্ত্বটি বাস্তবে প্রয়োগ করিবার সময় একটি ভিত্তি বৎসর (base year) নির্বাচন করিতে হয়। সেই বৎসরটি এমন হইতে হইবে যে সেই সময়ে দুই দেশের মুদ্রাটির ক্রয়ক্ষমতার অনুপাত সমান থাকে। কিন্তু, বাস্তবজগতে এই ধরণের একটি ভিত্তি বৎসর খুঁজিয়া বাহির করা খুবই কঠিন। আমরা ক্রয়ক্ষমতার সমতা তত্ত্বটির সমালোচনা করিতে পারি। এই তত্ত্বটি যদি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ করে এই রকম জিনিসের দামস্তরের সহিত সম্পর্কযুক্ত থাকে, তবে ইহাতে কোন ভুল নাই।

সমালোচনা

কিন্তু, কোন মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা বিবেচনা করিবার সময় শুধু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশকারী জিনিসগুলির দাম বিবেচনা করিলেই চলিবে না; দেশের অভ্যন্তরে যে সকল জিনিসের কেনাবেচা হয় সেইগুলিরও দাম বিবেচনা করিতে হয়। আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশকারী সবরকম জিনিসের দামস্তরের ভিত্তিতে মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা বিবেচনা করিলে দুই দেশের মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা খুব কমই সমান অনুপাতে থাকে। শুধু তাহাই নহে, আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে প্রবেশকারী জিনিসপত্রের দাম লেনদেনের ব্যালান্সকে প্রভাবিত করে না।

দ্বিতীয়ত, দুই দেশের মধ্যে ঋণ আদান-প্রদান মূলধনের আনাগোনার দরুণ বিনিময় হারে যে পরিবর্তন হয় ক্রয়ক্ষমতার সমতা তত্ত্বটি তাহা বিবেচনা করে না। দুই দেশের মধ্যে মূলধনের যে আনাগোনা হয় তাহা বিনিময় হারকে যেভাবে প্রভাবিত করে, আভ্যন্তরীণ দামস্তর বা মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা বিনিময় হারকে সেইভাবে প্রভাবিত করে না।

তৃতীয়ত, দেশের অভ্যন্তরে নূতন উৎপাদন পদ্ধতির উদ্ভাবন অথবা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দামস্তরকে প্রভাবিত করে এবং সেই প্রভাব সমানভাবে বাণিজ্য ব্যালান্সে প্রতিফলিত নাও হইতে পারে।

চতুর্থত, দেশের অভ্যন্তরে অথবা বিদেশে আমদানি-রপ্তানির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিবর্তিত হইবার ফলেও বিনিময় হার পরিবর্তিত হইবে না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে দুই দেশে পারস্পরিক চাহিদার প্রভাবে দুইদেশের মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তিত হইতে পারে, অথবা আমদানি-রপ্তানি ছাড়াও যে অন্যান্য কারণে কোন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার জন্য চাহিদা থাকিতে পারে এবং তাহা বিনিময় হারকে প্রভাবিত করিতে পারে ক্যাসেল প্রদত্ত ক্রয়ক্ষমতার সমতা তত্ত্ব তাহা স্বীকার করে না।

সুতরাং এই তত্ত্বটির সাহায্যে বিনিময় হার নিরূপণ করা সম্ভব নহে। এই তত্ত্বটি বাস্তবের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে যদি জিনিসপত্রের

দাম বৈদেশিক মুদ্রার হার অনুযায়ী সর্বদাই সমভাবে পরিবর্তিত হয় তবে এই তত্ত্বটি একটি মূল্যহীন স্বতঃসিদ্ধ বক্তব্যে(axiomatic truism) পর্যবসিত হয়। ক্ষেত্রবিশেষে যদি অন্যান্য জিনিসের কোন পরিবর্তন না ঘটে (other things remaining constant) তবে হয়ত ইহা কার্যকর হইতে পারে। কিন্তু ইহা সম্ভব না হওয়াই স্বাভাবিক। অবশ্য মূল্যস্তরের পরিবর্তন যে, বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময়ের হারকে প্রভাবিত করে, ইহা এই তত্ত্বে স্বীকৃত হয় বলিয়া তত্ত্বটির কিছুটা মূল্য আছে এবং ইহা আংশিকভাবে সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয়।

লেনদেন ব্যালান্স তত্ত্ব (Balance of Payments Theory) এই তত্ত্ব অনুযায়ী বৈদেশিক বিনিময় হার বিদেশী মুদ্রার জন্য চাহিদা ও যোগানের সম্মিলিত প্রভাবের উপর নির্ভর করে। এই চাহিদা ও যোগান নির্ভর করে লেনদেন ব্যালেন্সের উপর অর্থাৎ, বিদেশ হইতে কত টাকা পাওয়া যায় এবং বিদেশে কত টাকা পাঠাইতে হয় তাহার উপর। যদি আমদানির পরিমাণ এবং বিদেশে দেয় অর্থের অন্যান্য পরিমাণ বাড়িয়া যায়, তবে বৈদেশিক মুদ্রার জন্য চাহিদা বাড়িয়া যায়। আবার যদি রপ্তানির পরিমাণ এবং বিদেশ হইতে পাওয়া যাইবে এই রকম অর্থের পরিমাণ বাড়িয়া যায় তবে বৈদেশিক মুদ্রার যোগান বাড়িয়া যায়। লেনদেন ব্যালান্স নির্ভর করে দৃশ্যতঃ আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য (visible trade), প্রত্যক্ষ আমদানি-রপ্তানি ব্যতীত অন্য ধরণের ব্যবসাজনিত লেনদেন (invisible trade) এবং মূলধনের আনাগোনার উপর। যদি বৈদেশিক মুদ্রার জন্য চাহিদা ইহার যোগান অপেক্ষা বেশী হয় তবে দেশীয় মুদ্রার মূল্য বাড়িবা যায় এবং বিনিময় হার দেশীয় মুদ্রার অনুকূলে আসে। আবার যদি বৈদেশিক মুদ্রার যোগান ইহার চাহিদা অপেক্ষা বেশী হয় তবে দেশীয় মুদ্রার মূল্য কমিয় যায় এবং বিনিময় হার দেশীয় মুদ্রার বিপক্ষে যাইবে। সংক্ষেপে ইহাই হইতেছে বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণের চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব। এখানে মনে রাখিতে হইবে বৈদেশিক মুদ্রার জন্য চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতা আবার নির্ভর করে উভয় দেশেরই পরস্পরের জিনিসের আমদানির জন্য চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এবং রপ্তানিযোগ্য জিনিসের যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। অধ্যাপিকা জোয়ান রবিনসনের (Prof. Joan Robinson) মতে বৈদেশিক মুদ্রার জন্য চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতা আভ্যন্তরীণ অনেকগুলি কারণের উপরেও নির্ভর করে ; যেমন, আয়স্তর, সক্রিয় চাহিদা (effective demand) কর্মসংস্থান এবং উৎপাদন স্তর, ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে বিনিময়-হারে স্থায়ী ভারসাম্য অর্জন করা একপ্রকার অসম্ভব।

আধুনিক মংবাদ

তবে বিনিময় হারের পরিবর্তন কি কি উপাদানের উপর নির্ভর করে, তাহা বলা যাইতে পারে। চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন লেনদেন ব্যালেন্সে সমতা আনিতে পারে। কিন্তু লেনদেন ব্যালান্সে সমতা রক্ষিত হইলেই যে বিনিময় হারে স্থির ভারসাম্য অর্জিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। অধ্যাপিকা জোয়ান রবিনসনের ভাষায় "Equilibrium

rate of exchange is a chimera" আধুনিককালে দুই দেশের মধ্যে মুদ্রা-বিনিময় হার নিরূপিত হয় আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের নিকট প্রত্যেক দেশের মুদ্রার যে Par value ঘোষিত আছে, তাহার দ্বারা। ভারতীয় মুদ্রায় যেমন একটি Par value আছে, মার্কিন ডলারেরও অনুরূপ একটি Par value আছে। এই দুইটি Par value উপর ভিত্তি করিয়া এই দুইটি মুদ্রার মধ্যে বিনিময় হার স্থির করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ভারতীয় মুদ্রাব যে par value ঘোষিত হইয়াছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের যে par value ঘোষিত হইয়াছে, তাহার ভিত্তিতে ১ ডলার=৭ টাকা ৬৯ পয়সা।

আধুনিককালের মুদ্রা বিনিময় হার নিরূপণের পদ্ধতি

মুদ্রার বহির্মূল্য হ্রাস (Devaluation of Currency): স্বর্ণ অথবা বৈদেশিক মুদ্রাব হিসাবে যদি কোনও দেশের মুদ্রার বিনিময় মূল্য কমিয়া যায় তবেই ইহাকে মুদ্রার বহির্মূল্য হ্রাস বলা হয়।

মুদ্রার বহির্মূল্য কমিয়া গেলে সাধারণতঃ রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং আমদানির পরিমাণ কমিয়া যায়। রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়া যাইবার কারণ হইতেছে এই যে, বিদেশীরা অল্প খরচে সংশ্লিষ্ট দেশ হইতে জিনিসপত্র কিনিতে পারে। আবার আমদানির পরিমাণ কমিয়া যাইবার কারণ হইতেছে এই যে, বিদেশ হইতে কোন জিনিস আমদানি করিবার খরচ বাড়িয়া যায়। এখন প্রশ্ন হইতেছে,, মুদ্রার বহির্মূল্য হ্রাস পাইলে রপ্তানি কতটা বাড়িবে এবং আমদানি কতটা কমিবে। আমদানি কতটা কমিবে তাহা নির্ভর করে বিদেশ হইতে কোন জিনিস আমদানি করিবার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার (elasticity of home demand for import) উপর, বিদেশে এই জিনিসের যোগানের স্থিতি-স্থাপকতার (elasticity for foreign supply of these goods) উপর, বিদেশের অধিবাসীদের সেই বিশেষ জিনিসের জন্য চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর (elasticity of foreign demand for these goods) এবং দেশের অভ্যন্তরেই আমদানিযোগ্য জিনিসের যে সকল বিকল্প জিনিস আছে সেইগুলির যোগানের স্থিতি-স্থাপকতার উপর। যতগুলি স্থিতিস্থাপকতার কথা উপরে উল্লেখ করা হইল সেইগুলির মধ্যে দেশীয় জিনিসের জন্য বিদেশীদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাই প্রধান। যদি বিদেশীদের এই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১ হইতে বেশী হয়, তবে দেশের রপ্তানি বাড়িয়া যাইবে এবং বাণিজ্য ব্যালান্স উন্নত হইবে। ইহাকে মার্শাল লার্নার শর্ত (Marshall-Lerner Condition)বলা হয়।

লেনদেন ব্যালান্সের উপর প্রভাব

মুদ্রার বহির্মূল্য হ্রাসের আর একটি পরিণতি হইল দেশের অভ্যন্তরে দামস্তরের বৃদ্ধি। জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যাইবার কারণগুলি হইল, (১) আমদানি খরচের বৃদ্ধি (২) অধিক রপ্তানির জন্য দেশে রপ্তানিযোগ্য জিনিসগুলির কৃত্রিম অভাব এবং (৩) রপ্তানিযোগ্য জিনিসগুলির উৎপাদন

দামস্তর বাড়িয়া যায়

বাড়িয়া যাওয়া হেতু দেশের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির উৎপাদনের আপেক্ষিক হ্রাস। মুদ্রার বহির্মূল্য হ্রাস পাইবার দরুণ জিনিসপত্রের দাম কতটা বাড়িবে তাহাও মূলতঃ উপরে বর্ণিত স্থিতিস্থাপকতাগুলির উপর নির্ভর করে। মুদ্রার বহির্মূল্য কমিয়া গেলে একদিকে যেমন বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি হয় এবং লেনদেনের ব্যালান্সে ঘাটতি থাকিলে তাহা দূর করা কিছুটা সম্ভব হয়, অপরদিকে সেইপ্রকার জিনিসপত্রের দাম কিছুটা বাড়িয়া যায়। জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যায় বলিয়া ব্যবসায়ীগণ দাম বাড়াইবার অনুপ্রেরণা (incentive) পায়, এবং ইহাতে দেশের উৎপাদন স্তর (level of output) এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ (employment opportunities) বাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে।

মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ (Exchange Control)

বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ (Exchange control) বলিতে বুঝায় এমন ব্যবস্থা যেখানে বৈদেশিক মুদ্রার বাজার নিয়ন্ত্রিত, যেখানে স্বেচ্ছামূলক নিয়ন্ত্রণবিধি প্রচলিত, যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতারা নিজেদের খুশিমত বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারে না, এবং যেখানে বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ অথবা মূল্য অথবা দুই-ই সরাসরি সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন।

মুদ্রা-বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য (Objectives of Exchange Control)ঃ

বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণে কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে :—

(১) দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের জন্য মুদ্রা-বিনিময় ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। (২) দেশের পক্ষে অপরিহার্য আমদানির নিশ্চয়তা বজায় রাখিবার জন্য বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত রাখা হয়। (৩) স্বল্পকালীন অথবা দীর্ঘকালীন মূলধন আনাগোনা, (capital movements) সোনা এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যের রপ্তানিতে বাধানিষেধ আরোপের উদ্দেশ্যে মুদ্রাবিনিময় নিয়ন্ত্রণ করা হয়। (৪) লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য রক্ষার জন্য মুদ্রাবিনিময় নিয়ন্ত্রণ করা হয়। (৫) অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে সফল করিবার উদ্দেশ্যে অপরিহার্য যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি করার জন্য এবং কাঁচা মাল রপ্তানি বন্ধ করার জন্য মুদ্রাবিনিময় নিয়ন্ত্রণ করা হয়। (৬) বিনিময়-হারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখিবার জন্য রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং সস্তায় আমদানির জন্য মুদ্রাবিনিময় নিয়ন্ত্রণ করা হয়। (৭) কোন বিশেষ দেশকে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দানের উদ্দেশ্যেও মুদ্রাবিনিময় নিয়ন্ত্রণ করা হয়। (৮) সরকারী রাজস্ব-বৃদ্ধির জন্য মুদ্রাবিনিময় নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

ধরা যাক, কোন সরকার যাবতীয় বৈদেশিক মুদ্রা সরকারী মূল্যে নিয়ন্ত্রণ করিল; এখন তাহাকে রেশনিং-এর মারফৎ এই মুদ্রার চাহিদা মিটাইতে হইবে, কারণ চাহিদা যোগান অপেক্ষা অনেক বেশী। কর্তৃপক্ষকে এক্ষেত্রে চারিটি উপায় নির্ধারণ করিতে হইবে।

* Ragnar Nurkse—International Currency Experience p, 173.

(১) পণ্য আমদানি, ঋণ পরিশোধ কার্য, বৈদেশিক ভ্রমণ প্রভৃতি উদ্দেশ্যে কতটা বৈদেশিক মুদ্রাবণ্টন করা হইবে। (how much to allot for different purposes, commodity imports, debt service, tourists' traffic etc.); (২) ভিন্ন ভিন্ন পণ্যের আমদানির মধ্যে মজুত বৈদেশিক মুদ্রা কিরূপে বণ্টিত হইবে (how to distribute the exchange available for imports among different commodities.); (৩) বিভিন্ন সংস্থার (firms) মধ্যে কিরূপে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবহার সীমিত করিতে হইবে (how to ration exchange among different firms) এবং (৪) ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে সামগ্রিক মুদ্রা কিরূপে বণ্টিত হইবে ("how to distribute the total among different countries.")—

এইসকল সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য যে সকল উপায় আছে, সেই সকল উপায়গুলিকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করা হয়, এবং তাহা হইতেছে বৈদেশিক মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি করা।

বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Methods of Exchange Control): বৈদেশিক মুদ্রা-নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে; এখানে কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতি লইয়া আলোচিত হইতেছে। এই আলোচনাকালে আমরা ধরিয়া লইব যে, বৈদেশিক মুদ্রার হারের পরিবর্তনকে লেনদেন ব্যালান্সে সমতা আনয়নকারীরূপে ব্যবহার করা হইবে না :—

(১) কতিপয় যন্ত্রপাতি বা মূলধন আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মুদ্রার নিয়ন্ত্রণ করা হইয়া থাকে। এই সমস্ত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলিকে যদি সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায়, তাহা হইলে এইগুলি শুধু বিশেষ ধরনের বৈদেশিক মুদ্রার আনাগোনা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। কিন্তু এই মুদ্রা-নিয়ন্ত্রণ সাধারণ লেনদেনে বাধা সৃষ্টি নাও করিতে পারে, যেমন, hot money movements. কিন্তু শুধু একই ধরনের বৈদেশিক মুদ্রার উপর নিয়ন্ত্রণ কঠোরভাবে পরিচালনা করা প্রায়ই একেবারে অসম্ভব।

(২) অনেকক্ষেত্রে সর্বাত্মক বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অর্থাৎ, সরকারের নির্দেশ অথবা অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তি অথবা কোন ফার্ম যে কোন উদ্দেশ্যেই বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহার করিতে পারিবে না। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহারের উপর কড়াকড়ি করা হয়।

এই নীতির দুর্বল দিক হইল আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক একেবারে আটক করিয়া রাখা (freezing the pattern of international economic relations)।

(৩) আমদানি শুল্ক ধার্য করিয়া এবং বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহারের জন্য "কোটা" (quota) ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াও সরকার বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

(৪) রাষ্ট্র সরাসরি বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা এবং যোগান নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

অর্থাৎ ইহা নিজেই বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করিয়া বিনিময়ের হার নির্ধারণ করিয়া থাকে। প্রয়োজন হইলে সরকার বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সহিত বিভিন্নভাবে মুদ্রা বিনিময় হার নির্ধারিত করিতে পারে। ইহাকে পার্থক্যমূলক বিনিময় হার নির্ধারণ পদ্ধতি (Discriminatory Exchange Rates) বলা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মজুত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণের উপর রাষ্ট্রের এই সরাসরি হস্তক্ষেপ-পদ্ধতি নির্ভর করে।

(৫) বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণের অন্যতম পদ্ধতি হইতেছে **চুক্তি-পদ্ধতি**। রাষ্ট্রের যাবতীয় ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং আর্থিক সমস্যাবলী চুক্তির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি তিন ভাগে বিভক্ত—(১) পণ্য-বিনিময় চুক্তি (Barter Agreements), (২) লেনদেন চুক্তি (Payments Agreements) এবং (৩) ক্লিয়ারিং চুক্তি (Clearing Agreements)।

১। **পণ্য-বিনিময় চুক্তি :** এই চুক্তি অনুযায়ী দুই দেশের মধ্যে পণ্যের বিনিময়ে পণ্য লেনদেন হয়, ইহাতে অর্থসংক্রান্ত অথবা বৈদেশিক মুদ্রার কোন সমস্যাই দেখা দেয় না।

২। **লেনদেন চুক্তি :** দুইটি দেশের সমস্ত লেনদেন একটি বিশেষ সময়ের মধ্যে শেষ হইয়া গেলে যদি বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ পরিশোধের আরও কিছু বাকী থাকে, তাহা অপর কোন তৃতীয় দেশের মুদ্রার সাহায্যে পরিশোধ করা যাইবে—এইরূপ চুক্তি হইতে পারে।

৩। **ক্লিয়ারিং চুক্তি :** এই চুক্তি অনুযায়ী দুইটি দেশের মধ্যে চুক্তি দ্বারা পণ্য-দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বিনিময় হার স্থির করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকই দেনা-পাওনা স্থির করিবার ভার গ্রহণ করে।

মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণের অসুবিধা : (Disadvantages of Exchange Control) বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের নিম্নলিখিত অসুবিধা দেখা যায়।

বহুমুখী বাণিজ্যের ফলে যেসব দেশ তুলনামূলক সুবিধায় পণ্য উৎপাদন করিতে পারে, আমরা সেই সব দেশ হইতে জিনিসপত্র ক্রয় করিতে পারি, এবং যেখানে আমরা সর্বাপেক্ষা বেশী মূল্য পাইতে পারি, সেই সব দেশে আমাদের উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্রী ভালদামে বিক্রয় করিতে পারি। দুইটি দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে সমতা আনিবার পক্ষে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ একটি বিরাট বাধা। এই ব্যবস্থার ফলে বহুমুখী বৈদেশিক বাণিজ্যের সংকোচন হইয়া থাকে। পণ্যের মূল্য এবং উৎকর্ষেরও পরিবর্তন হয়। আবার যেসব ক্ষুদ্র দেশ বৃহৎ দেশের সহিত বাণিজ্য করে, ক্লিয়ারিং চুক্তির ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে তাহারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়। ইহা দেখা গিয়াছে যে, বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ-প্রথা আন্তর্জাতিক আক্রমণ এবং জোর করিয়া অর্থ-আদায়ের (blackmail) একটি উৎকৃষ্ট পথ। তবুও স্বাধীন বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময় নিয়ন্ত্রণের সুবিধাই বিভিন্ন দেশকে ইহা গ্রহণ করিতে প্রণোদিত করে।

মুদ্রাবিনিময় নিয়ন্ত্রণের সুবিধা (Advantages of Exchange Control) মুদ্রাবিনিময় নিয়ন্ত্রণের নিম্নলিখিত সুবিধা দেখা যায়।

কোন দেশের সরকার লেনদেন ব্যালান্সে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হইলে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন। ফাট্‌কা কাববার এবং মূলধন চলাচলের ফলে হয়তো জনসাধারণ মনে করিতে পাবে যে, দেশ হইতে মূলধন প্রায় সবই দেশের বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে; এই অস্বাভাবিক অবস্থা প্রতিরোধ করিবার জন্য বৈদেশিক মুদ্রা-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আবশ্যক।

মুদ্রাস্ফীতিব তীব্রতা বাড়িলে এবং তাহা গোপন করিতে হইলে এই ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকরী হয়। ইহাব দ্বারা সরকারী মুদ্রামানেব হ্রাস, বৈদেশিক মুদ্রাব রিজার্ভ এবং মজুত সোনার পরিমাণের পতন বোধ করা সম্ভব।

দেশের মূল্যস্তব এবং অনুৎপাদনমূলক আমদানি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য সরকাব এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকেন। আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর-নিয়ন্ত্রণ বৈদেশিক লেনদেনের নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত সম্ভব নয়।

৪। এই সম্পর্কে যদি সবকাব সম্পূর্ণভাবে ওযাকিবহাল না থাকেন তাহা হইলে মুদ্রাবিনিমব নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ফলে অন্য দেশের মন্দার প্রভাব নিজের দেশে এড়ানো সম্ভব হয়। বৈদেশিক মুদ্রা সংকটেব সৃষ্টি হইলে বৈদেশিক মুদ্রাব সুষম বণ্টন কবিয়া সরকার দেশেব প্রয়োজনীয় জিনিসেব আমদানি অব্যাহত বাখিতে এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিসের আমদানি বন্ধ করিয়া দিতে পাবেন।

বৈদেশিক বাণিজ্য ও কোটা (Quota): বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণেব এবং শিল্প সংবক্ষণেব একটি কঠোব নিয়ম অনুযায়ী কোটা-প্রথা গ্রহণ করা হয়, 'কোটা' বলিতে সাধারণতঃ বোঝা যায় আমদানির পরিমাণগত বাধানিষেধ এবং সেই আমদানির আনুপাতিক অংশ অনুযায়ী সরকারেব নিকট হইতে বৈদেশিক মুদ্রা অথবা প্রয়োজনীয় অনুমতি লাভ, ইহাই বর্তমানে কোটা বলিয়া বিশেষভাবে পরিচিত। আমদানির উপর নিম্নলিখিত পাঁচপ্রকার প্রত্যক্ষ কোটা দেখা যায়। যথাঃ—(১) শুল্ক কোটা (Tariff or Customs Quota) (২) একপাক্ষিক আমদানি কোটা (Unilateral Import Quota) (৩) আমদানি লাইসেন্স (Import Licensing) (৪) দ্বিপাক্ষিক কোটা (Bi-Lateral Quota) (৫) সংমিশ্রিত কোটা (Mixing Quota)

(১) **শুল্ক কোটা** (Tariff or Customs Quota) যখন কোন একটি বিশেষ পণ্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিশেষ স্বল্পহারে কোন দেশে আসিতে দেওয়া হয় তখন ইহাকে শুল্ক কোটা বলা হয়। কিন্তু এই বিশেষ নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত যদি কোন পরিমাণ আসে তাহা হইলে তাহার উপর উচ্চহারে শুল্ক দিতে হয়। এইরূপ কোটার মধ্যে স্থায়ী কোটা এবং সাধারণ শুল্কের বৈশিষ্ট্য একই সঙ্গে দেখা যায়। শুল্ক কোটার বিরুদ্ধে, দুইটি প্রধান যুক্তি হইতেছে, প্রথমত, স্বল্পহারে যখন

আমদানি নির্দিষ্ট পরিমাণ ছাড়াইয়া যায়, তখন স্বল্পহার হইতে যে লাভ হয় তাহা সম্পূর্ণরূপে যে কার্মগুলি রপ্তানি করে তাহারাই পাইয়া থাকে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকটি নূতন শুল্ক কোটা ধার্য করার সময় এত প্রচুর পরিমাণে পণ্য দেশের ভিতর আসিতে পারে যাহার দরুণ মূল্যস্তর ঊর্ধ্বমুখী হইতে পারে।

(২) **একপাক্ষিক কোটা** (Unilateral Import Quota)—একপাক্ষিক আমদানি কোটা তখনই আরোপ করা হয় যখন বৈদেশিক সরকারের সহিত আলোচনা না করিয়া সরকার কোন নির্দিষ্ট পণ্য আমদানির উপর নির্দিষ্ট সময়ে বাধানিষেধ আরোপ করিতে চাহেন।

এই কোটা এইরূপ হইতে পারে যাহার দ্বারা নির্দিষ্ট পণ্যটি যে কোন দেশ হইতে আমদানি করা চলিতে পারে। অথবা ক্ষেত্র বিশেষে এই কোটা (allocated) সুবণ্টিত হইতে পারে, যে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কোটাটি দেশের আমদানিকারীর ও বৈদেশিক যোগানকারীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভাগ করা হয়।

একপাক্ষিক কোটার প্রথম রূপটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহার ফল খুব সন্তোষজনক হয় না। কারণ—

(১) যখনই কোটাটি উন্মুক্ত করা হয় তখনই এই কোটা পূরণ করিবার জন্য আমদানি-কারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবহার দেখা দেয়। দূরবর্তী যোগানদারেরা ইহাতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (২) যে সকল বড় আমদানিকারী নিজেদের অর্থের প্রাচুর্য ও সুনামের ভিত্তিতে অতি স্বল্প সময়ে বিরাট পরিমাণের সংশ্লিষ্ট জিনিসটির জন্য অর্ডার দিতে পারেন তাঁহারা অপেক্ষাকৃত কম সঙ্গতি সম্পন্ন আমদানিকারী হইতে অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় ব্যবসা করিতে পারেন। (৩) আমদানিকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাত্রা এত বেশী হইতে পারে যাহার ফলে আমদানি-কাঠামোয় ভারসাম্যহীনতার (imbalance) সৃষ্টি হইতে পারে।

কোন দেশ অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের দরুণ অথবা বৈষম্যমূলক আচরণ করিবার দরুন কোটার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। যে দেশ এইরূপ কোটার আশ্রয় গ্রহণ করে তাহার আসল উদ্দেশ্য হইল যে অপর কোন তৃতীয় দেশ হইতে যেন নির্দিষ্ট পণ্যের আমদানি না হয় অথবা দেশীয় পণ্যের আমদানি-পরিপূরকের উৎপাদনের যেন কোন ক্ষতি না হয়। ইহার অপর আর একটি উদ্দেশ্য হইল যে, যদি কোন দেশ সংশ্লিষ্ট দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিরুদ্ধে কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করে তাহা হইলে সেই দেশের বিরুদ্ধে ইহার সাহায্যে প্রতিশোধ গ্রহণ করা।

(৩) **আমদানি লাইসেন্স** (Import Licensing)—এই প্রথার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন আমদানিকারীদের সমান ব্যবহার প্রদর্শন করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এই প্রথায় কিছু কিছু অসুবিধা আছে। যেমন, ঋতুভেদে কোন বিশেষ পণ্যের যোগানের পরিবর্তন, বিভিন্ন যোগানকারী দেশের যোগানের শর্তের পরিবর্তন এবং

নতুন আমদানিকারী ফার্মের আবেদনপত্রের মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। কিন্তু এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও লাইসেন্স-প্রথার অনেক সুবিধা আছে। যেমন, কোটা পূর্ণ হইবার পূর্বে প্রতিযোগীদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতার যে তীব্রতা দেখা যায় তাহা এই প্রথার দ্বারা অনেকটা কমানো যায়। মূল্যের বিশেষ পরিবর্তন অথবা কোন বৃহৎ ফার্মের প্রতি সুবিধা প্রদানও ইহার দ্বারা কমানো চলে। বরং যদি কোন ফার্ম অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করে, তাহা হইলে তাহার লাইসেন্স বাতিল করিয়া দেওয়া চলে।

(৪) **দ্বিপাক্ষিক কোটা** (Bilateral Quota)—আমদানিকারী দেশের ফার্মগুলি যাহাতে কোন পণ্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবার করিতে না পারে সেজন্য আমদানিকারী এবং রপ্তানিকারী দুইটি দেশের সরকারের মধ্যে চুক্তি করিয়া যে কোটা নির্দিষ্ট হয় তাহাকেই বলা হয় দ্বিপাক্ষিক কোটা। একপাক্ষিক কোটা হইতে দ্বিপাক্ষিক কোটার সুবিধাগুলি নিম্নরূপ—

(১) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোটা অনুযায়ী আমদানির পরিমাণ এমনভাবে ভাগ করা যাইতে পারে যাহাতে যোগান অথবা মূল্যের বিশেষ কোন পরিবর্তন না হয়। (২) চুক্তির দ্বারা রপ্তানির ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবার বন্ধ করা সম্ভব হয়। (৩) যেহেতু লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে বিদেশীরাও অংশগ্রহণ করিয়া থাকে সেজন্য কোটার বিরুদ্ধে তাহাদের বাধা অনেকাংশে কমানো সম্ভব। (৪) রপ্তানিকারী দেশের লাইসেন্স প্রদানের ফলে কোটা ধার্যকারী দেশের আমদানিকারীরা যে চাপ সৃষ্টি করিতে পারে তাহা এই প্রথার দ্বারা বহুলাংশে দূর করা যায়।

দ্বিপাক্ষিক কোটার বিরুদ্ধে যে প্রধান বাধা দেখানো হয় তাহা হইতেছে এই যে, ইহার ফলে আন্তর্জাতিক কার্টেলের (Cartel)-এর সৃষ্টি হইতে পারে। কারণ সাধারণত বেসরকারী সংস্থার (যেমন চেম্বার্স অব কমার্স প্রভৃতি) হাতেই রপ্তানি-লাইসেন্স প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়। সেজন্য এইরূপ ব্যবস্থা দ্বিপাক্ষিক কোটার অধীনে সহজেই সুসংগঠিত কার্টেলের শিকার হইয়া থাকে। উপরন্তু এইরূপ কোটার ফলে রপ্তানিকারী দেশ কোটা পরিচালনার দরুণ দাম বাড়াইয়া দিয়া থাকে; ফলে, আমদানি-কারীরা সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং জাতীয় রাজস্ব কমিয়া যায়।

(৫) **সংমিশ্রিত কোটা** (Mixing Quotas)—কোন দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় বিদেশী সামগ্রী অথবা যন্ত্রপাতি কতটা ব্যবহার করা যাইবে তাহা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধিনিষেধের সহিত সংশ্লিষ্ট। সংমিশ্রিত কোটা সাধারণতঃ পণ্যের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয় এবং দেখা যায়, সাধারণত নিম্নলিখিত জিনিসগুলি বিশেষভাবে ইহার আওতায় আসিয়া থাকে। তুলাজাত দ্রব্য, কাঁচা পশম, তরল জ্বালানি, পানীয়দ্রব্য (কফি), তামা এবং রবার। এইরূপ কোটায় বিদেশী একচেটিয়া কারবারীর উপর নির্ভরশীল হইতে হয় না বটে, কিন্তু তুলনামূলক খরচের সুবিধা অনুসারে যে সম্পদের ব্যবহার করা হয় তাহাও এই প্রথার দ্বারা

ব্যহত হয়। ইহার ফলে জিনিস পত্রের দাম বাড়িয়া যায় এবং উৎপাদিত সামগ্রীর উৎকর্ষ কমিয়া যায়।

বাণিজ্য শুল্কের অর্থনৈতিক প্রভাব (Economic Effects of Tariffs): বাণিজ্য শুল্কের প্রভাবকে সাতভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—(১) সংরক্ষণের প্রভাব (Protective Effect) (২) ভোগ-প্রভাব (Consumption Effect), (৩) রাজস্ব প্রভাব (Revenue Effect), (৪) পুনর্বণ্টন প্রভাব (Redistribution Effect), (৫) বাণিজ্যহার প্রভাব (Terms of Trade Effect), (৬) কর্মসংস্থান প্রভাব (Employment Effect) এবং (৭) লেনদেন ব্যালান্স প্রভাব (Balance of Payments Effect)।

বাণিজ্য শুল্কের ক্ষেত্রে উপরোক্ত সবগুলি প্রভাবই যে সবদেশে সমান গুরুত্বপূর্ণ তাহা নহে। নিম্নের চিত্রে বিভিন্ন প্রভাব দেখানো হইয়াছে। ধরা যাক্ কোন জিনিসের উপর আমদানি শুল্ক ধার্য করা হইয়াছে। জিনিসটির দাম হইতেছে OP, এই দামে যোগান অপেক্ষা চাহিদা MV পরিমাণ বেশী। যদি ক্রেতাদের চাহিদা পূরণ করিতে হয়, তবে QQ_1 পরিমাণ জিনিস আমদানি করা দরকার। কিন্তু শুল্ক ধার্য করিবার ফলে যোগান-দাম (Supply Price) বাড়িয়া হইয়াছে PP_1, ইহার ফলে আভ্যন্তরীণ উৎপাদন QQ_2 পরিমাণে বাড়িয়াছে, বাজারের চাহিদা Q_1Q_3 পরিমাণ কমিয়াছে।

চিত্র নং—১০১
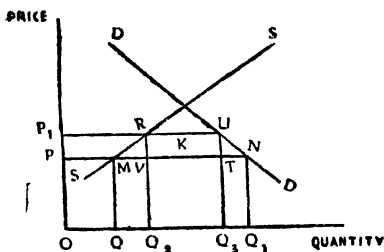
আমদানির পরিমাণও Q_1Q_3 পরিমাণ কমিয়াছে। QQ_2 পরিমাণ পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি হইতেছে সংরক্ষণের প্রভাব (Protective Effect), Q_3Q_1 পরিমাণ চাহিদা কমিয়া যাওয়া হইতেছে ভোগ-প্রভাব (Consumption Effect)। সরকার এখন $PP_1 \times Q_2Q_3 = RVTU$ পরিমাণ (চিত্রটির ভিতর K বিন্দুর সাহায্যে দেখানো হইয়াছে) রাজস্ব পাইতেছে। ইহা হইতেছে শুল্কের রাজস্ব-প্রভাব (Revenue Effect)।

বাণিজ্য শুল্কের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের প্রভাব (Protective Effect) কতটা কার্যকর হইবে তাহা নির্ভর করে যোগান রেখার স্থিতিস্থাপকতার উপর। যদি যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বেশী হয়, তবে সংরক্ষণ প্রভাবও বেশী দেখা যায়। অপরপক্ষে যদি যোগান অস্থিতিস্থাপক হয়, অর্থাৎ যদি শুল্ক ধার্য করার পর দেশের ভিতর সংশ্লিষ্ট জিনিসটির উৎপাদন সেই অনুপাতে না বাড়ে, তবে সংরক্ষণ প্রভাব বেশী কার্যকর হয় না।

বাণিজ্য শুল্কের ক্ষেত্রে ভোগ প্রভাব (Consumption Effect) প্রতিভাত হয় সামগ্রিকভাবে ভোগের পরিমাণ হ্রাসের মাধ্যমে। বাণিজ্য শুল্ক ধার্য করা হইলে সংশ্লিষ্ট জিনিসের দাম বাড়িয়া যায় এবং ক্রেতাদের বেশী দাম দিয়া জিনিসটি কিনিতে হয়। অবশ্য যদি জিনিসটির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয় তবে ক্রেতারা বেশী দাম দিয়া জিনিসটি কিনিবে এবং সামগ্রিকভাবে ভোগের পরিমাণ নাও হ্রাস পাইতে পারে।

বাণিজ্য শুল্কের রাজস্ব প্রভাবের (Revenue effect) ফলে সরকারের প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। অনগ্রসর দেশগুলির পক্ষে ইহা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থানের কাজে এই রাজস্বের সদ্ব্যবহার করা যাইতে পারে। যদি কোন বাণিজ্য শুল্কের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ প্রভাব এবং পুনর্বণ্টন প্রভাব (Redistribution Effect) বিশেষ কার্যকর না হয়, তবে শুধু রাজস্ব আদায়ের জন্য শুল্ক ধার্য করা যাইতে পারে। যদি এই শুল্ক ধার্যের ফলে দেশে ভোগ-প্রভাব কার্যকর না হয় তবে ধরিয়া লওয়া হয় যে যতটুকু শুল্ক আরোপ করা হইল বিদেশে জিনিসপত্রের দাম ঠিক ততটুকু কমিয়াছে এবং শুধুমাত্র বিদেশী উৎপাদকগণই এই করের বোঝা বহন করিয়া থাকে।

বাণিজ্য শুল্ক ধার্য করার ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যায় এবং উৎপাদকগণের মুনাফার পরিমাণও বাড়িয়া যায়। এই বর্ধিত মূল্যস্তর ও উৎপাদকদের বর্ধিত মুনাফার মাধ্যমেই পুনর্বণ্টন প্রভাব (Redistribution Effect) প্রতিভাত হয়। যাহারা গরীব ক্রেতা তাঁহারা এই বর্ধিত মূল্যের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হন; কিন্তু উৎপাদকগণ এজন্য লাভবান হন।

বাণিজ্য শুল্ক বাণিজ্য হারের উপর বিশেষ প্রভাব (Terms of Trade Effect) বিস্তার করিয়া থাকে। যদি দুইটি দেশের মধ্যে চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতা মোটামুটি একপ্রকার থাকে তবে আমদানি শুল্ক ধার্য করা হইলে জিনিসটির রপ্তানি মূল্যের অনুপাতে আমদানি মূল্য বাড়িবে এবং সেই দেশের বাণিজ্য হার প্রতিকূল হইবে; অপরদিকে রপ্তানিকারী দেশের বাণিজ্য-হার অনুকূল হইবে।

বাণিজ্য শুল্ক ধার্য করা হইলে যদি কোন দেশের শিল্প সংরক্ষণের ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয় এবং সেজন্য আমদানির-বিকল্প জিনিসের উৎপাদন বাড়ে, অথবা যদি রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নতি হয় তবে আমরা ইহার কর্মসংস্থান প্রভাব (Employment Effect) এবং আয় প্রভাব (Income Effect) দেখিতে পাই। অপর পক্ষে শুল্ক ধার্য করায় যদি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি না করা যায় এবং এজন্য দেশে শিল্পোৎপাদন ব্যাহত হয় তবে ইহার কর্মসংস্থান প্রভাব ও আয় প্রভাব প্রতিকূল হয়। আমদানি শুল্ক ধার্য করায় যদি আমদানির পরিমাণ কমে অথচ রপ্তানির পরিমাণ অব্যাহত থাকে তবে বাণিজ্য ব্যালান্স উন্নত হয় এবং ইহার লেনদেন-ব্যালান্স প্রভাব (Balance of Payments Effect) অনুকূল থাকে।

Exercise

1. How far can the Rate of Exchange between two Currencies be determined by the Purchasing Power Parity Theory? ক্রয়শক্তির সমতাতত্ত্ব অনুযায়ী দুই দেশের মুদ্রার মধ্যে বিনিময় হার কিভাবে নির্ধারিত করা যায়] (৩৮২-৩৮৪ পৃঃ)

2. How is the Foreign Exchange Rate determined under Gold Standard and under Inconvertible Paper Currency System? [বৈদেশিক বিনিময় হার স্বর্ণমানের ক্ষেত্রে এবং স্বর্ণরূপান্তরের অযোগ্য কাগজী মুদ্রার ক্ষেত্রে কিভাবে নিরূপিত হয়।] (৩৮১-৩৮৪ পৃঃ)

3. Examine the Purchasing Power Parity Theory. [ক্রয়-ক্ষমতার সমতা তত্ত্বটি পরীক্ষা কর।] (৩৮২ ৩৮৪ পৃঃ)

4. Discuss the effects of the Devaluation of a Currency on Balance of Payments and the Price Level. [লেনদেন ব্যালান্স এবং মূল্যস্তরের উপর মুদ্রার বহির্মূল্যের প্রভাব আলোচনা কর।] (৩৮৫-৩৮৬ পৃঃ)

5. Discuss the methods of Exchange Control. What are its Merits and Demerits? [মুদ্রাবিনিময় নিয়ন্ত্রণের পন্থাগুলি আলোচনা কর। ইহার কি কি সুবিধা ও অসুবিধা আছে।] (৩৮৭-৩৮৯ পৃঃ)

6. Explain how the Rate of Exchange between two currencies is determined. [দুইটি মুদ্রার মধ্যে বিনিময় হার কিভাবে নির্ধারিত হয় ব্যাখ্যা কর।] (৩৮২-৩৮৫ পৃঃ)

7. Discuss the Economic Effects of Tariffs. [বাণিজ্য শুল্কের অর্থনৈতিক প্রভাব আলোচনা কর।] (৩৯২-৩৯৩ পৃঃ)

8. What are the different types of Quota? How do they affect the flow of Foreign Exchange? ["কোটা"র বিভিন্ন রূপ কি কি বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহকে ইহা কিভাবে প্রভাবিত করে।] (৩৮৯-৩৯২ পৃঃ)

9. Write a short notes on Exchange Control? [মুদ্রাবিনিময়ের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।] (৩৮৬-৩৮৮ পৃঃ)

10. Write a short note on Devaluation. [মুদ্রার বহির্মূল্য হ্রাসের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।] (৩৮৫-৩৮৬ পৃঃ)

সপ্তবিংশ অধ্যায়

সরকারের আয়-ব্যয় নীতি
(Public Finance)

ব্যক্তিগত আয়-ব্যয় (Private Finance) এবং সরকারী আয়-ব্যয়ের (Public Finance) মধ্যে আমরা বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাই। ব্যক্তিগত আয়-ব্যয় নীতিতে জনসাধারণ আয় অনুযায়ী ব্যয় করে; কিন্তু সরকারী আয়-ব্যয় নীতিতে সরকার ব্যয়ের পরিমাণ আগে স্থির করে এবং ব্যয় অনুযায়ী আয় বাড়ায়। আয় হইতে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়া গেলে জনসাধারণকে ধার করিতে হয়। অনুরূপভাবে সরকারকেও বাড়তি ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য সরকারী ক্ষেত্রে ধার করিতে হয়। সরকার ধার করে বিদেশ হইতে অথবা দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যমূলক ব্যাংক এবং জনসাধারণের নিকট হইতে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে ধার নেওয়ার অর্থ হইতেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মারফৎ নূতন কাগজী মুদ্রা সৃষ্টি করা।

ব্যক্তিগত আয়-ব্যয় নীতি এবং সরকারী আয়-ব্যয়ের পার্থক্য

রাষ্ট্রের রাজস্বের উৎস (Sources of Revenue of the State): রাষ্ট্রের রাজস্ব সংগ্রহ করিবার বিভিন্ন উৎস আছে। প্রথমত, রাষ্ট্র জনগণের উপর কর ধার্য করিতে পারে। রাজস্ব সংগ্রহের ইহাই সর্বাপেক্ষা বড় উৎস। দ্বিতীয়ত, সরকার নিজের সম্পত্তি হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে পারে। কোন রাজ্যের বন সম্পদ অথবা নিজস্ব গৃহ অথবা অন্য সম্পত্তি হইতেও সরকার কিছু উপার্জন করিতে পারে। তৃতীয়ত, সরকার ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া কিছু উপার্জন করিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, ভারতের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, (State Trading Corporation)। পরিবহণ ব্যবস্থা এবং ডাকবিভাগ পরিচালনা করিয়া ভারত সরকার কিছু উপার্জন করে। সর্বশেষে, সরকার জনসাধারণের কোন বিশেষ উপকার করিয়া দিবার বিনিময়ে তাহাদের উপর লেভি (Levy) অথবা ফি (Fee) ধার্য করিতে পারে।

কর (Taxation): প্রথমত, কোন প্রতিদানের আশা না রাখিয়া যখন বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে টাকা প্রদান করিতে হয়, তখন ইহাকে কর বলে। কর সকলকেই প্রদান করিতে হয় যদি তাহাদের উপর কর ধার্য করা হয়। দ্বিতীয়ত, কর প্রদান করিবার সময় সরকারের নিকট হইতে ইহার প্রতিদানে কিছু পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। যখন সরকার কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অথবা জাতীয় ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত টাকা সংগ্রহ করিবার জন্য সচেষ্ট হয়, তখন জনগণের উপর ফি (Fee) অথবা লেভি (Levy) ধার্য করা হয়। ফি (Fee) অথবা (Levy) হিসাবে জনগণ সরকারকে যে অর্থ প্রদান করে ইহার প্রতিদানে তাহারা সরকার হইতে কিছু উপকার পাইয়া থাকে।

করের সূত্র (Canons of Taxation): সরকারের দিক হইতে কর ধার্য

করিবার কতিপয় সাধারণ সূত্র থাকা উচিত বলিয়া অর্থনীতিবিদ্‌গণ মনে করেন। অ্যাডাম স্মিথ চারিটি সূত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যথা, সামর্থ্যের সূত্র (Canon of Equity), নিশ্চয়তার সূত্র (Canon of Certainty), সুবিধার সূত্র (Canon of Convenience) এবং ব্যয়সংকোচনের সূত্র (Canon of Economy)। সামর্থের সূত্র অনুযায়ী গরীব অপেক্ষা ধনীদের উরর করের বোঝা বেশী হওয়া উচিত ; কারণ তাহাদের কর প্রদানের ক্ষমতা বেশী। এই সূত্র অনুযায়ী কর-ব্যবস্থা প্রগতিশীল (Progressive) হওয়া উচিত। স্থিরতার সূত্র অনুযায়ী কর প্রদানের পরিমাণ এবং কিভাবে ইহা দিতে হইবে তাহা সরকার কতৃক স্পষ্টভাবে করদাতাগণকে জানাইয়া দিতে হয়। সুবিধার সূত্র অনুযায়ী করপ্রদানে যাহাতে করপ্রদানকারীর সুবিধা হয় সেইরকম সময়ে ইহা ধার্য অথবা সংগ্রহ করা উচিত। সরকারের দিক হইতে যাহাতে কর সংগ্রহে কোন অসুবিধা না হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। ব্যয়-সংকোচনের সূত্র অনুযায়ী কর সংগ্রহের কাজে যাহাতে যতদূর সম্ভব অল্প খরচ হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

অ্যাডাম স্মিথ প্রদত্ত সূত্রগুলি ছাড়াও আধুনিক কর-ব্যবস্থায় আরও কতিপয় সূত্র অনুসৃত হয়। প্রথমত, করধার্যের নীতি সর্বদা পরিবর্তনশীল ও নমনীয় (Flexible) হওয়া উচিত যাহাতে সরকারের প্রয়োজন অনুযায়ী কর ধার্য করা যাইতে পারে। ইহাকে স্থিতিস্থাপকতার সূত্র (Canon of Elasticity) বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, কর-ব্যবস্থাকে এমনভাবে গঠন করা উচিত যাহাতে ইহা উৎপাদনের উদ্যোগ (Enterprise) ও অনুপ্রেরণার (Incentive) পরিপন্থী না হয়। অর্থাৎ কর ধার্যের ব্যাপারে উৎপাদনশীলতার সূত্র (Canon of Productivity) মানিয়া চলা উচিত।

করধার্যের আরও একটি নীতি হইতেছে সরলতার সূত্র (Canon of Simplicity)। যে সকল কর ধার্য করা হয় সেগুলি সম্পর্কে সকল বিষয় যেন জনসাধারণ সহজে বুঝিতে পারে। তাহা ছাড়া, কোন সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও কর ধার্য করা যাইতে পারে। সেক্ষেত্রে কর হইতে যে রাজস্ব পাওয়া যাইবে তাহা ঐ বিশেষ সামাজিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া ব্যয় করিতে হইবে। কোনও একটি বিশেষ অর্থনৈতিক প্রকল্পের অর্থসংস্থানের জন্যও কর ধার্য করা যাইতে পারে। এই নীতিটিকে আমরা সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের সূত্র (Canon of Social Objective) বলিতে পারি। সর্বশেষে, করলব্ধ আয়ের পরিমাণ এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে সরকার ইহার দ্বারা সাধারণ ব্যয়নির্বাহ করিতে পারেন। ইহাকে আমরা প্রাচুর্যের সূত্র (Canon of Sufficiency) বলিতে পারি।

করপ্রদানের বোঝা বা করভার (Incidence of Taxation): করদাতা করপ্রদানের যে বোঝা নিজে বহন করে তাহাকে বলা হয় করভার বা Incidence of Taxation. প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে করভার একজনের উপর হইতে আরেকজনের উপর চালান করা যায় না ; যাহার উপর আয়কর ধার্য করা হইয়াছে

তাহাকেই কর প্রদান করিতে হইবে। প্রত্যক্ষ করের বোঝা করদাতা নিজে বহন করিলেও করদাতা নিজেই একবার ক্রেতা এবং আরেকবার বিক্রেতা হইতে পারে। কর ধার্য হইবার ফলে করদাতার ক্রয়শক্তি কমিয়া যায় এবং ক্রেতা হিসাবে তাহাকে সেই বোঝা বহন করিতে হয়। অপরপক্ষে বিক্রয়যোগ্য জিনিসের দাম করের হার অনুযায়ী কিছুটা বাড়িতে পারে এবং উৎপাদক হিসাবেই করদাতা দাম বাড়াইয়া থাকে যাহাতে আয়কর প্রদান করিবার পরেও তাহার উদ্বৃত্ত আয় বিশেষ কমিয়া না যায়। করের হার (Rate of Tax) এবং করদাতার আয়ের উপরেও করপ্রদানের বোঝা নির্ভর করে। একই কর বড়লোকের উপরে কম বোঝা এবং গরীবের উপর বেশী বোঝার সৃষ্টি করিতে পারে।

প্রত্যক্ষ করের বোঝা অপরের উপর চালান করা যায় না; পরোক্ষ করের বোঝা অপরের উপর চালনা করা যায়

পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে করদাতা নিজে করভার বহন না করিয়া তাহা আরেকজনের উপর চালান করিতে পারে (যেমন, বিক্রয়করের ক্ষেত্রে)। কোন জিনিসের উপর কর ধার্য করা হইলে করভার কত হইবে তাহা নির্ভর করে সেই জিনিসের জন্য চাহিদা ও ইহার যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। যে জিনিসের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক, সেই জিনিসের উপর যদি কর ধার্য করা হয়, তবে করদাতার আর্থিক বোঝা খুব বেশী হয়। কারণ, চাহিদা অস্থিতিস্থাপক থাকার দরুণ তাহাকে বাধ্য হইয়াই সেই জিনিসটি কিনিতে হয় এবং কর প্রদান করিতে হয়। অপরপক্ষে যদি চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়, তবে করদাতার আর্থিক বোঝা তত বেশী হয় না, কারণ, জিনিসটির উপর কর ধার্য হওয়ামাত্রই করদাতা জিনিসটি ক্রয়ের পরিমাণ কমাইয়া দেয়। শুধু চাহিদা নহে, যোগানের স্থিতিস্থাপকতাও অনুরূপভাবে করপ্রদানের আর্থিক বোঝাকে প্রভাবিত করে। প্রত্যক্ষ করের বোঝা চালান নিম্নের চিত্রে দেখানো হইয়াছে।

এই চিত্রে DD এবং SS রেখা হইতেছে কর ধার্য করার পূর্বে যথাক্রমে চাহিদা ও যোগান রেখা। OP হইতেছে কর ধার্য করার পূর্বের দাম। এখন যদি একটি প্রত্যক্ষ কর ধার্য করা হয়, তবে করদাতার ক্রয়শক্তি কমিয়া যায় এবং চাহিদা-রেখা নীচের দিকে D′D′ পরিমাণ পর্যন্ত কমিয়া আসে। তাহা হইলে করের পরিমাণ হইতেছে RQ এবং বাজারের নূতন দাম হইতেছে OT;

চিত্র নং ১০২

কর হইতে প্রাপ্ত মোট রাজস্বের পরিমাণ হইতেছে TQRS, এবং ইহার মধ্যে
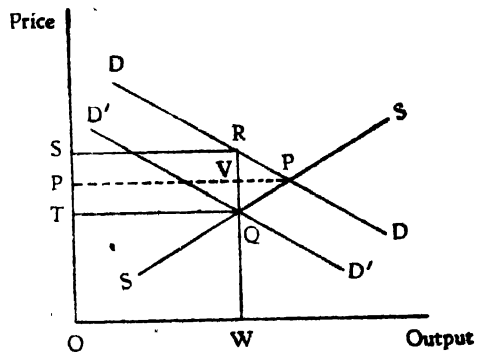
ক্রেতাকে প্রদান করিতে হইতেছে PVQT এবং উৎপাদককে প্রদান করিতে হইতেছে SRVP। এখন প্রত্যক্ষ করধার্যের ফলে করদাতার চাহিদা বা ক্রয়শক্তি কতটা কমিবে তাহা নির্ভর করে করদাতার নিকট বিশ্রাম এবং কাজের আপেক্ষিক গুরুত্বের উপর।

করপ্রদানের বোঝা চালান (Shifting the Burden of Taxation) : যখন করদাতা নিজে করপ্রদানের বোঝা বহন না করিয়া তাহা অন্য কাহারও উপর চালান করে, তখনই ইহাকে করপ্রদানের বোঝা চালান (Shifting the Burden of Taxation) বলা হয়। যেমন, বিক্রয়কর (Sales Tax) ধার্য হইলে বিক্রেতা নিজে করপ্রদানের বোঝা বহন না করিয়া বিক্রয়যোগ্য জিনিসটির দাম করের পরিমাণ অনুযায়ী বাড়াইয়া দেয় এবং করপ্রদানের বোঝা ক্রেতার উপর চালান করে। এইভাবে একজনের উপর হইতে আরেকজনের উপর করপ্রদানের বোঝা চালান করা তখনই সম্ভবপর হয় যখন যে জিনিসটির উপর কর ধার্য করা হইয়াছে সেই জিনিসটির চাহিদা স্থিতিস্থাপক (elastic) হয়। সরকার যখন আমদানি-শুল্ক (Import Duty) ধার্য করে, তখন অনেকক্ষেত্রে ব্যবসায়িগণ আমদানিকৃত জিনিসের দাম বাড়াইয়া দিয়া ক্রেতাদের নিকট হইতে শুল্কের টাকা আদায় করে, ইহাকে বলা হয় Forward Shifting অথবা সম্মুখভাবে কর-প্রদানের বোঝা চালান। আবার, এমনও হইতে পারে যে আমদানি-শুল্ক প্রদান করিতে হইবে বলিয়া জিনিসের দাম বাড়ানো হইবার পর দেখা গেল জিনিসটির চাহিদা কমিয়া গিয়াছে। তখন ব্যবসায়ীগণ চেষ্টা করিবে শুল্কপ্রদানের বোঝা যে দেশ হইতে জিনিসপত্র আমদানি করা হইতেছে সেই দেশের ব্যবসায়ীদের উপর চালান করিতে; অর্থাৎ তাহারা তখন শুল্কের পরিমাণ অনুযায়ী কম দামে জিনিস আমদানি করিবার জন্য চেষ্টা করিবে। এইভাবে করপ্রদানের বোঝা অপরের উপর চালান করাকে বলা হয় Backward Shifting.

চিত্র নং ১০৩

নিম্নের চিত্রে পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে করভার কিভাবে ক্রেতা এবং বিক্রেতাকে বহন করিতে হয় তাহা দেখানো হইয়াছে।
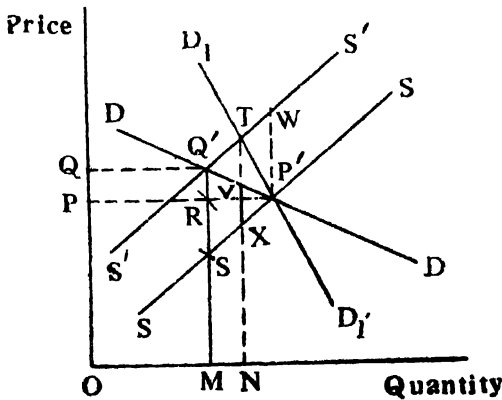
এই চিত্রে DD এবং SS হইতেছে যথাক্রমে চাহিদা-রেখা ও যোগান-রেখা, OP হইতেছে বাজার-দাম। এখন P′W পরিমাণ কর ধার্য করা হইল। ইহার ফলে যোগান কমিয়া গেল এবং নূতন যোগান-রেখা হইল S′S′; লম্বভাবে SS রেখা এবং S′S′ রেখার মধ্যে যে দূরত্ব তাহা হইতেছে করের

পরিমাণ, এবং তাহাই P'W দ্বারা সূচিত হইতেছে। করধার্যের ফলে দাম OP হইতে OQ পর্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। সরকার SQ পরিমাণ (Q_1 হইতেছে S'S' রেখা এবং DD রেখার ছেদবিন্দু বা নূতন ভারসাম্যের বিন্দু) কর হইতে রাজস্ব পাইতেছে এবং ইহার মধ্যে SR পরিমাণ কর প্রদান করিতেছে ক্রেতাগণ এবং RQ_1 পরিমাণ (=PQ) কর প্রদান করিতেছে উৎপাদকগণ। যেহেতু চাহিদা আপেক্ষিকভাবে স্থিতিস্থাপক, সেইজন্য করপ্রদানের সম্পূর্ণ বোঝা ক্রেতার উপর চাপানো যাইতেছে না। যদি চাহিদা আপেক্ষিকভাবে অস্থিতিস্থাপক হয়, অর্থাৎ যখন D_1D_1 হইতেছে চাহিদা-রেখা, তখন ক্রেতাগণ TV (T হইতেছে D_1D_1 রেখা এবং S'S' রেখার ছেদবিন্দু) পরিমাণ কর প্রদান করে এবং তাহা Q_1R অপেক্ষা বেশী এবং বিক্রেতাগণ VX পরিমাণ কর প্রদান করে।

যদি বিক্রয়করের ক্ষেত্রে করের সম্পূর্ণ বোঝা বিক্রেতাগণ ক্রেতাদের উপর চাপাইয়া দেয় তবে ইহা হইল সম্মুখভাগে করভার চালন (Forward Shifting)। কিন্তু যদি দেখা যায় সম্পূর্ণ করভার ক্রেতাদের উপর চালান করা যাইতেছে না, তখন বাধ্য হইয়া বিক্রেতাকে নিজের উপরেই সেই করের বোঝা রাখিতে হয় এবং সেক্ষেত্রে কর-বৃদ্ধির সঙ্গে দাম বাড়ানো সম্ভব হয় না। আমরা ইহাকে পশ্চাৎভাগে করভার চালান (Backward Shifting) বলিতে পারি।

প্রত্যক্ষ করের গুণাগুণ (Merits and Demerits of Direct Taxation): প্রত্যক্ষ করব্যবস্থার নিম্নলিখিত গুণ আমরা দেখিতে পাই। প্রথমত, এই ব্যবস্থায় করপ্রদানের আর্থিক বোঝা করদাতার উপর থাকে বলিয়া করদাতা অনুভব করেন যে তিনি সরকারকে কর প্রদান করিতেছেন। ইহাতে তাঁহার নাগরিক চেতনা বাড়িয়া যায় এবং সরকারী ব্যয়ের গতি ও প্রকৃতি জানিবার জন্য একটি কৌতূহল জন্মে।

প্রত্যক্ষ করের গুণ

দ্বিতীয়ত, প্রত্যক্ষ করে সরকার প্রগতিশীল করনীতি অনুসরণ করিয়া দেশে অর্থ ও ধনের বৈষম্য কমাইবার চেষ্টা করিতে পারে। সুতরাং দেশে সমুদয় অর্থনৈতিক শক্তির সমবণ্টনের চেষ্টা করা প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমেই সম্ভবপর। আয়কর, ব্যয়কর, মূলধন-মুনাফা কর, প্রভৃতি করের মাধ্যমে সমাজে আয় এবং ধনের বৈষম্য কমানো যায়। কর ধার্য করিবার সময় সামর্থ্যের সূত্রটি (Canon of Equity) অনুসরণ করা প্রত্যক্ষ করে সম্ভবপর।

তৃতীয়ত, প্রত্যক্ষ করে প্রাপ্য রাজস্বের পরিমাণ সম্বন্ধে সরকারের একটি ধারণা থাকে। প্রত্যক্ষ করে আমরা নিশ্চয়তার সূত্রটি (Canon of Certainty) কার্যকরী হইতে দেখিতে পাই।

সর্বশেষে, প্রত্যক্ষ করের একটি বিশেষ সুবিধা হইতেছে এই যে সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী করের হার বাড়াইতে অথবা কমাইতে পারে। সুতরাং, এই কর স্থিতিস্থাপকতার সূত্রটি (Canon of Elasticity) কার্যকরী হয়। তাহা ছাড়া, প্রত্যক্ষ

কর-ব্যবস্থা উৎপাদনশীলতার সূত্রে (Canon of Productivity) এবং ব্যয় সংকোচের সূত্রটির (Canon of Economy) সহিত সঙ্গতিপূর্ণ। পরোক্ষ করে এই সুবিধা থাকে না।

প্রত্যক্ষ করের কতিপয় ত্রুটিও আছে। প্রথমত, প্রত্যক্ষ করের সাহায্যে সব লোকের নিকট হইতে কর পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, প্রত্যক্ষ কর-ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে সরকারকে জনগণের অপ্রিয় করিয়া তোলে। জনসাধারণের উপর করের বোঝা যদি কেবলই বাড়াইয়া দেওয়া হয়, তবে জনসাধারণও সরকারের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া পড়ে। পৌরচেতনা জাগ্রত না হইলে প্রত্যক্ষ কর-ব্যবস্থা পরিচালনা করা কঠিন হইয়া পড়ে। তৃতীয়ত, প্রত্যক্ষ কর-ব্যবস্থায় কর ফাঁকি দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। অবশ্য উৎপাদন-শুল্ক, বিক্রয়-কর প্রভৃতি পরোক্ষ কর প্রদানের ক্ষেত্রে ফাঁকি দেখা যায় না তাহা নহে। তবুও ইহা ঠিক প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে কর ফাঁকির (Tax evasion) সম্ভাবনা বেশী থাকে।

প্রত্যক্ষ করের ত্রুটি

পরোক্ষ করের গুণাগুণ (Merits and Demerits of Indirect Taxation): পরোক্ষ করের প্রধান গুণ হইতেছে এই যে ইহাতে সব লোকের কিছু না কিছু কর প্রদান করিতে হয়। সরকার যে অর্থ ব্যয় করেন তাহার সুফল অল্প-বিস্তর সকলেই ভোগ করে। সুতরাং সেই করপ্রদানের বোঝা অল্প-বিস্তর সকলেরই কিছু বহন করা উচিত। দ্বিতীয়ত, এই কর-ব্যবস্থা জনগণের মধ্যে বেশী অসন্তোষের সৃষ্টি করে না। কারণ, এই ব্যবস্থায় করপ্রদানের বোঝা শেষ পর্যন্ত বহন করিতে হয় ক্রেতাকে। ক্রেতা জিনিস কিনিবার সময় এই কর দিতে প্রস্তুত হইয়াই জিনিস কিনে। ক্রেতা বুঝিতে পারে না যে সে কর দিতেছে। কতিপয় মাদক দ্রব্যের উপর এই কর ধার্য করা হইলে সমাজের উপকার হয়। কারণ, সেক্ষেত্রে সেই জিনিসগুলির দাম বাড়িয়া যায় ও সেইগুলির জন্য চাহিদা কমিয়া যায় এবং সেইজন্য সেইগুলির উৎপাদনও কমিয়া যায়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আর্থিক সংস্থানের একটি বিরাট দায়িত্ব পরোক্ষ করকে গ্রহণ করিতে হয়। কারণ পরোক্ষ কর ব্যাপক ও উৎপাদনশীল হইতে পারে। পরোক্ষ কর হইতে যে রাজস্ব পাওয়া যায় তাহা অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থানে ব্যবহৃত হয়। ভারতে মোট রাজস্বের শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশী আসে পরোক্ষ কর হইতে। সর্বশেষে, যে সকল জিনিসের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক, সেইগুলির উপর পরোক্ষ কর ধার্য করিয়া সরকার রাজস্বের পরিমাণ বাড়াইতে পারে।

পরোক্ষ করের গুণ

পরোক্ষ করের কতিপয় ত্রুটিও আছে। প্রথমত, পরোক্ষভাবে কর প্রদানকারীদের নাগরিক চেতনা অপেক্ষাকৃত কম জাগরিত হয়। দ্বিতীয়ত, পরোক্ষ কর ধার্য করা হইলে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যায় এবং তাহার ফলে সেইগুলির জন্য চাহিদা

কমিয়া যায়। সেইজন্য জিনিসগুলির উৎপাদন কমিয়া যায়। তৃতীয়ত, পরোক্ষ কর ধার্য করা হইলে দেশের মধ্যে আয় ও ধনের বৈষম্য বাড়িয়া যায়। গরীব ও বড়লোকদের একই কর দিতে হয়, অথচ তাহাদের আর্থিক অবস্থা এক প্রকার নয়। কর ধার্য করিবার সময় করপ্রদানকারীর আর্থিক অবস্থা এবং করপ্রদানের ক্ষমতার কথা বিবেচনা করা উচিত। অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্য (on welfare ground) কোন কোন ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পরোক্ষ কর সমর্থনযোগ্য না হইতে পারে। কারণ সেই পরোক্ষকর হয়ত ক্রেতাদের ভোগোদ্বৃত্ত (Consumer's Surplus) কমাইয়া দিতে পারে। নিম্নের চিত্রে ইহা দেখানো হইয়াছে।

পরোক্ষ করের ত্রুটি

এই চিত্রে DD এবং SS হইতেছে যথাক্রমে চাহিদা ও যোগান রেখা। ST হইতেছে করধার্যের পরিমাণ; এই করধার্য করিবার পর যোগান-রেখা SS রেখা হইতে উপরে TT রেখায় চলিয়া যায়। ইহার ফলে ভোগোদ্বৃত্ত DSP হইতে কমিয়া হয় DTQ। ইহার মধ্যে সরকার TQVS পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ করিতেছে। সুতরাং ভোগোদ্বৃত্তের নীট ক্ষতি হইতেছে QVP পরিমাণ।
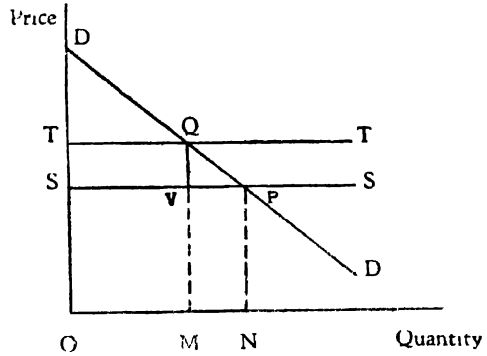
চিত্র নং ১০৩

পরোক্ষ করে করপ্রদানের ক্ষমতার সূত্রটি (Canon of Ability to Pay) উপেক্ষিত হয়। সর্বশেষে, প্রত্যক্ষ কর অপেক্ষা পরোক্ষ কর বেশী ব্যয়বহুল। সেইজন্য পরোক্ষ করে ব্যয়-সংকোচনের সূত্রটি (Canon of Economy) উপেক্ষিত হয়। তবে আধুনিক কর-ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ কর এবং পরোক্ষ কর উভয়ই ধার্য করিতে হয়।

প্রগতিশীল, সমানুপাতিক ও প্রতিক্রিয়াশীল কর (Progressive, Proportional and Regressive Taxation) : যখন লোকের আয় বাড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে করের হার বাড়িয়া যায়, তখন ইহাকে প্রগতিশীল কর (Progressive Tax) বলে। এই কর ধার্য করা হইলে বড়লোকদের বেশী কর প্রদান করিতে হয়। তাহাতে আয় ও ধনের বৈষম্য কমিয়া যায় এবং সমাজে আয় ও ধনের অপেক্ষাকৃত সমবণ্টনের লক্ষণ দেখা যায়। যখন আয় বাড়িয়া গেলেও করের হার একই থাকে, তখন ইহাকে সমানুপাতিক কর (Proportional

Tax) বলে। আবার যখন আয় বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে করের হার আপেক্ষিকভাবে কমিয়া যায়, তখন ইহাকে প্রতিক্রিয়াশীল কর (Regressive Tax) বলে। যদি দেখা যায় করের বোঝা অপেক্ষাকৃত কম আয় সম্পন্ন লোকের উপর বেশী, তখনও ইহাকে প্রতিক্রিয়াশীল কর বলা হয়।

প্রগতিশীল কর বনাম সমানুপাতিক কর (Progressive Taxation *vs.* Proportional Taxation): প্রগতিশীল করের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইতেছে এই যে ইহা ন্যায়সঙ্গত (Equitable)। এই ব্যবস্থায় ধনীদের বেশী কর দিতে হয়। যাহার যত বেশী আয়, তাহাকে তত বেশী আয়কর দিতে হয়। আবার, যাহার কম আয়, তাহার উপর ধার্য করের হারও অল্প। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি (Law of Diminishing Marginal Utility) ব্যাখ্যা করিবার পর সকলেই অনুভব করিতে থাকেন যে সমানুপাতিক হারে কর ধার্য করিলে ন্যায়ের সূত্র (Canon of Equity) অনুসৃত হয় না। কারণ আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে টাকার প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশঃ কমিয়া আসে। যাহাদের আয় বাড়িয়া যায় এবং টাকার প্রান্তিক উপযোগ কমিয়া যায়, তাহাদের কর প্রদান করিবার সামর্থ্যও (Ability to Pay Taxes) বাড়িয়া যায়। সুতরাং ন্যায় ও সমতার খাতিরেই বড়লোকদের উপর বেশী কর ধার্য করা উচিত। কিন্তু এই যুক্তির বিরুদ্ধে এই সমালোচনা করা হয় যে, টাকা হইতে প্রান্তিক উপযোগ কখনই পরিমাপ করা সম্ভব নহে। সমানুপাতিক হারে কর ধার্য করিলে ন্যায়ের সূত্র অনুসৃত হয় না।

প্রগতিশীল করের পক্ষে যুক্তি

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগের যুক্তি

অধ্যাপক পিগুর (Pigou) মতে প্রগতিশীল কর-ব্যবস্থা ন্যূনতম ত্যাগ স্বীকারের নীতির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ। যদি ধনী এবং দরিদ্রের উপর একই হারে কর ধার্য করা হইত, তবে ধনী অপেক্ষা দরিদ্রের বেশী ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। ন্যূনতম ত্যাগ স্বীকারের (Least Aggregate Sacrifice) ভিত্তিতেই কর-ব্যবস্থা প্রগতিশীল হওয়া উচিত। এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ত্যাগ স্বীকার কখনও পরিমেয় নহে।

ন্যূনতম ত্যাগ-স্বীকারের যুক্তি

দ্বিতীয়ত, এই ব্যবস্থায় করদাতা অনুভব করেন যে, তিনি সরকারকে কর প্রদান করিতেছেন এবং তাঁহার আয় বেশী হইলে করের হারও বেশী হইতেছে। ইহাতে তাঁহার নাগরিক চেতনা বাড়িয়া যায়। এই কর হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব সম্পর্কেও সরকারের সর্বদাই নিশ্চয়তা থাকে।

তৃতীয়ত, প্রগতিশীল করের মাধ্যমে সরকার দেশের জনগণের মধ্যে আয় ও ধনের বৈষম্য কমাইবার চেষ্টা করিতে পারেন। সুতরাং সরকারের পক্ষে দেশে সমুদয় অর্থনৈতিক শক্তির সমবণ্টনের চেষ্টা করা প্রগতিশীল করের মাধ্যমেই সম্ভবপর। আয়কর

উত্তরাধিকার কর মূলধন মুনাফা কর, সম্পদ কর, দান কর প্রভৃতি হইতেছে প্রগতিশীল কর। নিম্নে একটি চিত্রের সাহায্যে আয়-বণ্টন কিভাবে হয় তাহা দেখানো হইল।

এই চিত্রে বাক্সের ভিতর এক কোণ হইতে আরেক কোণ পর্যন্ত যে O O′ রেখা টানা হইয়াছে তাহা সমানভাবে জাতীয় আয়ের বণ্টন বুঝায়। ইহা Lorenz Curve নামে পরিচিত। OPO′ রেখাটি বুঝাইতেছে যে, অল্পসংখ্যক লোক বেশী আয়ের সুফল পাইতেছে। যখন প্রগতিশীল কর ধার্য করা হয়, তখন আয় বণ্টন রেখা O P O′ হইতে O R O′ পর্যায়ে চলিয়া যাইতেছে অর্থাৎ ইহা O O′ রেখার নিকটবর্তী হইতেছে।
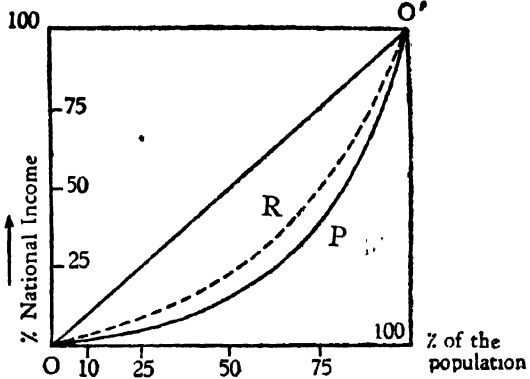
চিত্র নং ১০৪

আয়-বণ্টনের রেখা যতই O O′ রেখার নিকটবর্তী হইবে, বুঝিতে হইবে আয়ের বণ্টনও ততই সমানভাবে হইতেছে।

চতুর্থত, বিশেষ কোন আর্থিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য অথবা কোন অর্থনৈতিক প্রকল্পের আর্থিক সংস্থান করিবার জন্য এবং উৎপাদন ও নিয়োগ অব্যাহত রাখিবার জন্য প্রগতিশীল কর-ব্যবস্থা খুবই উপযোগী। যাঁহারা প্রগতিশীল কর পছন্দ করেন না, এবং যাঁহারা সমানুপাতিক কর (Proportional Taxation) পছন্দ করেন, তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সকলেরই সমান অনুপাতে কর প্রদান করা উচিত। আয় বেশী হইলেই যে বেশী কর দিতে হইবে তাহা ন্যায়-সঙ্গত নহে।

সমানুপাতিক করের পক্ষে এবং প্রগতিশীল করের বিপক্ষে যুক্তি,—এই যুক্তির উত্তর

পঞ্চমত, যাহাদের আয় বেশী, তাহাদের উপর অধিক হারে কর ধার্য করা হইলে ব্যবসায়-বাণিজ্যে এবং উৎপাদন-বৃদ্ধির ব্যাপারে তাহাদের উদ্যোগ ও অনুপ্রেরণা কমিয়া যাইবে। আমরা এই যুক্তির উত্তর দিতে পারি। বড়লোকদের উপর অধিক হারে কর ধার্য করিলে যে বাড়তি রাজস্ব পাওয়া যাইবে, তাহার সাহায্যেই সরকার দেশের উৎপাদন বাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য হইতেছে জনগণের মধ্যে আয় ও ধনের সমতা আনয়ন করা ; সেইদিক হইতে প্রগতিশীল কর সমর্থনযোগ্য। আয়করের সাহায্যে ধনী ও গরীবদের মধ্যে আয়ের পার্থক্য অনেক কমিয়া যায়। ইহাতে আয় ও ধনের পুনর্বণ্টন হয়। অল্প আয় উপার্জনকারীগণও বিনিয়োগের কাজে অগ্রসর হইতে

একক‌র-ব্যবস্থা বনাম বহুকর-ব্যবস্থা (Single Tax System *vs.* Multiple Tax System) : কর (Tax) এবং কর-ব্যবস্থার (Tax System) মধ্যে পার্থক্য আছে। কর বলিতে বিশেষ একটি কর বুঝায়। আর কর-ব্যবস্থা বলিতে সমগ্র কর ও কর সংগ্রহের গতি বুঝায়। প্রাচীনকালে সাধারণতঃ একটিই কর প্রচলিত ছিল এবং তাহা ছিল ভূ-সম্পত্তির উপর ধার্য কর। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সম্পত্তি এবং বিভিন্ন ধরনের আয়ের উপর কর ধার্য করা হয়।

এককর-ব্যবস্থার পক্ষে প্রধান যুক্তি হইতেছে ইহার সরলতা (simplicity)। দেশে যদি শুধু একটিমাত্র কর প্রচলিত থাকে তবে ইহার পরিধি এবং হার সম্পর্কে সকলেই অবহিত থাকে। সেজন্য প্রাচীনকালে যখন একটি-মাত্র কর প্রচলিত থাকিত তখন দরিদ্র কৃষকও বুঝিতে পারিত তাহাকে কত কর দিতে হইবে। কিন্তু বর্তমানকালে কোন দেশেই আমরা এককর-ব্যবস্থা দেখিতে পাই না। অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেমন গতিশীল, কর-ব্যবস্থাও সেই প্রকার গতিশীল। সরকারের আর্থিক ব্যবস্থার জটিলতা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। সেজন্য রাজস্বের জন্য শুধু একটিমাত্র করের উপর নির্ভর করিয়া থাকা চলে না। শুধু একটি কর প্রচলিত থাকিলে (ধরা যাক ভূ-সম্পত্তির উপর) সমাজের সকলকে কর প্রদান করিতে হয় না। অথচ যে বিশেষ জিনিসটির উপর কর ধার্য করা হইয়াছে তাহা ছাড়াও হয়ত এমন অনেক আয়ের উৎস লোকের থাকিতে পারে যাহাতে তাহাদের কর প্রদানের ক্ষমতা খুবই বেশী; কিন্তু একটিমাত্র কর প্রচলিত থাকায় তাহাদের আর কর প্রদান করিতে হয় না। একটি মাত্র কর দেশে চালু থাকিলে জনসাধারণের পক্ষে কর ফাঁকি দেওয়াও খুবই সহজ। দেখা যাইতেছে, রাজস্বের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য, কর-ব্যবস্থায় ন্যায় ও সমতার সূত্র কার্যকর করিবার জন্য, কর ফাঁকি বন্ধ করিবার জন্য, অর্থনৈতিক উন্নয়নের আর্থিক সংস্থান করিবার জন্য এবং গতিশীল সমাজব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া চলিবার জন্য কখনই এককর-ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত নহে। আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীমাত্রেই এককর-ব্যবস্থার সমর্থক নহেন। কিন্তু বহুকর-ব্যবস্থাও ত্রুটিমুক্ত নহে। করের সংখ্যা যদি খুব বেশী হয় তবে কর-ব্যবস্থা জটিল হইয়া পড়িতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে কর সংগ্রহ করিবার খরচও (cost of collection) বাড়িয়া যায় এবং কর ফাঁকির পরিমাণও বাড়িয়া যায়। সেজন্য খুব বেশী সংখ্যক কর ধার্য না করিয়া আবার শুধু একটি মাত্র করের উপর নির্ভর না করিয়া সরকারের উচিত এমন কয়েকটি কর ধার্য করা যাহাতে করভার সকলের মধ্যে যথাসম্ভব সমানভাবে বণ্টিত হয়। আমরা এই ব্যবস্থাকে Plural Tax System বলিতে পারি।

এককর-ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি

এককর-ব্যবস্থার বিপক্ষে যুক্তি

বহুকর-ব্যবস্থাও ত্রুটিমুক্ত নয়

কতিপয় কর থাকা বাঞ্ছনীয়

একটি ভাল কর-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of a good

প্রথমত, এই কর ব্যবস্থায় কর সংগ্রহের সূত্র (Canons of Taxation) বা নীতিগুলি যথাসম্ভব অনুসৃত হওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত, ভাল কর-ব্যবস্থায় কয়েকটি সুনির্বাচিত কর ধার্য করিতে হইবে। করগুলি ধার্য করিবার আগে করভার (Incidence) কিরূপ হইবে তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। তৃতীয়ত, কর ধার্য কবিবার সময় করদাতাদের কর প্রদানের সামর্থ্য (Tax-paying Capacity) বিবেচনা করিতে হইবে। মোট করভার যদি কর প্রদান করিবার সামর্থ্যকে অতিক্রম করে, তবে দেশে সামগ্রিক সম্পদের পরিমাণ কমিয়া যাইবে এবং মূলধন-সৃষ্টির কাজ ব্যাহত হইবে। চতুর্থত, এমনভাবে কর-ব্যবস্থা চালিত হওয়া দরকার যেন কর সংগ্রহ করার এবং কর প্রদান করার পদ্ধতি খুব সরল হয়, কর ফাঁকি দেওয়া যেন সম্ভব না হয় এবং করসংগ্রহ করার খরচও কম হয়। এককথায় ভাল কর-ব্যবস্থা সর্বদাই সুপরিচালিত হইয়া থাকে। ক্যালডর মনে করেন, ন্যায়-নীতি (Conon of Equity), অর্থনৈতিক ফলাফল (Economic Effects) এবং শাসনতান্ত্রিক দক্ষতা (Administrative Efficiency), এই তিনটি জিনিসের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কর ব্যবস্থা পরিচালনা করা উচিত। অনগ্রসর দেশগুলিতে কর-ব্যবস্থা এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যেন ইহা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া চলে। প্রয়োজনবোধে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাজস্বের পরিমাণ বাড়াইতে যেন অসুবিধা না হয়, আবার দেশেব মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখিবার পক্ষেও যেন কর-ব্যবস্থা সহায়ক হয়।

একটি ভাল কর-ব্যবস্থায় কখনই একটিমাত্র কবের উপর নির্ভর করা হয় না,—কয়েকটি সুনির্বাচিত করের উপর নির্ভর কবা হয়। তাহা ছাড়া, একটি ভাল কর-ব্যবস্থায় আমরা দেখিতে পাই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ করের সংমিশ্রণ। কোন দেশই শুধু প্রত্যক্ষ কর অথবা শুধু পরোক্ষ করের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না।

কর নীতি (Principles of Taxation)

কর ধার্য করিবার সময় সরকার কি নীতি অবলম্বন করিবেন সেই বিষয়ে অর্থবিজ্ঞানীদের মতে মতভেদ আছে। প্রথম নীতিটি হইতেছে উপকার-তত্ত্ব (Benefit Theory)। এই তত্ত্ব অনুযায়ী যে যে পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, সে সেই পরিমাণে কর প্রদান করিবে। কিন্তু, এই নীতিটির প্রধান ত্রুটি হইতেছে এই যে রাষ্ট্রের নিকট হইতে কে কি পরিমাণে সুযোগ-সুবিধা পাইয়া থাকে। তাহার পরিমাপ করা কঠিন। রাষ্ট্র মোট যে রাজস্ব পায়, তাহার অধিকাংশই সামাজিক স্বার্থে খরচ করা হইয়া থাকে। সুতরাং কে কত সুযোগ-সুবিধা পাইল তাহার সঠিক পরিমাপ করা সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের মধ্যে ধনীদের অপেক্ষা গরীবগণ সাধারণতঃ বেশী সুযোগ-সুবিধা লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং এই তত্ত্ব অনুযায়ী গরীবদের বেশী কর প্রদান করিতে হয়; এই যুক্তি কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়। যে যে-পরিমাণ সুবিধা ভোগ করে তাহাকে যদি সেই অনুপাতে কর প্রদান করিতে হয়, তবে কর-ব্যবস্থা

করের উপকার তত্ত্ব

প্রতিক্রিয়াশীল (Regressive) হইয়া যাইবে। এই তত্ত্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন। তবে ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে না হইলেও সামগ্রিকভাবে এই তত্ত্বটির কিছু যৌক্তিকতা আছে।

কর প্রদানের দ্বিতীয় নীতিটি হইতেছে কর প্রদানের সামর্থ্য তত্ত্ব (Faculty Theory or Ability to Pay Theory)। এই তত্ত্ব অনুযায়ী যাহার যে পরিমাণে কর প্রদান করিবার সামর্থ্য আছে, তাহাকে সেই পরিমাণেই কর প্রদান করিতে হইবে। প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কর প্রদান করে, তবে সামগ্রিক প্রকৃত করভার (Real burden) কম হইবে।

এই তত্ত্বটি বাস্তবে প্রয়োগ করিবার প্রধান অসুবিধা হইতেছে এই যে, এমন কিছু সঠিক মানদণ্ড নাই যাহার সাহায্যে করদাতার কর প্রদানের সামর্থ্য পরিমাপ করা যাইতে পারে। অনেকের মতে কাহার কত সম্পত্তি আছে, তাহা পরিমাপ করিয়া কর প্রদানের সামর্থ্য পরিমাপ করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। কারণ, এমন অনেক লোক আছে যাহাদের হয়ত কোন সম্পত্তি নাই, অথচ অন্যভাবে তাহাদের অনেক আয় আছে। অনেকে মনে করেন খরচের পরিমাণের দ্বারা লোকের কর প্রদানের সামর্থ্য সম্বন্ধে ধারণা করা যাইতে পারে। অধ্যাপক ক্যালডর এই মত পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু, এই যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। অনেক সময়ে মানুষও ঠেকায় পড়িয়া বেশী খরচ করিতে পারে। কিন্তু এই খরচের সাহায্যে তাহার কর প্রদানের সামর্থ্যের সঠিক পরিমাপ হয় না। আবার অনেকে মনে করেন, যেহেতু সম্পত্তি ও ব্যয় কোনটির সাহায্যেই লোকের কর প্রদানের সামর্থ্য সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা সম্ভব নয়, সেইজন্য লোকের আয়-ই কর প্রদানের সামর্থ্যের ভিত্তি হওয়া উচিত। কিন্তু, আয়ের সাহায্যেও লোকের কর প্রদানের সামর্থ্য সর্বদা পরিমাপ করা যায় না। প্রথমত, করদাতা তাহার প্রকৃত আয়ের পরিমাণ গোপন করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন করদাতার নিকট অর্থের প্রান্তিক উপযোগ (Marginal Utility of Money) সমান নয়। যে গরীব তাহার নিকট অর্থের প্রান্তিক উপযোগ খুব বেশী। আবার কোন বড়লোকের নিকট অর্থের প্রান্তিক উপযোগ খুব বেশী নয়। তৃতীয়ত, একই পরিমাণ আয় অর্জন করিবার জন্য বিভিন্ন লোকের ত্যাগ স্বীকার বিভিন্ন পরিমাণ হইতে পারে। একজন কেরানী সমস্ত মাস ধরিয়া খাটিয়া ১০০ টাকা বেতন পান। অথচ এই ১০০ টাকা উপার্জন করিবার জন্য একজন ব্যবসায়ীকে হয়ত আরও কম পরিশ্রম করিতে হইবে। সুতরাং উভয়কে যদি একই হারে কর প্রদান করিতে হয়, তবে ন্যায়বিচার হয় না। এইজন্য জোসিয়া স্ট্যাম্পের (Josiah Stamp) মতে লোকের কর প্রদানের সামর্থ্য যাহাতে সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় সেইজন্য নিম্নলিখিত নীতিগুলি পালন করিতে হইবে।

কর প্রদানের সামর্থ্য তত্ত্ব প্রয়োগ করিবার সুবিধা

আয়ের সাহায্যে কর প্রদানের সামর্থ্য কতটা পরিমাপ করা যায়—ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপাদানের নিয়ম

প্রথমত, আয়কর ধার্য করিবার সময় কাল বিচার করিতে হইবে। যখনই কাহারও আয় হইবে তখনই তাহাকে কর প্রদান করিতে হইবে, এই নীতি ('Pay as you earn' Principle) চালু করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, নীট আয়ের পরিমাপ করিবার জন্য আয় অর্জন করিবার সময়ে যাহা ব্যয় হয় এবং যন্ত্রপাতির যাহা ক্ষয়ক্ষতি হয়, তাহা বাদ দিতে হইবে। তৃতীয়ত, আয়কে দুইভাগে বিভক্ত করিতে হইবে, যথা, অর্জিত আয় (Earned Income) এবং অনুপার্জিত আয় (Unearned Income)। চতুর্থত, আয়কর ধার্য করিবার সময় করদাতার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিতে হইবে। যেমন করদাতার পরিবারের আয়তন যদি বড় হয়, তবে সেই পরিমাণে আয়করের হারও কম হওয়া উচিত।

কিভাবে সামর্থ্য-তত্ত্ব অনুযায়ী আয়কর ধার্য করা যায়—ক্যাম্পের সুপারিশ

কর প্রদান করার অর্থ হইতেছে ত্যাগ (Sacrifice) স্বীকার করা। এই ত্যাগ স্বীকার করাকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা, সমান ত্যাগ স্বীকার (Equal Sacrifice) এবং সর্বনিম্ন ত্যাগ স্বীকার (Least Aggregate Sacrifice or Minimum Sacrifice)। সমান ত্যাগস্বীকার নীতি অনুযায়ী প্রগতিশীল কর (Progressive Taxation) ধার্য করা উচিত যাহাতে সকলের ত্যাগ সমান হয়। এই নীতি অনুযায়ী যাহারা বড়লোক, তাহাদের বেশী কর দেওয়া উচিত এবং যাহারা গরীব, তাহাদের কম কর দেওয়া উচিত; দ্বিতীয় নীতি অনুযায়ী আয়ের সর্বোচ্চপর্যায়ে এই কর ধার্য করিতে হইবে যাহাতে ত্যাগের পরিমাণ সর্বনিম্ন হয়। কিন্তু, এই নীতির বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হইতেছে এই যে, ইহাতে বড়লোকদের বিনিয়োগ স্পৃহা (Inducement to Invest) এবং সঞ্চয়ের প্রবণতা (Propensity to Save) ব্যাহত হয়।

কর ধার্য করার আর একটি নীতি হইতেছে সেবা-কার্যের ব্যয়নীতি (Cost of Service Principle)। এই নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য যে সমস্ত কাজ করে সেইগুলির খরচ অনুযায়ী তাহাদের উপর কর ধার্য করা উচিত। কিন্তু এক্ষেত্রেও আমরা বলিতে পারি, কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্য রাষ্ট্রের সঠিক কত খরচ হইতেছে, তাহার পরিমাপ করা সম্ভব নহে। এই তত্ত্বটিও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন।

আধুনিককালে কর ধার্য করিবার সময় সরকারকে বিবেচনা করিতে হয় যেন কর-ব্যবস্থা (অনুন্নত দেশের ক্ষেত্রে) অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করে। আবার, উন্নত দেশগুলির করনীতি এমনভাবে গঠিত হইবে যেন কর-ব্যবস্থা দেশের আয়, উৎপাদন স্তর এবং কর্মসংস্থানের স্তরকে উঁচু রাখিতে সাহায্য করে। কর-ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সকল সামাজিক ও আর্থিক লক্ষ্যসাধনের নীতিকে আমরা করতত্ত্বের সামাজিক উদ্দেশ্য (Social Objectives of Taxation Theory) বলিতে পারি।)

কর প্রদানের ক্ষমতা (Taxable Capacity) : বর্তমান সময়ে সকল দেশের সরকারের ব্যয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বর্ধিত সরকারী ব্যয় প্রায়ই করের সাহায্যে করা হয়। সেইজন্য বর্তমানে আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই যে মানুষের কর-প্রদানের ক্ষমতা শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে। কর প্রদান বা করভার বহনের ক্ষমতা নির্ধারণের ব্যাপারে কোন একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। কেহ কেহ বলেন, জাতীয় আয় হইতে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি (Depreciation) বাবদ অর্থ এবং জনসাধারণের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহাই জনসাধারণের কর প্রদানের ক্ষমতা। এই যুক্তিটি বাস্তবে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা আছে। আবার অনেকে বলেন, দেশের উৎপাদনী শক্তি এবং কর্মক্ষমতা না কমাইয়া জনসাধারণ যতটা কর প্রদান করিতে পারে ততটাই তাহাদের উপর কর ধার্য করা উচিত।

কলিন ক্লার্কের অভিমত

অধ্যাপক কলিন ক্লার্ক (Colin Clark) বলেন, জাতীয় আয়ের শতকরা পঁচিশ ভাগের উপর পর্যন্ত নিরাপত্তার সঙ্গে কর ধার্য করা যাইতে পারে এবং ইহাতে দেশের উৎপাদনী শক্তি এবং কর্মক্ষমতা কমে না। কিন্তু যদি কর হইতে মোট রাজস্বের পরিমাণ জাতীয় আয়ের শতকরা পঁচিশ ভাগের বেশী হয়, তবে দেশের জিনিসপত্রের দাম অসম্ভব বাড়িয়া যায় এবং ব্যবসায়ীদের উৎপাদনের অনুপ্রেরণা (incentive) নষ্ট হয়। শ্রমিকরাও বেশী মজুরি দাবি করে ; মালিকরাও তখন একদিকে শ্রমিকদের মজুরি বাড়াইয়া দেয়, এবং অপরদিকে জিনিসপত্রের দাম বাড়াইয়া দেয়। কিন্তু, কলিন ক্লার্কের এই যুক্তি সব দেশের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় যথাক্রমে জাতীয় আয়ের শতকরা ৩৩ ভাগ এবং ৪০ ভাগ ধার্য করা হয়। ভারতবর্ষেও বর্তমানে জাতীয় আয়ের শতকরা ১৪ ভাগ কর ধার্য করা হয়।[১]

ক্যালডরের মতে মোট আয়ের সাহায্যে করদাতাদের করপ্রদানের ক্ষমতা সঠিক ভাবে নিরূপণ করা যায় না। কারণ অনেকেই করপ্রদানের ভয়ে সঠিক আয় কত তাহা গোপন করেন। বরং করদাতাদের অর্থব্যয় করার ক্ষমতার (Spending Power দ্বারা তাহাদের করপ্রদানের ক্ষমতা নিরূপণ করা যায়।

কোন একটি দেশের নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর সমস্ত জাতি মোট যে পরিমাণ কর

ফিণ্ডলে সিরাস প্রদত্ত চুক্তি

প্রদান করিতে পারে তাহাকেই কর প্রদানের বা বহনের) ক্ষমতা (Taxable Capacity) বলা হয়। ফিণ্ডলে সিরাস মনে করেন, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান অপরিবর্তিত রাখিয়া তাহাদের

১। লোকের কর প্রদানের ক্ষমতা সম্বন্ধে অধ্যাপক হিগিন্স (Prof. Higgins) বলেন, "How much people pay in taxes without working or investing less, depends on the value they place on what they get for their money. Taxable capacity also depends on the skill with which the tax system is adapted to institutional framework."

ন্যূনতম ভোগের জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদনের উপরেও যদি বেশী উৎপাদন হয়, তবে সেই উদ্বৃত্ত উৎপাদন তাহাদের কর প্রদানের ক্ষমতা সূচিত করে। [১]

সিরাসের মতে জীবনযাত্রার মানের দরুণ যতটুকু প্রয়োজন তাহা রাখিয়া রাষ্ট্র বাকী অংশটুকু কর হিসাবে লইতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হইল রাষ্ট্রের হাতে কি এত ক্ষমতা আছে যাহার দ্বারা ইহা সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যায়, সরকারী শাসনব্যবস্থা এই কাজে সাফল্য আনিতে অক্ষম। তাহা ছাড়া, জীবনযাত্রার মানের দরুণ করদাতার কতটুকু আয় কর মুক্ত রাখা উচিত সেই সম্পর্কে মতভেদের প্রচুর অবকাশ আছে। এই সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থা করদাতার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে পারে।

স্যার জোসিয়া স্ট্যাম্পের মতে তাহা বাঁদ দিলে যাহা বাকী থাকে তাহাই করপ্রদানের ক্ষমতা। যদি সবটুকু উদ্বৃত্ত লওয়া হয় তাহা হইলে করপ্রদানের ক্ষমতা সংকটের সম্মুখীন হইবে। অপর পক্ষে জোসিয়া স্ট্যাম্পের মতে কর বহনের ক্ষমতা হইল ভোগ এবং উৎপাদনের মধ্যে যেটুকু থাকে তাহাই, অর্থাৎ করপ্রদান ক্ষমতা সঞ্চয়ের উপর নির্ভরশীল, ইহা স্থায়ী নয়। ইহার কারণ দেখাইয়া তিনি বলেন যে প্রথমত, কর বহনের ক্ষমতা, কর-ব্যবস্থা কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে তাহার উপর নির্ভর করে। দ্বিতীয়ত, যে সকল লোকের উপর কর সমান হয় কর প্রদানের ক্ষমতা অনেকাংশে তাহাদের মানসিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। তৃতীয়ত, ইহা কি উপায়ে কর গ্রহণ করা হয় তাহার উপরেও নির্ভর করে চতুর্থত, ধন-বণ্টন ব্যবস্থার উপর ইহা নির্ভরশীল। পঞ্চমত, কর প্রদান ক্ষমতার হার উৎপাদন-বৃদ্ধির হার অপেক্ষা অধিক বেগে বাড়ে বা কমে।

জোসিয়া স্ট্যাম্পের যুক্তি

আবার কোন কোন অর্থবিজ্ঞানীর মতে দেশের জাতীয় আয় হইতে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ অর্থ ও জনসাধারণের জন্য জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় অর্থ নির্দিষ্ট করিয়া রাখিবার পর যাহা থাকে, তাহাই জাতির কর প্রদানের ক্ষমতা। সরকার এই উদ্বৃত্তটুকু করের মাধ্যমে গ্রহণ করিতে পারেন। যদি সরকার ইহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণে কর বসান, তাহা হইলে দুইটি ফল দেখা দিতে পারে,—(১) জনসাধারণের জীবনধারণের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহা কমিবে অথবা (২) মূলধনের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিবে। ইহার যে কোন একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে। জবন-যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যদি না থাকে তাহা হইলে শ্রমিকের বা সামগ্রিকভাবে জাতির কর্মক্ষমতা হ্রাস পাইবে। অপরপক্ষে মূলধন কমিলে জাতীয় আয় কমিবে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ কত পরিমাণ অর্থ আলাদা করিয়া রাখিতে

জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এবং কর প্রদানের ক্ষমতা

1. "The total surplus of production over the minimum consumption required to produce that volume of production, the standard of living remaining unchanged."

হইবে ? তাহা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। ক্ষয়ক্ষতি বাবদ অর্থ ছাড়াও নূতন নূতন মূলধন বৃদ্ধির জন্য আরও, অধিক পরিমাণে অর্থের নিয়োগ করা দরকার। ইহা না করিতে পারিলে দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে না। কিন্তু জাতীয় আয়ের কত পরিমাণ নূতন মূলধন বাবদ রাখা প্রয়োজন তাহা ঠিক করিবার কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠি নাই। এইরূপ জীবনধারণের জন্য কত অর্থের প্রয়োজন তাহাতে দেশ, কাল এবং জাতি পার্থক্য হিসাবে থাকিতে পারে।

কর প্রদানের ক্ষমতা আপেক্ষিক

বস্তুতঃ, কর প্রদানের ক্ষমতা আপেক্ষিক (Relative) ; ইহা অনেক কিছু বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, যেমন,—অর্থ নৈতিক অবস্থা, জনসাধারণের মানসিক অবস্থা, দেশের এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের অবস্থা ইত্যাদি। এইগুলিও, দেশ, কাল এবং পাত্র হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন হয়।

কর কাঠামোর প্রকৃতি

প্রথমত, কর-কাঠামোর প্রকৃতি কর-প্রদান ক্ষমতাকে নির্ণয় করে। ইহাতে যে সকল প্রত্যক্ষ কর যেমন আয়কর, মৃত্যুকর, ইত্যাদি, থাকে, সেই করগুলি প্রদানের ক্ষমতাকে উচ্চস্তরে নির্ধারণ করিতে হইলে আয়ের উপর করের প্রভাব জানিবার দরকার বিশেষ নাই। করদাতার অর্থ নৈতিক ইচ্ছা ও জাতির উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর ইহার কি প্রভাব তাহাই বিশেষ আলোচনায় বিষয়।

জাতীয় আয়ের বণ্টন

দ্বিতীয়ত, কর-প্রদানের ক্ষমতা জাতীয় আয়-বণ্টন ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। দেশের ভিতর ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যত বেশী প্রভেদ থাকিবে তত বেশী কর প্রদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে। অপরপক্ষে জাতীয় আয় সুষমভাবে বণ্টিত হইলে কর-প্রদানের ক্ষমতা কমিবে।

জাতীয় আয় এবং কর প্রদান ক্ষমতার সম্পর্ক

তৃতীয়ত, জাতীয় আয় এবং কর প্রদানের ক্ষমতার মধ্যে সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। উদাহরণস্বরূপ, জনসংখ্যার পরিমাণ ও জাতীয় আয়ের সম্পর্ক লইয়া আলোচনা করা যাইতে পারে। যদি জনসংখ্যার হার জাতীয় আয় অপেক্ষা দ্রুত বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে কর-প্রদান ক্ষমতা হ্রাস পাইবে। অপরপক্ষে, যেমন আমেরিকায়, জনসংখ্যার বৃদ্ধি অপেক্ষা জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি বেশী হইলে কর-প্রদানের ক্ষমতাও বেশী হইবে।

চতুর্থত, কর-প্রদানের ক্ষমতা দেশের সামগ্রিক শিল্প-সংগঠন ব্যবস্থার প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। দেশে যখন মূলধন সৃষ্টির হার বৃদ্ধি করিতে হয়, (যেমন, ভারতবর্ষে) তখন কর-প্রদান ক্ষমতার হ্রাস করা দরকার। এই বর্ধিত মূলধন ভবিষ্যতে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিলে কর প্রদানের ক্ষমতা স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাইবে।

পঞ্চমত, দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার উপর ইহা নির্ভর করে। যদি আয়ের একটি বৃহৎ অংশ অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং সেবাকার্যে খরচ করা হয় তাহা হইলে বুঝিতে

হইবে কর প্রদান ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ধরা যাক্, ক এবং খ এই দুইটি দেশের জাতীয় আয় ও জনসংখ্যা সমান। কিন্তু ক-দেশে খ-দেশ অপেক্ষা প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং সেবাকার্য বেশী মূল্যবান। ফলে ক-দেশের নাগরিকেরা বিলাস ব্যসনে বেশী ব্যয় করিতে পারে না। এই অবস্থায় ক-দেশে করপ্রদানের ক্ষমতা খ-দেশ হইতে কম।

দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থা

ষষ্ঠত, সরকারী রাজস্ব কি ভাবে ব্যয় করা হয়, তাহার উপরেও করবহন-যোগ্যতা নির্ভরশীল। সরকার যদি জনকল্যাণ-মূলক কার্যে যেমন জনশিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা প্রভৃতিতে বেশী রাজস্ব ব্যয় করেন তাহা হইলে কর প্রদান-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে। অপর পক্ষে, শুধু যুদ্ধের দরুণ ভয়াবহ ব্যয়বহুল মারণাস্ত্র নির্মাণ করিলে কর প্রদানের-ক্ষমতা হ্রাস পাইবে।

সরকারী ব্যয়ের প্রকৃতি

সপ্তমত, কর প্রদানের ক্ষমতা দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান, রাজনৈতিক এবং মানসিক অবস্থা, দক্ষতা, কাজ করিবার ক্ষমতা এবং ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যুদ্ধের সময় ইহা বৃদ্ধি পায়। কারণ দেশকে বাঁচাইবার জন্য জনসাধারণ অধিক ত্যাগ করিতে রাজী থাকে। কিন্তু শান্তির সময় তাহারা নিজেদের জীবনযাত্রার মান স্বেচ্ছায় হ্রাস করিতে চাহে না। সুতরাং কর প্রদানের ক্ষমতাও হ্রাস পায়।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, কর প্রদানের ক্ষমতা একটি আপেক্ষিক জিনিস এবং উহা বহু বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। ইহার একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করা দুরূহ ব্যাপার। ড্যালটনের (Dalton) মতে কর প্রদানের ক্ষমতার নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নাই। কিন্তু, ফিণ্ডলে সিরাসের মতে ইহার বাস্তবরূপ তখনই দেখা দেয় যখন কোন দেশ জাতীয় আয়ের কত অংশের উপর কর ধার্য করিতে পারে তাহা বিবেচনা করে।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর (Some Important Taxes)

আয়কর (Income tax) : বর্তমানে সকল দেশের সরকারী রাজস্বের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উৎস হইতেছে আয়কর। প্রত্যক্ষ করগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান কর হইতেছে আয়কর। যেহেতু আয়ই হইতেছে এই আয়করের ভিত্তি সেইজন্য কর ধার্য করার যোগ্য আয় বলিতে কি বুঝা যায়, তাহার একটি পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত। 'আয়' বলিতে বুঝায় বিভিন্ন উৎপাদন হইতে প্রাপ্ত নিয়মিত পরিতৃপ্তি, ইহাকে আসল আয় বলা হয়। কিন্তু করের উদ্দেশ্যে আসল আয়ের ধারণাটির খুব মূল্য নাই। আর এক ধরণের আয় আছে যাহাকে মানসিক আয় বলা হয়। তাহা হইতেছে মনের অনুভূতি। ইহার পরিমাপ করা একরূপ অসম্ভব। সমান আয় বিশিষ্ট ব্যক্তির মনে অনুভূতির বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। আবার আসল আয়ের সঠিক পরিমাপ করা খুব কঠিন। সুতরাং আর্থিক আয়কেই আয়করের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা উচিত; কারণ এই আয়ের পরিমাপ করা সহজ। যদি আসল আয় বলিতে তৃপ্তিলাভের স্রোত (flow of satisfactions) বুঝা যায়, তাহা হইলে আর্থিক আয় বলিতে বুঝা যাইবে ঐ তৃপ্তি যে সব দ্রব্য অথবা সেবাস্রোত হইতে পাওয়া যায়, তাহার বাজার দাম।

যদি সংজ্ঞার দিক হইতে কর ধার্য করার আয়কে আসল আয় বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে সমস্যা হইতেছে করস্থাপনের উদ্দেশ্যে কোন্ স্তরে তাহা পরিমাপ করা হইবে।

কিন্তু কোন ব্যক্তির কর প্রদানের ক্ষমতা কিরূপ তাহা আর্থিক আয়ের দ্বারা নির্ভুল ভাবে বিচার করা যায় না, সম-পরিমাণ আর্থিক আয়ের ব্যক্তিগণের মধ্যে আসল আয়ের পার্থক্য থাকিতে পারে। সেইজন্য কর ধার্যের সময় সরকার করদাতার অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাগুলি দেখিয়া কর ধার্য করেন।

· কোন কোন ধনবিজ্ঞানীর মতে কর ধার্যের উদ্দেশ্যে সঞ্চয়ের পরিমাণকে ভিত্তি করা উচিত; কারণ সঞ্চয় আয়ের অন্তর্গত। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ইহাকে গ্রহণ করা যায় না। অধ্যাপক পিগু (Prof. Pigou) চল্‌তি আয়কর হইতে সকল প্রকার সঞ্চয়কে বাদ দিবার পক্ষপাতী। কারণ সঞ্চয়ের উপর কর ধার্য করিবার অর্থ হইতেছে দুইবার কর প্রদান (double taxation) করা। একই আয়ের উপর করদাতাকে দুইবার কর দিতে হইতেছে, প্রথমে আয় পাইবার সময়, দ্বিতীয়বার যখন সঞ্চিত আয়ের উপর হইতে সুদ লাভ করা হয় তখন; কিন্তু এই উক্তি গ্রহণযোগ্য নহে। Stamp-এর মতে আয়করে দুইবার কর নাই। কারণ ঠিক আয়ের উপর কর এবং আয় হইতে প্রাপ্ত সুবিধার উপর কর ধার্য করা এক নয়। করের জন্য যদি সঞ্চয়কে বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে আয়ের যে দুই ব্যবহার, সঞ্চয়-ব্যবহার (saving use) এবং ব্যয়-ব্যবহার (spending use) তাহার মধ্যে পক্ষপাতিত্বের দোষ দেখা যায়। সরকারীভাবে এই নীতি কার্যকরী করা যায় না, কারণ কোন ব্যক্তির আয়ের তালিকা এবং তাহার সত্যতা নির্ণয়ের ব্যাপারে বিস্তৃতভাবে অনুসন্ধান করা দরকার।

আয়কর মূলধন হইতে দেওয়া হয় না। যদি মূলধন হইতে দেওয়া হইত তাহা হইলে দেশের মূলধন কমিয়া যাইত। সুতরাং আয়ের এরূপ সংজ্ঞা হওয়া উচিত যে যাহা মূলধনের অংশে পড়ে তাহা যেন বাদ পড়ে।

ব্যক্তি ও যৌথ কোম্পানী আয়কর দিয়া থাকে। ব্যক্তিগত আয়কর যে ব্যক্তিবিশেষে হইবে, এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। যদিও কর ধার্যের নীতি হিসাবে কর প্রদান করিবার ক্ষমতা (ability to pay) তত্ত্ব অনুসরণ করা হয় তাহা হইলেও ব্যক্তি হিসাবে কর ধার্য না করিয়া আয় এবং ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কর সমষ্টিগতভাবে ধার্য করা উচিত। কারণ, দুইজন করদাতার আয় সমান হইলেও তাহাদের দুইজনের কর প্রদান ক্ষমতার মধ্যে বহু পার্থক্য থাকিতে পারে। করদাতাকে যদি অবিবাহিত, বিবাহিত অথচ নিঃসন্তান অথবা বিবাহিত এবং সন্তান ও অন্যান্য পোষ্য প্রভৃতির ভরণ পোষণ করিতে হয় তাহা হইলে তাহার কর প্রদানের ক্ষমতা কম হয়। অনুরূপভাবে যদি বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্ত্রীর কোন আয় থাকে তাহা হইলেও কর প্রদানের ক্ষমতা নিরূপণ করিবার সময় তাহা বিবেচনা করিতে হইবে।

সীমাতিরিক্ত আয়ের উপর কর (Super Tax) এবং যৌথপ্রতিষ্ঠানগত আয়কর (Corporate tax) আয়করের অন্য দুইটি রূপ। অতি-আয়কর ধার্য করা হয়

উচ্চস্তরের আয়ের মালিকদিগের উপর। ইহার হার বেশী। আবার কখন কখন আয়কর এবং অতি আয়কর একই সঙ্গে আরোপ করা হইয়া থাকে। যৌথ কর ধার্য করা হয় যৌথ মূলধনী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক আয় অথবা লাভের উপর। শেয়ার ক্রেতাগণেব মধ্যে মোট আয় বা মুনাফা ভাগ করিয়া দিবার পূর্বে এই কর আরোপ করা হয়।

আয়করেব মূল উদ্দেশ্য হইল আয়ের উপর কর ধার্য করা। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে এই করের ফলে কোন ব্যক্তি ভবিষ্যতে আর এইরূপ আয় অর্জন করিতে পারিবে না। সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া সামগ্রিক আয় হইতে ক্ষয়ক্ষতি পূরণ তহবিল (Replacement Fund) বাবদ কিছু বাদ দিয়া কর আরোপণযোগ্য আয় নিরূপণ করা হয়। এই নীতির স্বীকৃতির ফলে অর্জিত আয় এবং অনুপার্জিত আয়ের (earned and unearned income) পার্থক্য করা হইয়াছে। অর্জিত আয়ের উপর কম হারে কর ধার্য করা হয়। আয়কর ধার্যের সময় একটি নিম্নতম আয়স্তরকে বাদ দেওয়া হয়। ইহাতে কর কাঠামো দোষমুক্ত হয় ও ন্যায়-নীতির (equity) দ্বারা পরিচালিত হয়। উচ্চ আয়স্তরের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও এইগুলি দেখিয়া কর ধার্য করা হয়।

আয়কর ধার্যের সময় সাধারণতঃ এক বৎসরেব মধ্যে যে আয় অর্জিত হয় তাহাই আয় হিসাবে ধরা হয়। নির্দিষ্ট মজুরি, সুদ অথবা খাজনাব ক্ষেত্রে এই সময় নিরূপণ সত্য হইতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিব ক্ষেত্রে যাহা সত্য, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তাহা সত্য নাও হইতে পারে। অনেক ধনবিজ্ঞানী সেইজন্য কর দিবার ক্ষমতার দিক হইতে বিচার করিয়া কয়েক বৎসরের আয়ের গড়কে বাৎসবিক গড় হিসাবে গণ্য করেন। এই গণনার নাম গড় বৎসর পদ্ধতি (average-year-method)। আবার কোন কোন ধনবিজ্ঞানী পূর্ব বৎসরের আয়কে করের ভিত্তি হিসাবে ধরিতে বলেন, ইহাকে বলা হয় পূর্ববর্তী-বৎসর-পদ্ধতি (previous-year-method)। আমেবিকা এবং ভারতবর্ষে এই পদ্ধতি প্রচলিত এবং কিছুকাল পূর্বে ইংল্যাণ্ড এথন পদ্ধতি অনুসারে কর ধার্য করিত।

আয়করের ফলাফল (Effects of Income Tax) : আয়করের ফলাফল সম্পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করিতে হইলে ব্যক্তিগত আয়কর এবং যৌথ কারবারের আয়করকে বিশ্লেষণ করিতে হইবে। আয়করের ফলাফল সাধারণভাবে দুইটি জিনিসের উপর বিবেচনা করিতে হইবে। (১) বিনিয়োগের অর্থ সংস্থানের জন্য সঞ্চয়ের যোগানের উপর এবং (২) বিনিয়োগের ইচ্ছার উপর ; ইহা ছাড়া, কর ব্যবস্থার ফলাফল অর্থনৈতিক অবস্থাব পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা দবকার ; অর্থাৎ মন্দা অথবা মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতিতে দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সেইদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

ব্যক্তিগত আয়করের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

সঞ্চয়ের যোগান ও আয়কর (Income tax and the supply of savings) : বাস্তবে দেখা যায় যে ঝুঁকি মূলধনের (equity-capital) একটি বিরাট

অংশ উচ্চ-আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট হইতে আসে ; সুতরাং এইরূপ ব্যক্তিগণের উপর আয়করের কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইতে পারে তাহা বিশ্লেষণ করা হইবে। যদি আয়করের প্রান্তিক হার খুব উচ্চস্তরে থাকে তাহা হইলে এই শ্রেণীর লোকেরা ব্যবসায়-বাণিজ্যে ঝুঁকি-মূলধনের (equity-capital) যোগান হ্রাস করিয়া দিবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে উচ্চহারে কর প্রদানের পরেও এই শ্রেণীর লোকেরা সঞ্চয় করিতে পারে এবং প্রতি বৎসরে ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রচুর পরিমাণ মূলধন দিয়া থাকে। ইহার একটি কারণ হইতেছে এই যে ধনী ব্যক্তিরা করের বোঝা বহন করিবার পরেও বহুভাবে অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে করের হার খুব বেশী মনে হইলেও ধনী ব্যক্তিগণের কাছে এই করভার খুব দুর্বিষহ বলিয়া মনে হয় না।

বিনিয়োগ স্পৃহা ও আয়কর (Income Tax and incentive to invest): বিনিয়োগ স্পৃহার উপর আয়করের নির্দিষ্ট প্রভাব আছে। কারণ (ক) বিনিয়োগের মূলধন হইতে আয় কমিয়া যায় ; (খ) উচ্চ প্রান্তিক করের হারের জন্য ঝুঁকি-বিনিয়োগ কম হইয়া থাকে। কিন্তু করের ঠিক প্রভাব নির্ভর করে বিনিয়োগ-কারীগণের বিনিয়োগের উদ্দেশ্যের উপর। এই করের আসল পরিণাম হইতেছে কম উৎপাদন এবং কম ঝুঁকি-বহনকারী বিনিয়োগ। কিন্তু ইহাও সত্য যে বহু বিনিয়োগ-কারী আছে যাহারা ঝুঁকিবহুল বিনিয়োগ করিয়া নিজেদের আয় বজায় রাখে এবং কর দিবার পরেও এই আয় নষ্ট হইয়া যায় না। বিনিয়োগ ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হইতে পারে মূলধনের মূল্য বৃদ্ধি (capital appreciation) করা যদি। এই করের সাহায্যে মূলধন লাভের অনুকূল ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে এই করের প্রভাব হইবে লাভজনক বিনিয়োগ ব্যবস্থার প্রতি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করা, এবং ইহাতে লাভজনক সিকিউরিটি ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

বস্তুতঃ এই করের নীট ফল হইতেছে এই যে ইহা উচ্চ আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাধারণ ষ্টক কিনিবার ইচ্ছা এবং ক্ষমতা হ্রাস করিয়া দেয়। কিন্তু কোন প্রকারেই ইহা ঝুঁকি মূলধনের যোগান হ্রাস করে না। প্রায় সব দেশেই ক্ষমতার ভিত্তিতে উচ্চ প্রান্তিক হারে কর দিবার পরেও বেশ কিছু অর্থ-মূলধনের (money-capital) যোগান অক্ষুন্ন থাকে। সমৃদ্ধির সময় যতই এই করের শ্রেষ্ঠত্ব থাকুক না কেন মন্দার সময় ইহার প্রভাব একেবারেই বিপরীত হইতে পারে।

উপরের বিশ্লেষণ হইতে মনে হইতে পারে যে বিনিয়োগের পরিমাণের উপর আয়করের প্রভাব খুব গুরুত্বপূর্ণ নহে। তবে ইহা খুবই সত্য যে ব্যক্তিগত আয়কর হইতে যৌথ আয়কর কিছু পরিমাণে বিনিয়োগের পরিমাণ কমাইয়া দেয়। কিন্তু এই বিনিয়োগ হ্রাসকে কর-ব্যবস্থার সাধারণ কার্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিতে হইবে। পূর্ণ-কর্মসংস্থানের সময় কর-ব্যবস্থার আসল উদ্দেশ্য হইতেছে বিনিয়োগ এবং ভোগ-ব্যয়ের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া। মুদ্রাস্ফীতির সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজই হইতেছে,

বিরুদ্ধে যে সাধারণ সমালোচনা করা হয়, তাহা এই দিকটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয় না।

অপরপক্ষে যখন পূর্ণ কর্মসংস্থান দেখা যায় না, তখন বিনিয়োগেব উপর আয়করের ফলাফল প্রতিকূল হইতে পারে। কিন্তু যে সকল কর ব্যক্তিগত ব্যয় কমায় সেই সব করের ক্ষেত্রেই এই সমালোচনা প্রযোজ্য, এবং এই দিক হইতে বিচার করিলে আয়করের প্রভাব অন্যান্য সকল করের প্রভাব অপেক্ষা অনেক সহনশীল। মন্দার সময় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি খুব কমই বিনিয়োগ করে, নূতন বিনিয়োগ করিতে উদ্যোগী হয় না এবং উপার্জিত সকল মূলধনই বিনিয়োগে নিযুক্ত করে না। সুতরাং একটি যৌথ প্রতিষ্ঠানের কর নিষ্ক্রিয় মূলধন হইতে দেওয়া হইবে এবং ইহা সরাসরি ভোগ-ব্যয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে।

আয়করের অর্থনৈতিক ফলাফল বিচার করিলে ইহা কতটা বিনিয়োগ হ্রাস করিতে পারে, তাহাই বিশেষভাবে বিবেচ্য নয়; দেখিতে হইবে অন্যান্য করের সহিত তুলনামূলক বিচারে ইহা কতদূর দীর্ঘকালীন মূলধন গঠনের হার (long-run rate of capital formation) কমাইয়া দেয়। এইদিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যৌথ আয়কর অন্যান্য কর অপেক্ষা সঞ্চয়ের পরিমাণ বেশী কমাইয়া দেয়। এই করের কিছু অংশ অবণ্টিত মুনাফা (undistributed profits) হইতে দেওয়া হইয়া থাকে, ফলে ইহা সরাসরি সঞ্চয় কমাইয়া দেয়; বাকী অংশ শেয়ারহোল্ডারগণ নিজেদের সঞ্চয় হইতেই দেন। কারণ উচ্চ আয়ের ব্যক্তিগণই এই ষ্টকের প্রধান অধিকারী। ইহাতে সম্ভাব্য মূলধন গঠনের হার অতি দ্রুত পরিমাণে কমিয়া থাকে।

জাতীয় আয় এবং কর্মসংস্থানের উপর আয়করের প্রভাব (Effects of Income Tax on National Income and Employment): জাতীয় আয় এবং কর্মসংস্থানের উপর আয়করের প্রভাব দুইটি হইতে আমরা বিবেচনা করিতে পারি :—

(১) উপাদান যোগানের (factor-supplies) উপর ফলাফল (২) বিনিয়োগ স্পৃহাব উপর ফলাফল।

প্রথমত, আয়করের ফলে উৎপাদনে নিযুক্ত হইতে পারে এমন উপাদানের মধ্যে যদি কোন পরিবর্তন হয়, তাহা হইলে সামগ্রিক উৎপাদনের উপর প্রভাব পরিলক্ষিত হইবে। যদি জনসাধারণ এই করের ফলে কাজে বিমুখ হয় তাহা হইলে শ্রমিকের যোগান কমিবে, জাতীয় আয় হ্রাস পাইবে, সরকারী এবং বেসরকারী উৎপাদনের পরিমাণ কমিবে এবং কাম্য (optimum) উৎপাদন হইবে না। জনসাধারণ যদি অতিরিক্ত খাটিতে না চায় তাহা হইলে অনুপস্থিত শ্রমিকের সংখ্যা বাড়িবে, প্রান্তিক শ্রমিকেরা শ্রম-যোগান দিবে না, উৎপান কমিবে এবং সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান হ্রাস পাইবে। অপরপক্ষে জনসাধারণ যদি কাজ করিতে উৎসাহ পায়, তাহারা যদি নিজেদের জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিতে চায় অথবা করের দরুণ

তাহারা যদি কাজের ঘণ্টার পরিবর্তন না করে তাহা হইলে জাতীয় আয় না কমিয়া বাড়িয়া যাইবে।

কিন্তু এই ধরণের জাতীয় আয় বৃদ্ধি অর্থনৈতিক কল্যাণ সূচিত করে না। এই কল্যাণ শুধু মাত্র সামগ্রিক উৎপাদনের উপরই নির্ভর করে না, উপরন্তু ইহা বিশ্রাম এবং কাজের মধ্যে একটি কাম্য সমন্বয়ের উপরও নির্ভর করে। যদি জনসাধারণ নিজেদের উপায়ের মধ্যে কাজের সময়ের পরিবর্তন করিতে পারে এবং আয়কর ধার্য করিবার ফলে যদি বিশ্রাম এবং কাজের মধ্যে সময়ের বণ্টন ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় এবং তখন যদি উৎপাদন বৃদ্ধি অথবা হ্রাস পায়, তাহা হইলে জনসাধারণ মনে করিবে যে তাহাদের অর্থনৈতিক কল্যাণের পরিমাণ কমিয়াছে।

আয়করের অন্যতম কুফল হইতেছে এই যে এই করের ফলে পারদর্শী চালকের যোগান (supply of executive talent) কমিয়া যাইতে পারে। তখন সরকারী নীতি এইরূপ হওয়া উচিত যে করের ফলে যেন দুর্লভ পরিচালকের বুদ্ধির যোগান কমিয়া না যায়। এই করের দরুণ যদি নূতন নূতন উৎপাদন নীতি অথবা দ্রব্য উদ্ভাবিত না হয়, তাহা হইলে অর্থনৈতিক দিক দিয়া ইহা ক্ষতিকারক হইবে।

আয়কর ধার্যের ফলে জাতীয় আয়ের পরিমাণ কমিতে পারে ; ইহার ফলে ভোগব্যয় এবং বিনিয়োগব্যয় কমিয়া থাকে ; ইহার দরুণ কর্মসংস্থানও প্রভাবিত হয়। আয়কর ব্যক্তিগত ভোগব্যয় হ্রাস করিয়া থাকে, অপরদিকে বিনিয়োগ-যোগ্য মূলধনের সরবরাহ এবং বিনিয়োগ স্পৃহাকে প্রভাবিত করে। কর-রাজস্বের ব্যয়ের ফলে করের সংকোচনকারী প্রভাবসমূহ দূরীভূত হয়। আয় এবং কর্মসংস্থান হ্রাস হয় কিনা তাহা নির্ভর করে সরকারী ব্যয়ের সম্প্রসারণশীল প্রভাব (expansionist effect) এবং করের সংকোচনশীল প্রভাবের আপেক্ষিক শক্তির উপর। যেহেতু আয় হইতেই আয়কর দেওয়া হইয়া থাকে, সেইজন্য সামগ্রিকভাবে এই করের ফলে জাতীয় আয় হ্রাস পায় না। কিন্তু আয়কর যদি বিনিয়োগ স্পৃহার উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে তাহা হইলে এই করের নীট প্রভাব সংকোচনশীল। করের স্তর এবং কর-কাঠামোর হার এই সংকোচন প্রভাব নিরূপণ করিয়া থাকে। দীর্ঘকালীন এই করের ফলে যদি মূলধন গঠনের হারে পরিবর্তন হয় তাহা হইলে জাতীয় আয়ের পরিবর্তন হইতে পারে। উন্নত দেশের পক্ষে এই সমস্যাটি বিশেষ গুরুতর নয় ; কারণ তাহারা অতিরিক্ত সঞ্চয় করিতে পারে। কিন্তু অনুন্নত দেশের পক্ষে ইহা একটি কঠিন সমস্যা।

আয়করের উপরোক্ত সুবিধাগুলি থাকিলেও আজকাল পৃথিবীর সব দেশের কর ব্যবস্থার মধ্যে আয়কর প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রত্যক্ষ করগুলির মধ্যে ইহাই সর্বপ্রধান। আয়কর খুবই নমনীয় (flexible) অথবা স্থিতিস্থাপক (elastic) প্রগতিশীল নীতি অনুযায়ী ব্যক্তির কর দিবার ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ইহার হার হ্রাস-বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ইহা অবশ্যই উৎপাদনশীল। অন্যান্য করের

তুলনায় ইহা আদায়ের খরচও খুব কম। সরকার আয়কর হইতে কত রাজস্ব পাইতে পারেন তাহার একটি সঠিক হিসাব আয়কর হইতেই পাওয়া সম্ভব। আয়করের বোঝা একজন অন্য একজনের উপর চাপাইতে পারে না।

ব্যক্তিগত ব্যয়কর (Personal Expenditure Tax) : আয়কর লোকের আয়ের উপর ধার্য করা হয় এবং ব্যয়কর লোকে যে পরিমাণ টাকা ব্যয় করে তাহার উপর ধার্য করা হয়। আয় অথবা ব্যয়—কিসের ভিত্তিতে ব্যক্তির নিকট হইতে কর গ্রহণ করা উচিত তাহা লইয়া বহু দিন ধরিয়া বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। সাধারণতঃ ব্যয়কর আরোপিত হয় ব্যক্তির মোটভোগ-ব্যয়ের উপর, তাহার সামগ্রিক ব্যয়ের উপর নহে। কিন্তু ক্যালডর সম্প্রতি সামগ্রিক ব্যক্তিগত ব্যয়ের উপর কর ধার্য করার সুপারিশ করিয়াছেন। আয়করে যেমন একটি সর্বনিম্ন আয় ঠিক করা থাকে, ব্যয়করেও সেইরূপ সর্বনিম্ন ব্যয়ের পরিমাণ ঠিক করা থাকে। মোট ব্যয়ের পরিমাণ ইহার বেশী হইলে ব্যয়কর দিতে হয়—কম হইলে কর দিতে হয় না। যে ব্যক্তির আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী তাহার ক্ষেত্রে আয়কর অপেক্ষা ব্যয়করে কর-ভিত্তি (tax base) অধিকতর বিস্তৃত। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকোলাস ক্যালডরের ব্যয়করের প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতবর্ষে ১৯৫৭-৫৮ সালে এই করের প্রবর্তন করা হইয়াছিল।

ক্যালডর মনে করেন আয়কর অপেক্ষা ব্যয়কর আরও ভাল এবং ন্যায়সঙ্গত। ব্যয়-করের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় যুক্তি এই যে, এই কর স্থাপনের ফলে ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যয় কমাইবার প্রবণতা দেখা যায়। কোন ব্যক্তির কর প্রদান ক্ষমতার সঠিক পরিমাপ তাহার আয় হইতে পাওয়া যায় না, তাহার ব্যয়ই ইহার উপযুক্ত পরিমাপ। ব্যয়ের পরিমাণ কমিলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং ইহাতে দেশের মোট সঞ্চয় বাড়িয়া যায়। বিশেষ করিয়া অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে এই করের বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই সব দেশের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ কম এবং এই সঞ্চয়ের পরিমাণ শীঘ্র না বাড়িলে মূলধন গঠনের হার বাড়ানো সম্ভব নহে। ব্যয় করে সঞ্চয় বাড়ে এবং ইহার ফলে কোন অনগ্রসর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম হয়।

ক্যালডরের মতে আয়করের বিরুদ্ধে দুইটি যুক্তি উত্থাপন করা যায়। এমন ব্যক্তি আছেন যাহার তিনটি বাড়ী আছে এবং ভাড়া বাবদ তাঁহার মাসিক আয় ৩০০০ টাকা। আবার একজন বড় ব্যারিষ্টার বা ডাক্তার প্রতিমাসে ৩০০০ টাকা রোজগার করিয়াও ভাড়া বাড়ীতে বাস করেন। দুইজনের আয় সমান হইলেও করপ্রদানের ক্ষমতা সমান নহে। প্রথম ব্যক্তির সম্পত্তি আছে বলিয়াই আয়ের সমস্ত অর্থ ব্যয় করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব। দ্বিতীয় ব্যক্তির সঞ্চিত সম্পত্তি নাই। কাজেই তাঁহাকে প্রতিমাসেও কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে হয়। ইহা ভিন্ন বিভিন্ন ব্যক্তির আয় সমান থাকিলেও তাঁহাদের দায়িত্ব এবং ভোগ-প্রবণতা পৃথক থাকায় তাঁহাদের ব্যয়ের পরিমাণও পৃথক হইয়া থাকে। সুতরাং ব্যয়ের পরিমাণকেই ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। ক্যালডরের মতে আয় অপেক্ষা ব্যয়-ই কর প্রদান করিবার ক্ষমতার ভাল মাপকাঠি।

দ্বিতীয়ত, বর্তমানে যে রকম উচ্চহারে আয়কর স্থাপন করা হইতেছে তাহাতে লোকের আয় বাড়াইবার জন্য অধিক কাজ করিবার স্পৃহা কমিয়া যাইতেছে। উচ্চহারে কর দিতে হইলে কর্মের ইচ্ছা ও উত্তম কমিয়া যাইতে পারে এবং যদি তাহাই হয় তবে সঞ্চয়ের পরিমাণও কম হইবে। কারণ আয়কর প্রদান করিয়া লোকের হাতে অল্প পরিমাণ টাকা সঞ্চিত থাকে। আয়করের প্রভাবে সঞ্চয় কমিয়া যায় এবং ব্যয়করের প্রভাবে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। এই সঞ্চিত অর্থের যথোপযুক্ত একত্রীকরণ (mobilisation) এবং বিনিয়োগ হইলেই মূলধন গঠনের কাজ অগ্রসর হইতে পারে।

ব্যয়করের বিরুদ্ধে যুক্তি : ব্যয়করের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে। প্রথমত, ন্যায়ের দিক হইতে বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে ইহা পক্ষপাতদুষ্ট (Discriminatory)। যাঁহারা অধিক ব্যয় করে বা ব্যয় করিতে বাধ্য হন তাঁহাদের উপরেই ব্যয়কর আরোপিত হয়। কিন্তু যাঁহাবা বেশী ব্যয় না করিয়া বেশী সঞ্চয় করেন, তাঁহাদের কম কর প্রদান করিতে হয়। ইহাতে সঞ্চয়-প্রবণ ধনী ব্যক্তিদের অধিকতর সুবিধা হয় ; বৃহৎ পরিবার বা ব্যয় বেশী এইরূপ পরিবারের খুব অসুবিধা হয়। সেইজন্য ন্যায়ের দিক দিয়া ইহা আমরা মানিয়া লইতে পারি না। যে ব্যক্তির ব্যয় বেশী তাহার কর প্রদানের ক্ষমতাও যে বেশী হইবে সেই বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নাই। তৃতীয়ত, ব্যয়-করের প্রভাব সংকোচনশীল। মুদ্রাস্ফীতির সময় এই করের উপযোগিতা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। কিন্তু মন্দা বা সংকোচনের সময় ব্যয়-করের কোন উপযোগিতা নাই। সুতরাং ব্যয়কর মন্দার সময় প্রবর্তন করা উচিত নহে। কিন্তু আয়করের সুবিধা সর্ব অবস্থাতেই সমান। চতুর্থত, ব্যয়কর আদায়ের জন্য যে সংগঠনের প্রয়োজন তাহা গঠন করা খুবই অসুবিধাজনক।

ব্যয়কর আরোপ করার পদ্ধতি : ব্যয়কর দুইভাবে আরোপ হইতে পারে। প্রথমত, আয়করের মত ব্যয়করেও করদাতাগণের বাৎসরিক একটি হিসাব সরকারকে দিতে হয়। এই হিসাবের ভিত্তিতেই কর আরোপ করা হয়। আয়ের একটি সঠিক হিসাব বা পরিমাপ থাকে। ধনীরা সাধারণতঃ ব্যয়ের হিসাব রাখেন না। কিন্তু ক্যালডরের মতে করদাতাকে ব্যয়ের হিসাব আলাদা করিয়া দিতে হইবে না। তাঁহাকে প্রতি বৎসর আয়ের হিসাব ও সঞ্চিত অর্থ বা সম্পত্তির পরিমাণ জানাইয়া দিলেই চলিবে। যে বৎসর যে পরিমাণ আয় হইয়াছে তাহা হইতে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাদ দিলেই ব্যয়ের পরিমাণ পাওয়া যাইবে। সুতরাং কর ধার্য করার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন দুর্ভোগ নাই। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন সামগ্রীর উপর কর বসাইয়া ব্যয়কর আদায় করা হয়। ইহার নাম সামগ্রী কর (commodity taxes)। বিক্রেতারা এইসব করের বোঝা ক্রেতাদিগের উপর চাপাইয়া (shift) থাকে। ফলে ক্রেতারাই এই কর দেয়। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের জন্য এই করকে ব্যাপক হারে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু ইহা আদায় করার ব্যাপারে প্রচুর অসুবিধা আছে। সামগ্রী-করের অপর একটি রূপ আংশিক ব্যয়কর (partial outlay tax)। সামগ্রী-করের অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া

বিশেষ বিশেষ ব্যয়ের বা সামগ্রীর উপর এই কর বসান হয়। এই করের ভিত্তি হিসাবে ব্যক্তির সামগ্রিক ব্যয়কে ধরা হয় না। বিশেষ বিশেষ ধরণের ব্যয়ই এই করের ভিত্তি।

আয়কর ও ব্যয়করের তুলনা: ক্যালডর করের ভিত্তি (base) হিসাবে আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু লোকের মোট আয়ের মাত্র একটি অংশ হইতেছে ব্যয়। সুতরাং করের ভিত্তি হিসাবে আয় অপেক্ষা ব্যয় সংকীর্ণতর। আয় যদি সমুদয় সম্পদের একটি নিয়মিত

কর প্রদানের ক্ষমতার দিক হইতে আয়কর ও ব্যয়করের তুলনা

প্রবহমান স্রোত হয় তবে সেই আয়ের যে অংশটুকু ভোগের জন্য ব্যয়িত হইতেছে তাহাই ব্যয়-করের ভিত্তি বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। অথচ ক্যালডর মনে করেন যে লোকের ব্যয়েব পরিমাণ এবং উৎস হইতেছে তাহার কব দেওয়ার ক্ষমতা যাচাই করা যায়। আয়কর ফাঁকি দেওয়ার ঝোঁক সর্বত্রই দেখা যায়; আয়কর ফাঁকি দেওয়ার প্রধান উপায় হইতেছে বেশী খরচ করা। সুতরাং যদি ব্যয়কব আয়করের বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে গৃহীত না হইয়া সহযোগী ব্যবস্থা (complementary) হিসাবে গৃহীত হয়, তবে লোকেব কর ফাঁকি দেওয়া বন্ধ হইতে পারে। ক্যালডর মনে করেন যে আয়ের মধ্যে অনেক জিনিস ধরা হয় না, যেমন হঠাৎ কোন সুযোগে অর্থপ্রাপ্তি, অনিশ্চিতভাবে মাঝে মাঝে প্রাপ্ত আয় অথবা মূলধনী লাভ প্রভৃতি। এই অর্থপ্রাপ্তি লোকের কর প্রদানের ক্ষমতা বাড়াইয়া দেয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আয়-করের জন্য যখন আয়ের হিসাব সরকারের নিকট দাখিল করা হয়, তখন করদাতা এই অতিরিক্ত আয় সেই হিসাবের মধ্যে দেখান না বলিয়া সেই আয় কর হইতে মুক্ত থাকে। ব্যয়করের এই ত্রুটি নাই। যে কোন সূত্রেই লোকের আয় হোক না কেন, ব্যয় হইলেই তাহা করের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

দ্বিতীয়ত, ন্যায়পরতার দিক হইতে চিন্তা করিলেও ক্যালডরের মতে আয়কর

ন্যায়পরতার দিক হইতে আয়কর ও ব্যয়করের তুলনা

অপেক্ষা ব্যয়কর অধিকতর উপযোগী। বিভিন্ন ব্যক্তির আয় সমান হইলেও ব্যয় সমান হয় না। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনযাত্রার মানও তাহাদের মোট ব্যয়ের পরিমাণ দ্বারাই সূচিত হয়। সুতরাং ন্যায়পরতার দিক হইতে চিন্তা করিলে আয় অপেক্ষা ব্যয়ই করের ভিত্তি হিসাবে অধিকতর উপযোগী।

তৃতীয়ত, ক্যালডর মনে করেন যে মূলধন-সৃষ্টির জন্য যে পরিমাণে সঞ্চয় বৃদ্ধিব প্রয়োজন তাহা করিতে হইলে আয়কর অপেক্ষা ব্যয়কর অধিকতর উপযোগী। তাহা ছাড়া, বিনিয়োগ ও কর্মোদ্যোগের (incentives) উপর করের প্রভাব বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে আয়কবের প্রভাব ব্যয়করের প্রভাব অপেক্ষা বেশী মারাত্মক। ক্যালডর মনে করেন যে আয়কর বিনিয়োগকারীকে ঝুঁকিবহুল বিনিয়োগে (risky investment) মূলধন নিযুক্ত কবিতে উৎসাহিত করে না।

কিন্তু ব্যয়করের এমন কতিপয় ত্রুটি আছে যেগুলি আয়করে দেখিতে পাওয়া

যায় না। প্রথমত, ব্যয়কর পক্ষপাতদুষ্ট। যাঁহারা ব্যয়সংকোচন করিয়া অর্থ জমান তাঁহাদের উপর ব্যয়কর ধার্য করা হয় না ; অথচ ইহাতে আয়-বৈষম্য কোন কোন ক্ষেত্রে বাড়িয়া যায়। সঞ্চয়ী এবং কৃপণ ধনীদের ইহাতে সুবিধা হয়। আয়করের ক্ষেত্রে ইহা হয় না। দ্বিতীয়ত, ব্যয়সায়ে যখন মন্দা থাকে ও দেশে বেকার অবস্থা তীব্র আকার ধারণ করে, তখন ব্যয়করের প্রভাব সংকোচনশীল (deflationary) হইয়া থাকে। সর্বশেষে, করদাতার নিকট হইতে ব্যয়কর আদায় করা আয়করের তুলনায় বেশী অসুবিধাজনক। সুতরাং আয়করের বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে যে ব্যয়কর খুব ভাল তাহা নহে ; বরং সুষ্ঠুভাবে সরকারের করনীতি অনুসরণ করিতে হইলে আয়কর ও ব্যয়কর একই সঙ্গে ধার্য করা উচিত।

মৃত্যু-কর (Death Duties) : কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি হস্তান্তরিত করিবার সময় মৃত্যুকর ধার্য করা হয়। মৃত্যুকর সাধারণতঃ দুই প্রকারের—(ক) উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত হইবার পূর্বে যে কর ধার্য করা হয় তাহার নাম সম্পত্তি-কর (estate duty) ; (খ) আসল অথবা মূল সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যেবণ্টিত হইবার পর উত্তরাধিকারীরা যে বণ্টিত অংশ পাইল, সেই অংশকে ভিত্তি করিয়া যে-কর ধার্য করা হয়, তাহাই উত্তরাধিকার কর (inheritance tax or succession duty) নামে পরিচিত।

মৃত্যুকরের পক্ষে যুক্তি : অন্যান্য সকল করের ন্যায় মৃত্যুকরও রাজস্বের প্রয়োজনে প্রথমে বসান হয়। পরবর্তীকালে অর্থবিজ্ঞানী এবং রাজনীতিজ্ঞগণ এই করকে সাধারণের গ্রহণ করিবার পক্ষে কয়েকটি যুক্তি দিয়াছেন। এই করের পক্ষে প্রথমে যে নীতি দেখান হয় তাহা হইল উপকারিতা তত্ত্ব (benefit theory)। রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনের বিধান অনুযায়ী কোন ব্যক্তি তাহার মৃত্যুর পূর্বে ইচ্ছামত সম্পত্তি বণ্টন করিয়া যাইতে পারে। যদি এই আইন না থাকিত তবে রাষ্ট্রে বিশৃংখলা দেখা দিত। রাষ্ট্র এই উত্তরাধিকার ব্যবস্থা সম্ভব করিয়াছে। সুতরাং ইহা স্বাভাবিক যে মৃতের সম্পত্তির একটি অংশ রাষ্ট্র দাবি করিবে। বলিতে গেলে মৃত্যুকর এক ধরণের ফি (fee)। কারণ মৃত্যুর পর মৃতের যে উইল কার্যকর হইবে একমাত্র রাষ্ট্রই তাহা কার্যকর করিতে পারে এবং সেই হিসাবে রাষ্ট্র এই ফি দাবি করিতে পারে। এই নীতির দ্বারা মৃত্যুকর হিসাবে রাষ্ট্র যে বিরাট সম্পত্তির অংশ দাবি করে তাহা ন্যায় সঙ্গত হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। ঠিক মৃত্যুকর না বলিয়া ইহাকে "প্রবেট-ফি"ই (probate fees) বলা যাইতে পারে। আরও দুইটি নীতিকে মৃত্যুকরের পক্ষে দেখান হইয়া থাকে : (১) Theory of State Partnership এবং (২) Back-tax Theory। প্রথমোক্ত নীতিতে বলা হয় যে সব সম্পত্তির সৃষ্টির মূলে রাষ্ট্রই একজন নীরব এবং নিষ্ক্রিয় অংশীদার। সুতরাং ইহার একটি অংশ পাইবার সে অধিকারী। এই নীতি অবাস্তব এবং অত্যন্ত ব্যাপক। যে কোন করের ক্ষেত্রেই এই যুক্তি প্রযোজ্য। দ্বিতীয় নীতি অনুযায়ী মৃত ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় রাষ্ট্রকে ফাঁকি দিয়া সম্পত্তি করিয়াছে। তাহার প্রদেয় কর সে রাষ্ট্রকে দেয়

নাই। সুতরাং মৃতের সম্পত্তি হইতে কর আদায় করা দরকার ; যে সকল ব্যক্তি কিছু সম্পত্তি অর্জন করিয়াছে তাহাদের সকলের ক্ষেত্রে এইরূপ দোষারোপ করা উচিত নহে। তৃতীয় যুক্তি হইতেছে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় আয় এবং সম্পদের যে বৈষম্য আমরা দেখিতে পাই তাহা দূর করিবার জন্য মৃত্যুকর ধার্য করা উচিত। বর্তমানে Faculty Principle অনুসারে মৃত্যুকরকে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া ধরা হয়। ইহা দেখান হয় যে ন্যূনতম মূল্যের উর্দ্ধে যদি কেহ সম্পত্তির অধিকারী হয় তাহা হইলে তাহাব কর দিবার বিশেষ ক্ষমতা জন্মে। ইহা অন্যান্য করদানের ক্ষমতা হইতে ভিন্ন। সম্পত্তি যতই বৃদ্ধি পাইবে কর প্রদানের ক্ষমতা সঙ্গে সঙ্গে ততই বৃদ্ধি পাইবে। সুতবাং ক্রমবর্ধমান হারে কর স্থাপন নীতিটি মৃত্যুকরের ক্ষেত্রে আরোপ করা যাইতে পারে। এই সম্পত্তির মধ্যে যতই অপ্রত্যাশিত (windfall) মূল্য থাকিবে ততই ক্রমবর্ধমান হারে কর বাড়ানো যাইবে। উদাহরণস্বরূপ দেখান যায় যে, কোন একটি নির্দিষ্ট মূল্যের সম্পত্তি যদি কোন দূরাত্মীয় অপরিচিত ব্যক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার ক্ষেত্রে কর-হার অবশ্যই বাড়ানো উচিত। অপর পক্ষে যদি মৃতের বিধবা পত্নী বা পুত্র-কন্যাগণ এই সম্পত্তি পায় সে স্থানে দেয় করের হাব সংকুচিত করা উচিত। মৃত্যু-করকে দুই দিক হইতে প্রগতিশীল করা যাইতে পারে (ক) সম্পত্তির আয়তন বৃদ্ধির দিক হইতে এবং (খ) মৃত ব্যক্তির সহিত উত্তরাধিকারিদের সম্পর্ক নিকটবর্তী অথবা দূরবর্তী কিনা এই দিক হইতে।

সম্পত্তি কর এবং উত্তরাধিকার করের তুলনামূলক আলোচনা : প্রয়োগের দিক হইতে বিচার করিলে সম্পত্তি কর উত্তরাধিকার কর হইতে অনেক সুবিধাজনক। প্রথম করটি শুধু সম্পত্তির পরিমাণকে নির্দিষ্ট করিতে পারিলেই ধার্য করা যাইতে পারে ; কিন্তু দ্বিতীয় করটির ক্ষেত্রে সম্পত্তির অংশ ছাড়া আরও অনেক বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কর ধার্য করিতে হয়। উত্তরাধিকার করে ব্যক্তির কর-প্রদানের ক্ষমতার দিকে দৃষ্টি রাখা হয় ; কিন্তু সম্পত্তি করে কর-প্রদানের ক্ষমতার দিকটি দেখা সম্ভব হয় না। কোন একটি নির্দিষ্ট মূল্যের সম্পত্তি যদি একজন লাভ করে তাহা হইলে তাহার কর-প্রদান ক্ষমতা এবং ঐ সম্পত্তি যদি চাব-পাঁচ জনের মধ্যে ভাগ হইয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের কর প্রদানের ক্ষমতা কিছুতেই এক হইতে পারে না। কারণ ব্যক্তিই করভার বহন করে, সম্পত্তি কখনও করভার গ্রহণ করে না। সুতরাং উত্তরাধিকারীদের অংশের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কর ধার্য করা উচিত ; সম্পত্তিব পরিমাণ দেখিয়া কর ধার্য করা উচিত নয়। অধ্যাপক টেলর (Prof. Taylor) মনে করেন, উত্তরাধিকার করের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পত্তি কর হইতে যে বেশী তাহা শুধু কল্পিত। কোন ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় তাঁহার সম্পত্তি এমন ভাবে বণ্টিত করিতে পারেন যাহাতে কেহ বেশী অথবা কেহ কম অংশ পাইতে পারে। নিকট আত্মীয়দের কম অংশ দিলে, তাহাদের করভার কম হইবে এবং দূর আত্মীয়দের বেশী অংশ দিলে তাহাদের করভারের বেশী অংশ বহন করিতে হইবে।

বর্তমানে ধন পুনর্বণ্টনের দিক দিয়া মৃত্যুকরকে অনেকেই সমর্থন করেন। ধনতন্ত্রের

অন্যতম প্রধান দোষ হইতেছে ধন-বন্টনের বৈষম্য। বর্তমানের উত্তরাধিকার প্রথাই বহুলাংশে এই বৈষম্যের জন্য দায়ী। দেশের অধিকাংশ ধনসম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে জমা হয়। ধনসম্পদ শুধু আরও ধনসম্পদের সৃষ্টি করে, এবং ইহাতে দেশে অর্থ নৈতিক শক্তির অসম বণ্টন হয় এবং সমাজে ধনিকশ্রেণী এবং দরিদ্র শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। দেশের মধ্যে এইরূপ প্রথা একেবারেই অবাঞ্ছনীয়। ধনতন্ত্রের উগ্র বিরুদ্ধবাদীরা ব্যক্তিগত সম্পদ এবং এইরূপ উত্তরাধিকার ব্যবস্থাকে একেবারেই বিলুপ্ত করিতে চাহেন। কিন্তু মধ্যপন্থীরা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির পরিমাণ হ্রাস করিতে চাহেন। মৃত্যুকর এই হ্রাসের পক্ষে সরকারের হাতে একটি মূল্যবান অস্ত্র। এই দিক দিয়া কতকগুলি নির্দিষ্ট উপায়ও নির্ধারণ করা হইয়াছে। ইটালীর অর্থবিজ্ঞানী Rignano ক্রমান্বয়ে তিনজন উত্তরাধিকারের পর যাবতীয় সম্পত্তি বিলোপ করিবার পক্ষে এক পরিকল্পনা করিয়াছেন।

ধন পুনর্বণ্টনের স্বপক্ষে কেইন্‌সীয় অর্থবিজ্ঞান ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আলোচনা করে। ক্ল্যাসিক্যাল ধনবিজ্ঞানীরা ধনের পুনর্বণ্টন সমর্থন করেন আদর্শগত এবং নীতিগত কারণে; কিন্তু কেইন্‌সের মতানুরাগীরা অর্থ নৈতিক কারণেই ধনের পুনর্বণ্টন (Redistribution of wealth) সমর্থন করেন। পূর্বতন অর্থবিজ্ঞানীগণ স্বীকার করিতেন যে অর্থ নৈতিক উন্নতির জন্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন। সেইজন্য একদিক হইতে বিচার করিলে আয়-বৈষম্য থাকাও দরকার, কারণ ধনীরাই সঞ্চয় করিয়া থাকেন। কিন্তু কেইন্‌সীয় অর্থবিজ্ঞান এই যুক্তি গ্রহণ করে না, কেইন্‌সের মতে মন্দা এবং অর্থ নৈতিক দুর্দশার অন্যতম কারণ হইতেছে ধন-বন্টনের বৈষম্যের দরুণ ভোগ-সংকোচন। দেশের অর্থ-নৈতিক অবস্থা উন্নত করিতে হইলে ভোগ-ব্যয় বৃদ্ধি করিতে হইবে। ভোগ-ব্যয় বৃদ্ধি করিতে হইলে ধনীদিগের নিকট হইতে অর্থ লইয়া দরিদ্র দিগের মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে। কারণ ধনীদের প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা কম এবং দরিদ্রদের প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা বেশী। মৃত্যুকর ধনের পুনর্বণ্টন আনিবার পক্ষে একটি মূল্যবান কর। ইহার দ্বারা দেশের আয় এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা যায়।

মৃত্যুকরের বোঝা (Incidence of Death Duties): মৃত্যুকরের বোঝা কে বহন করে তাহা লইয়া অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। একদল এই মত পোষণ করেন যে মৃত ব্যক্তিই এই কর বহন করেন। অপর দল বলেন এই করের বোঝা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বহন করেন। তৃতীয়ত, এই মতবাদে দেখা যায় যে করের বোঝা মৃত ব্যক্তি বা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কেহই বহন করেন না, ইহা বহন করে সম্পত্তি নিজেই।

মৃত ব্যক্তি তাহার সম্পত্তি বণ্টনের একমাত্র অধিকারী। করের দ্বারা এই সম্পত্তি বণ্টন প্রবাহিত হয়। মৃত ব্যক্তি নিজেই করের বোঝা বহন করেন। মৃত্যুর পর কর প্রদান করিবার জন্য তিনি যদি কোন বীমা ব্যবস্থা অথবা কোন তহবিল সৃষ্টি করিয়া যান (যাহার ফলে কর দিবার কোন অসুবিধা হইবে না; ঐ বীমা বা তহবিল হইতে

কর দেওয়া যাইবে) তাহা হইলে কর-বোঝা মৃত ব্যক্তিকেই বহন করিতে হয়। কারণ এই বীমা বা তহবিল সৃষ্টি করিবার দরুণ তাহাকে বর্তমানের ভোগ এবং বিশ্রাম ত্যাগ করিতে হইয়াছে। মৃত্যুকরকে যদি অপেক্ষমান আয়করের একটি রূপ (as a kind of deferred income tax) বলিয়া মনে করা যায় তাহা হইলে মৃত্যুকরের বোঝা মৃত ব্যক্তির উপরই পড়িবে।

অপর পক্ষে দ্বিতীয় মতবাদটির সমর্থনে বলা যায় যে কর-বোঝা সম্পত্তির উত্তরাধিকারীই বহন করিয়া থাকে, মৃত ব্যক্তি নহে। কারণ জীবিত ব্যক্তিই কর দান করে। উপরন্তু করের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিগণের প্রাপ্ত অংশের পরিমাপের দিক হইতে, এবং কর-হার নির্ধারণের সময় তাহাদের অন্যান্য বহু বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কর-হার নির্ধারণ করা হয়।

করভারের সমস্যা সম্পর্কে কোন সমাধানে আসা সহজ নহে। একদিক হইতে দেখিতে গেলে করের বোঝা উত্তরাধিকারীর উপরেই পড়ে। কারণ মৃত ব্যক্তি কোন কর দিতে পারে না। কিন্তু মৃত ব্যক্তি যদি করের বোঝা চিন্তা করিয়া সত্যই কর প্রদান করিয়া জন্য একটি তহবিল সৃষ্টি করিয়া যান অথবা একটি বিরাট সম্পত্তি আলাদা করিয়া রাখেন তাহা হইতে কর দেওয়ার পরেও উত্তরাধিকারী একটি নির্দিষ্ট মূল্যের সম্পত্তি ভোগ করিতে পারেন। তাহা হইলে স্বভাবতঃই করের বোঝা তাঁহার উপরেই পড়িবে যদিও তিনি নিজের হাতে কর প্রদান করেন না। এইরূপ ব্যবস্থা করা না থাকিলে সম্পত্তির উত্তরাধিকারীই করের বোঝা বহন করিবে। এই বিতর্কের পরিণতি হিসাবে মৃত্যুকরের কর-বোঝা সম্পর্কে কোনরূপ সাধারণ সমাধান বাহির করা যায় না। কর-বোঝা মৃতের অথবা উত্তরাধিকারীর উপর অথবা অংশত মৃতের এবং অংশতঃ উত্তরাধিকারীর উপর থাকিতে পারে।

এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্য অপর ব্যক্তিগণ বলেন যে সম্পত্তিই কর-বোঝা বহন করে ; মৃতব্যক্তিও নহে অথবা উত্তরাধিকারিও নহে, কিন্তু ইহা সন্তোষজনক সমাধান নহে। কারণ করের হার সর্বদা সম্পত্তির পরিমাণের উপর নির্ভর করে না।

মৃত্যুকর এবং আয়করের তুলনামূলক আলোচনা (Comparison between Death Duty and Income Tax): দুইটি দিক হইতে মৃত্যুকর এবং আয়করের ফলাফল তুলনামূলকভাবে বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে :

(১) আয় এবং কর্মসংস্থানের উপর এবং (২) আয়-বণ্টনের উপর।

(১) আয় এবং কর্মসংস্থানের উপর প্রভাবের দিক হইতে বিচার করিলে মৃত্যুকর আয়কর অপেক্ষা অধিকতর সমর্থনযোগ্য। এই ক্ষেত্রে দুইটি বিশেষ বিষয় বিচার করিয়া দেখা উচিত। তাহা হইতেছে, মৃত্যুকর এবং আয়করের প্রভাব কিভাবে (ক) কর্ম এবং বিনিয়োগ ইচ্ছার উপর, এবং (খ) মূলধন গঠন করিবার জন্য সঞ্চয়ের যোগানের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ইহা ছাড়া, সম্পত্তির উপর মৃত্যুকরের বিশেষ একটি প্রভাব দেখা যায়।

কর্মোদ্যোগের (incentive to work) দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে মৃত্যুকর কাজের ইচ্ছার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। এই কর ব্যবসায় বা মূলধন বৃদ্ধির জন্য অধিক খরচের পথে পরিপন্থী নয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আয়করের প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আয়করেব প্রভাব এই ক্ষেত্রে নির্ভর করে (ক) আয়কর কাঠামোর উপর (খ) করদাতা কিভাবে কর্ম, বিশ্রাম এবং জীবন-যাত্রার মানের প্রতি দৃষ্টি দেয় তাহাব উপব, (গ) করেব ফলে আয়ের পবিবর্তন হইবার পরও সেই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে করদাতা তাহার কর্ম প্রচেষ্টা পবিবর্তনে কতদূব সক্ষম তাহার উপর এবং (ঘ) কর্মের পিছনে অর্থের কোন সম্পর্ক আছে কিনা তাহাব উপর। ইহা সাধারণতঃ স্বীকাব কবা যায় যে প্রান্তিক কর-হারের উপরে আয়কবের প্রভাব খুবই বেশী। সুতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচাব কবিলে কর্মোদ্যোগের উপর মৃত্যুকরের প্রভাব আয়কর হইতে অনেক কম। আয়কর প্রত্যক্ষভাবে এবং সর্বতোভাবে ব্যক্তির কর্ম প্রচেষ্টাকে প্রভাবিত কবে।

বিনিয়োগ ইচ্ছাব (incentive to invest) দিক হইতে বিচার করিলে মৃত্যুকর মুনাফার পরিমাণ হ্রাস করিতে পারে না যদি এই মুনাফা বিনিয়োগ হইতে আসে।

সঞ্চয়ের দিক দিয়া দেখিতে গেলে আয়কর এবং মৃত্যুকর উভয়ই সঞ্চয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে। দুইটি করই জাতীয় আয় হইতে সঞ্চিত সঞ্চয়ের পরিমাণ কমাইয়া দেয় (বিশেষতঃ সরকার যদি এই কর হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব মূলধন সংগঠনের জন্য ব্যয় না করিয়া গরীবদের আয় বৃদ্ধির জন্য ব্যয় করেন)।

আয়-বণ্টনের দিক হইতে চিন্তা করিলে ক্রমবর্ধনশীল মৃত্যুকব হইতে আয়করের প্রভাব অনেক বেশী। আয়করের সাহায্যে অতি সহজেই বড় লোকের উপব বেশী কর ধার্য কবা যায় এবং গরীবদের কর প্রদানের বোঝা হইতে অব্যাহতি দেওয়া যায়। মৃত্যুকরে আয় ও ধনের বৈষম্য আয়করের অনুপাতে কমানো যায় না।

কোন কোন সময় দেখান হয় যে মৃত্যুকর জাতীয় আয় হইতে সঞ্চয়ের পরিমাণ যেরূপ হ্রাস করিতে পারে, আয়কর সেইরূপ পারে না। কারণ মৃত্যুকর মূলধনের উপর, এবং আয়কর আয়ের উপর ধার্য কবা হইয়া থাকে। আবার যে আয়করেব দ্বারা আয় পুনর্বণ্টন করা হয় সেই আয়কর জাতীয় আয় হ্রাস করে। কারণ ধনী করদাতারা কর দিবার জন্য সঞ্চয় কমায় কিন্তু ভোগব্যয় কমায় না। মৃত্যুকর ক্রমবর্ধনশীল হইলে কম পরিমাণে কর্ম ও বিনিয়োগের ইচ্ছা কমায়, এবং আয়করের ন্যায় সঞ্চয় হ্রাস করে। যে সমাজে আয় এবং বৈষম্যের মূলে সুযোগের বৈষম্য থাকে সেই সমাজে ক্রমবর্ধনশীল মৃত্যুকর অবশ্যই এইরূপ বৈষম্য দূর কবিয়া থাকে।

এই যুক্তিগুলির সহিত প্রচলিত নীতিগত দিকটিও দেখান হয় যে ধনীরা কিরূপে সম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকেন। কেহ কেহ ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্তরাধিকার নীতিটির আমূল বিলোপ চাহিয়া থাকেন।

মূলধনী লাভ-লোকসানের সমস্যা (Problems of capital gains and losses): আয়করের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা হইতেছে মূলধনী লাভ-লোকসানের সমস্যা। মূলধনী লাভ (capital gains) অর্থে কম দামে মূলধন কিনিয়া অধিক দামে বিক্রয়ের দরুণ মূলধন হইতে যে আর্থিক লাভ হয় তাহা বুঝায়। মূলধন বিক্রয়ের ফলে যে ধরণের লাভ হয় তাহার সবটাই মূলধনী লাভের পর্যায়ে ফেলা যায় না। আমেরিকার আয়কর আইন মূলধনী লাভ লোকসানকে বিশেষভাবে কয়েকটি সম্পত্তির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছে। কোন ব্যক্তির চিরাচরিত উপায়ে আয়ের মধ্যে যে আয় পড়ে না, সেই আয় মূলধনী লাভ-লোকসানের মধ্যে গণ্য করা হয়। ইহা খুবই পরিষ্কার যে ব্যক্তি বিশেষের কর প্রদানের ক্ষমতা নির্ধারণে মূলধনী লাভ-লোকসানের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। লাভ হইলে কর প্রদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, এবং লোকসান কর-প্রদানের ক্ষমতা সংকুচিত করে। ক্যালডর মূলধনী লাভের উপর কর ধার্য করার পক্ষপাতী।

মূলধনী লাভের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। (১) মূলধনী লাভ দ্রুত পরিবর্তনশীল, (২) করভার হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মূলধনী লাভ দেখাইবার সুবিধা থাকে, (৩) উচ্চ আয়-স্তরের ব্যক্তিবর্গের মধ্যেই এই মূলধনী লাভ সীমাবদ্ধ।

বাণিজ্যচক্রে সমৃদ্ধির কালে মূলধনী লাভ ঘটে এবং অবনতির সময় লোকসান দেখা দেয়। যেহেতু ধনী ব্যক্তিরাই মূলধনের অধিকারী সেই হেতু মূলধনী লাভ ধনীদের মধ্যেই দেখা যায়। সুতরাং আয় ও ধনের বৈষম্য কমাইবার জন্য মূলধনী লাভের উপর কর ধার্য করা উচিত।

সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটি আমাদের মনে দেখা দেয় তাহা হইতেছে মূলধনী লাভটি লাভ কিনা? মূলধনী দ্রব্যের দাম বাড়িয়া যাইবার ফলে অথবা সুদের হারের পরিবর্তনের ফলে মূলধনী লাভ দেখা দেয়। কিন্তু ইহা অত্যন্ত অনিশ্চিত এবং পরিবর্তনশীল; সুতরাং ইহাকে আয় হিসাবে ধরা যায় না। অপর পক্ষে, মূলধনী লাভ অবশ্যই কর প্রদান করিবার ক্ষমতা নির্দেশ করে; কারণ ইহা নিছক কাগজ কলমে দেখানো লাভ নয়। ইহা প্রকৃতই মূলধনী দ্রব্য বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত লাভ। মূলধনী লাভের উপর কর বসানো যেমন যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ মূলধনী লোকসানের ক্ষেত্রেও কর তুলিয়া লওয়া যুক্তিযুক্ত। মূলধনী লাভের উপর কর সর্বদাই প্রগতিশীল হওয়া উচিত।

আরও একটি প্রশ্ন হইল, আয়করের হারের ন্যায় মূলধনী লাভের উপর করের হার একই পর্যায়েহইবে কিনা অথবা ইহার হার আয়কর হার হইতে বিভিন্ন হইবে কিনা। ইহা দেখানো হয় যে সাধারণ আয়করের হারে যদি মূলধনী লাভের উপর কর ধার্য হয় তাহা হইলে মূলধনের বাজারের কাজে বিঘ্ন দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ দেখানো হয়, যখন সিকিউরিটির মূল্য কমিতে থাকে, তখন তাহা বিক্রয় করিতে পারিলে মূলধনী লাভের

পরিবর্তে মূলধনী লোকসান দেখা যাইতে পারে। কিন্তু এই যুক্তিটি মূলধনী-লাভের সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ; একটি নির্দিষ্ট হারের বিরুদ্ধে এই যুক্তিটি প্রয়োগ করা যায় না। এই করের প্রধান গুণ হইতেছে, ইহা একটি প্রত্যক্ষ কর ; তাহা ছাড়া, এই করটি আয়করের ন্যায় নমনীয় বা স্থিতিস্থাপক।

মূলধনী লাভ-করের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি : আয়করের যা যা সুবিধা আছে, মূলধনী লাভের উপর কর ধার্য করিলেও সেই সুবিধাগুলি পাওয়া যায়। প্রথমত এই কর আয় এবং ধনের বৈষম্য কমাইয়া দিবার পক্ষে সহায়ক। ইহা একটি প্রগতিশীল কর। দ্বিতীয়ত, মুদ্রাস্ফীতির সময়ে এই কর বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর হয়। তৃতীয়ত, এই কর হইতে যে রাজস্ব পাওয়া যায় তাহা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থ-সংস্থানের কাজে লাগানো যায়। সর্বশেষে, মূলধনী লাভ করদাতার কর প্রদান করিবার ক্ষমতা সূচিত করে। সুতরাং ইহা করের ক্ষেত্রে ন্যায়ের সূত্র (Canon of Equity) অনুসরণ করে।

মূলধনী লাভের উপর কর ধার্য করার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি

এই করের বিপক্ষে যে যুক্তিগুলি দেওয়া হয় সেগুলি হইতেছে ; (১) মূলধনী লাভ সর্বদাই অনিশ্চিত এবং পরিবর্তনশীল হওয়ায় ইহা হইতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব না-ও পাওয়া যাইতে পারে। ইহা আয়করের মত কখনই নিশ্চিত নহে। (২) মূলধনী লাভের উপর ধার্য করের হার খুব বেশী হইলে ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগ স্পৃহা বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে। মূলধনী লাভের উপর করের হার এমন ভাবে বাড়ানো উচিত নয়, যাহাতে বিনিয়োগ বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে। শাসনগত দিক হইতে এই করটি খুবই জটিল।

কর হইতে মূলধনী লোকসান বাদ দেওয়া উচিত কিনা : এক বছরের লোকসান অন্য বছরের লাভ হইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে। শুধু নীট মূলধনী লাভের উপরই কর ধার্য করা উচিত। স্বেচ্ছাকৃত কর ফাঁকির কথা ছাড়িয়া দিলেও বাণিজ্যচক্রের অবনতির সময় সরকার বহু পরিমাণে রাজস্ব হারাইতে পারেন ; কারণ তখন মূলধনী লোকসান দেখা দেয়।

মন্দার সময় আয়কর হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব সাধারণতঃ কমিয়া যায়। সেই সময় যদি লোকসানকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয় তাহা হইলে সরকারের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার পরিকল্পনায় বিরাট সমস্যা দেখা দিবে। এইরূপ সময় যে সব ধনী ব্যক্তিগণ মূলধনের মালিক, যাহাদের কর দিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহারা যদি সম্পূর্ণ মূলধনী লোকসানের সুযোগ-সুবিধা পান তাহা হইলে এই অবস্থা আরও অসহনীয় হইয়া থাকে। এই দিক হইতে বিচার করিলে মূলধনী লোকসান সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করার ব্যাপারটি জটিল হইয়া পড়ে।

এই সকল কারণের জন্য অধিকাংশ সরকারই প্রাপ্ত মূলধনী লাভের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া লোকসান বাদ দিয়া থাকেন। ন্যায়-নীতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে এইরূপ

সরকারী নীতি খুব গ্রহণযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু শাসনগত সুবিধার জন্য ইহা গ্রহণীয়।

যদি স্বল্পকালীন এবং দীর্ঘকালীন লাভ-লোকসানের মধ্যে পার্থক্য করা যায় তাহা হইলে মূলধনী-লাভের উপর কর ধার্যের হার সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান হইতে পারে। আমেরিকায় দীর্ঘকালীন লাভ-লোকসানের প্রতি সন্তোষজনক দৃষ্টি দেওয়া হইয়া থাকে। স্বল্পকালীন লাভ-লোকসানের প্রতি কঠোর দৃষ্টি দিবার কারণ হইল এই যে এই অবস্থার সৃষ্টির জন্য ফাটকা কারবারীদের মনোভাবই দায়ী এবং তাহারা খুশীমত কর ফাঁকি দিতে পারে। দীর্ঘকালীন লাভকে আয় হিসাবে ধরিয়া উচ্চহারে কর বসানো যাইতে পারে।

বিক্রয় কর (Sales Tax) : বর্তমানকালে সভ্যদেশের করকাঠামোয় যে সব অপ্রত্যক্ষ কর দেখা যায় বিক্রয় কর তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন জিনিসের বিক্রয় অথবা ক্রয়ের উপর যে সব কর আরোপ করা হয় তাহাই বিক্রয় কর বলিয়া পরিচিত। ক্রয় বা বিক্রয়ের পরিমাণই এই করের ভিত্তি। বিক্রয় করের তিনটি প্রকার ভেদ আছে। (১) নির্বাচিত বিক্রয় কর (Selective Sales Tax); (২) খুচরা বিক্রয় কর (Retail Sales Tax) ; (৩) সাধারণ বিক্রয় কর (General Sales Tax)। বিভিন্ন জিনিসের বিক্রয়ের উপর এই কর ধার্য হইলেও এই কর আদায় করা হয় ক্রেতাদের নিকট হইতে। সকল-প্রকার বিক্রয় হইতে যে কর আদায় করা হয় তাহা সাধারণ বিক্রয় কর বলিয়া পরিচিত। খুচরা বিক্রয়ের উপর যে কর ধার্য করা হয় তাহা খুচরা বিক্রয় কর বলিয়া পরিচিত। নির্বাচিত বিক্রয় কর কতকগুলি নির্বাচিত জিনিসের উপর হইতে লওয়া হয়, যেমন, তামাক, পেট্রোল অথবা মদ।

ইহা সাধারণতঃ ধরা হয় যে বিক্রয় কর ক্রয়মূল্যের সহিত গ্রহণ করা হয়। এই করের দরুণ বিক্রেতার খরচ বৃদ্ধি পায়। বিক্রয়ের পরিমাণ কমাইবার জন্য যদি বিক্রয় কর ধার্য করা হয়, তবে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যায়। ইহার অর্থ হইতেছে যে বিক্রয় করের সম্পূর্ণ অংশ ক্রয়মূল্যের সহিত ধরা হয়। কিন্তু বিক্রয় করের কর-বোঝা কতটুকু চালান যায় তাহা নির্ভর করে কোন জিনিসের চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার (Elasticities of Demand and Supply) উপর। যদি জিনিসটির মূল্য সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে করের বোঝা সম্পূর্ণরূপে ক্রেতাদের উপর চালান যায়। অপর পক্ষে জিনিসের চাহিদা যদি সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে ক্রেতারা করের বোঝা একেবারেই বহন করিবে না। বিক্রেতাকে করের বোঝা সম্পূর্ণ বহন করিতে হইবে। চাহিদা যদি শূন্য স্থিতিস্থাপকতা (zero elasticity) এবং সীমাহীন স্থিতিস্থাপকতার (perfect elasticity) মধ্যে কোথাও থাকে, তাহা হইলে করবোঝা কিছুটা বিক্রেতা এবং কিছুটা ক্রেতা বহন করিবে। যদি চাহিদা আপেক্ষিকভাবে স্থিতিস্থাপক (relatively elastic) হয় তাহা হইলে মূল্য বৃদ্ধি পাইলে চাহিদা কমিবে ; ইহার ফলে

উৎপাদন কমিবে এবং উৎপাদন কমিলে খরচ কমিবে। বিক্রয় করের করবোঝা ক্রেতার উপর চাপাইয়া দেওয়া কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যদি কোন কর নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং এই সীমার বাহিরে যদি কর ধার্য করা হইয়াছে এইরূপ জিনিস কিনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে ক্রেতাদের উপর এই কর চালানো কিছুতেই যাইবে না।

বিক্রয় করের পক্ষে যুক্তিসমূহ (Arguments in favour of Sales Tax) : বিক্রয় করের পক্ষে বহু যুক্তি আছে। যেমন—(১) বিক্রয় করের ফলে একটি স্থায়ী রাজস্বের উৎস তৈয়ার হয়, (২) এই কর আদায়ের খরচ খুব কম ; (৩) ইহা সমগ্র কর-ব্যবস্থার ভারসাম্য (balance) বজায় রাখিবার পক্ষে সহায়ক ; (৪) ইহা বাণিজ্যচক্র বিরোধী ; (৫) ইহা ধার্য করিবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজস্ব আদায় করা যায়।

অধ্যাপক হ্যানসেনের (Prof. Hansen) মতে চরম উন্নতি এবং মন্দার সময় পরিপূরক কর হিসাবে বিক্রয় করকে ব্যবহার করা উচিত। বাণিজ্যচক্র বিরোধী ভূমিকায় বিক্রয় করের গুরুত্ব অনেক। চরম উন্নতির সময় উচ্চহার বিশিষ্ট বিক্রয় কর ভোগব্যয় কমাইয়া মুদ্রাস্ফীতির চাপ কিছু পরিমাণে প্রতিরোধ করিতে পারে। সেইরূপ ভাবে মন্দার সময় কম হারে বিক্রয় কর পূর্বের চরম উন্নতির অথবা মন্দার সময় সংগৃহীত কর-রাজস্ব দেশের মধ্যে ব্যয় করিলে ভোগ-ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। বাণিজ্যচক্র বিরোধী অস্ত্র হিসাবে বিক্রয় করকে ব্যবহার করা যাইতে পারে। যুদ্ধের সময় মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করিবার জন্য বিক্রয় কর আরোপ করা যায় এবং সেই ক্ষেত্রে বিক্রয় কর আংশিকভাবে কার্যকর হইতে পারে। যাহারা আয়ের সম্পূর্ণ অংশটাই ব্যয় করে এবং সঞ্চয়ের কোন চেষ্টা করে না, সেই সব ব্যক্তিদের উপর বিক্রয় কর বসাইয়া রাজস্ব আদায় করিয়া মূলধন গঠন করা যাইতে পারে। দেশে শুধু ধনীরাই করের বোঝা বহন করিবে আর দরিদ্রেরা কিছু দিবে না, তাহা হইতে পারে না। সুতরাং দরিদ্রদিগকে কর দিতে বাধ্য করিতে হইলে বিক্রয় কর স্থাপন করা রাষ্ট্রের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু, এই যুক্তিটি বর্তমানে গ্রহণযোগ্য নহে।

বিক্রয়করের বিপক্ষে যুক্তি (Arguments against Sales Tax) : ফিসক্যাল নীতির অস্ত্র হিসাবে বিক্রয় কর বাণিজ্যচক্র-বিরোধী রূপে কতদূর কার্যকর হইতে পারে সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। বাণিজ্যে চূড়ান্ত সমৃদ্ধির সময় সকল ব্যক্তিরই আয় সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায় না। এই সময় যদি বিক্রয় করের হার বাড়াইয়া অতিরিক্ত ভোগ কমানো হয় তাহা হইলে ইহা গরীবদের পক্ষে প্রতিকূল হইবে। এমন সময় ধনীদের লাভ খুব বেশী হয় এবং প্রধানতঃ তাহাদের কাজের ফলেই জিনিসপত্রের দাম পড়িয়া যায়। এই অবস্থা রোধ করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে আয়করের হার ক্রমবর্ধমান করা। বস্তুতঃ দীর্ঘকালীন নীতিতে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করিবার পক্ষে বিক্রয় করের স্থান খুব উচ্চে নয়। বিক্রয় কর ধার্য করিবার আশু ফল হইল মূল্য বৃদ্ধি, মূল্য হ্রাস নয়। যে উপায় দ্বারা মূল্য বৃদ্ধি হয় প্রাথমিক ভাবে তাহা কি করিয়া

মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিতে পারে, তাহা ঠিক পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। অধিকন্তু মূল্যবৃদ্ধির ফলে মজুরির হার বাড়িয়া পূর্বের বর্ধিত দাম আরও বাড়িবে এবং মুদ্রাস্ফীতির চাপ ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহার জন্য বিক্রয় করই দায়ী। টেলরের (Taylor) মতে দ্রব্যকর (Commodity Tax) চূড়ান্ত সমৃদ্ধির সময় মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে। ইহার দুইটি কারণ (১) ইহা জিনিসপত্রের দামের সহিত যুক্ত হয় এবং (২) ভবিষ্যতের দাম বাড়িবার জন্য ইহা উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির সম্ভাবনা বহন করে। এই সব দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে বাণিজ্যচক্র বিরোধী নীতি হিসাবে বিক্রয় কর অপেক্ষা আয়করের স্থান অনেক উচ্চে।

যুদ্ধের সময় মুদ্রাস্ফীতি রোধকল্পে বিক্রয় করের কার্যকারিতা খুব পরিষ্কার নয়। কোন কারণে যদি ভোগ কমাইতে হয় তাহা হইলে ন্যায় নীতির দিক হইতে দেখাইতে হইবে যে দেশের সর্বশ্রেণীর ব্যক্তিই যেন ক্ষতি স্বীকার করে। জিনিসপত্রের দাম বাড়াইয়া দিয়া বিক্রয় কর সমানুপাতিক হারে দরিদ্রের দুর্দশা বাড়াইয়া দেয়। বিক্রয়-করের ফলে হয়ত ভোগ-ব্যয় একেবারেই সংকুচিত হইবে না যদি ধনী ব্যক্তিগণ ব্যয় না কমাইয়া ব্যয়ের পরিমাণ আরও বাড়াইয়া দেন। এই সব ক্ষেত্রে মূল্য-রোধ (price control) এবং রেশনিং (rationing) কার্যকর পথ, ফিস্ক্যাল নীতি তখন বিশেষ কার্যকর হয় না।

উপসংহারে দেখান যাইতে পারে যে বিক্রয় করের বিরুদ্ধে যাহাই যুক্তি দেখানো হোক না কেন ইহা সর্বজন স্বীকৃত যে বিক্রয় কর দ্বারা রাষ্ট্র প্রচুর পরিমাণ রাজস্ব লাভ করিতে পারে; বর্তমানে কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রের আদর্শ অনুসরণ করিয়া প্রায় সকল সরকারকেই বহু প্রকার দায়িত্ব পালন করিতে হয়। এই দায়িত্ব পালন করিতে হইলে বিরাট অর্থের প্রয়োজন, এবং তাহা প্রত্যক্ষ কর হইতে পাওয়া যায় না। সুতরাং যদিও ইহা স্বীকৃত যে এই সকল কর আয় বণ্টনের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তবুও বিক্রয় করের যে সকল দোষগুলি বণ্টনের দিক হইতে দেখা যায় সরকারের উচিত সেই দোষ-গুলিকে যতদুর সম্ভব দূর করা। ঠিক কি ধরনের বিক্রয় কর বসান হইবে, তাহার উপর ইহার সার্থকতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। একবিন্দু কর (one point tax) সামগ্রিক কর (turnover) হইতে অনেকাংশে গ্রহণীয়, প্রত্যেকবার হাত বদলের সময়ই যদি এই কর বসান হয় তাহা হইলে দ্রব্যের মূল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে। এই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যদি খুচরা বিক্রয়ের সময় কর বসান হয় তাহা হইলে জটিলতার সৃষ্টি হইবে না। শাসনতান্ত্রিক সুবিধার দিক দিয়া একবিন্দু কর সাধারণ কর অপেক্ষা সুবিধাজনক। এমন কি খুচরা বিক্রয় কর ক্ষতিকারক হইতে পারে যদি বিশেষ বিশেষ জিনিস ইহা হইতে বাদ না দেওয়া হয়, এবং কর-হারে যদি বিশেষ ভাবে একতা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়। খাদ্যদ্রব্য এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিকে বিক্রয় করের হাত হইতে রক্ষা করা উচিত, এবং বিলাস সামগ্রীর উপর বর্ধিত হারে এই কর স্থাপন করা উচিত।

আয়কর এবং বিক্রয়করের মধ্যে তুলনা (Comparison between Income Tax and Sales Tax): আয়কর হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের তুলনায় বিক্রয় কর হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের স্থায়িত্ব অনেক বেশী। বিক্রয় করের ভিত্তি হইতেছে ভোগ এবং আয়করের ভিত্তি হইতেছে আয়। যদিও ভোগ নির্ভর করে আয়ের উপর, তথাপি কেইন্‌সীয় অর্থবিজ্ঞানে দেখানো হইয়াছে যে বাণিজ্যচক্রের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে আয় যত পরিবর্তনশীল হয় ভোগ তত পরিবর্তিত হয় না। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে আয়কর হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব অপেক্ষা বিক্রয়কর হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ বেশী স্থিতিশীল। এই আপেক্ষিক স্থিতিশীলতার আর একটি কারণ এই যে আয়করকে ধার্য করা হয় ক্রমবর্ধনশীল হারে এবং বিক্রয়কর ধার্য করা হয় সমানুপাতিক হারে। দেশে মন্দা অবস্থায় ক্রমবর্ধনশীল আয়কর হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব কমিয়া যায় কারণ তখন লোকের আয়ই কমিয়া যায়। কিন্তু সমানুপাতিক বিক্রয় কর হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব তত কমিয়া যায় না। একটি করকে রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতার দিক দিয়া যদি বিচার করা হয় তাহা হইলে বিক্রয়করের স্থান আয়কর হইতে অনেক উচ্চে।

আয়করের সহিত বিক্রয়করের তুলনা

কোন কোন সময়ে বিক্রয় কর আদায়ের খরচ কম, এই দিক দিয়া বিক্রয় কর ধার্যের পক্ষে যুক্তি দেখানো হয়। ইহা সুবিদিত যে বিক্রয় কর নিজে নিজেই সংগৃহীত হয়। আয়কর সংগ্রহের শাসনতান্ত্রিক খরচের সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে বিক্রয় কর সংগ্রহের শাসনতান্ত্রিক খরচ অনেক কম। অনুন্নত দেশের পক্ষে বিক্রয় কর খুবই কার্যকর হয়। দেশের সর্বত্র ক্রেতাদের নিকট হইতে কর রাজস্ব সংগ্রহ করে বিক্রেতারা এবং পরে সংগৃহীত রাজস্ব সরকারী তহবিলে সঞ্চিত হয়। এই সব দেশে আয়কর কর্মোদ্যোগ ও বিনিয়োগ স্পৃহাকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করে। কিন্তু বিক্রয়কর আয়করের সুবিধা দান করে অথচ কর্মোদ্যোগ বা বিনিয়োগ স্পৃহাকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করে না। অন্যান্য পরোক্ষ কর পক্ষপাতদুষ্ট (discriminatory), কিন্তু বিক্রয় করের ক্ষেত্রে এই দোষ নাই। দেশে এমন বহু ব্যক্তি আছে যাহারা কর ফাঁকি দেয় কিন্তু বিক্রয় কর তাহাদেরই ব্যয়ের উপর হইতে সংগ্রহ করা হয়।

আয়করের বোঝা ক্রমবর্ধমান, কিন্তু বিক্রয় করের বোঝা ক্রমহ্রাসমান (regressive) কর কাঠামোয় এই দুই ধরণের কর পাশাপাশি থাকার দরুণ দেশের কর ব্যবস্থায় সাম্য (balance) দেখা যায়।

সরকারী ব্যয় (Public Expenditure)

সরকারী ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Public Expenditures): সরকারী ব্যয়কে উৎপাদনমূলক (Productive) ব্যয় এবং অনুৎপাদনমূলক (Unproductive) ব্যয়, এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অথবা উৎপাদন, জাতীয় আয় এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য সরকার

যে, খরচ করিয়া থাকে তাহাকে উৎপাদনমূলক খরচ বলা হয়। অপরদিকে যে সরকারী ব্যয়ের ফলে জাতীয় উৎপাদন বাড়ে না তাহাকে অনুৎপাদনমূলক সরকারী ব্যয় বলা হয়। যুদ্ধের সময় যে সরকারী ব্যয় হয় তাহাকে অনুৎপাদনমূলক ব্যয় বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ডক্টর ড্যালটন (Dr. Dalton) সরকারী ব্যয়কে নিম্নলিখিত দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন : (১) বহিরাক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ গোলযোগ বা বিশৃঙ্খলার হাত হইতে দেশকে রক্ষার উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যয় এবং (২) সামাজিক জীবনের উৎকর্ষ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ, জনগণের জীবনকে অধিকতর উপভোগ্য করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যয়।

তৃতীয়ত, সরকারী ব্যয়কে দান বা অর্থ সাহায্য (Grants) এবং ক্রয়জনিত ব্যয় (Purchase prices) এই দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। দরিদ্রদের সাহায্য, বৃদ্ধদের অবসর ভাতা (Old-age Pension) এবং বিভিন্ন শিল্পকে অর্থসাহায্য, (Subsidies) দান বা অর্থসাহায্যের পর্যায়ে পড়ে। অপরপক্ষে বিভিন্ন লোকের কাজ বা সেবা গ্রহণ করিবার বিনিময়ে সরকারকে যে টাকা খরচ করিতে হয় তাহাকে ক্রয়-জনিত ব্যয় বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ সেনাবাহিনী বিচারক প্রভৃতির মাহিনার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

চতুর্থত, অধ্যাপক পিগুর মতে (Prof. Pigou) আসল ব্যয় (Real Expenditure) এবং হস্তান্তর-ব্যয় (Transfer Expenditure) এই দুই ভাগেও সরকারী ব্যয়কে বিভক্ত করা হয়। যে সরকারী ব্যয়ের সাহায্যে সমাজের বিভিন্ন সম্পদ এবং উৎপাদনের উপাদানসমূহের ব্যবহার করা হয়, তাহাকে আসল ব্যয় বলা হয়। যুদ্ধ, জিনিসপত্রের উৎপাদন প্রভৃতি খাতে যে ব্যয় হয় তাহাকে আসল ব্যয় বলা যাইতে পারে। অপরপক্ষে যে সকল ব্যয়ের ফলে সামাজিক সম্পদ হস্তান্তরিত হয়, তাহাদের হস্তান্তর ব্যয় বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ আভ্যন্তরীণ সরকারী ঋণ-পরিশোধ বা সুদ-প্রদান হস্তান্তর-ব্যয়ের পর্যায়ে পড়ে।

সর্বশেষে, প্লেহ্‌নের (Plehn) মতে জনসাধারণের পক্ষে সরকারী ব্যয় কতটা কল্যাণকর সেই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিলে ইহাকে চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—(১) *যে সকল সরকারী ব্যয় সকল নাগরিকদের পক্ষে সমান কল্যাণকর, যেমন, পুলিশ, সেনাবাহিনী, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সর্বজনীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতি ; (২) যাহা কোন কোন শ্রেণীর পক্ষে বিশেষ ধরনের কল্যাণকারক; কিন্তু সামগ্রিকভাবেও ইহাকে* কল্যাণকর বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে, যেমন, সামাজিক নিরাপত্তা জনিত (Social Security) সরকারী ব্যয় ; (৩) যাহা কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপকারী এবং সকলের পক্ষেই সাধারণভাবে কল্যাণকর যেমন, বিচার বিভাগের জন্য সরকারী ব্যয় ; এবং (৪) যাহা কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর, যেমন সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরিতে নিযুক্ত অথবা সরকারী শিল্পে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য ব্যয়।

সাম্প্রতিককালে সরকারী ব্যয়-বৃদ্ধির কারণ (Causes of increasing Government Expenditure in recent times) : ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানী-গণের অনেকেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাস করিতেন এবং মনে করিতেন যে সরকারী ব্যয় সর্বদাই অনুৎপাদনমূলক (unproductive)। এজন্য তাঁহারা সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ যতদূর সম্ভব কমাইবার সুপারিশ করিতেন। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রভাব বেশীদিন অর্থনৈতিক নীতিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারে নাই। পূর্বে মনে করা হইত, সরকারী বাজেট্‌কে যতদূর সম্ভব ছোট করা উচিত ; কিন্তু বর্তমান ধারণা হইতেছে, প্রয়োজন অনুযায়ী বাজেটকে বড় করিতে হইবে এবং দরকার হইলে বাজেটে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া ঘাট্‌তিরও সৃষ্টি করা যাইতে পারে। বর্তমানে যে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ সব দেশেই বাড়িয়া যাইতেছে তাহার কারণগুলি নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

(১) পরিকল্পনাবিহীন অর্থনীতিতে খুব কম রাষ্ট্রই বর্তমানে বিশ্বাস স্থাপন করে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই সরকারী ব্যয়ের পরিমাণও বাড়িয়া যাইতেছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সমগ্র দায়িত্ব সরকারকেই গ্রহণ করিতে হয়। সেজন্য পরিকল্পিতভাবে শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিনিয়োগ-ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে।

(২) মানুষের জীবনযাত্রা ক্রমেই জটিল হইয়া পড়িতেছে। কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রে (welfare state) মানুষের সর্বনিম্ন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং সামাজিক নিরাপত্তার দায়িত্ব সরকারকেই গ্রহণ করিতে হয়। সেজন্য সরকারী ব্যয়ের পরিমাণও ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে।

(৩) প্রতিরক্ষা জনিত ব্যয়-বৃদ্ধির পরিমাণও বর্তমানযুগে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এবং বিশেষতঃ, আণবিক শক্তি লইয়া নানা প্রকার গবেষণা সফল হইবার পর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে "ঠাণ্ডা লড়াইয়ের" (cold war) অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে। রাজনৈতিক চাপে সবদেশকেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে অধিক পরিমাণে খরচ করিতে হয়। ইহাও সরকারী ব্যয়বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

(৪) শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, শিল্প-গবেষণা, সমাজ কল্যাণ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে—ইহাও সরকারী ব্যয় বাড়িয়া যাইবার অন্যতম কারণ। বাণিজ্যচক্রের প্রতিক্রিয়া হইতেছে ব্যবসায়ে মন্দা। ধনতান্ত্রিক সমাজে ব্যবসায়িক বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় এবং মন্দা প্রায়ই দেখা যায়। এই অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সরকারকে প্রয়োজন বোধে ক্ষতিপূরণমূলক আয়-ব্যয় নীতি (Compensatory Fiscal Policy) অনুসরণ করিতে হয়। ইহার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে।

সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী ঋণের পরিমাণও

বাড়িয়া যাইতেছে। কারণ অতিরিক্ত পরিমাণ সরকারী ব্যয়ের আর্থিক সংস্থান ঋণের মাধ্যমেই করিতে হয়।

সরকারী ব্যয় ও জাতীয় আয় (Public Expenditure and National Income) : পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সরকারী ব্যয় জাতীয় আয়কে প্রভাবিত করে। সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়া জাতীয় আয় বাড়ানো যায়। কিন্তু ইহা কিভাবে সম্ভবপর হয় তাহা জানিতে হইলে আমাদের প্রথমেই জানিতে হইবে জাতীয় আয় বলিতে কি বুঝায়। জাতীয় আয় হইতেছে একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণতঃ এক বৎসরে) দেশে সম্পূর্ণ উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীর (Final Products) মূল্যের সমান। একটি নির্দিষ্ট সময়ে সামগ্রিক আয় সামগ্রিক ব্যয়ের সমান। সামগ্রিক ব্যয়কে পুনরায় ভোগজনিত ব্যয় (C) এবং বিনিয়োগজনিত ব্যয় (I), এই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। লর্ড কেইন্‌সের সংজ্ঞানুযায়ী $Y=C+I$. এখানে Y হইতেছে জাতীয় আয়। কিন্তু, একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে জাতীয় আয়ের আরও একটি উপাদান আছে তাহা হইতেছে সরকারী ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় (G)। সুতরাং আমরা বলিতে পারি $Y=C+I+G$.

এখন দেখা যাক্, সরকারী ব্যয় কিভাবে জাতীয় আয়কে প্রভাবিত করে। সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়া গেলে সামগ্রিকভাবে জনসাধারণের ভোগের প্রবণতা (Propensity to consume) বাড়িয়া যায়। ইহাতে 'মাল্টিপ্লায়ার প্রভাব' কার্যকর হয়। জনসাধারণের ভোগের প্রবণতা বাড়িয়া গেলেই বিনিয়োগকারীগণ অধিক বিনিয়োগ করিতে উৎসাহী হয়। বিনিয়োগের প্রবণতা বাড়িয়া গেলে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। নিম্নে প্রদত্ত ১০৫ নং চিত্রে ইহা দেখানো হইয়াছে :
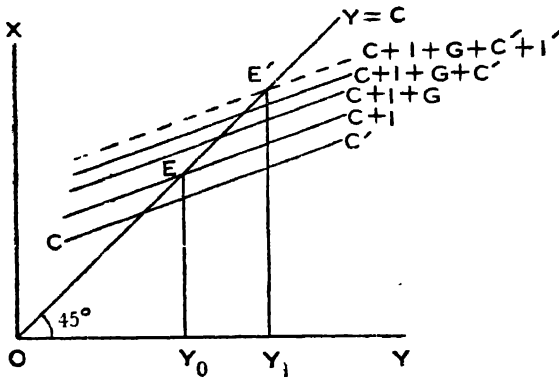
চিত্র নং—১০৫

এই চিত্রে O বিন্দুতে একটি ৪৫° ডিগ্রীর কোণ অঙ্কিত হইয়াছে ; ৪৫° ডিগ্রীর যে রেখাটি টানা হইয়াছে তাহাতে বুঝান হইয়াছে যে সমুদয় আয়ই খরচ হইয়া যাইতেছে,

অর্থাৎ, সঞ্চয় কিছুই নাই। C রেখাটি বুঝাইতেছে ভোগপ্রবণতা এবং 'C+I' রেখাটি বুঝাইতেছে ভোগজনিত ব্যয় এবং বিনিয়োগ জনিত ব্যয়ের সমষ্টি। এই চিত্রে E বিন্দুতে জাতীয় আয়ের ভারসাম্য অর্জিত হইয়াছে এবং OY_0 হইতেছে ভারসাম্য পর্যায়ের জাতীয় আয়। C+I+G রেখা এবং C+I রেখার মধ্যে যে ব্যবধান তাহা সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ সূচিত করিতেছে। এই সরকারী ব্যয়ের ফলে ভোগের প্রবণতা আরও বাড়িয়া গিয়াছে, এবং তাহা সূচিত হইতেছে C+I+G রেখা এবং C+I+G+C′ রেখার ব্যবধানের দ্বারা। ভোগের প্রবণতা বাড়িয়া যাইবার ফলে মাল্টিপ্লায়ার কার্যকর হইতেছে এবং ইহাতে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়া যাইতেছে ; তাহা সূচিত হইতেছে C+I+G+C′ রেখা এবং C+I+G+I′ রেখার ব্যবধানের দ্বারা। E′ বিন্দুতে বর্ধিত আয়ের ভারসাম্য অর্জিত হইয়াছে এবং জাতীয় আয় OY_1 পর্যন্ত বাড়িয়াছে। C+I রেখা এবং C+I+G রেখার মধ্যে যে ব্যবধান সেই পরিমাণ সরকারী ব্যয়ের ফলে জাতীয় আয় OY_0 হইতে OY_1 পর্যন্ত বাড়িয়াছে। এইভাবে সরকারী ব্যয় বাড়িলে যে জাতীয় আয় বাড়ে ইহাকে ব্যয়ের সম্প্রসারণশীল প্রভাব (expansionist effect) বলা যাইতে পারে।

সরকার তাহার ব্যয় বাড়াইবার জন্য টাকা সংগ্রহ করেন তিনটি উৎস হইতে,—যথা, (১) চলতি আয়, (২) সঞ্চিত অর্থ এবং (৩) নূতন টাকার সৃষ্টি। যদি সরকার চলতি আয়ের উপর কর ধার্য করিয়া সেই রাজস্ব ব্যয় করে তবে জাতীয় আয় বাড়িবে কিনা তাহা নির্ভর করে করদাতারা সেই টাকা লইয়া কি করিত তাহার উপর। যদি এই কর আরোপের ফলে করদাতাদের সামগ্রিক ভোগজনিত ব্যয় এবং বিনিয়োগজনিত ব্যয় কমিয়া যায়, তবে জাতীয় আয় পূর্বাপেক্ষা আর বাড়িবে না। ঋণের সাহায্যে সরকারের অর্থ সংগ্রহ করিবার ফলও যদি অনুরূপ হয়, তখনও একই কারণে জাতীয় আয় পূর্বাপেক্ষা বাড়িবে না। কিন্তু, জাতীয় আয়ের যে অংশ সরকারের পূর্বেই সঞ্চিত ছিল, সরকার যদি তাহা তুলিয়া লইয়া খরচ করেন, তবে জাতীয় আয় বাড়িবে। সর্বশেষে, সরকার যদি নূতন টাকা সৃষ্টি করিয়া অথবা বাজেটে ঘাটতি অর্থসংস্থান করিয়া ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ায়, তবে অন্যান্য অবস্থার পরিবর্তন না ঘটিলে জাতীয় আয় নিশ্চয়ই বাড়িবে।

সরকারী ব্যয়ের অর্থসংস্থান

ঘাট্‌তি অর্থসংস্থান (Deficit Financing) : আধুনিককালে যে কোন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মসূচীর মধ্যে ঘাট্‌তি অর্থসংস্থানের (Deficit Financing) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। কিন্তু, পূর্বেকার অর্থবিজ্ঞানীগণ ঘাট্‌তি অর্থসংস্থানের নীতি সমর্থন করিতেন না। যখন বাজেটে আয় হইতে খরচের পরিমাণ বেশী হয়, তখন ইহাকে ঘাট্‌তি বাজেট (Deficit budget) বলা হয়। এই ঘাট্‌তি দূর করার জন্য যে অর্থসংস্থান করা হয়. তাহাকেই বলা হয় ঘাট্‌তি অর্থসংস্থান (Deficit-Financing)। এই ঘাট্‌তি দূর করার জন্য সরকার সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যমূলক ব্যাংক, অথবা জনসাধারণ এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ঋণ

গ্রহণ করিয়া থাকেন। যখন সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে টাকা ধার করেন, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই ধারের বিপক্ষে নূতন টাকা ছাপায়। সুতরাং ঘাট্‌তি অর্থ-সংস্থানের জন্য যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতে সরকার ঋণ গ্রহণ করে তবে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু, নূতন টাকা ছাপা হইলেই যে মুদ্রাস্ফীতি হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। নূতন টাকা ছাপা হইলে লোকের ক্রয়শক্তি এবং সক্রিয় চাহিদা (effective demand) বাড়িয়া যায়। যে পরিমাণে চাহিদা বাড়িবে সেই পরিমাণে যদি জিনিসপত্রের যোগান বাড়ে, তবে মুদ্রাস্ফীতি হয় না। অপরপক্ষে যদি লোকের ক্রয়শক্তি ও চাহিদা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্রের যোগান না বাড়ে, তবে দেশে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যায় ও মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়। সুতরাং যদি দেশে মূলধনের স্বল্পতা, শ্রমিকদের কর্মদক্ষতার অভাব, অর্থ নৈতিক উন্নতির পথে এই জাতীয় প্রতিবন্ধক (bottlenecks) থাকে, তবে প্রয়োজনমত যোগান বাড়ানো যায় না। এবং ঘাট্‌তি অর্থসংস্থানের ফলে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়। যদি সরকার বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির নিকট হইতে টাকা ধার করেন তবেও কিছু পরিমাণে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হইবে। কিন্তু যদি সরকার জনসাধারণের নিকট হইতে টাকা ধার করেন তবে তাহা বিশেষ মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করে না।

কিন্তু, উন্নত দেশগুলিতে ঘাট্‌তি অর্থসংস্থানের পক্ষে অন্য একটি যুক্তির অবতারণা করা যায়। ঘাট্‌তি অর্থসংস্থানের ফলে উন্নত দেশে যে নূতন সক্রিয় চাহিদার সৃষ্টি হয় তাহা দেশের উৎপাদন এবং আয় বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়। দেশের উৎপাদন এবং আয় বাড়িলে কর্মসংস্থানেরও সম্প্রসারণ হয়। মূলধনের স্বল্পতা, শ্রমিকদের কর্মদক্ষতার অভাব, প্রভৃতি প্রতিবন্ধক উন্নত দেশগুলিতে দেখা যায় না। সুতরাং ঘাট্‌তি অর্থ সংস্থানের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যে মূল্যস্তর বৃদ্ধি—এই যুক্তি উন্নত দেশগুলির পক্ষে সর্বদা খাটে না।

সরকারী ব্যয়ের ফলাফল (Effects of Public Expenditure) : ডক্টর ড্যালটনের মতে উৎপাদনের উপর সরকারী ব্যয়ের প্রভাব তিনটি দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করা যাইতে পারে যথা, (১) কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতার (ability to work and save) উপর প্রভাব, (২) কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের ইচ্ছার (desire to work and save) উপর প্রভাব এবং (৩) অর্থ নৈতিক ও উপকরণসমূহ নিয়োগের দিক পরিবর্তন (diversion of economic resources) উপর প্রভাব। যে সকল সরকারী ব্যয়ের প্রভাবে জনসাধারণের উৎপাদনীশক্তি বাড়িয়া যায় (যেমন জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য ব্যয়) সেইগুলি লোকের কাজ করিবার উদ্যম বাড়াইবার পক্ষে সহায়ক হয়। কর্মোদ্যম বাড়িলে উৎপাদন বাড়ে; ইহাতে আয় বাড়ে এবং আয় বাড়িলে ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে। বেকার ভাতা, বৃদ্ধ বয়সে পেন্সন প্রভৃতি ব্যয় জনসাধারণের কর্মোদ্যম এবং সঞ্চয়ের স্পৃহা

উৎপাদনের উপর সরকারী ব্যয়ের প্রভাব

কমাইয়া দেয় বলিয়া ড্যাল্টন মনে করেন। অনেক ক্ষেত্রে দেশের অর্থনৈতিক সম্পদগুলি একত্রীকরণে অথবা সংহতিকরণে (mobilisation) সরকার একটি বিশেষ ভূমিকা অবলম্বন করে এবং ইহাতে অনেক সময় নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। সরকার কর্তৃক এই ধরণের অর্থ ব্যয়ের ফলে অর্থনৈতিক সম্পদ অথবা উপকরণগুলির নিয়োগের দিক পরিবর্তন হইয়া থাকে। অর্থনৈতিক সম্পদ অথবা উপকরণগুলির এইপ্রকার দিক পরিবর্তনের ফলে যদি সামগ্রিক ভাবে জাতীয় আয় অথবা উপকরণগুলির উৎপাদনীশক্তি বাড়িয়া যায়, তবে সরকারী ব্যয় সামগ্রিকভাবে কল্যাণকর বলিয়া বিবেচিত হয়।

সরকারী ব্যয়ের সাহায্যে সমাজে আয়ের বৈষম্য কমাইয়া ফেলা সম্ভবপর। সরকার যদি ধনী ব্যক্তিদের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া গরীবদের জন্য সেই অর্থ ব্যয় করে (যেমন, সরকারের হস্তান্তর ব্যয়) তবে সেই ব্যয়ের প্রভাবে সমাজে আয়-বৈষম্য অনেক কমিয়া যায়। ডক্টর ড্যাল্টনের মতে সরকারী ব্যয়ও প্রগতিশীল (Progressive) নীতির ভিত্তিতে হওয়া উচিত। যেমন, যে যত গরীব, সে সরকার হইতে তত বেশী আর্থিক সাহায্য পাইবে। সরকারী ব্যয়ের ফলে যদি আয়ের পুনর্বণ্টন হয় তবে ইহা সমাজের কতিপয় ক্ষেত্রে শুভকর হইতে পারে। যেমন গরীবদের আয় বাড়িলে তাহাদের ভোগের প্রবণতা বাড়ে এবং ইহা উৎপাদন পক্ষে বৃদ্ধির সহায়ক হয়। কিন্তু অপর দিকে আয়ের এই ধরণের পুনর্বণ্টন হইবার ফলে যদি ধনী ব্যক্তিদের কর্মোদ্যম এবং সঞ্চয়ের স্পৃহা কমিয়া যায় তবে ইহা সামগ্রিকভাবে সমাজের পক্ষে শুভকর নাও হইতে পারে।

বণ্টনের উপর সরকারী ব্যয়ের প্রভাব

যদি দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান না থাকে তবে সরকারী ব্যয়ের সাহায্যে আমরা দেশের অর্থনৈতিক সম্পদসমূহের সদ্ব্যবহার করিতে পারি। ইহাতে একদিকে যেমন উৎপাদন ও আয় বাড়ে, অপরদিকে সেইপ্রকার কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়ে। বাণিজ্যিক মন্দার সময়ে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইলে সংকট-মুক্তির অবস্থা সৃষ্টি করা যায়; ইহাতে উৎপাদন, আয় এবং কর্মসংস্থান কতটা বাড়িবে তাহা নির্ভর করে Multiplier effect এবং Acceleration Co-efficient-এর যৌথ কার্যকারিতার উপর। এই দুইটি প্রভাবের যৌথ কার্যকারিতার ফলে যখন জাতীয় আয় এবং কর্মসংস্থান বাড়ে তখন ইহাকে *Leverage effect* বলা হয়।

কর্মসংস্থান ও আয়ের উপর সরকারী ব্যয়ের প্রভাব

পূরণকারী ব্যয় (Compensatory Spending): যখন ব্যক্তিগত বা বেসরকারী ব্যয়ের পরিমাণ এবং সক্রিয় চাহিদার পরিমাণ কমিয়া যায়, তখন সরকারী ব্যয়ের দ্বারা যদি সেই চাহিদা এবং ব্যয়ের ফাঁক পূরণ করা হয়, তবে সেই সরকারী ব্যয়কে পূরণকারী ব্যয় (Compensatory Spending) বলা হয়। বাণিজ্যিক মন্দার সময়ে জনসাধারণের ভোগজনিত ব্যয় এবং বিনিয়োগজনিত ব্যয়ের পরিমাণ কম

থাকে এবং সাধারণভাবে সক্রিয় চাহিদার (effective demand) স্তরও তখন খুব নীচু থাকে। সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া বিশেষতঃ, সরকারী বিনিয়োগ নীতি (Public Works Policy) অনুসরণ করিয়া সমাজের সামগ্রিক ভোগজনিত এবং বিনিয়োগজনিত ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ানো হয়। ইহাতে জনসাধারণের চাহিদাও বাড়িয়া যায়। চাহিদা বাড়িলে উৎপাদন বাড়ে এবং অবশেষে আয় ও কর্মসংস্থান বাড়ে। উৎপাদন এবং আয় বাড়িয়া গেলে দেশের অর্থব্যবস্থা যখন ক্রমশঃ চূড়ান্ত সমৃদ্ধির কাছাকাছি আসে, তখন আবার সরকারী ব্যয় খুবই কমাইয়া দিতে হয়। চূড়ান্ত সমৃদ্ধির (boom) সময় সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ কমাইয়া সরকারের উদ্বৃত্ত বাজেট প্রস্তুত করিতে হয়।

বাণিজ্যিক সংকটের সময় সরকার যে পূরণমূলক ব্যয় করেন তাহা প্রধানতঃ ঘাটতি ব্যয় করা হইয়া থাকে। কারণ, সেই অবস্থায় অধিক কর ধার্য করা উচিত নয়, বরং করের হার আরও কমাইয়া দেওয়া উচিত অথবা কতিপয় কর তুলিয়া দেওয়া উচিত। সুতরাং প্রচলিত কর হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের সাহায্যে সরকারী ব্যয়ের অর্থসংস্থান করা সেই সময়ে সম্ভব নয়। সেইজন্য বাণিজ্যিক সংকটের সময় সরকারী বিনিয়োগ নীতিকে বিশেষভাবে ফলপ্রসূ করিতে হইলে সরকারকে ঘাটতি অর্থসংস্থানের সাহায্য লইতে হয়। বেসরকারী ক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে ব্যয়ের পরিমাণ যত বাড়িতে থাকে, সরকার নিজের ব্যয় তত কমাইতে থাকে। পূর্ণ নিয়োগের স্তরে পৌঁছিবার কিছু পূর্ব হইতেই সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ কমাইবার প্রয়োজন অনুভূত হয়।

সরকারের আয় ব্যয় নীতির বিভিন্ন উদ্দেশ্য (The Goals of Fiscal Policy):

সরকারের ফিসক্যাল নীতির উদ্দেশ্যগুলি শুধু অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্ধারিত হয় না; সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের মূল্য বা সার্থকতা বিচারের (value judgments) উপর ফিস্ক্যাল নীতির উদ্দেশ্যগুলি নির্ভর করে। এই বিষয়ে অর্থবিজ্ঞানীগণ একমত যে অধিকতর অর্থনৈতিক স্থিতিসাধন করা এবং বেকার সমস্যা না বাড়াইয়া অথবা জিনিসপত্রের দামের হ্রাসবৃদ্ধি না করাইয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি স্থায়ী মান নির্ধারণ করাই ফিস্ক্যাল নীতির উদ্দেশ্য। যদি উৎপাদন বৃদ্ধি অপেক্ষাও সামগ্রিক চাহিদা বেশী হয় তবে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয় এবং যদি উৎপাদন বৃদ্ধির হারের তুলনায় সামগ্রিক চাহিদা কমিয়া যায় তবে বেকার অবস্থা ও মন্দার সৃষ্টি হয়; এই উভয় ক্ষেত্রেই উন্নয়ন সর্বাধিক পর্যায়ে হয় না। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার অর্থ এই নয় যে দেশের সর্বক্ষেত্রেই স্থিতশীলতা বজায় থাকিবে; কারণ, যখন দেশে সাধারণভাবে স্থিতিশীলতা বজায় থাকিবে, তখনও উৎপাদন কৌশল, ক্রেতার পছন্দ এবং উৎপাদনের যোগান পরিবর্তিত হইলে আপেক্ষিকভাবে জিনিসপত্রের দাম ও উৎপাদন

বেকার অবস্থার দূরীকরণ করা ফিসক্যাল নীতির একটি প্রাথমিক উদ্দেশ্য হিসাবে স্বীকৃত হয়। পূর্ণ-নিয়োগ বজায় রাখিতে না পারিলে জাতীয় আয় এবং উন্নয়ন হার কাম্য পর্যায়ে (optimum level) পৌছায় নাই বুঝিতে হইবে। বেকার অবস্থা জনগণের দুঃখকষ্টের কারণ হয় এবং ইহা প্রতিরোধ করার অর্থ হইতেছে অধিক পরিমাণে অর্থ নৈতিক কল্যাণ করা। পূর্ণ-নিয়োগ বলিতে আমরা বুঝি এমন অবস্থা যেখানে নির্দিষ্ট মূল্যে সমুদয় উপাদানকেই অস্বেচ্ছাকৃত ভাবে অলস (involuntarily idle) থাকিতে হয় না। পূর্ণ নিয়োগ অর্জন করা সহজসাধ্য নহে।

অর্থ নৈতিক স্থিতিশীলতার দ্বিতীয় দিক হইতেছে সাধারণভাবে একটি স্থির মূল্যস্তর বজায় রাখা। জিনিসপত্রের দাম কমিয়া গেলে বিনিয়োগকারীর লাভের পরিমাণ কমিয়া যায়; ইহাতে বিনিয়োগ এবং উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া যায় এবং পূর্ণ নিয়োগ বজায় রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। জিনিসপত্রের দাম ক্রমাবনতির দিকে যাইতে আরম্ভ করিলে প্রকৃত আয়ের পুনর্বণ্টন (redistribution of real income) হয় এবং ইহা ন্যায়পরতার (equity) নীতির প্রতিকূল হয়। অধমর্ণের পক্ষে ইহা ক্ষতির কারণ হয়। ঋণ পরিশোধের অপর দিকে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যাওয়াও সবক্ষেত্রে ভাল নয়। জিনিসপত্রের দাম বাড়িলে দেশে উৎপাদন ও বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ে বটে অথবা ইহা পূর্ণ-নিয়োগ বজায় রাখিবার পক্ষে অনুকূল হয় বটে, কিন্তু, জিনিসপত্রের দাম বাড়িলে যে প্রকৃত আয়ের পুনর্বণ্টন হয়, তাহাতে স্বল্প আয়-উপার্জনকারীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহা ছাড়াও চোরা কারবার, কৃত্রিম সঞ্চয়, প্রভৃতি সামাজিক দুর্নীতির পরিমাণও সেই সময়ে বাড়িয়া যায়। আবার মুদ্রাস্ফীতির মাত্রা অতিরিক্ত বাড়িয়া গেলে দেশে সাধারণ অতি-উৎপাদন (general over-production) হইয়া যাইবার আশংকা থাকে।

যদিও বলা হইয়া থাকে সাধারণ মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ফিসক্যাল নীতির উদ্দেশ্য, তবুও সামাজিক কল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিলে সাধারণ মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা কি পর্যায়ে বজায় রাখা উচিত, সেই বিষয়ে অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেক সময় বলা হয় যে মূল্যস্তর যদি খুব অল্প পরিমাণে নিম্নগামী হয়, তবে সমগ্র সমাজের স্বার্থ সুসংরক্ষিত থাকে; কারণ, ইহাতে বর্ধিত উৎপাদনীশক্তি এবং কম উৎপাদন খরচ জনিত যে সুবিধা তাহা সমাজের বিভিন্ন লোকের মধ্যে বণ্টিত হয়। কিন্তু এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা হয় যে জিনিসপত্রের দাম যদি একটুও নিম্নগামী হয়, তবে পূর্ণ-নিয়োগ বজায় রাখা কঠিন হইয়া পড়ে।

অপরপক্ষে ক্রমবর্ধমান মূল্যস্তর বজায় রাখার পক্ষেও অনেক সময়ে যুক্তি প্রদর্শিত হয়; কারণ এই প্রকার মূল্যস্তরে উৎপাদকগণ উৎপাদন বাড়াইতে অথবা বিনিয়োগকারীগণ বিনিয়োগ বাড়াইতে উৎসাহিত হয়। কিন্তু এই অবস্থায় নির্দিষ্ট [illegible] অসুবিধার সম্মুখীন হয়। তবে পূর্ণ-নিয়োগ বজায় রাখার

বজায় রাখা। মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার অর্থ এই নয় যে সব জিনিসের দামই স্থিতিশীল থাকে। চাহিদা, উৎপাদন, উৎপাদন কৌশল, প্রভৃতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কতিপয় বিশেষ দামের পরিবর্তন হইতে পারে।

সরকারী ফিস্‌ক্যাল নীতির যে উদ্দেশ্যগুলি উপরে আলোচিত হইল, সেইগুলি ছাড়াও সরকারের অর্থ নৈতিক নীতির আরও একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, তাহা হইতেছে, দেশের সমুদয় অর্থ নৈতিক সম্পদের একান্ত কাম্য বণ্টন (optimum allocation) করা। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অনেক ক্ষেত্রেই সরকারের ফিস্‌ক্যাল নীতি এবং অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার কর্মসূচীর মধ্যে একটি সামঞ্জস্য আনয়ন করিতে হয়।

ফিস্‌ক্যাল নীতির বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে পূর্ণ-কর্মসংস্থান অর্জন করা ও ইহা বজায় রাখা, আসল আয়ের বৃদ্ধি করা, আয়-সমতা আনা প্রভৃতিই প্রধান। অনুন্নত এবং উন্নয়মান দেশগুলিতে ফিসক্যাল নীতির প্রধান লক্ষ্য হইতেছে, অর্থ নৈতিক উন্নয়ন (economic growth) অর্জন করা। অনুন্নত দেশের যেমন অর্থ নৈতিক উন্নয়ন অর্জন করা প্রয়োজন, উন্নত দেশগুলিরও সেইরূপ অর্থ নৈতিক উন্নয়নের হার (rate of economic growth) বজায় রাখা প্রয়োজন। সুতরাং স্থিতিশীলতা (stability) এবং উন্নয়ন (growth) অর্জনই হইতেছে আধুনিক ফিসক্যাল নীতির প্রধান লক্ষ্য। এই দুইটি লক্ষ্য অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরের সহিত যুক্ত। তবে বিভিন্ন দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা বিভিন্ন রকম বলিয়া এই দুই লক্ষ্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব বিভিন্ন দেশে এক প্রকার থাকে না। যদি দেশের উন্নয়নের হার স্থির থাকে তবে মূল্যস্তরের পরিবর্তন কমিয়া আসে। আবার পূর্ণ কর্মসংস্থান নীতি যদি সফল হয় তবে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

আধুনিক ফিসক্যাল নীতিকে স্বল্পকালীন এবং দীর্ঘকালীন ফিসক্যাল নীতি এই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। দীর্ঘকালীন ফিসক্যাল নীতির লক্ষ্য হইতেছে ভারসাম্য পর্যায়ের জাতীয় আয় (equilibrium level of income) বজায় রাখা। দীর্ঘকালে দেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধি, কারিগরী জ্ঞানের বৃদ্ধি, মূলধন সৃষ্টির পরিমাণ, দীর্ঘকালীন ভোগ-প্রবণতা ও বিনিয়োগ স্পৃহা প্রভৃতি উপাদানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া দেশকে পূর্ণ-কর্মসংস্থান স্তরে গতিশীল রাখাই ভারসাম্য পর্যায়ের জাতীয় আয় বজায় রাখার উদ্দেশ্য। দীর্ঘকালে এই অর্থ নৈতিক উন্নয়ন (economic growth) বজায় রাখা ফিসক্যাল নীতির একটি প্রধান দায়িত্ব।

দীর্ঘকালীন ফিসক্যাল নীতি

স্বল্পকালীন ফিসক্যাল নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধ করিয়া দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে ভারসাম্য বজায় রাখা। ব্যয় (spending) এবং কর স্থাপন (taxing) হইতেছে বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধকারী ফিসক্যাল নীতির প্রধান অস্ত্র। সেইজন্য এই ধরণের ফিসক্যাল নীতি আলোচনা করিবার সময় আমরা প্রধানতঃ সরকারী বাজেটের দিকে

হইতে (revenue side) এবং সরকারী ব্যয়ের দিক হইতে (expenditure side) আলোচনা করিয়া থাকি।

বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধকারী অথবা পূরণমূলক আয়-ব্যয় নীতির বিভিন্ন দিক

(Contra-cyclical Fiscal Policy)

১৯২৯ সালের বাণিজ্যিক মন্দার অভিজ্ঞতা হইতে অর্থবিজ্ঞানীরা বুঝিয়াছিলেন যে ফিসক্যাল নীতির যথাযথ প্রয়োগের সাহায্যে বাণিজ্যিক মন্দা এবং বেকার অবস্থা দূর করা যায়। ১৯৩৬ সালে কেইন্‌সের "General Theory of Employment, Interest and Money" বইটি প্রকাশিত হইবার পর অর্থবিজ্ঞানীগণ কর্তৃক এই ধারণা আরও ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পুনরায় অর্থবিজ্ঞানীগণ উপলব্ধি করিলেন যে ফিসক্যাল নীতির যথাযথ প্রয়োগের দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করাও সম্ভবপর। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধোত্তর কালেই বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধকারী ফিসক্যাল নীতির সার্থকতা অর্থবিজ্ঞানীগণ কর্তৃক যথাযথভাবে স্বীকৃত হয়। বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধকারী ফিসক্যাল নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে বাণিজ্যচক্রে ব্যবসায় বাণিজ্যের যখন যেমন অবস্থা তাহা প্রতিরোধ করিতে পারে এই ধরণের কতিপয় নীতি অবলম্বন করা হয়। যেমন, যদি ব্যবসায় বাণিজ্যে আমরা চূড়ান্ত সমৃদ্ধি দেখিতে পাই তবে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধকারী ফিসক্যাল নীতি গ্রহণ করিতে হয়। অনুরূপভাবে যদি আমরা ব্যবসায় বাণিজ্যে মন্দা অবস্থা বা বেকার অবস্থা দেখিতে পাই, তবে মন্দা প্রতিরোধকারী ফিস্‌ক্যাল নীতি গ্রহণ করা হয়। যখন ফিস্‌ক্যাল নীতি এমনভাবে অনুসৃত হয় যে পূর্ণ কর্মসংস্থান অর্জিত ও প্রতিষ্ঠিত হইবার পথে যে ত্রুটিগুলি (deficiencies) আছে তাহা দূর করিবার চেষ্টা করা হইতেছে, অথবা পূর্ণ-কর্মসংস্থান না থাকার দরুণ বেসরকারী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হইতেছে, তাহা দূর করিবার চেষ্টা করা হইতেছে, তখন সেই ফিস্‌ক্যাল নীতিকে পূরণমূলক ফিসক্যাল নীতি বা Compensatory Fiscal Policy বলা হয়। দেখা যাইতেছে পূরণমূলক ফিস্‌ক্যাল নীতিও হইতেছে বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধকারী ফিসক্যাল নীতি। ব্যয় (spending) এবং কর স্থাপন (taxing) প্রধানতঃ এই দুইটি অস্ত্র লইয়াই ফিস্‌ক্যাল নীতি বাণিজ্যচক্রকে আক্রমণ করে। ইহা ছাড়া, অবশ্য আরও আনুষঙ্গিক অস্ত্র আছে। ভোগ, বিনিয়োগ ও সরকারী ব্যয়—জাতীয় আয় নিরূপণের এই তিনটি প্রধান উপাদানকে প্রভাবিত করিয়াই ফিস্‌ক্যাল নীতি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা (economic stability) বজায় রাখিবার চেষ্টা করে।

মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে ফিসক্যাল নীতি (Fiscal Policy for Controlling Inflation) ঃ

চূড়ান্ত সমৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির সময়ে অনুসৃত ফিস্‌ক্যালনীতি

ব্যবসায়ে চূড়ান্ত সমৃদ্ধি (boom) যখন মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করে, তখন তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্য সরকার এমন কতিপয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন যাহাতে ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের প্রবণতা (inducement to invest) কমে এবং ভোগকারীদের ক্রয়শক্তি কমিয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে সরকার নূতন কর ধার্য করিয়া থাকে অথবা বর্তমান করগুলির হার বাড়াইয়া দেয়। ইহাতে নূতন বিনিয়োগও কিছু কমে। আমেরিকার অর্থবিজ্ঞানী কলিন ক্লার্ক (Colin Clark) মনে করেন যে করের পরিমাণ বাড়াইয়া মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করিবার একটি সীমারেখা থাকা উচিত। তাঁহার মতে সেই সীমারেখা হইতেছে জাতীয় আয়ের শতকরা পঁচিশ ভাগ।

করের সীমারেখা সম্বন্ধে ক্লার্কের মতবাদ

তাহা না হইলে অর্থাৎ করের হার জাতীয় আয়ের শতকরা ২৫ ভাগের সীমায় দাঁড়াইয়া গেলে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ স্পৃহা বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ইহাতে উৎপাদন কমিয়া যায়; তাহা ছাড়া, শ্রমিকরাও তখন অতিরিক্ত মজুরি দাবি করে এবং জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যাইবার দরুণ মালিকরাও বেশী মজুরি দিতে বাধ্য হয়। মজুরির পরিমাণ বাড়িয়া গেলে ইহা দুইভাবে পুনরায় মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করিতে পারে। মজুরির পরিমাণ বাড়িলে শ্রমিকের আয় বাড়ে, আয় বাড়িলে শ্রমিকের ভোগের প্রবণতা ও চাহিদা বাড়ে, কিন্তু অতিরিক্ত করভাবে জর্জরিত হওয়ার দরুণ উৎপাদকগণ উৎপাদন বাড়াইতে ভরসা পায় না। এই অবস্থায় জিনিসপত্রের দাম আরও বাড়িয়া যায়। অপরদিকে শ্রমিকের মজুরি বাড়িলে উৎপাদকের উৎপাদন খরচ বাড়িয়া যায় এবং এইজন্য উৎপাদকও জিনিসপত্রের দাম বাড়াইয়া দেয়। সুতরাং কলিন ক্লার্কের মতে করের হার ঊর্দ্ধতম সীমা ছাড়াইয়া গেলে ইহা মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করার পরিবর্তে মুদ্রাস্ফীতি আরও প্রসারিত করে। কিন্তু কলিন ক্লার্কের যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে করের হার জিনিসপত্রের দামের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করিবে তাহা নির্ভর করে করের প্রকৃতি (nature of tax), কর হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব খরচ করিবার পদ্ধতি, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, কর ধার্য করিবার পর করদাতাদের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া, মুদ্রাস্ফীতির কারণ এবং ইহার গভীরতা প্রভৃতির উপর। তবে মোটামুটি-ভাবে করের হার বাড়াইয়া দিলে অথবা নূতন কর ধার্য করিলে সরকারের রাজস্বের পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং বাজেটে উদ্বৃত্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। ইহাতে মুদ্রাস্ফীতি আংশিকভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।

দ্বিতীয়ত, সমৃদ্ধির সময় সরকার জনসাধারণ এবং ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে অধিক ঋণ গ্রহণ করিয়া তাহাদের ক্রয়শক্তি কমাইবার চেষ্টা করে এবং ঋণ হইতে প্রাপ্ত টাকা

যাহাতে দেশে প্রচলিত না হয় সেইজন্য তাহা আটক (blocked) করিয়া রাখে ; তৃতীয়ত, সরকার শিল্প-ব্যবসায়ে সমৃদ্ধির সময় যথাসম্ভব শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত এবং দেশ রক্ষার সহিত সম্পর্কহীন সমুদয় খরচ (Non-defence expenditures) কমাইবার চেষ্টা করে। চতুর্থত, দেশের ভিতর সরকারী ঋণের টাকা পরিশোধ করিবার সময় যদি শিল্পব্যবসায়ে সমৃদ্ধি থাকে, তবে সরকার টাকা ফেরৎ দেওয়ার তারিখ আরও পিছাইয়া দিতে পারে ; ইহাকে ঋণ পরিচালন নীতি বা Debt Management Policy বলে। পঞ্চমত, কোন কোন ক্ষেত্রে সরকার দেশীয় মুদ্রার সহিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বাড়াইয়া জিনিসপত্রের দাম কমাইবার জন্য এবং আমদানি বাড়াইবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহাকে মুদ্রার বৈদেশিক মূল্যবৃদ্ধি (Over-valuation of the Currency) বলা হয়। এইভাবে আমদানি করিবার খরচও কমানো হইয়া থাকে। অবশ্য এইনীতি কতদূর সফল হইবে তাহা নির্ভর করে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। যদি এই স্থিতিস্থাপকতা ১ হইতে বেশী (greater than unity) হয় তবেই অন্য কোন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন কার্যকর হয়।

সবশেষে সরকারী কর্মচারীদের বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের (compulsory saving) ব্যবস্থা করিয়াও সরকার তাহাদের ভোগের পরিমাণ কমাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। ভোগ-জনিত ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইলে সঞ্চয় বাড়ে এবং ইহা মুদ্রাস্ফীতির প্রতিহধানে সহায়ক হয়।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সহিত মুদ্রাস্ফীতি যুক্ত হইলে ফিস্ক্যাল নীতি কিভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে আমরা তাহা আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু যদি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সহিত মুদ্রাস্ফীতি যুক্ত না হয়, তবে সরকারের বাজেটে সমতার সৃষ্টি (balanced budget) করিতে হয়। ব্যবসায়ে মন্দার সময় সরকার যে বিনিয়োগ নীতি বা Public Works Policy অনুসরণ করে, সমৃদ্ধির সময় সেই সকল বিনিয়োগকে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়। ইহাকে এইজন্য "Cyclically Adjusted Public Works Policy" বলা হয়।

মন্দা প্রতিরোধে ফিসক্যাল নীতি (Fiscal Policy for Controlling Depression) **:** যখন ব্যবসায় বাণিজ্যে মন্দা দেখা যায়, তখনই দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পূরণমূলক ফিস্ক্যাল নীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিশেষভাবে প্রতিভাত হয়। ব্যবসায় বাণিজ্যে মন্দা বা সংকট দেখা দিলে কার্যকর চাহিদা (effective demand) বাড়ানোই পূরণমূলক ফিস্ক্যাল নীতির প্রধান উদ্দেশ্য। সরকার এই সময় অনেক কর প্রত্যাহার করিয়া লইতে পারেন অথবা প্রচলিত কমাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু করের হার কমাইয়া দিলেই যে সর্বদা ভোগজনিত খরচ সমান অনুপাতে বাড়িয়া যায় তাহা নহে। সেইজন্য

মন্দা-বিরোধী ফিস্ক্যাল নীতি

বাণিজ্যিক মন্দা প্রতিরোধকল্পে সরকারকে ব্যয়ের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিতে হয়। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে সরকারের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা হইতেছে সরকারী বিনিয়োগ (Public Works) আরম্ভ করা। সরকারী বিনিয়োগ বাড়িলে মাল্টিপ্লায়ার এবং একসেলারেশন নীতির যৌথ প্রভাবে জাতীয় আয় বাড়িয়া যায়। তাহা ছাড়া, এই নীতির কতিপয় বাহ্যিক সুবিধা (external economies) আছে এবং সেইগুলির প্রভাবেও জাতীয় উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান বাড়িয়া যায়। কিন্তু এই নীতির কতিপয় ত্রুটি আছে। সেইগুলি নিম্নে আলোচিত হইল।

সরকারী বিনিয়োগ নীতি ও তাহার ত্রুটি (Public Works Policy and its limitations)

প্রথমত, এমন অনেক সরকারী বিনিয়োগ আছে যেগুলিকে ব্যবসায়-বাণিজ্যে মন্দা অথবা সংকটের প্রতীক্ষায় রাখা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যদি ব্যবসায়-বাণিজ্যে মন্দা দেখা না যায় তবুও সরকারকে স্কুল কলেজ, রাস্তাঘাট, বাঁধ, পুল প্রভৃতি নির্মাণ করিবার কাজে অগ্রসর হইতে হয়। এমন কি যদি দেশে মুদ্রাস্ফীতি থাকে তবুও সরকার এই ধরণের বিনিয়োগমূলক কাজগুলিকে উপেক্ষা করিতে পারে না। কারণ, এইগুলির সহিত দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ জড়িত। অথচ মুদ্রাস্ফীতির সময় এই ধরণের কাজে অগ্রসর হইবার প্রধান ঝুঁকি হইতেছে এই যে ইহাতে মুদ্রাস্ফীতির প্রসার হইতে পারে। সরকারী বিনিয়োগ নীতির এই সমালোচনার উত্তরে বলা হয় যে মুদ্রাস্ফীতির সময় সরকারী বিনিয়োগ নীতিকে এমনভাবে পরিচালিত করিতে হইবে যাহাতে বন্ধ করিয়া দেওয়া সম্ভব এই ধরণের বিনিয়োগমূলক কাজগুলিকে স্থগিত রাখা হয় এবং পরে পুনরায় ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিলে সেই কাজগুলিতে হাত দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়ত, মন্দার সময় যে নির্মাণ-কাজগুলি (construction works) সরকার হাতে লইয়া থাকে, সেইগুলিকে সমৃদ্ধি আসিবার পূর্বেই শেষ না করিতে পারিলে বিনিয়োগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় নির্মাণ কার্য শেষ করিবার জন্য সময়ের মাত্রা (timing) সর্বদা ঠিক থাকে না। কতিপয় প্রকল্প আছে যেগুলিকে সমৃদ্ধির পূর্বে শেষ না করিতে পারিলে সরকারের লোকসান হয়। এই কারণে সরকারী বিনিয়োগ নীতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত, বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধকল্পে সরকারী বিনিয়োগ নীতিকে কার্যকর করিতে হইলে নির্ভুলভাবে আসন্ন অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণীর (forecasting) ব্যবস্থা করা দরকার। তাহা না হইলে অনেক ক্ষেত্রেই অসময়ে মূলধনী-ব্যয় হইয়া থাকে অথবা স্বল্পস্থায়ী মন্দাকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করিয়া অতিরিক্ত বিনিয়োগ হইয়া থাকে।

সরকারী বিনিয়োগ নীতি ছাড়াও মন্দার-সময় সরকার অন্যধরণের ব্যয় করিয়া [illegible] যথা সরকার বেকারদের বেকারভাতা এবং গরীবদের সামাজিক

নিরাপত্তা ও আর্থিক সাহায্য প্রদান প্রভৃতি বাবদ কতিপয় খরচ করিয়া থাকেন। এইগুলিকে ত্রাণ-সংক্রান্ত ব্যয় (Relief Expenditures) বলা হয়। সংঘাতজনিত বেকার অবস্থা (Frictional unemployment) দূর করিতে হইলে সরকারকে কর্ম-বিনিময় সংস্থা (employment exchange) স্থাপন করিতে হয়। ইহা সরকারের শাসন সংক্রান্ত নীতির অন্তর্ভুক্ত। দীর্ঘকালীন বেকার অবস্থা (secular unemployment) দূর করিতে হইলে সরকারকে অধিক পরিমাণে বিভিন্ন নির্মাণকার্যে অগ্রসর হইতে হয়, বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা (investment opportunities) বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হয়, ব্যবসায়ীদের ঋণ প্রদান করিতে হয়, করভার কমাইয়া দিতে হয় এবং বিভিন্ন উপায়ে দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সাহায্য করিতে হয়। মন্দার সময়ে জনসাধারণের ক্রয়শক্তি বাড়াইবার জন্য সরকারের ঋণ নীতিরও (debt policy) পরিবর্তন হয়। আভ্যন্তরীণ সরকারী ঋণের যে টাকা সমৃদ্ধির সময় পরিশোধ করার কথা ছিল সেই টাকা মন্দার সময়ে ফেরত দেওয়া হয়। এই সময়ে আয়ের বৈষম্য কমাইয়া দেওয়াও সরকারী কর-নীতির একটি অন্যতম লক্ষ্য। বড় লোকদের উপর কর ধার্য করিয়া এবং গরীবদের কর মুক্তির সুবিধা দিয়া গড় ভোগের প্রবণতা (average propensity to consume) বাড়ানো হইয়া থাকে। ইহাতে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ে।

বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধকারী ফিস্‌ক্যাল নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় বাজেটের সমতা-অসমতা সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠে। নিয়ন্ত্রিত বাজেটের নীতি (Managed Budget Policy) যাঁহারা অনুসরণ করেন তাঁহারা বলেন যে প্রতি বৎসর বাজেট সমতা বজায় রাখার নিয়ম অনুসরণ না করিলেও একটি বাণিজ্যচক্রের স্থিতিকালের মধ্যে বাজেটে সমতা (cyclical balancing of the budget) বজায় রাখার জন্য চেষ্টা করা উচিত।

বর্তমানে অর্থবিজ্ঞানীগণ সরকারী বিনিয়োগ নীতি অপেক্ষা স্বয়ংক্রিয় স্থিতিসাধনের ব্যবস্থার (Automatic Stabilisation Devices) উপর বা সরকারী অর্থ-কাঠামোর নমনীয়তার (Built-in-flexibility) উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করিয়া থাকেন।

বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধকারী সরকারী আয়-ব্যয় নীতির সমালোচনা ও সীমাবদ্ধতা (Criticisms and Limitations of Contra-Cyclical Fiscal Policy) : ফিস্‌ক্যাল নীতি সমাজের মোট খরচের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব অনেক কমাইয়া দেয়। কিন্তু এই ফিস্‌ক্যাল নীতি কার্যকর করার পথে কতিপয় বাধা আছে। প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে, ফিস্‌ক্যাল নীতির উপর আস্থা স্থাপন করিয়া দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্যের বিচ্যুতি প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা চলিবার সময় দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মূলগত দোষত্রুটিগুলি চাপা থাকিতে পারে। দ্বিতীয়ত, ফিস্‌ক্যাল নীতির যথাযথ প্রয়োগ করিতে গেলে সরকারী

ফিসক্যাল নীতির সমালোচনা

ঋণের পরিমাণ বাড়িয়া যাইতে পারে এবং ইহা একদিকে আয়-বৈষম্য বাড়াইয়া দিতে পারে ও অপরদিকে ঋণ বাবদ সুদ প্রদান করিবার সময়ে দেশের লোকের উপর একটি বোঝার সৃষ্টি করিতে পারে। তৃতীয়ত, বাৎসরিক বাজেটে সমতা না রাখিবার নীতি গৃহীত হইলে সরকারের পক্ষে অতিব্যয় এবং অপব্যয় হইবার সম্ভাবনা থাকে। চতুর্থত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা মনে করেন যে অধিক মাত্রায় ফিস্‌ক্যাল নীতি প্রযুক্ত হইলে ইহা বেসরকারী শিল্প-প্রসারের পক্ষে উপকারী না হইয়া বরং ক্ষতিকর হইতে পারে।

উপরোক্ত সমালোচনাগুলি বাদ দিলেও আমরা ফিস্‌ক্যাল নীতির কতিপয় সীমাবদ্ধতা দেখিতে পাই। প্রথম সীমাবদ্ধতা হইতেছে ফিসক্যাল নীতি প্রয়োগ করিবার সময় আসন্ন অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা এবং সময়ের মাত্রা ঠিক রাখা সম্পর্কিত। ভবিষ্যৎ অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার গতি নির্ধারণ ও ফিসক্যাল নীতি প্রয়োগ করিবার ঠিক উপযুক্ত সময় নিরূপণ করার অসুবিধা, ফিসক্যাল নীতির সাফল্যের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয়ত, যদি ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঠিক গতি নির্ধারণ করা সম্ভবপরও হয়, তবুও অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কারণে বাজেটে সমতা রাখার নীতি হইতে বিচ্যুত হওয়া সরকারের পক্ষে অসম্ভব হইতে পারে। প্রসঙ্গত বলা যাইতে পারে, মুদ্রাস্ফীতির সময়ে সরকার অনেক ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে করের হার বাড়াইতে অথবা নূতন কর স্থাপন করিতে সাহস পায় না। আবার ইহাও সম্ভব যে দলগত স্বার্থের চাপে পড়িয়া সরকার ফিসক্যাল নীতির নামে শ্রেণীবিশেষের স্বার্থরক্ষার জন্য কতিপয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে পারে।

ফিসক্যাল নীতির সীমাবদ্ধতা

তৃতীয়ত, মন্দার সময় সরকারী বিনিয়োগ নীতির (Public Works Policy) কতিপয় সীমাবদ্ধতা আছে। সেইগুলিও বিনিয়োগের গতি নির্ধারণ ও বিনিয়োগ নীতি প্রয়োগের সঠিক সময় নিরূপণের সহিত সম্পর্কিত।

চতুর্থত, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো (Structure of the economy) অনেক সময় ফিস্‌ক্যাল নীতির যথাযথ প্রয়োগের পথে বাধা সৃষ্টি করে। মুদ্রাস্ফীতির প্রতিরোধ ফিস্‌ক্যাল নীতি সর্বদা কার্যকর হয় না। ধরা যাক, মজুরি বাড়িয়া যাইবার দরুণ যদি মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয় তবে গতানুগতিক ফিস্‌ক্যাল নীতির প্রয়োগ করিয়া ইহা দমন করা সাধারণতঃ সম্ভব হয় না। কারণ, এই ধরণের মুদ্রাস্ফীতির সামাজিক আয়ের বৃদ্ধি হইতে সৃষ্ট হয় না।

পঞ্চমত, ফিস্‌ক্যাল নীতির আর একটি সমস্যা দেখা যায় যখন কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার অথবা পৌর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই নীতি অনুসরণ করা হয় না। ইহাতে ফিস্‌ক্যাল নীতির কার্যকারিতা অনেক অংশে ব্যাহত হয়। সর্বশেষে, প্রশাসনিক অদক্ষতা (administrative inefficiency) থাকিলেও ফিস্‌ক্যাল নীতি যথাযথভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না।

ফিস্‌ক্যাল নীতিকে সফল করিতে হইলে নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ হওয়া দরকার। প্রথমত, প্রশাসনিক জ্ঞান, সততা ও দক্ষতা না থাকিলে ফিস্‌ক্যাল নীতির যথাযথ প্রয়োগ করা সম্ভবপর হয় না; দ্বিতীয়ত, ফিস্‌ক্যাল নীতি প্রয়োগ করিবার জন্য দেশের সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি থাকা দরকার যাহাতে রাজনৈতিক অসুবিধা ইহার প্রয়োগের পথে বাধার সৃষ্টি না করিতে পারে। সেইজন্য ফিস্‌ক্যাল নীতি প্রয়োগ করা হইলে যাহাতে ইহা কার্যকর ও সফল হয়, তাহা তত্ত্বাবধান করিবার জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত একটি কমিশন থাকা প্রয়োজন। তাহা ছাড়া, অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যদি সরকারকে করের হার পরিবর্তিত করিতে হয়, তবে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে যেন জনসাধারণ ইহার বিরোধিতা না করিতে পারে। তৃতীয়ত, বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধকারী ফিস্‌ক্যাল নীতিকে সফল করিতে হইলে বাজেটের পরিবর্তন করা দরকার। বাজেট রচনার গতানুগতিক পদ্ধতি এবং বাজেটে সমতা রাখার নীতি সর্বদা অনুসরণ করা সম্ভবপর নয়।

ফিসক্যাল নীতির সাফল্যের শর্ত

বাজেট (The Budget)

সরকারের আয় (revenue) এবং খরচের (expenditure) হিসাবকে বাজেট বলা হয়। প্রত্যেক দেশের সরকারকেই প্রতি বৎসর আয়-ব্যয়ের একটি বাজেট তৈয়ার করিতে হয়। বাজেট অনেক প্রকারের হইতে পারে। যেমন, চল্‌তি বাজেট (Current Budget) অর্থাৎ চল্‌তি আয় ও ব্যয়ের হিসাব; মূলধন বাজেট (Capital Budget) ইত্যাদি। ভারতে আলাদাভাবে আমরা রেলওয়ে বাজেট দেখিতে পাই। যখন বাজেটে সবকারের আয় ও ব্যয় পরস্পরের সমান হয়, তখন ইহাকে আমরা সম-বাজেট (Balanced Budget) বলি। যদি আয় হইতে ব্যয়ের পরিমাণ বেশী হয়, তবে ইহাকে ঘাট্‌তি বাজেট (Deficit Budget) বলা হয়। যখন ব্যয় হইতে আয়ের পরিমাণ বেশী হয়, তখন ইহাকে উদ্বৃত্ত বাজেট (Surplus Budget) বলা হয়। ঘাট্‌তি বাজেট অথবা উদ্বৃত্ত বাজেট উভয়কেই আমরা অসম-বাজেট (Unbalanced Budget) বলিতে পারি।

সমতাহীন বাজেট (Unbalanced Budget): সমতাহীন বাজেট বলিতে উদ্বৃত্ত বাজেট (Surplus Budget) ও ঘাট্‌তি বাজেট (Deficit Budget) দুই-ই বুঝায়। মুদ্রাস্ফীতির সময় উদ্বৃত্ত বাজেট বিশেষ উপযোগী; কারণ বাজেটের উদ্বৃত্ত আয় আটক (blocked) করিয়া রাখিয়া মুদ্রাস্ফীতি কিছু পরিমাণে প্রতিরোধ করা যায়। আবার সমৃদ্ধির সময়ে বাজেটে যে উদ্বৃত্ত হয় তাহাই পরবর্তী মন্দার সময় সরকার খরচ করিতে পারেন। এইভাবে সমতাহীন বাজেটকে বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধকারী বাজেটে (Contra-cyclical Budget) পরিণত করা যায়। ঘাট্‌তি বাজেট

(Deficit Budget) আধুনিক ফিস্‌ক্যাল নীতির একটি প্রধান অঙ্গ। যখন বাজেটে আয় হইতে খরচের পরিমাণ বেশী হয় তখন বাজেটটিকে ঘাট্‌তি বাজেট বলা হয়।

এই ঘাট্‌তি দূর করিবার জন্য যে অর্থসংস্থান করা হয়, তাহাকেই বলা হয় **ঘাট্‌তি অর্থসংস্থান** (Deficit Financing) এই ঘাট্‌তি দূর করিবার জন্য সরকার সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যমূলক ব্যাংক এবং জনসাধারণের অথবা ব্যাংক নয় এই রকম ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানর নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে। যখন সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে টাকা ঋণ করে, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই ঋণের বিপক্ষে নূতন টাকা ছাপায়। সুতরাং ঘাট্‌তি অর্থসংস্থানের জন্য যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতে সরকার ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে তবে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু, নূতন টাকা ছাপা হইলেই যে মুদ্রাস্ফীতি হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

ঘাট্‌তি অর্থসংস্থানের দরুণ মুদ্রাস্ফীতি কখন হইতে পারে

নূতন টাকা ছাপা হইলে লোকের ক্রয়শক্তি এবং সক্রিয় চাহিদা (effective demand) বাড়িয়া যায়। যে পরিমাণে চাহিদা বাড়িবে সেই পরিমাণে যদি জিনিসপত্রের যোগান বাড়ে, তবে মুদ্রাস্ফীতি হইবে না। বরং দেশের আয়, উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। অপরপক্ষে যদি লোকের ক্রয়শক্তি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে যোগান না বাড়ে, তবে দেশে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যাইবে এবং মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হইবে। সুতরাং যদি দেশের মূলধনের স্বল্পতা, শ্রমিকদের কর্মক্ষমতার অভাব, এই জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতির প্রতিবন্ধক (bottlenecks) থাকে, তবে প্রয়োজনমত যোগান বাড়ানো যায় না এবং ঘাট্‌তি অর্থসংস্থান মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করে।

ক্ষেত্রবিশেষে ঘাটতি অর্থসংস্থান দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম পন্থা হিসাবে কার্যকর হয়। ঘাটতি অর্থসংস্থানের ফলে যদি দেশের অব্যবহৃত সম্পদগুলিকে উৎপাদনের কাজে লাগানো সম্ভব হয় এবং ইহার ফলে যদি দেশের জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান বাড়ে তবে ইহা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক হয়। অপর দিকে ঘাটতি অর্থসংস্থান যদি সামগ্রিকভাবে দেশের সঞ্চয় বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয় তবেও ইহা অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম পন্থা হিসাবে বিবেচিত হয়। কিন্তু যখন নূতন মুদ্রার সৃষ্টি হইলে দেশে মুদ্রাসম্প্রসারণ হেতু শুধু জিনিসপত্রের দাম-ই বাড়ে অথচ উৎপাদন আশানুরূপ বাড়ে না, তখন ঘাটতি অর্থসংস্থান দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করে।

সরকার যদি বাণিজ্যমূলক ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে, তবে ব্যাংকগুলিরও সরকারী সিকিউরিটির রিজার্ভ বাড়িয়া যায় এবং ইহার বিপক্ষে তাহারা দাদন অথবা ঋণ দেওয়ার পরিমাণ বাড়াইতে পারে। সুতরাং এই দাদন অথবা ঋণের বৃদ্ধিও কিছু পরিমাণে লোকের ক্রয়শক্তি এবং চাহিদা বাড়াইয়া দিতে পারে এবং অল্পবিস্তর জিনিসপত্রের দাম বাড়াইয়া দিতে পারে। এইভাবে যে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়, তাহা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নূতন টাকার সৃষ্টি হেতু যে মুদ্রাস্ফীতি হয় সেই ধরণের হয় না,

অর্থাৎ তত তীব্র হয় না। ঘাট্‌তি অর্থসংস্থানের জন্য যদি সরকার জনসাধারণের নিকট টাকা ধার করে তবে তাহা মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করে না।

আধুনিককালে ঘাট্‌তি বাজেটের পক্ষে সর্বপ্রধান যুক্তি হইতেছে এই যে জাতীয় আয়ের উপর ইহার একটি সম্প্রসারণশীল প্রভাব থাকে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যে সরকার চেষ্টা করিতেছে, ঘাট্‌তি বাজেট তাহাই সূচনা করে। কিন্তু বাজেটে ঘাট্‌তি হইলেই জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান বাড়িয়া যায় না। বাজেটে ঘাট্‌তি করিয়া যদি কার্যকর চাহিদা বাড়াইতে হয় তবে প্রশাসনিক জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। অনুন্নত দেশগুলিতে বাজেটে ঘাট্‌তি করিবার একটি সীমারেখা থাকা উচিত এবং সেই সীমারেখা হইতেছে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা। বাজেটে ঘাট্‌তি করিলে যে নূতন অর্থের সৃষ্টি করা হয়, দেখিতে হইবে সেই অর্থ যেন উৎপাদনাত্মক কাজে ব্যয়িত হয়। ঘাট্‌তি বাজেট আধুনিক পূরণমূলক ফিস্‌ক্যাল নীতির অন্যতম অঙ্গ।

অনেকে মনে করেন, উদ্বৃত্ত বাজেট সর্বদা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিচায়ক না-ও হইতে পারে। কারণ, সরকারের যদি লক্ষ্য থাকে যেভাবেই হোক বাজেটে উদ্বৃত্তের সৃষ্টি করা, তবে হয়ত অনেক প্রয়োজনীয় ব্যয় সংকুচিত হইতে পারে এবং এই সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম বাধা প্রাপ্ত হইতে পারে। যুক্তিটির যথেষ্ট সারবত্তা আছে সন্দেহ নাই! কিন্তু এজন্য একথা বলা চলেনা যে উদ্বৃত্ত বাজেট সর্বদা বর্জনীয়। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে ইহা খুবই কার্যকর হয়। তাহা ছাড়া, এক বছরের বাজেট-উদ্বৃত্ত অপর বছরের বাজেটে ঘার্টতি দূর করার কাজে লাগানো যায়। সমগ্র বাণিজ্যচক্র জুড়িয়া প্রতি সাত অথবা আট বছরের জন্য দীর্ঘকালীন সম-বাজেট নীতি অনুসরণ করা যাইতে পারে। ইহাতে ক্ষেত্র বিশেষে কোন বছর উদ্বৃত্ত বাজেট আবার কোন বছরে ঘাটতি বাজেটের আশ্রয় গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালে সম্পূর্ণ বাণিজ্যচক্র লইয়া যেন বাজেটে রাজস্ব ও ব্যয়ের পরিমাণ সমান থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইহাকে Managed Budget বলা হয়।

উদ্বৃত্ত বাজেটের বিপক্ষে যুক্তি

সরকারী ঋণ (Public Debt)

ঘাট্‌তি বাজেট, অর্থাৎ, বাজেটে আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বেশী হইলে সরকারকে ঋণ করিতে হয়। এই ঋণ যদি বিদেশ হইতে গ্রহণ করা হয়, তবে ইহাকে বৈদেশিক ঋণ (ExternalDebt) বলা হয়। যদি এই ঋণ দেশের ভিতরেই সংগ্রহ করা হয়, তবে ইহাকে আভ্যন্তরীণ সরকারী ঋণ (Internal Public Debt) বলা হয়। দেশের ভিতর সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতেপারেন। ঋণ সংগ্রহ করিয়া সরকার ইহা বিভিন্ন খাতে ব্যয় করেন। কিন্তু ঋণ গ্রহণ করিলে ইহার জন্য ঋণ প্রদানকারীকে সুদ প্রদান করিতে হয় অথবা অনেক

সময় আসল টাকা শোধ করিতে হয়। এই ব্যয়কে বলা হয় ঋণকৃত্যক বা "Debt Services"।

সরকারী ঋণকে Funded Debt এবং Unfunded Debt এই দুইভাবে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যে সকল ঋণ সরকারকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে শোধ করিয়া দিতে হয়, সেই ঋণকে Unfunded Debt বলা হয়। আবার দীর্ঘমেয়াদী ঋণকে অর্থাৎ যে ঋণ অল্প সময়ের মধ্যে শোধ করিতে হয় না সেই ঋণকে বলা হয় Funded Debt।

সরকারী ঋণের ফলাফল (Effects of Public Debt) : সরকারী ঋণের কি ফলাফল হইবে, তাহা ঋণের পরিমাণ এবং ঋণ পরিশোধের পদ্ধতির উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে যে আভ্যন্তরীণ সরকারী ঋণের কোন বোঝা নাই ("An internally held public debt imposes no burden on the community")। কারণ, ঋণ শোধ করিবার জন্য সমাজের এক শ্রেণীর লোকের উপর কর ধার্য করা হইলেও সেই কর হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব দেশের বাহিরে যায় না। ঋণপ্রদানকারীই সেই টাকা পায়। সুতরাং দেশের টাকা দেশেই থাকিয়া যায় এবং সমাজের পক্ষে আভ্যন্তরীণ সরকারী ঋণ কোন বোঝার সৃষ্টি করে না। আমরা এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলিতে পারি যে সরকারী ঋণ আদৌ কোন বোঝার সৃষ্টি করিবে কিনা তাহা নির্ভর করে ঋণের পরিমাণের উপর এবং জনসাধারণের উপর, এবং এইজন্য যে কর ধার্য করা হয় সেই করের প্রকৃতি (nature) ও হারের (rate) উপর। যদি প্রত্যক্ষ করের (direct tax) মাধ্যমে সেই টাকা সংগ্রহ করা হয় তবে ধনীদের উপর বোঝার সৃষ্টি হইবে, এবং যদি পরোক্ষ করের (indirect tax) মাধ্যমে সেই টাকা তোলা হয়, তবে তাহা গরীবদের উপর অধিক চাপের সৃষ্টি করিবে। সরকারী ঋণ পরিশোধ করার জন্য যে কর ধার্য করা হয় তাহার ফলে দেশের আয় ও ধনের বৈষম্য বাড়িয়া যাইতে পারে। ক্ষেত্র বিশেষে করভার বাড়িয়া গেলে উৎপাদকদের বিনিয়োগ-স্পৃহা বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে। তাহা ছাড়া, সরকারী ঋণের টাকা কিভাবে বণ্টিত হয়, এবং তাহা সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোয় বিপর্যয়ের ("strains and stresses") সৃষ্টি করে কিনা তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে। অনেক সময় সরকারী ঋণের অসম বণ্টনের জন্য দেশে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়। আবার আর একদিক হইতে বিবেচনা করিলে মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবিধানের জন্য সরকারী ঋণ বাড়ানো প্রয়োজন এবং সেইক্ষেত্রে এই ঋণের টাকা শুধু উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য খরচ করা হয়; অন্য কোন ভাবে সেই টাকা খরচ করা উচিত নয়। সরকারী ঋণ আদৌ মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করিবে কিনা তাহা নির্ভর করে সরকারী ঋণের উৎসের (sources) উপর। সরকার যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে, অর্থাৎ, যদি সরকারকে ধার দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে নূতন টাকা ছাপাইতে হয়, তবে সরকারী ঋণ মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করিবে। কিন্তু সরকার যদি জনসাধারণের নিকট

হইতে ঋণ গ্রহণ করে তবে সেই ঋণ মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করিতে পারে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট হইতেও যদি সরকার ঋণ গ্রহণ করে, তবে তাহাও মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করিতে পারে। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট অত্যধিক সরকারী ঋণের পরিণামে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয় তবে ইহা দেশবাসীর উপর বোঝার সৃষ্টি করে। অপর দিকে সরকার যে অর্থ ঋণ হিসাবে গ্রহণ করেন তাহা যদি দেশের সমুদয় সম্পদের ব্যবহারে লাগানো হয় এবং ইহা যদি উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইবার কাজে সহায়ক হয় তবে সরকারী ঋণের সুফল দেশবাসী ভোগ করে।

সরকারী ঋণ (Public borrowing) দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান করিতে পারে। সরকার যদি ঋণ বাবদ প্রাপ্ত টাকা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য খরচ করে, তবে তাহা দেশের আয়, উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান বাড়াইয়া দেয়। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের জন্য সরকারী ঋণের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। সরকারের ঋণ গ্রহণের পিছনে কি উদ্দেশ্য কাজ করে তাহাও এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়। যদি যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করার জন্য অথবা প্রতিরক্ষা প্রভৃতির জন্য সরকার ঋণ গ্রহণ করেন, তবে ইহা জনসাধারণের উপর বোঝার সৃষ্টি করিতে পারে। কারণ যেক্ষেত্রে ভোগ-সামগ্রীর উৎপাদন বাড়িবেনা, অথচ জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যাইবে। শুধু বাজেট-ঘাটতি দূর করিবার জন্য যদি ঋণ গ্রহণ করা হয় এবং নূতন মুদ্রা উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে ব্যবহৃত না হয় তবেও মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়।

সরকারের ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য (Purposes for which public debt may be incurred) : ঋণ গ্রহণ করার পিছনে অনেক উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। প্রথমত, যুদ্ধ-বিগ্রহ সৃষ্টি হইলে সরকার যুদ্ধের খরচ নির্বাহ করিবার জন্য ঋণ গ্রহণ করিতে পারেন। দ্বিতীয়ত, বাজেট ঘাটতির সৃষ্টি হইলে সেই ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য সরকার ঋণ করিতে পারেন। তৃতীয়ত, অর্থ নৈতিক উন্নয়নেব জন্য অথবা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের জন্য সরকার ঋণ গ্রহণ করিতে পারেন। সাধারণতঃ উৎপাদনাত্মক বিনিয়োগের (productive investment) জন্য সরকার অনেকক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। দেশে রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপনের জন্যও সরকার ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। উপরোক্ত কারণগুলির জন্য যদি সরকার ঋণ গ্রহণ করে তবে তাহা সমর্থনযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু যখন সরকারী ঋণের টাকা শুধু বিলাসসামগ্রী ক্রয়ে খরচ করা হয় অথবা অনুৎপাদনমূলক (unproductive) ব্যাপারে খরচ করা হয়, তখন সেই সরকারী ঋণকে সমর্থনের অযোগ্য হিসাবে বিবেচনা করা যাইতে পারে।

সরকারী ঋণ পরিশোধ করার উপায় (Methods of repaying public debt) : সরকারী ঋণ নিম্নলিখিত উপায়গুলির সাহায্যে পরিশোধ করা হয়। প্রথমত, সরকার ঋণ পরিশোধের জন্য জনসাধারণের উপর কর ধার্য করিতে পারেন। অথবা

জনসাধারণের উপর levy ধার্য করিতে পারেন ইহাকে (capital levy) বলা হয়। এই ধরণের কর ধার্য করার বিপক্ষে বলা যায় যে, সঠিকভাবে মূলধনের মূল্য নিরূপণ করা সম্ভবপর নয় বলিয়া অথবা যাহাদের মূলধন নাই তাহাদের মধ্যে অনেক বড়লোক এই করের আওতার বাহিরে থাকে বলিয়া এই করে ন্যায় বিচার রক্ষিত হয় না। দ্বিতীয়ত, ইহা মূলধন বিনিয়োগের উপর খারাপ প্রভাব বিস্তার করে।

তৃতীয়ত, সরকার প্রতি বৎসরই ঋণ পরিশোধের জন্য কিছু টাকা একটি নির্দিষ্ট তহবিলে রাখিয়া দিতে পারেন। নির্দিষ্ট কাল পরে এই তহবিলে যে টাকা সঞ্চিত হয়, তাহা হইতে ঋণ শোধ করা যাইতে পারে। এই জাতীয় তহবিলকে বলা হয় Sinking Fund.

চতুর্থত, সরকার যখন ঋণ গ্রহণ করেন তখন যদি সুদের হার বেশী থাকে এবং পরে যদি বাজারে সুদের হার কমিয়া যায়, তবে সরকার আগেকার ঋণগুলিকে শোধ করিয়া নূতন সুদের হার অনুযায়ী নূতন ঋণ গ্রহণ করিতে পারেন। এই পদ্ধতিকে বলা হয় ঋণের পরিবর্তন পদ্ধতি (conversion of debt)। সর্বশেষে যদি দেশে কোন প্রকার রাজনৈতিক বিপ্লব হয় এবং দেশের সেই বিপ্লবের ফলে নূতন সরকার গঠিত হয়, তবে সেই সরকার আগেকার সরকারের সমুদয় ঋণ বাতিল (repudiation) করিয়া দিতে পারেন। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে কম্যুনিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর আগেকার সরকারের (জারের আমলের) সমুদয় ঋণ বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য ঋণ বনাম কর (Loans vs. Taxation as methods of War Finance): দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে বিভিন্ন দেশে প্রতিরক্ষা ব্যয়ের মাত্রা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। বিশেষত, বিরাট আকারের কোন যুদ্ধ না হইলেও ছোটখাটো যুদ্ধ এবং বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে "ঠাণ্ডা লড়াই" (cold war) লাগিয়াই আছে।

এই অবস্থায় প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা আরও জোরদার করা যে কোন দেশের পক্ষেই স্বাভাবিক। সেজন্য যুদ্ধখাতে এবং প্রতিরক্ষাখাতে ব্যয়-নির্বাহের পদ্ধতি লইয়া আলোচনা করা দরকার।

যুদ্ধকালীন সরকারী রাজস্ব নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হইতেছে দেশে সমুদয় সম্পদ ভোগের জন্য ব্যয়িত না করিয়া এবং প্রয়োজন বোধে উন্নয়নমূলক ব্যয়ের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করার জন্য ব্যবস্থা করা। কিন্তু হয়ত এমন বহু উৎপাদনমূলক বিনিয়োগের ব্যবস্থা দেশে থাকিতে পারে যেগুলি কোন অবস্থায় পরিত্যাগ করা অথবা বন্ধ করিয়া দেওয়া সম্ভব নয়। তখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, অতিরিক্ত যুদ্ধকালীন ব্যয় অথবা যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য ব্যয় কিভাবে নির্বাহ করা হইবে। অর্থবিজ্ঞানীগণ এক্ষেত্রে দুইটি বিকল্প পন্থার কথা আলোচনা করিয়াছেন; একটি হইতেছে ঋণ করিয়া যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করা এবং অপরটি হইতেছে

আরও কর ধার্য করিয়া (by taxes) যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করা। আমরা এই দুইটি বিকল্প পন্থার গুণাগুণ বিচার করিতে পারি।

প্রথমত, যাহারা যুদ্ধ-ব্যয় নির্বাহের জন্য করের পক্ষে যুক্তি প্রদান করেন, তাঁহাদের মতে কর ধার্য করা হইলে সরকারের দিকে হইতে ভবিষ্যতের জন্য কোন দায় থাকে না ; কিন্তু ঋণ গ্রহণ করা হইলে ভবিষ্যতের জন্য সরকারের একটি দায় থাকিয়া যায়। কারণ সরকার যদি বর্তমানে ঋণ গ্রহণ করেন, তবে ভবিষ্যতে সেই ঋণ শোধ করার জন্য প্রস্তুতি থাকিতে হইবে। ঋণ গ্রহণ করা তখনই উচিত যখন দেখা যাইবে যে প্রকল্প অথবা যে বিনিয়োগের জন্য ঋণ গ্রহণ করা হইতেছে, সেই প্রকল্প অথবা সেই বিনিয়োগ হইতেই ভবিষ্যতে ঋণ পরিশোধ করার মত টাকা সংগৃহীত হইবে। এই দিক হইতে বিচার করিলে যুদ্ধের জন্য ঋণ গ্রহণ করা অনুৎপাদনশীল। কারণ, যুদ্ধের সময় যে টাকা ঋণ হিসাবে গ্রহণ করা হয় তাহা যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহেই কাজে লাগানো হয়। ভবিষ্যতে এই ব্যয় হইতে এমন কোন প্রতিদান (returns) পাওয়া যায় না যাহা হইতে ঋণের উপর সুদ প্রদান করার অথবা ঋণ পরিশোধ করার টাকা সংগৃহীত হইতে পারে। মনে রাখিতে হইবে, যুদ্ধ-কালীন ঋণের উপর সুদের হারও বেশী থাকে। যদি এমন হইত যে একটি বিশেষ শিল্প-প্রকল্পের জন্য সরকার ঋণ গ্রহণ করিতেছে এবং সেই শিল্প-প্রকল্প হইতে ঋণ পরিশোধ করার মত আয় উপার্জিত হইবার সম্ভাবনা আছে, তখনই সেই ঋণ গ্রহণ করার পক্ষে বিশেষ যুক্তি থাকে। কিন্তু যুদ্ধের ব্যয়-নির্বাহ করার ক্ষেত্রে এই যুক্তি প্রযুক্ত হয় না। যুদ্ধের সময় যে ঋণ গ্রহণ করা হয় তাহাতে দেশের মোট মূলধনের পরিমাণ কমিয়া যায়। সেজন্য অনেকে যুদ্ধকালীন ব্যয় নির্বাহের জন্য ঋণের উপর নির্ভর না করিয়া করের উপর নির্ভর করার পক্ষপাতী।

দ্বিতীয়ত, কর ধার্যের মাধ্যমে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করিলে দেশের অবাঞ্ছিত এবং অনুৎপাদনশীল ভোগ (undesirable and unproductive consumption) নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর। ইহাতে সামগ্রিকভাবে দেশের মূলধন বৃদ্ধির কাজ ব্যাহত হইবে না।

তৃতীয়ত, গ্ল্যাডষ্টোন যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহে করের ভূমিকার সমর্থনে বলিয়াছিলেন যে যদি অধিকতর কর ধার্য করিয়া যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করা হয় তবে লোকে আর যুদ্ধ সমর্থন করিবে না ; কেননা সেক্ষেত্রে যুদ্ধের সামগ্রিক আর্থিক বোঝা করদাতাদের উপর আসিয়া পড়িবে বলিয়া তাঁহারাই সরকারের যুদ্ধ সম্পর্কিত নীতির সমালোচনা করিবেন।

চতুর্থত, ঋণের মাধ্যমে বিশেষতঃ, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে বা নোট ছাপাইয়া যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করিলে যে মুদ্রাস্ফীতির আশংকা থাকে, করের মাধ্যমে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করিলে সেই আশংকা থাকে না।

কিন্তু একথাও ঠিক যে করের মাধ্যমে যুদ্ধের সমুদয় ব্যয় নির্বাহ করিবার পথে অনেক অসুবিধা আছে। কারণ, করদাতাগণের মনে এইজন্য অসন্তোষের সৃষ্টি হইবে।

তাহাছাড়া, করদাতাগণও চাহিবেন না যে তাহাদের প্রদত্ত কর হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব শুধু অনুৎপাদনশীল যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যবহৃত হউক।

পঞ্চমত, যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য শুধু কর-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিলে করের বোঝা অসম্ভব বাড়িয়া যাইবে।

কর ধার্য করিবারও একটি সীমা আছে; যতখুশী তত কর ধার্য করা কখনই সম্ভব নয়। অতিরিক্ত কর ধার্য করা হইলে দেশের বিনিয়োগ এবং মূলধন সৃষ্টির প্রয়াস ব্যাহত হইতে পারে। এইদিক হইতে বিবেচনা করিলে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করার জন্য ঋণের উপর নির্ভর করা যুক্তিসঙ্গত। যুদ্ধের ব্যয়-নির্বাহের জন্য ঋণ গ্রহণের পক্ষেও নিম্নলিখিত যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে।

প্রথমত, বর্তমানকালের যুদ্ধ-বিগ্রহ এতটা ব্যয়-সঙ্কুল যে শুধু কর ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, ইচ্ছা করিলেই করের পরিমাণ বাড়ানো যায় না এবং কর ধার্য করিবারও একটি সীমা আছে। অথচ, যদি প্রয়োজন হয় তবে সরকার যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে, অর্থাৎ নূতন নোট ছাপাইতে পারে। অবশ্য ইহাতে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হইতে পারে; কিন্তু সেই সঙ্গে সরকার করের হার বাড়াইয়া বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের (compulsory saving) ব্যবস্থা করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ-নিয়ন্ত্রণ নীতি জোরদার করিয়া সেই সমস্যার প্রতিবিধান করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে পারেন। তৃতীয়ত, সরকার যদি যুদ্ধের সময় জনসাধারণের নিকট হইতে স্বেচ্ছায় প্রদত্ত দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পাইয়া থাকেন তবে মুদ্রাস্ফীতিরও সৃষ্টি হয় না এবং জনসাধারণের উপর গুরুতর বোঝারও সৃষ্টি হয় না। চতুর্থত, অতিরিক্ত করধার্যের মাধ্যমে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করিলে দেশের বিনিয়োগ এবং উৎপাদন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এবং মূলধন সৃষ্টির উৎসগুলিও অকার্যকর হইয়া পড়িতে পারে; ঋণের মাধ্যমে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করিলে ইহা হইবে না। ঋণের যে বোঝা জনসাধারণের উপর পড়িতে পারে, তাহা দীর্ঘকালের পরিপ্রেক্ষিতে এমনভাবে সঞ্চিত হইতে পারে যে ইহাতে দেশের মূলধন-সৃষ্টির প্রয়াসও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এবং জনসাধারণকেও দুর্দশায় পড়িতে হয় না।

যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য ঋণ গ্রহণ এবং কর ধার্য করা উভয় পদ্ধতির পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি আলোচনা করিয়া ইহাই প্রতীয়মান হয় যে জরুরী অবস্থায় কোন একটি বিশেষ পদ্ধতির উপর নির্ভর করা বাঞ্ছনীয় নহে। যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারকে যেমন কর-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিতে হয়, সেইপ্রকার ঋণ-গ্রহণের উপরেও নির্ভর করিতে হয়। এইজন্য কর-ব্যবস্থাও যথেষ্ট নমনীয় (flexible) বা স্থিতিস্থাপক (elastic) হওয়া দরকার। ঋণ গ্রহণের জন্যও একটি সুষ্ঠু নীতি গৃহীত হওয়া দরকার।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থানের ভূমিকায় ঋণ বনাম কর (Loans vs. Taxation as methods of Development Finance): অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভূমিকায় সরকার কর্তৃক ঋণ গ্রহণের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনাকে কার্যকর করিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয় এবং শুধু কর ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া এই প্রয়োজন মিটানো সম্ভব হয় না। কারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যখনই অর্থের প্রয়োজন হইবে তখনই ইচ্ছামত কর-হার বর্ধিত করা অথবা নূতন কর স্থাপন করা সম্ভব হয় না। এইজন্য কর-ব্যবস্থাকে খুবই নমনীয় এবং স্থিতিস্থাপক হইতে হইবে। কিন্তু তাহা ছাড়া, যদি কর ব্যবস্থা স্থিতিস্থাপক হয়, তবুও যতখুশী তত করের হার বর্ধিত করা সম্ভব হয় না; কারণ, করের হার অতিরিক্ত বাড়াইয়া দিলে উৎপাদকদের বিনিয়োগ-স্পৃহা এবং উৎপাদন বাড়াইবার অনুপ্রেরণা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। ইহাতে মূলধন সৃষ্টির (Capital Formation) প্রয়াস নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। সেইজন্য কোন কোন অর্থবিজ্ঞানী মনে করেন যে অর্থনৈতিক উন্নয়নেব জন্য কর-ব্যবস্থা অপেক্ষাও ঋণ গ্রহণের উপর নির্ভর করা অধিকতর ফলপ্রসূ হয়। কর-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়াও সরকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের জন্য ঋণ গ্রহণ করিতে পারে এবং সেক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণ করা হয় জনসাধারণ, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং বাণিজ্যমূলক ব্যাংকগুলি হইতে। যখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে করের মাধ্যমে যা রাজস্ব পাওয়ার কথা ছিল তাহা পাওয়া গিয়াছে, সরকারের পক্ষে যাহা ব্যয়-সংকোচ করা সম্ভব ছিল তাহাও হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যতীত অন্যান্য ঋণের উৎস হইতে যাহা ঋণ পাওয়া যাইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল তাহাও পাওয়া গিয়াছে,—অথচ সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার আর্থিক সংস্থান করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হইতেছে না, তখন বাধ্য হইয়াই সরকারকে ঘাটতি বাজেটের সৃষ্টি করিয়া ইহার অর্থসংস্থান করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করার অর্থ হইতেছে নূতন নোট ছাপানো অথবা মুদ্রা সম্প্রসারণ করা। এই ব্যবস্থার ভাল-মন্দ দুইটি দিক আছে। ভাল দিকটি হইতেছে, যদি নূতন মুদ্রার সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয়, যদি শ্রমিকদের উৎপাদনীশক্তি উৎপাদনবৃদ্ধির পক্ষে উপযুক্ত হয় এবং গুণক বা মাল্টিপ্লায়ার নীতি (Multiplier Principle) কার্যকর হয়,—তবে ইহা দেশের উৎপাদন, জাতীয় আয় এবং নিয়োগের পরিমাণ বাড়াইয়া দিতে পারে। ইহার খারাপ দিকটি হইতেছে, বর্ধিত মুদ্রা যদি আনুপাতিক হারে উৎপাদন না বাড়াইতে পারে তবে ইহা মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করিবে। বিশেষতঃ অনুন্নত দেশগুলিতে নূতন মুদ্রা সম্প্রসারণে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা খুব প্রবল থাকে।

কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা থাকে বলিয়াই যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থানের জন্য সরকারের দিক হইতে ঋণ গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকা উচিত এই যুক্তি কখনই গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ শুধু কর ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়াই যে অর্থনৈতিক

উন্নয়নের জন্য আর্থিক সংস্থান করা যায় না তাহা বিভিন্ন দেশের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার আর্থিক সংস্থান কিভাবে হইয়াছে তাহা দেখিলেই প্রতীয়মান হয়। আমরা ভারতের বিভিন্ন পাঁচসালা পরিকল্পনার দিকে তাকাইলেই দেখিতে পাই এইগুলির অর্থসংস্থানের জন্য শুধু যে এককভাবে কর ব্যবস্থা অথবা ঋণ গ্রহণের উপর নির্ভর করা হইয়াছে তাহা নহে, উভয় পদ্ধতিই অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার আর্থিক সংস্থানের জন্য অপরিহার্য। এক্ষেত্রে একটি অপরটির প্রতিযোগী নয়, একটি অপরটির পরিপূরক (Complementary)।

করের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থান করিবার বিপক্ষে একটি যুক্তি এইভাবে দেখানো হয়,—যাঁহারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থানের জন্য কর প্রদান করিতেছেন, তাঁহারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফলগুলি ভোগ করিয়া যাইতে পারিতেছেন না, পরবর্তী যুগের লোকেরাই এই সুফলগুলি ভোগ করিবেন; অথচ কর প্রদানের বোঝা বহন করিতে হইতেছে বর্তমানকালের লোকদের। কিন্তু এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, বর্তমানে আমরা যে সুবিধাগুলি পাইতেছি অথবা বর্তমানে যে প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ হইয়াছে, সেইগুলির প্রারম্ভের সময় অতীত যুগের করদাতাগণই কর প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সেই বোঝা বহন করিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা বর্তমানের সুফলগুলি ভোগ করিতেছি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দেশের স্বার্থে করদাতাদের এই ত্যাগ স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং উপরোক্ত যুক্তিটি গ্রহণযোগ্য নহে।

কর-ব্যবস্থা দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হইতেছে নিম্নরূপ :—

(১) কর-ব্যবস্থা দেশের সঞ্চয়বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক; অর্থাৎ করের মাধ্যমে জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশ সংগৃহীত করিয়া সরকার ইহা মূলধন সৃষ্টির কাজে লাগাইতে পারে। (২) কর-ব্যবস্থা হইতে যে রাজস্ব পাওয়া যায় তাহা যদি বিশেষ উন্নয়ন-প্রকল্পের অর্থসংস্থানে ব্যয়িত হয়, তবে করদাতাগণও সেই প্রকল্পের কাজ ঠিকভাবে চলিতেছে কিনা সেইদিকে লক্ষ্য রাখিবার প্রেরণা পায়, এবং সরকারের পক্ষেও জনসাধারণের প্রদত্ত টাকা যাহাতে অনুৎপাদনমূলক কাজে ব্যয়িত না হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখার তাগিদ থাকে। (৩) কর ব্যবস্থার মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করার চেষ্টা চালানো যায়। সরকার কর্তৃক জনসাধারণ ব্যতীত অন্যান্য উৎস হইতে (যেমন কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্য-ব্যাংক) ঋণ গ্রহণ করিলে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হইবার যা সম্ভাবনা থাকে তাহার প্রতিবিধান করার জন্য কর-ব্যবস্থারও নূতনভাবে পুনর্বিন্যাস করিতে হয়। (৪) কর-ব্যবস্থার মাধ্যমে আয় ও ধনের বৈষম্য কমাইয়া দিয়া আয়ের পুনর্বণ্টন করা সম্ভবপর। ঋণ-গ্রহণের বিপক্ষে যে যুক্তিগুলি দেখানো হয় সেইগুলির মধ্যে প্রধান যুক্তি হইল, ইহাতে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তী যুগের জন্য একটি বোঝার সৃষ্টি হয়। কারণ সেই ঋণ পরিশোধ করার সময় আবার হয়ত নূতন কর ধার্য করা হইতে পারে।

কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে বর্তমানে ঋণ গ্রহণ করার মাধ্যমে যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইতেছে তাহা ভবিষ্যতে জাতীয় আয় এবং নিয়োগের পরিমাণ বাড়াইয়া দিবে। সুতরাং পরবর্তীযুগের করদাতাদের কর প্রদান করিবার ক্ষমতাও বেশী হইবে। মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা যে কোনও উন্নয়ন-প্রয়াসী দেশেই দেখা যায়। কারণ, উন্নয়নের আর্থিক সংস্থানের জন্য যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হউক না কেন, বর্তমানকালের কোন সরকারের পক্ষেই অতিরিক্ত মুদ্রার সৃষ্টি না করিয়া উপায় থাকে না। সেইজন্য যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থিক সংস্থানের জন্য কর ধার্য করা এবং ঋণ গ্রহণ করা উভয়েরই ব্যবস্থা থাকে। বর্তমানকালের আর্থিক ব্যবস্থায় একটি অপরটির পরিপূরক হইয়া গিয়াছে।

Limits to Public Debt

সরকারী ঋণের সীমা (Limits to Public Debt): সাধারণভাবে বিচার করিতে গেলে ঋণ গ্রহণ করার ব্যাপারে সরকারের ক্ষমতা অসীম; অর্থাৎ সরকার যত খুশী ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু তবুও সরকারের ঋণ গ্রহণ করিবার একটি সীমা আছে। যদি সরকার যতখুশী ঋণ গ্রহণ করেন তবে সরকারকে অনেকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। প্রথমত, যে ঋণ সরকার গ্রহণ করেন সেইগুলির জন্য সরকারকে সুদ প্রদান করিতে হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ে আসল টাকাও শোধ করিতে হয়। সুদ প্রদান করিবার জন্য সরকারকে দেশের কর-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিতে হয়। যদি বাৎসরিক সুদ প্রদানের টাকা অত্যধিক হয় তবে সরকার সেইজন্য অত্যধিক কর ধার্য করিতে পারে না। যদি প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে সরকার সেই টাকা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করে তবে ধনীদের উপর বোঝার সৃষ্টি হয়, এবং যদি পরোক্ষ করের মাধ্যমে সরকার সেই টাকা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করে তবে গরীবদের উপর অধিক চাপের সৃষ্টি হয়। সুতরাং শুধু ঋণ গ্রহণ করিলেই হয় না, কিভাবে সেই ঋণ বাবদ সুদের টাকা প্রদান করিতে হইবে তাহাও সরকারকে চিন্তা করিতে হয়; এবং সেই টাকার ব্যবস্থা করিবার সময় যদি সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোয় বিপর্যয়ের ("strains and stresses") সৃষ্টি হয় তবে সরকারের ঋণ গ্রহণ সীমিত হইয়া যায়। যদি সরকারী ঋণের ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়, তবে সরকারের ঋণ গ্রহণ সীমিত হয়। সরকারের পক্ষে অধিক ঋণ গ্রহণ করার একটি বিপদ আছে। যদি সরকারী ঋণের পরিমাণ অত্যধিক হইয়া যায়, তবে ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগ স্পৃহা (inducement to invest) কমিয়া যাইতে পারে। বিদেশী সরকার অথবা শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিও সেই দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য অধিক অর্থ বিনিয়োগ করিতে অনিচ্ছুক হইতে পারে। সুতরাং সরকারী ঋণের এই দিকটি বিবেচনা করিয়া কোন দেশের সরকারই যতখুশী ঋণ গ্রহণ করিতে সাহসী হন না। সর্বশেষে, আভ্যন্তরীণ ঋণ গ্রহণ করিবার সর্বাপেক্ষা নিরাপদ উৎস হইল জনসাধারণ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতে যদি সরকার ঋণ গ্রহণ করে তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট ছাপাইতে বাধ্য হয় এবং ইহার ফলে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়। বাণিজ্যমূলক ব্যাংকগুলির নিকট

হইতে যখন সরকার ঋণ গ্রহণ করে তখনও দেশে ক্রেডিটের সম্প্রসারণ হয়। সেইজন্য একদিকে মুদ্রাস্ফীতি এড়াইতে হইলে এবং অপরদিকে ঋণের মাধ্যমে অধিক অর্থ সংগ্রহ করিতে হইলে সরকারকে জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু জনসাধারণের ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে সরকারের ঋণ গ্রহণ করাও খুব সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। অনেকে বলেন, সরকারী ঋণের ফলে যে আর্থিক বোঝার সৃষ্টি হয় তাহাই সরকারী ঋণের সীমা সূচিত করে। যদিও অনেকে বলেন যে আভ্যন্তরীণ ঋণেব কোন বোঝা নাই, কারণ ঋণ শোধ করিবার জন্য সমাজের একশ্রেণীর লোকের উপর কর ধার্য করা হইলেও সেই কর হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব দেশের বাহিরে যায় না, তবুও আমরা এই যুক্তি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না করিয়া বলিতে পারি যে সরকারী ঋণ আদৌ বোঝার সৃষ্টি করে কিনা এবং তাহা সরকারের ঋণ গ্রহণকে সীমিত করে কিনা তাহা নির্ভর করে প্রথমত, ঋণের উপর, এবং দ্বিতীয়ত, এইজন্য যে কর ধার্য করা হয় সেই করেব প্রকৃতি (nature) ও হারের (rate) উপর। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সরকারের ঋণ গ্রহণ করাব ক্ষমতা একেবারে সীমাহীন নয় যদিও এই ক্ষেত্রে সরকারের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে।

Exercise

1. Distinguish between direct and indirect taxes; which kind of taxes do you support and why?

[প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের পার্থক্য দেখাও। ইহাদের মধ্যে কোন প্রকার কর তুমি সমর্থন কর এবং কেন ?] (৩৯৬-৩৯৭ পৃষ্ঠা ; ৩৯৯-৪০১ পৃষ্ঠা।)

2. Distinguish between (a) Direct and Indirect taxes. (b) Proportional and Progressive taxes. Do you support Progressive taxes? Give reasons for your answer.

[(ক) প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর এবং (খ) সমানুপাতিক কর ও প্রগতিশীল করের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। তুমি কি প্রগতিশীল কর সমর্থন কর ? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি প্রদান কর।] (৩৯৬-৩৯৭ পৃষ্ঠা ; ৪০১-৪০৩ পৃষ্ঠা।)

3. Discuss how Fiscal Policy may be used for the control of cyclical fluctuations.

[বাণিজ্যচক্রজনিত পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকারের আয়-ব্যয় নীতি কিভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহা আলোচনা কর।] (৪৪০-৪৪৪ পৃষ্ঠা।)

4. Describe the occasions when a Government is justified in borrowing to meet its expenditure.

[কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্ম ঋণ গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত তাহা বর্ণনা কর।] (৪৫০ পৃষ্ঠা ; ৪৫৪ পৃষ্ঠা)

5. Write a short note on Taxes on commodities.

[জিনিসের উপর কর ধার্য সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।]
(৩৯৮-৩৯৯ পৃষ্ঠা ; উদাহরণ হিসাবে ৪২৮-৪২৯ পৃষ্ঠার সারাংশ।)

6. Discuss the effects of a tax on a commodity.

[কোন্ জিনিসের উপর কর ধার্যের প্রভাব আলোচনা কর।]
(৩৯৮-৩৯৯ পৃষ্ঠা ; উদাহরণ হিসাবে ৪২৮-৪২৯ পৃষ্ঠার সারাংশ)

7. Write a short note on the principles which determine the incidence of taxes.

[যে নীতিগুলি দ্বারা করের বোঝা নিরূপিত হয় তাহার উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।] (৩৯৬-৩৯৭ পৃষ্ঠা।)

8. Discuss the factors which govern the incidence of a tax on (a) Commodities and (b) Monopoly.

[জিনিসপত্র এবং একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে করের বোঝা কি কি উপাদানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা আলোচনা কর।] (৩৯৮-৩৯৯ পৃষ্ঠা)

সংকেত : একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রেও পরোক্ষ কর প্রদানের বোঝা নির্ধারণ করার নীতি অনুসৃত হয়। কারণ, একচেটিয়া কারবারী একটি জিনিসেব একমাত্র বিক্রেতা। একচেটিয়া কারবারীর উপর যদি সরকার কব ধার্য করেন, তবে একচেটিয়া কারবারী সেই করের বোঝা ক্রেতার উপর চালন করেন। সেই বোঝা কতটা তীব্র হইবে তাহা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট জিনিষের জন্ম ক্রেতার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর।]

9. Under what circumstances is it justifiable to improve indirect taxes ?

[কোন্ অবস্থায় পরোক্ষ কর ধার্য করা যুক্তিসঙ্গত ?] (৪০০-৪০১ পৃষ্ঠা)

10. On what ground would you justify a progressive tax on incomes ? Discuss the economic disadvantages of a highly progressive income tax.

[আয়ের উপর প্রগতিশীল কর কিসের ভিত্তিতে তুমি সমর্থন করিবে ? বেশী প্রগতিশীল করের অর্থনৈতিক অসুবিধাগুলি আলোচনা কর।] (৪০২-৪০৩ পৃঃ)

11. How can the canon of equity be followed in a tax system ? [কোন্ কর ব্যবস্থায় ন্যায়পরতার সূত্রটি অনুসরণ করা যায় ?]
(৪০৬-৪০৭ পৃষ্ঠা)

12. Discuss the factors which govern taxable capacity of

the people. [জনসাধারণের কর প্রদানের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী উপাদানগুলি আলোচনা কর। (৪০৮-৪১১ পৃষ্ঠা)

13. Discuss the arguments for and against Sales Tax.
[বিক্রয় করের পক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তিগুলি আলোচনা কর।) (৪২৮-৪৩০ পৃষ্ঠা)

14. Comment on the different senses in which the term, "ability to pay taxes" has been interpreted. [যে সকল বিভিন্ন অর্থে "কর দানের সামর্থ্য" কথাটির ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে সেইগুলির উপর মন্তব্য কর।] (৪০৬-৪০৭ পৃষ্ঠা)

15. Draw a comparison between Income Tax and Death Duty. [আয়কর এবং মৃত্যুকরের মধ্যে তুলনা কর।] (৪২৩-৪২৪ পৃষ্ঠা)

16. Discuss the effects of Death Duty. [মৃত্যুকরের প্রভাব আলোচনা কর।] (৪২০-৪২১ পৃষ্ঠা)

17. Discuss the problems of capital gains and loans in taxation and show the merits and demerits of Capital Gains Tax. [কর ধার্যের ক্ষেত্রে মূলধনী লাভ লোকসানের সমস্যা আলোচনা কর এবং ইহার সুবিধা ও অসুবিধা দেখাও।] (৪২৫-৪২৭ পৃষ্ঠা)

18. Discuss the incidence of Income Tax on saving, inducement to work and risk-bearing capacity. [সঞ্চয়, কাজের আগ্রহ এবং ঝুঁকি বহনের ক্ষমতার উপর আয়-করের প্রভাব আলোচনা কর।]

(৪১৩-৪১৭ পৃষ্ঠা)

19. Examine the effects of Expenditure Tax. Do you prefer an Expenditure Tax to Income Tax? [ব্যয় করের প্রভাব পরীক্ষা কর। তুমি কি আয়কর হইতে ব্যয়কর বেশী পছন্দ কর?] (৪১৭-৪২০ পৃষ্ঠা)

20. Discuss the effects of Public Expenditure on national income of a country. [একটি দেশের জাতীয় আয়ের উপর সরকারী ব্যয়ের প্রভাব আলোচনা কর।] (৪৩৩-৪৩৪ পৃষ্ঠা)

21. Write notes on; (a) Deficit Financing and (b) Compensatory Spending. [(ক) ঘাটতি অর্থসংস্থান এবং (খ) পূরণমূলক ব্যয়ের উপর টীকা লিখ।] (ক) ৪৩৪-৪৩৫ পৃষ্ঠা; ৪৪৭-৪৪৮ পৃষ্ঠা; (খ) ৪৩৬-৪৩৭ পৃষ্ঠা

22. "An internally held public debt imposes no burden on the community." Examine the statement. [আভ্যন্তরীণ ঋণ সমাজের উপর কোন বোঝার সৃষ্টি করে না।" উক্তিটি পরীক্ষা কর।]

23. Discuss the relative arguments for and against a balanced budget and an unbalanced budget. [সম-বাজেট এবং অসম বাজেটের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি আলোচনা কর।]

25. Examine the case for and against (a) loans and (b) taxes as methods of finaneing econcmic development. [অর্থনৈতিক উন্নয়নেব অর্থসংস্থানে ঋণ এবং করের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি পরীক্ষা কর।]

26. Discuss the effects of Public Expenditure. [সরকারী ব্যয়ের ফলাফল আলোচনা কর।](৪৩৩-৪৩৭ পৃষ্ঠা)

27. Discuss the goals of Fiscal Policy.

[সরকারের আয়-ব্যয় নীতির উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা কর।] (৪৩৭-৪৪০ পৃষ্ঠা)

28. Discuss the limitations of contra-cyclical Fiscal Policy. What are the conditions of its success ?

[বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধকারী সরকারী আয়-ব্যয় নীতির সীমাবদ্ধতা আলোচনা ইহার সাফল্যের শর্ত কি ?] (৪৪৪-৪৪৬ পৃষ্ঠা)

29. Examine the various aspects of a cyclically flexible Public Works Policy.

[বাণিজ্যচক্রের পরিবর্তনের সঙ্গে নমনীয় সরকারী বিনিয়োগ নীতির বিভিন্ন দিক পরীক্ষা কর।] (৪৪২-৪৪৩ পৃষ্ঠা)

30. What are the different types of Public Expenditure. Discuss the causes of inereasing government expenditure in recent times. [সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন ধরণের সরকারী ব্যয়বৃদ্ধির কারণগুলি আলোচনা কর।] (৪৩০-৪৩৩ পৃষ্ঠা)

31. Discuss the principles of Taxation.

[কর ধার্যের নীতিগুলি আলোচনা কর।] (৪০৫-৪০৮ পৃষ্ঠা)

32. Examine the relative roles of Single Tax system and Multiple Tax System. [এককর ব্যবস্থা ও বহুকর ব্যবস্থার পারস্পরিক ভূমিকা পরীক্ষা কর।] (৪০৪ পৃষ্ঠা)

33. Discuss the characteristics of a good tax system.

[একটি ভাল কর ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।] (৪০৪-৪০৫ পৃষ্ঠা)

34. Draw a comparison between Income Tax and Sales Tax. [আয়কর এবং বিক্রয়করের মধ্যে তুলনা কর।] (৪৩০ পৃষ্ঠা)

35. Examine the effectiveness of fiscal policy in controlling inflation. [মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের আয় ব্যয় নীতির কার্যকারিতা পরীক্ষা কর।] (৪৪১-৪৪২ পৃষ্ঠা)

36. Write a note in Fiscal Policy for controlling depression

[মন্দা প্রতিরোধে সরকারের আয়-ব্যয় নীতির উপর একটি টীকা লিখ।]

(৪৪২-৪৪৪ পৃষ্ঠা)

অষ্টবিংশ অধ্যায়

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং অর্থ´নৈতিক উন্নয়ন

(The Economic Activities of the State and Economic Development)

যে কোন অর্থনৈতিক কাঠামোয় দেশের অর্থ´নৈতিক উন্নয়নে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। অ্যাডাম স্মিথ প্রমুখ আগেকার দিনের অনেক ধনবিজ্ঞানী ব্যবসায় বাণিজ্যে ও দেশের অর্থ´ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ পছন্দ করিতেন না। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ যে কোন ক্ষেত্রেই অবাঞ্ছনীয় এবং ব্যবসায়ীগণের উদ্যোগ নষ্ট করে। প্রত্যেক উৎপাদকই সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের কাজ করে এবং সরকারের উচিত নয় ইহাতে হস্তক্ষেপ করা। সুতরাং সরকারের প্রকৃতপক্ষে কোন অর্থ´নৈতিক কাজ নাই।

কিন্তু এই নীতি বেশী দিন লোকের সমর্থন পাইল না। ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের পর হইতে দেশের অর্থনৈতিক জীবন এত জটিল হইয়া পড়িল যে শ্রমিকশ্রেণীর কাজের ব্যবস্থা, বাসস্থানের ব্যবস্থা, মজুরি নির্ধারণ, মালিকের শোষণের হাত হইতে রক্ষা, প্রতিযোগিতায় বিপর্যস্ত শিল্পগুলির রক্ষা, বেকার সমস্যার সমাধান, একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে সরকারের হস্তক্ষেপ বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়ে। দেশে যদি কল্যাণ-রাষ্ট্র (Welfare State) প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তবে সরকারকে কিছু না কিছু অর্থনৈতিক কাজ করিতেই হইবে। সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলিতে সম্পূর্ণভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণে অর্থ´নৈতিক উন্নতি সাধিত হয়। সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ সামাজিক মালিকানায় থাকে। রাষ্ট্র সমুদয় উপকরণ নিজের নিয়ন্ত্রণে আনিয়া দেশের অগণিত জনসাধারণের কল্যাণ করিতে চেষ্টা করে। শিল্প ও অন্যান্য অর্থ নৈতিক প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা দেশে আয় ও ধনের বৈষম্য কমাইয়া দেওয়া, জনসাধারণের জন্য সম্পূর্ণভাবে অর্থ নৈতিক সাম্য বজায় রাখা—এইগুলিই সমাজতন্ত্রী সরকারের অর্থ নৈতিক কাজ। দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের জন্য সমাজতন্ত্রী সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা (Development Planning) বা অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা (Economic Planning) তৈয়ার করেন এবং ইহাকে সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করিবার চেষ্টা করেন।

সরকারের অর্থ নৈতিক কাজ (Economic Functions of the State): **সরকার ও শ্রমিক**—শ্রমিকগণের কল্যাণের জন্য এবং তাহাদের উৎপাদনীশক্তি বাড়াইবার জন্য সরকারকে অনেক কাজ করিতে হয়। শ্রমিকদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার করা, উপযুক্ত মজুরি প্রদান করিবার ব্যবস্থা করা, শ্রমিকদের কাজের উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি করা, বাসস্থান ও কাজের অবস্থার উন্নতি করা, চাকুরীর নিরাপত্তা ও অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, নারী-

শ্রমিকদের প্রসূতিকালীন ভাতা প্রদান করা, পঙ্গু, বৃদ্ধ ও বেকার শ্রমিকদের আর্থিক সাহায্য করা, এই কাজগুলি আধুনিক সরকারগুলি কিছু না কিছু করিয়া থাকে।

সরকার ও শিল্প—দেশে শিল্পের উন্নতির জন্য রাষ্ট্রকে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। শিল্পের উন্নতির জন্য অধিক পরিমাণে মূলধন সরবরাহ করা, শিল্পপতিদের বিনিয়োগ করিবার উৎসাহ বাড়াইয়া দেওয়া, শিল্প-শ্রমিকদের কর্মনিপুণ করা, মালিক ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করা, প্রয়োজন হইলে শিল্প জাতীয়করণ করা, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে বৃহদায়তন শিল্পগুলির সহিত প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করা, আধুনিক সরকারগুলিকেই এই কাজগুলি করিতে হয়।

সরকার ও বেকার সমস্যা ঃ আধুনিক সরকারগুলির অন্যতম প্রধান কাজ হইতেছে দেশে বেকার সমস্যার সমাধান করা। এইজন্য সমাজতন্ত্রী দেশগুলিতে বেকার ভাতা দেওয়া হয়। সমাজতন্ত্রী না হইয়াও কোন কোন দেশ (যেমন, শ্রমিক সরকারের আমলে ইংলণ্ড) বেকার ভাতা প্রদান করিয়াছে। বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য সরকারকে নূতন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে হয়, জাতীয় উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হয় এবং নিজের উদ্যোগে রাস্তাঘাট নির্মাণ, গৃহনির্মাণ, রেলপথ প্রভৃতি সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ (Public works) আরম্ভ করিতে হয় যাহাতে বেকার শ্রমিকগণ কাজ পায়। প্রয়োজন হইলে দেশের কর-ব্যবস্থার (Tax system) পরিবর্তন করিয়া এবং নূতন কাগজী টাকা ছাপাইয়া সরকারকে এইসব বিনিয়োগের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়। সাধারণতঃ গরীবদের উপর হইতে করের বোঝা তুলিয়া দিয়া অথবা কর প্রদানের হার কমাইয়া দিয়া এবং বড়লোকদের উপর নূতন কর স্থাপন করিয়া অথবা বর্তমান করগুলির হার বাড়াইয়া দিয়া সরকারকে অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়। অনেক সময় বাজেটে আয় অপেক্ষাও ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া এবং বাড়তি ব্যয়ের জন্য নূতন টাকার সৃষ্টি করিয়া সরকারকে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হয় এবং অন্যান্য বিনিয়োগে হাত দিতে হয়।

সরকার ও আয়বৈষম্য ঃ আধুনিককালে প্রত্যেক গণতান্ত্রিক সরকার চেষ্টা করেন জনসাধারণকে সমান অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিবার জন্য। আবার, সমাজতন্ত্রী সরকারগুলিও দেশ হইতে আয় ও ধনের সমুদয় বৈষম্য দূর করিতে চেষ্টা করে। এইজন্য সরকার বড়লোকের উপর অধিক আয়কর, সম্পত্তি কর ও অন্যান্য কর স্থাপন এবং গরীবদের কর হইতে রেহাই প্রদান ইত্যাদি ব্যবস্থা অবলম্বন করে। তাহা ছাড়া, গরীবদের নানাভাবে আর্থিক সাহায্য প্রদান করিয়াও তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিবার চেষ্টা করা হয়। আবার, দেশের অর্থনৈতিক শক্তি যাহাতে একস্থানে কেন্দ্রীভূত না হইয়া দেশের সর্বত্র ন্যায়সঙ্গতভাবে এবং সমানভাবে বণ্টিত হয়, সেজন্য সরকারের ব্যয়-নীতিকেও পরিকল্পিত উপায়ে পরিচালনা করিতে হয়। বিশেষতঃ অপেক্ষাকৃত গরীবদের জন্য সরকারী ব্যয়ে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া

তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিবার চেষ্টা করা হয়। এজন্য আধুনিক সরকারগুলি (যেমন ভারত) গ্রামাঞ্চলে সমাজ-সেবামূলক কাজের ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

সরকার ও মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ : দেশে যদি মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া যায় তবে জনসাধারণের বিভিন্ন জিনিস কিনিবার ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। কিন্তু, যদি সেই অনুপাতে দেশের উৎপাদন না বাড়ে তবে দেশে জিনিসপত্রের দাম খুব বাড়িয়া যায়। মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করিবার জন্য সরকারকে একটি সুনির্দিষ্ট মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন করিতে হয়। প্রয়োজন হইলে সরকার ব্যাংকের মারফৎ অথবা জনসাধারণের উপর কর বৃদ্ধির মারফৎ দেশ হইতে মুদ্রার পরিমাণ কমাইবার চেষ্টা করে। তাহা ছাড়া, আবশ্যকীয় জিনিসপত্রের নিয়ন্ত্রণ করিয়া এবং সর্বোচ্চ দাম নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া রাষ্ট্র মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করিতে পারে।

সরকার ও বহির্বাণিজ্য : দেশের বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা রাষ্ট্রের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। দেশে আমদানির পরিমাণ কমাইয়া দিয়া দেশ হইতে বিদেশে জিনিসপত্রের রপ্তানি বাড়াইয়া দিতে সব রাষ্ট্র চেষ্টা করিয়া থাকে। আমদানি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার আমদানি নিয়ন্ত্রণ-নীতি প্রবর্তন করেন অথবা বিদেশ হইতে আমদানি করিবার জিনিসপত্রের উপর বেশী হারে শুল্ক ধার্য করেন। কোন কোন দেশে আজকাল রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের (State Trading) প্রচলন করা হইয়াছে।* ভারতবর্ষেও রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের প্রবর্তন হইয়াছে। ইহাতে কতিপয় নির্দিষ্ট দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণেব সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্র নিজের হাতে গ্রহণ করে। প্রয়োজন হইলে সরকার বিভিন্ন শিল্পকে সংরক্ষণ প্রদান করে। ইহাতে একদিকে যেমন দেশের শিল্পোন্নয়নের ব্যবস্থা হয়, অপরদিকে সেই প্রকার বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা উন্নত হয়।

সরকার ও অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা : দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে সরকারের প্রধান ভূমিকা হইতেছে একটি অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা গঠন কবা। সরকার যদি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হন তবে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করেন। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী না হইলেও যে কোন সরকার অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করিতে পারেন। অনেক গণতান্ত্রিক, অনগ্রসর দেশ অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা চালাইতেছে।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (State Trading): সমাজতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ দেশগুলিতে রাষ্ট্র দেশের বাণিজ্য পরিচালনা করিয়া থাকে। বিভিন্ন শিল্পেব উপর ব্যক্তিগত মালিকানার (Private ownership) স্থলে সরকারী মালিকানার (Social ownership) প্রতিষ্ঠা হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যতীত অন্যান্য দেশগুলিতেও

অনেক সময় কিছু পরিমাণে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য দেখিতে পাওয়া যায় (যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে)। তবে ধনতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য এবং সমাজতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য পরিচালনার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। সমাজতান্ত্রিক অথবা সাম্যবাদী দেশগুলিতে উৎপাদন ব্যবস্থা এবং বণ্টন ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থাকে বলিয়া রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য অপরিহার্য হইয়া পড়ে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া (যেমন কোন রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান দ্বারা পণ্য ক্রয় করা এবং ব্যবসায়ের ভিত্তিতে সেই পণ্য পুনর্বিক্রয় করা) রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের প্রবর্তন করা হইয়া থাকে। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য পরিচালনার ফলে অনেক সময় রাষ্ট্র মুনাফা অর্জন করিতে পারে। কিন্তু কিন্তু সব সময়েই যে মুনাফা অর্জনের নিমিত্ত রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের প্রবর্তন করা হইয়া থাকে, তাহা নহে।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদান করা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি

(ক) রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ভোগ-সামগ্রীগুলির ক্ষেত্রে প্রবর্তিত হইলে বৈদেশিক বাণিজ্য-বালান্সের অবস্থা অনেক উন্নত হইবে এবং বাণিজ্যক্ষেত্রে কোন দেশ দর কষাকষি (bargaining) সাহায্যে সুবিধাজনক শর্ত আদায় করিতে পারিবে। যদি এই সকল ভোগসামগ্রীর ক্ষেত্রে অনেক বেসরকারী ব্যবসায়ী থাকে, তবে বেসরকারী ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বিপুল প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হইবে এবং তাহাতে সমগ্র দেশের পক্ষে সুবিধাজনক লেনদেনের শর্ত আদায় করা যাইবে না।

(খ) রাষ্ট্র যদি দেশের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে পণ্য ক্রয় করিয়া বিদেশের বাজার দরে তাহা বিক্রয় করিয়া কিছু মুনাফা অর্জন করে, তবে ইহা দেশের বাণিজ্যাবস্থার উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে। সরকারী ক্ষেত্রে এই উদ্বৃত্ত লাভ দেশের জনকল্যাণে ব্যয়িত হইতে পারে। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তিত হইলে বেসরকারী বাণিজ্য পরিচালনার সকল ত্রুটি দূর হইবে।

(গ) দেশের শিল্পগুলির জন্য কাঁচামাল সরবরাহ অব্যাহত রাখিবার জন্য বিভিন্ন সরকার পরস্পরের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য-চুক্তি (Bilateral Trade Agreements) সম্পাদন করিয়া থাকেন। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তিত হইলে এই সকল চুক্তির সর্ত পালন করা এবং চুক্তিগুলির শর্ত পালনের ফলস্বরূপ শিল্পোন্নয়নের জন্য কাঁচামাল সরবরাহের নিশ্চয়তা সৃষ্টি করা সম্ভবপর হইবে।

(ঘ) অনুন্নত দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যাবস্থার উন্নয়ন অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করিতে হইবে। শুধু আমদানি নিয়ন্ত্রণ এবং রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণ করিলেই হইবে না। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সহিত যাহাতে পূর্ণ সামঞ্জস্য বজায় থাকে সেই ভাবে বিভিন্ন পণ্যের আমদানি নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। তাহা সম্ভব হইতে পারে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য পরিচালনার সাহায্যে।

(ঙ) অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের বিশেষ দরকার। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সাহায্যে সরকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অধিকতর সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের বিপক্ষে যুক্তি

বেসরকারী ক্ষেত্রের ব্যবসায়ীগণ স্বভাবতঃই রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যকে প্রীতির চোখে দেখেন না। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তিত হইলে বেসরকারী ক্ষেত্রের শিল্প-বাণিজ্যে ভীতির সঞ্চার হইবে এবং শিল্পপতিদের বিনিয়োগ-স্পৃহা এবং ব্যবসায়ের উত্তম কমিয়া যাইবে।

ভারতের কর তদন্ত কমিশন (Taxation Enquiry Commission) মনে করেন "অল্প সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের ফলে রাজস্বের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য ফল পাইবার সম্ভাবনা নাই। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন হইতেছে ব্যবসায়ে বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মচারীর। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য পরিচালনা করিবার মত প্রকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন পরিচালক সরকারের আছে কিনা সেই বিষয়ে প্রশ্ন উঠে। যখন দ্রব্যমূল্যের স্তর উপরের দিকে, তখনই রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তনের প্রকৃষ্ট সময়।"[১]

অধ্যাপক জেকব ভাইনার (Jacob Viner) রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তনের বিরোধী। তাঁহার মতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের উপর গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং সেই প্রতিক্রিয়ার ফল অনেক সময় রাজনৈতিক সম্পর্কের মধ্যেও প্রতিভাত হয়।

শিল্প জাতীয়করণের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি : সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহাতে সমুদয় শিল্প জাতীয়করণ করা হয় এবং উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা শিল্প জাতীয়করণের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদান করিতে পারি।

জাতীয়করণের পক্ষে যুক্তি : (১) জাতীয়করণ করা না হইলে ব্যক্তিগত মালিকানার আওতায় একই শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। তাহাতে বহু অর্থ ও শ্রমের অপচয় ঘটে। জাতীয়করণ করা হইলে কোন শিল্পের প্রতিযোগিতাজনিত ক্ষতি হয় না।

(২) ব্যক্তিগত মালিকানায় জিনিসের প্রকৃতি যেরূপই হউক না কেন মালিকগণের লক্ষ্য থাকে অধিক মুনাফা অর্জনের প্রতি। সেখানে শুধু মুনাফার জন্য শ্রমিকসমাজকে শোষণ করা হয়। তাহা ছাড়া, ব্যক্তিগত মালিকানায় আওতায় জিনিসপত্রের দাম

---

১ "No spectacular results from the point of view of revenue, may be expected from state trading over a short period, State trading requires personnel, specialised experience of business and raises the question of the adequacy of the government machinery at present for the task."

অপেক্ষাকৃত বেশী থাকে। শিল্প জাতীয়করণ করা হইলে সরকারের অধিক মুনাফার লোভ থাকে না বলিয়া বিভিন্ন সামগ্রীর দাম কম থাকে।

(৩) শিল্পের জাতীয়করণ করা হইলে সমগ্র জাতির কল্যাণ হয়। শিল্পের মালিকানা আসে রাষ্ট্রের হাতে। জনগণের কি রকম অবস্থায় বেশী মঙ্গল হইতে পারে সেই চিন্তার দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করে। বিভিন্ন সামগ্রীর মান উন্নয়ন এবং সমাজের প্রয়োজন মত উৎপাদন সরকার করিয়া থাকেন।

(৪) ব্যক্তিগত মালিকানার আওতায় শ্রমিকগণের ন্যায়সঙ্গত মজুরি পাওয়া সহজ নয়। রাষ্ট্রের হাতে শিল্প পরিচালনার ভার থাকিলে শ্রমিকগণের ন্যায়সঙ্গত মজুরি এবং কাজের শর্তাদি লাভ করিবার উপায় সহজতর হয়।

(৫) অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য শিল্পের জাতীয়করণ অপরিহার্য। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকর হয় সরকারের পরিচালনা এবং কর্তৃত্বাধীনে।

জাতীয়করণের বিপক্ষে যুক্তি : (১) মূলধন-গঠনের সমস্যায় জর্জরিত অনগ্রসর দেশে শিল্প জাতীয়করণ করা হয়। বড় বড় শিল্পপতিগণ মূলধন-গঠন এবং মূলধন বিনিয়োগের কাজে আগাইয়া আসিবেন না। সেইজন্য অনেকে অভিমত পোষণ করেন যে, মূলধন-গঠনের কাজ যাহাতে ব্যাহত না হয়, সেইজন্য কিছু সময়ের জন্য সামগ্রিকভাবে জাতীয়করণ নীতি কার্যকর করা উচিত নহে।

(২) অনেক অর্থবিজ্ঞানী এই আশংকা করেন যে শিল্প জাতীয়করণের সাহায্যে অধিক উৎপাদন করা সম্ভবপর নাও হইতে পারে। ব্যক্তিগত মালিকানার আওতায় শিল্পপতিগণ অধিক মুনাফা আদায়ের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন।

(৩) সরকারী কর্মচারিগণের কাজে অবহেলার জন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির কর্মদক্ষতা কমিয়া যাইতে পারে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণের কাজের স্থিতিকাল নির্ভর করে কর্মদক্ষতা এবং পারদর্শিতার উপর। পক্ষান্তরে সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীকালের দৈর্ঘ্যের উপরই কর্মচারীগণের পদোন্নতি নির্ভর করে। তাহা ছাড়া, বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্পপতিগণের বিশেষ লক্ষ্য থাকে যাহাতে কোন কাঁচা মালের অপচয় না ঘটে। শিল্প পরিচালনা করিবার শক্তিও সাধারণতঃ সরকারী কর্মচারীগণ অপেক্ষা তাঁহাদের বেশী থাকে।

(৪) অনেকে গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া বলিয়া থাকেন শিল্প জাতীয়করণ করিলে শিল্পপতিগণের ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করা হয়। তাঁহারা ধনতান্ত্রিক দেশগুলির উদাহরণ দেখাইয়া বলেন যে, শিল্প রাষ্ট্রীয়করণ করায় রাশিয়ার যে শিল্পোন্নতি হইয়াছে জাতীয়করণ নীতি গ্রহণ না করায় আমেরিকায় তাহা অপেক্ষা আরও বেশী শিল্পোৎপাদন ঘটিয়াছে।

(৫) কেহ কেহ বলিয়া থাকেন সরকারের হাতে যে অর্থসম্পত্তি আছে, তাহা কার্যরত শিল্পগুলিতে খরচ না করিয়া রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠায় খরচ করা উচিত। তাহাতে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে।

(৬) দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য এবং দেশকে মুদ্রাস্ফীতির কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রধান প্রয়োজন হইল উৎপাদন বৃদ্ধি। দেশের সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে বেসরকারী ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কখনই অস্বীকার করা যায় না। রেলপথ, ডাকঘর, টেলিফোন ইত্যাদি সরকারী কর্ম-প্রতিষ্ঠানেও লাভ-লোকসানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই সব কাজ করা হয়। অথচ ইহারা জনকল্যাণের আদর্শকে সামনে রাখিয়াই কাজ করে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষেও জনকল্যাণের আদর্শকে সামনে রাখিয়া শিল্পোৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করা অসম্ভব নয়।

মার্ক্সের উন্নয়নতত্ত্ব (Marxian Theory of Development): সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন কার্ল মার্ক্স (Karl Marx)। ১৮৬৭ সালে মার্ক্স তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত "Das Capital" বইয়ে ঘোষণা করেন যে সমাজতন্ত্রই যে কোনও রাষ্ট্রব্যবস্থার চরম পরিণতি। মার্ক্সের সমাজতন্ত্র তিনটি মূল সূত্রের উপর ভিত্তিশীল। সেইগুলি হইতেছে, (১) উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব (Theory of Surplus Value), (২) ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা (Materialist Conception of History) এবং (৩) শ্রেণী সংগ্রাম মতবাদ (Theory of Class Struggle)। মার্ক্সের মতে উৎপাদনের উপাদান মাত্র একটি, এবং তাহা হইতেছে 'শ্রম'। শ্রমিক যে কাজ করে তাহার দুইটি সময় আছে, একটি হইতেছে সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় পরিশ্রমের সময় (socially necessary labour time), এবং অপরটি হইতেছে অতিরিক্ত পরিশ্রমের সময় (surplus labour time)। শ্রমিক কর্তৃক উৎপাদিত সামগ্রী মালিক যে দামে বিক্রয় করে, শ্রমিক সেই পরিমাণে মজুরি পায় না। যতটা মজুরি তাহাকে দেওয়া হয়, তাহা হইতেছে সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় পরিশ্রমের মূল্য এবং যতটা মজুরি হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা হইতেছে তাহা হইতেছে তাহার অতিরিক্ত পরিশ্রমের সময়ের মূল্য। এই উদ্বৃত্ত মূল্য হইতে মূলধনের সঞ্চয় (accumulation of capital) হয়, এবং মার্ক্স ইহাকে "Organic Composition of Capital" আখ্যা দিয়াছেন। ইহার দুইটি পরিণতি দেখা যায়। প্রথমত, একদিকে মালিক শ্রেণীর হাতে যতই মূলধন সঞ্চিত হইবে অপরদিকে শোষিত শ্রমিক শ্রেণী ততই সংঘবদ্ধ হইবে। দ্বিতীয়ত, মালিকদের মূলধন যতই বিনিয়োগ করা হইবে, অতিরিক্ত শ্রমিকগণ (reserve army of labour) ততই কাজে নিযুক্ত হইবে। পরে দেখা যাইবে যত বিনিয়োগ হইতেছে, সেই পরিমাণ শ্রমিক লওয়া হইতেছে না এবং মুনাফার হার আরও কমিয়া আসিতেছে (Falling rate of Profit)। তখনই ধনতন্ত্রের সংকট (crisis) আগাইয়া আসে এবং শ্রমিক শ্রেণী সংঘবদ্ধ হইয়া মালিক শ্রেণীকে অপসারণ করে এবং শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র (Dictatorship of the Proletariat) প্রতিষ্ঠা করে। শ্রমিক শ্রেণীর সংঘবদ্ধ হইবার আরও একটি কারণ হইতেছে শ্রেণী সংগ্রাম। মার্ক্সের মতে মানুষের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনধারা তাহার অর্থনৈতিক জীবনেরই একটি প্রতিবিম্ব। ইতিহাসের দিকে তাকাইলে

বরাবরই একটি শ্রেণী সংগ্রাম দেখা যায়। মধ্যযুগের সংগ্রাম ছিল ভূম্যধিকারী অভিজাত সম্প্রদায় (feudal lords) এবং কৃষকদের মধ্যে ; শিল্প-বিপ্লবের পর সেই সংগ্রাম দেখা যাইতেছে মালিক শ্রেণী এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে। মার্ক্সের মতে আধুনিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে শ্রমিক-মালিক বিরোধ নিহিত আছে। ইহার ফলেই একদিন শ্রমিক শ্রেণী সংঘবদ্ধ হইয়া বিপ্লবের মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ঘটাইবে।

খুব সংক্ষেপে ইহাই হইতেছে মার্ক্সের উন্নয়ন তত্ত্বের গোড়ার কথা। শ্রমিকশ্রেণীর কাছে এই মতবাদের অকৃত্রিম আবেদন আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই তত্ত্বের একটি ত্রুটি হইতেছে এই যে শ্রমই উৎপাদনের একমাত্র উপকরণ নয়। বিভিন্ন শ্রমিকের উৎপাদনী শক্তি বিভিন্ন ধরনের ; সুতরাং তাহাদের মজুরির হারও বিভিন্ন। মার্ক্স এই বিষয়গুলি গভীরভাবে চিন্তা করেন নাই। তাহা ছাড়া, মানুষের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস যে সর্বদাই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে তাহা নহে।

আধুনিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য (Features of a modern socialist economy) ঃ আধুনিক সমাজতন্ত্রে, যেমন, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজের সমস্ত ধনসম্পদের ন্যায়সঙ্গতভাবে সমান বণ্টন করিয়া সামগ্রিক সমাজ কল্যাণ সাধন করাই সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য। সেইজন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ করা হয় এবং উৎপাদানের উপাদানগুলিকে সামাজিক মালিকানার অধীনে আনা হয়। তাহা ছাড়া, সমাজের বিভিন্ন শিল্প অথবা উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টাগুলিকেও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বিবেচ্য বিষয়। ব্যক্তিগত মুনাফার স্থলে সামাজিক মুনাফা বৃদ্ধি করাই সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্যতম উদ্দেশ্য। শুধু আয় ও ধনের বৈষম্য কমাইলেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না। সমাজতন্ত্রে সমাজের প্রত্যেকটি লোকের কর্মসংস্থান করিয়া দেওয়া হয় এবং পরিকল্পনার (planning) মাধ্যমে সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করিয়া দেশের সমুদয় সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন করাও সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য।

সমাজতন্ত্রের অসুবিধা (Difficulties in a Socialist Society) ঃ যাহারা সমাজতন্ত্রের বিরোধী তাহাদের মতে এই ব্যবস্থার প্রথম ত্রুটি হইতেছে এই যে ইহা রাষ্ট্রের কর্মক্ষমতার উপর অত্যধিক আস্থা রাখে, এবং তাহা ছাড়া সমাজতান্ত্রিক সরকার ব্যক্তিবিশেষের কর্মক্ষমতার উপর অত্যধিক আস্থা রাখে। কিন্তু অনেক সময় ব্যক্তি বিশেষের কর্মক্ষমতা ও রাষ্ট্রে সুদক্ষ কর্মচারী পাওয়া কষ্টকর হইতে পারে এবং পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের কাজেও ভুলচুক হইতে পরে ; ইহাতে সমস্ত সমাজের ক্ষতি হয়। দ্বিতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক সরকার ব্যক্তিগত কর্মক্ষমতার প্রকৃত মর্যাদা দেয় না। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতাকে অবহেলা করা হয়। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়নের বেসরকারী প্রয়াস ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ধনতন্ত্রে বেসরকারী শিল্পপতিগণ লাভের আশায় নিজ নিজ শিল্পের উন্নতি করেন। ইহাতে তাহাদের নিজেদের কিছু পরিমাণে লাভ অর্জন করা সম্ভবপর হয়, দেশেরও শিল্পোন্নয়ন হয়। সমাজতন্ত্রের অধীনে ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উচ্ছেদ ও সরকারের অর্থ-নৈতিক ক্রিয়াকলাপ জনসাধারণের কর্মোদ্যম নষ্ট করিয়া দেয়। তাহা ছাড়া, প্রত্যেকেরই বৃত্তি নির্বাচনের (choice of occupation) ক্ষমতা থাকে রাষ্ট্রের হাতে। চতুর্থত, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থকদের মতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া উৎপাদনের প্রকৃত পরিমাণ কমিয়া যাইতে পারে। কারণ, সেক্ষেত্রে ব্যক্তিগত লাভের আশায় বেশী করিয়া উৎপাদন করিবার সুযোগ শ্রমিকগণ পায় না। ধনতন্ত্রের সমর্থকগণ বলেন, আমেরিকা একটি ধনতান্ত্রিক দেশ হইলেও সেই দেশের শ্রমিকদের অবস্থা যে খুব খারাপ তাহা নহে। বরং একজন আমেরিকানের মাথাপিছু আয় অপেক্ষা একজন রাশিয়ানের মাথাপিছু আয় অপেক্ষা অনেক বেশী। জীবনযাত্রার মানও রাশিয়া অপেক্ষা আমেরিকায় অনেক উন্নত।

ধনতন্ত্রের সমর্থকদের মতে সমাজতন্ত্রে জিনিসপত্রের দাম নিরূপণে অসুবিধা দেখা যায়। অধ্যাপক মাইসেস (Prof. Mises) বলেন, সমাজতন্ত্রে যুক্তিসঙ্গতভাবে অর্থ-নৈতিক সম্পদের বণ্টন কিংবা অর্থনৈতিক হিসাব-নিকাশ করা অসম্ভব। ("Under socialism, rational economic calculation is impossible") এই যুক্তি অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে উপকরণের প্রতিযোগিতামূলক বাজার নাই। প্রতি-যোগিতামূলক বজায় না থাকায় সর্বদা প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় অনুযায়ী জিনিসপত্রের দাম নিরূপণ করা হয় না এবং সর্বনিম্ন খরচ অনুযায়ী (minimum average cost) একান্ত কাম্য উৎপাদন (optimum output) করা সম্ভব হয় না। কিন্তু অধ্যাপক ডিকিনসন (Dikinson), অধ্যাপক লাংগে (Lange) এবং অধ্যাপক টেলর (Taylor) এই অভিযোগ খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে কোন বিশেষ সমাজব্যবস্থার সহিত মূল্য নিরূপণের কোন সম্বন্ধ নাই। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও সংখ্যাতাত্ত্বিক উপায়ে সামগ্রিক চাহিদা এবং সরবরাহ স্থির করিয়া প্রত্যেক উপকরণের হিসাব-মূল্য (accounting price) বাহির করা হয়। সমাজতন্ত্রবাদে কোন জিনিসের করে রাষ্ট্রের উপর। রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে কোন জিনিসের দাম বাড়াইয়া দিয়া লাভ অর্জন করিতে পারে ; কিন্তু সেই লাভ হইবে সামাজিক লাভ এবং তাহা সামাজিক কল্যাণের জন্য খরচ করা হইবে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জিনিসের মূল্য নিরূপণ করা অসুবিধাজনক কিনা

অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপাদান : অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া খুবই গৌণ। প্রকৃত জাতীয় আয় (Real National Income) যদি বাড়িতে থাকে এবং জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি যদি স্থিতিশীল হয়, তবেই দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতেছে বলা যায়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলিতে বুঝায়,

যে হারে জনসংখ্যা বাড়ে তাহা অপেক্ষা বেশী হারে জাতীয় আয় অথবা তাহা অপেক্ষা বেশী হারে জনপ্রতি উৎপাদন (Per capita output) ও জনপ্রতি প্রকৃত আয় (Per capita real income) বাড়ে। দেশের জনসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদের অনুপাতে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিই প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থ।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থ

প্রসিদ্ধ অর্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক হ্যারড (Harrod) এবং ডোমারের (Domar) মতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন মূলতঃ নির্ভর করে দুইটি জিনিসের উপর; সঞ্চয় বৃদ্ধির হার (Rate of growth of Saving) অথবা মূলধন সৃষ্টির হার (Rate of capital formation) এবং মূলধন-উৎপাদন অনুপাতের (Capital-Output Ratio) উপর।[১] মূলধন সৃষ্টির হার যত বেশী হইবে এবং মূলধন-উৎপাদনের অনুপাত যত কম হইবে তত দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন হইবে। মূলধন-উৎপাদন অনুপাত বলিতে আমরা বুঝি, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কি পরিমাণ মূলধনের দরকার। যদি মূলধনের প্রয়োজন উৎপাদনের পরিমাণ অনুযায়ী বেশী হয়, তবে মূলধন-উৎপাদনের অনুপাত বেশী; তখন বুঝিতে হইবে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের উৎপাদনী শক্তি বা শ্রমিকের উৎপাদনী শক্তি কম। যদি মূলধন-উৎপাদন অনুপাত কম হয়, তবে বুঝিতে হইবে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের উৎপাদনী শক্তি বা শ্রমিকের উৎপাদনী শক্তি বেশী। তবু সঞ্চয় বৃদ্ধির হার এবং কম মূলধন-উৎপাদন অনুপাত থাকিলেই চলিবে না, অর্থনৈতক উন্নয়নের জন্য আরও একটি শর্ত আছে তাহা হইতেছে, কম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার। সঞ্চয় বৃদ্ধির হার সুউচ্চ থাকিলেও এবং মূলধন-উৎপাদন অনুপাত কম থাকিলেও অর্থনৈতিক উন্নয়ন আশাপ্রদ হইবে না যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশী হয়। সেইজন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে যতদূর সম্ভব কম রাখিতে হইবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন কি কি উপাদানের উপর নির্ভর করে?

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দেশে উৎপাদিত সামগ্রীর মধ্যে বিদেশ হইতে আমদানিকৃত সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির অবদান (important components) কমিয়া আসিতে থাকে; কারণ আমদানির বিকল্প জিনিস উৎপাদনে দেশের উৎপাদন পরীক্ষার তৎপরতা বাড়ে। দেশের ভিতরেই আয়-বৃদ্ধি হেতু ভোগ সামগ্রীর জন্য চাহিদা বাড়িতে থাকে। রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়া ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য উন্নত

১। হ্যারডের সমীকরণ হইতেছে নিম্নরূপ:

$$G = \frac{S}{K}$$

G—উন্নয়ন হার (Rate of growth)

S—সঞ্চয়-আয় অনুপাত (Saving-Income Ratio)

K—মূলধন-উৎপাদন অনুপাত (Capital-Output Ratio)

যদি মূলধন-উৎপাদন অনুপাত স্থির থাকে, তবে উন্নয়ন-হার বাড়াইবার জন্য সঞ্চয়-আয় অনুপাত বাড়ানো দরকার।

ধরণের উৎপাদন পদ্ধতি, শ্রমিকদের কর্ম নৈপুণ্য, কারিগরী শিল্পের মান উন্নয়ন, জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন প্রভৃতি হইতেছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কতিপয় আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্য।

আধুনিক যুক্তি অনুযায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুধু মূলধন কিংবা শ্রমের সুষম প্রয়োগের উপর নির্ভর করে তাহাই নহে, —এমন অনেক উপাদান আছে যেগুলি শুধু মূলধন কিংবা শ্রমের প্রয়োগের দ্বারা আবদ্ধ নয়, অথচ এইগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

সুষম বা ভারসাম্য-সূচক উন্নয়ন এবং অসম উন্নয়ন (Balanced growth vs. Unbalanced growth) : অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিভাবে হইতে পারে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া র‍্যাগনার নার্কসি (Ragnar Nurkse) "balanced growth" পদ্ধতির সুপারিশ করিয়াছেন। কিন্তু হান্স সিংগার (Hans Singer) এবং হার্শম্যান (Hirschman) এই যুক্তির সমালোচনা করিয়াছেন। নার্কসি মনে করেন, অনুন্নত দেশে যে স্বল্প প্রকৃত আয় দেখিতে পাওয়া যায় তাহার প্রকৃত কারণ হইতেছে উৎপাদনী শক্তির নীচু স্তর এবং মূলধনের অভাব। মূলধনের অভাবের কারণ হইতেছে সঞ্চয়ের স্বল্পতা। বিনিয়োগের প্রবণতা ও বাজারের বিস্তৃতির উপর নির্ভরশীল। সেইজন্য বিভিন্ন শিল্পে বেশী করিয়া মূলধন প্রয়োগ করা উচিত যাহাতে উৎপাদনীশক্তিও বাড়ে এবং বাজারেও আরও বিস্তৃতি হয়। সেজন্য উৎপাদন এবং উন্নয়নের প্রচেষ্টা এমন হওয়া উচিত যেন ইহা সামগ্রিকভাবে ভারসাম্য-সূচক (balanced) হয়। নার্কসির ভাষায় "The case for balanced growth depends on the need for a balanced diet."

হান্স সিংগার এই যুক্তির সারবত্তা সম্বন্ধে সন্দিহান ; তিনি মনে করেন, অনুন্নত দেশে যেখানে শতকরা ৭০ ভাগ হইতে ৮০ ভাগ লোক কৃষিজীবী, সেখানে ভারসাম্যসূচক উন্নয়ন-পদ্ধতি প্রয়োগ করিলে যথাযথ ফল লাভ নাও হইতে পারে। এই শতকরা ৮০ ভাগ কৃষিজীবীকে মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগে পরিণত করিতে হইবে এবং অবশিষ্টাংশকে শিল্পক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল করিতে হইবে তবে দেশ উন্নত হইতে পারে। সিংগারের ভাষায়, "We can define the process (of economic growth) as one of transforming a country from an 80 percent farmer to 15 percent farmer." এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে ভারসাম্যসূচক উন্নয়ন পদ্ধতি গ্রহণ করিলে চলিবে না,—কারণ, সম্পদের স্বল্পতা থাকিলে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা সহজ নহে। সেইজন্য সিংগার মনে করেন ভারসাম্য বিহীন উন্নয়ন পদ্ধতি (Technique of unbalanced growth) অনগ্রসর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অধিকতর কার্যকর হইবে। হার্শম্যানও (Hirschman) এই মতবাদে বিশ্বাসী। ভারতবর্ষে স্বল্পকালীন ভিত্তিতে ভারসাম্য বিহীন উন্নয়ন পদ্ধতির দ্বারা দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে ভারসাম্য সূচক উন্নয়ন পদ্ধতির দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা চলিতেছে। ভারসাম্য বিহীন উন্নয়ন পদ্ধতি অনুযায়ী যখন যেমন সম্ভবপর সেইভাবেই উন্নয়নের

প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতে হয়। ইহাতে যদি উৎপাদন প্রচেষ্টায় সমুদয় সম্পদ নিয়োগ করার ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় না থাকে, তাহাতে ক্ষতি নাই। যে জিনিসটির প্রধান প্রয়োজন তাহা হইতেছে, যে কোন উপায়েই বিনিয়োগের উৎপাদনীশক্তি বাড়াইয়া দেওয়া।

এই উপাদানগুলিকে কারিগরী উন্নয়ন বা Technical Progress বলা যাইতে পারে। অধ্যাপক সলো (Solow) দেখাইয়াছেন, ১৯০৯ সাল হইতে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে অর্থনৈতিক উন্নতি হইয়াছে তাহার মধ্যে শতকরা ৮৭½ ভাগ হইয়াছে কারিগরি উন্নতির জন্য এবং শতকরা ১২½ ভাগ হইয়াছে মূলধন ও শ্রমের প্রয়োগের জন্য। অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে জমি, মূলধন, শ্রম এবং উন্নত কলা-কৌশলের প্রয়োগের উপর। কিন্তু, মূলধন ও শ্রমের পরিমাণ হইতেও ইহাদের উৎপাদনীশক্তির গুরুত্ব অনেক বেশী।

অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপায় (Requirements for economic development of an underdeveloped country) : অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রথমেই জাতীয় আয় বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে। জাতীয় আয় বাড়াইতে হইলে দেশের শিল্পগুলিকে উন্নত করিতে হইবে। সুতরাং অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম উপায় হইল দেশের দ্রুত শিল্পায়ন যাহাতে সম্ভবপর হইতে পারে সেইভাবে একটি একটি পরিকল্পিত কার্যসূচী তৈয়ার করা। কিন্তু যাহাতে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন সম্ভবপর হইতে পারে, সেইজন্য শিল্প শ্রমিকদের কারিগরী কর্মকুশলতা বাড়াইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে অধিক সংখ্যক কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত এবং প্রয়োজন হইলে বিদেশী কারিগরী বিশেষজ্ঞ-দের সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। তাহা ছাড়া, দ্রুত শিল্পোন্নয়নের অর্থ হইল বেশী করিয়া মূলধন সৃষ্টির ব্যবস্থা করা। মূলধন-সৃষ্টি নির্ভর করে, (১) সঞ্চয়ের সৃষ্টি, (২) সঞ্চিত আর্থিক সম্পদের একত্রীকরণ বা সংহতিকরণ (Mobilisation of Savings) এবং (৩) সঞ্চয়ের উপযুক্ত বিনিয়োগের উপর।

দ্বিতীয়ত, অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিদেশী সাহায্য এবং সহযোগিতার প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক ব্যাংক বা বিশ্ব-ব্যাংক (World Bank) প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে বিদেশী মূলধন গ্রহণে অনুন্নত দেশের জনসাধারণের অনিচ্ছা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। শুধু অর্থিক সাহায্যই নহে, বিদেশ হইতে কারিগরী সহযোগিতাও (Technical co-operation) লাভ করা যাইতে পারে।

তৃতীয়ত, অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না যদি বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গৃহীত না হয়। প্রচ্ছন্ন বেকার সমস্যা এবং মরশুমী বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য পার্শ্ববর্তী উপজীবিকা হিসাবে কুটির ও গ্রামীণ ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে উন্নত করা যাইতে পারে। প্রচ্ছন্ন বেকার অবস্থার মধ্যে মূলতঃ কিছু পরিমাণ সঞ্চয় (Potential Saving) নিহিত থাকে।

যদি এই সমস্যার সমাধান করা যায়, তবে সঞ্চয় সৃষ্টির কাজ অনেক পরিমানে সফল হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল সমস্যা

অর্থনৈতিক উন্নয়নের গোড়ার কথা হইতেছে জনপ্রতি প্রকৃত জাতীয় আয় বাড়ানো। এই উদ্দেশ্যে একদিকে যেমন প্রকৃত জাতীয় আয় বাড়াইতে হইবে অপরদিকে সেই প্রকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাইতে হইবে।

উপরের আলোচনায় আমরা দেখিতেছি উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্যা মূলতঃ মূলধনসৃষ্টির সমস্যা। মূলধন সৃষ্টি প্রধানতঃ নির্ভর করে সঞ্চয়ের সৃষ্টি, সংগ্রহকরণ বা একত্রীকরণ এবং সঞ্চয়ের বিনিয়োগের উপর। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগের হার বাড়াইতে হইবে; সঞ্চয় বাড়াইলেও বিনিয়োগের হার বাড়ানো সম্ভবপর। সেইজন্য অধ্যাপক লুইয়ের (Prof. Lewis) মতে অনুন্নত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল সমস্যা হইতেছে কিভাবে সঞ্চয়ের পরিমাণ শতকরা ৫ ভাগ হইতে শতকরা ১৫ ভাগ পর্যন্ত বাড়ানো যায়।[১]

এই সঙ্গে আমরা ইহাও বলিতে পারি যে অনগ্রসর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা হইল কিভাবে দেশকে শতকরা ৮০ ভাগ কৃষিজীবী হইতে শতকরা ১৫ ভাগ কৃষিজীবীতে রূপান্তরিত করা যায়।[২]

সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িলে ইহার সদ্ব্যবহার বা উপযুক্ত বিনিয়োগের প্রশ্ন উঠে। এই উদ্দেশ্যে অনুন্নত দেশগুলিকে বিদেশী কারিগরী বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় মূলধন বা যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে হয়। এজন্য অনুন্নত দেশগুলির সর্বদাই কিছু বিদেশী মুদ্রা সঞ্চয় করিয়া রাখা উচিত। বিদেশী মুদ্রা অর্জনের উপায় হইতেছে দেশের যে সমস্ত জিনিসের জন্য বিদেশে ভাল চাহিদা আছে, সেইগুলির উৎপাদন বাড়াইয়া রপ্তানির ব্যবস্থা করা। তাহা ছাড়া, বৈদেশিক ঋণের সাহায্যেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো যাইতে পারে।

কিন্তু গড় উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ ফলপ্রসূ নাও হইতে পারে যদি সেই সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রিত করা না হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচীকে অনেক ক্ষেত্রে বানচাল করিয়া দেয়।

আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায় (Phases) দেখিতে পাই। প্রকৃত উন্নয়নের প্রারম্ভিক মুহূর্তের (Take off stage) জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন। এই প্রস্তুতি হইতে পারে কৃষি এবং শিল্পের উন্নয়নের দ্বারা এবং জাতীয় আয় ও শিল্পের উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধির দ্বারা। "Take Off" পর্যায়ের পর আমরা দেখিতে পাই "Self-sustaining

১। হান্স সিংগারের (Hans Singer) ভাষায় "Arthur Lewis has defined the process of economic growth as one of transforming a country from a 5 percent saver to a 15 percent saver. We can with equal justice, define the process as one of transforming a country from an 80 percent farmer to 15 percent farmer."

২. Lewis—Theory of Economic Growth

Growth" বা স্বয়ংক্রিয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এই স্বয়ংক্রিয় অথবা স্বনির্ভরশীল অর্থনৈতিক উন্নয়নে দেশের আভ্যন্তরীণ সম্পদ এবং জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি হেতু বর্ধিত ও সুসংহত সঞ্চয়ের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয় ভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বাড়িতে থাকে। ভারতের চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় স্বয়ংক্রিয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের (Self-sustaining Growth) জন্য প্রচেষ্টা চলিতেছে। এই উদ্দেশ্যে কৃষি ও শিল্পের যুগপৎ উন্নয়ন এবং মূলধন-সৃষ্টির (capital formation) কাজ বর্ধিত হারে হওয়া দরকার।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থসংস্থান (Financing of Economic Devolopment): অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রধান প্রয়োজন হইতেছে আর্থিক সঙ্গতি। দেশে যদি মূলধন সৃষ্টির হার না বাড়ে এবং যদি উন্নয়নমূলক কাজগুলি সফল হয় না। সুতরাং যে কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থার উপর। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই অর্থ কোথা হইতে আসিবে ?

কর ধার্য

প্রথমন, সরকার জনগণের উপর বেশী করিয়া কর ধার্য করিয়া রাজস্বের পরিমাণ বাড়াইতে পারে এবং দেশরক্ষা ব্যতীত অন্যান্য খাতে ব্যয়-সংকোচন নীতি অবলম্বন করিতে পারে। ইহাতে যে রাজস্ব বৃদ্ধি হয় তাহা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থান করিবার কাজে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কর ব্যবস্থা অন্যান্য উপায়েও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক হয়। সঞ্চয় বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ, অবাঞ্ছিত ভোগ নিয়ন্ত্রণ এবং আয় ও ধনের বৈষম্য কমাইয়া কর ব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম করে।

সরকারের ঋণ গ্রহণ

দ্বিতীয়ত, সরকার দেশের কতিপয় আভ্যন্তরীণ উৎস হইতে ঋণ সংগ্রহ করিতে পারে সাধারণতঃ, ব্যাংক অথবা জনসাধারণের নিকট হইতে এই ঋণ সংগ্রহ করা হয়।

ঘাটতি অর্থ সংস্থান

তৃতীয়ত, বাজেটে ঘাট্‌তি করিয়া অর্থাৎ সরকারের আয় অপেক্ষা খরচের পরিমাণ বেশী বাড়াইয়া দিয়া পরিকল্পনার আর্থিক সঙ্গতি বাড়ানো যাইতে পারে। বাজেটে ঘাট্‌তি দূর করিবার জন্য অনেক নূতন কাগজী নোট ছাপানো হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক নূতন কাগজী নোট ছাপাইয়া সরকারকে ধার হিসাবে দেয়। এই ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি হইল এই যে মুদ্রার সরবরাহ বাড়িলে ইহা জনগণের ক্রয়শক্তি ও চাহিদা বাড়াইয়া দেয় ; ইহায় ফলে দেশের উৎপাদনও বাড়িয়া যায়। কিন্তু উৎপাদন বাড়িয়া যাইবার পথে প্রধান অন্তরায় হইল মূলধনের স্বল্পতা এবং শ্রমিকদের কর্মকুশলতার অভাব। প্রকৃতপক্ষে অনুন্নত দেশগুলিতে নূতন কাগজী নোট ছাপাইলে কিছু না কিছু মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়, ইহার ফলে জিনিস পত্রের দাম বাড়িয়া যায়।[1]

১। ৪৪৭-৪৪৮পৃষ্ঠায় ঘাটতি অর্থসংস্থান সম্পার্ক বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

মুদ্রাস্ফীতির সাহায্যে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থান (Inflationary financing of economic development) করা উচিত কিনা সেই বিষয়ে অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। ঘাটতি অর্থসংস্থানের ফলে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। যাঁহারা মুদ্রাস্ফীতির মাধ্যমে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থান করিবার নীতি সমর্থন করেন, তাঁহাদের মতে মুদ্রাস্ফীতি চূড়ান্ত রূপ ধারণ না করিয়া জিনিসপত্রের দাম কিছু পরিমাণে বাড়াইবার কাজে প্রেরণা পায় ও ইহার ফলে কর্মসংস্থানের পরিমাণও বাড়ে। তাহা ছাড়া মুদ্রাস্ফীতির ফলে সামগ্রিকভাবে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। কিন্তু, মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হইলে বর্ধিত মুদ্রার সাহায্যে যদি দেশের অব্যবহৃত সম্পদগুলিকে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করা যায়, তবেই দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন হওয়া সম্ভব। তাহা না হইলে চূড়ান্ত মুদ্রাস্ফীতি শুধু জিনিসপত্রের দামই বাড়াইতে এবং দরিদ্র জনসাধারণের দুর্দশা বাড়াইবে—অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে সহায়ক হইবে না।

মুদ্রাস্ফীতির সাহায্যে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন

চতুর্থত, বিদেশ হইতে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করিয়াও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলির অর্থসংস্থান করা হয়। বর্তমানকালে সব অনুন্নত দেশকেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। অর্থ নৈতিক উন্নয়নের জন্য অনগ্রসর দেশগুলির পক্ষে বিদেশ হইতে আর্থিক সাহায্যই শুধু নহে, কারিগরী সাহায্যেরও প্রয়োজন হয়। তবে কোন দেশের রপ্তানি আয় যদি বাড়িতে থাকে এবং তাহা দ্বারা যদি বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা যথেষ্ট পরিমাণে পূরণ করা সম্ভব হয়, তবে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতাও কমিতে থাকে।

বৈদেশিক সাহায্য

উপরে বর্ণিত চারিটি উৎস ছাড়াও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করিতে হইলে অন্যভাবে চেষ্টা করা যাইতে পারে। দেশের সমুদয় সঞ্চয়কে একত্রিত করিয়া ইহার বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা উচিত। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিও "লাভও নহে ক্ষতিও নহে" এই নীতি পরিত্যাগ করিয়া উন্নয়নের অর্থসংস্থানের জন্য কিছু উদ্বৃত্ত অর্জন করিবার ব্যবস্থা করিতে পারে।

Exercise

1. Discuss the economic functions of the State.
[সরকারের অর্থনৈতিক কাজগুলি আলোচনা কর।] (৪৬১-৪৬৩ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the arguments for and against State Trading.
[রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি আলোচনা কর।] (৪৬৩-৪৬৫ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the arguments for and against nationalisation of industries. [শিল্প জাতীয়করণের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি আলোচনা কর।] (৪৬৫-৪৬৭ পৃষ্ঠা)

4. Write a very brief note on the Marxian theory of economic development. [মার্ক্সীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত্ত্ব সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।] (৪৬৭-৪৬৮ পৃষ্ঠা)

5. Examine the distinguishing features of a socialist society and discuss the difficulties arising in such a society.

[সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষা কর এবং এই জাতীয় সমাজে যে অসুবিধাগুলি দেখা যায় সেগুলি আলোচনা কর।] (৪৬৮-৪৬৯ পৃষ্ঠা)

6. What do you mean by economic growth ? What are the factors governing economic development ? [অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলিতে কি বোঝ ? অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপাদানগুলি কি কি ?] (৪৬৯-৮৭১ পৃষ্ঠা)

7. Distinguish between Balanced growth and unbalanced growth. [সুষম বা ভারসাম্য সূচক উন্নয়ন এবং অসম উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।] (৪৭১-৪৭২ পৃষ্ঠা)

8. Discuss the requirements for economic development of an underdeveloped economy. [অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপায় সম্পর্কে আলোচনা কর।] (৪৭২-৪৭৪ পৃষ্ঠা)

9. Discuss the different methods of financing economic development. [অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থান সম্পর্কে আলোচনা কর।]

(৪৭৪-৪৭৫ পৃষ্ঠা)